

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

১১২ বর্ষ ১ম-২য় সংখ্যা • বৈশাখ-আষাঢ়, আবণ-আশ্বিন ১৪১২

৭০

পত্রিকাধ্যক্ষ
প্রভাতকুমার দাস

৬৬১৫৫৩



বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা ৭০০ ০০৬

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
১১২ বর্ষ ১ম-২য় সংখ্যা বৈশাখ-আষাঢ়, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪১২
Sahitya-Parisat-Patrika
Vol. 112, No. 1 & 2 Baisak-Asarh, Sraban-Aswin 1412
(Published on Agrahayan 1412, December 2005)

প্রকাশ : অগ্রহায়ণ ১৪১২

P31194

প্রকাশক :
শ্রীরমাকান্ত চক্রবর্তী
সম্পাদক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা ৭০০ ০০৬

বণবিন্যাস ও মুদ্রণ :
শ্যামল সাউ, দি সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৬

দাম : ১০০.০০ টাকা

সাহিত্য - প রি ষ ৎ - প ত্রি ক়া

১১২ বর্ষ ১ম-২য় সংখ্যা • বৈশাখ-আষাঢ়, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪১২

সূ চি প ত্র

পত্রিকা প্রসঙ্গ • প্রভাতকুমার দাস

লেখক-পরিচিতি •

পত্র • রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১

রবীন্দ্রনাথের দুটি চিঠি ও অনন্যদাশঙ্কর রায় • সুরজিৎ দাশগুপ্ত ২

ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান উপাসক সম্প্রদায় ও অক্ষয়কুমার দত্ত

• আশীষ লাহিড়ী ৭

আলালী ভাষার সুলুক সন্ধান • রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ১৭

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা গদ্য সাহিত্যে চলিত শব্দের ব্যবহার

• অনীতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২৮

উপভাষা : স্বাতন্ত্র্যের সংকট ও স্বরূপের সন্ধান • নীলাদ্রিশেখর দাশ ৩৭

কৃষ্ণিবাসের রামায়ণ : শুচিবায়ুর একদিক • বীতশোক ভট্টাচার্য ৪৯

এই জীবন • রশ্মিতী সেন ৭০

রবীন্দ্র স্নেহধন্য উদয়ন পত্রিকার ইতিহাস ও রচনাসূচি • অশোককুমার রায় ১০৫

ঘরে-বাইরে • ১১৩

উদয়ন : সংখ্যানুক্রমিক সূচি • অশোককুমার রায় ১১৭

স্বদেশী আন্দোলন : ফিরে দেখা • সোনালি চক্রবর্তী বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪৪

বর্ণপরিচয়-এর দেড়শো বছর • অমিতাভ মুখোপাধ্যায় ১৫৯

‘দৈব ও পুরুষকার’ কিংবা দৌহিত্রীর দৃষ্টিতে বিদ্যাসাগর • সরযুবালা দেবী ১৬৯

‘দৈব ও পুরুষকার’ কিংবা দৌহিত্রীর দৃষ্টিতে বিদ্যাসাগর • অমিয়কুমার সামন্ত ২০৩

পরিষৎ-সংবাদ • ২০৬

১৪১১ বঙ্গাব্দের উপহৃত পুস্তক তালিকা • ২১১



রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন

বাংলা বই

গীতার্থ চিন্তা চক্রধর আচার্য ৪০.০০ ● রোমান্টিকতা ও বাংলা কাব্যে রোমান্টিক ধারার
বিবর্তন ড. ভানুভূষণ জানা ৮৫.০০ ● বেতার নাটক রচনারীতি ড. সূর্য সরকার ৩৫.০০ ●
বাংলা লোকসাহিত্যে রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গ ড. গৌরী ভট্টাচার্য ১৩০.০০ ● ভারত-ভ্রমণ দিনপঞ্জি
কাম্পো আরাই অনুবাদ : কাজুও আজুমা ৬০.০০ ● অভয়াঙ্গল (কবিকল্পন মুকুন্দ) (রবীন্দ্রনাথ
ঠাকুরের মন্তব্য সংবলিত) ড. দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ৮৫.০০ ● চিত্রভাবন শোভন
সোম ১০০.০০ ● রবীন্দ্রচর্যা দেবীপদ ভট্টাচার্য ১৪০.০০ ● রবীন্দ্র দ্বিজেন্দ্র বিতর্ক পুলিনবিহারী
সেন সংকলিত ২০০.০০ ● কবিকে লেখা চিঠি হেমন্তবালা দেবী সম্পাদনা ড. দেবনাথ
বন্দ্যোপাধ্যায় ও জয়ন্তী সান্যাল ৮০.০০ ● রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃতচর্চা সম্পাদনা সুবুদ্ধিচরণ
গোস্বামী ৭০.০০ ● সংস্কৃত সাহিত্যে সমাজতত্ত্ব ও অন্যান্য প্রসঙ্গ ড. করুণাসিন্ধু দাস
১২০.০০ ● গোপথ ব্রাহ্মণ ড. তারকনাথ অধিকারী ১৫০.০০ ● কবির অধ্যয়ন উজ্জলকুমার
মজুমদার ৮৫.০০ ● বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা ড. গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য ৪০০.০০ ● বাঘনাপাড়া
সম্প্রদায় ও বৈষ্ণব সাহিত্য ড. কাননবিহারী গোস্বামী ১৫০.০০ ● ভারতদূত রবীন্দ্রনাথ ড.
হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৫.০০ ● সভ্যতার সংকেত : ভাষাতাত্ত্বিক সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সম্পাদনা
ড. ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক ও অন্যান্য ৮০.০০ ● কবির অভিনয় অবন্তীকুমার সান্যাল ৩০.০০ ●
জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি অনুবাদ প্রভাতকুমার দাস ৭০.০০ ● সুন্দরের অভ্যর্থনা অলোকরঞ্জন
দাশগুপ্ত ৫০.০০ ● কবির অনুবাদ অশ্রুকুমার শিকদার ৪০.০০ ● তারাসঙ্কর : আলোকিত
দিগ্ধলয় ড. পল্লব সেনগুপ্ত সম্পাদিত ১৫০.০০ ● দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী ক্ষিতীন্দ্রনাথ
ঠাকুর ১২৫.০০ ● রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত ২০০.০০ ● মৃত্যুর নিপুণ শিল্প
বিকীর্ণ আঁধারে সংকলন ড. প্রভাতকুমার দাস ১২.০০ ● বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও তার
ক্রমবিকাশ ড. নির্মলকুমার দাশ ২২০.০০ ● রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যু ড. ধীরেন্দ্রনাথ দেবনাথ
১৪০.০০ ● কথা ও সুর ধৃজটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ৬০.০০ ● সঙ্গীত রত্নাকর (শার্ঙ্গদেব)
সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অনূদিত ২১০.০০ ● জীবনানন্দ : বিভিন্ন কোরাস ড. পল্লব সেনগুপ্ত
সম্পাদিত ১৫০.০০ ● পুথির কথা ড. শম্পা সরকার ৪০.০০ ● লোকশিল্প সাহিত্য :
অবনীন্দ্রনাথ নির্মলেন্দু ভৌমিক ২৫.০০ ● প্রাচীন ভারতের ধর্মসমাজ ও দর্শন হেমন্তকুমার
গাঙ্গুলী ৬০.০০ ● বঙ্গদেশে পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্যে বৈদিক ব্রাহ্মণ মধুসূদন বোদান্ত শাস্ত্রী
১২.০০ ● রবীন্দ্রসাহিত্য কালপঞ্জি ২০.০০ ● রবীন্দ্র মানচিত্র ১৫.০০ ● বিশ্বপথিক রবীন্দ্রনাথ
১৫.০০ ● কবিতীর্থ জোড়াসাঁকো তুলসীমঞ্জরী গঙ্গোপাধ্যায় ২৫.০০ ● সর্বজনের রবীন্দ্রনাথ
সম্পাদক মণ্ডলী ১৫.০০ ● ট্রাজেডি প্রসঙ্গে এয়ারিস্টটল দত্তাশ্রয় দত্ত ৭৫.০০।

প্রাপ্তি স্থান

সোনারতরী

৬/৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলকাতা - ৭০০০০৭

৫৬এ বি. টি. রোড কলকাতা ৭০০০ ৫০

পত্রিকা প্রসঙ্গ

প্রায় সাতমাস অতিক্রমের পর একশো বারো বর্ষের প্রথম সংখ্যাটির সঙ্গে দ্বিতীয় সংখ্যা একত্র কবে প্রকাশিত হচ্ছে—সহমর্মী পাঠক বুঝবেন, এর প্রধান এবং একমাত্র কারণ ব্যয়-সঙ্কোচের লক্ষ্যে আমাদের প্রকাশন কর্মসূচি রূপায়ণে কিছুটা ধীরে চলার নীতি বাধ্যত গৃহীত হয়েছে। যদিও ইতিমধ্যে আমরা উপলব্ধি করেছি, পাঠক ও সদস্যবর্গ এই পত্রিকার প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল, উত্তরোত্তর তারই মূল্য দেওয়ার জন্য আমরা বদ্ধপরিকর। বছরের অর্ধেক সময় পেরিয়ে এসেও পত্রিকাটি প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি এজন্য আমরা বিশেষ লজ্জিত হয়ে আছি এ সংখ্যার লেখকদের কাছে, কেননা তাঁরা প্রত্যেকেই এই বিলম্বিত ব্যবস্থাকে প্রভূত ধৈর্যের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। তাঁদের তিতিক্ষা আমাদের কৃতার্থ করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পরিকল্পনা মতো কিছু লেখা আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি, অনেকে সাগ্রহে ডাকযোগেও বেশ কয়েকটি সম্পর্ড পাঠিয়েছেন, ইতিমধ্যে তৃতীয় সংখ্যার মুদ্রণকাজও সমাপ্তির পথে—আশা করছি সেটি আসন্ন পৌষের মধ্যেই প্রকাশিত হতে পারবে।

শতাধিক বর্ষ পূর্বে বঙ্গাব্দ ১৩১১ ১৭ চৈত্র ক্লাসিক থিয়েটারে অনুষ্ঠিত বিশেষ অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ ‘ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ’ শীর্ষক নিবন্ধটি পাঠ করার সময় ‘বাংলাদেশের যে জ্যোতির্ময় সারস্বত ছায়াপাত’ রচিত হয়েছিল, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদকে তিনি তারই ‘একটি কেন্দ্রবদ্ধ সংহত অংশ’ বলে উল্লেখ করে বলেছিলেন : ‘ছাত্রমণ্ডলী তাহার চতুর্দিকে জ্যোতির্বাষ্পের মতো বিকীর্ণ অবস্থায় আছে। এই ঘন অংশের সঙ্গে বিকীর্ণ অংশের যখন জাতিগত ঐক্য আছে, তখন সে ঐক্য সচেতনভাবে অনুভব করা চাই, তখন এই দুই আত্মীয় অংশের মধ্যে আদান প্রদানের যোগ স্থাপন করা নিতান্ত আবশ্যক।’ হয়তো আজ নতুন করে এই ভাষণের মূল উপজীব্য উপলব্ধি করা দরকার, ‘বিনা বেতনে বিনা পুরস্কারে খ্যাতিবিহীন কর্মের মধ্য দিয়ে যে মাতৃসেবার প্রকৃত স্বরূপ, তার প্রতি ছাত্রমণ্ডলীকে মনোযোগী করতে হবে।’ দেশের কাব্যে, গানে, ছড়ায়, প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষে, কীটদষ্ট পুথির জর্জর পত্রে, গ্রাম্য পার্বণে, ব্রত কথায়, পম্পীর কৃষিকুটীরে’ স্বদেশকে সন্ধান করার যে উদ্যোগ একসময় পরিষদ গ্রহণ করেছিল, সেই আদর্শের পরিপোষণে আজকের তরুণ ছাত্রদের আগ্রহ যাতে বাড়ে, সে ব্যাপারে আমাদের উদ্যোগী হতে হবে। পরিষদের কর্মকাণ্ডের পরিধি বহুব্যাপ্ত, আপাতত প্রকাশন কর্মে শিশিক্ষু-উৎসাহীদের স্বেচ্ছাসেবার প্রতি আমরা আন্তরিক প্রত্যাশা স্থাপন করছি।



আমাদের সৌভাগ্য, রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ উত্থাপন করার আরো একটি সুযোগ আমরা পেয়েছি—এবারের সংখ্যাটি শুরু হয়েছে রবীন্দ্রনাথের দুটি অপ্রকাশিত পত্র দিয়ে। পরিসর প্রশস্ত না হলেও, রবীন্দ্রনাথের যে কোনো অমুদ্রিত রচনাই নিঃসন্দেহে যে কোনো পত্রিকার পক্ষেই গৌরবের। তরুণ কোনো কবিশোপ্রার্থীকে লেখা প্রবীণ কবির স্নেহ সাধুবাদ—এই দুটি পত্রের যৎসামান্য বিষয়, কিন্তু তা কীরকম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল যে, সেদিনই তিনি প্রাপ্ত কাব্যগ্রন্থের নানা স্থানে নানা রকম পরামর্শ ও সুপারিশ জানাতে আগ্রহী হয়েছিলেন। সেই বৃত্তান্ত নিয়ে একটি নিবন্ধও লিখেছেন প্রাপকের স্নেহধন্য সুরজিৎ দাশগুপ্ত। সুরজিতের চেষ্টায় অমদ্যশংকরের কনিষ্ঠ পুত্র আনন্দরূপ রায় চিঠি দুটি প্রকাশের অনুমতি দিয়ে আমাদের বাধিত করেছেন।

আধুনিক ভারতীয় বিজ্ঞানদর্শন চর্চায় অক্ষয়কুমার দত্ত যে পথিকৃতির ভূমিকা পালন করেছিলেন সেই বিশেষ দিকটি আলোকিত করেছেন আশীষ লাহিড়ী। পরবর্তী তিনটি প্রবন্ধ ভাষা বিষয়ক, লিখেছেন যথাক্রমে রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, অনীতা বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলাদ্রিশেখর দাশ—প্রবন্ধগুলির ভিতর দিয়ে লেখকদের বিশ্লেষণ ও দৃষ্টিভঙ্গি অভিজ্ঞ পাঠকদের কাছে নতুন চিন্তার বিস্তার ঘটাবে। বীতশোক ভট্টাচার্য রামায়ণ অনুবাদকদের শুচিবায়ুগ্রস্ততার বিষয়ে একটি মনোস্তম্ভ সন্দর্ভ রচনা করেছেন যাতে বিদেশি মহাকাব্যের প্রসঙ্গও এসেছে সাবলীলভাবে। রুশতী সেন তাঁর প্রস্তুতমান গ্রন্থ *ধৃজটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়*-এর একটি অংশ এখানে প্রকাশের জন্য দিয়েছেন, রচনাটিতে লেখকের মতো তাঁর জীবনকে ঘিরে জিজ্ঞাসু পাঠকদের সামনেও অনেক প্রশ্ন তৈরি হবে। এরপরে সম্ভব বছরের অধিক সময় পূর্বে ক্ষণজীবী *উদয়ন* পত্রিকার সংখ্যানুক্রমিক সূচি ও তার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রচনা করেছেন অশোককুমার রায়। এই পত্রিকার গুরুত্ব প্রসঙ্গে অবশ্যই স্মর্তব্য যে, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং পত্রিকাটিতে শুধু নামমাত্র আশীর্বাণী জানাননি, তিনি লেখক তালিকার অগ্রভাগে নিজেই যুক্ত করেছিলেন।

বর্তমান সংখ্যায় শেষাংশে দুটি রচনা লিখেছেন যথাক্রমে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের বিষয়ে সোনালি চক্রবর্তী বন্দ্যোপাধ্যায় এবং *বর্ণপরিচয়* প্রকাশের দেড়শো বছরকে স্মরণ করে অমিতাভ মুখোপাধ্যায়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ব্রিটিশ শাসক কর্তৃক বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব কার্যকরী করার ঘটনায় বাঙালি জনমানসে একটা বিপুল অভিঘাত সৃষ্টি করেছিলেন। বাইরের দিক থেকে তাঁরা যুক্তি হিসেবে বঙ্গ-প্রদেশের প্রশাসনিক অসুবিধার দিকটিকেই প্রচার করলেও তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিভেদ সৃষ্টি করে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যকে বিঘ্নিত করা। প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ আন্দোলনের ভিতর দিয়ে যে উদ্দীপনা সঞ্চার করেছিলেন সামাজিক রাজনৈতিক নেতৃবর্গ, সাহিত্যিক, শিল্পী, শিক্ষক, বিজ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবীদের ভাবনায় ও সৃজনকর্মে তার প্রভাবও পরিলক্ষিত হয়েছিল। ক্রমান্বয়ে বঙ্গপ্রদেশের সীমা অতিক্রম করে তার সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটকেও আন্দোলিত করেছিল—তারই একটা সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা আজকের দিনেও অত্যন্ত জরুরি বোধ হয়েছে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের গোড়ায় পর্যাতিরিশ বছর বয়সে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা দুমাসের ব্যবধানে *বর্ণপরিচয়*-এর প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ রচনা করেছিলেন, শেষোক্ত ভাগে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতির সময় তিনি নিযুক্ত হয়েছিলেন দক্ষিণবঙ্গের বিদ্যালয় পরিদর্শক পদে। সেই গ্রন্থের প্রভাব কীভাবে তখনকার দিনে ক্রমান্বয়ে বিস্তার লাভ করে আজকের একুশ শতক পর্যন্ত দীর্ঘ সময় পর্বে প্রাসঙ্গিকতা অব্যাহত রেখেছে, তারই একটা আনুপূর্বিক পটভূমি স্পষ্ট করা অত্যন্ত জরুরি মনে করেছেন শেষোক্ত প্রবন্ধকার। দুটি ঘটনাই বাঙালির জাতীয় জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। এ উপলক্ষ্যে পত্রিকার মাধ্যমে বি . দুটিকে আমরা পাঠকের সামনে উপস্থাপন করার সুযোগ পেলাম।

একেবারে শেষ দুটি রচনার গুরুত্বও আমাদের স্বীকার করতে হয়—প্রথমটি বিদ্যাসাগরের দৌহিত্রী সরযুবালা দেবীর লেখা—সেটির সম্পাদনা এবং সূত্র নির্দেশ অংশটি বহুশ্রমে প্রস্তুত করেছেন অমিয়কুমার সামন্ত। এছাড়াও তিনি স্বতন্ত্র একটি নিবন্ধে সরযুবালার পরিচয় এবং আলোচ্য রচনাটির বিষয় তথ্যপূর্ণ বিশ্লেষণ করেছেন। বিদ্যাসাগরের ব্যক্তি পরিচয় ও তাঁর পারিবারিক উত্তরাধিকার বিষয়ে পাঠকদের সামনে কিছু নতুন ভাবনার অবকাশ তৈরি হবে হয়ত।

গত সংখ্যা প্রকাশের পর সাহিত্যক্ষেত্রে অনেক বিশিষ্ট জনের প্রয়াণ আমাদের বিষণ্ণ করেছে। তবু বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় কবি ভাস্কর চক্রবর্তীর কথা। গত শতকের ষাটের দশকের কবি হিসেবে তাঁর স্বাতন্ত্র্য প্রায় আবির্ভাব সময় থেকেই পাঠক মহলে সাড়া জাগিয়েছিল। জন্ম

১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫, ১৯৭১-এ তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ *শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা* প্রকাশিত হয়, দশ বছর পরে তাঁর দ্বিতীয় বই *এসো, সুসংবাদ এসো*, পরবর্তী বছর ছাৰিশের সময়ে *শ্রেষ্ঠ কবিতা* সহ তাঁর কবিতার বইয়ের সংখ্যা ন-দশটি, যেগুলি : *রাস্তায় আবার; আকাশ অংশত মেঘলা থাকবে; স্বপ্ন দেখার মহড়া; তুমি আমার ঘুম; নীল রঙের গ্রহ; দেবতার সঙ্গে; কেমন আছ মানুষেরা; জিরাকের ভাষা*। গদ্যের বইয়ের সংখ্যা মাত্র তিনটি : *প্রিয় সূত্রত; শয়নযান; বিবেকানন্দ*। কবিতার মতোই তাঁর গদ্যের হাতটিও ছিল অসাধারণ। মাত্র ষাট বছর বয়সেই ক্যাপারে আক্রান্ত হয়ে গত ২৩ জুলাই ২০০৫ তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন, তাঁর বন্ধুবান্ধব, গুণগ্রাহী প্রিয় পাঠকদের অপ্রস্তুত করে দিয়ে। পেশায় শিক্ষিত, পরিচ্ছন্ন ফিটফাট, গভীরদর্শন কবি তাঁর *জিরাকের ভাষা* কাব্যগ্রন্থে লিখেছিলেন : 'কবিতা কবিতা শুধু কবিতা কবিতা নিয়ে বেঁছে থাকা বিশাল পাগলামী।' আমৃত্যু কবিতার কাছে সমর্পিত ভাস্কর তাঁর প্রস্থান সময় আসন্ন জেনেও কোনো আক্ষেপ করেন নি, কিন্তু অসহায়তার মধ্যে নিম্নস্বরে বলেছিলেন : 'চলে যেতে হয় বলে চলে যাচ্ছি, নাহলে তো, আরেকটু থাকতাম।' তিনি থাকতে পারলে, বাংলা কবিতা নিঃসন্দেহে আরো ঋদ্ধ হত।

একেবারেই আকস্মিক ভাবে ছিয়াশি বছর বয়সে গত ২০ অক্টোবর ২০০৫-এ প্রয়াত হয়েছেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিশিষ্ট অধ্যাপক, নাট্যতত্ত্ববিদ অজিতকুমার ঘোষ। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে ১ জানুয়ারি নোয়াখালির শায়েস্তানগরে তাঁর জন্ম। ১৯৪০-এ বাংলায় এম.এ. পাশ করে যশোহর মাইকেল মধুসূদন কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেছিলেন। বছর সাতেক পরে কলকাতার সুরেন্দ্রনাথ কলেজে যোগ দিয়ে সেখানে ষোলো বছর অধ্যাপনা করে ১৯৬৩-র সেপ্টেম্বর থেকে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় কুড়ি বছর একটানা যুক্ত ছিলেন। সে প্রতিষ্ঠানে বিদ্যাসাগর প্রফেসর পদে কাজ করা ছাড়াও দীর্ঘদিন কলা অনুষদের অধ্যক্ষতা করেছেন। অধ্যাপক হিসেবে তাঁর দক্ষতা ও সুনাম সত্ত্বেও নাট্যসমালোচনা কিংবা নাট্যতত্ত্ব বিষয়ে তাঁর পাণ্ডিত্য সর্বজন বিদিত। *বাংলা নাটকের ইতিহাস; নাটকের কথা; নাট্যতত্ত্ব ও নাট্যমঞ্চ; রঙ্গমঞ্চে বাংলা নাটকের প্রয়োগ; নাটক ও নাট্যকার* প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁকে প্রভূত খ্যাতির অধিকারী করেছিল। *বঙ্গ সাহিত্যে হাস্যরসের ধারা* শীর্ষক গবেষণা গ্রন্থের প্রাথমিক রূপ উপস্থাপন করে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি এইচ ডি এবং পরবর্তীকালে শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য বিষয়ে গবেষণা করে ডি লিট উপাধি পান যেটি পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। *জীবন শিল্পী শরৎচন্দ্র* তাঁর আর একটি উল্লেখ্য গ্রন্থ। *নাট্যকর শচীন সেনগুপ্ত, নাট্যকার মম্বথ রায়* দুটি জীবনীগ্রন্থ যথাক্রমে নাট্য আকাদেমি ও বাংলা আকাদেমির অনুরোধে তিনি লিখেছিলেন। এই দুটি প্রতিষ্ঠানের সদস্য হিসেবেও তিনি আজীবন যুক্ত ছিলেন। এছাড়াও সাহিত্য অকাদেমির *এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইণ্ডিয়ান লিটারেচার* গ্রন্থে তিনি বাংলা বিভাগের সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছিলেন। আলোচ্য প্রতিষ্ঠানের আঞ্চলিক কমিটিরও সদস্য ছিলেন। *প্রাচী* নামে একটি ইংরেজি পত্রিকার বাংলা বিভাগের সম্পাদনা করতেন। দীনবন্ধু মিত্র ও দ্বিজেন্দ্রলালের উপর তাঁর স্বতন্ত্র দুটি গ্রন্থও প্রকাশ করেছিলেন সাহিত্য অকাদেমির মেকার্স অব ইণ্ডিয়ান লিটারেচার প্রকল্পে।

পাঠক এবং সদস্য হিসেবে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সঙ্গে তাঁর সংযোগ দীর্ঘকালের। বঙ্গাব্দ ১৩৯৫ ফাল্গুন থেকে ১৩৯৮ বৈশাখ পর্যন্ত তিনি ছিলেন পরিষদের সভাপতি। ২৫ শ্রাবণ ১৪০৮ (২০০১ ১০ আগষ্ট) তাঁর অশীতি উত্তীর্ণ বয়সে আরো কয়েকজন প্রাক্তন সভাপতির সঙ্গে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ তাঁকে সংবর্ধনা জ্ঞাপক করেছিল। তিনি তাঁর স্মৃতিকথা *জীবনের ধন কিছুই যায় না ফেলা* গ্রন্থে এই ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন অভিভূত হয়ে। তাঁর জাপান ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি একটি প্রাঞ্জল ও সুখপাঠ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন *সূর্যোদয়ের দেশে*। বহু পুরস্কার ও সম্মান তিনি লাভ করেছেন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও বিশ্বজ্ঞান সমাজ থেকে। ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলা একাডেমিও তাঁকে সংবর্ধিত করেছিল। ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরোজিনী বসু স্বর্ণপদক লাভ করেন শ্রেষ্ঠ গবেষক রূপে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নাট্য একাডেমি ১৯৯৯ সালের জন্য মনোনীত করে ২০০১ এর ২৬ জুন তাঁকে দীনবন্ধু পুরস্কার অর্পণ করেন।

অজিতকুমারের অগণিত ছাত্রছাত্রীদের পংক্তিভুক্ত হওয়ার সুযোগ বর্তমান অধ্যক্ষের কাছেও সুখস্মৃতি, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বাংলা শ্রেণিকক্ষে তাঁর উদাত্তকণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ গিরিশচন্দ্র কিংবা মন্মথ রায়ের নাটক বিষয়ে নাট্যকীয় পাঠদান অত্যন্ত উপভোগ্য হয়ে উঠত। বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যাভিনয়ের উদ্যোগে তিনি অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে অংশ গ্রহণ করতেন। মনে পড়ছে, শীতের সন্ধ্যাগুলি কী মনোরম দৃশ্য হয়ে উঠত যখন প্যান্ট-শার্ট পরিহিত তিনি একদিকে, আর অন্যদিকে তাঁর অগ্রজতুল্য সাধন ভট্টাচার্য টিলে হাতা সার্জের পাঞ্জাবি আর ভুলুষ্ঠিত ধূতি পরে উপাসনা মন্দিরের ব্যাটমিস্টন কোর্টে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হতেন। নাট্যবিষয়ে গবেষণা ছাড়াও তাঁর আর একটি বিষয়ে অত্যন্ত ভালোলাগা ছিল—সেটি 'হল বাংলার যাত্রা গান। মাঝে মাঝে সে-বিষয়ে মত বিনিময় করতেন নিজের কৌতূহল নিয়ে, মনে পড়ছে একবার আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রে এক আলাপচারিতায় তাঁর মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ হয়েছিল। তাঁকে শেষ বয়স পর্যন্ত কাজ করতে দেখে মনে হত কী অফুরন্ত প্রাণশক্তির অধিকারী ছিলেন, তাঁর প্রমাণে সত্যি একটা যুগের অবসান হল।

বিগত কয়েকটি সংখ্যায় অর্থনৈতিক সংকট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমরা বিজ্ঞাপন সংগ্রহের কথা বলেছি বার কয়েক, এই সংখ্যায় সেই অভিযানের অংশত সাফল্য আমাদের আশাষিত করেছে। আশাকরি চলতি বছরে এই সাফল্য বিস্তৃতি পাবে প্রকাশিতব্য পরবর্তী দুটি সংখ্যায়। বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই।

লেখক পরিচিতি

অনীতা বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৬৩-) সংস্কৃত কলেজে ভাষাতত্ত্ব বিভাগের লেকচারার। তাঁর প্রথম বই *ফার্স্ট বেঙ্গলি গ্রামার : এ কমপ্যারাটিভ এনালিসিস* ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে বাংলা ভাষা ও মাগধী প্রাকৃত ভাষা নিয়ে গবেষণা করছেন।

অমিতাভ মুখোপাধ্যায় (১৯৩৪-) অনেকদিন থেকে অভিধান সংকলনের কাজ করছেন। সম্প্রতি এ টি দেবের *শব্দবোধ অভিধান* সংস্কার ও সম্পাদনার কাজ শেষ করেছেন, শীঘ্রই সেটি নব কলেবরে প্রকাশিত হবে।

অমিয়কুমার সামন্ত (১৯৩৮-) পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন ডি. জি., বর্তমানে ইউনিভার্সিটি অব জুরিডিক্যাল সায়েন্সেস-এ পড়াচ্ছেন। অনেক গুলি গ্রন্থের মধ্যে *লেফট এজক্ট্রিমিস্ট মুভমেন্ট ইন ওয়েস্টবেঙ্গল ; ছ খণ্ডে টেরোরিজম ইন বেঙ্গল ; গোখাল্যাণ্ড মুভমেন্ট খুব উল্লেখযোগ্য কাজ।* বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে *বিদ্যাসাগর ; উপনিবেশিক সমাজে বিদ্যাসাগরের অবস্থান।* আই সি এস এস আর-এর সিনিয়র ফেলো হিসাবে সম্প্রতি বিদ্যাসাগর বিষয়ে একটি গবেষণা কাজ শেষ করেছেন।

অশোককুমার রায় (১৯৪০-) মন্মথনাথ ঘোষ ইনস্টিটিউট অব নাইনটিন্থ এণ্ড টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি স্টাডিজ এর প্রতিষ্ঠাতা। গ্রন্থপঞ্জি এবং পত্রপত্রিকার সূচি সংকলনে তিনি বিশেষ আগ্রহী। তাঁর সম্পাদনায় *নৃপেন্দ্রনাথ রচনা সম্ভার* প্রকাশিত হয়েছে ১৯৯৫-এ।

আশীষ লাহিড়ী (১৯৪৮-) কলকাতা স্কুল অব হিস্ট্রি অব সায়েন্স-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট। আনন্দ পুরস্কার প্রাপ্ত *এগ্রিম্যাপ ডিক্সনারী : ইংলিশ-বেঙ্গলি* অন্যতম সম্পাদক। তাঁর লেখা অনেকগুলি গ্রন্থের মধ্যে *অন্য কোনো সাধনার ফল ; বিজ্ঞানীর ঈশ্বর ও অন্যান্য বিতর্ক* বিশেষ উল্লেখ্য। এখন অক্ষয়কুমার দত্তের বিজ্ঞান-দর্শন বিষয়ে কাজ করছেন।

নীলাদ্রিশেখর দাশ (১৯৬৭-) ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের সঙ্গে যুক্ত, ভাষা বিজ্ঞানী। তাঁর লেখা ভাষা প্রযুক্তি বিষয়ক কয়েকটি রচনা পাঠক মহলে প্রশংসিত হয়েছে। নতুন বই *ভাষাংশ সংগ্রহ ও আধুনিক ভাষা বিজ্ঞান* গ্রন্থের মূদ্রণের কাজ চলছে।

বীতশোক ভট্টাচার্য (১৯৫১-) কবি ও প্রাবন্ধিক, মেদিনীপুর কলেজে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে অধ্যাপনা করছেন। সাহিত্য-শিল্প-চলচ্চিত্র বিষয়ে অনেকগুলি গ্রন্থের প্রণেতা। *গদ্য সংগ্রহ* ১ ছাড়া তাঁর অন্যান্য প্রবন্ধ গ্রন্থ : *কবিতার অ আ ক খ ; জীবনানন্দ ; কথা জিজ্ঞাসা ; কবিতার ভাষা কবিতায় ভাষা। পূর্বাপর* নামে একটি প্রবন্ধের বই শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য (১৯৪৭-) কলকাতার আনন্দমোহন কলেজের ইংরেজি বিভাগের রিডার।
গত বছর পুস্তক মেলায় প্রকাশিত হয়েছে *বাপ্পালির নতুন আত্মপরিচয়*।

রুশভী সেন (১৯৫৯-) কলকাতার বাসন্তীদেবী কলেজে অর্থনীতির অধ্যাপক। *বিভূতিভূষণ :
দ্বন্দ্বের ক্রিয়াস ;সত্যজিৎ‌এর বিভূতিভূষণছাড়া পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বিভূতিভূষণ
বন্দ্যোপাধ্যায় পাঠক মহলে সমাদৃত হয়েছে। অন্য গ্রন্থ : সমকালের গল্প উপন্যাস :
প্রত্যাহানের ভাষা ;প্রচ্ছন্নের আখ্যান। কল্যাণী দত্তের খাড়াবাড়ি থোড সম্পাদনা করেছেন।
সাহিত্য অকাদেমির মেকার্স অব ইণ্ডিয়ান লিটারেচার প্রকল্পে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের
জীবনী লিখেছেন এখন।*

সুরজিৎ দাশগুপ্ত (১৯৩৪-) সাহিত্য অকাদেমির মেকার্স অব ইণ্ডিয়ান লিটারেচার প্রকল্পের
অধীনে তিনি অন্নদাশঙ্কর রায়ের জীবনী লিখেছেন। সম্প্রতি তাঁর প্রবন্ধের বই *বিশ
শতকীয় পাশ্চাত্য মন ও সৃষ্টি* প্রকাশিত হয়েছে। *অন্নদাশঙ্কর রায় ও তাঁর মানবিকতা ;
বাংলা ছোটো গল্পের সূচনা ও প্রেমেন্দ্র মিত্র শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। রবীন্দ্রনাথ ও বাংলায়
রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িকতার বিষয়ে একটি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করছেন।*

সোনালী চক্রবর্তী বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৬০-) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক।
পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করছেন। এখন তাঁর গবেষণার বিষয় ভারতের
শ্রমিক আন্দোলন।

3

ସମ୍ପାଦକ

କଲ୍ୟାଣ

ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ

ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ ୧୯୫୫ । ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ

ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ ୧୯୫୫ । ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ

ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ ୧୯୫୫ । ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ

ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ ୧୯୫୫ । ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ

ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ ୧୯୫୫ । ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ

ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ ୧୯୫୫ । ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ

ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ ୧୯୫୫ । ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ

ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ ୧୯୫୫ । ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ

ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ ୧୯୫୫ । ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ

ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ ୧୯୫୫ । ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ

ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ ୧୯୫୫ । ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ

রাখী

৬

এই ভরা যৌবনের ডালি
তোমার পায়ে রাখার আগে
হঠাৎ যদি মরণ এসে
একটি মুঠি ভিক্ষা মাগে
একটি মুঠি আয়ু আমার
পাত্রে তাহার দিব ঢালি'
তোমার তরে রইবে তোলা
এই ভরা যৌবনের ডালি।

কবিতা মঞ্জু

এই ভরা যৌবনের ডালি
মরণে এর কয় কতটুকু ?
এক জনমের তেইশটি ফুল
নাই থাকে তো নাই বা থাকুক।
দিনে দিনে যা ভরেছি
একটি দিনে হবে খালি ?

X

জন্ম জন্মান্তরের ফুলে
ভরা এ যৌবনের ডালি।
দিনে দিনে যা পেয়েছি
যা ছিল মোর পাবার আশা
যা পেয়ে মোর মিটল না সাধ
—শতকবারের ভালোবাসা—

নানা জন্মে নানা

"নানা যুগের"

হলে ছান্দে,

সময় প্রায়

সম্পূর্ণ।

স্বাস্থ্য

হঠাৎ যদি আজকে মরি
মেথ'বে সবই রেখে গেছি
কালের কোলে গেছি রেখে দেব
(দিনে দিনে) যা পেয়েছি। *এক মেয়েটি।*

*স্বপ্নের পথে
মিলে গলে পুত্র
স্বপ্ন মিলে গলে গলে*

দিনে দিনে যা পেয়েছি-
হোক না নিমেষের মাগুয়া *২২/৫/০০ ০৭১৩*
যা ছিল মোর পাবার আশা
হোক না যুগান্তের চাওয়া
মরার সাথে মরার তো নয়
যা পেয়েছি যা হুয়েছি
আস্থার সাথে যাবার তো নয়
যা চেয়েছি যা পেয়েছি। *মুদ্রা*

আমার ধনের নাই তুলনা
চক্ষে আমার স্বপ্ন-মণি
যা হেরি তা স্বপ্ন হেরি
কালোর কোলে আলোর খনি।
কুৎসিতে পাই রূপের দিশা
হাটের ধুলায় কুড়াই সোনা
দিনের আলোয় স্বপ্ন হেরি
আমার ধনের নাই তুলনা।

স্বামী

আমায় আমি বাইরে খুঁজি'
বাহিরকে হায দেখু'ছ না রে
দূরে দূরেই রাখু'ছ তাকে ।
বিচিত্র তার চোখের চাওয়া
কেশের গন্ধ শাড়ীর হাওয়া
বিচিত্র তার পরশ বুঝি
বাহিরকে হায দেখু'ছ না রে
দূরে দূরেই রাখু'ছ তাকে ।
আমায় আমি বাইরে খুঁজি'
নাই চিনিলাম বিচিত্রারে ।

১৭.৩

বাহিরকে ভাই লবো যেচে
নাই হলো বা মনের মতো
নয় কি মনোহর সে কত !
এবার আমি রইলু আশে
আপন মানুষ কখন আসে
মন যে এত মরছে বেছে
মন কি আমার মনের মতো ?
নয় কি মনোহর সে কত !
বাহিরকে ভাই লবো যেচে
বইব না রে আশ্রয়ত ।

"স্বামী মনোহর"
কিন্তু স্বামী
কতক স্বামী
হয় না।

Is it not
how beautiful —
your heart —

ভাষী

হে শোভনে আমি সাধিব না
 নাহি যদি পাই কাঁদিব না ।
 তুমি চকলা তুমি পাখী
 সাধ যায় বুকে বেঁধে রাখি ।
 বাঁধিবার তরে কী বেদনা
 সকল অর্ঘ্য নিবেদনা ।
 তবু রাখিব না মিছে আশা
 পাখীরে বাঁধিতে নারে বাসা ।
 বাঁধিবার তরে সাধিব না
 বাধা নাহি পড়ে কাঁদিব না ।

উড়িতে উড়িতে পাশাপাশি
 নিমেষের ভালোবাসাবাসি ।

কী অমৃতময়ী

বুকে ভরি' লহু বাহা পারি
 কী যে অমৃত তুমি নারি !
 পলেক চাহনি তিল হাসি
 বুকে বাজাইল স্বপ্ন বাঁধি !

নহি

কখনো

দুই মাস নয়

একটি ৩৫

উদ্ভব

এর বেশী পাওয়া অতি পাওয়া

নাহি যদি পাই নাহি ধাওয়া ।

অমৃত নয় ।

আকাশে আকাশে পাশাপাশি
 এই চের ভালোবাসাবাসি ।

পত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(অমদাশঙ্কর রায়কে লিখিত)

পত্র : এক

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

এইমাত্র তোমার রাখী পড়লুম। বিশেষ ভালো লাগল। এর ভাষায় রূপ আছে, ভাবে রস আছে, সব সুদ্ব জড়িয়ে একটি বিশিষ্টতা দেখা গেল। ইতিপূর্বে তোমার গদ্য প্রবন্ধ পড়ে আনন্দ পেয়েছি। তোমার কবিতার মধ্যে সহজ নৈপুণ্য ও আবেগের নিবিড়তা এবং ছন্দের গতিলীলা দেখে তোমাকে সাধুবাদ দিচ্ছি।

ইতি ২ জানুয়ারি ১৯৩০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্র : এক

ওঁ

[SANTINIKETAN
BENGAL]

কল্যাণীয়েষু

কাল দৈবাৎ আমার হাতে একটু সময় ছিল তাই মনোযোগ করে তোমার “রাখী” আর একবার পড়লুম। দেখলুম তোমার যথার্থই শক্তি আছে কিন্তু এখনো দ্বিধা ঘোচেনি। কতকগুলি কবিতা সম্পূর্ণ ভালো, আবার কতকগুলি যেন পিছিয়ে পড়েছে। এই বইয়ে সাধারণের কাছে তোমার প্রথম পরিচয়। এই জন্যে বিশেষ যত্নে বাছাই করে যদি কবিতাগুলি সাজাতে তাহলে ভালো হত। সামনে তুমি উপস্থিত থাকলে মোকাবিলায় আলোচনা করতে পারতুম। তোমার বইখানিতে স্থানে স্থানে হস্তক্ষেপ করেছি—এর থেকে বুঝতে পারবে আমার মতে কোথায় কোথায় কি আকারের ত্রুটি। অবশ্য আমার মত তোমার মতের সঙ্গে যে মিলবেই এমন কোনো কথা নেই—এক্ষেত্রে তোমার মতেরই চরম অধিকার। ইতি ৩ জানুয়ারি ১৯৩০

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের দুটি চিঠি ও অন্নদাশঙ্কর রায়

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

অন্নদাশঙ্কর রায় বাংলা সাহিত্যে প্রথম প্রবেশ করেছিলেন টলস্টয়ের একটি গল্পের অনুবাদক রূপে। তখন তিনি বিদ্যালয়ের ছাত্র। কলেজ জীবনে তিনি ওড়িয়া কবি হিসেবে প্রথমে পরিচিতি লাভ করলেও পাশাপাশি বাংলাতেও কবিতা লেখা শুরু করেন। সনেট-এর গঠন ও রূপ বরাবরই তাঁর প্রিয়। সে সময় ‘কৃষ্ণ’ নামে তাঁর একটি দীর্ঘ কবিতা *প্রবাসী* পত্রিকাতে সম্পাদকের লেখা ‘বিবিধ প্রসঙ্গ’-র অব্যবহিত পরে পাতা জুড়ে প্রকাশিত হয়। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে অন্নদাশঙ্করের খ্যাতির সূচনা *বিচিত্রা* পত্রিকাতে ধারাবাহিক ভাবে *পথেপ্রবাসে* ভ্রমণকথা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে। তার পর যখন বারো বছর ধরে ‘যার যেথা দেশ’, ‘অজ্ঞাতবাস’, ‘কলঙ্কবতী’, ‘দুঃখমোচন’, ‘মর্তের স্বর্গ’ ও ‘অপসরণ’ নামে খণ্ডে খণ্ডে তাঁর বিশাল উপন্যাস *সত্যাসত্য* প্রকাশিত হয় তখন বাংলা সাহিত্যে আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তামূলক বিদ্যাগর্ভ ভাবপ্রধান ও মননশীল উপন্যাসের সম্পূর্ণ নতুন এক ধারার প্রবর্তক রূপে তিনি অভিনন্দিত হন। সেই উপন্যাস সম্পূর্ণ করে তিনি শুরু করেন বাংলা ছড়ার এক নতুন ব্যঞ্জনা উচ্চারণ— আপাত অর্থহীনতার গর্ভে গভীর অর্থময়তা বপন। তবে পরিমাণের দিক থেকে প্রবন্ধই তাঁর সাহিত্যের প্রধান অংশ এবং মানবসংস্কৃতির এমন দিক খুঁজে বের করা কঠিন যে-দিক নিয়ে তিনি প্রবন্ধ লেখেননি। তাঁর প্রতিভা, মনীষা ও ব্যক্তিত্বের বৈচিত্র্য স্বতই মনে করিয়ে দেয় রবীন্দ্রনাথের কথা।

অন্নদাশঙ্কর বাল্যকাল থেকেই রবীন্দ্রভাবনায় উদ্ভুদ্ধ। পাটনায় স্নাতকস্তরে অধ্যয়ন শুরু করেই ১৯২৪ সালে জানুয়ারি কি ফেব্রুয়ারিতে তিনি রবীন্দ্র-সন্দর্শনে যান শান্তিনিকেতনে। রবীন্দ্রনাথের প্রাতঃস্নানকালে পথের মধ্যে তাঁকে শিল্প সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন করেন। পাটনা থেকে আগত সেই উজ্জ্বল তরুণকে রবীন্দ্রনাথ আশ্বাস দেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদেয় ভাষণে প্রশ্নটির উত্তর দেবেন। পরে ভাষণটি ‘সাহিত্য’ নামে প্রকাশিত হয় *বঙ্গবাণী* পত্রিকার ১৩৩১ বৈশাখ সংখ্যায়। প্রবন্ধটির সূচনাংশেই ছিল অন্নদাশঙ্করের প্রশ্নটি যার উত্তর বিস্তৃতভাবে দেন ভাষণে। তখন রবীন্দ্রনাথ জানতেন না প্রশ্নকর্তার নাম, তাই ভাষণে অন্নদাশঙ্করকে উল্লেখ করেন ‘একটু পশ্চিমের কোনো কলেজের ছাত্র’ বলে। প্রবন্ধটি যখন *সাহিত্যের পথে* গ্রন্থটির অন্তর্ভুক্ত করা হয় তখন ওই সূচনাংশ বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে যাওয়া হয় গ্রন্থের শেষে। সেই সাক্ষাৎকারের পরে অতিবাহিত হয় প্রায় ছ বছর।

১৯২৯-এর অক্টোবরে অন্নদাশঙ্কর আই সি এস হয়ে প্রথম কর্মস্থল বহরমপুরে অ্যাসিস্ট্যান্ট

ম্যাজিস্ট্রেটের পদে যোগ দেন। ডিসেম্বরে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *রাখী*। কিন্তু তাতে প্রথম প্রকাশের কাল, কবিতাগুলি রচনার স্থান, কাব্যগ্রন্থের মূল্য ইত্যাদি প্রাসঙ্গিক কোনও তথ্য ছিল না। সেই *রাখী*র এক কপি নিয়ে বড়দিনের ছুটিতে বন্ধু অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর সঙ্গে অন্নদাশঙ্কর চললেন শান্তিনিকেতনে। সেবারকার অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন ‘কবির সঙ্গে দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার’ প্রবন্ধে। তাব অংশবিশেষ তুলে দিই—‘কবিকে আমার সদ্যপ্রকাশিত কবিতার বই “রাখী” উপহার দিতেই বললেন, “আচ্ছা, তোমরা যদি এমন করে চুরি কর তা হলে আমি আমার বইয়ের জন্য নাম খুঁজে পাই কোথায়?” আমি বললুম, “বা। চুরি করলুম কবে। এ নাম তো আমারি আবিষ্কার।” তিনি হেসে বললেন, “কিন্তু ওটা আমারি কল্পনায় ছিল।” বইখানা নাড়াচাড়া করে কাছে রেখে দিলেন। কয়েকদিন পরে আমার কর্মস্থলে আমার বই আমার কাছে ফিরে আসে। খুলে দেখি রবীন্দ্রনাথের সুন্দর হাতের লেখায় সংশোধন। একখানি চিঠিও ছিল। “রাখী” প্রসঙ্গে।’

এখানে অন্নদাশঙ্কর যে-চিঠিটির উল্লেখ করেছেন সেটি মনে হয় *রাখী*র সঙ্গে পাঠানো চিঠি। সেটিও জানুয়ারিতে লেখা। তার আগের দিনে, ২ জানুয়ারি ১৯৩০ তারিখে, আরও একটি চিঠি রবীন্দ্রনাথ পাঠিয়েছিলেন *রাখী* বইটি পড়ার প্রথম প্রতিক্রিয়ায়। অর্থাৎ *রাখী* কাব্যগ্রন্থখানি পড়ে রবীন্দ্রনাথ মোট দুখানি চিঠি অন্নদাশঙ্করকে লিখেছিলেন। প্রথম চিঠিটি পাওয়ার দু-এক দিন পরেই অন্নদাশঙ্করের হাতে পৌঁছিল একটা প্যাকেট, তাতে আর একখানি চিঠি, সঙ্গে শান্তিনিকেতনে হাতে হাতে উপহার দিয়ে আসা *রাখী* বইখানি।

তখন অন্নদাশঙ্কর *রাখী*র পাতা উলটে উলটে দেখেন যে বহু কবিতারই মার্জিনে মার্জিনে রবীন্দ্রনাথ নানা রকম পরামর্শ বা সুপারিশ এবং কোনও কোনও স্থলে নিজের বস্তু বা মন্তব্য লিখে দিয়েছেন। রবীন্দ্রানুসারী কবিদের পরে অন্নদাশঙ্কর অমিয় চক্রবর্তী সুধীন্দ্রনাথ প্রেমেন্দ্র মিত্র অচিন্ত্যকুমার বুদ্ধদেব বিষ্ণু দে প্রমুখ আরও নতুন প্রজন্মের কবি। রবীন্দ্রনাথের মতো বিশ্ববিখ্যাত কবির পক্ষে এই নতুন প্রজন্মের কোনও কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থের এরকম অভিনিবেশের সঙ্গে পাঠ করে সংশোধন করার ঘটনা জানা যায় না। সুধীন্দ্রনাথ ও অমিয় চক্রবর্তী ছিলেন রবীন্দ্রনাথের বিশেষ ঘনিষ্ঠ এবং সুধীন্দ্রনাথের ‘কুকুট’ কবিতাটি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ প্রবাসীতে প্রকাশার্থে পাঠিয়েছিলেন। অনেক স্বতন্ত্রতা-সম্পন্ন আধুনিক কবিই তাঁদের প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হলে রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়ে দিয়ে অথবা হাতে হাতে দিয়ে তাঁর মতামত যাচাই করতেন এবং রবীন্দ্রনাথও তাঁদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করতেন সন্নেহে ও সানন্দে। এটাই ছিল দম্ভর। কিন্তু অন্নদাশঙ্করের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা গড়াল অনেক দূর পর্যন্ত। ‘বিশেষ ভালো লাগল’ বলেই রবীন্দ্রনাথ ছেড়ে দেননি। কোথায় কী পরিমার্জনা কী সংস্কার করলে কবিতাগুলি আরও উন্নত আরও পরিণত হবে তার জন্য নিজের বিচার-বিশ্লেষণ কাব্যগ্রন্থখানির নানা পাতায় করে দেখিয়েছেন।

১৯২৯-এর সেই সংস্করণের উপর রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ মতামত মেনে নিয়ে ১৯৩০-এই অন্নদাশঙ্কর *রাখী*র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন। সাতাম বছর পরে শ্রীধীমান দাশগুপ্তর সম্পাদনায় যখন *অন্নদাশঙ্কর রায়ের রচনাবলী* দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় তখন তাতে *রাখী*র সেই দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠই গ্রহণ করা হয়। রবীন্দ্রনাথ যে-কাব্যগ্রন্থের বিষয়ে বিপুল আগ্রহ বোধ করে যথেষ্ট সময় ব্যয় করেছিলেন সেটি সম্বন্ধে যদি এখনকার পাঠকপাঠিকাকে

কৌতূহল মেটাতে হয় তা হলে তাঁদের এই রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্গত রাখী-ই পড়তে হবে। কিন্তু এই রচনাবলীভূক্ত রাখী পড়ে জানা যাবে না যে প্রথম সংস্করণের রাখীতে ছিল মোট ৩৩টি কবিতা, সেগুলি ছিল সংখ্যাচিহ্নিত ও শিরোনামহীন এবং দ্বিতীয় সংস্করণে ছিল নামযুক্ত ১৯টি কবিতা। কিন্তু রচনাবলীভূক্ত 'বিলম্বিতা' শীর্ষক কবিতাটির চতুর্থ স্তবক থেকে দুটি পঙ্ক্তি ও পুরো ষষ্ঠ স্তবকটি কেন বর্জিত হল, কার হস্তক্ষেপে অথবা অমনোযোগিতায়, তা বোঝা যায় না, এ ব্যাপারে সম্পাদকও ব্যাখ্যাহীন। রবীন্দ্রনাথ এই কবিতাটির একটি অন্ত্যমিল পরিবর্তনের ও তিনটি বানান সংশোধনের পরামর্শ দেন। অন্নদাশঙ্কর দিয়েছিলেন 'ফিরিল'র সঙ্গে 'মরিল'র মিল, রবীন্দ্রনাথ 'ফিরিল'র বদলে 'সরিল'-র মিল চাইলেন। অন্নদাশঙ্কর মেনে নেন রবীন্দ্রনাথের চাওয়াকে।

আবার 'মিলনের গান' কবিতাটি আদি সংস্করণে ছিল ২ সংখ্যক কবিতা আর তার অন্তিম স্তবকের দুটি চরণ ছিল এই রকম—'পারিনি আপন কুঁড়িটিরে ফুটাইতে/পরাভব শোক নিশসিছে মোর চিতে'। এখানে রবীন্দ্রনাথ 'নিশসিছে'র বদলে চেয়েছিলেন 'নিঃশ্বসে', কিন্তু অন্যত্র তিনি ক্রিয়াপদের মিল সম্বন্ধে সতর্ক হতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। হয়তো সে পরামর্শ স্মরণ করে 'ফুটাইতে'-র সঙ্গে 'মোর চিতে'-র কাঁচা মিল এড়াতে অন্নদাশঙ্কর দুটি সম্পূর্ণ নতুন চরণ লেখেন, 'জীবনের হুকে নিযতি চালায় পাশা/পণে হারিলাম রাজকন্যার আশা।'

রবীন্দ্রনাথ কত অভিনিবেশের সঙ্গে উত্তরসূরির কাব্যগ্রন্থটি পড়েছিলেন তার আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিই। অন্নদাশঙ্কর পরে যার নাম দেন 'বিমুক্ত' সেই ৫ সংখ্যক কবিতাটির দ্বিতীয় স্তবকের প্রথম পঙ্ক্তিটি ছাপা হয়েছিল, 'মানুষ সে যে কী সে কী সুন্দর'—স্পষ্টতই মুদ্রণকালে এখানে একটা ছাড় পড়ে—সেটা পূরে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ করলেন, 'মানুষ সে যে কী সুন্দর সে কী সুন্দর'। এই কবিতারই তৃতীয় স্তবকের অন্তিম পঙ্ক্তিতে অন্নদাশঙ্কর প্রথমে লিখেছিলেন, 'মরণেও বুঝি হবে না ইহার অন্য'। এখানে রবীন্দ্রনাথ দুরকম প্রস্তাব দেন—একটি হল সংশয়-সূচক 'বুঝি'র জায়গায় 'কিছু', আর একটি হল 'বুঝি' শব্দটিকে রেখে বস্তুব্যকে প্রাঞ্জল করে 'মরণেও বুঝি এ ছাড়া না অন্য' এবং অন্নদাশঙ্কর কবিতাটির 'বিমুক্ত' নাম দেওয়ার সময় লেখেন 'মরণেও কিছু এ ছাড়া হবে না অন্য।'

৬ সংখ্যক কবিতার দ্বিতীয় স্তবকের চতুর্থ পঙ্ক্তিতে অন্নদাশঙ্কর প্রথমে লিখেছিলেন, 'জন্ম জন্মান্তরের ফুলে ভরা এ যৌবনের ডালি', এবং রবীন্দ্রনাথ এই 'জন্মজন্মান্তরের'-এর জায়গায় প্রস্তাব করলেন 'নানা জন্মের নানা', পরে তার নীচে মন্তব্য জুড়ালেন, '“নানা যুগের” হলে ছন্দের পক্ষে আরো ভালো হয়।' অবশ্য অন্নদাশঙ্কর 'অনাগতের তবে' কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথের পরামর্শ পুরোপুরি নেননি, পঙ্ক্তিটি একটু পালটে লেখেন, 'কোন জন্মান্তরের ফুলে' ইত্যাদি। এই কবিতাটির তৃতীয় স্তবকের তৃতীয় ও চতুর্থ পঙ্ক্তি দুটি প্রথমে ছিল 'হঠাৎ যদি আজকে মরি দেখবে সবই রেখে গেছি/কালের কোলে গেছি রেখে দিনে দিনে যা পেয়েছি।' চতুর্থ পঙ্ক্তির 'রেখে' শব্দটি রবীন্দ্রনাথের পছন্দ হয়নি, তিনি তার পাশে লিখলেন 'ফেলে' এবং 'দিনে দিনে' শব্দদুটিকে প্রথমে বন্ধনীর মধ্যে রেখে পঙ্ক্তির শেষে যোগ করলেন 'যা মেগেছি।' আর পাশের মার্জিনে মন্তব্য লিখলেন, 'ক্রিয়াপদের মিল হলে খুব খাঁটি মিল হওয়া চাই।' অন্নদাশঙ্কর সংশোধিত পাঠে লেখেন, 'কালের কোলে গেছি রেখে যা পেয়েছি যা মেগেছি।'

৭ সংখ্যক কবিতার প্রতি স্তবকের অন্তিম পঙ্ক্তিশুলি যথাক্রমে প্রথমে ছিল ‘আর তারা কি বা হবে’, ‘আন ফুল কি বা হবে’, ‘আন মণি কি বা হবে’, ‘আন দেশা কি বা হবে’ এবং ‘আন সুর কি বা হবে’। এই পঙ্ক্তিশুলি পাশে পাশে রবীন্দ্রনাথ লিখে দেন ‘অন্য তারায় কী আমার বলো হবে’, ‘অন্য ফুলেতে কী আমার বলো হবে’, ‘অন্য মাগিকে কী আমার বলো হবে’, ‘অন্য দেখায় কী আমার বলো হবে’ এবং ‘অন্য সুরেতে কী আমার বলো হবে’। অন্নদাশঙ্কর ‘অন্বেষণ’ কবিতাটিতে সবগুলি সংশোধনই পুরোপুরি গ্রহণ করেন।

৮ম সংখ্যক কবিতাতে রবীন্দ্রনাথ দুটি জায়গায় পরিমার্জনার প্রস্তাব করেন। প্রথম স্তবকের অন্তিম পঙ্ক্তিতে ‘খুব খোয়ালেম আয়ুর পুঁজি’-র বদলে ‘শেষ করে দিই আয়ুর পুঁজি’ আর চতুর্থ স্তবকের তৃতীয় পঙ্ক্তিতে ‘নয় কি মনোহর সে কত’-র জায়গায় ‘হায় রে মনোহর সে কত’। রবীন্দ্রনাথ এখানে পৃষ্ঠার নীচে যে-মন্তব্য করেন তা থেকে বোঝা যায় নবীন কবির রচনার উন্নতির জন্য কত গভীর ভাবে তিনি ভেবেছেন। পৃষ্ঠার নীচের বাঁ দিকে প্রথমে তিনি লেখেন, ‘“কত মনোহর কি নয়”—ঠিক বাংলা হয় না।’ সম্ভবত পরে নীচের ডান দিকে যোগ করেন, ‘Is it not how beautiful—যেমন হয় না।’ অন্নদাশঙ্কর কবিতাটির নাম ‘মনের মানুষ’ রেখে রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কথাই মেনে নেন।

৯ম সংখ্যক কবিতাটির নাম ‘রচনাবলী’তে হয়েছে ‘পাশাপাশি’। এটির দ্বিতীয় স্তবকের প্রথম পঙ্ক্তিতে যেখানে ছিল ‘তুমি পথে আর আমি পথে’ সেখানে পরের ‘পথে’র নীচে রেখা-চিহ্ন দিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ‘(রথে?)’। কাব্যগ্রন্থখানিতে নানা স্থানে মুদ্রণপ্রমাদ আছে দেখে রবীন্দ্রনাথ কি ভেবেছিলেন এখানেও মুদ্রণপ্রমাদ ঘটে থাকতে পারে? না, এখানে প্রমাদ ঘটেনি। ‘পাশাপাশি’তে ‘আমি পথে’-ই বহাল হয়েছে। অন্তিম স্তবকের তৃতীয় ও চতুর্থ পঙ্ক্তিতে প্রথমে ছিল ‘বুকে ভরি’ লনু যাহা পারি/কী যে অমৃত তুমি, নারি’। এখানে রবীন্দ্রনাথ লনু’-র বদলে ‘লই’ আর ‘কী যে অমৃত’-র স্থলে ‘কী অমৃতময়ী’ সুপারিশ করে ‘অমৃত’-কে চার মাত্রা ধরা সম্বন্ধে মন্তব্য করেন, ‘ঋ ফলা দুই মাত্রা নয় অর্থাৎ ওর উচ্চারণ অস্বিত নয়।’ অন্নদাশঙ্কর ‘পাশাপাশি’তে রবীন্দ্রনাথের মতামতের ধারা বুঝে নিয়ে লেখেন, ‘বুকে ভরে লই যাহা পারি/কী অমৃতময়ী তুমি নারী।’

১১ সংখ্যক কবিতার তৃতীয় স্তবকের চতুর্থ পঙ্ক্তিতে ছিল ‘টান্বে বিচ্ছেদ পানে’। এখানে রবীন্দ্রনাথ পরামর্শ দেন ‘ল’বে বিচ্ছেদ পানে’ করার জন্য এবং অন্নদাশঙ্কর ‘এখন আর তখন’ কবিতাটিতে ওই পরামর্শ শিরোধার্য করেন। ১৫ সংখ্যক কবিতার যেখানে যেখানে অন্নদাশঙ্কর ‘ঘনগুঢ়’ শব্দটি লিখেছিলেন সেখানে সেখানে ‘ঘনগুঢ়’-র নীচে রেখাচিহ্ন দিয়ে মার্জিনে ‘নিগুঢ়’ লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু ‘রচনাবলী’তে সন্নিবেশিত রাশীতে এই কবিতাটি নেই অর্থাৎ ১৯৩০-এ প্রকাশিত রাশীর দ্বিতীয় সংস্করণের বেলায় বর্জিত ১৪টি কবিতার এটি একটি।

মুদ্রিত দুটি চিঠি ও রাশীর পাতায় লেখা সংস্কার-প্রস্তাবগুলি থেকে বোঝা যায় যে যৌবনের মুগ্ধতা ও যন্ত্রণা, আশা ও হতাশা, আবেগ ও বিশ্বাসে বিশিষ্ট অন্নদাশঙ্করের কবিতাগুলি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের গভীর পক্ষপাত জন্মেছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও অন্নদাশঙ্করের মধ্যে পরবর্তীকালে চিঠিপত্রের আদানপ্রদান হয়নি। যদিও দুজনেই পত্রলেখক রূপেও ছিলেন বহুপ্রসূ। কর্মজীবনে অন্নদাশঙ্কর কয়েকবার সত্বীক রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়েছিলেন বটে, কিন্তু চিঠি

লেখেননি। তবে ১৯৩৭ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন রাজশাহী জেলার পতিসরে শেষবারের মতো জমিদারির প্রজ্ঞাপনের সঙ্গে দেখা করতে যান তখন রাজশাহীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অন্নদাশঙ্করের একটা টেলিগ্রাম পাঠান আত্রাইঘাট স্টেশনে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য। আবার ১৯৪১-এ তাঁর শেষ জন্মদিন উপলক্ষে রচিত কবিতাটিও তিনি বাঁকুড়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অন্নদাশঙ্করকেই পাঠিয়েছিলেন। তার প্রায় দু মাস পরেই তাঁর তিরোধান।

রাষ্ট্রীয় কবিতাগুলিতে রবীন্দ্রনাথ যেসব সংশোধন করেছিলেন সেগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখি বানানের আধুনিকীকরণ, ছন্দের খাতিরে শব্দের বিকৃতি বর্জন, ক্রিয়াপদের কাঁচা মিল বর্জন, 'আন তারা কি বা হবে'র মতো বাক্যের কাব্যিকতা বর্জন, 'নয় কি মনোহর সে কত'-র মতো বাক্যের কৃত্রিম বিন্যাস বর্জন, এমন কী ঋ-ফলাযুক্ত শব্দের উচ্চারণবিধি পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের পরামর্শগুলির বিজুতি। কবিতার বিষয় ও ভাবনার অপেক্ষা তিনি বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন অবয়ব, গঠন ও রূপের উপর। গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে উত্তরসূরির রচনা বিচার-ও-সংস্কার-সাধনে পরবর্তী প্রজন্মগুলির সম্মুখে উদযাটিত হয়েছে রবীন্দ্রব্যক্তিত্বের এক স্বল্পজ্ঞাত মাহাত্ম্য।

রবীন্দ্রনাথ ও অন্নদাশঙ্করের সম্পর্কও এক স্বল্পচর্চিত বিষয়। যদিও অন্নদাশঙ্কর ইংল্যান্ডে থাকাকালেই ছড়া লেখা শুরু করেন তবু রবীন্দ্রপ্রয়াণের পরে পরেই ছড়াকার রূপে অন্নদাশঙ্করের প্রবল আত্মপ্রকাশ। রবীন্দ্রনাথ শেষবার জমিদারিতে গেলে অন্নদাশঙ্কর তাঁর সঙ্গে আত্রাইঘাট স্টেশন থেকে নাটোর পর্যন্ত রেলপথ ট্রেনের একই কামরায় একান্তে ভ্রমণ করেন। সেই ভ্রমণের কালে অন্নদাশঙ্করকে ছড়া লেখার পরামর্শ দেন রবীন্দ্রনাথ। তখন অন্নদাশঙ্কর ব্যস্ত ছিলেন *সত্যসত্য* উপন্যাস লেখা নিয়ে। উপন্যাসটি লেখা সাক্ষ করে অন্নদাশঙ্কর সোৎসাহে আধুনিক ছড়া লেখা শুরু করেন ১৯৪২ থেকে। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ প্রকরণের প্রসঙ্গে যেসব সংকেত দিয়েছিলেন সেসবকে আত্মস্থ ও গ্রহণ করে অন্নদাশঙ্কর বাংলা ছড়ার এক নতুন আধুনিক রূপ নির্মাণ করেন। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, রবীন্দ্রনাথ কি রাষ্ট্রীয় কবিতাগুলির মধ্যে বাংলা ছড়ার নবজন্মের সম্ভাবনা অনুভব করেছিলেন?

ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-উপাসক সম্প্রদায় ও অক্ষয়কুমার দত্ত

আশীষ লাহিড়ী

১৮৪৩ থেকে ১৮৫৫—এই বারো বছর অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬) *তত্ত্ববোধিনী* সম্পাদক ছিলেন। এই বারোটি বছর বাঙালির মননচর্চার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখা উচিত। বিজ্ঞানের ইতিহাসের দিক থেকে তিনটি কারণে তাঁর এই কীর্তি বিশেষভাবে স্মরণীয় : এক, তিনি শিক্ষিত বাঙালির চিন্তাভাবনায় একটা আরোহবাদী যুক্তিশীলতার বাতাবরণ তৈরি করেন। দুই, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিজ্ঞান, উদ্ভিদবিদ্যা, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ে নিয়মিত ও প্রচুর লেখা লেখেন (পাঠ্যবই সমেত) এবং ওই ধরনের লেখার উপযোগী গদ্য-কাঠামো রচনা করেন। তিন, বেদের ও অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রের অভ্রান্ততাকে চ্যালেঞ্জ করেন। খুচরো খুচরো করে এ ধরনের কাজ আরো কেউ কেউ হয়তো করেছিলেন। কিন্তু একটা সুসংহত, কেন্দ্রীয় দার্শনিক তত্ত্বের পরিকাঠামোয়, চিন্তাধারার একটা ‘সিস্টেম’ হিসেবে একটা আধুনিক বিজ্ঞানদর্শনকে প্রক্ষেপ করার ব্যাপারে অক্ষয়কুমার পথপ্রদর্শক।

অথচ এই পর্বে তিনি স্বাধীন ছিলেন না, দেবেন্দ্রনাথের মালিকানা ও মতাদর্শের অধীন *তত্ত্ববোধিনী* তাঁর ভাবনাচিন্তার পূর্ণাঙ্গ বাহন ছিল না মোটেই। ফলে স্বন্দ্র বেধেই থাকত। অক্ষয়কুমার মানুষের ব্যক্তিত্বের আধ্যাত্মিক দিকগুলি সম্বন্ধে সচেতনভাবেই কম কথা বলতেন। সেগুলোকে রেখে দিতেন নেপথ্যে। মানুষের সঙ্গে ঐহিক বাহ্য জগতের সম্বন্ধ কী, সেটাই ছিল তাঁর মূল আলোচ্য। নিরাকার পরম সত্তা বলে কিছু একটা নিশ্চয়ই আছে, এটা তিনি তখন মানতেন, কিন্তু সেই পরম সত্তার সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ কী, তা নিয়ে বিশেষ ভাবিত ছিলেন না। মানুষের কাজ হল বস্তুজগতের নিয়মগুলোকে জানা, এবং সেই নিয়মগুলির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নিজের ব্যক্তিগত ও সামাজিক আচরণকে চালনা করা—এই ছিল তাঁর মত। দেবেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ঠিক এর বিপরীত। তিনি বাহ্য জগতের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নিয়ে ততটুকুই আগ্রহী ছিলেন, যতটুকু সেই পরম সত্তার উপাসনায় সহায়ক। দেবেন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত উক্তি তো সকলেরই জানা : ‘আমি কোথায়, আর তিনি কোথায়। আমি খুঁজিতেছি ঈশ্বরের সহিত আমার কি সম্বন্ধ ; আর তিনি খুঁজিতেছেন, বাহ্য বস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির কি সম্বন্ধ;—আকাশ পাতাল প্রভেদ।’

ফ্রান্সিস বেকন ও অক্ষয়কুমার দত্ত

এই স্বন্দ্রের মধ্যে দিয়ে চলতে চলতেই অক্ষয়কুমার নিজের ভাবনাচিন্তাগুলোকে ভাঙতে-গড়তে লাগলেন। খানিকটা স্পিনোজার ধরনে তিনি প্রকৃতি আর ঈশ্বরের ধারণাটি গড়ে

তোলেন : ঈশ্বর মানে হল, প্রকৃতির নিয়মগুলির অলঙ্ঘনীয় পরম্পর-নির্ভরতা; কোনো একটি নিয়মও অকারণ নয়, বিচ্ছিন্ন নয়। প্রথম পর্যায়ে এই ধরনের একটা পূর্ণাঙ্গক সমগ্রতাবাদী ভাবনাতেই তাঁর বিশ্বাস ছিল। তাই তিনি বললেন, ঈশ্বরের পাঠ সবচেয়ে ভালোভাবে নেওয়া যায় এই ব্রহ্মাণ্ডকে জেনে, অর্থাৎ বিজ্ঞান চর্চা করে। তিনি একথাও বলেন যে ভারতীয় মনীষা যে বৈজ্ঞানিক ভাবনার ক্ষেত্রে প্রচণ্ড আশা জাগিয়েও শেষ পর্যন্ত ঈঙ্গিত প্রগতি ঘটাতে পারেনি, তার একটি বড়ো কারণ হল, এই বস্তুময় ব্রহ্মাণ্ডকে তন্ন তন্ন করে জানবার আগ্রহের অভাব। এই ব্রহ্মাণ্ড কোন কোন কারণে অবাস্তব তার যুক্তি সন্ধানই তাঁদের অনেক সময় নষ্ট হয়েছে। কী করলে এই জঘন্য মনুষ্যজন্ম থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় তার উপায় সন্ধানে তাঁরা অনেকে এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে কী করলে, বিদ্যাসাগরের কথায়, পৃথিবীটাকেই স্বর্গ করে ফেলা যায় তা নিয়ে ভাববার অবকাশ পান নি। ঠিক এই জায়গাতেই ফ্রাঙ্কলিন বেকনের (১৫৬১-১৬২৬) আরোহবাদী (ইন্ডাক্টিভিস্ট) পদ্ধতি ও অভিজ্ঞতাবাদী (এম্পিরিসিস্ট) দর্শন অক্ষয়কুমারের কাছে অপরিহার্য হয়ে উঠল। বেকনীয় পন্থার মূল কথাটি এই : বিজ্ঞানের কাজ হল নিয়ম প্রণয়ন করা; এর জন্য প্রতীত ঘটনাসমূহকে পর্যবেক্ষণের মারফত তার পূর্ণ বিবরণ জানতে হবে ; কোন কোন ক্ষেত্রে ঘটনাগুলি একে অপরের থেকে আলাদা তা জানতে হবে ; কোন কোন ক্ষেত্রে ঘটনাগুলি ঘটছে না, তা লক্ষ্য করতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় যা জানা যাবে তার সত্যমিথ্যা যাচাই করার জন্য অতঃপর পরীক্ষানিরীক্ষা করতে হবে। অভিজ্ঞতাবাদ ও আরোহবাদের সমন্বয়ে গঠিত এই পন্থাই, দেকার্তের (১৫৯৬-১৬৫০) গণিতের সহায়তায় ইউরোপে বিজ্ঞানের নবজন্ম ঘটায়। খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্ব-কবলিত মধ্যযুগ থেকে বেরিয়ে এসে বিজ্ঞান আধুনিক রূপ ধারণ করে ইউরোপে, ঘটে বৈজ্ঞানিক বিপ্লব।

এই প্রক্রিয়াটা ভারতবর্ষে সম্পূর্ণ হয়নি। হয়নি বলেই ভারতীয় বিজ্ঞানের অগ্রগতি দশম শতাব্দী থেকে কার্যত থেমে থাকে। বৌদ্ধ-বিরোধী, বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ-বিরোধী শঙ্করের মায়াদ্বাদী বেদান্ত জগৎকে মায়ী প্রমাণ করার পাশাপাশি হিন্দুধর্মকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দানে সমর্থ হল। গোতমের ন্যায়শাস্ত্রে আরোহপ্রণালীর কিছু পূর্বাভাস থাকলেও, প্রাতিষ্ঠানিক হিন্দু ধর্মতত্ত্বের প্রবল উদ্ভাপে পরে তা শুকিয়ে গেল। জড় কণিকা-বাদী বৈশেষিকের ভাষ্যকারেরা প্রাণপণে ঈশ্বরের সঙ্গে বৈশেষিক দর্শনের সম্বন্ধ রচনায় উদ্যোগী হয়ে ওঠেন। ১২০০ সালের পর থেকে নব্যন্যায় বলে যা গড়ে ওঠে তা বাস্তব অনুসন্ধানের পথ থেকে ভারতীয়, বিশেষ করে বাঙালি মনকে আরো বহু দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। গোপাল হালদারের ভাষায়, ‘সম্রাট আকবরের কাল পর্যন্তও ধরিলে মনে করিতে পারি, উহা [ভারত] এলিজাবেথের যুগ হইতে গৌরবে স্নান নয়। ...তবু এক শতাব্দী পার হইতেই দেখি—ভারতবর্ষ একেবারে স্নান। ইহার কারণ অবশ্য আছে। কিন্তু যে কারণটি সহজেই চোখে পড়ে তাহা বৈজ্ঞানিক ঔৎসুক্য। গ্যালিলিও-বেকন সে যুগের জন্মদাতা।” যে-প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে টাইকো, কেপলার, গ্যালিলিও, নিউটনের উদ্ভব হয়, তার কোনো চিহ্ন দেখা গেল না ভারতবর্ষে। কেন দেখা গেল না, তার অবশ্য নানা কারণ আছে, সেগুলি স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয়; এখানে কেবল ঘটনাটি উল্লেখ করেই ক্ষান্ত থাকছি।

ভারতীয় বিজ্ঞানচিন্তার অগ্রগতি এবং তার ধমকে-দাঁড়ানোর ব্যাপারটিকে সমরেন্দ্রনাথ সেন কয়েকটি ধাপে খুব সুন্দর করে বুঝিয়েছেন। ১) ‘বৈশেষিক-ন্যায় প্রদত্ত বলের প্রকারভেদ

ও ব্যাখ্যা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, বল গতিসৃষ্টির কারণ এই সত্য হিন্দুরা বেশ প্রাচীন কাল হইতেই উপলব্ধি করিয়াছিল। এমনকি গুরুত্বের কারণ যে পৃথিবীর আকর্ষণ এবং এই আকর্ষণের জন্যই ভারী বস্তু উপর হইতে নীচে পড়ে, এই আবিষ্কারও হিন্দুদের বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক। তবে ত্বরণের স্বরূপ কি, বল হইতে ত্বরণের উদ্ভব হয় কিনা, এ সম্বন্ধে হিন্দুদের কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল বলিয়া মনে হয় না।^১ ২) মোমেন্টাম বা ‘ভরবেগ সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট ধারণা নৈয়ায়িকদের ব্যবহৃত “বেগ” শব্দটির মধ্যে পাওয়া যায়।’ বেগ বলতে তাঁরা ‘গতিশীল বস্তুর এক বিশেষ সংস্কারকে’ বোঝাতেন : ‘বস্তু একবার গতিপ্রাপ্ত হইলে এই সংস্কারবশে ইহা গতিশীল অবস্থায় থাকিবার চেষ্টা করে।’ নিউটনীয় ভাষায়, ইনার্শিয়া। ৩) ‘উপর হইতে নীচে পড়িবার সময় বস্তুর গতি বিরূপ হইয়া থাকে ন্যায়-বৈশেষিকের সে আলোচনাও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।... গুরুত্ব ও সংস্কারের প্রভাবে বস্তুটি বেগবান থাকে, অর্থাৎ ইহার গতি এই দ্বিবিধ কারণের ফল।’ এতদূর এগোবার পর, তাঁরা কিন্তু একেবারে মূল প্রশ্নটি তোলবার দ্বারপ্রান্তে এসে থমকে গেলেন। ‘গুরুত্ব ও সংস্কারের সংযোগে বস্তুর গতি ক্রমশঃ ত্বরিত হয় কিনা, ...সম্ভবত এ প্রশ্ন তাঁহাদের মনে আদৌ জাগে নাই।’^২ অথচ ওই প্রশ্নটা মনে জাগল বলেই গ্যালিলিও সমস্যাটির সঠিক সমাধান করতে সক্ষম হন। এমন নয় যে তিনি খুব সহজেই সমাধানটা বার করে ফেললেন। ‘বস্তুত, গোড়াতে গ্যালিলিও ভুল বুঝেছিলেন; তিনি ধরে নিয়েছিলেন, বস্তুর গতি বাড়ে অতিক্রান্ত দূরত্বের সম অনুপাতে। পরে অবশ্য তিনি সঠিকভাবেই বুঝলেন যে, পতনশীল বস্তুর গতি বাড়ে কাল বা সময়ের অনুপাতে।’^৩

গ্যালিলিও-র মনে যে-প্রশ্ন জাগল, সে-প্রশ্ন ভারতীয় নৈয়ায়িকদের মনে জাগেনি কেন? সেন মহাশয়ের সিদ্ধান্ত : ‘গ্যালিলিও বস্তুর গতি সম্বন্ধে দীর্ঘকাল হাতে কলমে নানাবিধ পরীক্ষা করিয়া অতীব মূল্যবান সব তথ্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ভারতীয় নৈয়ায়িকরা এইরূপ পরীক্ষার ধার দিয়াও যান নাই, শুধু বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন ও স্বপ্নার দ্বারা যতদূর অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর তাহার চেষ্টা করিয়াছিলেন।’^৪ গ্যালিলিওর কাজের, বস্তুত আধুনিক বিজ্ঞানের, বৈশিষ্ট্য আরো প্রাঞ্জলভাবে বুঝিয়েছেন বার্নাল : ‘পরীক্ষায় কোনও অপ্রত্যাশিত ফল পাওয়া গেলে তাকে অস্বীকার করার বদলে তিনি বরং নিজের যুক্তিধারাটিকেই নতুন করে বিচার করতে বসতেন। পরীক্ষানির্ভর বিজ্ঞানের কুলচিহ্ন তো এইটাই—বাস্তব তথ্যকে মেনে নেওয়ার এই সর্বনয় মনোভাব।’^৫ অর্থাৎ বিজ্ঞান শুধু বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন নয়, শুধু স্বপ্নার ব্যাপার নয়; বিজ্ঞান নিরন্তর তত্ত্ব আর পরীক্ষার, ভাবনা আর প্রয়োগের দ্বন্দ্বিকতার মধ্যে দিয়ে এগোয়। ঠিক এই জায়গাটাতেই জোর দিয়েছিলেন বেকন। আর ঠিক এই জায়গাটাতেই জোর দিতে ভুলে গিয়েছিলেন ভারতীয় বিজ্ঞান-দার্শনিকরা। তাই অনেকদূর, যতদূর নিছক বুদ্ধি আর স্বপ্না দিয়ে এগোনো যায় ততদূর, এগিয়ে থেমে গিয়েছিল ভারতীয় বিজ্ঞান।

ন-শো বছর পর সেই প্রক্রিয়া জাগিয়ে তোলার আন্দোলনে নামলেন বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার—বিশেষ করে অক্ষয়কুমার। ভারতীয় বিজ্ঞানের ইতিহাসে এই ঘটনা স্মরণীয় বলে মনে করি।

বেকনের আড়াইশো বছর পরে জন্মানোর সুবাদে অক্ষয়কুমার কতকগুলো স্বাভাবিক সুবিধে পেয়ে গিয়েছিলেন। বেকনের প্রধান দুর্বলতা এই যে তিনি গণিত ভালো বুঝতেন না, কী করে গাণিতিক পদ্ধতিতে সামান্যীকরণ ঘটিয়ে তত্ত্ব উপনীত হতে হয়, সে বিষয়ে তাঁর

ধারণা অস্পষ্ট ছিল। অপর দিকে দেকার্ত ছিলেন গণিতের জাদুকর। বেকন আর দেকার্ত এই দুজনে মিলে আধুনিক বিজ্ঞানের পদ্ধতিতত্ত্ব গড়ে দেন। তারই মহত্তম পরিণতি দেখতে পাই নিউটনে। অক্ষয়কুমার যখন নিউটনীয় গতিবিজ্ঞান আয়ত্ত করার কাজে নামলেন, ততদিনে পরীক্ষানির্ভর পদার্থবিদ্যার সঙ্গে গণিত ওতপ্রোত হয়ে গেছে। কাজেই সবার আগে তাঁকে রপ্ত করতে হল উচ্চাঙ্গের গণিত—ক্যালকুলাস। তাই বেকনের চিন্তাধারার গণিতের অভাবজনিত যে-ত্রুটি, সেটা তাঁকে আর আলাদা করে অতিক্রম করতে হয়নি, তাঁর প্রশিক্ষণের প্রক্রিয়াতেই তিনি সেই দুর্বলতাকে আপনাই পার হয়ে গেলেন। তিনি বেকনের ইতিবাচক দিকটির দ্বারা কেবল প্রভাবিত হয়েছিলেন।

বেকনের আরো একটি ভাবনা অক্ষয়কুমারকে বিশেষ করে প্রভাবিত করেছিল। সেটি হল, বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষের জীবনযাত্রার সর্বঙ্গীণ উন্নতি। ‘মধ্যযুগীয় বিজ্ঞান থেকে আধুনিক বিজ্ঞানে উত্তরণের পথে বাক ফেরার সন্ধিলগ্নে’ বেকনের আবির্ভাব। আধুনিক বিজ্ঞানের ‘মূলগত ব্যবহারিক চরিত্রটির ওপর এবং বিভিন্ন ব্যবহারিক কৌশলের উন্নতিসাধনের কাজে এর প্রয়োগ ঘটানোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন’ তিনি, জোর দিয়েছিলেন ‘চারপাশের বাস্তব দুনিয়াকে সহজ কাণ্ডজ্ঞানের নিরিখে বুঝে নেওয়ার কাজে এই নতুন আন্দোলনের ভূমিকা ওপর।।’ মহেন্দ্রনাথ রায়-লিখিত জীবনী থেকে জানতে পারি, অক্ষয়কুমারের সংগ্রহে বাস্পশক্তি, বাষ্পীয় এনজিন, লীন তাপ, হাইড্রলিক্স, দহন, জ্বালানি প্রভৃতি বহুবিধ ফলিত বিজ্ঞানের বই ছিল। সেগুলো নিয়ে তিনি যে রীতিমতো চর্চা করতেন, তাঁর ব্যবহৃত ‘নোট-পুস্তকে’ তার প্রচুর প্রমাণ আছে। আধুনিক বিজ্ঞানের ‘মূলগত ব্যবহারিক চরিত্রটি’ যে তিনি বুঝে নিতে চাইছিলেন, তারই স্মারক এগুলো।

কিন্তু বিজ্ঞানের গুরুত্ব কি শুধুই ব্যবহারিক উপযোগিতার মধ্যে সীমাবদ্ধ? আদৌ তা নয়। স্বয়ং ফ্রান্সিস বেকন প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের শ্রেষ্ঠ পন্থা হিসেবে এই নতুন বিজ্ঞানের মহিমা কীর্তন করেছিলেন : ‘...সবার চাইতে বড়ো উপকারটি সাধন করবেন তিনিই যিনি নিছক একটা কাজের জিনিস আবিষ্কার না করে প্রকৃতিতে একটা আলো জ্বেলে দিতে পারবেন। সেই আলোর স্পর্শে আমাদের বর্তমান জ্ঞানের গভীর পরপারে স্থিত অন্ধকার এলাকাগুলি উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, অচিরেই বিশ্বের লুকোনো গোপন রহস্যগুলি আমাদের চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। যিনি এ কর্মটি সাধন করবেন তিনি মানবজাতির মঙ্গলবিধাতা রূপে কীর্তিত হবেন, পূজিত হবেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মানুষের সাম্রাজ্যবিস্তারকারী রূপে, মানবমুক্তির হোতা রূপে, জীবনযাপনের উপকরণসমূহের বিজ্ঞেতা বলে।’* বেকনের এই কথার প্রতিধ্বনি অক্ষয়কুমারের বহু রচনায় বহু বার শুনতে পাই আমরা। তিনি যখন বলেন, ব্রহ্মের চেয়ে ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধেই তাঁর আগ্রহ বেশি, তখন আসলে তিনি বেকনের পথেই হাঁটেন।

কিন্তু বেকনের কথা তো রামমোহনও বলেছিলেন। অক্ষয়কুমার কি নতুন কিছু বললেন?

‘বেকন পড়িয়া করে বেদের সিদ্ধান্ত’

রামমোহন ছিলেন একই সঙ্গে বৈদান্তিক একেশ্বরবাদী আর বেকনবাদী। অথচ, প্রথমটির মূল প্রেমিস হল, ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমরা যা অবগত হই তা মিথ্যা, মায়ী। সেই মায়ী অপসারণ করার নামই সাধনা। আর দ্বিতীয়টির প্রেমিস হল, ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সংগৃহীত উপাস্তকে

যথাযথ পদ্ধতিতে সাজিয়ে নিয়ে, বিশ্লেষণ করে, পরীক্ষার মাধ্যমে তাদের সত্যাসত্য যাচিয়ে নিয়ে, তবেই আমরা সত্য ধারণায় উপনীত হতে পারি। তফাৎটা একেবারে মৌলিক। এই মৌলিক তফাৎটা এদেশে প্রথম সবচেয়ে নির্ভুলভাবে উপলব্ধি করেন অক্ষয়কুমার—শুধু তাত্ত্বিক দিক থেকে নয়, হাতে কলমে বিজ্ঞান শিখে। তাই এদেশে অক্ষয়কুমারই বেকন-পন্থার প্রকৃত প্রবর্তক।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে সিদ্ধার্থ ঘোষ মন্তব্য করেছিলেন, ‘বেকনের দর্শনের প্রতি রামমোহনের ... আস্থা সত্ত্বেও অক্ষয়কুমার দত্তকেই আমরা বেকনের আদর্শের প্রথম বাঙালি প্রচারক বলতে পারি। তিনি ঘোষণা করেছিলেন, ভারতের এখন একজন বেকন প্রয়োজন। ...১৮৫৫ সালে অক্ষয়কুমারের সম্পাদকের চাকরিটি হারানোর পিছনেও রয়েছে বেকনীয় আসক্তি।’^{১৮} ১৮৫৫ সালে তিনি *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকার সম্পাদক পদ থেকে সরে আসেন। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব চরম মাত্রায় গিয়ে পৌঁছেছিল। ওই সময়েই তাঁর সেই বহু-আলোচিত ‘শিরঃপীড়া’ প্রবল হয়ে উঠে তাঁকে অশস্ত্র করে তোলে। বালির বাড়িতে চলে যান তিনি। সেই থেকে মোটের ওপর ‘একলা চলো’ নীতি অনুসরণ করেন। ঘটমান বর্তমানে মানসসাধী ছিলেন বিদ্যাসাগর, আর তাত্ত্বিক অতীতে পথপ্রদর্শক ছিলেন ফ্রান্সিস বেকন। বেকন প্রসঙ্গে তাঁর বিখ্যাত উক্তিটি এই :

[প্রাচীন ভারতের] দার্শনিক গ্রন্থকারেরা অনেকেই সতেজ বুদ্ধির সুপুষ্ট বীজ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যদি তত্ত্বানুসন্ধানের প্রকৃত পথাবলম্বন পূর্বক বিশুদ্ধ বিজ্ঞান-মার্গে বিচরণ করিতে পারিতেন, তবে বহুকাল পূর্বে ভারত ভূমিও ইয়ুরোপ-ভূমির ন্যায় এ অংশে ভূস্বর্গ-পদে অধিকৃত হইতেন, তাহার সন্দেহ নাই। তাঁহারা বিশ্বের যথার্থ প্রকৃতি ও সেই প্রকৃতিসিদ্ধ নিয়মাবলী নির্ধারণ পূর্বক কণ্ঠব্যাক্তব্য-নিরূপণের নিশ্চিত উপায় চেষ্টা না করিয়া কেবল আপনাদের অনুধ্যান-বলে দুই একটি প্রকৃত মতের সহিত অনেকগুলি মনঃকল্পিত মত উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের একটি পথ-প্রদর্শকের অভাব ছিল। একটি বেকন—একটি বেকন—একটি বেকন তাঁহাদের আবশ্যক হইয়াছিল।’

অক্ষয়কুমার খুব ভালোভাবেই জানতেন যে বেকন-চর্চার আবশ্যিকতার কথা বলে তিনি ভীমরুলের চাকে ঘা মেরেছেন। রাজনারায়ণ বসুকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন তিনি : ‘ঈশ্বর গুপ্ত আমার সম্বন্ধে একবার শ্রেষ্ট করিয়া লিখিয়াছিলেন “বেকন পড়িয়া করে বেদের সিদ্ধান্ত”।’

সিদ্ধার্থ আরেকটি প্রায়-অলক্ষিত সম্ভাবনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। সেটি হল, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের দৃষ্টিভঙ্গির পিছনে অক্ষয়কুমারের সম্ভাব্য প্রভাব। ‘রামমোহন থেকে শুধু অক্ষয়কুমার নয়, রাজেন্দ্রলাল পর্যন্ত একটি নিরবচ্ছিন্ন সম্পর্ক আছে। ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০ পর্যন্ত রাজেন্দ্রলাল *তত্ত্ববোধিনী*র প্রবন্ধ-নির্বাচনী সভার সদস্য রূপে অক্ষয়কুমারের সঙ্গে কাজ করেছেন। ঠিক তার পরেই, ১৮৫১-য় রাজেন্দ্রলাল বিবিধার্থ-সংগ্রহের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।’ রাজেন্দ্রলাল-সম্পাদিত *বিবিধার্থ-সংগ্রহ*-এর বেকনীয় আদর্শ সম্বন্ধে যদি-বা কোনো সন্দেহ থাকে, “চতুর্থ পর্বে প্রকাশিত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘জ্ঞানশিক্ষার বিষয়’ আমাদের সন্দেহ নিরসন করল। ইংরাজী উপ-শিরোনামা ছিল ‘Baconian System of Philosophy’.”^{১৯} বেকন-শিষ্য অক্ষয়কুমারের চিন্তাধারা হয়তো রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে সরাসরি প্রভাবিত করেছিল, সিদ্ধার্থ-প্রকল্পিত এই ভাবনাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র ছাড়াও আরো একজন প্রাচ্যস্মরণীয় বাঙালি বেকনের বিজ্ঞানদর্শনকে নিজের জীবনদর্শন বলে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। একদিকে বৈদান্তিক মায়বাদ ও অধঃপতিত সাংখ্যদর্শন, অন্যদিকে জর্জ বার্ক্লির ভাববাদী দর্শন, এই সবগুলির বিরুদ্ধে একযোগে লড়াই করেছিলেন তিনি। ১৮৫৩ সালে জে আর ব্যালান্টাইনের সঙ্গে তাঁর মহাবিতর্ক বাঙালির মননচর্চার ও বিজ্ঞানদর্শনচর্চার ইতিহাসে এক অমূল্য দলিল হয়ে রয়েছে। তবে বিদ্যাসাগর বেকনীয় অভিজ্ঞতাবাদী দর্শনের আলোকে বিচার করে সাংখ্য ও বৈদান্তিকে 'false systems of philosophy' বলে চিহ্নিত করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু কেন 'ফল্‌স' তার বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেন নি। তাঁর অত সময় ছিল না। সমাজ-সংস্কার, শিক্ষা-সংস্কার, পুস্তক রচনা, পরে মেট্রোপলিটান শিক্ষাকাণ্ড, নানাবিধ জনহিতকর কাজে তিনি ব্যবহারিক দিক থেকে এত ব্যস্ত থাকতেন যে প্রশান্ত মনে এই তাত্ত্বিক কাজ করবার অবসর তাঁর ছিল না। তা সত্ত্বেও, প্রাচীন ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে যেটুকু সমালোচনী মনোভাব তিনি দেখিয়েছিলেন তারই 'পাপে' এদেশের পণ্ডিতমহল আজও তাঁকে ক্ষমা করতে পারেন নি।

বিদ্যাসাগর মশাই যেকাজ অসমাপ্ত রেখেছিলেন, সেই কাজ নিয়েই সারা জীবন কাটান অসুস্থ অক্ষয়কুমার। সাংখ্য-বৈদান্ত কেন অর্থে 'ফল্‌স', আধুনিক আরোহী বিজ্ঞান ও দর্শনের প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করলে ভারতীয় দর্শন ও বিজ্ঞানের মূল্যায়ন কী হবে, তার বিস্তৃত টীকাভাষ্য রচনা করেন তিনি—অকুতোভয়ে, পরিণামের কথা না ভেবে। বিদ্যাসাগরের ওই অল্প কয়েকটি বিষয়সী উদ্ভিই (তাও ইংরেজি ভাষায়!) যদি হিন্দু বাঙালিদের কোমল প্রাণে অত আঘাত দিয়ে থাকে, তাহলে অক্ষয়কুমারের স্বদেশি ভাবার কামানগর্জন যে তাদের একেবারে ধরাশায়ী করে ফেলবে, তাতে আর আশ্চর্য কী।

বিদ্যাসাগর-অক্ষয়কুমার-রাজেন্দ্রলাল এই তিনজনকে একযোগে আধুনিক বাংলার বিজ্ঞানভাবনার প্রবর্তক-ত্রয়ী বলা যেতে পারে। তবে রাজেন্দ্রলাল মিত্র শেষ পর্যন্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক রক্ষণশীলতার পক্ষে চলে যাওয়ায়, তাঁর এই বিজ্ঞানমনস্কতা ঈঙ্গিত ফললাভে ব্যর্থ হয়। বিদ্যাসাগরও তীব্র অভিমানে ভদ্রলোক বাঙালিদের সংস্রব ত্যাগ করেন। অক্ষয়কুমার কিন্তু জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নিজের মতো করে লড়াই চালিয়ে গিয়েছিলেন।

ডারউইনবাদ ও অক্ষয়কুমার

তাঁর চিন্তাধারার বিকাশে কয়েকটি স্তর দেখতে পাই। প্রথম পর্যায়ে মূলত জর্জ কুশ-এর প্রভাবে তিনি মনে করছেন, প্রাকৃতিক নিয়মগুলিকে জানতে পারলে প্রগতি ঘটবে। সেই সব প্রাকৃতিক নিয়মাবলী সর্বব্যাপ্ত এবং সর্বশক্তিমান একজন ঈশ্বরের অস্তিত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, সেই ঈশ্বরই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিয়মশৃঙ্খলা বজায় রাখেন। দুই, ঈশ্বরই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিয়মশৃঙ্খলা বজায় রাখেন ঠিকই, কিন্তু বিশ্বপ্রকৃতির নিয়মকানুন আমাদের জানতে হবে এই ঐহিক বিশ্বপ্রকৃতিকে পর্যবেক্ষণ করেই। অর্থাৎ, জ্ঞান আহরণের কাজে শাস্ত্রচর্চা কিংবা ধর্মচর্চা গৌণ, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিই মুখ্য। যে-কারণে তত্ত্ববোধিনীর পাতার পর পাতা জুড়ে তিনি বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের বিবরণ ছাপতেন, সৌর ব্যবস্থার সাপেক্ষে পৃথিবীর অবস্থান নিয়ে প্রবন্ধ লিখতেন, দিন রাত্রি আর ঋতুগুলির নিয়মানুগতার প্রাকৃতিক কারণ ব্যাখ্যা করতেন। দেখাতে চাইতেন, প্রকৃতিতে কোনো কিছুই নিয়মহারা নয়। ওই নিয়মগুলিকে জানতে পারাই ঈশ্বরকে

জানা। স্পষ্টতই, ডীইজম-এর দ্বারা তিনি এই পর্বে গভীরভাবে প্রভাবিত।

ঈশ্বরকে, এবং সেই সূত্রে ধর্মকে এক অ-নৈতিক ভিত্তির ওপর স্থাপন করলেন অক্ষয়কুমার। ফলে নীতিশাস্ত্রের দিক থেকে এক সমস্যার উদয় হল। বিশ্বপ্রকৃতির নিয়মকানুনের মধ্যে মানুষের জন্য যদি ঈশ্বরপ্রদত্ত নৈতিক কোনো নির্দেশ না থাকে, তাহলে মানুষের আচরণের ভালোমন্দের মাপকাঠিটা কী হবে, সমাজ এগোবে কী করে? কুন্স-এর রচনায় এর কোনো উত্তর পেলেন না তিনি। যেসময় এইসব ভাবনাচিন্তা করছেন, ঠিক সেই সময়েই (১৮৫৯) বেরোল ডারউইনের *অরিজিন অব স্পিশিজ*। একদিকে তা জীববিজ্ঞানে যেমন মুক্তির হিল্লোল বহিয়ে দিল, অন্যদিকে তেমনি, সমাজবিজ্ঞানে ‘সামাজিক ডারউইনবাদী’দের অশুভ প্রভাব মানুষে মানুষে শোষণকে ‘প্রকৃতিসম্মত’ বলে প্রমাণ করতে চাইল। এই ভুল পথে হেঁটে শিব ভেবে বাদর গড়ে ফেলার একটা বিপদ ছিল। অক্ষয়কুমার সেই ভুল রাস্তায় হাঁটেন নি। তার বদলে তিনি বেকনীয় দর্শনের কাঠামোর মধ্যেই নিজেকে ধরে রাখেন। আর সেই কাঠামোরই অঙ্গ স্বরূপ জন স্টুয়ার্ট মিলের যুক্তিশাস্ত্র আয়ত্ত করে নেন। এক্ষেত্রেও তাঁর সহযাত্রী ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, যিনি মিলের ‘লজিক’-কে সংস্কৃত কলেজের পাঠ্যক্রমে সম্মিষ্ট করেন। তিনি সিদ্ধান্তে এলেন, মানুষকে এমন এক প্রস্থ আদর্শ মূল্যবোধ তৈরি করতে হবে, যা হবে বিশ্বপ্রকৃতির নিয়মাবলির সঙ্গে সুসঙ্গত। সমাজজীবনে মানুষের সুস্থভাবে বাঁচবার জন্য যেসব জিনিস চাই, মানুষের যেসব চাহিদা ভৌত এবং জৈব বিজ্ঞানের নিয়মগুলির সঙ্গে সঙ্গত, তারই আলোকে মানুষের নৈতিক আচরণের ভালোমন্দের সংহিতা বানিয়ে নিতে হবে। এইটা করতে পারলে মানুষ পরমেশ্বরের ইচ্ছা, অর্থাৎ শাস্ত মঙ্গলের লক্ষ্য পূরণ করার দিকে এগোতে পারবে।

এ দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে অনেক গৌজামিল আছে। সবচেয়ে বড়ো গৌজামিল এই যে এখানে ধরে নেওয়া হচ্ছে, শাস্ত, অপরিবর্তনীয়, আদর্শ মানবপ্রকৃতি বলে একটা কিছু আছে, এবং তা যুক্তিগ্রাহ্য। এর ফলে কিন্তু যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে মানবপ্রকৃতির ও মানবীয় মূল্যবোধের পরিবর্তনের ব্যাপারটা চাপা পড়ে গেল। এখানে তিনি স্ব-বিরোধিতার ফাঁদে নিজেকে জড়ালেন। বেকনীয় পদ্ধতিতন্ত্র অনুযায়ী, পর্যবেক্ষণ আর পরীক্ষণ ছাড়া কোনো ধারণাকে সত্য বলে মেনে নেওয়া চলে না। অথচ বেকন-পন্থী হওয়া সত্ত্বেও অক্ষয়কুমার এই পর্যায়ে বিনা পর্যবেক্ষণে মানবপ্রকৃতির পরমেশ্বর-নিয়ন্ত্রিত শাস্ত ও অবিশ্বাসের চরিত্রকে মেনে নিয়েছেন। কেননা, তখনো পর্যন্ত তাঁর ধারণা ছিল, বিশ্বপ্রকৃতির যাবতীয় নিয়মাবলী জনৈক ঈশ্বরের তৈরি।

কিন্তু যত দিন গেল, ততই তিনি এই স্ব-বিরোধিতা বিষয়ে সচেতন হলেন। পদার্থবিজ্ঞানে তাঁর ব্যুৎপত্তি যত বাড়ল, ততই তিনি উপলব্ধি করলেন যে প্রাকৃতিক নিয়মগুলি মোটেই ঈশ্বরপ্রদত্ত নয়। ঈশ্বরের নিরিখে প্রকৃতিকে বিচার করার বদলে ক্রমশ তিনি প্রকৃতির নিরিখে ঈশ্বরকে বিচার করতে অভ্যস্ত হন। অচিরেই প্রশ্ন তুললেন, প্রকৃতির নিয়মগুলি যদি সত্য হয়, তাহলে ঈশ্বরের ধারণাটি গ্রাহ্য থাকে কি?'' অর্থাৎ, হয় প্রাকৃতিক নিয়ম, নয় ঈশ্বর—প্রশ্নটা এই জায়গায় এসে ঠেকল। তৃতীয় পর্যায়ে অক্ষয়কুমার সূত্রবদ্ধ করে বলছেন, মানুষ ও তার পরিপার্শ্বের যে-জগৎ সেখানে তিন ধরনের নিয়মের অস্তিত্ব রয়েছে : ১) ভৌত নিয়ম ; ২) জৈব নিয়ম ; ৩) মানসিক নিয়ম। নিয়মগুলি স্বয়ংস্বতন্ত্র, কিন্তু পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

চতুর্থ পর্যায়ে তিনি বলছেন, মানুষের যাবতীয় মানবিক গুণাবলির সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশকে বাহ্য জগতের নিয়মাবলির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। তার অর্থ এই যে শাস্ত্রত শাস্ত্রবাক্য অনুযায়ী নিজেকে গড়ে তুললে মানুষ মানবিক হতে পারে না ; বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ধারণা তৈরি করে, সেই ধারণা অনুযায়ী জীবনকে চালিত করলে তবেই মানুষ মানবিক হয়ে উঠবে। এই ভাবনারই উপধারা হিসেবে তিনি পরিষ্কার ভাষায় বললেন, মানুষের মনের বিকাশের ইতিহাসে প্রাচীন শাস্ত্রগুলি এক প্রাথমিক স্তরের পরিচায়ক। সেগুলি বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিশাসিত নিয়মের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। স্বর্ণযুগ অতীতে ছিল না, তা আছে ভবিষ্যতে। প্রকৃষ্টাকে এই জায়গায় নিয়ে আসবার মূলে সম্ভবত কৌতের প্রভাব কাজ করেছিল। কৌত মনে করতেন, মানুষের মনের বিকাশের ইতিহাসে তিনটি পর্যায় আছে। প্রথম ও আদিম পর্যায়টি ধর্মতাত্ত্বিক, দ্বিতীয়টি অধিবিদ্যক (মেটাফিজিক্যাল) এবং তৃতীয়টি প্রত্যক্ষ বা বৈজ্ঞানিক (পজিটিভ)। তাঁর মতে বর্তমানে মানুষ তৃতীয় পর্যায়ে বাস করছে। মজার ব্যাপার এই যে, কৌত তাঁর পজিটিভিজমে জন্মনাভিত্তিক দূরকল্পনাকে কোনো ঠাই না দিলেও, তাঁর নিজের এই 'তত্ত্ব'টি কিন্তু মোটের ওপর জন্মনাভিত্তিকই বটে।

এইসব বিভিন্ন ভাবধারার সংঘাতে শেষ পর্যন্ত অক্ষয়কুমারের বিশ্বভাবনায় আমূল পরিবর্তন এসেছিল। পৌত্তলিকতা তিনি ইস্কুলে পড়বার সময়েই বর্জন করেছিলেন। কিন্তু যুক্তিসম্মত ধর্ম, বা ডীইজ্জে তাঁর যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। ডীইস্টরা মনে করতেন, একেবারে সৃজনের আদিলগ্নে ঈশ্বর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে এক মোক্ষম ঠেলা দিয়েই সরে পড়েছেন। ব্রহ্মাণ্ড তার পর থেকে নিজের নিয়মেই চলেছে, আর ঈশ্বরের হস্তক্ষেপ দরকার হচ্ছে না।

দেবেন্দ্র-জীবনীকার অজিতকুমার চক্রবর্তী যে-যে কারণে অক্ষয়কুমারকে সমালোচনা করেছেন, তার মধ্যে একটি হল তাঁর ডীইজ্জ-আসক্তি। অন্যটি, যা কার্যত একই সূত্রে জড়িত, হল এই যে তিনি ফরাসি 'এন্সাইক্লোপেডিস্ট'-দের মত অনুসরণ করতেন। এই এন্সাইক্লোপেডিস্ট-রা হলেন আঠেরো শতকের ফরাসি *অঁসিক্লেপেদি*-গোষ্ঠী। মানুষের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ কয়েকটি নাম এই গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত। আঠারো শতকের গোড়ায় ফ্রান্সে অপেশাদার বিজ্ঞানকর্মীদের বলা হত 'প্রকৃতিবাদী দার্শনিক' (*philosophes*)। এঁদের প্রধান কাজ ছিল তখনকার ফরাসি 'সমাজের চালু প্রতিষ্ঠানগুলির সমালোচনা করা। কারণ ঐসব প্রতিষ্ঠান দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের পথ রুদ্ধ করে দিচ্ছে বলে মনে করা হত।' আমেরিকা থেকে এসে বেনজামিন ফ্রাঙ্কলিনও এঁদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন।* এই প্রকৃতিবাদী দার্শনিকদের অধিকাংশই ওই অঁসিক্লেপেদি গোষ্ঠীর সদস্য ছিলেন। ১৭৫১ থেকে ১৭৭২-এর মধ্যে তাঁরা আটটা খণ্ডে প্রকাশ করেন 'জ্ঞানবিজ্ঞান, প্রকৌশল ও পদার্থসমূহের বিশ্বকোষ', যা পৃথিবীর

* ফ্রাঙ্কলিন সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথের মূল্যায়নের কথা রবীন্দ্রনাথ *জীবনস্মৃতি*-তে লিখে গেছেন। মহর্ষির চোখে ফ্রাঙ্কলিন ছিলেন 'নিতান্তই সুবুদ্ধি মানুষ'। তাঁর 'হিসাব-করা কেজো ধর্মনীতির সংকীর্ণতা' দেবেন্দ্রনাথকে পীড়া দিত। তিনি 'ফ্রাঙ্কলিনের যোরতর সাংসারিক বিজ্ঞতার দৃষ্টান্তে ও উপদেশবাক্যে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিতেন এবং প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না।' একই মানুষ সম্বন্ধে বার্নাল লিখছেন : 'পারিতে এবং ডের্সাইতে থাকাকালীন রাজনীতি ও বিজ্ঞানের গতিপ্রকৃতির ওপর তাঁর প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশি। ফ্রাঙ্কলিন যেন অষ্টাদশ শতাব্দীর বেকন। তবে এ-বেকনের চরিত্র আলোদ। ... নব্যযুগের এই বেকনের উদ্ভব জনগণের মধ্যে থেকে, স্বাধীনতার আবহাওয়ায়। ... নব্যযুগের বিজ্ঞানের একেবারে সামনের সারিতে তাঁর

ইতিহাসের একটি মহত্তম ঘটনা। প্রধানত দনি দিদরো (Diderot, ১৭১৩-৮৪) এবং দলাঁবেরার (D'Alembert, ১৭১৭-৮৩)-এর প্রযত্নে রচিত হয় এই যুগান্তকারী বিশ্বকোষ। 'মুক্ত মননের সঙ্গে বিজ্ঞান, ম্যানুফ্যাকচার ও অবাধ বাণিজ্যের ভাবনার মিলন ঘটল এই গ্রন্থে। গ্রন্থটি হয়ে উঠল নবীন উদারপন্থীদের বাইবেল।'^{১২} ডীইজ্জম সম্পর্কে দিদরো-র মন্তব্য অমর হয়ে রয়েছে: ডীইস্ট হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে নাস্তিক হয়ে উঠবার আগেই মারা গেছে। সুতরাং অক্ষয়কুমার যদি ডীইস্ট আর এনসাইক্লোপেডিস্টদের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে থাকেন,, এবং এদেশে সে-ভাবধারা প্রবর্তন করতে চেয়ে থাকেন, তাহলে শুধু সেই কারণেই তাঁর অমর হয়ে থাকার কথা। কেননা, ওই ভাবনার মর্মগ্রহণ করবার মতো লোক ভারতবর্ষে তখন আর কজন ছিলেন, সন্দেহ।

বয়স ও জ্ঞান বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অক্ষয়কুমার আরো চরমপন্থী অবস্থান নেন। অনুমান করা যায়, ডারউইনের *অরিজিন অব স্পিশিজ* (১৮৫৯) তাঁর চিন্তার দিক-বদলে এক মাইলফলক হয়ে রয়েছে। বালির বাড়িতে তাঁর সংগ্রহালয়ে নিউটন আর ডারউইনের পোর্ট্রেট টাঙানোর পর তিনি বলেছিলেন, 'আমার গৃহ ক্রমে দেবলোক হইয়া উঠিল।' তাই তাঁর মহাগ্রন্থ *ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের* দ্বিতীয় খণ্ডের (১৮৮৩) 'উপক্রমণিকা'তে পৌনে তিনশো পৃষ্ঠা জুড়ে তিনি প্রমাণ করতে চাইলেন যে হিন্দু ধর্মের বনেদ বলে কথিত 'ষড়্দর্শনের মধ্যে প্রায় কোন দর্শনকারই জগতের স্বতঃ-সৃষ্টিকর্তা স্বীকার করেন নাই। কপিল-কৃত সাংখ্য তো সুস্পষ্ট নাস্তিকতাবাদ; পতঞ্জলি ঈশ্বরের অস্বীকার করেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে বিশ্বস্রষ্টা না বলিয়া বিশ্বনির্মাতা মাত্র বলিয়া গিয়াছেন। গৌতম ও কণাদের মতানুসারে জড় পরমাণু নিত্য; কাহারও কর্তৃক সৃষ্ট হয় নাই। প্রাচীন মীমাংসাপণ্ডিতেরা তো ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্পষ্টই অস্বীকার করিয়াছেন। বেদান্তের মতে জগৎ সৃষ্টই হয় নাই, বিশ্বব্যাপার ভ্রমমাত্র, ইহাতে আর সৃষ্টিকর্তার সম্ভাবনা কি?'^{১৩} আন্তিক বেকন-এর পাশাপাশি তিনি নিজেকে নাস্তিক কোঁত-এরও ভক্ত বলে ঘোষণা করেন। তাই রাজনারায়ণ বসু স্পষ্ট ভাষাতেই বলেছিলেন, 'The Babu long ago abjured his belief in Brahmoism and turned an agnostic. This change can be proved from passages in his work on Hindu sects.'^{১৪} যাঁর জীবনের ব্রতই ছিল অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে পথ চলা, মত ভাঙা আর মত গড়া, তিনি কী করে সারা জীবন একই ভাবের অনুবর্তন করে চলাবেন?

আধুনিক ভারতীয় বিজ্ঞান-দর্শনের ধারায় পথ-প্রবর্তকের সম্মান অক্ষয়কুমারেরই প্রাপ্য। তিনি আমাদের বেকন, তিনিই আমাদের দেকার্ত। প্রশ্ন কেবল একটাই: আমাদের নিউটন কে?

অবস্থান।' বৈজ্ঞানিকতা, গণতান্ত্রিকতা আর সহজ বুদ্ধি, এই তিনটি গুণের সমন্বয়ে ফ্র্যাঙ্কলিন অনন্য। সম্ভবত সেই কারণেই দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে সহ্য করতে পারেন নি। সম্ভবত সেই কারণেই অক্ষয়কুমারের সঙ্গেও তাঁর এত বিরোধ। কারণ অক্ষয়কুমারের মধ্যেও ওই তিন গুণের সমাহার বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়।

সূত্র নির্দেশ

- ১ গোপাল হালদার, *সংস্কৃতির রূপান্তর*, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১৮০
- ২ সমরেন্দ্রনাথ সেন, *বিজ্ঞানের ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, ক্যান্টিন্ডেশন অব সায়েন্স, কলকাতা, ১৯৫৮, পৃষ্ঠা ১০৫
- ৩ জে ডি বার্নাল, *ইতিহাসে বিজ্ঞান* (অনুবাদ আশীষ লাহিড়ী), আনন্দ, কলকাতা, ২০০৫, পৃষ্ঠা ২৬০
- ৪ সেন, পৃষ্ঠা ১০৫
- ৫ বার্নাল, পৃষ্ঠা ২৬০
- ৬ বার্নাল, পৃষ্ঠা ২৬৯-২৭১
- ৭ সিদ্ধার্থ ঘোষ, 'বিজ্ঞান-পথিক রাজেন্দ্রলাল মিত্র', *এক্সপ্লোরেশন*, শারদীয় ১৩৯৮
- ৮ অক্ষয়কুমার দত্ত, *ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়*, দ্বিতীয় খণ্ড, 'উপক্রমণিকা', কক্সা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ৫২
- ৯ রাজনারায়ণ বসু, *আত্মজীবনী* (তৎকর্তৃক লিখিত হস্তলিপি হইতে মুদ্রিত), দ্বিতীয় সংস্করণ, সাম্য প্রেস, ৬, কলেজ রো, কলকাতা, ১৯১২ (এ লতিফ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত), পৃষ্ঠা ৫৪
- ১০ ঘোষ, পূর্বোক্ত
- ১১ A(sit) K(umar) Bhattacharyya, 'Akshay Dutt, Pioneer of Indian Rationalism,' *The Rationalist Annual*, London, 1962
- ১২ বার্নাল, পৃষ্ঠা ৩২৩
- ১৩ অক্ষয়কুমার দত্ত, পৃষ্ঠা ৫৪
- ১৪ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *অক্ষয়কুমার দত্ত*, সাহিত্য-সাধক চরিতমালা-১/১২, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা, ১৯৪৬

আলালী ভাষার সুলুক সন্ধান

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

টেকচাঁদ ঠাকুর (প্যারীচাঁদ মিত্র)-এর *আলালের ঘরের দুলাল* (১৮৫৮) বেরনোমাত্র বেশ সাড়া পড়ে যায়।^১ তার কারণ বইটির ভাষাভঙ্গি। উনিশ শতকের মাঝামাঝি বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত-র হাতে বাংলা গদ্যর এক বিশেষ রীতি বা স্টাইল গড়ে উঠেছিল। সে-রীতির লক্ষণ দুটি: (১) তৎসম শব্দের দিকে ঝোঁক; তদ্ভব, অর্ধতৎসম ও দেশী শব্দকে—কী সংলাপে, কী বিবরণে—এড়িয়ে চলাই যেন নিয়ম, আর (২) ক্রিয়া, সর্বনাম, অব্যয় ও অনুসর্গ—এই চারটিতে সর্বদাই সাধু কোড-এর রূপ ব্যবহার। এর জন্যেই মুখ-চলতি প্রবাদ-প্রবচন বা বাগধারা (ইডিয়ম)-র জায়গা সে-রীতিতে হতো না।^২ *আলাল* এসে প্রথম দিকটিকে ভালো রকম নাড়া দিল, যদিও দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে প্যারীচাঁদ মিত্র কোনোভাবেই বিদ্রোহ করেন নি। তবে তাঁর সংলাপে ও বিবরণে প্রবাদ-প্রবচন ও বাগধারা দেখা গেল প্রচুর পরিমাণে। তার ফলেই ‘আলালী’ ভাষা সম্পর্কে আপত্তি উঠল নানা মহল থেকে। ব্যাকরণের বিচারে কিন্তু ‘আলালী’ ভাষা সাধু কোড-এরই নিচু বা সাদামাটা রীতির প্রথম ভালো নমুনা; উঁচু বা মহারীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেই তার আবির্ভাব।^৩ অর্থাৎ তথাকথিত ‘[বিদ্যা]সাগরী’ বা ‘অক্ষয়ী’ ভাষার সঙ্গে ‘আলালী’ ভাষার মূল তফাত রীতিগত: আদতে দুটিই কিন্তু সাধু কোড-এর গদ্য।^৪

এখানেই ‘আলালী’ ভাষার সঙ্গে ‘হতোমী’ ভাষার মূল তফাত। ‘হতোমী’ ভাষা মানে আগাগোড়া চলিত কোড। চলিত কোড-এর তখনও কোনো উঁচু রীতি দেখা দেয় নি। তার জন্যে বিশ শতক অবধি অপেক্ষা করতে হবে। তবে এক জায়গায় ‘আলালী’ আর ‘হতোমী’ ভাষার মিল আছে: দুটিই লেখা হয়েছিল নিচু রীতিতে, যদিও প্রথমটি সাধু কোড-এ, দ্বিতীয়টি চলিত কোড-এ। এর জন্যেই উনিশ শতকে ‘আলালী’ ও ‘হতোমী’ ভাষাকে এক করে দেখা হতো।^৫ এমনকি চলিত কোড-এর সপক্ষে প্রমথ চৌধুরী যখন আসরে নামলেন, তখনও তাঁর চোখে *আলাল* আর *হতোম* একই বিদ্রোহের ‘দুটি লাল পতাকা’।^৬

আলাল আদতে সাধু কোড-এই লেখা, কিন্তু মনোযোগী পাঠকরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন: বইটির ক্রিয়াপদের রূপ সর্বদা সাধু কোড অনুযায়ী নয়, মাঝে মাঝেই চলিত কোড-এর ধাতুরূপ এসে পড়ে—শুধু সংলাপে নয়, বিবরণেও। এর কয়েকটি উদাহরণ দেখা যাক:

(১) ভাবিয়া কাঁদছি (পৃ. ১২৯)^৭

(২) ভেঙ্গে পড়িয়াছে (পৃ. ৮০)

(৩) ঠিকুরে ফেলিয়া দিতেছে (পৃ. ১০২)

(৪) জ্বলিয়া উঠে বলিলেন (পৃ. ৫৪)

(৫) আসিয়া জুটে যায় (পৃ. ১২৫)

(১)-এর ক্ষেত্রে অসমাপিকা ক্রিয়ার রূপটি সাধু কোড-এর, সমাপিকার রূপটি চলিত-এর। (২)-এ ব্যাপারটি ঠিক উল্টো। (৩) আর (৪)-এর দুটিতেই অসমাপিকায় সাধু-চলিত কোড-এর মিশেল ঘটেছে। (৫)-এর ক্ষেত্রেও কথটি সত্যি। উদাহরণগুলির ক্ষেত্রে অসমাপিকা ক্রিয়াগুলির রূপ দেখেই সাধু-চলিতের মিশেল ধরা যায়, সমাপিকার রূপ দেখে নয়। (৩) ও (৪)-এ অসমাপিকা ও সমাপিকা দুটি আলাদা কোড-এর, সাধু-চলিতের মিশেলটি তাই স্পষ্ট। ঘটনা হলো, বাংলা ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রে সাধারণ বর্তমান-এ ক্রিয়াপদের রূপ সাধু-চলিতে এক। তাই আসিয়া যায় বা জুটে যায়—যথাক্রমে সাধু ও চলিত হিসেবে ঠিক। কিন্তু এ দু-এর মিশেল হলে আর তাকে ‘ঠিক’ বলা যাবে না। ‘যা’ ধাতুর সাধারণ অতীত-এর ক্ষেত্রেও একই কথা। যেমন :

(৬) চারি দিগে মহা গোল পড়িয়া গেল। (পৃ. ৪১)

(৭) যদি একবার হেসে কথা কহিলেন তবে বাপের সঙ্গে বসে গেলাম। (পৃ. ৩০)
সাধু কোড-এ যাইল ও যাইলাম-ও লেখা যেত, তবে গেল আর গেলাম-এখন সাধু ও চলিত দু-এতেই চলে। অন্য ধাতুর ক্ষেত্রে সাধারণ অতীত-এর রূপ দেখে অবশ্য সাধু-চলিত বোঝা যায় :

(৮) ছেয়ে ফেলিল (পৃ. ৮৭)

(৯) ঘেঁষে বসিলেন (পৃ. ৪৭)

এছাড়াও বাংলায় অনুজ্ঞাসূচক বাক্যে অসমাপিকা ক্রিয়া না-থাকলে সাধু-চলিতের তফাৎ করা যায় না। যেমন : ‘মেয়েদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে বল্’ (পৃ. ১২৩)। তাই এ ধরনের বাক্যের ক্ষেত্রে সাধু-চলিত মিশে আছে—জোর করে এমন বলা যাবে না। সমাপিকা ক্রিয়ার ক্ষেত্রে সাধারণ অতীত ও ভবিষ্যৎ, ঘটমান ও পুরাঘটিত বর্তমান ও অতীত, নিত্যবৃত্ত অতীত-এ সাধু-চলিতের রূপ পুরোপুরি আলাদা। আর অসমাপিকা-র ক্ষেত্রে -তে-, -লে- ও -এ-অন্ত-র রূপ সাধু-চলিতে সম্পূর্ণ আলাদা। আলাল থেকেই কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হলো :

সমাপিকা ক্রিয়া :

ঘটমান বর্তমান : (ক) তোমার নিকটে আসিতেছি (পৃ. ২৮)

(খ) ছুঁচ বিধছে (পৃ. ৩৭)

পুরাঘটিত বর্তমান : (ক) সে তরে গিয়াছে (পৃ. ১২১)

(খ) দাঁত পড়েছে (পৃ. ৭৪)

(গ) মাথা খেয়েছেন (পৃ. ১১০)

সাধারণ অতীত : (ক) দৌড়ে যাইতে লাগিল (পৃ. ৬৫)

(খ) তবে কি খেয়াল দেখিলাম? (পৃ. ২৭)

ঘটমান অতীত : (ক) ... প্রেমনারায়ণ মজুমদার যাইতেছিলেন (পৃ. ২০)

(খ) ...মাথা শুকাইতেছিলেন (পৃ. ২৭)

- পুরাঘটিত অতীত : (ক) কত পাপ করেছিলাম (পৃ. ১২৮)
 (খ) উত্তম জ্ঞান জন্মিয়াছিল (পৃ. ৩৩)
- নিত্যবৃত্ত অতীত : (ক) চেপে চুপে রাখিভেন (পৃ. ১৮)
 (খ) আত্মীয়তা দেখাত (পৃ. ১২৫)
- সাধারণ ভবিষ্যৎ : (ক) আমরা যাব না (পৃ. ১৭)
 (খ) চাঁদ ধরিব (পৃ. ৬)
 (গ) পিরের নাম লিয়ে চেলাব (পৃ. ১২১)

অসমাপিকা ক্রিয়া :

- তে- অস্ত : (ক) বলতে কহিতে, লিখতে পড়তে যেতে আসতে
 (পৃ. ১১০)
 (খ) ছাড়িতে লাগিল (পৃ. ৯৩)
 (গ) দৌড়িয়া মারিতে যাবেন (পৃ. ২৪)
- লে- অস্ত : (ক) উন্টে পান্টে লইলে...হইতে পারে (পৃ. ৮৪)
 (খ) করলে চলবে (পৃ. ১১৩)
 (গ) ভাত ছড়ালে কাকের অভাব নাই (পৃ. ৮৯)
- এ- অস্ত : (ক) তাঁহার কথা ফেসে গেল (পৃ. ৮০)
 (খ) পড়িয়া গেল (পৃ. ৪১)
 (গ) করিয়া লইয়া আসিতেছে (পৃ. ১০২)
 (ঘ) ছেড়ে পলাই নাই (পৃ. ২০)

আলাল থেকে এতক্ষণ যে উদাহরণগুলো দেওয়া হলো তাতে পাশাপাশি সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার মধ্যে সাধু-চলিত কোড-এর মিশেল ঘটেছে। তবে কখনও কখনও একই বাক্যে, পাশাপাশি না-থাকলেও, সাধু-চলিতের ভালো রকম মিশেল দেখা যায়। যেমন :

- (১০) এই বলিয়া চক্ষের জল ফেলিতে ডুমিতে আস্তে শয়ন করিলেন ।
 (পৃ. ২৭)

এখানে বিবরণের মধ্যেই ক্রিয়াপদের রূপে এমন গরমিল দেখা যায়।

সংলাপের মধ্যেও একই ব্যাপার ঘটে। যেমন :

- (১১) টাকাকে একেবারে অগ্রাহ্য করিলে সংসার কিরূপে চলবে ? (পৃ. ৪৯)

মেয়েদের মুখের সংলাপে আঞ্চলিক ক্রিয়াপদের কথ্য রূপও দেখা যায়, কিন্তু তারপরেই আসে সাধু কোড-এর রূপ :

- (১২) আমি একটু হাত বাগড়াবাগড়ি করেছি, আমাকে একটা লাথি মারিয়া চলিয়া গেলেন (পৃ. ২৮)

পুরুষের মুখেও আঞ্চলিক ভাষার ধাতুরূপের সঙ্গে সাধু কোড-এর ক্রিয়াপদ আর অন্য অঞ্চলের চলিত কোড-এর ক্রিয়াপদ মিশে থাকে :

- (১৩) ভাত খেতে বসেছি—ডাকাডাকিতে ভাত ফেলে রেখে এস্তেচি—ভেটেল পান্সি হইলে অল্প ভাড়ায় হইত—এখন জোয়ার—দাঁড় টানতে ও বিকে

মার্তে মাজিদের কাল ঘাম ছুটেবে—গহনার নৌকায় গেলে দুইচার পয়সায়
হতে পারে—চলতি পান্সি চার পয়সার ভাড়া করা আমার কর্ম নয়—একি
খুতকুড়ি দিয়া ছাত্তু গোলা? (পৃ. ৯)

সমস্ত কথ্য ক্রিয়া রূপের মধ্যে হইলে আর হইত দুটি ব্যতিক্রম। বিবরণের মধ্যেও এক-
এক সময়ে এই ধরনের আঞ্চলিক ভাষার ক্রিয়াপদ এসে গেছে :

(১৪) [বাবুরামবাবু] পরে ভড়ৎ করিয়া ইঁকা টানিতেছেন—শুশুকগুলো এক এক
বার ভেসে ২ উঠতেছে—বাবু স্বয়ং উঁচু হইয়া দেখতেছেন ও গুনৎ করিয়া
সখীসম্বাদ গাইতেছেন—^৮ (পৃ. ৯)

সাধারণ অতীত-এর ক্ষেত্রে চলিত কোড-এর উত্তমপুরুষ-এ -আম- অন্ত রূপটি সাধু-চলিত
দু কোড-এই চলে (যেমন, এলাম (পৃ. ১০, ১৩), গেলাম (পৃ. ৩০), যদিও সাধু কোড-
এ বিকল্পে আসিলাম, যাইলাম-ও লেখা হয়)। -উম-অন্ত রূপটি কিন্তু একান্তভাবেই চলিত
কোড-এর।^৯ আলাল-এর সংলাপে, খুব অল্প হলেও, তার নমুনা রয়েছে :

(১৫) এই সকল গোলযোগ দেখিয়া আমি বরযাত্রীদিগকে ছাড়িয়া কন্যাযাত্রীদিগের
পালে মিশিয়া গেলুম...। (পৃ. ৭৮)

(১৬) বালকেরা বাঁচলুম বলিয়া তাড়ি পাত তুলিয়া গুরুমহাশয়কে ভেৎচুতে^{১০} ও
কলা. দেখাইতে^{১১} চোঁচা দৌড়ে ঘরে গেল। (পৃ. ৯৬)

একাধিক অসমাপিকা ক্রিয়া ও সবশেষে একটি সমাপিকা ক্রিয়া—এমন বাক্য আলাল-
এ অনেক আছে। আর সেখানে প্রায়ই সাধু-চলিত কোড-এর রূপ মিশে থাকে :

(১৭) ছড় খেয়ে পালিয়া আসিতে হইয়াছিল (পৃ. ৩২)

(১৮) তেড়ে আসিয়া ডান হাত নেড়ে বলিলেন (পৃ. ৩৬)

(১৯) 'নরম হইয়া সামঞ্জস্য করিয়া বলতে লাগিলেন (পৃ. ৪২)

(২০) শিলৎ করিয়া হাসিয়া ঠাট্টা জুড়ে দিল—কর্তা খেপে উঠে ঠকচাচাৎ বলিয়া
ডাকেন—(পৃ. ৭৭)

(২১) গুনিয়া বগল বাজাইয়া নেচে উঠিল—(পৃ. ৯৩)

(২২) রেগে মেগে হুমকে উঠিয়া বলিলেন (পৃ. ১১০)

আলাল-এর ভাষারীতি সম্পর্কে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন :

‘আলালের ঘরের দুলালে’ মিশ্র রীতি ব্যবহৃত হয়েছে। প্যারীচাঁদ সাধুভাষা,
কলকাতাই চলতি বুলি ও বিভিন্ন অঞ্চলের উপভাষার সাহায্য নিয়ে কৌতুকরসের
মারফতে চরিত্রের অধোগতি ও তার থেকে উদ্ধার লাভের কাহিনী বর্ণনা
করেছেন। ‘আলালে’ সাধুভাষা ও চলতি ভাষার যথেষ্ট জগাখিচুড়ি পাকিয়েছে,
পরে তাঁর ভাষা থেকে এদোষ অনেকটা লোপ পেয়েছিল।^{১২}

‘কলকাতাই চলতি বুলি’ বিষয়টিকে ব্যাখ্যা না করলে বোঝার অসুবিধে হয়।^{১৩} আলাল-এ খাস
কলকাতাই চরিত্র মাত্র তিনটি—বৌবাজারের বেচারাম, বটতলার বক্রেশ্বর আর বার সিমলের
বাঞ্ছারাম। বাকি সকলেই বালি বা বৈদ্যবাটি, অর্থাৎ হাওড়া-স্ফালি জেলার লোক।^{১৪} কাহিনীতে
তাঁদের কথাই বেশি আসে। আর বিবরণে ও সংলাপে সাধু-চলিত ক্রিয়াপদ মেশানোর ব্যাপারটা

প্যারীচাঁদের রচনায় পরে কমে এসেছিল ঠিকই, কিন্তু একেবারে চলে যায় নি। যেমন :

- (২৩) শ্যালা জলের ঘটা! তুই মেও২ করিয়া কি বাঁচবি? তোকে এখনি খাব। (মদ
খাওয়া..., পৃ. ১৪২)
- (২৪) অবিবাহিত, বিবাহ করিবার বাসনা তাহার মনে ঢেউ খেলাচ্ছে। (আধ্যাত্মিকা,
পৃ. ৫১৮)
- (২৫) তাহারা চলে গেলে গোপাল বাগানে আসিয়া আরাম পাইলেন। (বামাতোষিণী,
পৃ. ৫৫৭)

অসিতবাবু আরও জানিয়েছেন :

রবীন্দ্রনাথের আগে পর্যন্ত প্রায় সমস্ত কথাসাহিত্যিকের এ দোষ পুরোমাত্রায় ছিল। সাধুভাষা ও চলিতভাষার
অসতর্ক সংমিশ্রণকে কেউ দোষাবহ মনে করতেন না। যাঁরা আগাগোড়া সাধুভাষায় (মায় সংলাপ
পর্যন্ত) উপন্যাস লিখতেন তাঁদের ভাষায় কিন্তু এদোষ বড়ো একটা চোখে পড়ে না। কিন্তু যাঁরা
সাধুভাষায় আখ্যান কর্ণা এবং সংলাপে চলিতভাষার সাহায্য নেবার চেষ্টা করতেন, তাঁদের লেখাতেই,
বিশেষত সংলাপে এই ত্রুটি বড়ো বেশী প্রকট হয়ে উঠত। অবশ্য সেযুগের পাঠকেরাও এ-দোষ সম্বন্ধে
আদৌ অবহিত ছিলেন না। প্যারীচাঁদের প্রথম দুটি আখ্যানে ভাষাসংমিশ্রণ মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে।^{১০}

এখানেও একটু বোঝার ভুল হচ্ছে বলে মনে হয়। ব্যাকরণের বিচারে, বিবরণ ও সংলাপ দু-
এর ক্ষেত্রেই প্যারীচাঁদ সাধু কোড-এ লিখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দুটি ক্ষেত্রেই মাঝে মাঝে
ক্রিয়াপদের চলিত কোড-এর রূপ (সমাপিকা ও অসমাপিকা—দু রকমেরই) এসে পড়ে।
বোঝা যায়, *আলাল*-এর ভাষাকে অসিতবাবু না-সাধু না-চলিত, দু-এর খিচুড়ি—এমন কিছু
ভেবেছেন। সুকুমার সেন একে বলেছেন “মিশ্র সাধুভাষা”; সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও লিখেছেন :
“সাধু-ভাষার ন্যায় চলিত-ভাষাও আজকাল সাহিত্যে খুব ব্যবহৃত হইতেছে,—সাধু-ভাষার
পার্শ্বে গদ্য-সাহিত্যেও ইহার একটা স্থান হইয়াছে। পদ্য-সাহিত্যে বিশুদ্ধ সাধু-ভাষা অপেক্ষা
বিশুদ্ধ চলিত-ভাষা অথবা মিশ্র সাধু- ও চলিত-ভাষারই প্রচলন বেশী।”^{১১} গদ্যের ক্ষেত্রে
আলাল-এই মিশ্র সাধু-চলিতের প্রথম নমুনা পাওয়া যায়। *আলাল* কেন, প্যারীচাঁদের সমস্ত
রচনাই সাধু কোড-এ, শুধু রীতিটা উঁচু নয়, নিচু বা মাঝারি (যেমন *অভেদী* বা *আধ্যাত্মিকা*-য়)।
আঞ্চলিক ভাষা বা মুসলমানি বাংলা সংলাপ বাদ দিলে *আলাল*-এ সাধু কোড-এর ক্রিয়াপদই
প্রধান, তবে কখনও কখনও চলিত রূপও আছে।

বিষয়টি ঠিকমতো বুঝতে গেলে *হতোম*-এর সঙ্গে *আলাল*-এর কিছু অংশের তুলনা করা
দরকার। আমাদের সৌভাগ্য : একই গল্প *আলাল* ও *হতোম*-এ পাওয়া যায়। তার দুটি রূপই
একবার পড়ে দেখা যাক :

প্যারীচাঁদ :

- (২৬) পূজার সময় নবমীর রাত্রে বাটীতে বিদ্যাসুন্দরের যাত্রা হচ্ছে—ভবানীবাবু সমস্ত রাত্রি
তাকিয়ার উপর হাত দিয়া কিমুচ্ছেন—এক২ বার বোধ হচ্ছে যেন পড়ে গেলেন।
ভোরে তোপের শব্দে চমকিয়া উঠিলেন, চোখ বুজে চারিদিক ফেল২ করিয়া দেখতে২
যাত্রাওয়ালাদের বলিলেন—শ্যালারা। সারা রাত কেবল মালিনীর গান শুনায়ে হাড়েনাড়ে
জুলিয়েছিল—কৃষ্ণ বাহির কর—যাত্রাতে কৃষ্ণ নাই? তোবোঁতাদের থামে বেঁধে মারব।

(মদ খাওয়া, পৃ. ১৪৪)

P31194

হুতোম :

(২৭) আর একবার ঠনঠনের “র” ঘোষণা বাবুর বাড়ীতে বিদ্যাসুন্দর যাত্রা হচ্ছিল, বাবু মদ খেয়ে পেকে মজ্জলিশে আড় হয়ে শুয়ে নাক ডাকিয়ে যাত্রা গুনছিলেন। সমস্ত রাত বেঁধেই কেটে গ্যালো, শেষে ভোর ভোর সময় দক্ষিণ মশানে কোটাল হাস্যমাত্রে বাবুর নিদ্রা ভঙ্গ হলো—কিন্তু আসোরে কেট্টাকে না দেখে বাবু বিরক্ত হয়ে “কেট্ট ল্যাও, কেট্ট ল্যাও” বলে খেপে উঠলেন। অন্য অন্য লোকে অনেক বোঝালেন যে, “ধর্ম অবতার। বিদ্যাসুন্দর যাত্রায় কেট্ট নাই” কিন্তু বাবু কিছুতেই বুঝলেন না (কেট্ট তাঁরে—নিতান্ত নির্দয় হয়ে দেখা দিলেন না বিবেচনায়) শেষে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগলেন। (সটীক হুতোম, পৃ. ৯৪-৯৫)

দুটি গল্পের পরিণতি দু রকমের—প্রথমটি রুদ্রসের, দ্বিতীয়টি করুণসের। কিন্তু এখানে সেটি আলোচনার বিষয় নয়।^{১*} ওপরের দৃষ্টান্তে প্যারীচাঁদ দিব্যি শুরু করেন চলিত কোড-এর ক্রিয়া দিয়ে, কিন্তু তার মধ্যে এসে পড়ে সাধু কোড-এর রূপ। আর হুতোম বরাবর চলিত কোড-এ লিখে গেছেন, কোনো মিশেল নেই।

অসিতবাবু যা বলেছেন তা ঠিক হতেই পারে। উনিশ শতকের পাঠকরা ক্রিয়াপদের রূপ নিয়ে মাথা ঘামাতেন না, সাধু কোড-এর ভেতরকার সঙ্গতি বজায় থাক বা না থাক, বুঝতে পারলেই হলো—এই ছিল তাঁদের মনোভাব। কিন্তু আলাল-এ কেন এমন ঘনঘন রূপ বদলায়—তার ব্যাখ্যা শুধু এই দিয়েই হয় না। একটু পরে আসব সে-কথায়।

এতক্ষণ যা বলা হলো তা খুব নতুন কিছু নয়। অনেকেই তা মনে মনে বোঝেন। শুধু কোড আর রীতিকে গুলিয়ে ফেলার ফলে (বা আলাদা না-করার দরুন) বোঝাবার অসুবিধে হয়। প্যারীচাঁদ মিত্র চেয়েছিলেন সাধু কোড-এরই প্রচলিত উঁচু রীতি ছেড়ে নিচু রীতিতে লিখতে—কিন্তু সে-কোড-এর বদলে অন্য কোড-এ লেখার পরিকল্পনা তাঁর ছিল না। আসলে তাঁর লক্ষ্য ছিল অল্পশিক্ষিত পাঠক-পাঠিকা—যারে বসেই যাঁরা লেখাপড়া শিখেছেন—তাঁদের পড়ার উপযোগী কিছু লেখা। তাই যেসব কথা মুখে মুখে চলে, সেগুলিকেই লেখায় এনেছেন। কিন্তু ক্রিয়াপদের রূপের ক্ষেত্রে করিয়া ছেড়ে করে, ভাবিতে ছেড়ে ভাবতে, যাইতেছে-র বদলে যাচ্ছে, বা যাইয়াছিল-র বদলে গিয়েছিল, এমনকি দিবেন-এর জায়গায় দেকেন লেখার চেষ্টা তিনি করেন নি।^{১*} আঠেরো শতকে যে কোড-এ চিঠিপত্র, দলিল দস্তাবেজ ইত্যাদি লেখা হতো, আলাল (১৮৫৮) থেকে বামাতোষিনী (১৮৮১) সেই কোড-এই লেখা। আগেই বলা হয়েছে, আলাল ও মদ খাওয়া বড় দায়-এ সাধু-চলিত ক্রিয়াপদের বেশি মিশেল আছে, পরের বইগুলিতে তা কমে আসে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, সাধুর জায়গায় ক্রিয়াপদের চলিত রূপ একচ্ছত্র হয়ে পড়েছে। ঘটনা ঠিক উল্টো। এতদৈশীয স্ত্রীলোকদিগের পূর্ববস্থা (১৮৭৮), আধ্যাত্মিকা (১৮৮০) ইত্যাদি রচনায় ক্রিয়াপদের সাধু রূপ বিবরণে প্রায় সর্বদাই অবিকৃত থাকে।

কিন্তু সংলাপের ব্যাপারে প্যারীচাঁদ বোধহয় কোনোদিনই মনোস্থির করতে পারেন নি। তাই ক্রিয়াপদ ও সর্বনামের সাধু রূপ কখনও ঠিক থাকে, কখনও বা চলিত রূপের পাশাপাশি বসে, কখনও বা মিশে যায়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক :

১৫১১০০

- (২৮) কতিপয় স্ত্রীলোক এককালীন বলিয়া উঠিলেন, “ঈশ্বর আরাধনা ত্যাগ করিব কেন? কোন পূজা আমাদের বটিতে না হয়? কাহার বটিতে শালগ্রাম না আছে?” (আধ্যাত্মিকা, পৃ. ৫১৪)
- (২৯) “এই গুনিয়াছিলাম বামুনের মেয়ে নাকি বড় যোগিনী—কৈ বাপকে রক্ষা করতে পারলে না?” (আধ্যাত্মিকা, পৃ. ৫২৮)।
- (৩০) ঘটকী। মা! ঘুরে ঘুরে না খাওয়া না দাওয়া করে তোমার মেয়েরও ব্যাটার সম্বন্ধ করিয়াছি। হরলালবাবুর ছেলে এন্ট্রেন্স ও এফ.এ. পাস করিয়াছে। এইবার বি. এতে পাস হবে। (বামাতোষিণী, পৃ. ৫৯৬)

সংলাপে ক্রিয়াপদের এই অস্থিরতার মধ্যেই প্যারীচাঁদের সমস্যাটি ধরা পড়ে। আলাল-এর আগে বাংলায় শিশুপাঠ্য বই থেকে স্তম্ভনগর্ভ সন্দর্ভ সবই লেখা হচ্ছিল। কিন্তু স্বাভাবিক কারণেই সেগুলিতে সংলাপের অবকাশ ছিল কম। মাসিক পত্রিকা (১৮৫৪) বার করে প্যারীচাঁদ ও রাখানাথ শিকদার সত্যিই একটা কাজের কাজ করলেন। ঘরের বয়স্কা মেয়েদের কথা আলাদা করে তখনও বোধহয় কেউ ভাবেন নি। ঘরে বসেই এইসব মেয়েদের অক্ষর-পরিচয় হয়েছিল, কোনো পাঠক্রম অনুযায়ী ধাপে ধাপে শেখার সুযোগ তাঁরা পান নি। ফলে রোজকার কথাবার্তায় যেসব তৎসম শব্দ থাকে, তার চেয়ে বেশি শব্দ এঁরা শিখবেন কোথা থেকে? এঁদের বোঝার মতো করে, শুধু গল্প নয়, নীতিশিক্ষামূলক বই লেখা সত্যিই একটা চ্যালেঞ্জ—সে যুগেও, এ যুগেও। তবে কাহিনি মারফত নীতিশিক্ষা দেওয়া তুলনায় সহজ। প্যারীচাঁদ মিত্রের সব কাহিনি যে আলাল-এর মতো বাস্তবনির্ভর বা মদ খাওয়া বড় দায়-এর মতো মজাদার, তা নয়। কিন্তু টানা বিবরণ না-দিয়ে মাঝে মাঝে সংলাপ থাকলে গল্প আরও জমে—প্যারীচাঁদ এ কথা বুঝতেন।

আর তার দরুনই ক্রিয়াপদে যত গোলমাল। প্যারীচাঁদ চাইছেন মুখের কথাকেই চরিত্রের মুখে বসাতে। কিন্তু বাদ সাধে পুরনো সংস্কার। যেমন, চটকা ধাতু একেবারেই লৌকিক। মুখে মুখে এর দিব্যি ধাতুরূপ করা যায়। কিন্তু সাধু কোড-এর রূপটি খুবই কৃত্রিম হবে। ফলে প্যারীচাঁদ লেখেন :

- (৩১) ...সাহেব এক২ বার সিস্ দিতেছেন—এক২ বার নাকে নস্য গুঁজ়ে হাতের আঙ্গুল চটকাতেছেন—এক২ বার কেতাবের উপর নজর করিতেছেন—এক২ বার দুই পা ফাঁক করিয়া দাঁড়াইতেছেন—(আলাল, পৃ. ৩৮)

বাক্যটি এখানে শেষ হয় নি। তবে এর অন্তর্গত সব কটি উপবাক্যে (clause) সমাপিকা ক্রিয়া সাধু কোড-এর, একটিমাত্র অসমাপিকা ক্রিয়া চলিত কোড-এর (গুঁজ়ে)। প্যারীচাঁদ এটিকে সাধু রূপ দেন নি, কিন্তু চটকা ধাতুটিকে ঘটমান বর্তমান কালের রূপ দেওয়ার সময়ে, অন্যান্য ক্রিয়ার সঙ্গে মিল রেখে, লিখেছেন চটকাতেছেন। এখানে গুঁজ়ের জায়গায় গুঁজিয়া লিখলে আর সাধু-চলিতের মিশেল হতো না। কিন্তু প্যারীচাঁদ বোধহয় সর্বদা অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যাপারে অতটা সচেতন ছিলেন না। (৩১)-এর ক্ষেত্রে অন্যান্য উপবাক্যে গোড়া থেকে সবকটি সমাপিকা ক্রিয়াই -তেছেন-অন্ত। তখন চটকা ধাতুটিকেও তিনি সেই ভাবেই রূপ দেন চটকাতেছেন। আরও শুদ্ধিবাদী লেখক হয়তো লিখতেন চটকাইতেছেন, কিন্তু প্যারীচাঁদ এখানে গুঁজ়ে লেখার পর চটকাচ্ছেন লিখতে গিয়েও যেন থেমে গেছেন, আগের

ক্রিয়াপদগুলির রূপের সঙ্গে মিল রেখে -ছেন-এর জায়গায় -তেছেন করে দিয়েছেন। কিন্তু মধ্যের -ই-টি আর দেওয়া হয় নি—যদিও এক শ্রেণীর আ-কারান্ত ধাতুব ক্ষেত্রে সাধু রূপে সেটি আসার কথা (ধাইতেছেন, পাইতেছেন, যাইতেছেন, ইত্যাদি)।^{১৭} এই রূপগুলি লেখার সময়ে প্যারীচাঁদের কোনো অসুবিধে হয় নি, অন্যদের মতো -ই- সমেতই তিনি লিখতেন। কিন্তু চট্কা ধাতুটা বোধহয় তাঁর আগে আর কাউকে লিখতে হয় নি (বা খুব অল্প লোককেই লিখতে হয়েছে)। প্যারীচাঁদ এখানে ভাবছেন চলিত কোড-এ, তারপর রূপান্তর করছেন সাধু কোড-এ।^{১৮}

এইভাবে লিখতে বসে প্যারীচাঁদ সচেতনভাবে কিছু মৌখিক ক্রিয়ার অসমাপিকার রূপকে সাধু-র চেহারা দিয়েছিলেন। যেমন :

(৩২) ঘাবড়িয়া যাইতে লাগিল (পৃ. ৩৫)

(৩৩) টপ্কিয়া... যাইতে লাগিল (পৃ. ৪৪)

(৩৪) বিগড়িয়া যাইতে পারে (পৃ. ১০)

(৩৫) হিঁচুড়িয়া লইয়া গিয়া কয়েদ করিয়াছে (পৃ. ২৩)

খেয়াল করে দেখবেন : এই বাক্যগুলিতে সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার রূপে কোনো গরমিল নেই। প্যারীচাঁদকে লিখতে হচ্ছে এমন এমন একটি কাহিনি যাতে শিক্ষিত-অধশিক্ষিত-অশিক্ষিত, হিন্দু-মুসলমান, স্ত্রী-পুরুষ, গরিব-বড়লোক, গৃহী-সন্ন্যাসী, সাহেব-বাঙালি—সব রকমের চরিত্র আসবে। তাদের মুখে সংলাপ বসানোর সময়ে প্যারীচাঁদ চাইছেন : সেগুলো যেন বাস্তবজীবন-সম্মত হয়। তা হলে সব সংলাপই কথিত রূপে হওয়ার কথা। কিন্তু তা হয় না। কারণ : বাংলার প্রচলিত লিখিত রূপ সম্পর্কে একটা সংস্কারও প্যারীচাঁদের অবচেতনে ছিল। এ দু-এর সঙ্ঘাত তিনি জীবনের শেষ পর্যন্ত এড়াতে পারেন নি—বিবরণে যদি বা সামলান, সংলাপে এসে সব গোলমাল হয়ে যায়। এই সঙ্কট ছতোম-এর হয় নি, কারণ বিবরণে ও সংলাপে তিনি একই চলিত কোড-এ নিজেই বেঁধে রেখেছিলেন। এদিক থেকে তিনি অনেক সচেতন বিদ্রোহী। প্যারীচাঁদও বিদ্রোহী—সংস্কৃত শব্দের অকারণ বাড়াবাড়ি তাঁর পছন্দ হয় নি। তাই তিনি গড়ে তুললেন বাংলা গদ্যর এক নিজস্ব রীতি। কিন্তু ছতোম গড়েছিলেন লেখার এক নতুন কোড। আলাল ছাড়া ছতোম হতো কিনা—এ নিয়ে ভাবা বেকার। তবে আলাল-এ ক্রিয়াপদের বৈচিত্র্য থেকে সাধু-চলিতের আসল তফাতটা স্পষ্ট ধরা পড়ে। ভারী বা হালকা শব্দ দিয়ে দু-এর তফাত হয় না, তফাত হয় ক্রিয়াপদে, সর্বনামে, আর এ দুটির তুলনায় গৌণ হলেও, অনুসর্গে আর অব্যয়ে। ছতোম সেটি বুঝেছিলেন, কিন্তু প্যারীচাঁদ ঠিক ঠাণ্ডা করেন নি।

টীকা

- ১ শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, *আলালের ঘরের দুলাল* 'বঙ্গসাহিত্যে এক নবযুগ আনয়ন করিল। এই পুস্তকের ভাষার নাম "আলালী ভাষা" হইল। এই আলালী ভাষার সৃষ্টি হইতেই বঙ্গসাহিত্যের গতি ফিরিয়া গেল। প্যারীচাঁদ মিত্র বঙ্গসাহিত্যে এই যুগান্তর আনয়ন করিলেন' (পৃ. ১৩১)। সুশীলকুমার দে-ও মনে করেন, "Thus [আলাল] is Peary Chand's most important work and constitutes a landmark in the history of a (sic) Bengali prose" (পৃ. ৬০৪)।
- ২ প্রবাদ-প্রবচন মুখে মুখেই তৈরি, সেগুলোয় তাই সাধু কোড-এর ব্যবহার বিরল। বরং তাতে আঞ্চলিক ভাষার বহু শব্দ থাকে। কিশোর পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথম জবাবে প্রমথ চৌধুরী লিখেছিলেন :

- ‘আপনারা যাকে “প্রচলিত বিশুদ্ধ” বলেন তার বিরুদ্ধে আমার প্রথম আপত্তি এই যে, তা “অশুদ্ধ” এবং “অপ্রচলিত”—অর্থাৎ তা ungrammatical এবং unidiomatic’ (পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ. ৬০)।
৬. প্যারীচাঁদ যে সচেতনভাবে বিব্রোহ করেছিলেন তার প্রমাণ রয়েছে মাসিক পত্রিকা (১৮৫৪)-র প্রথম সংখ্যাতেই : “এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষত জ্ঞানোন্মত্তের জন্যে ছাপা হইতেছে, যে ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হইবেক। কিন্তু পণ্ডিতেরা পড়িতে চান, পড়িবেন, কিন্তু তাহাদিগের নিমিত্তে এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই” (সুশীলকুমার দে, পৃ. ৬০৩-এ উদ্ধৃত)। এর ক্রিয়াপদ, সর্বনাম ইত্যাদি সাধু কোড-এর, কিন্তু রীতিটি সাদামাটা বা নিচু।
৪. শিবনাথ শাস্ত্রী মন্তব্য করেছেন, *আলাল* ও *হুতোম*-এর পর থেকে “ভাষা সম্পূর্ণ আলালী রহিল না বটে কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রী রহিল না, বঙ্কিমী হইয়া দাঁড়াইল” (পৃ. ১৩১)। শিবনাথ শাস্ত্রী আরও লক্ষ্য করেছেন যে, *আলাল*-এর পরের বইগুলিতে প্যারীচাঁদ “কিন্তু আলালী ভাষা ব্যবহার করেন নাই, বরং বঙ্কিমী ভাষাই ব্যবহার করিয়াছেন” (এ)। ‘ভাষা’ শব্দটি নানা অর্থে প্রয়োগ করা হলেও, মূল কথা হলো : অভেলী, যৎকিঞ্চিৎ ইত্যাদি বই-এ প্যারীচাঁদ নিচু রীতি ছেড়ে মাঝারি রীতিতে চলে গিয়েছিলেন। আসলে ঈশ্বরচন্দ্রী, আলালী আর বঙ্কিমী—ব্যাকরণের বিচারে তিনটিই সাধু কোড, তবে রীতির দিক থেকে উঁচু, নিচু ও মাঝারি—এই তিনটি ধারার প্রতিনিধি।
৫. শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছেন, ‘তখন আমরা কেনও লোকের ভাষাকে গাভীরোঁ হীন দেখিলেই তাহাকে আলালী ভাষা বলিতাম, এই আলালী ভাষার উৎকৃষ্ট নমুনা “হুতোমের [হুতোম প্যাচা-র] নক্সা।” যাহার ইচ্ছা হয় পাঠ করিয়া দেখিবেন তাহা কেমন সরস, মিষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী’ (পৃ. ১৩১)। বঙ্কিমচন্দ্র মনে করতেন, “বাঙ্গালা সাহিত্যে চারি জন রহস্যপটু লেখকের নাম করা যাইতে পারে,—টেকচাঁদ, হুতোম, ঈশ্বর গুপ্ত এবং দীনবন্ধু। সহজেই বুঝা যায়, যে ইহার মধ্যে দ্বিতীয় প্রথমের শিষ্য....” (*রচনাসংগ্রহ*, ১ : ২, পৃ. ১১২০)। “বাঙ্গালা ভাষা” প্রবন্ধেও বঙ্কিম “টেকচাঁদী বাঙ্গালা” ও “টেকচাঁদি ভাষা”-র পাশাপাশি “হুতোমি ভাষা”-র কথা লিখেছেন, টেকচাঁদি ভাষা যে “হুতোমি ভাষার এক পৈঠা উপর”—এই বলে তফাতও করেছেন, কিন্তু রীতির বিচারে দুটিকেই “উচ্চভাষা” থেকে আলাদা করে দেখেছেন। তিনি তাই লেখেন : “যদি সরল প্রচলিত কথাবার্তার ভাষায় তাহা সর্বাঙ্গপেক্ষা সুস্পষ্ট এবং সুন্দর হয়, তবে কেন উচ্চভাষার আশ্রয় লইবে? যদি সে পক্ষে টেকচাঁদি বা হুতোমি ভাষায় সকলের অপেক্ষা কার্য সুসিদ্ধ হয়, তবে তাহাই ব্যবহার করিবে। যদি তদপেক্ষা বিদ্যাসাগর বা ভূদেববাবু প্রদর্শিত সংস্কৃতবল্লভ ভাষায় ভাবের অধিক স্পষ্টতা এবং সৌন্দর্য হয়, তবে সামান্য ভাষা ছাড়িয়া সেই ভাষার আশ্রয় লইবে” (*রচনাসংগ্রহ*, ১ : ১, পৃ. ৪৮৪)।
৬. “আমাদের ভাষা-সংকট” (১৩২৯), *প্রবন্ধসংগ্রহ* ১, পৃ. ৩৩২। পরে অবশ্য প্রথম চৌধুরী বলেছিলেন, “আলালী” ভাষাও ‘আজকাল যে ভাষা সাধু ভাষা বলে গণ্য, সেই ভাষা, ও ভাষার ক্রিয়াপদ দ্বন্দ্বের মত লম্বা, আর তার সর্বনামের বৃকের ভিতর থেকে “হা” বেরিয়ে যায় নি’ (শব্দ, ২৬ আষাঢ় ১৩২৯, পৃ. ২১৪)।
৭. *আলাল* সমেত প্যারীচাঁদের সব রচনার ক্ষেত্রে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত *প্যারীচাঁদ রচনাবলী*র পৃষ্ঠাসংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে।
৮. এই দৃষ্টান্তে ‘গাইতেছেন’ পদটি খেলাল করার মতো। বোধহয় ‘গাইছেন’ (কবিতা) আর ‘গাইতেছেন’ (লিখিত)-এর মাঝামাঝি একটা চেহারা। অবশ্য এটি আঞ্চলিক রূপও হতে পারে, যেমন হয় ‘ঘটতেছে’, ‘উঠতেছে’, আর ‘দেবতেছেন’-এর ক্ষেত্রে। সংলাপে এই রূপগুলি খুবই স্বাভাবিক হতো, কিন্তু বিবরণে বেমানান।
৯. রবীন্দ্রনাথ ও প্রথম চৌধুরী অবশ্য ‘উম’ লেখার পক্ষপাতী ছিলেন না, কিন্তু মাঝে মাঝে লিখে ফেলতেন। প্রথম চৌধুরী বলেছিলেন, “...‘উম’-রূপ বিভক্তিটি অদ্যাবধি কেবলমাত্র কলকাতা শহরে আবদ্ধ, সুতরাং সমগ্র বাংলাদেশে [অর্থাৎ অবিভক্ত পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ] যে সেটি গ্রাহ্য হবে

- সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে...' ("বঙ্গভাষা বনাম বাবু-বাংলা ওরফে সাধুভাষা", প্র. স. ১, পৃ. ৩১৮)।
- ১০ প্যারীচাঁদ রচনাবলী-র ভূমিকা, পৃ. (৩৩)।
- ১১ এ বিষয়ে পবিত্র সরকার ও মুণাল নাথ-এর আলোচনা দ্র।
- ১২ এ সম্বন্ধে, বোধহয় আলমসী ভাষার চাল থেকে কারও কারও মনে হয়েছিল : বইটিতে "কলিকাতার সম্ভ্রান্ত ক্রিয়া ও ইংরাজী-পারসী মিশ্রিত প্রচলিত কথা" বেশি আছে, তাই এভাবে "পন্নীগ্রামে অনায়াসে বোধগম্য হইবে না।" এর উত্তরে *বিবিধার্থ সমগ্র*-র সমালোচক বলেছিলেন : "পরন্তু এই গ্রন্থ কলিকাতার ভাষায় কলিকাতাস্থদিগের শ্রেষ্টে লেখা হইয়াছে ; সুতরাং পন্নীগ্রামে ইহা বোধগম্য না হইলে ক্ষতি নাই" (নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, পৃ. ৬৯১-এ উদ্ধৃত)। শেষ কথাটি খুবই অদ্ভুত। *আলাল* আদৌ "কলিকাতার ভাষা"-য় অর্থাৎ কলকাতাবাসী লেখাপড়া-জানা লোকদের "কথিত ভাষা"-য় লেখা হয় নি। সুশীলকুমার দে-র মতো বিদ্বজ্জনও একই ভুল করেছেন। তাঁর মতে *আলাল*-এ "is given an amusing picture of the society of contemporary Calcutta with a running description of its bazar, police, magistrate's court, a marriage ceremony and its preliminary noisy discussions" (পৃ. ৬০৪)। *আলাল*-এ কলকাতার প্রসঙ্গ খুবই কম—প্রথম কয়েকটি অধ্যায়ের পরে কলকাতার কথা প্রায় আসেই না। কাহিনির ঘটনাস্থল প্রথমে বালি, বৈদ্যবাটি, স্থলি ; তারপরে যশোর ও বারাগসী।
- ১৩ টী. ১০, পৃ. (৩৩)। রাজনারায়ণ বসু ও ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের লেখায় প্রায়ই সাধু-চলিত মিশে যায়—লেখকের অজান্তেই।
- ১৪ সুকুমার সেন, পৃ. ৬৫ ; সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃ. ৮৮।
- ১৫ টেকচাঁদ ঠাকুর, স্ক্রনিয়ার (প্যারীচাঁদের ছেলে, চুনীলাল মিত্র) কটাক্ষ করে বলেছিলেন : "...হুতুম আপনার নজ্ঞাখানিতে আপনার অনেক কথা বলিয়াছেন, তবে লোকালয়ে যে শুলো অত্যন্ত ঘৃণাস্বর তাহাই বলেন নাই। হুতুমের নজ্ঞাখানির রচনা চমৎকার কিন্তু বিশেষ স্মরণ করিয়া পাঠ করিলে মহোদয় টেকচাঁদ ঠাকুরের উচ্ছিষ্ট সংগ্রহই সম্পূর্ণরূপে বলিতে হইবে" (পৃ. ৪-৫)। অকণ নাগও এর সঙ্গে মোটা মুটি একমত। আমার কিন্তু মনে হয় : এ ধরনের গল্প মুখে মুখেই চালু ছিল। টেকচাঁদ ও হুতুম দু জনেই সেগুলো শুনেছিলেন, পরে নিজের নিজের মতো করে লিখেছেন। তার জন্মেই গল্পের পরিণতি সর্বদা এক হয় না। 'প্রতিমের নকল সিদ্ধি' নিয়ে গল্পটিও একই ধরনের (সটীক হুতুম, পৃ. ১০২, টী. ২৮০ দ্র.)।
- ১৬ বাংলা নাটকে কিন্তু মাইকেল মধুসূদনের *শর্মিষ্ঠা* (১২৬৫) থেকেই কলকাতার লেখাপড়া-জানা লোকদের কথিত ভাষায় সংলাপ লেখা চলছিল। সাধু-চলিত বিতর্কের সময় হারীতকৃষ্ণ দেব সে-কথা উল্লেখ করেছেন (পৃ. ৩০)।
- ১৭ রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছিলেন বাংলার সব আ-কারান্ত ধাতু ধরনের দিক থেকে এক নয়। কোথাও শুধু 'আ', কোথাও 'আঁ[হ]। যেমন খা—খাচ্ছেন, চা[হ]—চাইছেন (*বাংলাভাষা-পরিচয়*, র-র, খণ্ড ১০, পৃ. ১০৪৮)।
- ১৮ বঙ্কিমচন্দ্রকেও এই সমস্যা পড়তে হয়েছিল : "কেহ বা তামাকু খাইতেছে, কেহ বা মারামারি করিতেছে, কেহ কেহ ভুজ্জা খাইতেছে। কৃষকে লাঙ্গল চষিতেছে, গোঙ্গ ঠেঙ্গাইতেছে, ..." (*বিষবৃক্ষ*, পরি. ১)। অঙ্গরচন্দ্র সরকার লিখেছেন : "সকলেই জানেন, এই বিষবৃক্ষের তলায় গোঙ্গ ঠেঙ্গাইতে ঠেঙ্গাইতে পাঁচন-বাড়ি হাতে বঙ্গে বঙ্গদর্শনের আবির্ভাব ১৮৭২ সালে" (পৃ. ১৩)। অন্য ক্রিয়ার ক্ষেত্রে যাই করুন, 'ঠেঙ্গানো'র কোন অ-লৌকিক বিকল্প বঙ্কিমচন্দ্র খুঁজে পান নি।

রচনাপঞ্জি

(প্রকাশস্থান না দেওয়া থাকলে কলকাতা বুঝতে হবে)

- অজরচন্দ্র সরকার। *বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা*। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, [১৯৪৯]।
- অরুণ নাগ সম্পা। *সটীক হতেম প্যাঁচার নকশা*। সুবর্ণরেখা, ১৩৯৮।
- নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। *প্যারীচাঁদ মিত্র*। *জীবন ও সমাজচিন্তা*। জয়দুর্গা লাইব্রেরী, ১৯৮৯।
- পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। *চলমান জীবন*। প্রথম পর্ব। ক্যালকাটা বুক ক্লাব, [১৩৫৯]।
- পবিত্র সরকার। “কলকাতাই বুলি”। *কোরক*, শারদীয় ১৪১০।
- প্যারীচাঁদ মিত্র। *প্যারীচাঁদ রচনাবলী*। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পা। মণ্ডল বুক হাউস, ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ।
- প্রথম চৌধুরী। *প্রবন্ধসংগ্রহ*। খণ্ড ১। বিশ্বভারতী, ১৯৫৭।
- “বীরবলের পত্র”। *শব্দ*, ২৬ আষাঢ় ১৩২৯।
- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। *বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ*, গোপাল হালদার সম্পা। সাঙ্করতা প্রকাশন, ১৯৭৩।
- মৃণাল নাথ, “কলকাতার ‘ভাষা’”। *বাঙালির ভাষাচিন্তা*। সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পা। প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০২।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*। খণ্ড ১০। পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৮৯।
- শিবনাথ শাস্ত্রী। *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*। নিউ এজ পাবলিশার্স, ১৯৫৭।
- সুকুমার সেন। *বাঙ্গলা সাহিত্যে গদ্য*। আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৮।
- সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। *বাঙ্গলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা*। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৪।
- হারীজকৃষ্ণ দেব। *সবুজ পাতার ডাক*। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৭।
- Dej Sushil Kumar. *Bengali Literature in the Nineteenth Century*. Firma K.L. Mukhopadhyay, 1962.

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা গদ্য সাহিত্যে চলিত শব্দের ব্যবহার

অনীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা ভাষার দুটো রূপ—সাধু ও চলিত। একথা আমাদের সকলেরই জানা, সাধু বাংলা ভাষার রূপ সাধারণত লিখিত রূপের মধ্যে পাওয়া যায় এবং কথোপকথনের ভাষা হিসেবে চলিত বাংলার রূপই ব্যবহৃত হয়। দীর্ঘকাল থেকে এই নিয়মই চলে আসছে। যদিও আধুনিক বাংলা গদ্য-সাহিত্য সম্পূর্ণ চলিত ভাষাতে লিখিত হচ্ছে। কিন্তু বাংলা গদ্য সাহিত্যের সূচনায় এরকম নীতি প্রচলিত ছিল না বললেই চলে। সেই সময় সংস্কৃত ঘোষা গুরু গভীর সাধু ভাষার প্রয়োগই গদ্য সাহিত্যে দেখা যায়। সাধু ভাষার ব্যবহার ভদ্র সমাজের একটা শিষ্টাচাররূপে গণ্য হোত ; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে বাংলা গদ্য সাহিত্যের সূচনা কাল থেকেই বিভিন্ন লেখকের রচনার মধ্যে সাধু ও চলিত উভয় প্রকার শব্দের প্রয়োগই আমরা লক্ষ্য করি। বর্তমান কালে আমরা যে জাতীয় চলিত শব্দ অহরহ ব্যবহার করছি কখনও কখনও সেই সব শব্দের ব্যবহার তদানীন্তন কালের লেখকের রচনার মধ্যেও পাই। সেই সময় ওই জাতীয় চলিত শব্দের ব্যবহার খুবই অস্বাভাবিক ছিল। অনেক সময় দুজন ব্যক্তির মধ্যে পারস্পরিক কথাবার্তায় অথবা কোনো বিশেষ অঞ্চলের বা ব্যক্তি বিশেষের বক্তব্যের মধ্যে সাধারণ চলিত বা colloquial শব্দের প্রয়োগ পাওয়া গেছে। অনেক সময় উপভাষাগত বৈচিত্র্যও নজরে পড়ার মতো। বর্তমান প্রবন্ধে আমি একটি বাংলা গদ্য সাহিত্য কুপার শাক্সের অর্থভেদ-এর মধ্যে চলিত শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করব। এখানে উল্লেখ্য বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে পোর্টুগিজ সাহেব কর্তৃক রচিত এই গ্রন্থখানির মূল্য অসামান্য। এটিই ছিল প্রথম বাংলা গদ্য সাহিত্য। পোর্টুগিজ পণ্ডিত মানোএল-দা-আসসুস্পসাউ ১৭৪৩ সালে রোমান হরফে এই গ্রন্থখানি প্রকাশ করেন যদিও বইটি লিখিত হয়েছিল এর ৯ বছর পূর্বে ১৭৩৪ সালে। পূর্ববঙ্গের ভাওয়াল শহর থেকে বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৭৪৩ সালে। রোমান হরফ ব্যবহার করায় প্রতিটি বাংলা শব্দ পোর্টুগিজ সাহেবের কাছে কিভাবে উচ্চারিত হোত তা সহজেই অনুধাবন করা যায়। এই গ্রন্থটিকেই বাংলা ভাষার গদ্য সাহিত্যের প্রথম নির্দেশন রূপে গণ্য করা হয়। এর পূর্বে বাংলা ভাষা ছিল মূলত পদ্যমূলক, ছন্দ ও মাত্রা নির্ভর। সেই সময় সাধু বাংলা শব্দের বা সংস্কৃত মূলক তৎসম শব্দের ব্যবহারই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু ওই গ্রন্থখানির ভাষার ছাঁদকে (style) বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এবং বিশেষ করে বাংলা চলিত রীতির (colloquialism) ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে এই গ্রন্থের ভাষা আমাকে আকৃষ্ট করে। তাই বর্তমান নিবন্ধের সূচনা।

মানোএল-দা-আসসুস্পসাউ এর গ্রন্থখানির (কুপার শাক্সের অর্থভেদ) ভাষা বৈশিষ্ট্য

আলোচনা করার পূর্বে আমরা সংক্ষেপে একটু চলিত ভাষা সম্পর্কে বিভিন্ন বৈয়াকরণ ও দার্শনিকের মত আলোচনা করব এবং সেই সঙ্গে সাধু বাংলা ভাষার সঙ্গে চলিত ভাষার মূল পার্থক্য কোন কোন ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় তা নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি।

বাংলা কথ্য ও লিখিত ভাষা নিয়ে প্রথম যিনি সোচ্চার হয়েছিলেন তিনি হলেন উইলিয়াম ইয়েটস্ (১৮৪৭)। তিনি তাঁর *বাংলা ভাষা* নামক গ্রন্থে স্পষ্ট ভাবেই উল্লেখ করেছেন যে, মাতৃভাষীগণ চলিত বাংলা শব্দ বা ভাষা দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কথাবার্তায় ব্যবহার করতেন এবং ভাষার চলিত রূপের মধ্যেই ভাষার প্রকৃত রূপ বা মাদুর্য্য দৃষ্ট হয়। উদাহরণ স্বরূপ তিনি হস্ত হাত; কর্ণ কান প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। তিনি বলেন সংস্কৃত থেকে কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে (modified) বাংলায় শব্দ ব্যবহৃত হয়। এরপর ১৮৭৭ সালে অধ্যাপক শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ও স্বীকার করে নিয়েছেন যে কালক্রমে কথ্যভাষা বা চলিত ভাষাই সাধুভাষার প্রভাবকে ক্ষুণ্ণ করে ভাষার রাজ্যে প্রভাব বিস্তারে জরী হবে। এই বক্তব্যের ঠিক এক বছর পরেই ১৮৭৮ সালে বঙ্গ সাহিত্যের সম্রাটস্বরূপ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর ‘বাংলা ভাষা’ নামক বিখ্যাত প্রবন্ধে সাধু ভাষা ও চলিত ভাষা নিয়ে সুন্দর আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন বস্তুবিষয়ের গভীরতার উপর নির্ভর করে যেমন আমরা শব্দ চয়ন করব, তেমনি লেখকদের নিজস্ব রুচি বা ইচ্ছার উপরও ঋণিকতা নির্ভর করে যে তিনি কি জাতীয় শব্দ ব্যবহার করতে চান। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে সাধারণমানুষকে যদি কোনো বিষয় বোঝাতে হয় তবে চলিত ভাষার শব্দই উপযোগী হবে। তিনি কথ্য ও লেখ্য ভাষার মধ্যে সর্বদাই কিছু পার্থক্য রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। বাংলা গদ্য সাহিত্যের আদি পর্বে সংস্কৃত ঘেঁষা শব্দ, ত্রিরাপদ প্রভৃতির ব্যবহার কিছুটা গৌরবজনক বা সম্মানসূচক ব্যাপার ছিল। এই সময়ে প্যারীচাঁদ মিত্র যিনি ছদ্মনামে টেকচাঁদ ঠাকুর নামে সুপরিচিত ছিলেন তিনি ভীষণভাবে সংস্কৃতমূলক শব্দের ব্যবহারের প্রতিবাদ করেছিলেন। ইংরাজি ভাষার সাহিত্যিক হয়ে তিনি colloquial English language বা চলিত ইংরাজি ভাষার মহিমা উপলব্ধি করেছিলেন। সেজন্য তিনি ১৮৫৮ সালে চলিত বাংলা ভাষায় *আলালের ঘরের দুলাল* নামক গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই চলিত ভাষাকেই ‘অপর ভাষা’ নামে অভিহিত করেছেন। সংস্কৃত পণ্ডিতদের কাছে চলিত ভাষা একটু নীচু স্তরের ভাষা বলে বিবেচিত হত। সেই সময় সংস্কৃত ঘেঁষা বাংলা ভাষা (যাকে সাধুভাষা বলা হয়) এবং চলিত ভাষার মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছিল; যদিও তৎকালীন বিশিষ্ট লেখকদের অনেককেই চলিত শব্দ ব্যবহারের উপকারিতার কথা স্বীকার করেছেন। যদি কথ্য বা চলিত ভাষার মধ্যে উপযুক্ত শব্দ পাওয়া যায় তবে সংস্কৃতমূলক কঠিন শব্দ ব্যবহার না করারই পরামর্শ দিয়েছেন সকলে। ভাষার সাবলীলতা ও বিষয়ের মাদুর্য্যই হল শেষ কথা। এই দুটো দিকে লক্ষ্য রেখে যতটা সম্ভব সহজ সরল ব্যবহার করতে হবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯০৯ সালে প্রকাশিত *শব্দতত্ত্ব* গ্রন্থে বাংলা ভাষার এই দু’রকম রূপভেদকে রূপকথার গল্পের সুয়োরাণি ও দুয়োরাণির সঙ্গে তুলনা করেছেন। দুয়োরাণির মতো চলিত বাংলা ভাষা প্রথমে উপেক্ষিত হলেও কালক্রমে যে এই ভাষাই জরী হবে এবং সাহিত্যে ব্যবহারের উপযোগী হয়ে উঠবে তা তিনি সেই সময়ই স্বীকার করেছিলেন। তিনি চলিত বাংলা ভাষাকে *প্রাকৃত বাংলা* বলেছেন। পরবর্তীকালে প্রমথ চৌধুরী, রাজশেখর বসু, ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকেই চলিত রীতি ব্যবহারকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। যাইহোক, এই স্বল্প পরিসরে বিশদভাবে আলোচনা করার অবকাশ নেই, সাধু ভাষার সঙ্গে চলিত ভাষার কোথায়

কোথায় বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় তা সংক্ষেপে নীচে আলোচনা করা হল। যার ফলে আমরা অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত প্রথম বাংলা গদ্য সাহিত্য *কৃপার শাস্ত্রে অর্থভেদ* গ্রন্থখানি কতখানি চলিত বাংলা শব্দের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল তা সহজেই বুঝতে পারব।

সাধু ভাষার সঙ্গে চলিত ভাষার প্রথম পার্থক্য নজরে পড়ে শব্দের উচ্চারণের মধ্যে। কিছু কিছু বাংলা শব্দের লিখিত রূপ ও উচ্চারণের মধ্যে বৈষম্য দেখা যায়। যেমন ‘আপনার’ শব্দটি, উচ্চারিত হয় আপন্নার হিসেবে। এ রকম বহু শব্দই আছে যেখানে লেখার সঙ্গে উচ্চারণের অনেক পার্থক্য দেখা যায়। স্বরসঙ্গতি বা স্বরধ্বনির গুণগত পরিবর্তনও চলিত ভাষার আরেকটি বৈশিষ্ট্য। যেমন সাধু ভাষার ‘দেশি’, ‘জাতে’, ‘মূলা’ প্রভৃতি শব্দ কথ্য বা চলিত রূপে অনেক সময় ‘দিশি’, ‘জেতে’, ‘মূলো’ প্রভৃতি রূপে উচ্চারিত হয়। তাছাড়া দ্বিমাত্রিকতা, সমীভবন অভিপ্রাতিজাত ধ্বনি পরিবর্তন, স্বরভঙ্গি বা বিপ্রকর্ষ, বর্ণ বিপর্যাস ইত্যাদি প্রক্রিয়াগুলি চলিত বাংলা শব্দের মধ্যেই পাওয়া যায়। যেমন করিতেছে > করছে > কচ্ছে; করিয়া > কইয়া > কোরে; করিল > করল > কোল; জন্ম > জনম ইত্যাদি। সর্বোপরি সাধু ভাষার সঙ্গে চলিত ভাষার প্রধান পার্থক্য ধরা পড়ে ক্রিয়াপদ ও সর্বনামের রূপের মধ্যে। সাধু ভাষায় সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের পূর্ণরূপ ব্যবহৃত হলেও চলিত ভাষায় সেগুলোর সংক্ষিপ্ত রূপই দেখা যায়। যেমন তাহাদের > তাদের; আমাদের > খাইতেছিলাম > খাচ্ছিলাম; যাইব > যাব ইত্যাদি।

যাইহোক, উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে অন্ততঃ এটুকু স্পষ্ট যে বাংলা সাহিত্যে চলিত শব্দের ব্যবহার বা যাকে আমরা ইংরেজীতে colloquialism বলি, সেটি হঠাৎ করে বা অল্প সময়ের মধ্যে বাংলা ভাষায় স্থান করে নেয় নি। চলিত শব্দ ব্যবহারের পশ্চাতে একটা সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকেও বাংলা ভাষা বা বাংলা সাহিত্য যখন পুরোপুরিই সংস্কৃতানুগ ছিল; সংস্কৃত পদবিধি, সংস্কৃত শব্দ, প্রভৃতির ব্যবহারই যখন স্বাভাবিক ছিল; সেই সময়ের বহু পূর্বে একজন ইউরোপীয় পণ্ডিতের লেখা *কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ* নামক গ্রন্থের মধ্যে চলিত শব্দের ব্যবহার খুবই অস্বাভাবিক ছিল। মূলতঃ এই কারণেই রোমান হরফে লেখা এই গ্রন্থখানির ভাষাতাত্ত্বিক গুরুত্ব যথেষ্ট। এই গ্রন্থখানির ভাষার রূপ এবং ব্যবহৃত শব্দের প্রতি আকর্ষণই বর্তমান প্রবন্ধের সূচনা।

আমরা জানি কলকাতা তথা রাঢ়ী বাংলা ভাষার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল অধিকাংশ ক্ষেত্রে অ-কারের ও-কারে উচ্চারণ, এই জাতীয় ধ্বনি পরিবর্তন ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে লিখিত *কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ*-এর মধ্যেও পাওয়া যায় যেমন— opurbo (অপূর্ব), ononto (অনন্ত), odhom (অধম), ognı (অগ্নি), baloq (বালক), andhocar (অন্ধকার), ostro (অস্ত্র), ongxā (অংশ), katha (কথা), mondo (মন্দ) ইত্যাদি। মানোএল রোমান হরফ ব্যবহার করেছেন এবং তার ফলে প্রতিটি শব্দের ঠিক যে রকম উচ্চারণ শুনেছেন ঠিক সেইরকম ভাবেই প্রকাশ করেছেন। এই সমস্ত উদাহরণ থেকে খুব সহজেই অ-কারের ও-কারবৎ উচ্চারণ বুঝতে পারা যায়। পরবর্তীকালে যে সমস্ত বাংলা গদ্য সাহিত্য রচিত হয়েছিল সেগুলোতেও প্রতিফলিত হয়েছে। যদিও এই সময় রচনা সবই বাংলা হরফে লিখিত হওয়ায় *কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ*-এর মতো অত স্পষ্টভাবে অ-কারের ও-কার উচ্চারণ বোঝা যায় না। কেন্দ্রীয় *কথোপকথন*, রামরাম বসুর *রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র*, প্রভৃতি সব গ্রন্থেই আমরা এই জাতীয় ধ্বনি পরিবর্তন লক্ষ্য করি। অর্থাৎ একবিংশ শতাব্দীতে আদর্শ চলিত বাংলা ভাষার উচ্চারণের ধারা অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই

মানোএল তা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। ২৫০ বছর পূর্বেই কথ্য ভাষার শব্দ তিনি সাহিত্যে প্রয়োগ করেছেন।

বাংলা অ-কার অনেক সময় পশ্চাৎ উচ্চ সংবৃত্ত স্বরধ্বনি উ-তে পরিণত হয়। উদাহরণ হিসেবে মানোএল দিয়েছেন pasu (পশু), xuhore (সহরে); অ-স্বরধ্বনির এরূপ গুণগত পরিবর্তনের পশ্চাতে কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে এই ধ্বনিটির পূর্বে বা পরে ও বা উ থাকলে অ-কার উ-কারে পরিণত হয়। যখন পরবর্তী স্বরটি ‘ও’ হয় তখন এর হ্রস্বরূপ ‘উ’ পাওয়া যায়। যেমন xuhore; কিন্তু পরবর্তী স্বর যখন উ’ হয় তখন স্বরসঙ্গতি ঘটে। যেমন puxu. মানোএল তাঁর গ্রন্থখানি পূর্ববঙ্গের ভাওয়াল প্রদেশ থেকে প্রকাশ করেন। কাজেই পূর্ববঙ্গের ভাষার প্রভাব থাকা স্বাভাবিক। অনেক ক্ষেত্রেই পূর্ববঙ্গের ভাষার রূপ কলকাতার চলিত বাংলা ভাষায় স্থান করে নিয়েছে। মানোএল তাঁর কৃপার শাস্ত্রে অর্থ ভেদ-এ অ-কার-উচ্চারণ বোঝাতে কোথাও কোথাও এ-কারও ব্যবহার করেছেন। যেমন বাংলা ‘সুন্দর’ শব্দটি তিনি xonder লিখেছেন। একইভাবে qherte (ক্ষেত্র), opurbe (অপূর্ব) প্রভৃতি উদাহরণও দিয়েছেন। এই সমস্ত ক্ষেত্রে যদিও স্পষ্ট করে কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় অ-এর পূর্ববর্তী বা পরবর্তী যুক্ত ব্যঞ্জন এইরকম পরিবর্তনের জন্য অনেকটা দায়ী হয়। আবার অনেক সময় ‘ই’ বা ‘য়’ ধ্বনির প্রভাবেও অ-কারের এইরূপ পরিবর্তন হয়ে থাকে।

কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ-এ অ-কারের ন্যায় আরেকটি অতি সঞ্চরণশীল স্বর হল ‘ঋ’। আধুনিক চলিত বাংলা ভাষায় এটি ‘রি’ (ri) রূপে উচ্চারিত হয়। মানোএল এই স্বরধ্বনিটির ‘ইর’ বা ‘এর’ রূপে উচ্চারণকেই স্বীকার করেছেন। আমরা জানি যদিও মূল সংস্কৃত ভাষায় বা ঋক্বেদে এই স্বরটির উচ্চারণ স্থান ছিল কণ্ঠ বা velum. কিন্তু মধ্যভারতীয় আর্যভাষার যুগেই এই স্বরটি অ, ই, উ প্রভৃতি স্বরে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। সেই সময়ই এই স্বরধ্বনিটি কখনও কখনও ‘রি’ রূপেও উচ্চারিত হোত। আধুনিক বাংলায় এই উচ্চারণ রীতিই প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু মানোএলের গ্রন্থে আমরা যেসব বাংলা শব্দে ‘ঋ’ পাই সেখানে এটি ‘ইর’ বা ‘এর’ রূপে উচ্চারিত হয়েছে। যেমন—crepa (কৃপা), omerto (অমৃত), ghirna (ঘণা), mirtica (মৃত্তিকা), pirthibi (পৃথিবী) ইত্যাদি।

চলিত বাংলা ভাষায় ‘ঐ’ এবং ‘ঔ’ এই দুটি দ্বিস্বর ‘ওই’ এবং ‘ওউ’ রূপে উচ্চারিত হয়, যা আজ থেকে ২৫০ বছর পূর্বে লিখিত মানোএলের গ্রন্থে পাওয়া যায়। তিনি বাংলা ‘নৈরাকার’ এবং বৈকুণ্ঠে’ শব্দদুটি noiracar এবং boikonthে রূপে প্রকাশ করেছেন। একইরকম ভাবে choudo (চৌদ্দ), choqui (চৌকি) প্রভৃতি দিয়েছেন। এই সব উদাহরণ থেকে বোঝা যায় আধুনিক যুগের চলিত বাংলার উচ্চারণরীতিকে তিনি তাঁর গ্রন্থে অনেকখানিই প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। আজ থেকে কয়েক শ’ বছর পূর্বে এবং সর্বোপরি পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণরীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েও তিনি কিরূপে এই ধরনের উচ্চারণ বজায় রাখতে পেরেছিলেন, তা আমাদের কাছে যথেষ্ট বিস্ময় সৃষ্টি করে।

কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ-এ আমরা এমন কিছু কিছু শব্দের প্রয়োগ পাই যা চলিত বাংলা ভাষার নিজস্ব সম্পদ। মানোএল নির্দিষ্টায় ঐ সকল শব্দের উচ্চারণ রোমান হরফে প্রকাশ করেছেন। তিনি বাংলা ‘নিষ্ঠুর’ শব্দটি nitthur রূপে প্রকাশ করেছেন। এখানে উল্লেখ্য যে যেহেতু মানোএল তাঁর গ্রন্থে কোনো diacritical mark ব্যবহার করেন নি, তিনি মূর্খণ্য ধ্বনি বোঝাতে

দন্ত্য ধ্বনির দ্বিত্ব প্রয়োগ করেছেন। অর্থাৎ মূর্ধ্য ধ্বনির কর্কশতা বা শব্দ ভাব বোঝাতেই সম্ভবত তিনি এই বিশেষ প্রয়োগ করেছেন। আগেই বলা হয়েছে মানোএল তাঁর গ্রন্থ প্রণয়নকালে লাতিন বর্ণমালা দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হয়েছিলেন। লাতিন বা পোর্চুগীজ ভাষায় মূর্ধ্য ধ্বনি ট (t)-কে দন্ত্যধ্বনি ত (t) দ্বারাই প্রকাশ করা হয়। মানোএল কি ত (t) ধ্বনির মূর্ধ্য উচ্চারণটি ইংরাজি ভাষা থেকে গ্রহণ করেছিলেন, তবে সম্ভবত বাংলা ‘ত’ (t) থেকে ‘ট’ (t) -এর উচ্চারণকে পৃথক করবার জন্যই তিনি ‘ট’ (t) বোঝাতে দুটো ‘t’ ব্যবহার করেছেন। ‘ট’ (t) -এর উচ্চারণে যে একুট বেশি জোর লাগে (extra effort) দন্ত্য ধ্বনির উচ্চারণের তুলনায়, সেই কারণেই হয়ত এইরকম চিহ্ন ব্যবহার করেছেন। একই রকমভাবে ‘ড’ (d) বোঝাতে তিনি ‘d d’ এবং ‘ঠ’ (th) বোঝাতে ‘tth’ দিয়েছেন। এ বিষয়ে মানোএলের উদাহরণ—drixiti (দৃষ্টি), chutthi (কুঠি), ddor (ডর) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

সমীভবন বা assimilation যা চলিত বাংলা ভাষার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য মানোএলের গ্রন্থেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বাংলা ‘একত্র’ শব্দটিকে ekattar হিসেবে প্রকাশ করে এই জাতীয় পরিবর্তনের প্রাচীনত্ব রক্ষা করেছেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে সমীভবন ভারতীয় আর্যভাষার একটি প্রাচীন বৈশিষ্ট্য। ভারতীয় আর্য-ভাষার মধ্যস্তর বা মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষাতেই আমরা দেখি প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার বিষম সংযুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলি একরূপ লাভ করে। পালি ভাষায় ধর্ম শব্দটি ‘ধম্ম’, কর্ম শব্দটি ‘কম্ম’ হয়েছে। পালি হচ্ছে মধ্য যুগের প্রথম স্তরের ভাষা। মধ্য ভারতীয় আর্য-ভাষার দ্বিতীয় স্তরে যখন সাহিত্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষা জন্ম নিল তখনও আমরা এই বৈশিষ্ট্যের ব্যবহার পাই। সে সময় কয়েকটি বিশেষ প্রয়োগ ছাড়া প্রায় সকল প্রকার বিষম ব্যঞ্জনধ্বনিই সমীভূত রূপ লাভ করেছে। প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার বিষম যুক্ত ব্যঞ্জন -kt-, -pt- ইত্যাদি মধ্য ভারতীয় আর্যে -t t- হয়েছে। যেমন—ভক্ত > ভস্ত ; লিপ্ত > লিস্ত ; তবে এখানে উল্লেখ্য যে শব্দের প্রারম্ভে এই জাতীয় যুগ্ম ব্যঞ্জন ধ্বনি থাকলে সেক্ষেত্রে কিন্তু সমীভবনের পরিবর্তে মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষায় যুগ্ম ব্যঞ্জনের মধ্যে একটি লোপ পায় অথবা উভয়ের মাঝে একটি স্বরধ্বনি প্রবেশ ঘটে। যেমন—ত্রিণী > তিন্নি ; দ্বাদশ > দুবাদস ইত্যাদি। মানোএলের গ্রন্থে যে কয়েকটি বাংলা শব্দের সমীভূত রূপ পাওয়া গেছে তার থেকে চলিত বাংলা ভাষাকে সাধু বাংলা ভাষার থেকে আলাদা করা যায়; কারণ সাধু বাংলা ভাষার মূল সম্পদ হল সংস্কৃত মূলক শব্দ (তৎসম) বা অর্ধতৎসম শব্দ। আজকের দিনে চলিত বাংলা ভাষায় আমরা ‘রথ + তলা’ শব্দটিকে রততলা, সরছে সন্দটিকে ‘সচ্ছে’, ‘মারছেন’ শব্দটিকে ‘মাচ্ছেন’ প্রভৃতি রূপে যে উচ্চারণ করি, তা কয়েকশ বছর পূর্বে একজন বিদেশির লেখা প্রথম বাংলা গদ্য সাহিত্যে সেই জাতীয় শব্দের প্রয়োগ পাই, যার ঐতিহাসিক মূল্যই আলাদা। সে সময় বাংলা ভাষা ছিল মূলত সংস্কৃতের বেড়াজালে আবদ্ধ। পরবর্তী কালে এই সমীভবন চলিত বাংলা ভাষার একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

শব্দমধ্যে ধ্বনির স্থান পরিবর্তনও চলিত বাংলা ভাষার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য, যাকে ইংরাজিতে বলে metathesis এবং বাংলায় বলে বর্ণ বিপর্যাস। দ্রুত উচ্চারণের কারণেই ধ্বনির এরূপ স্থান পরিবর্তন হয়ে থাকে। কিন্তু এর ফলে শব্দের অর্থের কোনো পরিবর্তন হয় না। বাংলা ভাষার এই বৈশিষ্ট্যটিও এসেছে প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা থেকে যখন ‘গৃহ’ শব্দটি আধুনিক বাংলা ভাষায় ‘ঘর’ হয়। মধ্য বাংলার যুগেও এই জাতীয় পরিবর্তনের প্রমাণ মেলে। যেমন

সংস্কৃত 'পরিধা' > ম বাংলা পহির; সংস্কৃতকচটা > ম বাংলা চটকা' ইত্যাদি। যাইহোক আজকের দিনে চলিত বাংলা ভাষায় যে বর্ণবিপর্যয় একটি অত্যন্ত প্রচলিত বৈশিষ্ট্য বলে পরিচিত, আজ থেকে ২৫০বা ৩০০ বছর পূর্বে মনোএল তাঁর গ্রন্থে সেটিকে কিভাবে প্রকাশ করেছেন তা নীচের উদাহরণ থেকেই স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়। যেমন cord (ক্রেণ্ড), qhete (ক্ষেত্র), pichaxr (পিশাচ), motuq (মুকুট) ইত্যাদি।

আধুনিক চলিত বাংলা ভাষার অপর এক প্রধান বৈশিষ্ট্য হল স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ। বিদেশী এবং তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের মধ্যেই সাধারণতঃ এই জাতীয় ধ্বনি পরিবর্তন দেখা যায়। শব্দের মধ্যে অবস্থিত বিষম যুগ্ম ব্যঞ্জননের উচ্চারণকে সরলীকরণ করাকেই বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি বলে। এক্ষেত্রে একটি স্বরধ্বনির অনুপ্রবেশই ঐ যুগ্ম ব্যঞ্জননের উচ্চারণের কাঠিন্যকে লঘু করে দেয়। সাধারণত কাব্যের ভাষায় বা গ্রাম্য লোকের উচ্চারণে এই জাতীয় ধ্বনি পরিবর্তন ঘটে থাকে। ছন্দের প্রয়োজনেও অনেক সময় এই জাতীয় শব্দপ্রয়োগ হয়ে থাকে। গদ্য সাহিত্যে স্বরভক্তিজন্য ধ্বনিপরিবর্তন সাধারণত দেখা যায় না। তবে আজ থেকে ২৫০ বছর পূর্বে লিখিত কুপার শাস্ত্রের অর্থডেড-এ ব্যবহৃত বাংলা ভাষার মধ্যে থেকে চলিত শব্দের প্রয়োগ খুঁজতে গিয়ে এই জাতীয় কয়েকটি উদাহরণ পাওয়া যায়। যেমন—মনোএল 'লোক' শব্দটিকে 'Xoloq', 'দর্শন' শব্দকে 'doroxon', 'মূর্খ' শব্দকে 'murugh' রূপে প্রকাশ করেছেন। চলিত বাংলায় এমন কিছু কিছু শব্দ আছে সেগুলোর তৎসম রূপ ও চলিত রূপ উভয়ই ব্যবহৃত হয়। যেমন—'পুতুর'—এবং 'পুত্র' ; 'ভুরু' এবং 'ভূ' ইত্যাদি। আরও কয়েকশ বছর পিছনে ফিরলে দেখা যায় বৈদিক সংস্কৃত ভাষাতেও এরকম কয়েকটি প্রয়োগ রয়েছে। এখানে 'ইন্দ্র' শব্দটি 'ইন্দর' হয়েছে। পরবর্তীকালে মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষায় সংস্কৃত সংযুক্ত ব্যঞ্জননের মধ্যে অ, ই, উ—এর অনুপ্রবেশ তো প্রায় একটা স্বাভাবিক নিয়ম ছিল। যেমন-সংস্কৃত 'অগ্নি' > অর্ধ মাগধী-অগণি, সংস্কৃত 'আশ্চর্য' > অর্ধ মাগধী 'আয়রিয়', সংস্কৃত সর্বপ' > মধ্য ভারতীয় আর্য 'সরিসব'; তদ্ভব রূপ 'সাসব' পাওয়াই যায় না। তাছাড়া সংস্কৃত 'পদ্ম' > মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষায় 'পদুম' হয়েছে। সুতরাং উপরের আলোচনা থেকে অন্তত এটুকু পরিষ্কার সে সংস্কৃত, প্রাকৃত বা মধ্যভারতীয় আর্য ভাষার মধ্যে দিয়ে আধুনিক যুগে বাংলা ভাষার মধ্যে এই জাতীয় পরিবর্তন একটা নিজস্ব জায়গা করে নিয়েছে। সংস্কৃত ভাষায় এই জাতীয় পরিবর্তন খুব একটা বেশি পাওয়া না গেলেও মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার স্তরে এর প্রচুর প্রমাণ মেলে। সংস্কৃত ভাষা সর্বদাই ব্যাকরণের নিয়ম মেনে চলার পক্ষপাতী, এখানে নিয়মের শিথিলতা সাধারণত গ্রাহ্য হয় না। এখানে উল্লেখ্য যে স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষজন্য স্বরধ্বনিটি সাধারণত স্পর্শ ধ্বনি ও নাসিক্যধ্বনি/তরল ধ্বনি নিয়ে গঠিত যুক্ত ব্যঞ্জননের মাঝে উচ্চারিত হয় অথবা শিস্ ধ্বনি এবং একটি ব্যঞ্জননের মধ্যে আসে। আজকের দিনে বাংলা ভাষায় আমরা যে ধরনের স্বরভক্তি জাত পরিবর্তন পাই তা বহু পূর্বেই মানোএলের লেখার মধ্যে পাওয়া গেছে।

চলিত বাংলা ভাষার অপর এক প্রধান বৈশিষ্ট্য হল অপিনিহিতি, যা প্রধানতঃ পূর্ববঙ্গের চলিত ভাষায় পাওয়া যায়। এদিক থেকে বাংলা ভাষা অন্যান্য নব্য ভারতীয় আর্য ভাষা থেকে অনেকটা আলাদা। অপিনিহিতি পূর্ব মগধীয় শাখার ভাষাগুলোর একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। অন্যান্য নব্য ভারতীয় আর্য-ভাষায় পাওয়া যায় না। এখানে উল্লেখ্য যে মনোএল তাঁর গ্রন্থটি পূর্ববঙ্গের ভাওয়াল শহর থেকে প্রকাশ করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের উপভাষায় অপিনিহিতি জাত ধ্বনি পরিবর্তন

পাওয়া না গেলেও পূর্ববঙ্গের উপভাষায় ইহা একটি প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। অপিনিহিতকে মধ্য স্বরাগমও বলা হয়ে থাকে। অপিনিহিত স্বর হিসেবে ই বা-উ-কেই চিহ্নিত করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের উপভাষায় এই অপিনিহিত স্বর কখনও কখনও লুপ্ত হয় আবার কখনও কখনও ভিন্নভাবে পরিবর্তিতও হয়। যেমন আলিপনা > আইলপনা (অপিনিহিত) > আলপনা ; চারি > চাইর > চার ; থাকিতে > থাইকতে > থাকতে ইত্যাদি। কিন্তু পূর্ববঙ্গের উপভাষায় অপিনিহিত স্বরধ্বনিটি পূর্ব স্বরের সঙ্গে মিশে দ্বিস্বর তৈরী করে। মধ্য বাংলার সময়কাল থেকেই আমরা দেখি অপিনিহিত স্বর পূর্ববর্তী অ/আ-এর সঙ্গে মিশে একটি দ্বিস্বর তৈরী করে। এখানেই অপিনিহিতিকে অনেকে বর্ণবিপর্যয়ের সঙ্গে তুলনা করেছেন। যেমন কালি > কাইল ; সাধু > সাউধ। আধুনিক যুগে কিছু কিছু তৎসম শব্দের মধ্যেও অপিনিহিত স্বরের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন-অদ্য > অইদ ; লক্ষ > লইকখ ইত্যাদি। তবে এই জাতীয় পরিবর্তনের বীজ নিহিত রয়েছে ১৫শ অঙ্গে রচিত কৃত্তিবাসের রামায়ণে ও বিজয়গুপ্তের কাব্যের মধ্যে। আধুনিক বাংলা ভাষা এই বৈশিষ্ট্যটি মধ্য বাংলা থেকে গ্রহণ করেছে। সেই সময় বাংলা ভাষা ছিল মূলত পদ্যমূলক। গদ্য সাহিত্যের মধ্যে একমাত্র মানোএলই সর্বপ্রথম আজ থেকে প্রায় ২৫০/৩০০ বছর পূর্বে অপিনিহিতের উল্লেখ করেছেন। মানোএলের *কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ*-এ ‘ই’ এবং ‘উ’ দু ধরনের অপিনিহিতের ব্যবহারই লক্ষ্য করা যায়। যেমন raitre = (রাত্রে), moidhe = (মধ্যে), aixo = (এসো), carzio = (কার্য) chouq = (চোক) ddacait = (ডাকাত) ইত্যাদি। এই সমস্ত উদাহরণ থেকে এটা স্পষ্ট যে আজকের দিনে চলিত বাংলা ভাষায় (বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের উপভাষায়) সে অপিনিহিত স্বরের প্রয়োগ পাওয়া যায় তার বীজ বহু পূর্বেই বাংলা ভাষার মধ্যে ছিল।

চলিত বাংলা ভাষায় অনেক সময় ঘোষ ধ্বনি অঘোষরূপে উচ্চারিত হয় অথবা বিপরীতক্রমে অঘোষ ধ্বনি ঘোষ রূপে উচ্চারিত হয়। একইরকমভাবে মহাপ্রাণ এবং অল্পপ্রাণধ্বনি সকলের মধ্যেও পারস্পরিক পরিবর্তন বা interchange হয়ে থাকে। এই সব পরিবর্তনকে আমরা অঘোষীভবন / ঘোষীভবন এবং মহাপ্রাণীভবন বা অল্পপ্রাণীভবন বলে থাকি। আজকের দিনে বাংলা ভাষার মধ্যে এই জাতীয় ধ্বনি পরিবর্তন খুব স্বাভাবিক বলে মনে হলেও অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে এই জাতীয় পরিবর্তন খুব স্বাভাবিক ছিল না। আজ থেকে ২৫০ বছর পূর্বে এই জাতীয় ধ্বনি পরিবর্তন মূলক শব্দের প্রয়োগ ঘটিয়ে মানোএল বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। রোমান হরফ ব্যবহারের দিক থেকে বহুল পরিমাণে পোর্্তুগিজ এবং লাতিন ভাষার বর্ণমালার দ্বারা প্রভাবিত হলেও তিনি যথাসাধ্য উচ্চারণ অনুযায়ী বাংলা শব্দগুলির প্রতিবর্ণীকরণ করেছেন। সমগ্র গ্রন্থেই তিনি উচ্চারণরীতির উপরেই জোর দিয়েছেন। ঘোষীভবনের ক্ষেত্রে তিনি শব্দমধ্যস্থ -ক-এর -গ- তে রূপান্তর দেখিয়েছেন। যেমন dige = (দিকে), thague = (থাকে) ; তাছাড়া দন্তীয় ‘স’ ধ্বনি অনেক সময় জ় (ঘৃষ্ট রূপে উচ্চারিত) তে পরিণত হয়েছে, যা পূর্ববঙ্গের উপভাষার উচ্চারণের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। মানোএল ও স্বাভাবিকভাবে সেই প্রভাব মুক্ত হতে পারেন নি। তিনি ‘কালিপূজা’ শব্দটিকে ‘xalifuz’a’ রূপে প্রকাশ করেছেন। আসলে অঘোষধ্বনির ঘোষবৎ উচ্চারণের পেছনে একটা ছোটো ইতিহাস আছে। বাংলা ভাষা মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা থেকে এই বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করেছে। মধ্য ভারতীয় আর্যভাষায় স্বরমধ্যগত -থ- অনেক সময় শৌরসেনী উপভাষায় -ধ- হয়েছে এবং একই রকম ভাবে -ট-, -ঠ- যথাক্রমে -ড- এবং -ঢ- হয়েছে। যেমন সংস্কৃত ‘যথা’ > মধ্য ভারতীয় আর্য

(শৌরসেনী) ‘জ্জধা’, সংস্কৃত ‘পঠন’ > মধ্য ভারতীয় আর্য (শৌরসেনী) ‘পডন’, ; সংস্কৃত পট > মধ্যভারতীয় আর্য (শৌরসেনী) ‘পড’ হয়েছে।

বর্গের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণ যখন দ্বিতীয় ও চতুর্থরূপে উচ্চারিত হয় তখন তাকে মহাপ্রাণীভবন বলে। বাংলার এরকম পরিবর্তন চলিত ভাষায় প্রায়ই দেখা যায় এবং অনেকসময় মহাপ্রাণ ধ্বনির ক্ষেত্রে অল্পপ্রাণ ধ্বনির ব্যবহার গোটা শব্দটির মূল অর্থকেই পরিবর্তন করে দেয়। যেমন তালা : খালা, খাল : গাল ইত্যাদি। এক্ষেত্রেও মধ্যভারতীয় আর্যভাষাই উৎস; প্রকৃত ভারতীয় আর্য ভাষায় ‘প্রথম’ শব্দটি ‘প্রথম’ হলেও মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার স্তর থেকেই আমরা প্রথম মহাপ্রাণীভবনের প্রয়োগ পাই। যেমন সংস্কৃত ‘কপর’ প্রথমকে ‘কপর’ এবং পরে মধ্য ভারতীয় আর্যে ‘খপর’ হয়। এটিই কালক্রমে নব্য ভারতীয় আর্যভাষায় ‘খাপ-রা’ (sherd) হয়েছে। সুতরাং আজকের বাংলা ভাষায় আমরা মহাপ্রাণী ভবন বা অল্প প্রাণীভবন জাতীয় যে পরিবর্তন পাচ্ছি তা মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার সময়ে জন্ম নিয়েছে। পরবর্তীকালে এরকম আরও উদাহরণ পাওয়া যায়। যেমন সংস্কৃত ‘কঙ্ক’ > মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষায় ‘খঙ্ক’ এবং বাংলায় *খাঁধ, কাঁধ। মানোএল তাঁর গ্রন্থে শব্দের আদিতে এবং স্বরমধ্যগত অবস্থানে অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি গুলিকে মহাপ্রাণরূপে প্রয়োগ করেছেন। এবং কখনও কখনও অল্পপ্রাণ ঘোষ স্পর্শ গুলিকেও মহাপ্রাণরূপে ব্যবহার করেছেন। যেমন— ohonqhar (অহংকার), buqhe (বুকে), char (চড়), aghe (আগে), chax (চাখ), chouq (চোক), bichar (বিচার), ochina (অচেনা), ghuchauq (ঘুচাউক), nixthar (নিস্তার), tomate (তোমাতে), bonethe (বনেতে), proti (প্রতি), roidhe (রোদে), bidhae (বিদায়), bhuzite (বুজিতে) ইত্যাদি। মানোএলের গ্রন্থে আমরা এমন কিছু কিছু উদাহরণ পাই যেখানে মহাপ্রাণীভবনের সাথে সাথে বর্ণ বিপর্যয়ও ঘটেছে। যেমন— bathar (ভাতার), ath (হাত), bhode (বোধে) bibhao (বিবাহ), totacho (তথচ), ইত্যাদি। আবার কয়েকটি ক্ষেত্রে শর্তসাপেক্ষ মহাপ্রাণীভবনের উদাহরণও পাওয়া যায়। শর্ত হিসেবে দেখা গেছে একটি স্বরমধ্যগত স্পর্শধ্বনির পূর্বে (কখনও পরে) যদি একটি নাসিক্য ধ্বনি থাকে, সেক্ষেত্রে স্পর্শ ধ্বনিটি মহাপ্রাণরূপে উচ্চারিত হয়। যেমন bondhi> (বন্দি), Xondhuqher> (সিন্দুকের)। চলিত বাংলা ভাষার এই বৈশিষ্ট্য প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষাতেও লক্ষ্য করা যায় যেখানে সংযুক্ত ব্যঞ্জন -ষ- > -স্ত- রূপে উচ্চারিত হয়। পরবর্তী স্তরে প্রাচীন ভারতীয় আর্যের ‘জাস্বীর’ শব্দটি ‘জাস্তির’ রূপে পরিবর্তিত হয়েছে। সুতরাং মানোএল তাঁর *কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ*-এ যে সমস্ত বাংলা শব্দের মহাপ্রাণীভবন বা শর্তসাপেক্ষ মহা প্রাণীভবনের উদাহরণ দিয়েছেন সেগুলোর পেছনে একটা সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে।

মহাপ্রাণীভবনের বিপরীত প্রক্রিয়া হল অল্পপ্রাণীভবন। চলিত বাংলা ভাষায় মহাপ্রাণ ধ্বনির অল্পপ্রাণরূপে উচ্চারণ একটি অত্যন্ত প্রচলিত বৈশিষ্ট্য। বাংলা ভাষার ইতিহাসে খ্রিস্টীয় ১৫ শ অব্দে মধ্য বাংলার যুগে সর্বপ্রথম বাংলা সাহিত্যে এই অল্প প্রাণীভবনের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যদিও তারও পূর্বে মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার স্তরেও কিছু কিছু প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার মহাপ্রাণ ধ্বনি অল্পপ্রাণ রূপে উচ্চারিত হয়েছিল। যেমন প্রাচীন ভারতীয় আর্যের ‘শৃঙ্খলা’ শব্দটি শৌরসেনী এবং অর্ধমাগধী প্রাকৃত ভাষায় ‘স্নকলা’ হয়। সেই সময় থেকেই শব্দের শেষের ‘হ’ (h) যুক্ত মহাপ্রাণধ্বনির অল্পপ্রাণরূপে উচ্চারিত হবার একটা প্রবণতা দেখা দিতে শুরু করেছিল। যার প্রভাব হিসেবে আমরা অধুনিক চলিত বাংলা ভাষায় শব্দের শেষে অবস্থিত মহাপ্রাণধ্বনিগুলি

অল্পপ্রাণরূপে উচ্চারিত হতে দেখি। যেমন মাছ > মাচ, বাঘ > বাগ ইত্যাদি। এই সমস্ত শব্দের ক্ষেত্রে লিখিত রূপে মহাপ্রাণক্ষনি রক্ষিত হলেও উচ্চারণে তার মহাপ্রাণতা লোপ পেয়েছে। ১৭৪৩ সালে প্রকাশিত *কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ*-এর মধ্যেও এই জাতীয় ক্ষনি পরিবর্তনের উদাহরণ পাওয়া যায়। আজকের দিনের চলিত বাংলা ভাষার প্রায় প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্যই প্রায় ২৫০/৩০০ বছর পূর্বে লিখিত প্রথম বাংলা গদ্য সাহিত্যের মধ্যেও পাওয়া যায়। এটাই সব থেকে আশ্চর্যের বিষয়। *কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ*-এ শব্দের মধ্যে যে কোনও অবস্থানে (আদি, মধ্য, অন্ত) মহাপ্রাণ ক্ষনি থাকলে তা অনেক সময় অল্পপ্রাণরূপে উচ্চারিত হয়েছে। আমরা জানি আধুনিক চলিত বাংলা ভাষায় একমাত্র খুব সাবধানে বা consciously উচ্চারণ করলে শব্দের শেষের মহাপ্রাণক্ষনি রক্ষিত হয়, অন্যথায় ইহা লুপ্ত হয়। শব্দের আদিতে অবস্থিত মহাপ্রাণক্ষনির ক্ষেত্রেও সেই একটি কথা। কিন্তু পদমধ্যগত বা স্বরমধ্যগত অবস্থানে মহাপ্রাণ ক্ষনির অল্পপ্রাণরূপে উচ্চারণ বিষয়টি কিছুটা নিয়মবিরুদ্ধ। কারণ দুই স্বরক্ষনির মধ্যে অবস্থিত অল্পপ্রাণক্ষনি সাধারণত মহাপ্রাণ হয়। সেই সময় মহাপ্রাণক্ষনিগুলোকে কি একটু মৃদু ভাবে বা হালকাভাবে উচ্চারণ করার রীতি ছিল? যাইহোক, আজকের দিনে চলিত বাংলাভাষার এটা একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যা ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে মানোএলের গ্রন্থেই প্রথম পাওয়া যায়। যেমন calax = (খালাস), cobor (খবর), gori (ঘড়ি), dula (ধূলা), biqha (ভিক্ষা), bocti (ভক্তি), gam (ঘাম), gore (ঘরে), gax (ঘাস), xati (সাথী), matae (মাথায়), pontu (পহী), latu (লাথি), xttane (স্তানে), cande (কাঁধে), oporadi (অপরোধী), xonde (সন্ধ্যা) ইত্যাদি।

পরিশেষে বলি, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে রচিত প্রথম বাংলা গদ্য সাহিত্যের মধ্যে চলতি শব্দের ব্যবহার কিরকম ছিল তার একটা হিসেব দেওয়া হল। এর থেকে আধুনিক বাংলায় ব্যবহৃত চলতি শব্দের ধারাবাহিকতার একটা ইতিহাসও আমরা পেয়ে থাকি।

উপভাষা : স্বাতন্ত্র্যের সংকট ও স্বরূপের সন্ধান

নীলাদ্রিশেখর দাশ

১ কথারম্ভ

এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় হল উপভাষার স্বরূপের সন্ধান, এর উপাদান সংগ্রহের আধুনিক পদ্ধতি নিরূপণ এবং এর বহুমাত্রিক ব্যবহার পদ্ধতি নির্ধারণ। ভাষাবিজ্ঞানের আধুনিক গতিপথের নিশানা অনুসরণ করে এবং উপভাষার ব্যবহারিক উপযোগিতার প্রতি দৃষ্টি রেখে এখানে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে উপভাষার সংজ্ঞা কি হতে পারে, এর স্বরূপগত বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি, এবং এর স্বাতন্ত্র্যের মাপকাঠি কিভাবে ঠিক করা যেতে পারে। ইতিহাস জানাচ্ছে, একটা সময় ছিল যখন উপভাষা কথাটি ভাষার আঞ্চলিক বা ভৌগোলিক রকমফের বোঝাতে ব্যবহার করা হত। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই চেম্বার ও ট্রাডগিল (১৯৯৮) উপভাষার স্বরূপ সন্ধানে নেমেছিলেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে ভাষাবিজ্ঞানীরা এই সংজ্ঞার সীমারেখাকে শুধু প্রসারিত করেননি, পরিমার্জিতও করেছেন। এর ফলে, আজকের দিনে বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর ভাষা, সমাজভাষা, লোকভাষা, ব্যক্তিভাষা, ব্যক্তিভাষা—সমস্তই উপভাষার গোত্রভূক্ত। বর্তমান আলোচনাটিকেও এই পথ ধরে এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করা হয়েছে এবং খুঁজে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে উপভাষার তথ্যানুসন্ধান, নমুনা সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও ব্যবহার কিভাবে হলে সব চেয়ে বেশি লাভবান হবে আমাদের জীবন ও সমাজ।

২ সংজ্ঞাপনের সমস্যা

সমাজভাষাবিজ্ঞানের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয় হল উপভাষা। সমাজভাষা-বিজ্ঞান নিয়ে যাঁরাই আলোচনায় বসেছেন তাঁরা সকলেই মান্যভাষার বিপরীতে উপভাষার সোচ্চার উপস্থিতি লক্ষ করেছেন যদিও এর গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে অনেকেই দ্বিধাগ্রস্ত। কারণ, মান্যভাষা থেকে কতটা পৃথক হলে একটি ভাষাকে উপভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া যেতে পারে সে বিষয়ে নির্দিষ্ট সীমারেখা এখনও নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। এর জন্য অবশ্য ভাষাবিজ্ঞানীরা দোষী নন—মান্যভাষার ও উপভাষার স্বরূপগত আন্তর্মিলই এর জন্য দায়ী। কেনও একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে মান্যভাষা ও উপভাষাগুলির মধ্যে পারস্পরিক বোধগম্যতা ও আদান-প্রদানের বহুমানতা এতটাই স্বতঃ-সঞ্চারিত যে, দুই ভাষারূপকে সরাসরি দাঁড়ি টেনে দুই প্রান্তে আলাদা করে দেওয়া সম্ভব নয়। হামেশাই, মান্যভাষার মহাভোজে উপভাষার দু-একটি লঘুপদ ব্যঞ্জন যেমন সসম্মানে উপস্থিত থাকে, তেমনি উপভাষার আটপৌরে দৈনন্দিন রামায় প্রায়শই মান্যভাষার বাহারী গুরুপদ উপস্থিত থাকতে

পারে—এবং এ নিয়ে কেউ কোনও প্রশ্ন তোলেন না। বরং ধরে নেওয়া হয়, এটাই স্বাভাবিক—এমনটাই হওয়ার কথা। এই ভাবে দুই ভাষারূপের পারস্পরিক মিল-গরমিল ও আদান-প্রদানের জোরেই পরস্পরের ভাষাভাণ্ডার সম্পদশালী হয়, চিন্তা-ভাবনায় বৈচিত্র্য ও বিস্তৃতি আসে, এবং ভাষার জৌলুস বাড়ে। এখান থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না, উপভাষার সংজ্ঞা নির্ধারণ করা বেশ একটি জটিল সমস্যা। তাই সে পথে অযথা শক্তিক্ষয় না করে বরং উপভাষার স্বরূপটি বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে।

উপভাষার স্বরূপ নির্ণায়ক চরিত্র বুঝে নেবার আগে এর আভিধানিক স্বরূপটুকু বোধহয় বুঝে নেবার দরকার আছে। বাংলায় উপভাষা শব্দটি ইংরেজি শব্দ ডায়ালেক্ট-এর (dialect) যোগ্য পরিভাষা। ইংরেজিতে ডায়ালেক্ট শব্দটির উৎপত্তি ও বিবর্তনের ছবিটি কিছুটা স্পষ্ট হতে পারে নিচের বিশ্লেষণ থেকে :

The notion underlying *dialect* (coined in the 16th century) and its relatives *dialectic* (coined in the 14th century) and *dialogue* (coined in the 13th century) is of 'conversation'. They came ultimately from Greek *diadegesthai* 'converse', a compound verb formed from the prefix *dia-* 'with each other' and *lēgein* 'speak' (source of English *lecture* and a wide range of related words). This formed the basis of two derived nouns, First, *dialektos* 'conversation, discourse', hence 'way of speaking' and eventually 'local speech', which passed into English via Latin *dialectus* and Old French *dialecte* (from it was produced the adjective *dialektikos* 'of conversation, discussion, or debate', which was eventually to become English *dialectic*). Secondly, *dialogos* 'conversation', which again reached English via Latin and Old French. (John Ayto : 1997 : 169)

বাংলায় কে প্রথম উপভাষা কথাটি ব্যবহার করেছিলেন জানা নেই। তবে তাঁর ভাষাতাত্ত্বিক মুন্সিয়ানা প্রশংসনীয়। 'উপভাষা' কথাটির মধ্য দিয়ে তিনি এমন এক ভাষার সন্ধান করেছেন যে ভাষা মান্যভাষার কেন্দ্রীয় স্বরূপের থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র এবং এই স্বাতন্ত্র্যের কারণেই মান্যভাষার প্রাদেশিক রূপ হিসাবে স্বীকৃত।

৩ স্বরূপের সন্ধান

উপভাষার সংজ্ঞা নির্ধারণ করার মতোই এর স্বরূপ স্পষ্ট করে চিহ্নিত করা বেশ কঠিন। কারণ এর বহুমাত্রিক গঠন ও চরিত্র। গ্রাম্যতার গন্ধ মেখে আঞ্চলিকতার সীমায় সীমাবদ্ধ থাকার কারণে উপভাষা (তুলনীয় : উপনগর, উপসাগর, উপগুরু, উপপতি, উপপত্নী, ইত্যাদি) মান্যভাষার প্রান্তিক উপাঙ্গে থেকে গেছে। মান্যভাষার বিপরীতে, স্থানগতভাবে এই ভাষা আঞ্চলিক (regional), প্রসাধনে গ্রাম্য (rural), তাই চরিত্রগতভাবে অ-মান্য (non-standard)। তাই বলে মান্যভাষার সঙ্গে এর মিল কম নয়। মান্যভাষার আঙ্গিনায় এর অবাধ গত্যায়ত। ফলে হামেশাই নিজের সম্পদে মান্যভাষাকে সম্পদশালিনী করে তুলতে পারে উপভাষা।

স্থানগত (ডৌগোলিক) কিংবা জন্মগত (ব্যুৎপত্তি) কারণে উপভাষার সম্পর্ক রয়েছে

অন্যান্য দেশজ ভাষার সঙ্গেও। কোথাও প্রত্যক্ষভাবে, কোথাও পরোক্ষভাবে। যেহেতু এর শরীর গড়ে ওঠে সাধারণ লোকজীবনের কাদামাটিতে, তাই লোকজীবনের সমস্ত রূপ, রঙ, রস, গন্ধ, স্পর্শের সঠিক প্রতিফলন ঘটে থাকে এই ভাষায়। হয়তো মান্যভাষার চটকদার ঘোরপ্যাঁচ এখানে পাওয়া যাবে না, তবে বহুমান লোকজীবনের বর্ণিল চালচিত্র পাওয়া যাবে নিশ্চিতরূপেই। আর এখানেই উপভাষার অস্তিত্ব, এখানেই এর নিজস্বতা।

উপভাষা সমাজবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা ছাড়াও সাধারণ সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাই উপভাষার আলোচনা করতে বসলে কোনও ভাবেই অন্যগুলিকে বাদ দিয়ে আলোচনা সম্পূর্ণ হতে পারে না। এই আন্তর্বিভাগীয় ক্ষেত্রের গবেষণায় সাফল্য নির্ভর করে কিভাবে সমস্ত পুঞ্জীভূত তথ্যগুলিকে একসঙ্গে নথীভুক্ত, বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা, এবং উপস্থাপনা করা হয়েছে তার উপর। সাধারণভাবে উপভাষার আলোচনা জড়িয়ে থাকে কিভাবে ব্যবহারকারী তাঁদের জীবন, ইতিহাস ও সংস্কৃতি উপভাষার মাধ্যমে তুলে ধরতে পারছেন তার সঙ্গে। উপভাষার বর্ণিল চালচিত্রে শুধু ঔপভাষিক গোষ্ঠীর ভাষা-বৈচিত্র্য নয়, ধরা পড়ে তাঁদের ইতিহাস ও বর্তমান, মনস্তত্ত্ব ও মানসিকতা, ধর্ম ও বিশ্বাস, সমাজ ও সংস্কৃতি, সাহিত্য ও শিল্প, প্রকৃতি ও পরিবেশ, নাচ ও গান, ছড়া ও কবিতা, নাটক ও কাহিনি, রূপকথা ও উপকথা, ভূত, প্রেত, পরী ও রাক্ষস, কল্পিত কাহিনি ও পুরাণ, রাজনীতি ও সমাজনীতি, প্রচলিত প্রথা ও পদ্ধতি, প্রেম ও ভালোবাসা, সংসার ও সামাজিকতা, লোকাচার ও লৌকিকতা, সংস্কার ও সচেতনতা, উৎসব ও অনুষ্ঠান, কৌতুক ও হেঁয়ালি, বিজ্ঞান ও খেলাধুলা, ব্যবসাবাগিজ্য ও চাষাবাস, সাহিত্য ও চিকিৎসা—এক কথায় সব কিছুই। স্বাভাবিকভাবেই এই বহুমাত্রিক জীবনের প্রতিফলন যে ভাষার মাধ্যমে ঘটেছে সেই উপভাষার আলোচনাও বহুমুখী ও বহুমাত্রিক হতে বাধ্য। সেই উপভাষাকে বুঝতে হলে অবশ্যই কিছু টুকরো প্রমাণ ও উদাহরণের দোহাই দিয়ে কাজ চালানো যাবে না। তার জন্য অবশ্যই দরকার বিশাল আকারের একাধিক বহুমাত্রিক ভাষাংশ (corpus) যেগুলির মধ্যে গোষ্ঠীজীবনের সামগ্রিক চিত্র পরিপূর্ণভাবে ফুটে উঠতে পারে। এই পরিপ্রেক্ষিত মাধ্যম রেখে ভাবতে হবে কিভাবে ভাষা-প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে উপভাষার ভাষাংশ নির্মাণ করা যায় এবং সেগুলির বিশ্লেষণ থেকে তথ্য ও নমুনা তুলে এনে উপভাষা চর্চার ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য ও পূর্ণতা আনা যায়।

আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলেছে উপভাষার গবেষণায়। গত দু-তিন দশক ধরে উপভাষা নিয়ে কাজকর্ম করার উদ্দীপনা ও আগ্রহ লক্ষ করা যাচ্ছে ভাষাবিজ্ঞানীদের মধ্যে। ফল স্বরূপে, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞানসম্মতভাবে উপভাষার ভাষাংশ (dialect corpus) তৈরি করার কাজ শুরু হয়েছে শুধু তাই নয়, উপভাষার সঙ্গে সম্পর্কিত নানা দরকারি তথ্যও সংগ্রহ করা হচ্ছে যা না থাকলে উপভাষার স্বরূপটি পূর্ণ রূপে বোঝা সম্ভব হবে না।^১ উন্নত দেশগুলিতে এই নতুন পদ্ধতিতে উপভাষার তথ্য ও নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে, বিশ্লেষণ করা হচ্ছে এবং বিশ্লেষণ থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাদান সাধারণ ভাষা গবেষণা, শিক্ষা ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কাজেও ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়াও উপভাষার ভাষাংশ বিশ্লেষণ করে সমাজভাষাবিজ্ঞানীরা শুধু ঔপভাষিক জনগোষ্ঠীর ভাষা ব্যবহারের বৈচিত্র্য সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে জানতে পারছেন এমন নয়, সেই সঙ্গে তাঁরা জানতে পারছেন সেই জনগোষ্ঠীর জীবনের আরও নানা তথ্য যা এতদিন

ধরে অঙ্গাত ছিল। মোট কথা, উপভাষার ভাষাংশ, তার গঠন ও বিষয়বস্তু অনুসারে, এমন অনেক কিছুই সরবরাহ করতে পারছে যা বর্ণনামূলক, ঐতিহাসিক, তুলনামূলক এবং সমাজভাষাবিজ্ঞানের কাজে খুবই দরকারি বিষয়বস্তু হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

মনে হয় ভারতের ক্ষেত্রেও এমনটিই হওয়া উচিত। কারণ আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীদের মতে সমাজভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে ভারত একটি ঘুমন্ত নৈত্য (a sleeping sociolinguistic giant) যার ভাষারে রয়েছে অসীম বৈচিত্র্যময় অফুরন্ত সম্পদ। কিন্তু লক্ষ্যের ব্যাপার এই যে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে, বিশেষ করে আমেরিকা ও ইউরোপের উন্নত দেশগুলিতে, উপভাষার চর্চা ও বিশ্লেষণ যে পথ ধরে এগিয়ে গিয়ে সমাজ, জীবন ও শিক্ষার উন্নতি ঘটাতে পেরেছে সেই পথের ব্যবহার এখনও ভারতে শুরু করা সম্ভব হয়নি।^{১২} ফলে, অন্য দেশের উপভাষার কাজকর্ম দেখলেই মনে হয় ভারতের উপভাষাগুলির জন্য এমন কাজকর্ম হওয়া দরকার। আমাদের বিশ্বাস, ভাষা-প্রযুক্তির সুবিধা ও সুযোগ নিয়ে ভারতের উপভাষাগুলির গবেষণায় কিছু অবদান রেখে যাওয়া সম্ভব যা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সমগ্র মানবসমাজের উপকারে লাগতে পারে।

৪ বাংলার চালাচিহ্ন

প্রায় গত এক শতক ধরে বাংলা উপভাষা নিয়ে যে সমস্ত গবেষণা প্রকাশিত হয়েছে (যেমন, নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ১৯২৪, গোপাল হালদার ১৯২৯, আবদুল হাই ১৯৬৫, সুকুমার সেন, ১৯৭৩, কামিনীকুমার রায় ১৯৬৯-৭০, কালীন্দ্রনাথ বর্মণ ১৯৭০, নীলমাদন সেন ১৯৭২, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ১৯৭৪, মনজুর মোরশেদ ১৯৮৫, রাজীব হুমায়ুন ১৯৮৬, গোপাল হালদার ১৯৮৬, কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য ১৯৯০, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৯১, রেজাউল করিম ১৯৯০, সফিকুল ইসলাম ১৯৯২, শ্যামাপ্রসাদ দত্ত ১৯৭২, নির্মল দাশ ১৯৯৭, ভব রায় ২০০১, বলাইচাঁদ হালদার ২০০২, অনিমেষকান্তি পাল ২০০৩, প্রমুখ)^{১৩} সেগুলির বেশিরভাগই হাতে-গড়া কিংবা কানে-শোনা পরিমিত কিছু ভাষা-নমুনা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে করা হয়েছে। প্রায়শ, ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার (কখনও বা যৌথ কিংবা প্রাতিষ্ঠানিক প্রচেষ্টায়) উপভাষা সংগ্রহের চেষ্টা হয়েছে এবং সেই তথ্যকে কাজে লাগিয়ে বড়োজোর শব্দতালিকা কিংবা অভিধান তৈরি করা হয়েছে। দু-একটি ক্ষেত্রে অবশ্য উপভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনিগুলির স্বরূপ বিচারের কিংবা উপভাষায় ব্যবহৃত বাক্যের গঠন দেখে ব্যাকরণ রচনার চেষ্টা হয়েছে। এই ধরনের কাজ করা হয়েছে মূলত ক্ষেত্র-সমীক্ষককে কাজে লাগিয়ে উপভাষার নমুনা সংগ্রহ করে এবং সেগুলিকে বিশ্লেষণ করে।

জোর দিয়ে বলা যায়, প্রায় কোনও ক্ষেত্রেই প্রতিনিধিত্বমূলক, সমাঙ্গস্যপূর্ণ ও বিস্তৃত ভাষাংশ ব্যবহার করা হয়নি। তাই কোনও ভাবেই এই সমস্ত ভাষা-নমুনাকে ভাষাংশ বলা যায় না, যার ফলে, এই সমস্ত আলোচনা থেকে উপভাষাগুলি সম্পর্কে কিংবা উপভাষায় ব্যবহৃত বিভিন্ন ভাষিক উপাদান সম্পর্কে কিছু কিছু ধারণা পাওয়া গেলেও সামগ্রিকভাবে কোনও পূর্ণাঙ্গ আলোচনা পাওয়া যায়নি। আমাদের বিশ্বাস, এই সমস্ত কাজে যদি উপভাষার বিস্তৃত ও বহুমাত্রিক ভাষাংশ ব্যবহার করা সম্ভব হত, তাহলে আরও অনেক নতুন নতুন তথ্যের সন্ধান

পাওয়া যেত, যার ছটায় আলোকিত হতে পারত বাংলার উপভাষা, ঔপভাসিক জনজীবন এবং সমগ্র জনসমাজ।

উপভাষা চর্চার বর্তমান বিশ্বজনীন চলচিত্র দেখে বোঝা যায় বাংলা উপভাষাগুলির জন্য আধুনিক পদ্ধতিতে ভাষাংশ তৈরি করার সময় এসেছে। এই পদ্ধতিতে ভাষাংশ তৈরি করা সম্ভব হলে সমস্ত উপভাষাগুলির সর্বার্থসাধক সংরক্ষণ তৈরি করে রাখা সম্ভব হবে। এই সংরক্ষণ লিখিত ও কথ্য ভাষাংশ—দুই ভাবেই করা যেতে পারে। লিখিত ভাষাংশের মধ্যে উপভাষার লিখিত রূপের প্রাধান্য বজায় রেখে কথ্য ভাষাংশের মধ্যে কথাবার্তা ও কথোপকথনের পরিমাণ বাড়িয়ে রাখা যেতে পারে। কিংবা উভয় ক্ষেত্রেই দুই উপাদান সমান হারে রাখা গেলে কোনও ক্ষতি নেই। দুই ধরনের ভাষাংশই বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ধরে রাখা সম্ভব হলে অদূর ভবিষ্যতে ভাষা-প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে বিজ্ঞানসম্মতভাবে এগুলিকে বিশ্লেষণ করে উদ্দিষ্ট জনসমাজে উপভাষার ব্যবহার ও ভাষা-সংস্কৃতির চিত্রটি স্পষ্টভাবে জানা সম্ভব হবে।

৫ উপভাষার উপাদান

বুঝতে অসুবিধা নেই যে, উপভাষাকে বুঝতে হলে প্রয়োজন উপভাষার একাধিক ভাষাংশ। কারণ ভাষাংশ থেকে জনজীবনের যে পূর্ণাঙ্গ ছবি পাওয়া যাবে তা অন্য কোনোভাবেই পাওয়া সম্ভব নয়। তবে কিভাবে ভাষাংশ গড়ে তোলা সম্ভব, কী কী উপাদান সেই ভাষাংশে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত, কিভাবে সেই ভাষাংশ বিশ্লেষণ ও ব্যবহার করা যেতে পারে—এই সমস্ত বিষয়ে অনেকেরই স্পষ্ট ধারণা নেই। তাই ভাষাংশ নির্মাণ, এর উপাদান এবং এর ব্যবহার সম্পর্কে কিছু দিক নির্দেশ এই আলোচনায় তুলে ধরা মনে হয় অসঙ্গত হবে না।

উপভাষার ভাষাংশ দুই ধরনের হতে পারে : লিখিত ভাষাংশ ও কথ্য ভাষাংশ। লিখিত ভাষাংশের মধ্যে থাকবে দুটি প্রধান ভাগ : কল্পনামূলক রচনা এবং তথ্যমূলক রচনা। কল্পনামূলক রচনার মধ্যে থাকবে পুরাণ ও ইতিকথা, লোকগাথা, গল্প, ছড়া, গান, পাঁচালী, কবিতা, অপ্রকাশিত রচনা, পাণ্ডুলিপি, রূপকথা, ইতিকথা, প্রবাদ-প্রবচন, ইত্যাদি। তথ্যমূলক রচনায় থাকবে ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত হিসাবপত্র ও লেখালেখি, সমাজ জীবনের ইতিহাস, ধর্ম ও বিশ্বাস সম্পর্কিত রচনা, প্রকৃতি ও পরিবেশ নিয়ে লেখালেখি, রাজনীতি ও সমাজনীতি বিষয়ক রচনা, প্রচলিত প্রথা ও রীতিনীতি সম্পর্কিত নিয়মকানুন, সংসার ও সামাজিকতার নির্দেশাবলি, লোকাচার ও লৌকিকতার সাত-সতেরো, উৎসব ও অনুষ্ঠানের বিবরণ, লোকবিজ্ঞান ও খেলাধুলা সম্পর্কিত রচনা, চাষবাস বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ, সাহ্য ও চিকিৎসা বিষয়ক রীতিপদ্ধতি ইত্যাদি নানা বিষয়ের লিখিত নমুনা।

অন্যদিকে কথ্য ভাষাংশে থাকবে দৈনন্দিন আলাপচারিতা ও কথোপকথনের নানা ধরনের অংশ। সমাজ জীবনের নানা ক্ষেত্র থেকে তুলে আনা এই সমস্ত নমুনা লোকজীবনের সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরবে তার আপন মহিমায়। প্রয়োজনে লিখিত ভাষাংশের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত বিষয়ের ভাষিক রূপগুলিও কথ্য ভাষাংশে তুলে রাখা যেতে পারে। এর ফলে যে সমস্ত ক্ষেত্রে লিখিত ভাষাংশ অপারগ, সেখানে কথ্য ভাষাংশে সংরক্ষিত নমুনা উপভাষার আসল রূপটিকে তুলে ধরতে পারবে। উপভাষার এবং বিধ বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্যের কথা মাথায় রেখে নিচের সারণিতে সংক্ষেপে দেখানো হয়েছে উপভাষা ভাষাংশে কি কি উপাদান সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

উপভাষা ভাষাংশ

	লিখিত ভাষাংশ	কথ্য ভাষাংশ
রূপনামূলক রচনা	পুরানকাহিনি, ইতিকথা, রূপকথা, লোকগাথা, ভুতের গল্প, পশুপাখির গল্প, রাক্ষস-খোক্ষসের গল্প, পরীর গল্প, অন্যান্য গল্প, ছড়া, গান, পাঁচালী, ব্রতকথা, কবিতা, নাটক, প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত রচনা, পাণ্ডুলিপি, কথকথা, ইত্যাদি।	বিভিন্ন ধরনের লোকগান (বাউল, বুমুর, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, কীর্তন, তর্জা, ইত্যাদি) নাটক, পাঁচালি, ব্রতকথা, ছড়া, হৈয়ালী, গল্প-কাহিনি, ঘুমপাড়ানি গান, পুরানকাহিনি, লোকগাথা, কবিতা, রূপকথা, উপকথা, চারণগান, ভুতের গল্প, রসালাপ, প্রেমলাপ, ইত্যাদি।
তথ্যমূলক রচনা	ব্যবসা-বাণিজ্য, পুরাণ ও ইতিহাস, ধর্ম ও বিশ্বাস, প্রকৃতি ও পরিবেশ, রাজনীতি, সমাজনীতি, প্রথা ও পদ্ধতি, রীতি ও নীতি, নিয়মকানুন, সামাজিকতার বিভিন্ন নির্দেশাবলি, লোকচার, লৌকিকতার সাত-সতেরো, নানা অনুষ্ঠানের বিবরণ, লোকবিজ্ঞান, খেলাধুলা, চাষবাস, সাহ্য, চিকিৎসা, ইত্যাদি।	দৈনন্দিন আলাপচারিতা, ঝগড়াঝাটি, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাষ-বাস, ভুগোল ও ইতিহাস, ধর্ম ও বিশ্বাস, প্রকৃতি ও পরিবেশ, রাজনীতি, ধর্মনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, নিয়মকানুন, সামাজিকতা, লোকাচার, লৌকিকতা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, অনুষ্ঠান, লোকবিজ্ঞান, খেলাধুলা, সাহ্য, অসুখ-বিসুখ, চিকিৎসা বিষয়ক কথাবার্তা, আলোচনা, ইত্যাদি।

সারণি ১ : উপভাষা ভাষাংশের প্রাথমিক গঠন

উপরে নির্দেশিত পথ ধরে যদি বাংলাতে একাধিক উপভাষার বৈদ্যুতিন ভাষাংশ তৈরি করা সম্ভব হয় এবং সেগুলিকে যদি আধুনিক ভাষা-প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে সঠিক ও সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ করা যায় তবে উপভাষাগুলি সম্পর্কে এমন অনেক অজানা তথ্যের সম্ভান পাওয়া যাবে যা এখনও জানা যায়নি কিংবা এতাবৎ কাল গবেষকদের অনুমানের বাইরে থেকে গেছে। কাজটি কঠিন, সময় সাপেক্ষ, এবং ব্যয়বহুল সন্দেহ নাই। কিন্তু উপভাষাগুলিকে সঠিকভাবে জানতে হলে এ ছাড়া আর কোনও উপায় আছে বলে মনে হয় না। তবে এই ধরনের কাজ কোনও ব্যক্তির একার কাজ নয়। এর জন্য দরকার দীর্ঘকালীন পরিকল্পনা, বহুব্যক্তির যৌথ প্রচেষ্টা, প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ, বহুল আর্থিক সংস্থান, এবং ভাষা-প্রযুক্তির সফল ও সুযোগ্য ব্যবহার। কাজটি যদি করা সম্ভব হয় তবে দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত ক্ষেত্রকে তার প্রাপ্য সম্মান ও মর্যাদা দিয়ে নতুন রূপে ও ঐশ্বর্য্যে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে।

৬ উপভাষা ভাষাংশের ব্যবহার

উপভাষার গবেষণায় ভাষাংশের গুরুত্ব অপরিসীম। সমাজভাষাবিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান আলোচনার ক্ষেত্র হিসাবে উপভাষার একটি আলাদা তাৎপর্য আছে। এছাড়াও উপভাষিক তথ্য ও নমুনার গুরুত্ব রয়েছে সমাজবিজ্ঞানের আরও অনেক শাখায়। এই কথা মাথায় রেখে

উপভাষার গবেষণায় ভাষাংশের ব্যবহার ও প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা যেতে পারে।

- ১ ভাষাংশে অন্তর্ভুক্ত নমুনার বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্য উপভাষার সমস্ত ব্যবহারের প্রকৃত স্বরূপটি বিশ্বাসযোগ্যতার সাথে তুলে ধরতে পারে। এতদিন ধরে প্রচলিত পদ্ধতিতে ও গতানুগতিক ধারায় উপভাষার যে সমস্ত তথ্য বা নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে তার ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্য কোনওভাবেই বহুমাত্রিক নয়। কারণ গবেষণার প্রয়োজনে যে নমুনাগুলি সংগ্রহ করা হয়েছে সেগুলি সাধারণত একমাত্রিক — উপভাষার কোনও একটি বিশেষ দিককে (যেমন, শব্দ বা ধ্বনির ব্যবহার, ছড়ার ভাষা, মেয়েদের ভাষা, গীতি-কবিতার ভাষা, লোকগানের ভাষা, ইত্যাদি) নির্দেশ করার জন্যই সেই ভাষা-নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এই ধরনের নমুনা কোনও ভাবেই উপভাষার সার্বিক রূপটি তুলে ধরতে পারে না। তাই উপভাষা ব্যবহারের পথ ধরে ঔপভাষিক জনজীবন ও জনসমাজকে জ্ঞানতে এবং মান্য ভাষা থেকে উপভাষার স্বরূপ ও চরিত্রের পার্থক্যের সীমারেখাটি ভালোভাবে বুঝে নিতে কোনও বিশেষ ধরনের নমুনার উপর নির্ভর না করে বহুমাত্রিক ভাষাংশের উপরই ভরসা করা অনেক বেশি বিজ্ঞানসম্মত।
- ২ সাধারণতভাবে, উপভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনিসমষ্টির বিস্তৃত বর্ণনামূলক আলোচনা ছাড়াও উপভাষায় ব্যবহৃত রূপিম, শব্দ, পদ, বাক্য, শব্দার্থ, বাক্ধারা ইত্যাদির আলোচনা ও বিশ্লেষণের জন্য কথ্য ভাষাংশ প্রয়োজনীয় তথ্যের সন্ধান দিতে পারে। এছাড়া, ভাষাংশের বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্যের কারণে সমস্ত রকমের সংখ্যাগত, গুণগত, ও পরিমাণগত সিদ্ধান্তও নির্ধারণ করা সম্ভব হয় যার থেকে উদ্ভিষ্ট জনসমাজ সম্পর্কেও নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়। ইংরেজিতে ভাষার ক্ষেত্রে ইংরেজি উপভাষার হেলসিঙ্কি ভাষাংশ, উত্তর আয়ারল্যান্ডের কথ্য ভাষাংশ, ল্যাংকাস্টার-ওসলো-বার্গেন ভাষাংশ, লন্ডন-সুন্ড কথ্য ভাষাংশ প্রভৃতিকে একসঙ্গে রেখে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখা হয়েছে ইল্যান্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত উপভাষাগুলির মধ্যে মিল ও গরমিলের পরিমাণ কতখানি এবং এই উপভাষাগুলি মান্য ইংরেজি ভাষা থেকে কিভাবে আলাদা। বাংলাতেও এমন কাজকর্মের জন্য উপভাষার বৈদ্যুতিন ভাষাংশ নির্মাণের কথা চিন্তাভাবনা করা যেতে পারে।
- ৩ উপভাষার বেশ কিছু সম্পদ কালের কবলে পড়ে চিরকালের জন্য হারিয়ে যাবার পথে। অনাদরে, অব্যবহারে, অবহেলিতে হয়ে উপভাষার অনেক গান, ছড়া, পুরাকাহিনি, গল্প, হেঁয়ালি, রূপকথা, উপকথা, প্রবাদ ইত্যাদি চিরকালের জন্য হারিয়ে গেছে। একইভাবে অবলুপ্তির পথে চলেছে কবিগান, তর্জী গান, মনসার ভাসান গান, শীবের গাজন, ভাদু-টুসু গান, শীতলা যশীর গান, লালনগীতি, দেহতন্ত্রের গান, ইতু পুজোর গান, পাঙ্কির গান, ধানভাঙার গান, মাছধরার গান, ধান কাটার গান, পুতুল নাচের গান ও কাহিনি, বিয়ের গান, বর্ষার গান, শবযাত্রার গান, ঘুমপাড়ানি গান, ইত্যাদি। এই সমস্ত সম্পদ যদি হারিয়ে যায় তবে সেগুলিকে ফিরে পাবার আর কোনও সম্ভাবনা থাকবে না। কিন্তু এখনও যা বর্তমান রয়েছে

তাকে যথাযোগ্য মর্যাদায় সংরক্ষণ করতে হলে বৈদ্যুতিন ভাষাংশ গড়ে তোলা জরুরি। ভাষা-প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে এই সমস্ত বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ধরে রাখা একান্ত দরকার যাতে পরবর্তীকালে এগুলিকে কাজে লাগানো যায়। উপভাষার সম্পদ শুধু ইতিহাসের বিষয়বস্তু নয়, বর্তমান সমাজ জীবনকে নতুন আঙ্গিকে গড়ে তোলার কাজেও এগুলি অত্যাবশ্যকীয় ও অপরিহার্য সামাজিক দলিল।

৪. শুধুমাত্র উপভাষার কল্পনামূলক রচনা বিচার করে বহুমাত্রিক লোকজীবনের সামগ্রিক ছবি পাওয়া যাবে না। এর জন্য চাই উপভাষার ভাষাংশে সংরক্ষিত নানা প্রকার তথ্যমূলক রচনার সুনির্দিষ্ট বিচার-বিশ্লেষণ। তবে একাজ শুধু ভাষাবিজ্ঞানের চৌহদ্দির মধ্যে পড়ে না, সমাজবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাও এর সঙ্গে যুক্ত। সমাজবিজ্ঞানীরা উপভাষার তথ্যমূলক ভাষাংশ বিশ্লেষণ করে সহজেই জেনে নিতে পারেন নির্দিষ্ট ভাষাগোষ্ঠীর জীবন, জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির পূর্ণ ছবি। আর এই সমস্ত সংবাদ বিস্তৃতভাবে দিতে পারে কেবল উপভাষার ভাষাংশ।

৫. মান্যভাষার আলোচনার ক্ষেত্রেও, বিশেষ করে মান্যভাষা থেকে উপভাষার পার্থক্যের স্বরূপটি জানার জন্য, উপভাষার ভাষাংশের প্রয়োজন রয়েছে। উপভাষার ভাষাংশই তুলে ধরতে পারে এমন অনেক প্রাচীন শব্দ, জাতিগত শব্দ, যন্ত্রপাতির নাম, বিশেষার্থক শব্দ, প্রায়-অজ্ঞাত কোড ও জার্গন, তুলে যাওয়া বাক্যাংশ ও বাক্যধারা, প্রবাদ ও প্রবচন যা মান্যভাষায় রক্ষিত নেই। তাই উপভাষার ভাষাংশ তার স্বাধীন গঠন ও স্বতন্ত্র বিষয়বস্তু অনুসারে এমন অনেক তথ্য ও সংবাদ সরবরাহ করতে পারে যা বর্ণনামূলক, ঐতিহাসিক, তুলনামূলক এবং সমাজভাষাবিজ্ঞানের কাজে খুবই দরকারি।

৬. বাংলা উপভাষার প্রায় সমস্ত আলোচনাই (সামান্য উদাহরণ সামিল করে) প্রমাণ করার চেষ্টা করে উপভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনিগুলি উচ্চারণের দিক থেকে মান্যভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনিগুলির চেয়ে পৃথক। যেমন, মান্যভাষায় কোনও কোনও শব্দের প্রথমে উচ্চারিত ও-ধ্বনি উপভাষায় উ-ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয় (উদা: লোক : লুক, বোতাম : বুতাম, বোতল : বুতল, সোদপুর : সুদপুর, ইত্যাদি)। একইভাবে কখনও কখনও শব্দের প্রথমে উচ্চারিত এ-ধ্বনি উপভাষায় আ-ধ্বনিতে (যেমন, পেট : প্যাট, শেষ : শ্যাস, মেঘ : ম্যাঘ, দেশ : দ্যাশ, ইত্যাদি) রূপান্তরিত হয়ে যায়। এভাবে ব্যক্তিগত দক্ষতার মাপকাঠিতে কেউ পাঁচটি, কেউ সাতটি, কেউবা আরও কয়েকটি বেশি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। এঁদের অবদানের কথা যথাযোগ্য সম্মান সহকারে স্বীকার করে নেওয়ার পরেও যে প্রশ্নটি উঠে আসছে তা হল : শুধুমাত্র এই কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ছাড়া আর কোনও ধ্বনিগত বৈচিত্র্য নেই? নাকি আরও কিছু সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্য রয়েছে কিন্তু নমুনার বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্যের অভাবে এর থেকে বেশি গভীরে যাওয়া সম্ভবপর হয়নি? সম্ভবত এটাই ঠিক। বিস্তৃত ভাষাংশ এঁদের হাতে থাকলে সেগুলি বিশ্লেষণ করে আরও অনেক বৈশিষ্ট্যের সন্ধান দেওয়া যেতো। কিন্তু ভাষাংশের অভাবে তা আর সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

৭. উপভাষার ব্যাকরণ কি মান্যভাষার ব্যাকরণের সমগোত্রীয়? নাকি দুইয়ের মধ্যে

পার্থক্যের সীমারেখা টানা যায়? সাধারণ অভিজ্ঞতায়— উপভাষায় ব্যবহৃত ব্যাকরণ মান্যভাষায় ব্যবহৃত ব্যাকরণের থেকে আলাদা। সত্যিই কি তাই? কেউ কি বিস্তৃত নমুনা বিশ্লেষণ করে দেখেছেন দুয়ের মধ্যে ব্যাকরণগত কোনও পার্থক্য আছে কিনা—এবং থেকে থাকলে কতটা পার্থক্য রয়েছে, কিভাবে রয়েছে, কোথায় রয়েছে, কেন রয়েছে? এই সমস্ত প্রশ্নের প্রাসঙ্গিক উত্তর তখনই পাওয়া সম্ভব যদি উপভাষার একাধিক ভাষাংশ থেকে সংগৃহীত তথ্য ৪ প্রমাণ মান্যভাষা থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও প্রমাণের পাশাপাশি রেখে বিস্তৃত তুলনামূলক পর্যালোচনা করা যায়। তার আগে দুই ভাষার ব্যাকরণ সম্বন্ধে যাই বলা হোক না কেন, তা আংশিক অবলোকন ও খণ্ডিত বিশ্লেষণের বেশি কিছু নয়।

৮ রূপতত্ত্বের আলোচনায় অনেকেই উপভাষার সঙ্গে মান্যভাষার পার্থক্য দেখতে পান। এঁদের মতে বিভক্তিযুক্ত পদ গঠনের ক্ষেত্রে উপভাষায় এমন কিছু বিভক্তি ও অনুসর্গ ব্যবহৃত হয় যা মান্যভাষায় ব্যবহার করা যায় না। যুক্তির খাতিরে যদি ধরে নেওয়া যায় উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি উপভাষায় সত্যি সত্যিই বিদ্যমান, তাহলেও কিছু প্রশ্ন এসে যায়। যেমন, এই বৈশিষ্ট্যগুলি কিভাবে উদ্ধার করা হয়েছে? কানে শুনে নাকি কোনও নমুনা বিশ্লেষণ করে? যদি নমুনা সংগ্রহ করা হয়ে থাকে তবে তা কিভাবে, কোথা থেকে, কত পরিমাণে সংগ্রহ করা হয়েছে? নমুনার প্রামাণ্যতা কতখানি? আরও প্রশ্ন : এই বৈশিষ্ট্যগুলিই কি সব? আর কোনও বৈশিষ্ট্য ছিল না? উপভাষায় শুধু রূপতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য রয়েছে, পদগত, বাক্যগত কিংবা অর্থগত কোনও বৈচিত্র্য নেই? আলোচনাগুলি পড়ে মনে হয়, বৈশিষ্ট্যগুলি মূলত কথোপকথনের ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয়। লেখার ক্ষেত্রে কি কোনও পার্থক্য নেই? তাহলে লেখার বেলায় কি উপভাষায় মান্যভাষার ব্যাকরণ অনুসৃত হয়? তাই যদি হয় তাহলে কি লিখিত রূপের ক্ষেত্রে মান্যভাষার ব্যাকরণের সঙ্গে উপভাষার ব্যাকরণের কোনও পার্থক্য নেই? এই প্রশ্নগুলি একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যেত যদি কোনও বিস্তৃত ভাষাংশ বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তগুলি নেওয়া হত। মূল কথা হল, ভাষাংশের ঘাটতিই নতুন তথ্য, উদাহরণ ও প্রমাণের উপস্থাপনা থেকে সংশ্লিষ্ট গবেষকদের বঞ্চিত ও বিরত করেছে।

৯ আধুনিককালে উপভাষার চর্চায় ব্যবহারিক বৈচিত্র্য অনুসন্ধানের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে বৈদ্যুতিন ভাষাংশ। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কথ্য ভাষাংশ ব্যবহার করে জনার চেষ্টা হচ্ছে কিভাবে স্থান, কাল, পাত্র ও বিষয় অনুসারে ভাষার ব্যবহার বদলে যায়, সময়ের স্রোতে কিভাবে উপভাষার শব্দভাণ্ডার ও শব্দার্থের বদল ঘটে, কিভাবে একই ভৌগোলিক স্থানের মধ্যেই ভাষার বদল ঘটে, কিভাবে একধিক সমগোত্রীয় উপভাষাগুলির মধ্যে একটি উপভাষা মান্যভাষা হিসাবে পরিগণিত হবার দাবিদার হয়ে ওঠে, এবং এর পিছনে সেই উপভাষার ভাষিক সম্পদের কোনও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকা থাকে কিনা, ইত্যাদি নানা বিষয়।

১০ উপভাষা ভাষাংশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অবদান হল উপভাষার বিষয়াভিধান। সাধারণ অভিধানের থেকে এই ধরনের অভিধান চরিত্রগতভাবে একেবারেই আলাদা,

কারণ এই অভিধানে উপভাষার শব্দের সম্ভার এবং শব্দ সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্যের সঙ্গে থাকে গোষ্ঠীজীবনের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য। গোষ্ঠীজীবনের সঙ্গে যে সমস্ত জিনিস একাত্মভাবে জড়িয়ে আছে সেগুলির সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ এখানে লিপিবদ্ধ করা হয়। বিভিন্ন রীতিনীতি, প্রথা, গাছপালা, দেবদেবী, নাচ, গান, ছড়া, ইত্যাদি বিষয়ে যাবতীয় তথ্য ও সংবাদ এখানে ধরে রাখা হয়। এই ধরনের অভিধানে প্রতিটি অন্তর্ভুক্ত বিষয়ের প্রচলিত নাম, উৎপত্তি, ব্যবহার, জনজীবনের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক, নির্দিষ্ট বিষয়ের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি ধরে রাখা যায়। যেমন, বিভিন্ন দেবদেবীদের নাম, তাঁদের উৎপত্তি, বিবর্তন ও বিকাশ, কোন্ স্থানে কি নামে পরিচিত, কি তাঁদের ক্ষমতা ও মাহাত্ম্য, কোন্ উপলক্ষ্যে কিভাবে তাঁদের পূজা করা হয়, কারা তাঁদের পূজা করেন, পূজা করার রীতি-পদ্ধতি কেমন, ইত্যাদি তথ্য এই অভিধানে অন্তর্ভুক্ত করে রাখা যাবে, যাতে প্রয়োজনে যে কেউ এই বিষয়ে বিস্তারিত না হোক, সংক্ষিপ্ত তথ্য হাতের কাছে পেতে পারেন।

- ১১ উপভাষা-সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতি নিয়ে যারা গবেষণা করেন এই ধরনের ভাষাংশ তাঁদের কাজে লাগে। উপভাষার শব্দভাণ্ডার, বিশেষার্থক শব্দের ব্যবহার, প্রবাদ-প্রবচন-বাগধারার ব্যবহার, মান্যভাষা ও উপভাষার মধ্যে ভাষাতাত্ত্বিক পার্থক্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে গবেষণার জন্য উপভাষার ভাষাংশের অবদান ও প্রাসঙ্গিকতা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই।
- ১২ উপভাষার ভাষাংশ প্রকাশনার জগতেও কার্যকরি ও ফলদায়ী ভূমিকা পালন করতে পারে। ভাষাংশ থেকে সংগৃহীত গান, ছড়া ইত্যাদি আলাদা করে বেছে নিয়ে উপভাষার গান ও ছড়ার সংকলন, উপভাষার অভিধান, রূপকথা, উপকথা, পুরাণকাহিনি, লোককাহিনির সংকলন, সমাজবিজ্ঞানের নানা বিষয়ের (যেমন, লোকাচার, রীতিনীতি, চিকিৎসা, সাহিত্য, চাষাবাস, ইত্যাদি) বইপত্র তৈরি করা যেতে পারে যা উৎসাহী পাঠকের সংগ্রহে স্থান পেতে পারে।

৭ কথা শেষ

উপভাষা ভাষাংশের প্রধান ও প্রথম ব্যবহারকারী হবেন উপভাষাবিজ্ঞানীরা যারা ভাষাংশে অন্তর্ভুক্ত তথ্য ও প্রমাণের আলোকে উপভাষাকে বিচার বিশ্লেষণ করবেন। এঁদের পরে পরেই থাকবেন উপভাষার অভিধান নির্মাণকারীরা যাদের কাছে এই ভাষাংশ এক অতি প্রয়োজনীয় রত্নভাণ্ডার যেখান থেকে তাঁরা সমস্ত প্রকার শব্দ, সেগুলির ব্যবহার এবং অর্থ বৈচিত্র্য জেনে নিতে পারেন। একইভাবে, যারা উপভাষার গান, গল্প, ছড়া, প্রবাদ, বাকধারা ইত্যাদি নিয়ে গবেষণা করার কথা ভাবছেন তাঁরাও এই ধরনের ভাষাংশ থেকে প্রয়োজনীয় সংবাদ সহজেই সংগ্রহ করতে পারবেন। এঁদের পরে পরেই থাকবেন সমাজভাষাবিজ্ঞানীরা যারা এই ভাষাংশ থেকে ঔপভাষিক সমস্ত তথ্য ও প্রমাণ পেয়ে যেতে পারেন।

একই পথের যাত্রী হতে পারেন নৃবিজ্ঞানী ও অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানীরা যারা ভাষার আলোয় চিনে নিতে চান লোকজীবনের বাইরের আর ভেতরের দুই রূপ। এছাড়াও এঁদের

দলে থাকতে পারেন সাধারণ ভাষাবিজ্ঞানীরা যাঁদের কাছে উপভাষার সমস্ত প্রকার ভাষাতাত্ত্বিক তথ্য ও প্রমাণ সাধারণ ভাষাবিজ্ঞানের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনায় কাজে আসতে পারে। প্রকাশকরাও এই ধরনের ভাষাংশ থেকে তাঁদের প্রয়োজন মেটাতে পারেন। উপভাষার গান, গল্প, ছড়া, প্রবাদ-প্রবচন, রূপকথা, উপকথা ও পুরাকাহিনির সংকলন তাঁদের ব্যবসার পালে জোর হাওয়া লাগাতে পারে (এই ধরনের বইয়ের ক্রেতা কোনও কালেই কম ছিল না, এখনও তো আবার বাড়তির দিকে)। সব শেষে রয়েছেন অসংখ্য ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-অধ্যাপক ও উপভাষাপ্রেমী মানুষজন যাঁদের কাছে এই তথ্যভাণ্ডার অনেকটা সেই গন্ধমাদন পর্বতের মতো, যার থেকে সচেতন রসিক খুঁজে নিতে পারেন তাঁর সাধের বিশল্যকরণী।

টীকা :

- ১ এই কাজের বিস্তৃত বিবরণ এখানে অপ্রাসঙ্গিক। তবে সংক্ষেপে জানিয়ে রাখা যেতে পারে যে, এক সাধারণ হিসাবে পৃথিবীর প্রায় তিরিশটি দেশে উপভাষার ভাষাংশ তৈরি করার কাজ চলছে। এর মধ্যে রয়েছে গ্রেট ব্রিটেন, জার্মানি, আমেরিকা, ব্রাজিল, নরওয়ে, ডেনমার্ক, সুইডেন, ফ্রান্স, মালয়েশিয়া, চীন, দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, কানাডা সহ আরও অনেক দেশ।
- ২ এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা যেতে পারে এই মুহূর্তে বাংলা ভাষায় কেবল একটি মাঝারি মাপের সাধারণ লিখিত ভাষাংশ ছাড়া কিছুই নেই (দাস ২০০২)। এমনকি এই ভাষাংশকে দরকারমতো প্রক্রিয়াকরণ করে প্রয়োজনীয় তথ্য বের করে নেওয়ার মতো ভাষা প্রযুক্তির সফটওয়্যারও তৈরি করা সম্ভব হয়নি, যদিও দু-একটি ক্ষেত্রে কিছুটা সাফল্য পাওয়া গেছে।
- ৩ এগুলি ছাড়াও উপভাষা ও আঞ্চলিক ভাষার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আরও কিছু আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে অন্যত্র। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন সরকার (১৯৯৭, ২০০৩), নাথ (২০০১, ২০০২) ভৌমিক (১৯৯৯, ২০০৩), বন্দ্যোপাধ্যায় (২০০২)।

সূত্রনির্দেশ : বাংলা :

ইসলাম, পি. এম. সফিকুল (১৯৯২) *রাজশাহীর ভাষা*। ঢাকা : বাংলা একাডেমী।
 করিম, মীর রেজাউল (১৯৯০) *শেরশাবাদিয়া সম্রাটদের ভাষা ও সংস্কৃতি*। কলকাতা : পুস্তক বিপণি।
 চক্রবর্তী, নরেন্দ্রনাথ (১৯২৪) “খুলনা জেলার মাঝির ভাষা”। *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*। ৩১(২) : ৭৩-৭৫।
 দত্ত, শ্যামাপ্রসাদ (১৯২৭) “উলুবেড়িয়া মহকুমার সংক্ষিপ্ত ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য”। *ভাষা*। ১(১) : ১৯-২৬।
 পাল, অনিমেষকান্তি (২০০৩) “মেদিনীপুরের কথ্যভাষা বা উপভাষা”। অন্তর্গত : ভৌমিক, তাপস (সম্পাদিত) *বিষয় : বাংলা ভাষা*। কলকাতা : কোরক সাহিত্য পত্রিকা। পৃষ্ঠা : ৩৯৩-৩৯৭।
 দাশ, নির্মল (১৯৯৭) *উত্তরবঙ্গের ভাষাপ্রসঙ্গ*। কলিকাতা : ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানি।
 দাশ, নীলদ্রিশেখর (২০০২) “ভাষাংশ ভাষাতত্ত্ব : ভাষাবিজ্ঞানের নতুন দিগন্ত”। *অবভাস*। ২(২) : ৩৬-৬২।
 নাথ, মুণাল (২০০২) “ভাষাচর্চায় গোপাল হালদার”। *পরিকল্পনা*। ৫(১) : ২২-৩৫।
 নাথ, মুণাল (২০০১) “বিশ শতকের ভাষাতত্ত্ব ও ভাষাচর্চা”। *পরিকল্পনা*। ৪(১) : ১২৫-১৬২।
 বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার (সম্পাদিত) (১৯৯১) *আঞ্চলিক বাংলা ভাষার অভিধান*। কলকাতা : প্রথম খণ্ড।
 বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ (সম্পাদিত) (২০০২) *বাজলির ভাষাচিন্তা*। কলকাতা : প্রত্নসিদ্ধি পাবলিশার্স।
 বর্মণ, কালীপ্রনাথ (১৯৭০) *রাজবংশী অভিধান*। শিলিগুড়ি।
 ভট্টাচার্য, কৃষ্ণপ্রিয় (১৯৯০) *দুয়ারের লোকায়ত শব্দকোষ*। তিস্তাপক্ষ : শিলিগুড়ি।

- ভৌমিক, তাপস (সম্পাদিত) (১৯৯৯) *অভিধান সংখ্যা*। কলকাতা : কোরক সাহিত্য পত্রিকা।
- ভৌমিক, তাপস (সম্পাদিত) (২০০৩) *বিষয় : বাংলা ভাষা*। কলকাতা : কোরক সাহিত্য পত্রিকা।
- রায়, কামিনীকুমার (১৯৬৯-৭০) *লৌকিক শব্দকোষ*। (দুই খণ্ড) কলকাতা : লোকভারতী।
- রায়, ভব (২০০১) *রাড়ের লোকভাষা ও শব্দকোষ*। কলকাতা : দীপায়ন।
- শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ (সম্পাদিত) (১৯৭৪) *বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান*। ২য় মুদ্রণ। বাংলা একাডেমি : ঢাকা।
- সরকার, পবিত্র (১৯৯৭) *লোকভাষা লোকসংস্কৃতি*। দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ। কলকাতা : চিরায়ত প্রকাশন।
- সরকার, পবিত্র (২০০৩) *ভাষাপ্রেম ভাষাবিরোধ*। কলকাতা : দেব প্রকাশন।
- সেন, সুকুমার (১৯৭৩) *বাঙলার নারীর ভাষা*। কলকাতা : বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।
- হাই, আব্দুল (১৯৬৫) "ঢাকাই উপভাষা"। *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*। ৯(১) : ২৫-৩৮।
- হালদার, বলাইচাঁদ (২০০২) *ডায়মন্ড হারবার অঞ্চলের বাংলা উপভাষা*। কলকাতা : পুস্তক বিপণি।

ইংরেজি :

- Ayto, J. (1990) *Dictionary of Word Origin*, London : Blumsberry.
- Chambers, J. K. and P. Trudgill (1998) *Dialectology*. 2nd Edition, Cambridge : Cambridge University Press.
- Halder, Gopal (1929) "A brief sketch of the Noakhali dialect of the South Eastern Bengali." *Journal of the Department of Letters*. 19 : 1-40.
- Halder, Gopal (1986) *A Comparative Grammar of Eastern Bengali Dialects*. Kolkata : Puthipatra
- Humayun, Rajib (1986) *A Descriptive and Sociolinguistic Study of Sandipi Dialect*. Dhaka : University Press Ltd.
- Morshed, Abdul, K. M. (195) *A study of standard Bengali and the Noakhali Dialect*. Dhaka : Bangla Akakemy.
- Sen, Nilmadhab (1972) "Some dialects of Bangladesh : an outline." *Indian Linguistics*. 33(2) : 143-152.

কুন্তিবাসের রামায়ণ : শুচিবায়ুর একদিক

বীতশোক ভট্টাচার্য

Was it his spirit, by spirits taught to write
Above a mortal pitch, that struck me dead?

(Shakespeare : Sonnets : 86)

এলিজাবিথান নাট্যকারদের মধ্যে সেরা সম্ভাবনায় পূর্ণ শিল্পী এবং সে-যুগের প্রধান অনুবাদক জর্জ চ্যাপম্যানের আর তাঁরই অনুবাদকর্মের প্রেরণাস্বরূপ হোমারের প্রাসঙ্গিক ও আনুষঙ্গিক উল্লিখন থেকে গেছে শেকসপিয়রের এ-সনেটে। চ্যাপম্যান কবি, তিনি নাকি এসব সনেটের সেই প্রতিদ্বন্দ্বী কবি, যিনি শেকসপিয়রের প্রিয়জনকে প্রলুব্ধ করে শেকসপিয়রের থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছিলেন। পরিবারে উচ্ছে-উচ্চারিত-হতে-পারবে-না এমন অনুচিত শব্দাবলি বিবর্জন করে এবং তথাকথিত ক্রটিমুক্ত করেও একটি দশ-খণ্ড শেকসপিয়র সম্পাদন করেছিলেন টমাস বাউডলার নামের রোমান্টিক যুগের এক ভদ্রলোক, ভিকটোরিয়ান নীতিবোধের পূর্বাভাস লক্ষিত হয়েছিল সে-সম্পাদনায়, এবং তারপর থেকে গ্রন্থের নিরাপদ পরিশুদ্ধিকরণের সঙ্গে জড়িত হয়ে গেছে ‘বাউডলারাইজ’ নামের নিন্দাসূচক পরিভাষাটি। ব্রাহ্মণ্যধর্মের সঙ্গে শুচিকটির দূরত্ব অসেতুসাধ্য নয় এবং শুচিবায়ুগ্রস্ত সম্পাদকতার এরকম উদাহরণ বাংলার অনুবাদসাহিত্যেও কম নেই। উদ্বোধন কার্যালয় হতে প্রকাশিত এবং স্বামী গণ্ডীরানন্দ সম্পাদিত উপনিষৎ-গ্রন্থাবলি-র মধ্যে গ্রাম্য ও অস্বস্তিকর বিবেচনায় বর্জন ও পরিবর্তনের এমন নমুনা অবিরল। যেমন, বৃহদারণ্যক উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণের দ্বিতীয় মন্ত্রটির উপক্রম ও উপসংহার অংশেরই বাংলায় ভাষান্তরণ সম্ভব হয়েছে মাত্র; চতুর্থ মন্ত্রেরও অনুবাদও আছে, তবে তৃতীয় মন্ত্র এবং পঞ্চম থেকে দ্বাদশ মন্ত্রের কোনও অনুবাদই নেই। ছান্দোগ্যর পঞ্চম অধ্যায়ের অষ্টম খণ্ডের প্রথম মন্ত্রটি শুরুর পরেই ‘ইত্যাদি’ শব্দটি দিয়ে অনুবাদের দ্রুত সমাপন ঘটানো হয়েছে, চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ খণ্ডের দ্বিতীয় মন্ত্রটিতে কথিত সত্যকাম-জ্বালের উপাখ্যানটিতে যেহেতু এক বহুপরিচারিণী মহিলা ও তাঁর সন্তানের প্রাপ্য সামাজিক স্বীকৃতি রয়েছে তাই অনুবাদসূত্রে একথা জানানো যেন জরুরি হয়ে পড়েছে : “আধুনিক পণ্ডিতগণ এই অংশের অন্যরূপ অর্থ করেন জানিয়াও আমরা শঙ্করানুমোদিত অর্থই গ্রহণ করিলাম।” ‘পশুপাণ্ডিত্য’ শব্দটি রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি এবং এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ শঙ্করানুমোদিত অর্থ গ্রহণ না করে পদ্যবন্ধে ও গদ্যকবিতায় এ-উপাখ্যানের অনুবাদ-অনুসৃষ্টির শিল্পায়াসে সফল। পূর্বোক্ত বৃহদারণ্যক-উপনিষদে বোধহয় জাত্যবিদ্যার সূত্রেই যৌন-সমস্যা প্রথম ভারতীয় আলোচনার অলঙ্ঘ্য বিষয় হয়ে উঠেছিল, কামচেতনা অন্যান্য বাসনার সমতুল বলে গণ্য হতে পেরেছিল, শরীরী-সম্পর্কের রহস্যের সেই উদ্ঘাটনে যুগলসম্মিলন হল এক যন্ত, সে-অনুষ্ঠানে নারীই

হচ্ছে সেই আশুন যাতে বীজ নিষ্কিপ্ত, আর সেই হবিদান হতে সন্তানের উদ্ভব। সঙ্গতভাবেই নারীতে উপগত হওয়ার সূত্র আছে সেখানে, এমনকি স্বকীয় স্ত্রীর প্রেমিকের সঙ্গে স্বামীর মুখোমুখি হওয়ার প্রসঙ্গও রয়েছে। স্বাভাবিক মনে হয় বাৎসর্যায়ন যখন ওই-উপনিষদে উল্লিখিত ঔদালকি-শ্বেতকেতুকেই কামশাস্ত্রের আদি জনকরূপে চিহ্নিত করেন।

আদিকাব্য *রামায়ণ*-এর অনুবাদেও সম্পাদকের শুচিবায়ু দুষণ ছড়ায়। হোমারের এপিক পুত পাঠ্যবস্তু ছিল, একথা মাত্র আনুষঙ্গিক উল্লেখের যোগ্য, অন্যদিকে বাস্মীকীয় *রামায়ণ*-এ ধর্মীয় প্রসঙ্গের গুরুত্বের কথা বলাই বহুলতা বোধ হয়। সতেরো শতকের পূর্বকার পাশ্চাত্যে হোমার সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত মহাকবি রূপে গৃহীত হন নি, কিন্তু প্রাচ্যে বাস্মীকি ও তাঁর *রামায়ণ* স্মরণের অতীত কাল হতে ধর্মপরায়ণ কবিগুরু ও আদিকাব্যরূপে সমাদৃত। সংস্কৃতভাষী ভারতীয়রা যে ভাষিক ও নীতিক প্রৌঢ়তায় *রামায়ণ*কে সম্ভব করে তুলেছিলেন, ভারতের জাতীয় কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসের আদ্য পর্যায়সমূহে সে-আদিকাব্য যেভাবে অস্তিত্ববান ছিল, সেভাবে বাঁধা এই ধ্রুবপদটির গুরুত্ব নিশ্চয় অস্বীকার করা যাবে না। তবে সৃষ্টিশীল প্রকাশের সামর্থ্য ও আকাঙ্ক্ষায় সফল এবং *রামায়ণ* থেকে গ্রহিণী বাংলাভাষী রচয়িতার সংখ্যা ক্রমশ কমে এসেছে। মধ্যকালীন কাব্য-সাহিত্যে কৃষ্ণিবাসের *রামায়ণ* একটি ভিত্তিস্থানীয় তল নির্মাণ করলেও হিন্দিভাষীর কাছে, বাংলাভাষীর কাছেও এখন তুলসীদাসের *রামচরিতমানস* বৈপুল্যে ও বৈচিত্র্যে অতুলন। *রামায়ণ*, বিশ্বের সেরা অন্তত দশটি গ্রন্থের একটি, শত শত বর্ষ ধরে লক্ষ লক্ষ মানুষের বিশ্বাস ও শুদ্ধতার স্থল, তবু সে-অনুপাতে নগণ্য অংশের পাঠক প্রকৃত সংস্কৃত *রামায়ণ* পাঠে সমর্থ, অনুবাদে-অনুসৃষ্টিতেই মাত্র *রামায়ণ*-এর শ্রবণে বা পঠনে তাঁরা সক্ষম, অকৃতার্থের কাছে চরিতার্থতার এই স্বরূপে তুলসীদাস কৃষ্ণিবাসের মধ্যকালীন ভাষান্তরণের একান্ত শ্রম ও অভিযুক্তিতার স্পর্ধা বিশেষ গুরুত্বে পূর্ণ। সেসময়ের কথক ও শ্রোতা একযোগে ‘ভাষা’ বা বাংলায় *রামায়ণ*-এর প্রয়োজন অনুভব করেননি খুব সম্ভবত, সে-কালের মঠে-মন্দিরে-অস্থলে-চণ্ডীমণ্ডপে এজাতীয় নবীন অনুবাদের পুথি-রক্ষার বিষয়টি ধর্মীয় সমর্থন পায়নি বলেই মনে হয়, শ্রমসাপেক্ষ ও ব্যয়সাধ্য বাংলা *রামায়ণ*-এর হস্তলিপিসমূহ রচনার কাজ তা হলেও ক্রমে অগ্রসর হয়ে এসেছে, ফলে *রামায়ণ*পালার পুথিগুলির ঐতিহাসিক বিকাশের ছবিটি গুণগত না হলেও পরিমাণগত আধিক্যে পরিণতপ্রায়। *রামায়ণ*-এর পাঠক যঁারা তাঁরা আসলে *রামায়ণ* অনুবাদেরই পাঠক, আর কৃষ্ণিবাসের পাঠকই তাঁদের অধিক অংশ, আর সেজন্যই এ-বিস্ময় ন্যায্য যে, *রামায়ণ*-এ আপমনির্ভর ওই বিরাট পাঠককূলের কাছে কৃষ্ণিবাসের *রামায়ণ* কতখানি সেবাপরায়ণ, সাধারণভাবে *রামায়ণ*-এর পদ্যানুবাদ—বিশেষত কৃষ্ণিবাসের ভণিতাক্ষিত রচনা কি তাঁদের নিশ্চিতভাবে সম্পূর্ণ *রামায়ণ*-এর এবং একান্তভাবে *রামায়ণ*-এরই স্বাদ এনে দিত? এর উত্তর : না এবং হ্যাঁ। তার জন্য কৃষ্ণিবাসের প্রাথমিক দায় নেই, কারণ কারও পক্ষেই সংস্কৃত থেকে বাংলায় পূর্ণ বিশ্বস্ত অনুবাদ রচনা করা সম্ভব ছিল না, কেননা যাকে বলে সর্বস্বীকৃত সংস্কৃত *রামায়ণ* তেমন কোনও প্রামাণিক পাঠ্যবস্তু তখনও নেই, এখনও ভয়ে-ভয়ে নেই-ই বলতে হয়, তাছাড়া বিশ্বস্ত অনুবাদ বলে যে শেষপর্যন্ত যে কিছু হয় না সে কথা তো বলাই বেশি। আর কৃষ্ণিবাস তো সংস্কৃত *রামায়ণ*-এর নানা পাঠান্তরসম্বলিত সুপণ্ডিতের সম্পাদিত মূল *রামায়ণ*-এর কোনও সংস্করণ নিয়ে অনুবাদ করতে বসবার সুযোগ পান নি, পেলেও নিতে চাইতেন কিনা সন্দেহ, সংস্কৃত *রামায়ণ*-এর ঐচ্ছিক-অনৈচ্ছিক

পাঠভেদসংকুল নানান অংশের অনুলিপি ও তস্য অনুলিপি ও অন্যান্য পুথি ছড়িয়ে তাঁকে লিখতে বসতে হয়েছিল। সীমা ছিল তাঁর বিশ্বস্ততার, সেটুকু আনুগত্য নিয়েই বাশ্মীকির সঙ্গে স্বজনের আত্মীয়তা সম্ভব করে তুলতে পেরেছেন, তাই কৃষ্ণিবাসের স্বীকৃতি তাঁর পৃষ্ঠপোষক গুণগ্রাহীর আশা ছাড়িয়ে উঠেছে। বিচল হরফ, খ্রিস্টান মিশনারি ও বটতলার ফেরিওয়ালার সৌজন্যে উনিশশতকের বাঙালির অনক্ষরতা ও দারিদ্র্যের পটভূমিতেও মুদ্রিত কৃষ্ণিবাসি কাশীদাসি রামায়ণ মহাভারত-এর অভিঘাতের সক্রিয় ভূমিকা উপেক্ষা করা যাবে না। মুদ্রিত সংস্কৃত রামায়ণ-এর প্রকাশে, উপক্রমণিকা ও অন্যান্য সংস্কৃত এবং বাংলা ব্যাকরণের মুদ্রণে, মূল পাঠ্যবস্তু ও তার ভাষান্তরণের যাথাযথ বিষয়ে বিদ্যাবান অনুবাদকের নিবিষ্ট প্রয়াস সফল হয়ে উঠছিল এমন কল্পনা করতে ভালো লাগে। মুদ্রণের ভুল হস্তলিখনের ত্রুটির পরিমাণ হয়তো ছাড়িয়ে উঠতে পারে নি। এখানে ব্রাহ্ম ও খ্রিস্টানধর্ম রুচিভেদ সত্ত্বেও কৃষ্ণিবাসের রামায়ণ-এর প্রতি পরাস্থ ছিল না, কিন্তু রেনেসাঁয়ের বাঙালি ও বাংলাভাষা মহিমাম্বিত গদ্যশৈলীর আধারে রামায়ণকে বিধৃত দেখতে চাইছিলেন। অথচ বিদ্যাসাগর, হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য ও পঞ্চানন তর্করত্নদের প্রাতিস্থিক না হোক একব্যক্তিক এক-একটি অনুসৃষ্টি বা অনুবাদে বাশ্মীকীয় রামায়ণের বৈভব সমগ্রত ধরা ছিল না। পাশাপাশি অচল বাকরীতি ও অপ্রচল পদবিধির ছাপ প্রায় মুছে ফেলে পারিবারিক ও সামাজিক শৈলীর দিকে সহৃদয় চলনে কৃষ্ণিবাসের রামায়ণ একক ও সামূহিক পাঠের যোগ্য হয়ে থেকে গেল। তাঁর বাক্যের পর বাক্য উন্মোচনে কোনও অস্পষ্টতা নেই, সমিল পয়ারবন্ধের রচনায় তিনি আদ্যন্ত সাবলীল, রামপাঁচালির সুরের একমুখিতার মতোই তাঁর শব্দ-ভাব-ভাবনের গতি নির্বাধ মসৃণ স্বচ্ছন্দ। শ্লিষ্ট প্রাণশক্তির বিচ্ছুরণে রুচির, জীবন্ত সহৃদয়তার দীপ্তিতে আলোকিত, কৃষ্ণিবাসের সমীচীন অনুবাদ আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে সম্পাদকের হস্তক্ষেপে, শুচিবায়ুর বিড়ম্বনায়।

কৃষ্ণিবাস এবং চ্যাপম্যান দুজনেই মূলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, নীতিবাদী প্রবণতা উভয়ের রচনাতেই লভ্য, প্রক্ষেপের ঝোঁকও দুটি রচনাতেই অলক্ষগোচর নয়। তাঁদের জ্ঞান ও কাণ্ডজ্ঞানের অবিরোধে তাঁদের অনুবাদ নিষ্পন্ন, ফলে ইন্দ্রিয়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে তাঁদের ভাবনার বিকিরণ, ঐন্দ্রিয়িক চেতনায় সম্পন্ন তাঁদের ভাবুকতা। ম্যাথু আরনল্ডের মতো নীতিবাগীশ কবিসমালোচকও কাব্যের বিষয়-নির্বাক প্রসঙ্গে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, যে-প্রসঙ্গ পাঠকের কাছে উপাদেয় বোধ হবে, প্রেরণা ও আনন্দ সম্ভারিত করবে, সেই প্রসঙ্গ ই কাব্যের যোগ্য বিষয়। শুধু শিলার নয়, এ-ক্ষেত্রে তিনি সাক্ষী মেনেছেন হেসিঅদকেও। শিলারের উদ্ভি উদ্ভূত করেছেন তিনি : সব শিল্প আনন্দে নিবেদিত, কারণ মানবতাকে সুখী করা ভিন্ন উচ্চতর ও গভীরতর কোনও সমস্যা নেই। সর্বোচ্চ উপভোগ যাতে সম্ভব তাই যথার্থ শিল্প। তাই : “অগস্ত্যের কথা শুনি রামের উল্লাস।/ মুনি আর কিছু তার কহ ইতিহাস।।” কৃষ্ণিবাসি রামায়ণ সম্পাদকের হস্তাবেগনের স্থূলতায় এ আনন্দ অনেক স্থলে মুছে গিয়েছে, তার একটি ছোটো নমুনা দিয়ে প্রধান প্রসঙ্গে প্রবেশ সহজ হবে। আরণ্যকাণ্ডে পরিব্রাজক রাবণ সীতাহরণের পূর্বে সীতার শরীরী সৌন্দর্য বর্ণনায় অকৃপণ, সীতাও অকুণ্ঠিতচিত্তে প্রাপ্য প্রশংসা গ্রহণ করেছেন, হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য কৃত অনুবাদে তার একটি অংশ এমন : “তোমার... স্তনদ্বয় উচ্চ সংশ্লিষ্ট বর্তুল কমণীয় ও তালপ্রমাণ, উহার মুখ উন্নত ও স্থূল, উহা উৎকৃষ্ট রত্নে অলঙ্কৃত এবং যেন আলিঙ্গনার্থে উদ্যত রহিয়াছে।” বটতলার সংস্করণের একটি ছত্রে এর আভাষমাত্র

হলেও পাওয়া যাচ্ছে : “সুললিত দুই স্তন শোভা করে হারে।” কিন্তু হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ‘রুচিসম্মত’ সাহিত্য সংসদ সংস্করণে এর লেশমাত্র নেই, তারপর পাওয়া যাচ্ছে : “রহু দ্বিজ ফল আনি দিবেন লক্ষ্মণ।/সেই ফল দিব তুমি করিও ভক্ষণ॥” পূর্বোক্ত ‘তালপ্রমাণ’ শব্দটিতেই ফলের তুলনা ছিল, বাংলার জয়দেব পর্যন্ত তালফল ও স্তনের গুরুত্ব ও ঔদার্যকে মিলিয়ে দেখতে পেরেছেন, ফল ও স্তনের ওই উপভোগ্য ও মিলিত মোটিফটি রামকথার ছায়া-পড়া বাংলা ছড়ায় কিন্তু থেকে গেছে, থেকেই গেছে এক সম্মাসীর উদ্ভিন্তে ও কন্যার প্রত্যুদ্ভিন্তে :

(সম্মাসী) ধান নাড়ো কন্যে চাড়ো কন্যে হস্ত পদ পান।

বুকের মাঝে শ্রীফল দুটি ব্রাহ্মণকে করো দান।

(স্ত্রী) ভালো করেছ ব্রাহ্মণ ঠাকুর তোমার কথা মানি।

বারো বছর বিয়ে হয়েছ সোয়ামি নাহি চিনি।

মনে পড়ে, মিলান কুন্দেরা বলেছিলেন যে, স্বভূমির সঙ্গে আমাদের সব থেকে গভীরভাবে যা যুক্ত করে রাখে তার নাম ‘অম্লীলতা’। আর ‘গ্রাম্যতা’, তাও আয়তনবান করে আমাদেরই অস্তিত্বকে।

২

নেই বললে সাপের বিষ নেই, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত কৃষ্ণিবাসের *রামায়ণ* দেখে কেউ বলতেই পারেন : উত্তররামায়ণে রঙাহরণবৃত্তান্ত নেই। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় *গীতগোবিন্দ* অবিকল সম্পাদনা করেন, তীব্র আদিরসাত্মক এ-কাব্য ছব্ব সম্পাদনের ক্ষেত্রে জনরুচি তাঁর কাছে বাধা হয় না, কিন্তু কৃষ্ণিবাসের *রামায়ণ*-এর বেলায় তিনি ভিন্ন রীতিনীতি অনুসরণ করেন। শুধু এই সাহিত্যসংসদ-সংস্করণে নয়, প্রবাসী-সংস্করণেও রঙাহরণ বৃত্তান্ত ছিল না, জনার্দন চক্রবর্তী সম্পাদিত উত্তরাকাণ্ডের স্বতন্ত্র সংস্করণের মন্তব্যটিও লক্ষ্য করবার মতন : “এখানে ক. ২১১, ক. ২১৫, শ্রী. ১ ও হী. সংস্করণ মিলাইয়া নূতনভাবে রাবণ-রঙা কাহিনী বিন্যস্ত হইল।” ‘জয়গোপালগণের হস্তক্ষেপে’ আধুনিক সম্পাদকেরা একদিকে বিব্রত, অন্যদিকে তাঁরা ‘বটতলার ধারা’ বজায় রাখবার পক্ষপাতী, কিন্তু তাঁদের সম্পাদিত কৃষ্ণিবাসের *রামায়ণ*-এ বটতলাস্বীকৃত রঙাহরণের উপাখ্যান হয় একেবারেই স্থান পায় না, বা নামমাত্র স্থান পায়, অর্থাৎ শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়ায় পরিস্ফুট হয়ে শৃঙ্খারস অপেক্ষরূপে পরিবেশিত হয়। শুচিকরণের স্ব-আরোপিত দায়িত্ব গ্রহণকারী এই সব সম্পাদকের মুখপাত্র হয়ে জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী মন্তব্য করেন : “এই অংশ প্রচলিত সংস্করণে যাহা আছে, তাহা যেমন গ্রাম্য, তেমনই রুচি-বিগর্হিত।” গ্রাম্য ও রুচি-বিগর্হিত বলে কোনও রচনাকে সর্বসম্মতভাবে শনাক্ত করবার কোনও নিরীক এখনও সভ্যতা আমাদের শেখায় নি, কিন্তু সংস্কৃত রচনা ও বাংলা রচনা সম্পাদনে দুই ভিন্ন মাপকাঠির ব্যবহার অবশ্যই দ্বিচারিতা মনে হতে পারে। রঙাহরণের সঙ্গে ধিমের মিল আছে ল্যাভিনিয়ার ধর্ম ও তার প্রতিশোধমূলক শেকসপিয়রের টিটাস অ্যানড্রোনিকাস নাটকটির, এ-নাটকের আর্ডেন-সংস্করণের সম্পাদকীয় মন্তব্যের অনুসরণে বলা যায় : রঙাহরণ

এখন আমাদের কাছে যত অসংস্কৃত, কৃতিবাসের কালে নিশ্চিতই তার থেকে কম-অসংস্কৃত ছিল।

শুদ্ধতার অনুরোধে প্রথমেই ব'লে নেওয়া কর্তব্য যে, 'মূল' রামায়ণ-এর নলকুবের-রত্না-রাবণ সংবাদ তো দূরের কথা, কুবের-রাবণ প্রসঙ্গই ছিল না, এমনকি সমগ্র উত্তরকাণ্ডে প্রামাণিকতাই অসন্দিদ্ধভাবে প্রতিষ্ঠিত নয়। উত্তরকাণ্ডে বাম্মীকীয়-রামায়ণ রচয়িতা বাম্মীকি স্বয়ং এক প্রধান চরিত্ররূপে অবতীর্ণ, ভবিষ্যতের কাহিনি গাথার অন্তর্ভুক্ত—উত্তরকাণ্ডের এ বিয়টিও অদ্ভুত, তাই যেন সংস্কৃত রামায়ণ-এ একাধিকবার বলে নেওয়া হয়েছে : 'ভবিষ্যম্ উত্তরম্ চৈব সর্বং বাম্মীকিনা কৃতম্', এবং 'শেষম্ ভবিষ্যম্ ককুস্থ কাব্যম্ রামায়ণং শুভম্'। নতুন নতুন উপাখ্যানে সমৃদ্ধ হয়ে-ওঠা উত্তরকাণ্ড উত্তরকালের যোজনা নিঃসন্দেহে, রামায়ণ-এর সপ্তকাণ্ডের সমগ্রতা কোনও সমজ্ঞিত রচনার পরিচয় বহন করে না, দ্বিতীয় শতক হতে বাম্মীকির রামকথা নব নব কাহিনিরূপে বিস্তীর্ণ হতে শুরু করেছিল, রঘুবংশ-রচয়িতা কালিদাস একমাত্র উত্তরকাণ্ড প্রসঙ্গেই বাম্মীকির নাম করেছেন, কাজেই পরবর্তী প্রক্ষেপ ও পরিবর্তনকে অঙ্গীকার ক'রে মূল রামায়ণ কখন যে রত্নাহরণের প্রসঙ্গটি স্বীকরণ ক'রে নিয়েছে তার কাল যথাযথ নির্ধারণ বোধহয় অসম্ভব। বাম্মীকীয় রামায়ণ বর্তমানের যৌগ ও আপাতসংস্কৃত রূপ পেয়েছে সম্ভবত প্রায়-আড়াই হাজার বছর আগে, কৃতিবাসের রামায়ণও তার অন্তত এক হাজার বছর পরেকার রচনা, সেখানেও রামায়ণ ছাড়া অন্য রচনা হতে সংযোজিত অংশ যে নেই তা শপথ ক'রে বলা যাবে না। উত্তররামায়ণ এখন অসংশয়িতভাবে মূল রামায়ণ-এর অংশ, এ প্রত্যয় থেকে যাত্রা শুরু করলে একথা বিশ্বাসের যোগ্য যে, রত্নাহরণও কৃতিবাসি রামায়ণ-এর অংশ।

উত্তরকাণ্ড রামায়ণ-এর এক ধর্মীয় কাঠামো প্রস্তুত করে দিতে পেরেছিল, রাবণের প্রতি নিক্ষিপ্ত অভিষাপসমূহ সেই ধর্মীয়-নীতিক আধারশিলাটিকে দৃঢ় করেছে। কিন্তু এক বীরপুরুষ এক পরস্ত্রীকে হরণ করল এবং তার যোগ্য ফল পেল, প্রাচীনকাব্যসাহিত্যে পুনরাবৃত্ত এই প্রসঙ্গটির ধারায় বিবেচনা করলে রামায়ণ-এর কেন্দ্রীয় ঘটনা সীতাহরণের সঙ্গে রত্নাহরণের মৌল পার্থক্য বিশেষ কিছু নেই। পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত বঙ্গবাসী সংস্করণে এটি উত্তরকাণ্ডের একত্রিংশ সর্গের ঘটনা, তবে বাসুদেব লক্ষ্মণশাস্ত্রী পণশীকর সম্পাদিত নির্ণয়সাগর সংস্করণে এটি ষড়বিংশ সর্গের বিষয়। বাম্মীকি স্বাভাবিক অথচ মহত্বপূর্ণ ভঙ্গিমায় কাব্যময় এবং নাটকীয় এই দৃশ্যটির পরিস্ফুটনের জন্য শৃঙ্গাররসের অনুকূল আলম্বন উদ্দীপনার বিভাব সম্ভারিত করেছেন, যেন রঙ্গক্ষেত্রে কামমোহিত তবু মহাবীর্যশালী জাগ্রত ও নিঃসঙ্গ নায়ক রাবণের যথোচিত ভূমিকা গ্রহণেরই উপযোগী এ নৈসর্গিক পটভূমি, কিন্তু কৃতিবাসি রামায়ণ-এ প্রকৃতিবর্ণনা গুরুত্বপূর্ণ নয়, মূল প্রসঙ্গে প্রবেশের জন্যই ত্বর, তা হলেও সংস্কৃত রামায়ণের প্রারম্ভিক চোদ্দটি শ্লোককে মাত্র চারটি পয়ারে সুন্দরভাবে সংহত করে উপস্থাপিত করা হয়েছে কৃতিবাসের রামায়ণ-এর বটতলা সংস্করণে :

কৈলাস পর্বতে গেল বেলা অবসানে।

বাসা করি রাবণ রহিল সেই স্থানে ॥

দ্বিতীয় প্রহর রাত্রে জাগে দশানন।

চক্ষুর উদয়হেতু নির্মল গগন ॥

সুশীতল রাত্রি বহে বায়ু মনোহর।
ধবল রজনী শোভা করে সুধাকর ॥
রাবণ মদনে মত্ত নারী নাহি পাশে।
হেনকালে রম্ভা যায় উপর আকাশে ॥

চারটি পয়ারবন্ধে এই সারানুবাদের পাশে রাজশেখর বসুর গদ্যে সারানুবাদের চারটি বাক্য রাখলে ওই মূলানুগত অথচ গতিশীল সৃষ্টির সার্থকতার রূপ আরও স্পষ্ট হতে পারে :

রাত্রিকালে সৈন্যগণ নিদ্রিত হলে রাবণ পর্বতশিখরে উপবিষ্ট হয়ে কৈলাসের শোভা দেখতে লাগলেন। কিস্করীগণের মধুর সংগীত, পুষ্পের সম্ভার, শীতল বায়ু, চন্দ্রের উদয়—এইসকল কারণে রাবণ কামাবিষ্ট হলেন। তিনি বারবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চন্দ্রের দিকে চাইতে লাগলেন। সেই সময়ে দিব্যভরণভূষিতা সৌন্দর্যময়ী অঙ্গরা রম্ভা দেবতাদের উৎসবে যোগ দেওয়ার জন্য যাচ্ছিলেন।

‘হেনকালে রম্ভা যায় উপর আকাশে’—আকাশ শব্দটি অঙ্গরা রম্ভাকে এক্ষেত্রে এক অপ্রাকৃত ভূমিকা দিয়েছে, মূলে সচল রম্ভার বাস্তব ছবি ছিল। কিন্তু রম্ভা অঙ্গরা, জলোদ্ভূতা, বাষ্পীকৃত তার তুলনার জন্য আকাশেই তাকিয়েছেন : ‘নীলং সতোয়মেঘাভং বসন্ত সমবগুষ্ঠিতা’ : জলভরা মেঘের আড়ায় রাম্ভানো কাপড়ে বিশেষভাবে ঢাকা এ-রম্ভা। সুন্দরীতমা, তাঁর অভিসারিণী রূপের দৈহিক সুখমা ও অলংকরণ-প্রসাধন-আলোপনের বর্ণনায় বাষ্পীকৃত অকৃপণ, কিন্তু ‘গ্রাম্য’ ও ‘রুচিবিগর্হিত’ এই অনূদিত অংশে শরীরবর্ণনায় পয়ার তেমন অপব্যয়ের লক্ষণ নেই, ঘটনার নাটকীয় সংস্থাপন এ আখ্যানের লক্ষ্য :

রম্ভা রম্ভা বলিয়া রাবণ ধরে হাতে।
তুষিতে কাহার প্রাণ যাহ এত রাতে ॥
কোন নাগরের হেতু যাহ রসবতী।
তাহারে এড়িয়া মোরে ভজ লো যুবতী ॥
রতিশাস্ত্র অষ্টাদশবিধ আমি জানি।
তুমি আমি কেলি করি দিবসযামিনী ॥

রতিশাস্ত্রের উল্লেখ রাবণের প্রস্তাব নাগরিক হয়ে উঠলেও বঙ্গভাষী সম্পাদকের কাছে এ-জাতীয় সংলাপ গ্রাম্য মনে হয়, অথচ বাষ্পীকৃত মূল সংস্কৃত রামায়ণে রাবণের কামনার্ত কঠোর প্রণয়প্রস্তাবটিকে বিশেষ ও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। হেমচন্দ্র ভট্টাচার্যর অনুবাদে সে-অংশটি এরকম :

গিরিশিখরস্থ রাবণ ঐ সর্বাসুন্দরীকে সহসা দেখিতে পাইল এবং কামোন্মাদে গাত্ৰোত্থানপূর্বক লঙ্কাবনভবদনা বস্ত্রার করগ্রহণ করিয়া কহিল, ‘সুন্দরি। তুমি কোথায় চলিয়াছ, কাহার সম্ভোগসিদ্ধির উদ্দেশ্যে যাইতেছ, কাহার এমন সৌভাগ্য যে তোমায় ভোগ করিবে? অহো! তোমার অধরামৃত উৎপলবৎ সুগন্ধি ও সুধাবৎ সুস্বাদ, আজ কে তাহা পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইবে? তোমার এই কঠিন স্তনযুগল স্বর্ণবুস্ত্রাকার ও সুশোভন, আজ কে বক্ষস্থলে ইহার স্পর্শসুখ অনুভব করিবে? তোমার জঘনধ্বজ স্বর্ণচক্রতুল্য কাঞ্চীগুণমণ্ডিত ও সুশ্রব্দ, আজ কে ইহার উপর আরোহণ করিবে? ইন্দ্র, বিষ্ণু ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় প্রভৃতি দেবগণের মধ্যে বল, আজ কে আমা অপেক্ষা ভাগ্যবান আছেন? সুন্দরি। তুমি যে আমায় অতিক্রম করিয়া যাও ইহা তোমার উচিত হয় না। এক্ষণে এই শিলাতলে বিশ্রাম কর। একমাত্র আমিই ত্রিলোকের অধীশ্বর, যে ত্রিলোকের প্রভু আমি তাহারও প্রভু ও বিধাতা। অতএব তুমি আমার প্রার্থনা পূর্ণ কর।

‘রক্তা রক্তা’ কৃষ্ণিবাসি রামায়ণ-এ রাবণের এই বাড়তি ও দ্বিগুণ সন্মোহন ব্যাকুল এবং আন্তরিক, ‘করে গৃহীত্বা’ বা হাত-ধরার প্রসঙ্গটিও মূলে আছে, আর ‘রসবতী’ ‘নাগর’ ‘কেলি’ শব্দও এখন দেখা যাচ্ছে দ্রুত অনাবশ্যক। বাশ্মীকীয় রামায়ণ-এ এক্ষেত্রে রাবণ প্রথমেই বলেছেন : ‘ক গচ্ছসি বরারোহে কাং সিদ্ধিং ভঙ্জসে স্বয়ম্।’ গদ্য অঙ্গে রাবণের অভিপ্রায় আরও স্পষ্ট : ‘কাং সিদ্ধিং কস্য সন্তোগসিদ্ধিম্।’ রাবণ প্রথমেই রক্তাকে সন্মোহন করেছেন ‘বরারোহে’ বলে এবং পরে এমন সন্মোহনের কারণও আনুষঙ্গিকভাবে ব্যাখ্যা করেছেন : ‘অধ্যারোক্ষ্যতি কস্তে’দ্য জঘনং স্বর্গরূপিণম্।’ ‘বরারোহে’ সন্মোহনটি প্রশস্ত আরোহ যুক্ত বা নিতম্ববতী রক্তাকে প্রাসঙ্গিকভাবে উদ্দেশ্য করেছে, আরোহণের অনুষঙ্গও এখানে সক্রিয়। সংস্কৃত রামায়ণ মহাভারত-এ ‘বরারোহে’ সন্মোহন স্বাভাবিক, তার জন্য কেউ বাশ্মীকি ব্যাসকে এখনও ‘গ্রাম্য’ আখ্যা দেন নি। মহাভারতের বনপর্বে জয়দ্রথ দ্রৌপদীহরণে প্রবৃত্ত, জয়দ্রথও দ্রৌপদীকে প্রথম সন্মোহন করেছেন : ‘হে বরারোহে! তোমার মঙ্গল ত?’ প্রত্যুত্তরে দ্রৌপদীও স্বাভাবিকভাবে কুশল কামনা করেছেন : ‘তোমার রাজ্য, কোষ ও বলের কুশল ত?’ দ্রৌপদী বা সীতা পরপুরুষের এরূপ সন্মোহন সহজভাবেই নিয়েছেন।

‘অন্যেভ্যো’পি ত্বয়া রক্ষ্যা প্রাপুয়াং ধর্ষণং যদি।’ অন্য কেউ যদি আমাকে ধর্ষণ করে তাহলে আপনি আমাকে রক্ষা করবেন।—রক্তার সংলাপের শুরুতে এই কথায় ভবিতব্যের ছায়া পড়েছে; আয়রনি এই যে, রাবণই একটু পরে যখন রক্তাকে ধর্ষণ করবেন তখন রক্তাকে রক্ষা করবার জন্য কেউই থাকবেন না। কৃষ্ণিবাসের রামায়ণ-এ রক্তার এই সূচক গূঢ়োক্তিটি নেই, তারপরে রক্তা-রাবণ-সংবাদ অবশ্য মূলের আক্ষরিক অনুবাদ না হলেও রক্তা ও রাবণের বক্তব্য ভাবগত বিশ্বস্ততা রক্ষা করেই ঈষৎ সংক্ষিপ্ত, প্রাঞ্জল এবং নাটকীয়। প্রথমে হেমচন্দ্র ভট্টাচার্যর গদ্যানুবাদ ও পরে কৃষ্ণিবাসি রামায়ণ-এ গদ্যানুবাদ উদ্ধৃত করে এর মূলানুগত্য প্রমাণ করা যায়:

রাবণ কহিল, সুন্দরি। যদি তুমি আমার পুত্রের ভার্য্যা হও তবে অবশ্যই পুত্রবধূ হইতে পার। রক্তা কহিল, হাঁ, আমি ধর্মতই আপনার পুত্রবধূ। ত্রিলোকপ্রখিত নলকুবের আপনার ভ্রাতা কুবেরের প্রাণাধিক পুত্র। তিনি ধর্মবর্মে ব্রাহ্মণ, ভূজবলে ক্ষত্রিয়, ধ্রোমে অগ্নি, এবং ক্ষমায় পৃথিবী। সেই নলকুবের আমায় আহ্বান করিয়াছেন। আমি কেবল তাঁহারই জন্য এইরূপ সুবেশে সজ্জিত হইয়াছি। তিনি যেমন আমার প্রতি অনুরক্ত আমিও সেইরূপ তাঁহার প্রতি অনুরক্ত। তদ্ব্যতীত আমি আর কাহাকেও চাহি না। অতএব আপনি আমাকে ছাড়িয়া দিন। সেই ধর্মশীল নলকুবের একান্ত উৎসুক হইয়া আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন। আপনি তদ্বিষয়ে বিদ্যাচরণ করিবেন না। আমায় ছাড়ুন এবং সংপথে চলুন। আপনি আমার মন্দনীয় শুক, আমি আপনার প্রতিপাল্য পুত্রবধূ।

(বাশ্মীকি রামায়ণ : হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য)

বটতলা-সংস্করণে সংলাপের চলন রাবণের অসিচালনার মতোই ক্ষিপ্ত শাগিত ও অব্যর্থ, নলকুবেরের চরিত্র ব্যাখ্যানের জন্য উৎপ্রেক্ষা প্রয়োগের কোনও অবসর সেখানে নেই, প্রয়োজন নেই রক্তা নলকুবেরের সপ্রেম সম্পর্ক প্রমাণের, রাবণ ও রক্তার কথোপকথন পয়ারবন্ধের নির্ভরে স্বচ্ছন্দে এগিয়ে গিয়েছে :

রাবণ বলিল, তুমি কাহার সুন্দরী।
কি সম্বন্ধে তুমি সে আমার বক্ষ্যারী।

রজা বলে যদি কর সম্বন্ধ বিচার।
 আমারে ছাড়িয়া দেহ করি পরিহার॥
 শ্রীনলকুবর নামে কুবেরকুমার।
 পতিব্রতা হই আমি রমণী তাঁহার॥
 কুবের তোমার জ্যেষ্ঠ ধনঅধিকারী।
 আমি পুত্রবধু যে তোমার বহুয়ারী॥
 শ্বশুর হইয়া কর বধুরে হরণ।
 আমারে অপেক্ষি আছে কুবেরনন্দন॥
 ধর্মে মতি দেহ রাজা ছাড় পরিহাস।
 হাত ছাড়ি দেহ যাই নায়কের পাশ॥

অনুবাদে যেমন অনেক কিছু হারায়, তেমন প্রাপ্তিযোগও ঘটে। এখানে কথক রাবণ ও রজার কণ্ঠোপকণ্ঠনে প্রকাশিত অর্থের তলায় তাৎপর্যের আরেকটি স্তর আভাষিত করেন, বহুয়ারী শব্দের ‘বহু’, এবং ‘দেহ’—এই দুটি শব্দে আয়রনি ধ্বনিত হয়ে ওঠে। ‘আমার বহুয়ারী’ এবং ‘তোমার বহুয়ারী’র মধ্যে মেলে বহু বা বধু এবং বহুত্বের বাচকতা। ‘আমার’ এবং ‘তোমার’ এই বিপর্যাস অতিক্রম করে এখানে তলশায়ী অর্থ রাবণ যে রজার মতো বহু বধু বা বহুকে হরণ করেছেন তার দোতনা জাগে। ‘দেহ’ এই শব্দ ‘ছাড়িয়া দেহ’ বা ‘ছাড়ি দেহ’ এই দাও-সূচক অনুজ্ঞার বিপরীতে দেহ বা শরীরের অভিধা বহন করে রাবণ যে আচরে দৈহিকভাবে রজার সঙ্গে মিলিত হবেন তার পূর্বাভাষ শ্রুত হয়।

‘পতিব্রতা’ শব্দটি স্মরণ করিয়ে দেয় রজা সহসা যেন বাঙালিনির গলায় কথা কয়ে উঠেছেন। সংস্কৃত *রামায়ণ*-এ রজার শরীরী-ভাষা প্রয়োগের দৃষ্টান্ত আছে দু-একটি এবং তা রয়েছে প্রথমেই : ‘বেপমানা কৃতাঞ্জলিঃ’ এবং ‘অথাব্রবীদশগ্রীবশ্চরণাধোমুখীং স্থিতাম্।’ কৃষ্ণিবাসের *রামায়ণ*-এ এ দুটি আদিক-উল্লেখ একাকার হয়ে গিয়েছে : ‘লাজে হেঁটমাথা রজা বলে যোড়হাত।’ রজার পতি নলকুবর এবং-অথবা রজা যেদিন যাকে পতিত্ব বরণ করেন তিনিই রজার বর—পাঠ্যবস্তুর এই উভযোজ্যতা এবং নারী তার প্রণয়ীকে যখন না’ বলে সেই নেতিবাচকতার অর্থ ইতিবাচক ‘হ্যাঁ’, এই উভযোজ্যী সম্পর্কও অতিক্রম করে রচনাটি এক দ্বিধাষিত সীমায় এসে দাঁড়ায় শরীরের ভাষা নির্ভর করে। বাস্তব সেই শরীরীভাষার প্রয়োগে রজাহরণ-বৃন্তান্ত এভাবে মুখর হয়ে ওঠে। মৌনভাব, নাকে-হাত ও হেঁটমুখ অনুবাদক-কথকের পুরুষবাদী পাঠ-প্রক্রিয়ায় এভাবে বক্তব্য বহন করে :

এত যদি কহিলেক রাজা দশানন।
 নাকে হাত দিয়া রজা ভাবে মনে মন॥
 বুঝি রাবণের হাতে পরিত্রাণ নাই।
 মৌন হয়ে থাকি তবে যা করে গৌসাই॥
 এত ভাবি মৌনভাবে থাকে রজাবতী।
 রাবণ বুঝিল রজা দিলেক সম্মতি॥
 কিছুই না বলি রজা মৌনেতে থাকিল।
 রজারে চাহিয়া তবে রাবণ বলিল॥
 হেঁটমুখে রহে রজা রাবণগোচর।
 ভাল মন্দ রজা কিছু না দিল উত্তর॥

রক্তার এ আচরণ বাঙালিনির যোগ্য নয় শুধু, মহাকাব্যিক নায়িকারও উপযুক্ত। গ্রিক এপিক ওর্দিসিতে পত্নী পিনেলোপির অবস্থা বা অবস্থানও ছিল অনুরূপ : তিনি বিবাহকে ঘৃণ্য ব'লে প্রত্যাখ্যানও করতে পারছেন না, আবার বিষয়টিকে সিদ্ধান্তে পৌঁছে দিতেও পারছেন না। (১.২৪৯-৫০) রক্তার এবং কৃষ্ণিবাস নামের কথক-অনুবাদকের এই ভঙ্গিমা, উপাখ্যানের সমাপ্তির ক্ষেত্রে এই বিকল্প-ভাবনা, ওই উভযোজী সম্পর্কটির অম্লয় ঘটিয়ে ডায়ালজিক টেক্সটএর জন্ম দিয়েছে। ওর্দিসি আলোচক জন পেরাডোটোর ভাষায় এ হচ্ছে : “...stratagems of silence to avoid saying ‘yes’ to one system of organizing experience and ‘no’ to another, in a higher and more complicated system, the poem, that only precariously maintains them both.”

উত্তররামায়ণে ষড়বিংশ সর্গে আছে রক্তাহরণের বৃত্তান্ত আর সপ্তদশ সর্গে আছে বেদবতীর বৃত্তান্ত। কৃষ্ণিবাসের রামায়ণ-এ বেদবতীর উপাখ্যানও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রয়াত পিতার ইচ্ছাকে মর্যাদা দিয়ে নারায়ণকে পত্ররূপে লাভ করবার তপস্যায় নিরত সুন্দরী বেদবতীকে দেখে মুগ্ধ রাবণ তাঁকে বিবাহের প্রস্তাব ক’রে ব্যর্থ হন। তারপর : “ধরিয়া কন্যার কেশে করে অপমান।। দৌরাশ্ব্য করিয়া শেষে ছাড়িল রাবণ।” এই কলাৎকারের প্রতিবাদে বেদবতী অগ্নিতে আত্মোৎসর্গ ক’রে বলেন : “নারায়ণ স্বামী হবে জন্মজন্মান্তরে। মোর লাগি রাবণ সবংশে যেন মরে।।” পরজন্মে সেই বেদবতী সীতা হয়ে জন্মেছেন, সেই নারায়ণ রাম হয়ে জন্মেছেন, কিন্তু রাবণ সেই রাবণই আছেন। বেদবতীর শাপে রাবণের যদি সবংশে নিধন ঘটে থাকে, তাহলে রাম তো রাবণবধের নিমিত্তমাত্র, তবে রামায়ণ-এ রামের মহিমার বিস্তৃত কীর্তন সম্পূর্ণ হয় না। সীতাই অযোনিসম্ভবা বেদবতী, বেদবতী পতিপ্রত্যাশী কুমারী, কিন্তু রক্তা পরস্ত্রী ; বেদবতী রাবণকে রীতিমতো অভিশাপ দিয়েছেন কিনা তা অস্পষ্ট, রক্তার স্বামী বা সঙ্গী নলকুবর স্পষ্ট অভিশাপ দিয়েছেন রাবণকে। রাবণ বেদবতীর কেশাগ্র মাত্র স্পর্শ করেছিলেন, রাবণ সীতাকে হরণ করেছেন আরও ঘনিষ্ঠ ভঙ্গিতে : “সে বাম হস্ত উঁহার কেশ এবং দক্ষিণ হস্তে উরুযুগল ধারণ করিল।” এবং রাবণ ধর্ষণ করেছেন রক্তাকে। একটি দাঁতওয়ালা চাকা যেন ঘুরিয়ে চালাচ্ছে আরেকটি দাঁতওয়ালা চাকাকে, এরকমই মহাকাব্যের উপাখ্যানগুলির কলকল্লা, কিন্তু তাদের অগ্রপশ্চাতের বিবেচনা, চাপের হেরফেরের বিচার এক দুর্লভ কর্ম। কখনে যা ঘটে এবং কখনের অতিরিক্ত যা ঘটনা এ দুয়ের অভিঘাতের সম্পর্ক নির্ণয় কঠিন। রক্তাহরণের উপাখ্যানে যা ঘটেছে, তার বাইরে সীতাহরণের কিংবা বেদবতীহরণের উপাখ্যানে যা ঘটেছিল তাদের গতি একমুখী নয়, হয়তো দ্ব্যম্বিক কোনও সম্পর্কে, হয়তো অন্যোন্য় কোনও সম্বন্ধে, তারা পরস্পর আবদ্ধ এবং সচল : সীতাহরণের উপাখ্যান কী বেদবতীর উপাখ্যানের সাপেক্ষে গড়ে উঠেছিল, নাকি তার উলটোটাই সত্যি? বেদবতীর উপাখ্যানের চাপে, একটি কখনবহির্ভূত চাপে, রক্তাবতীর উপাখ্যানের কখনটি ভেতর থেকে বদলে গেল, এমন হতে পারে। আবার এরকমও হতে পারে যে, রামায়ণে রক্তাহরণের বৃত্তান্তটিই পূর্বকার, বেদবতীর বৃত্তান্ত তার পরেকার। ক্ষেমেস্তর দশাবতারচরিত্রএ বলা হয়েছে যে, কৈলাস পর্বতে অবস্থানকালে দশানন এক জ্যোৎস্নারাত্রে রক্তাকে তাঁর দিকে অগ্রসর হতে দেখেন ও বলপূর্বক রক্তাকে গ্রহণ করেন, এজন্য রক্তার স্বামী নলকুবর তাঁকে অভিশাপ দেন। তারপর পুষ্পক বিমানে যেতে যেতে সুমেরু পর্বতে তিনি অবসর নেন। সেখানে পর্বতশিখরে তপোনিরতা এক সুন্দরীকে তিনি

প্রার্থনা করেন ও রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যাত হন। এই নারী বৃহস্পতিকন্যা বেদবতী এবং বিষুগকে স্বামীরূপে লাভের অভিপ্রায়ে তাঁর এই ব্রত। রাবণ বেদবতীকেও বলাৎকার করতে উদ্যত হন কিন্তু নলকুবরের শাপের কথা মনে পড়ায় ধর্ম্মে নিবৃত্ত হন। দশাননের স্পর্শে কলুষিত বেদবতী অগ্নিতে আত্মোৎসর্গ করেন এবং দশাননকে হননের জন্য পুনর্জাত হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় তাঁর মৃত্যুবরণ সার্থক হয়। বাশ্মিকী ও ক্ষেমেন্দ্রর কথনের হয়তো দুটি ভিন্ন উৎস ছিল, হয়তো অভিন্ন এক উৎস হতে উভয়ে উৎসাহ আহরণ করেছিলেন। পাঠ্যবস্তুর অন্তর্গত ও বহিরাগত এই দুধরনের অভিঘাতের অনির্ণীত স্বরূপ রচনাটির গঠনগত সমস্যাকে আরও সংকুল করে তোলে। ‘কথাসরিৎসাগর’ অনুযায়ী অর্জুন নিষিদ্ধ-সম্পর্ক স্বীকার না করায়, রক্তাকে গ্রহণ না করায়, বৃহন্নলায় পরিণত হয়েছিলেন। রাবণ নিষিদ্ধ সম্পর্ক অস্বীকার করে, রক্তাকে বলপূর্বক গ্রহণ করে, নলকুবরের অভিধাপে আর-এক ধরনের বৃহন্নলায় পরিণত হলেন, অকামা নারীতে উপগত হওয়ার ক্ষমতা রাবণের আর থাকল না।

সীতা ও বেদবতীর সঙ্গে রাবণের লঘু এবং লঘুতর শরীরী-সম্পর্ক ঘটেছিল, রক্তার সঙ্গে তাঁর ঘটেছিল শরীর-সম্মিলন। মহাভারত-এর বনপর্বের অধ্যায় ২৬৭তে জয়দ্রথের দ্রৌপদীহরণ বৃত্তান্ত রয়েছে, সেখানে জয়দ্রথ ও দ্রৌপদীর শারীরিক ঘনিষ্ঠতার সংবাদ গোপন নেই। কালীপ্রসন্ন সিংহর অনুবাদে :

তিনি বারংবার জয়দ্রথকে তাঁহার শরীর স্পর্শ করিতে নিষেধ করিতে লাগিলেন...। দুরাশ্রা জয়দ্রথ তাঁহার বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া তদীয় উত্তরীয় বসন ধারণ করিল। তখন পতিব্রতা দ্রৌপদী উপায়ান্তর প্রাপ্ত না হইয়া বেগে জয়দ্রথকে আকর্ষণ করিবামাত্র সেই দুরাশ্রা ছিন্নমূল পাদপের ন্যায় ধরাতে নিপতিত হইল; কিন্তু সে তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া সাত্ত্বিক বলপূর্বক দ্রৌপদীকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। ঋপদনন্দিনী জয়দ্রথের আকর্ষণে নিতান্ত পীড়িত হইয়া পুরোহিত ঘোম্মের চরণে প্রণিপাতপূর্বক অগত্যা সিদ্ধুরাজের রথে আরোহণ করিলেন।

ধাত্রেয়িকা পঞ্চপাণ্ডবকে সাবধান করে বলেছিলেন : “কোন অধার্মিক পাপিষ্ঠ পুরুষ যেন আপনাদিগের প্রিয়তমার সুপ্রসন্ন বদনসুধাকর স্পর্শ করিয়া দূষিত করিতে না পারে।” দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী থাকা সত্ত্বেও, কিংবা দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী ছিলেন বলেই, এই দ্রৌপদীহরণ নিয়ে সীতাহরণের মতো বিরাট কোনও ঘটনা ঘটল না। পাঞ্চালদেশ যৌনশিথিলতার জন্য বিখ্যাত বা কুখ্যাত ছিল তাই, পাঞ্চালীর ক্ষেত্রে পঞ্চপাণ্ডব দ্বারা গৃহীত হওয়ার জন্য কোনও পরীক্ষাব প্রয়োজন হল না, কিংবা সীতার রাম ও রক্তার নলকুবরের মতো একমাত্র স্বামী নয়, একেবারে পঞ্চস্বামীগ্রহণেই ছিল দ্রৌপদীর পতিব্রতের পরাকার্তা।

৩

রামায়ণ-এর অযোধ্যাকাণ্ডে (৬২-৬৩) এবং মহাভারত-এর সভাপর্বে (৯-১০) দুটি করে শ্লোক প্রায় একই ভাবে রূপে স্থান পেয়েছে। শ্লোকদুটিতে রাজাকে রাজধর্ম সম্পর্কে সচেতন করে বলা হয়েছে যে, ধর্মের সঙ্গে যেন কামের বিবাদ না ঘটে, ধর্ম অর্থ ও কাম যেন যথাপরিমাণে এবং যথাসময়ে বিভাজন করে নেওয়া হয়। কালিদাসের রঘুবংশে কাম উপভোগের প্রাবল্য রাজা অগ্নিবর্ণের সর্বনাশ ডেকে এনেছিল এবং ইতিহাসে আছে অষ্টম শতকের রাষ্ট্রকূটরাজ দ্বিতীয় গোবিন্দ অতিরিক্ত কামনাপূর্তির পরিণামে অচিরে সিংহাসন হারিয়েছিলেন। এই

পরিপ্রেক্ষিতে উত্তরাকাণ্ডে রাবণের কামোপভোগের সব আখ্যান, রাবণের প্রতি সব অভিশাপের বৃত্তান্ত—বিশেষত রক্তাধর্ষণ ও নলকুবরের অভিশাপ—পুনর্মূল্যায়ন দাবি করে। বাৎস্যায়নের কামসূত্র-এ পারদারিক বা পরস্মীর সঙ্গে প্রণয়ের প্রসঙ্গ এক বড়ো অংশ জুড়ে রয়েছে। এ ধরনের সম্পর্ক স্থাপনের দুঃসহতা ও বিপদের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে, পরস্মীর মন ও চরিত্রের সম্বন্ধ বিবেচনার প্রয়োজনীয়তার কথাও এখানে উল্লিখিত। ঈশ্বরকামিত বা শাসকদের কাম এর এক অনুবঙ্গী অধ্যায়, রাবণের মতো সমুন্নত পদাধিকারী ও শক্তিশালী রাজা, বহু স্ত্রী ও বহু পুরাঙ্গ না থাকা সত্ত্বেও, কীভাবে পরস্মীতে আসক্ত হন তা এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়। সীতা ও রক্তা এই অর্থে ঈশ্বরকামিত পরস্মী।

রোমের প্রাচীন ইতিহাসের কাহিনি অবলম্বনে পরপুরুষ কর্তৃক লুক্রেসিয়ার ধর্ষণ, স্বামীর কাছে লুক্রেসিয়ার সে তথ্য উদ্ঘাটন ও তার করুণ পরিণতি চসার ও শেকসপিয়রের কাব্যের বিষয় হয়েছিল। লুক্রেসের নগ্ন বক্ষে টারকুইনের আকাঙ্ক্ষার ধূমায়িত তপ্ত হাত একটি রাজকীয় কল্পচিত্রের জন্ম দিয়েছে :

Whose ranks of blue veins, as his hand did scale,

Left their round turrets destitute and pale.

শেকসপিয়রের কাব্যে ধর্ষণের এ দৃশ্যটি অনুষ্ঠিত হয়েছে চার দেওয়ালের ভেতর, বাস্মীকির কাব্যে তা সুন্দর নৈসর্গিক পটভূমিতে প্রকাশ্য শিলাতলে সংঘটিত, এবং জলোপিতা অঙ্গরা রক্তা সংক্রান্ত বাস্মীকীয় বাক্যপ্রতিমাটিও জলোদ্ভূত। “পরে রক্তা বিমুক্ত হইয়া ক্রীড়াশীল হস্তীর করদলিত নদীর ন্যায় আকুল হইয়া উঠিল।” “গজেন্দ্রক্ৰীড়ামথিতা নদীবাকুলতাংগতা। লুলিতাকুলকেশান্তা করবেপিতপল্লবা।” বেপিতকরপল্লবা পদবঙ্কটিও সঙ্কোচগাঙ্গে আলুলায়িত, বাস্মীকি ও শেকসপিয়রের সৃষ্ট করদলনের দুটি কল্পচিত্র কত পৃথক। কৃতিবাসের রামায়ণ-এ ওই চিত্রধর্ম নেই, কেবল তথ্য প্রতিপাদন আছে : “শৃঙ্গারে রক্তার বেশ হইল সংচুর। / স্বামীর চরণ ধরি কান্দিল প্রচুর।।”

পণশীকর সম্পাদিত নির্ণয়সাগর-সংস্করণ সংস্কৃত রামায়ণ-এ রক্তাহরণ উপাখ্যানটি একটি ভিন্ন নামে সূচিত : “অথ রাবণস্য নলকুবরশাপপ্রাপ্তিঃ।” বস্তুত এ উপাখ্যানের আগ্রহের কেন্দ্র দুটি। যতক্ষণ পর্যন্ত না রক্তাধর্ষণের দৃশ্যটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে ততক্ষণ রাবণ পাঠকের মনোযোগের অভিকেন্দ্রে, এক জটিল ট্রাজিক চরিত্র রূপে যেন তাঁর কৈলাসশিখরে অবতরণ। ধর্ষণের পর রক্তা কিন্তু ট্রাজেডির নায়িকা নন, শৃঙ্গাররসের আকর ও করুণরসের উৎস হলেও রাবণের মতো তাঁকে আকর্ষণীয় মনে হয় না, বাস্মীকি ও কৃতিবাসের মতো পুরুষেরা তাঁকে আর তত উপাদেয় হয়ে গড়ে উঠতে দেন না, স্বামীর কাছে রক্তার বাধ্যতামূলক শরণাগতি তাঁর মেদুর পরিস্থিতিকে বিদ্যুদগর্ভ হয়ে উঠতে দেয় না। বাস্মীকি-রামায়ণ-এ এবং কৃতিবাসি রামায়ণ-এ কিছুটা নাটকীয়তা ও কিছু বাগ্মিতা থাকলেও এ-উপাখ্যান বস্তুত মঞ্চে আধারিত হওয়ার উপযোগী। নায়িকা রক্তা ধর্ষণের পর যদি আত্মপ্রকাশের মহীয়সী শক্তি পেতেন, নিষ্ক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ না করে যদি বেদবতীর মতো আত্ম-উৎসর্জনের পথ বেছে নিতেন, তাহলে সেই ইতিবাচক সক্রিয়তা তাঁর ভবিতব্যকে তাৎপর্যপূর্ণ করত। কিন্তু, হায়, বেদবতীর চরিত্রের সেই চর্কিত উদ্ভাসনের মাত্রা রক্তার থাকল না, থাকল না সেই অনুভবের গভীরতা, আপন ভাগ্য জয় করবার সেই ক্ষমা ও ক্ষমতা। ব্যাপিকা বাজলি নারীর মতোই রাবণের সঙ্গে কথোপকথনে

কৃতিবাসের রজ্জা একটু যেন বাচাল, রাবণ ধর্ষণ করবার প্রায় আগের মুহূর্ত পর্যন্ত বাস্মীকি ও কৃতিবাসের রজ্জা বাদানুবাদ ও বিতণ্ডায় পটীয়সী। রজ্জা রাবণকে যতই যুক্তি ও প্রতিযুক্তি এগিয়ে দেন ততই তিনি পাঠকের সহানুভূতি হারাতে থাকেন, বরং তাঁর শুদ্ধতা, তাঁর মৌন শরীরী-ভাষাই শেষপর্যন্ত বাস্তবময়ী হয়ে ওঠে। বর্ণনামূলকতা আখ্যানধর্মিতা কথোপকথনধর্ম বাস্মীকীয় রজ্জাহরণে সুষমভাবে বজায় ছিল, কৃতিবাসি *রামায়ণ*-এ বর্ণনার নান্দনিক দিকটি প্রায় হারিয়ে গিয়েছে, সক্রিয়তার পরিচয় আছে বলাৎকারেব মুহূর্তে, মূল ঝোঁকটি পড়েছে রজ্জা ও রাবণের সংলাপের উপর। স্বাসাধাত এসে পড়েছে রাবণের প্রস্তাবের পরই নলকুবরের অভিষাপের উপর। রজ্জাহরণের প্রথম থেকে যে রাবণরাজাকে পাঠক পেয়েছেন তিনি প্রাণশক্তির প্রাচুর্যে পূর্ণ, সুস্থ তবু যেন ঈষৎ বিকারগ্রস্ত, স্ববিরোধী কিছু প্রক্ষেভের প্রেরণায় তাড়িত এক কামুক ও অভিজাত পুরুষ, রজ্জার উপর তিনি শারীরিক মানসিক সামাজিক ও নৈতিক দিক থেকে প্রবল দৈহিক আক্রমণ করেন, সেই যৌন অপরাধের প্রয়াস ও নিষ্ঠুর প্রবল দৈহিক শক্তিমত্তার নির্লজ্জ প্রকাশে তাঁর চরিত্র মূর্ত হয়ে ওঠে, মূর্ততর হয়ে ওঠে নলকুবরের প্রতিদ্বন্দ্বী কিন্তু আদর্শায়িত ধর্মপরায়ণতার সংলগ্ন ভূমিকায়। এক্ষেত্রে কৃতিবাসের *রামায়ণ* রাবণের কামচেতনাকে প্রাধান্য দেয়, কিন্তু পাশাপাশি রজ্জার আহত সতীত্বে সমগুরুত্ব দেওয়া সম্ভব হয় না, রজ্জাকে প্রকীর্ণকামা বানিয়ে তোলার কুট অভিসন্ধি প্রকাশিত হয়, কারণ রজ্জাকে অন্তত ছন্দসতী আপাতসতী না সাজালে সীতার সতীত্বের আদ্যরূপটিকে সম্ভবপর করে উপস্থাপন সহজ হয় না। বাৎস্যায়নের *কামসূত্র*-এ পারদারিকের পূর্বেই আছে ভার্য্যাদিকারিক বা সতীত্ব আলোচনার অংশ। কৃতিবাসের *রামায়ণ*-এ রাবণের পারদারিক প্রয়াসের সফলতার পরিচয় জ্ঞাপনের পরেই এসে পড়েছে সতীত্বের ও সীতার প্রশংসা। বিজ্ঞাতীয়া রজ্জার কামনাকাতরতার অলজ্জ প্রকাশের বর্ণনায় কৃতিবাসের *রামায়ণ*-এর যত উৎসাহ একই নিশ্বাসে জাতীয়া স্ত্রী সীতার সতীত্ব বর্ণনায় আগ্রহ যেন ঠিক ততটাই। কাম ও সতীত্বধর্মের অতিশায়ন দুইই বিকার, উভয়ে একই মূদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। রাবণ শুধু রজ্জাকে বলাৎকার করেন নি, পুত্রবধুর সঙ্গে উপগত হয়েছেন, এই অজ্ঞাচার তাঁর পাপকে আরও পূর্ণ করেছে, তাঁর প্রতি শাপকে আরও ত্বরান্বিত করেছে। দস্তয়েভস্কির এপিক উপন্যাস হলে হয়তো এ পাপে স্বশুর মহাশয়কে মৃত্যুবরণ করতে হত, কিন্তু বাস্মীকি বা কৃতিবাস কেউই খ্রিস্টান ছিলেন না, রাবণকে তাঁরা যে দণ্ড দিয়েছেন তা মরণাস্তিক যন্ত্রণার, রাবণের কাছে তা মৃত্যুরও অধিক। সীতাহরণের সঙ্গে রজ্জাহরণ প্রকৃত প্রস্তাবে সম্বলিত হতে পারে না, কারণ রজ্জাহরণে কবির দ্বিচারিতার পরিচয় আছে, অথচ রাবণচরিত্রের ও সীতাচরিত্রের চিত্রণে তা নেই।

“শূঙ্গারে রজ্জার বেশ হইল সংচুর। / স্বামীর চরণ ধরি কান্দিল প্রচুর।।” “বেশ” করেন, তিনি তাই বেশ্যা, প্রচলিত এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে ‘স্বর্ণ-বেশ্যা’—বাংলায় রজ্জার এটিই প্রথম পরিচয়। বিপরীতদিকে, ‘সংচুর’ শব্দটিতে রজ্জার আহত সতীত্বের স্মৃতিচিহ্ন সক্রিয়। যা সংচুর তা শুধু সম্যকভাবে চূর্ণ নয়, তা শঙ্খচূর, বাঙালিনি হিন্দু আয়তীর অভিজ্ঞান শঙ্খ চূর্ণ হওয়ার ঘটনা। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এর পরদ্বী রাধা কৃষ্ণের বলাৎকার ও অনাচারের আশা ও আশঙ্কায় একই কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন : ‘রাধের বলয়া মো করিবৌ শঙ্খচূর’ আইনের প্রকৃতি বিবেচনায় প্রকৃত ধর্ষণ গুরুত্ব পায়। আইনের দর্শনেও মূল্যবোধ স্বভাবে বিমূর্ত, তাই নারীবাদী বিচারব্যবস্থা এই মত প্রকাশ করতে পারে যে, আইনগত ও নীতিগত সংস্কৃতিতে যেহেতু মূলত পুরুষপ্রাধান্য,

তাই নারীর উপর পুরুষতন্ত্রের শোষণের অধিকারের নিরিখে ধর্ষণের বিচারে নারীর চরম প্রতিরোধের তত্ত্বটি পেশ করা হয়ে থাকে। নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে, নারীর সম্মতি ব্যতিরেকে পুরুষ কর্তৃক নারীর উপর বলপ্রয়োগকে সাধারণভাবে ধর্ষণ আখ্যা দেওয়া হয়। ইচ্ছার বিরুদ্ধে, সম্মতি, বলপ্রয়োগ—এই সব ধারণাকে ধর্ষণের সংজ্ঞার্থে কীভাবে গ্রহণ করা হবে তা আইনের দর্শনে এখনও অমীমাংসিত এক সমস্যা। আইনের প্রথাগত পরম্পরা বিশ্বাস করে যে, নারী যদি তার প্রতি আক্রমণকারী পুরুষকে চরম প্রতিরোধ না করে তাহলে সে নারী শরীরী-মিলনে সায় দিয়েছে স্থির করা যায়। অতি-আধুনিক বিচারকেরা এক্ষেত্রে নারীর চরম প্রতিরোধের বদলে যুক্তিযুক্ত প্রতিরোধের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেও ভিন্নভাবে ভাবতে ও রায় লিখতে বাধ্য হচ্ছেন। যেখানে চরম প্রতিরোধ এমনকি প্রতিরোধ করাই মূর্থতা সেখানে ধর্ষিতার প্রতিরোধের প্রমাণের প্রয়োজন নেই—একথা বলেও তাঁদের জানাতে হচ্ছে : প্রত্যেক অহংকারী নারীর মতো ধর্ষণের সময় তাঁকেও প্রতিরোধের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিটির নিশ্চিত অনুসরণ করতে হবে, কেবল কথা দিয়ে পুরুষটিকে প্রতিরোধ করলে চলবে না। রক্তা রাবণকে শুধু কথা দিয়ে প্রতিরোধ করেন নি বলেই মনে হয় : “হাত-পা আছাড়ে রক্তা রাবণের কোলে। / রাবণ শৃঙ্গার করে ধরি তার চুলে।” কিন্তু কৃতিবাসি *রামায়ণ* এটিকে প্রতিরোধের প্রমাণ রূপে মান্য করে না। কারণ এর আগেই রক্তার মৌন সম্মতির লক্ষণ ভেবে নেওয়া হয়েছে : “অনুমানে রাবণ বুঝিল তার মন। / ধরিয়া শৃঙ্গার করে রাজার দশানন।।” এক্ষেত্রে রক্তার মৌন অসম্মতি নয় কারণ নারীর ‘না’-এর অর্থ যে ‘না’ নয় তা নীতিগতভাবে স্বীকৃতি পেয়ে আসছে : নারী-পুরুষের সংঘর্ষের যে পৌরুষেয় ধারণার আদর্শ, নারীর যৌনতা সম্পর্কে যে পৌরুষেয় আদর্শ তারই পরিপ্রেক্ষিতে পুরুষ-অধিকৃত সমাজে ধর্ষণ-আইনের মুসাবিদা করা হয়েছে। অহংকারী নারীর সতীত্ব ও স্ত্রীধর্ম সম্পর্কে আদর্শায়িত ভাবনার পরিণতিতে পুরুষ ধর্ষণের সত্য প্রকৃতি অনুধাবন করে না। কৃতিবাসি *রামায়ণ*-এ এজন্য নিজের স্ত্রীর সতীত্ব এমনকি নিজের স্ত্রীর কামচেতনাকে যে মূল্য দেওয়া হয়, ধর্ষণের শিকার নারীটিকে সেই মূল্য দিতে কার্পণ্য দেখা যাচ্ছে : “রাবণের শৃঙ্গার না সহে কোন নারী। / সবে মাত্র সহে রক্তা আর মন্দোদরী।” : কিন্তু রাবণের কাছে, রাবণকে পেশাদার ধর্ষক জেনেও পাঠক-শ্রোতার কাছে, রাবণের স্ত্রী মন্দোদরী এবং অশ্বরাজা রক্তার মূল্য ও দাম আলাদা হয়ে যায়, মন্দোদরী ও রক্তার কামচেতনা একই মাপকাঠিতে বিবেচনার বিষয় হতে পারে না। রক্তার মৌন শুদ্ধ সম্মতি নয় শুধু, তা নাকি এক সক্রিয় ইঙ্গিত যা রাবণের সজ্জোগলালসার আগুনে আত্মত্যাগ দেয় : “একে ত রাবণ তাহে রক্তার ইঙ্গিত। / ইঙ্গিতে শৃঙ্গার রাজা করে বিপরীত।। / একে দশানন তাহে সংগ্রামে প্রবীণ / একাসনে শৃঙ্গার করয়ে সপ্তদিন।।” রাবণের একাসনে সপ্তদিন শৃঙ্গার যেন মার্কোয়েসের মায়াবী বাস্তব আখ্যানের পুরুষচরিত্রের কীর্তি। শৃঙ্গার ও সংগ্রাম শব্দদুটিতে শুধু ধ্বনিসাম্য নেই, সংস্কৃত ও লাতিন প্রাচীন কাব্যে রত্নিরণ-কে সমাসবদ্ধ সমস্ত শব্দে পরিণত করা হয়েছে। কিন্তু এই যুদ্ধ অসম যুদ্ধ। ধর্ষণ এমন এক হিংস্র অপরাধ যাতে ধর্ষিতা শারীরিক, মানসিক এমনকি জৈবনিক হানির ভয় পায়। যত ক্ষত যত ক্ষতির সম্ভাবনা সত্ত্বেও ধর্ষণের ক্ষেত্রে নারীর প্রতিরোধ তাঁকে এমন এক আদর্শ গ্রহণ করতে বলে যে আদর্শ পুরুষালি ও অপরের আদর্শ, পুরুষের বিপক্ষে তাঁর এই বিরোধিতা তাঁর নারীসুলভ লৈঙ্গিক চরিত্রের দিক থেকে এবং প্রত্যাশিত নারীসুলভ সামাজিক প্রকৃতির দিক থেকেও যেন অস্বাভাবিক। দৈহিক বল ও

সামাজিক রাজনীতিক প্রতাপে অস্থিত রাবণরাজার সঙ্গে রক্তার কোনও তুলনাই চলে না, এমনকি মহাকাব্যও সীতা রক্তাদের ধ্বংসকদের মুখোমুখি হওয়ার জঙ্গি কৌশল শেখায় নি। কোনও নারী যদি রামায়ণ রচনা করতেন তা হলে সীতাহরণ রক্তাহরণ বৃত্তান্ত হয়তো ভিন্নভাবে পুনর্লিখিত হত, অন্তত রক্তার মৌনকে নিশ্চয় সম্মতি ভাবা হত না। রক্তাহরণ এমন একটি ঘটনা যেখানে অধিকার এবং বিচারের বৈধ ও গুরুত্বপূর্ণ ধারণাকে ঔদার্যনৈতিক সমর্থন করা হয় নি।

মূল্যবোধের এই মৌল আপেক্ষিকতার বিবেচনা মহাকাব্যে অন্যরকমভাবেও করা হয়েছে। শূর্ণখার কাহিনিও আদি *রামায়ণ*-এ ছিল না, কিন্তু রক্তাহরণ-বৃত্তান্তের আলোচনায় এই উপাখ্যানটি প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। রাবণভগ্নী শূর্ণখা রামের রূপমুগ্ধ হয়ে রামের প্রণয়প্রার্থনা করেন। সেজন্য তিনি কেবল উপহাসিত হন না, লক্ষ্মণ তাঁর নাসিকা ছিন্ন করে তাঁকে ছিন্ননাসিক বা ছিনালের শাস্তি দেন। প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্যে লক্ষ্মণের খঞ্জর নাসা-ছেদনে উদ্যত, অন্যহাতে তিনি পদানত তরুণী প্রণয়িনী শূর্ণখার কেশাকর্ষণ করছেন। মূল্যবোধের আপেক্ষিকতা শেষপর্যন্ত বোধহয় প্রতাপের আপেক্ষিকতায় পরিণতি পায়। জাতিবর্ণের বিবেচনাও এখানে মুখ্য হয়ে ওঠে। আর্য পুরুষ রাম-লক্ষ্মণের প্রতাপ প্রণয়িনী অনু-আর্য শূর্ণখাকে ছিনালে পরিণত করে, ধ্বংস রাক্ষস রাবণরাজার প্রতাপ এবং কাহিনির শ্রোতা রামের প্রতাপ রক্তা নামী অঙ্গরাকে বেশ্যা করে ফেলে। শূর্ণখা ও বেদবতী দুজনেই বিমুগ্ধকে কামনা করেছিলেন, দুজনেই এজন্য নিগৃহীতা হয়েছেন, দুজনের শারীরিক নিগ্রহের ঘটনা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সীতার হরণের সঙ্গে যুক্ত, অথচ রাক্ষসী শূর্ণখার ক্ষেত্রে প্রাপ্য হয়েছে শাস্তি, আর আর্য্য বেদবতী পেয়েছেন প্রেমের পুরস্কার।

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত উত্তরাকাণ্ডে নলকুবরের রোষ বীররসে নিষ্পত্তি পেয়েছে, নলকুবরের শাপ এবং তাঁর তপোবল গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে, কিন্তু বাঙালিসুলভ ভাবাকুলতায় সে বীররস রৌদ্ররসে পরিবর্তিত, নলকুবরের গালিও একেবারে বাঙালিধরনের :

কুপিল কুবের পুত্র লাগিল জ্বলিতে।
হাতে নিল জ্বল রাবণের শাপ দিতে।।
অসম্মত স্ত্রী হরে নিষেধে নাহি থাকে।
আমার তপের বল দেখুক সর্বলোকে।।
রাজ্যবলে তপবলে সম করি দেখি।
মোর শাপ আনল কাহার বাপে রাখি।।

‘মোর লাগি রাবণ সবংশে যেন মরে’ : বেদবতীর এই শাপ যেন শাপ নয়, শাপের অনুরূপানক উল্লেখ এখান নেই, বরং আছে তাপসী বেদবতীর স্বার্থচিন্তা, ফলে একদিকে তিনি শাপ দিতে কুণ্ঠিত, কারণ তপোবলের দ্বারা শপথ করে রাবণকে শাপ দিলে তাঁর তপস্যা বিফল হবে : ‘তপস্যার ফলে যদি তোরে নষ্ট করি। / বিফল হইবে এত তপস্যা আমারি।।’ অন্যদিকে, নিজের ভবিষ্যৎ নিয়েও তিনি ভাবিত : ‘শ্রেষ্ঠকূলে জন্মি যেন অযোনিসম্ভবা।’ বেদবতীর শাপদান যদি হয় আশ্বনেপদী, রক্তার দুর্দশা দেখে নলকুবরের শাপদান যেন পরম্প্রদী, রাবণের অনুধাবনের জন্য, সর্বলোকের অবহিত হওয়ার জন্যও, ‘বেশ্যা’ রক্তার হয়ে ব্রাহ্মণপুরুষ নলকুবরের এই শাপদান। উপদেশে অচ্ অনুনাসিক ইত্ (১. ৩. ২.) : পাণিনির সূত্রের নির্ভরে কাত্যায়নের

অষ্টম বার্তিকের ‘শাপে উপলব্ধনে’-র অনুবঙ্গে তোরু ইআগি প্রাচীন ভারতে শপথের রূপভেদ সম্পর্কে ব্যাকরণের বিশ্লেষণনির্ভর আলোচনা করতে গিয়ে শাপদানকারীর আত্মতাকে রদ করে এটিকে একটি পরনির্ভর ক্রিয়ার শ্রেণিভেদরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তোরু ইআগির রূপভেদ অনুযায়ী বেদবতীর শপথ হলে হতে পারত টাইপ ওয়ান সি গ্ৰি-টু ধরনের যেখানে শাপদানকারী নিজের ইষ্টপূর্তি সুকৃত ও তপশ্চর্যার ফল রহিত করে শাপ ঘোষণা করে। অন্যদিকে রক্তার হয়ে নলকুবরের শাপদানের বিষয়টি ডেক্সারেশন ওআনের উপর নির্ভরশীল ডেক্সারেশন টু রূপভেদটির উদাহরণ হতে পারে। এক নম্বর ঘোষণায় নলকুবর প্রমাণ করতে চান তাঁর শাপদানের ক্ষমতা এবং জ্ঞাত করাতে চান প্রথমত ধর্মক রাবণকে এবং সর্বজনকেও : “আজি হৈতে শাপ মোর হউক প্রচার / বলে ধরি রাবণ যে করিবে শৃঙ্গার।। / সেইক্ষণে মরিবেক যাবে দশ মাথা। / নলকুবরের শাপ না হবে অন্যথা।।” দু-নম্বর ঘোষণা দিয়ে শাপদাতা নলকুবর প্রথম ঘোষণাটির সত্যতা ধর্মিতা রক্তার কাছে জ্ঞাপন করান। লক্ষ করার বিষয়, নলকুবর স্বয়ং এবং শ্রোতা দেবগণ যদিও জানেন যে এ অভিশাপ সত্য, কিন্তু তাঁরা নিজেরা এর সত্যতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়েও নিজেরাই রাবণ ব্যক্তিরকে এর সত্যতা প্রমাণ করতে পারবেন না। রক্তা এই শাপদানের নিষ্ক্রিয় সাক্ষীমাত্র। শাপদানটি সুত্রাকারে এরকম : অ (রাবণরাজা) যদি হয় আ (ধর্মক রাবণ) তাহলে ক (জীবিত রাবণ) হবে হ (মৃত রাবণ)।

“ক্রোধে নলকুবর সে লাগিল জ্বলিতে। হাতে নিল জল রাবণেরে শাপ দিতে।” প্রাচীন ভারতে শাপদানের আনুষ্ঠানিক রূপটি কৃতিবাসি রামায়ণ-এর এ পয়ারবন্ধে রক্ষিত হয়েছে। সংস্কৃত রামায়ণ-এ ছিল : “মুহূর্তাক্রোধতাস্মাক্ষোয়াং জগ্রাহ পাণিনা। / গৃহীত্বা সলিলং সর্বমুপস্পৃশ্য যথাবিধি।।/ উৎসসর্জ তদা শাপং রাক্ষসেন্দ্রায় দাক্ষণম্।” বাম্বীকির তিন ছত্র কৃতিবাসের দুই ছত্রে সংহত। শাপদানের রীতি—কোষ হতে জল গ্রহণ করা, সে জল শরীরের বিশেষ বিশেষ স্থানে স্পর্শ করা—সংস্কৃত রামায়ণ-এ অনুসৃত হয়েছে। কোষের জল পান করে শাপ দেওয়ার কথা আছে রাজতরঙ্গিনীতে। কৃতিবাসের রামায়ণটিতে জল এবং জ্বল এই সম্বন্ধনিবাচক কিন্তু বিপরীতার্থক দুটি শব্দকে রূপদক্ষতায় সমন্বিত করা হয়েছে, এক্ষেত্রে সংস্কৃতে জলের দুটি প্রতিশব্দ তোয় এবং সলিল পাওয়া গিয়েছিল মাত্র।

নলকুবর যদি রক্তার কথায় অবিশ্বাস করতেন, পুরুষের পক্ষে অবিশ্বাস করা অস্বাভাবিক ছিল না, মহাভারত-এ আছে নল পতিব্রতা দময়ন্তীর কথায় বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেন নি, তখন দময়ন্তীকেই শপথ করতে হয়েছিল। এদিক থেকে দেখলে নলকুবর তাঁর স্ত্রী বা প্রণয়িনীর প্রতি অনেক বেশি বিশ্বস্ত, নল এবং নলকুবরের মধ্যে পার্থক্য অনেকখানি। শাপ ধাতু হতে নিষ্পন্ন শাপ ও শপথ দুটিই ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য, কাউকে স্পষ্টভাবে কিছু জ্ঞাত করানো অর্থেও শাপের ব্যবহার রয়েছে। প্রকাশন প্রত্যাশন সম্প্রদানসূচক উপলব্ধন শব্দটিও আক্রোশবশত শাপদানের সঙ্গে যুক্ত। রাবণ স্পর্শ করেছিলেন রক্তাকে, নলকুবর নিজের শরীরে স্পর্শ করে রাবণকে শাপ দিলেন। যাক্ষ তাঁর নিরুক্ষে (৩ .২১) বলেছেন, পুরুষাঙ্গবাচক ‘শেপ’ শব্দটি ‘শাপ’ ক্রিয়া থেকে উদ্ভূত, এই ক্রিয়া স্পর্শসূচক। দুর্গাস্বামী বলেন, ‘শেপ’ হচ্ছে তা-ই যা দিয়ে নারী পুরুষ কর্তৃক স্পৃষ্ট হয়। ‘উপলব্ধ’ বা ‘উপলব্ধন’ শব্দের সঙ্গে এর সঙ্গতিসূচক অর্থ প্রাচীন সংস্কৃতে স্বীকৃত। শাপের এই উভযোজী সম্পর্কে রক্তার সূত্রে রাবণ ও নলকুবর দুই পুরুষই অধিত। শাপ বা শপথের মধ্যবর্তিতায় ধর্ম ও কাম দুই বর্গের সমন্বয় ঘটেছে প্রবোধচন্দ্রিকার

একটি শপথে : “বুদ্ধের নামে শত শপথ করে বলছি, কাপালিনীর পীন উন্মুক্ত স্তনযুগ পীড়নে যে প্রমোদের উদয় হল তেমন যদি আর কোথাও হয়ে থাকে।” (৩ .১৮)

৪

রাবণ রক্তাকে বলাৎকার করতে গিয়ে রূঢ়ভাবেই বলেছেন : ‘অঙ্গরানাম্ পতির্ নাস্তি।’ অঙ্গরাদের পতি নেই, তাই রক্তাকে ধর্ষণে পরস্বীহরণজনিত পাপের বোধ বা অপরাধের চেতনা রাবণের ছিল না। মধ্যকালীন বাঙালির পারিবারিক মূল্যবোধে এ উচ্চারণের ধাক্কা কম নয়, সেই অভিঘাত সামলাতেই কৃষ্টিবাসের রক্তাকে এবং বাংলা *রামায়ণ*-এর রচয়িতাকেও ঈষৎ বাক-বিস্তার করতে হয়েছে :

রক্তা বলে আমার নিয়ম বলি শুন।

যে দিন যাহার পাশে করিব গমন।।

সেই দিন পতি সেই জানিহ নিশ্চয়।

এ কথা অন্যথা নাহি কদাচিত হয়।।

বিধির নির্বন্ধ শুন রাক্ষসের পতি।

চিরদিন ধর্ম রাবি এইরূপে সতী।।

কিন্তু কৃষ্টিবাসের *রামায়ণ*-এ আধুনিক সম্পাদকদের কাছে এসব ছত্র বর্জনযোগ্য বিবেচিত হয়েছে। সংস্কৃত *রামায়ণ*-এ এত কথা ছিল না, কিন্তু ‘অঙ্গরাদের পতি নেই’ একথাটি অন্তত ছিল, এবং এ ভাবটি সম্প্রসারণের সমীচীন প্রয়োজন ছিল। ঐতিহাসিক কোসংবী ভারতীয় পুরাণ ও বাস্তবতার আলোচনা সূত্রে এ বিষয়টিও বিশেষ আলোচনার উপযুক্ত মনে করেছেন। ‘বিধির নির্বন্ধ’ কেন সৃষ্ট হয়েছিল, সে-বিধান কারা কাদের স্বার্থে রচনা করেছিলেন তা বরং টীকায় অবহিত করবার দরকার ছিল। দশম মণ্ডল পঁচানব্বই সূক্ত ছয় সংখ্যক ঋকে পুরুরবা উর্বশীকে বলেছেন : সুজুর্গি শ্রেণি সুন আপি হ্রদেচক্ষু গ্রহিণী চরণ্যু—আমার এই কয় মহিলা ছিল, তুমি আসবার পর তারা আর আমার কাছে বেশভূষা করে আসত না। কোসংবীর মতে এঁরা হচ্ছেন রাজার কাছে আত্মোৎসর্গে প্রস্তুত শ্রেণিবদ্ধ নর্তকী। একদিকে প্রাচীন ভারতীয় পুরাণ-ইতিহাসে অঙ্গরা দিয়ে রাজবংশের সূচনার রীতি ছিল। কালিদাসের রঘুবংশের অষ্টম সর্গে আছে দশরথের পিতা অজ্ঞের অকালমৃত্যু স্ত্রী রানি ইন্দুমতী তিনি আসলে ছিলেন হরিণী নামের এক অঙ্গরা। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে অঙ্গরাবিবাহকে বৈধ স্বীকৃতি দান এজন্য একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল। আর এক দিকে, মাতৃতান্ত্রিক সমাজের সিদ্ধ পরম্পরা ও তার পরেকার ঐতিহ্য এইরকমই ছিল যে, অঙ্গরা কোনও স্থায়ী স্বামী বা প্রেমিকের কাছে নিজেকে একেবারে সমর্পণ করবে না। এই পটপ্রেক্ষিতে এক এক রাত্রে এক এক স্বামীর স্ত্রী রক্তার সতীত্বের অহংকার শূন্যগর্ভ কিছু নয়।

কুমারী, জলজা, রাজহংসীর মতো চলনে সম্পন্না, সুবাসিনী, অশেষ—প্রায় অবাস্তব—সৌন্দর্যের অধিকারিণী, পুরুষদের সুখের উৎস, প্রেমময়ী, নৃত্যপরা ও বাদননিপুণা এই অঙ্গরারা, ইন্দের প্রসাদে তারা মহিমাষিতা, কুবেরের প্রাসাদে তাদের অধিষ্ঠান, আর এই অঙ্গরাদের মধ্যে সুন্দরীতমা, তিনি রক্তা। রক্তার সঙ্গী নলকুবরও আদর্শপ্রণয়ী এবং সুদর্শন, প্রাচীন ভারতীয় ভাঙ্কর্যে কুবেরের কুরূপ হলেও নলকুবর রূপবান। নলের রূপ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং কুবর

শব্দের এক অর্থ কুজ। কুরূপ কুজ পুরুষ ও রূপবতী নারীর প্রেম ও কামনা আরব্য উপন্যাসের মতো প্রাচীন প্রাচ্যের কাহিনির আবৃত্ত প্রসঙ্গ, উলটোদিকে কুজা ও কৃষ্ণের প্রণয় পুরাণপ্রসিদ্ধ। যক্ষের মহিমা কেন শাপে লুপ্ত হয়, অঙ্গরা কেন বা অভিশপ্ত ও লাক্ষিত হয় তা ভাববার কথা। এবং অব্রাহ্মণ্য—বৌদ্ধ ও জৈন পরম্পরায় নলকুবর ও রজ্জা কেন গৃহীত ও আদৃত হন তাও একই সঙ্গে ভাবতে হয়। প্রথম শতকে রচিত অশ্বঘোষের *বুদ্ধচরিত*-এ এবং পঞ্চম শতকের প্রথমে দিকে ধর্মরক্ষ কর্তৃক সংস্কৃত থেকে *বুদ্ধচরিত* গ্রন্থের চৈনিক অনুবাদ *ফো-শো-হিঙ-ৎসান-কিঙ*-এ বুদ্ধজন্মপ্রসঙ্গে বলা হয়েছে যখন নলকুবর বা ন-লো-কিউ-পো নামক বৈশ্রবণপুত্রের জন্ম হয়েছিল তখন দেবগণ সুখ ও আনন্দে পরিপূর্ণ হয়েছিলেন। জৈন সাধকদের পাঠ্য উত্তরাধ্যায়নের বাইশের অধ্যায়ের রথনেমি উপাখ্যানে সাধিকা ও তরুণী রাজকন্যা রাজমিতীকে বর্ষণাচ্ছন্ন রৈবতকের গুহায় অতর্কিতে একাকী নগ্ন দেখে তাঁর স্বামীর অগ্রজ সংরক্ত রথনেমি তাঁকে মিলনের তাৎক্ষণিক প্রস্তাব করলে রাজমিতী রথনেমিকে নিবৃত্ত করে অক্লুশাহত হাতির মতো তাঁকে ধর্মপথে চালিত করেছেন এই-যা কথা বলে তা থেকে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, নলকুবর প্রেমিকপ্রবরের এক আদ্য কল্পরূপ ছিলেন : “আপনার যদি বৈশ্রবণের মতো সৌন্দর্য থাকে, আপনার যদি নলকুবরের মতো প্রীতিজনক ব্যবহার থাকে, আপনি যদি স্বয়ং পুরুষরও হন, তবু আপনার প্রতি আমি কোনও কামনা পোষণ করি না।” রথনেমি-রাজমিতীর এ আখ্যানের কাঠামো এমনিতেই রাবণ-রজ্জার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সোমদেবের কথাসরিত্সাগর গ্রন্থের একটি উপাখ্যানে বলা হয়েছে যুবরাজ সুন্দরসেন তাঁর প্রেমিকা মন্দারবতীকে নিয়ে সেভাবে স্বগৃহে গেলেন যেভাবে নলকুবর রজ্জাকে নিয়ে অলকায় গিয়েছিলেন। আর একটি উপাখ্যানে বলা হয়েছে চিত্রকূট পর্বতে তরুণ রাজা সুবেণ ও অঙ্গরা রজ্জা পরম্পরকে দেখে মুগ্ধ হলেন, তাদের উন্মত্ত মিলনের ফলে এক কন্যার জন্ম হলে রজ্জা স্বর্গে ফিরে গেলেন। ঋষি বৎস রজ্জাকন্যা সুলোচনার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বিবাহ করলেন এবং জামাতা বৎসের পুণ্যবলে স্বর্গের সুবেণ স্বর্গে গিয়ে তাঁর রজ্জাকে ফিরে পেলেন। আরও একটি উপাখ্যানে বলা হয়েছে যে, সমাগত রজ্জাকে গ্রহণ না করায় রজ্জার শাপে অর্জুন বৃহন্নলা হয়েছিলেন। *রামায়ণ*-এর রজ্জাহরণ বৃত্তান্তে ঘটল উলটো, অনিচ্ছুক রজ্জাকে বলপ্রয়োগে গ্রহণ করায় রাবণ শাপের ফলে প্রায়-বৃহন্নলারূপে পর্যবসিত হলেন। লোকপ্রিয় ওই প্রণয় আখ্যানটির ধারা সংস্কৃত থেকে প্রাকৃতে অপভ্রংশে নব্য-ভারতীয় আর্থভাষাসমূহে বয়ে চলেছে। দামোদরগুপ্তর কুটুমীমত নামের নিদর্শন আখ্যানে মঞ্জরী নানী নায়িকার দূতী নায়ককে নলকুবর-রজ্জা প্রেমের উল্লেখ করে ঘটকতায় সার্থক হয়েছে। সপ্তম শতকে নলকুবর-রজ্জাকে প্রসঙ্গ করে সংস্কৃত কাব্য রচিত হয়েছিল। নবম শতকের মাহারাত্রী প্রাকৃতে সম্ভবত কুতূহল বিরচিত লীলাবতী বা লীলাবাসী আখ্যানে আছে যে, রজ্জা রাজর্ষি বিপুলাস্যর ধ্যান ভঙ্গ করে, ফলে রজ্জার গর্ভে কুবলয়বতীর জন্ম হয়; কুবলয়বতীর গম্ভীর্বস্বামী মন্তক চূর্ণ হওয়ার অভিশাপে গ্রস্ত হয় এবং কুবলয়বতীর আত্মহত্যার চেষ্টা ব্যর্থ হলে রজ্জা কুবলয়বতীকে নলকুবরের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। মধ্যকালীন বাংলা কাব্যে যমলার্জুন ভঙ্গের ফলে শাপমুক্ত নলকুবরের উত্থানের উল্লেখ দেখা যাচ্ছে। বিলহণের রচনায় শুভিতা রজ্জার উল্লেখ রয়েছে, কথাসরিত্সাগর থেকেও জানা যাচ্ছে রজ্জা অভিশাপের ফলে স্তম্ভে পরিণত হয়েছিলেন। শুভিতরম্ভক নামের উপরূপকের উল্লেখ আছে নাট্যশাস্ত্রে। গ্রিক স্থাপত্যে ক্যারিঅ্যাটিদ ছিল শুভিতা নারীমূর্তি, তা হয়তো

যুদ্ধবন্দিণীর স্মারক। অভিশপ্ত নলকুবের বৃক্ষ ও অভিশপ্ত রক্তা স্তম্ভ। সংস্কৃত ক্যারিআটদের প্রসঙ্গ স্মরণ করিয়ে দেওয়া স্থাপত্যের একটি পরিভাষা শালভঞ্জিকা। শালভঞ্জিকা শব্দের দুটি অর্থ : স্তম্ভিতা নারী ও বেশ্যা; দুটি অর্থই যেন রক্তার উপযুক্ত। ভারতচন্দ্র তাঁর *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে অন্নপূর্ণার অভিশাপে নায়ক ভবানন্দরূপে নলকুবেরের মর্ত্যে অবতরণ দেখিয়েছেন। এখানে নলকুবেরের সঙ্গিনী রক্তা নন, তাঁদের নাম চন্দ্রিনী ও পদ্মিনী। ভারতচন্দ্র সম্ভবত লোকায়ত কোনও উৎস হতে নলকুবেরের এই উপাখ্যান সংগ্রহ করেছেন, সে-আখ্যান আমাদের জানা নেই।

রাবণ এবং রক্তা ব্যুৎপত্তিমূলের দিক থেকে উভয়ে উচ্চরবকারী, পুরাণে তাঁরা দুজনে সংগীত এবং নর্তন-বিশেষজ্ঞরূপে স্বীকৃত। তাছাড়া রক্তার নামে আছে অনু-অর্থ কদলী বা কলা শব্দের বাচকতা। অঙ্গুরা মেনকা এক ঋষির বীজ ধারণ করে কলার মধ্যে যে কন্যার জন্ম দেন তার নাম হয় কদলীগর্ভা। অঙ্গুরা অলম্বুবার কন্যার নামও কলাবতী। কলানৈপুণ্যের সঙ্গেই অঙ্গুরাদের বেশি যোগ, বিশেষত নাট্যকলার সঙ্গে তাঁরা যুক্ত। আধুনিক বাঙালির বিচারে হয়তো সামান্য অশালীন তবু লোকায়ত অথচ মহাকাব্যের অংশীভূত ঋষ্যশৃঙ্গবরণ রক্তাহরণ এই জাতীয় উপাখ্যান প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা-সাহিত্যকে বশীভূত করে রেখেছিল। লবকুশ বা কুশীলব সম্বলিত ভবভূতির রামনাটক উজ্জয়িনীর মহাকাল উৎসবে অভিনীত হয়েছিল, ভবভূতির *উত্তররামচরিত* নাটকে জনকদ্রোহী ঋষি কুশঙ্কজ সীতা ও উর্মিলাকে রথচালক রক্তার পরস্পরালব্ধ আখ্যান শুনিয়েছিল, অবশ্য উত্তররামায়ণের মতো উত্তররামচরিতেও এমন অনেক প্রসঙ্গ আছে যা আদি *রামায়ণ*-এ ছিল না। জয়সুর ন্যায়মঞ্জরীতে উদ্ধৃত নাট্যসংলাপ থেকে জানা যাচ্ছে যে কৃত্যারাবণ নামে এক বিলুপ্ত নাটকে কৃত্য সীতার রূপ ধরে রাবণকে বিনাশে উদ্যত হয়েছিল, কিন্তু মারে নি তার কারণ রামের হাতেই রাবণের মরণ হতে পারে। এ নাটক বেদবতী ও তার অভিশাপের গুরুত্বের কিছুটা হানি ঘটায়। মহাভারতের পরিশিষ্ট বা খিলপর্ব রূপে পরিচিত তৃতীয় শতকের রচনা হরিবংশে প্রাচীনকালে প্রচলিত লোকনাট্যের প্রত্নস্মৃতি উৎকীর্ণ হয়ে আছে। অসুররাজ বজ্রনাভের সুরক্ষিত রাজধানীতে অভিনীত রামকথা অবলম্বনে রচিত অথচ রামলক্ষ্মণের নামমাত্র ভূমিকাসম্বলিত এই মঞ্চস্থ নাটকটি বিশেষভাবে গৃহীত হয়েছিল বলা হয়েছে। বজ্রনাভ কালোৎসব উপলক্ষে বজ্রপুরে নাট্যদলকে নিমন্ত্রণ জানানেন, প্রেক্ষাগৃহে এই অভিনয় তাঁর সৈন্যবাহিনীর বিনোদনের উপযুক্ত ছিল, এবং রক্তাভিসার নাটকটি সেখানে অভিনীত হল। হরিবংশ-এ নাট্যোৎসবের বিশদ বর্ণনা রয়েছে : শুর নামে এক যাদব তরুণ রাবণের ভূমিকা ও রাজনর্তকী মনোবতী রক্তার ভূমিকা অভিনয় করেছিলেন। শাস্ত্র সেজেছিলেন বিদুষক, প্রদ্যুম্ন খল রাবণের ছদ্মবেশে আবির্ভূত হয়েছিলেন। অসুর দর্শকবৃন্দের দ্বারা নৃত্যপরিবেশিত অভিনেতাদের পদকর্ম ও অভিনয় উচ্চ প্রশংসিত হয়েছিল তাও এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। উত্তররামায়ণের মধ্যে রক্তাহরণের উপস্থাপন এপিসোডিক ড্রামার কথা মনে করিয়ে দেয়, যেন রক্তাহরণ এক প্রকরণ-নাট্য এবং তা রাক্ষসসেনাদের সমক্ষে অভিনীত হয়েছিল। বটতলার রামায়ণেও সৈন্যদের শিবিরের প্রসঙ্গটি রক্ষিত হয়েছে : “কৈলাস পর্বতে গেল বেলা অবসানে। বাসা করি রাবণ রহিল সেই স্থানে।” সংস্কৃত *রামায়ণ*-এ আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে রক্তা “সৈন্যমধ্যেন গচ্ছন্তী রাবণেনোপলক্ষিতা” সৈন্যদের মধ্যে দিয়ে চলেছেন রক্তা, রাবণের তাঁর উপর চোখ পড়ল। রণ ও রমণ, লুণ্ঠন ও ধ্বংসের একাকার

মোটফটি ওভিদের দার্ত আমাতোরিআ গ্রন্থে যেভাবে প্রযুক্ত হয়েছে তা সংলগ্নভাবে দেখানো যায় :

কিন্তু বৃত্তাকারে স্তরীভূত দর্শকের আসনসমূহই হওয়া উচিত তোমার প্রিয় যুগযাক্ষের : প্রণয়িনী বা নর্মসঙ্গিনী, এক রাত্রির ঘটনা বা স্থায়ী প্রেমের বিষয়—যেমনটি তুমি চাও, এখানে তুমি নিশ্চিত সমৃদ্ধ ফল পাবে।... আমাদের পরিশীলিত মহিলারা এই ভিড়ে এমন শীলায়িত হয়ে ঘনিজে আসেন যে আমার পছন্দ নিরূপণ করতে পারি না—দর্শক হয়ে আসেন তাঁরা, না দ্রষ্টব্য হয়ে : শুদ্ধ সত্তীহের এখানে কোনও সুযোগ নেই। ক্রীড়াকৌতুকের এ-পরম্পরার শুক রোমুলাস থেকে—নারীবহীন পুরুষেরা। স্যাবাইন ধর্ষণ।...ভক্ততায় জ্বরিত চিত্তের অধিত পুরুষ নজর হনছেন, চিত্তিত করছেন নির্ধাচিত মহিলাকে। এক্ষতান বাঁশরির বর তিন তালে নর্তকেরা ছুঁছেন পা, ফিরছেন বাক। নির্বিশেষ উৎসাহের নন্দিত রোলের মধ্যে সেই ইশারাটি করলেন সঘটি, এরই জন্ম উদগ্রীব অপেক্ষ। ধর্ষণ-প্রকল্পের সূচনা। লাফিয়ে উঠলেন পুরুষেরা, কঠে তাঁদের কামুক গর্জন, মহিলাদের ওপর তাঁদের তপ্ত হাত।...এভাবে কন্য পুরুষের দঙ্গল মহিলাদের করলেন আতঙ্কিত, তাঁদের বরও কপোলের লালিমা আর পূর্বেকার মতো থাকল না—সকলের জন্য একই দুঃস্বপ্ন, প্রত্যেকের জন্যে বিচিত্র সম্ভাস।... (রোমুলাস, আপনিই দেন সেনাদের যথাযথ উদার দান, দিন আমাকেও, আমিও সৈন্যদলে যোগ দেব।) সেই দিন থেকে শুরু এ সম্ভাস্ত অনুষ্ঠানের, সুন্দরী মেয়েদের কাছে আমাদের রঙ্গমঞ্চ চিরকাল বিপজ্জনক।

ওভিদ জানতেন অবৈধ প্রেম রোমান নাগরিকের বিনোদন রঙ্গমঞ্চ নাগরিকার সঙ্গে মিলনের সঙ্কেতস্থল। ওভিদ রঙ্গ করেছেন সেই শুচিবায়ুগ্রন্থদের, যাঁরা রঙ্গমঞ্চকে পাপের অধিষ্ঠানভূমি ভাবেন, নারীপুরুষকে পৃথক বসান। তা সত্ত্বেও রোমুলাস ও স্যাবাইন-মহিলাদের ধর্ষণের ঐতিহাসিক ঘটনা মিথ্যা হয়ে যায় না। ষোড়শ শতকে বোলোনার জিওভান্নি নির্মিত স্যাবাইন-ধর্ষণের বিরাট জটিল স্পষ্টতার ভাস্কর্য নারীদের নরম শরীরীসংস্থান, পেলবভঙ্গি, জড়িয়েফেলা সংগঠনের উজ্জ্বল নাটকীয়তাসমেত যে কোনও দিকের দর্শককে সমানভাবে স্মরণ করিয়ে দেয় ধর্ষণের অভিযাত সৃষ্টির জন্যই এই শিল্পের নির্মাণ। সুনীলমাধব সেন অঙ্কিত রক্তাহরণে রাবণ বিশাল এবং তাঁর আলিঙ্গনে গলে যেতে থাকা রক্তা সুকুমারী, কিন্তু রক্তার ধর্ষণজনিত প্রতিবাদ প্রতিরোধের চিহ্নমাত্র নেই, যা আছে তা নিঃশর্ত নিবিড় সমর্পণ।

এগারো শতকের কন্নড় কবি নাগচন্দ্রের পম্পারামায়ণ-এ এই রক্তা উপরক্তা হয়েছেন। বিশ্ববিজয়ে বেরিয়ে রাবণ নলকুবরের দুর্ভেদ্য দুর্গ অবরোধ করেছেন। নলকুবরের স্ত্রী উপরক্তা দীর্ঘকাল ধরেই রাবণের প্রেমে উন্মত্তা। রাবণ গ্রহণ করেছেন উপরক্তাকে, কিন্তু দুর্গজয়ের কৌশল আয়ত্ত করার জন্যই এই প্রণয়ের মুদ্রা রচনা, তাই উপরক্তার প্রতি রাবণের নির্দেশ : স্বামীর সঙ্গে অনন্যচিত্তে দাম্পত্যসুখ নির্বাহ করো। রাবণ নিজেও পরাঙ্গনাবিরতির শপথ গ্রহণ করেছেন, অন্যের শাপে গ্রস্ত হয়ে পরদারগ্রহণ থেকে নিবৃত্ত হওয়ার বাধ্যতা পম্পারামায়ণ-এর রাবণের নেই। কিলিমানুর ধম্পুরম রচিত উনিশ শতকের মলয়ালম কথাকলি নাটক রক্তাভিসার-এ অপ্রতিহত বীর নায়ক এবং অনুভূতিসমৃদ্ধ সুরূচিসম্পন্ন মানুষ রাবণ বর্বর বন্য রাক্ষস নন, দিব্য নর্তকী রক্তাকে দেখে রাবণের কবিনের নান্দনিক প্রকাশ গীতিময় রভসের গোঞ্জানিতে এভাবে মূর্ত হয়ে উঠতে থাকে :

রাবণ। উজ্জ্বল জ্যোৎস্নার রাতে
বলো কোথা চলেছ মধুরা।

পরিধানে নীল ক্ষৌমবাস,
কমনীয় রূপে দৃশ্যমান :
কালিন্দীর গাঢ় জলে লীন
দীপ্ত এক সুবর্ণের থাম।
মণি, রত্ন রমণীকুলের।
তুমি লক্ষ্মী, না তুমি পার্বতী;
ভারতী, না নিজে রতি তুমি।
ওষ্ঠাধর হাসি-উৎস ধরে;
দুটি ঠোঁট তরুণ মধুর—
অমৃত উচ্ছল পত্রপুটে।
চতুর্দশ ভুবনের প্রভু,
কামবাণে বিদ্ধ তবু আজ।
বন্দী তব লাভ্যমায়ায়।

রস্তা। এসো মাতি শৃঙ্গারের রণে।
যেতে দাও, রাক্ষসের রাজ্য।
নিবেদন করো গো শ্রবণ :
কুবেরের ছেলে যে প্রেমিক;
প্রণয়িনী তোমারই পুত্রের।
অশোভন প্রস্তাব তোমার।
পাপকর্মে হও তো বিরত।
দেবে শাপ কুবেরসন্তান।
ক্রোধ নয়, এ মিনতি রাখে।
তবু যদি চাও—অসহায়।

রাক্ষ। যেতে দাও, প্রণমি চরণে।
শোনো ওগো মধুরভাষিণী :
তোমাকে পাওয়া যে শুভযোগ।
সদয় বিধাতা যদি দেন
নিধি এনে আমারই চরণে।—
পদ্মার্জাখি, হারানোর নয়।
এসো এই কুঞ্জতলে এসো,
পিককে গঞ্জনা দাও স্বরে,
লঙ্কা দাও গজকে গমনে,
এসো মাতি কেলির কৌতুকে।
দন্ধ আমি কামনার শরে।
দেরি নয়, দাও না চুষন।
রতিতে যে আনন্দ আমার,
তুমি ধর্মে শিথিল অঙ্গরা।
শোভা পায় না এত সব কথা।
আছে কেউ আর যোগ্যতর
তোমায় সঙ্গত হতে পারে।
এসো এসো সূচারুকেশিনী।

শতপথব্রাহ্মণ তৃতীয় কাণ্ড দ্বিতীয় অধ্যায় প্রথম ব্রাহ্মণ চন্দ্রিশের সূক্তে বলা হয়েছিল যে, রক্ষসরা পার্শ্বি নারীদের অনুসরণ করে এবং এভাবে তাদের বীজ রোপণ করে। ভারতের সাহিত্যে-শিল্পে প্রায় দুই সহস্রাব্দ ধরে রামকথার এপিক অনুষঙ্গে বাহিত রম্ভাহরণ বৃত্তান্তটির বিচিত্র ও নিরবচ্ছিন্ন ধারা থাকা সত্ত্বেও আধুনিক বাংলার কৃতিবাসি রামায়ণ-এর বিচারমূঢ় সম্পাদকতায় রম্ভাহরণ প্রায়শ বর্জিত বা নীরন্তভাবে উপস্থাপিত হয়ে এসেছে। রম্ভাহরণ যদি কৃতিবাসের রামায়ণ-অতিরিক্ত তথ্যরূপেই থেকে থাকত—যেমন, মহাভারত-এ যে চ্যবন ঋষিকে বাল্মীকিস্থাপে পাওয়া গিয়েছিল সেই চ্যবনঋষির সন্তানরূপে বাল্মীকিকে নির্দেশের মান্য পরম্পরার সংবাদ কৃতিবাস থেকেই প্রথম প্রাপ্ত হওয়া গেল—সে তথ্যও বিশেষজ্ঞদের নতুন যোগাযোগের সূত্র এগিয়ে দিতে পারত। চ্যাপম্যানের হোমার খুলে কিটস পড়েছিলেন the sea hed soaked his heart through এবং উধাও ভেসে গিয়েছিলেন সে-ডেউ এর ধাক্কায়, কিন্তু অভিঘাত-হানা সেই পদবন্ধটি চ্যাপম্যানেই ছিল, মূল হোমারে ছিল না।

এই জীবন

রুশতী সেন

যেমন খেলা তেমনি যে কাজ...

১৯২৪ সাল। ধূজটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তখন লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি এবং সমাজতত্ত্ব বিভাগে শিক্ষক। জুলাই মাসে প্রকাশিত হলো তাঁর প্রথম বই *Personality and the Social Sciences*. লেখকের বিশেষ বন্ধু হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ছিলেন সে বইয়ের প্রকাশক। প্রায় বত্রিশবছর পরে, ১৯৫৬ সালের ৫ মার্চ ধূজটিপ্রসাদ ডায়েরিতে লেখেন :

ছাঞ্চিশ-সাতাশ বছর যখন বয়স তখন ইংরেজীতে আমার প্রথম বই লিখতে আরম্ভ করি। বইখানি কোনো পত্রিকায় সমালোচনার জন্য পাঠাইনি। আমার মতে যীরা ঐ-বিষয়ে শ্রেষ্ঠ মনীষী সেই বারোজনকে পাঠাই। তাঁরা প্রত্যেকেই চিঠিতে তাঁদের মন্তব্য জানান...বার্ট্রাণ্ড রাসেল, বেগর্সি, হলডেন, হবহাউস, কেসারলিঙ্ক, ক্রেমেন্টওয়েব প্রভৃতি চিঠি লিখেন। আত্মবিশ্বাসও এলো, কিন্তু ডক্টরেট নেওয়া হলো না, ডাবলাম আর কী দরকার। (মনে এলো, ধূজটিপ্রসাদ রচনাবলী ৩, দ্বিতীয় সম্ভার, পৃ ১৬২)।

আজকের দিনে বুদ্ধিজীবীর এমন হালচালকে কি বেহিসেব বলে? নাকি বোকামি? ধূজটিপ্রসাদের আমলে ওই বেহিসেবের নাম কি আলাদা ছিল? কী বলত তাকে? স্জ্ঞানের অভিমান? নাকি স্জ্ঞানীর ইমান? ধূজটিপ্রসাদের ডায়েরিতে আছে :

কেন শক্ত জিনিস ধরতে চাই, কেনই বা ছেড়ে দিই? এক উত্তর—দস্ত। খানিকটা সত্য, পুরোপুরি নয়। বাকিটা শিক্ষা। প্রথমে পারিবারিক শিক্ষা। সারাদিন মোকদ্দমা চালিয়ে সন্ধ্যায় ক্রান্ত হয়ে স্প্রিং-এর খাটে শুয়ে বাবা আমাকে বললেন, মেকলের ইংলণ্ডের ইতিহাস পড়ে শোনাও। মর্লের লেখা ম্যাডিস্টোনের জীবনীও মধ্যে মধ্যে পড়তে হতো। তখন বয়স বোধ হয় দশ-এগারো...তারপর স্কুলে ঈশান ঘোষের ইতিহাস আর নাবাগবাবুর সাহিত্য পড়ানো; কলেজে ফদার পাওয়ার, আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর, জ্ঞানকীনাথ, ক্ষেত্রমোহন, বিপিন গুপ্ত, ললিত বন্দ্যোপাধ্যায়, তার সঙ্গে সতীশ চট্টোপাধ্যায়ের অঙ্ক আর কৈলাশ পণ্ডিত মশাই-এর সংস্কৃত পড়ানো, অঘোর চট্টোপাধ্যায়ের কেমিস্ট্রি; বিশ্ববিদ্যালয়ে সিটফেন সাহেব, মনোমোহন ঘোষের ইংরেজী বক্তৃতা শোনা...ব্রজেন শীল, বিজয় মজুমদার, রমেশ মজুমদার, বিপিন সেন, অজয় দত্ত, সতীশ রায়...প্রথম চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ, প্যাট্রিক গেডিস এবং দূর থেকে জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র; বাইরে বাইরে অকনবাবু, গগনবাবু আর অর্ধেন্দু গাঙ্গুলী, কুমারস্বামী, রাধিকা গোসাই, কেরামৎ খাঁ, বিশ্বনাথ রাও, দুর্গভবাবু আরো কতো। আমার মনে হতো, সকলই ক্ষুদ্রে সম্ভূষ্ট হতে বারশ কবছেন...বুদ্ধিবাদ্যর অসীমতাই আমার শিক্ষা। দুরাশা পোষণ করেই ক্ষান্ত হইনি। সেজন্য খেটেওছি। [ওই, পৃ ৫১-৫২]।

ওই শিক্ষা, ওই পরিশ্রম, শিক্ষা সংলগ্ন এবং শ্রম-সম্পৃক্ত খানিকটা ন্যায্য দস্ত পাঠক খুঁজতে পারেন ধূজটিপ্রসাদের বুদ্ধিবাদী চর্চা আর অর্জন জুড়ে। অর্থাৎ বলা চলে, এক অর্থে

ধূজটিপ্রসাদের জীবন জুড়ে। ১৯২২ সালে লন্ডনে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেওয়ার আগে কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজে কিছুদিন পড়িয়েছিলেন তিনি। এ হলো ১৯২১ সালের কথা। তার একবছর আগে ১৯২০তে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর হয়েছেন ধূজটিপ্রসাদ, পেয়েছেন প্রথম শ্রেণি। ১৯১৯-এই তাঁর পড়া হয়ে গেছে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো। আর ১৯২২-এ, অর্থাৎ লন্ডনে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের বছরটিতে পড়তে শুরু করেছেন কার্ল মার্কস-এর ডাস্ ক্যাপিটাল গ্রন্থটি। সাবালক পত্রিকায় ধূজটিপ্রসাদের প্রথম লেখা বোধহয় ১৯১৬তে। সবুজপত্র-এ ১৩২৩-এর অগ্রহায়ণ, মাঘ এবং ফাল্গুন সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল ‘দাদার ডায়েরি’। বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন:

...আমাদের একমাত্র মামাতো ভাই ‘তিপুদা’...হীমান্ অতিসূকষ্ট, রোগভয় ও বাতিক-গ্রস্ত এবং প্রথম জীবনে সংশয়বাদী (পরে গভীর অধ্যাত্মসাধনার মধ্য) এই অসাধারণ মানুষটির সঙ্গে ধূজটিপ্রসাদের ছিল খুব অন্তরঙ্গতা ও মনের মিল। ‘সবুজপত্রে’ তাঁর প্রথম রচনা ‘দাদার ডায়েরী’ ঐ ব্যক্তিকে কেন্দ্র করেই তৈরি হয়। (বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ‘মানুষ ধূজটিপ্রসাদ : ঘরে ও বাইরে’, প্রসঙ্গ : ধূজটিপ্রসাদ, জলার্ক, আশ্বিন ১৩৯২ব, পৃ ১৯৯)।

ধূজটিপ্রসাদের ডায়েরিতে আছে :

ভালো ওস্তাদের কাছে গৌরী, মালিগৌরীও শুনেছি। গৌরী বলতে তিনকড়ি ও আমার দাদা ত্রিপুরার কণ্ঠে ‘পাগল বাবা পাগলি আমার মা’ যা শুনেছি, তার তুলনা নেই। ‘মার নাম শ্যামার’ মধ্যে শ্যামা বলবার সময় দাদার গলা কেঁপে উঠত। এরকম কণ্ঠ এক দিলীপ ছাড়া আর কারুর গলায় আসত না, যদিও গান কারুর কাছে শেখনি। দাদা হালিশহরের সিদ্ধেশ্বরীতলার ঘটি থেকে ‘পাগল বাবা পাগলি আমার মা’ গানটি গাইছে, আর আমরা নদীর ওপার থেকে সে গলা শুনতে পেতাম। এত জোর যে ঘরের কচের দরজা কনকন করে উঠত। দাদা সন্ধ্যাসী হয়ে গেল, আর গাইত না। (মিলিমিলি, ধূজটিপ্রসাদ রচনাবলী ৩, দ্বিতীয় সঙ্কর, পৃ ২৭৫-৭৬)।

এই হল ধূজটিপ্রসাদের জীবনকথায় হাত দেওয়ার সমস্যা। কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো, ক্যাপিটাল, সবুজপত্র, দিলীপ রায়, সব একই অনুচ্ছেদে হুড়মুড় করে এসে পড়ল আমাদের সামনে। সময়ের ক্রম যদি মেনে চলি, তবে তো এখন পাঠককে জানাতে হয় যে, জীবনের প্রথম বই ১৯২৪ সালে প্রকাশিত হওয়ার আগে, কেমন ছিল তাঁর লেখালেখির হালচাল। বলতে হয় যে ‘দাদার ডায়েরি’র পরেই তিনি সবুজ পত্র-এ ১৩২৪ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় অর্থাৎ ১৯১৭তে লিখেছিলেন ‘ধরতাই বুলি’, তারপর ১৩২৬ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যা সবুজপত্র-এ ‘ডিমোক্রাসি’। এই তিনটি রচনাই ১৯৮৭ সালে (জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৪ব) দেবজ পাবলিশিং-এর উদ্যোগে ধূজটিপ্রসাদ রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ড (২-২) প্রকাশের আগে পর্যন্ত অগ্রহীত পড়েছিল।

১৯৩১ সালে অবশ্য বেরিয়ে গেছে ধূজটিপ্রসাদের প্রথম বাংলা বই আমরা ও তাঁহারা। ছয়টি স্তবকে বিভক্ত কথোপকথনগুলির গ্রন্থিত হওয়ার সময় পাওয়া যায় বইয়ের মুখবন্ধে পয়লা জুলাই ১৯৩১ উল্লেখ থেকে। এ বইতে লেখকের চিন্তার মূল ধরতাই স্তবক থেকে স্তবকান্তরে, বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে নিজে থেকে প্রতিষ্ঠা করে। সঙ্গে সঙ্গে পাঠককে এক-একটি বিষয় নিয়ে একাধিক বিকল্প সিদ্ধান্তের দরজা খুলে দেয়। যেন কোনো শেষ সিদ্ধান্তের বাঁধন থেকে পাঠকের মুক্তি চেয়েই এমন বিন্যাসে লেখক নিজের আশ্রয় খোঁজেন। প্রথম তিনটি স্তবক ‘বিরোধের কথা’, ‘সুরের কথা’ এবং ‘সঙ্গীতের কথা’ প্রথম বেরিয়েছিল বঙ্গবাণী তে ;

আর বর্ষ অর্থাৎ শেষস্তবক ‘স্ত্রী-পুরুষের কথা’ প্রথম প্রকাশিত হয় *কল্লোল* পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪ সংখ্যায়। ১৯২৪এ *Personality and the Social Sciences* এবং ১৯৩১এ *আমরা ও তাঁহারা* -র মধ্যবর্তী সাতবছরে কীকী লিখেছিলেন ধূজটিপ্রসাদ? ১৯২৫ সালে লিখেছিলেন বিখ্যাত প্রবন্ধ ‘নর্মাল’, যা পরে গ্রহিত হয়েছে ধূজটিপ্রসাদের দ্বিতীয় বাংলা প্রবন্ধ সংকলন *চিন্তয়সিতে*। ভাদ্র ১৩৩২ সংখ্যা *সবুজপত্র*-এ প্রকাশিত ‘পত্র’ও ১৯৮৭র আগে গ্রহিত হয়নি। *আমরা ও তাঁহারা*-র চতুর্থ এবং পঞ্চম স্তবক যথাক্রমে ‘মনের কথা’ এবং ‘দেশের কথা’র প্রথম প্রকাশ সংক্রান্ত কোনো তথ্য অবশ্য এখনো মেলেনি। *আমরা ও তাঁহারা*-র মুখবন্ধে আছে ‘বইখানির প্রথম তিনটি স্তবক বছর কয়েক পূর্বে মাসিক ‘বঙ্গবাণী’তে প্রকাশিত হয়, বাকি তিনটি নতুন লেখা’ (র-২, পৃ ৩)। ১৯২৬এ *উত্তরা* পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩ সংখ্যায় ধূজটিপ্রসাদ লিখেছিলেন ‘ডায়েরির পাতা’ আর *কল্লোল* পত্রিকার ভাদ্র ১৩৩৩ সংখ্যায় আলোচনা করেছিলেন তৎকালীন তিনটি উল্লেখযোগ্য বই নিয়ে—সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর *ঐন্দ্রজালিক*, পরশুরামের *গড্ডলিকা* এবং শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের *অতসী*। প্রবন্ধটির নাম ছিল ‘বর্তমান গদ্য সাহিত্যে তিনখানি ভাল বই’।

ধূজটিপ্রসাদের প্রথম যে ছোটোগল্পের হৃদিস মেলে, তা ওই ১৯২৫-২৬ সাল নাগাদই লেখা। ‘মনোবিজ্ঞান’ (উত্তরা, অগ্রহায়ণ ১৩৩২ব; এটি কিন্তু *রিয়ালিস্ট* গল্পসংকলনে অন্তর্ভুক্ত ‘মনোবিজ্ঞান’ নয়, বরং বহুদিন অগ্রস্থিত থাকবার পরে *ধূজটিপ্রসাদ রচনাবলী* দ্বিতীয় খণ্ডের পরিশিষ্ট অংশে তা যুক্ত হয়) এবং ‘বকসীস’ (উত্তরা, পৌষ ১৩৩২ব) গল্পদুটিতে ইংরেজের বাংলায় পরাধীন শিক্ষিত বাঙালির ঘর আর বিশ্ব, তাদের জীবনযাপনের রাজনীতি-সমাজনীতি—অর্থনীতি সাহিত্যের সংগতিতে মূর্ত হয়েছে। ১৯২৭ সালে ‘স্ত্রী-পুরুষের কথা’র কথোপকথনে, *আমরা ও তাঁহারা*র সুচিন্তিত, সুপঠিত অথচ জিজ্ঞাসু পরিবেশনে খুঁজে পাওয়া যায় ‘বকসীস’ অথবা ‘মনোবিজ্ঞান’ এর মতো বিশিষ্ট ছোটোগল্পের নির্মাতাকে। কিন্তু এগন্ধকে আদৌ বলা চলে না প্রাবন্ধিকের সৃজন। সে-খামতি বরং জায়গাবিশেষে আছে তাঁর উপন্যাস-ত্রয়ীতে। ১৯২৭এ আরো দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেছিলেন ধূজটিপ্রসাদ—‘সাহিত্যিকের যুক্তি তথা সাহিত্যে মিথ্যাবাদ’ এবং ‘প্রগতি’। দুটিই পরে যুক্ত হয় *চিন্তয়সি*-তে। ১৯২৮এ লেখা দুটি প্রবন্ধের একটি ‘সমাজধর্ম ও সাহিত্য’, অন্যটি ‘সঙ্গীত সমালোচনা’। প্রথমটি পাওয়া যায় *চিন্তয়সি*-তে, দ্বিতীয়টি অনেক পরের বস্তুসংকলনে। ১৯২৯-এ লেখা ‘সমাজ ও সম্যাসগ্রহণ’ (*বিচিত্রা*, শ্রাবণ ১৩৩৬ব) *ধূজটিপ্রসাদ রচনাবলী* দ্বিতীয় খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আগে পর্যন্ত অগ্রস্থিত ছিল। *বিচিত্রা*র কার্তিক ১৩৩৬ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত ‘যোগধর্মের যুক্তি’ *চিন্তয়সি* সংকলনের অন্যতম প্রবন্ধ। সারাজীবন ধূজটিপ্রসাদ গ্রন্থসমালোচনা লিখেছেন প্রচুর, এবং সেসব বইয়ের পারস্পরিক বিষয়গত ফারাকও বিস্তৃত হওয়ার মতো! যে-পাঠকের আগ্রহ এবং মনোযোগের ব্যাপ্তি এতখানি, শিক্ষা-সংলগ্ন দৃষ্টে তাঁর কি ন্যায্য অধিকার? ১৯২৯-৩০-এ *উত্তরা* পত্রিকায় চারটি সাহিত্যমনস্ক চিঠি লিখেছিলেন ধূজটিপ্রসাদ; ১৩৩৬-এর আশ্বিন সংখ্যায় আছে সনেটের কথা। ১৩৩৬-এর কার্তিক সংখ্যার চিঠিটি একান্ত সজীব: ‘প্রত্যেক শিক্ষিত পুরুষনারী culturally ব্রাহ্ম হয়েছেন। তুমি বলবে এখানে হিন্দুধর্ম হিন্দুসমাজ ব্রাহ্মধর্মকে হজম করেছে। আমি ঠিক উন্টোকথা বিশ্বাস করি। সমগ্র হিন্দুসমাজকে ব্রাহ্মধর্ম টেনে তুলেছে।’ (‘একখানি পত্র সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীকে ২’ র-২, পৃ ২৭৪)। আর অগ্রহায়ণ ১৩৩৬-

এর চিঠির শেষে বাংলায় বুদ্ধিবাদী উপন্যাসের স্রষ্টা ধূজটিপ্রসাদ বিতুতিভূষণের পথের পাঁচালী নিয়ে উচ্ছ্বসিত :

ভাল কথা, বিতুতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পথের পাঁচালী’ পড়েছি? আমি ভাই মুগ্ধ হয়েছি। আজ যদি আমি এই বই সম্বন্ধে কিছু লিখি তা হলে সে লেখা উচ্ছ্বাসপূর্ণই হবে। কিন্তু বইখানি আমি অন্ততঃ দুবার পড়লাম। এখনো আমার মতামত সংযত করতে পারলুম না...এমন ভাষা, এমন গাভীর, এমন nature study, এমন সুস্পষ্ট, এমন চরিত্রাংশ, এমন পবিত্রতা আমাদের সাহিত্যে দুর্লভ। তুমি যেন প্রত্যেককে পড়তে অনুরোধ কোর—আমিও করছি...আসছে মাসে বইখানির দীর্ঘ সমালোচনা করব।’ (ওই, ৩, ওই, পৃ ২৮৩)

মাঘ ১৩৩৬ সংখ্যার চিঠিটি সেই সমালোচনা।

পাঠক হিসেবে ধূজটিপ্রসাদের অমলিন তন্ময়তা এবং চিন্তাবিদ হিসেবে তাঁর পরিশ্রমী দায়বোধ এইসব পত্রের ধরতাইতেও অনায়াসে মূর্ত হয়। ১৯৩১-এ জীবনের প্রথম বাংলা প্রবন্ধসংকলন *আমরা ও তাঁহারা* -র প্রকাশের সমকালে ধূজটিপ্রসাদ সমসাময়িক বাঙালির জীবন নিয়ে লিখছেন একটি আশ্চর্য প্রবন্ধ ‘বৈঠকখানা ও সমাজ’ (উত্তরা, আষাঢ় ১৩৩৮ব)। এই বছরই লেখা হয় *চিন্তয়সি* সংকলনের প্রথম প্রবন্ধ ‘কন্স্মে দেবায়’। ১৯৩২-এ ধূজটিপ্রসাদের দু-নম্বর ইংরেজি কিতাব *Basic Concepts in Sociology*-র প্রথম প্রকাশ, প্রকাশক Kegan Paul, Trench, Trubner & Co Ltd. পাশাপাশি চলেছে দ্বিতীয় বাংলা বই *চিন্তয়সি*-র প্রস্তুতি। সেখানকার ‘যুগধর্মের অন্যদিক’ আর ‘বিশ্বকবি’ এই বছরেই লেখা হল। ১৯৩৩-এ প্রকাশিত হল ধূজটিপ্রসাদের দ্বিতীয় বাংলা বই *চিন্তয়সি* (ভূমিকার তারিখ ২০.১২.১৯৩৩)। সেদিক থেকে *চিন্তয়সি*-কে দ্বিতীয় না বলে তৃতীয় বাংলা বই বলাই সংগত, কারণ ধূজটিপ্রসাদের একমাত্র গল্পসংকলন *রিয়ালিস্ট* প্রকাশ করেন কুন্দভূষণ ভাদুড়ী ওই ১৯৩৩ এই। এ বইয়ের উৎসর্গপত্রের তারিখ মহাশয়ী ১৩৪০। আশ্চর্যের কথা যে ১৯৩৩-এ লেখা ধূজটিপ্রসাদের তিনটি ছোটগল্প ‘মশারি’ (উত্তরা, শ্রাবণ ১৩৪০), ‘ভূতের গল্প’ (উত্তরা, ভাদ্র ১৩৪০) এবং ‘পাইপ’-এর (বিচিত্রা, পৌষ ১৩৪০) মধ্যে সবার সেরা যে ‘মশারি’, সে এখনো অগ্রস্থিত পড়ে আছে ; অবশ্য ‘পাইপ’-ও এখনো অগ্রস্থিত। ‘ভূতের গল্প’ *রিয়ালিস্ট* সংকলনে গেল ‘একদা তুমি প্রিয়ে’, ‘প্রেমপত্র’, ‘রিয়ালিস্ট’ এবং আর এক ‘মনোবিজ্ঞান’-এর সঙ্গে। প্রায় পাশাপাশি আশ্বিন ১৩৪০ সংখ্যা *উত্তরা* য় প্রকাশিত হয় সাহিত্যের বিশিষ্ট পাঠক ধূজটিপ্রসাদের একটি চিঠি ; তার পুনশ্চে আছে, ‘সুতিনী বইটা মাত্র অর্ধেকটা পড়েছি, এখন পাচ্ছি না। উদ্ধার করে পড়ব তারপর জানাব।’ (‘সাহিত্যপ্রসঙ্গ ও পুস্তক-পত্রিকা পরিচয় শ্রীসুরেশচন্দ্র চন্দ্রবতীকে লেখা ২’, র-২, পৃ ৩১১)। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ কৃত *লঘু-গুরু* উপন্যাসের সমালোচনার সুবাদে জগদীশ গুপ্তকে যারা পুরোপুরি নস্যাত করে দিয়েছেন, এমনকী সেই লেখককে বা তাঁর উপন্যাসটিকে একেবারে না-পড়েই, ধূজটিপ্রসাদ সেই দলের সদস্য নন! এখানেই ‘মশারি’র মতো গল্পের লেখকের সঙ্গে সমকালীন সাহিত্যের পাঠক ধূজটিপ্রসাদের পরম সংগতিবিধান সম্ভব। ওই ১৯৩৩-এ ইতিহাস সংক্রান্ত তিনটি প্রবন্ধের প্রথম দুটি অর্থাৎ ‘ইতিহাস : ১’ আর ‘ইতিহাস : ২’ লেখা হল। তারা যুক্ত হবে বস্তু্য প্রবন্ধ সংকলনে—সে অনেক পরের কথা।

চিন্তয়সি উৎসর্গ করা হয়েছিল ‘শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের চরণকমলে’। আগের

বছরে *Basic Concepts ...* উৎসর্গ করেছিলেন পরম বন্ধু এবং *Personality...*র প্রকাশক হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে, উৎসর্গপত্রে ছিল 'To H. C. my best'। *চিন্তয়সি*-র উৎসর্গপত্র ধূজটিপ্রসাদ জীবনভর বহন করেছেন। ১৯৫৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি ডায়েরিতে লিখেছেন, 'প্রমথবাবু বলতেন কোনো কিছুতে ডুবে যেতে নেই। তিনি আমাকে বের্গসের (বার্গসন) রচনায় দীক্ষিত করেন। পরে বের্গসের (বার্গসন) খপ্পর থেকে বাঁচান। আবার পড়লাম রাসেল-এর গর্তে। সেখান থেকেও উদ্ধার করলেন। ক্রোচে পড়তে বললেন—পড়লাম যা পেলাম। এবার কিন্তু নিজেই নিজেকে উদ্ধার করি। মার্কস্ তিনি জানতেন না—ওটা আমার স্বেচ্ছাকৃত অপরাধ।' (*মনে এলো*, ২-৩, দ্বিতীয় সম্ভার, পৃ ১৪৫)। *চিন্তয়সি*-র সঙ্গে একই বছরে প্রকাশিত ধূজটিপ্রসাদের একমাত্র গল্পসংকলন *রিয়ালিস্ট*-এর দ্বিতীয় কাহিনি 'প্রেমপত্র' র তো নামই হতে পারত 'বার্গসনের বাহাদুরি'। ১৯৩৪এ লেখা ধূজটিপ্রসাদের ছোটোগল্প 'একটি গল্প' (*উত্তরা*, চৈত্র ১৩৪০ব) *চারইয়ারি কথা*-র ধরতাইকে বহন করতে-করতে এক অনবদ্য গল্পহীনতার নাগাল পায়। গল্প শুরু হয় *উত্তরা*-র সম্পাদককে লেখা চিঠির ছলে, 'গল্প লিখতে অনুরোধ করেছেন, কিন্তু গল্পও আসছে না। তাই সময় কাটাবার জন্য প্রমথ চৌধুরীর চার-ইয়ারী কথা এবং রবিবাবুর নানীর পাতা গুলটাছি... ভাল হলে ছাপবেন। টেকনিকটা চার-ইয়ারীর এবং নানীর,—প্রয়োগের ক্ষমতা আমার। ('একটি গল্প' *উত্তরা* চৈত্র ১৩৪০ব পৃ ৬৪৩)। দীর্ঘ পঁচিশ বছর পরে ধূজটিপ্রসাদ ডায়েরিতে লেখেন :

তার গল্পের স্টাইল এবং প্রবন্ধের স্টাইল একই। কিন্তু গল্পে একটা fantasy পাই। 'চার ইয়ারি কথা'য় একটা ভুলুড়ে ভাব, নীল লোহিতের স্বয়ম্বর', 'বীণা বাই', 'ফরমায়েশী গল্প' ও তাই, fantasy। স্টাইল এক, কিন্তু গল্প হলো তর্কের বাইরেরকর জিনিস। সেখানে খামখেয়াল। (*ঝিলিমিলি*-৩, দ্বিতীয় সম্ভার, পৃ ২৩৭)।

ওই খামখেয়ালে আড়াল করা বাহারি যুক্তিগ্রন্থির টানে এখনো অগ্রহস্ত পড়ে থাকা 'একটি গল্প' পরম সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। যেন প্রাবন্ধিকের চিন্তাসূত্র আর আখ্যানকারের স্বতঃস্ফূর্ত কথকতা একে অন্যকে ভর করেছিল ওই কাহিনিতে। এই গল্প *উত্তরায়* যেবছর বেরল, তার একবছর আগে, অর্থাৎ *চিন্তয়সি*-র ১৯৩৩এ প্রমথ চৌধুরী তাঁর *নীললোহিত* গল্পগ্রন্থ উৎসর্গ করেন ধূজটিপ্রসাদকে। ১৫ মে ১৯৫৯-এর *ঝিলিমিলি* তে আছে :

আমি কতখানি প্রমথবাবুর কাছ থেকে পেয়েছি? প্রায় সবখানিই কুঁচিয়ে কাপড় পরা থেকে, সিগারেট খাওয়ার ধরন চলন-বলন, সবই। রচনারীতি? তাও তাঁর, তবে ঠিক সম্পূর্ণ তাঁর নয়। 'দাদার ডায়েরী' 'ধরতাই বুলি', 'নর্মাল'—এসব লেখা আমার নিজের, তিনি বদলে-সদলে বোধহয় দেননি। সবুজপত্রের অন্যান্য লেখায় তাঁর হাত আছে। সবুজপত্রের লেখা ছাড়া তিনি অদল-বদল করেননি। তবু তাঁর ছাঁচ থেকে গেছে। (ওই)

১৯৩৪-এ 'একটি গল্প'র আগে আরো একটি ছোটোগল্প প্রকাশিত হয়েছিল ধূজটিপ্রসাদের। *পরিচয়* পত্রিকার মাঘ ১৩৪০ সংখ্যায় বেরয় 'এই জীবন', যুধিষ্ঠির দাস ছদ্মনামে লেখা। এই গল্পই তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস *অন্তঃশীলা*-র বীজগল্প। বক্তব্য প্রবন্ধসংকলনে পরবর্তীকালে গ্রন্থিত হয়েছে এমন তিনটি প্রবন্ধের রচনাকাল ১৯৩৪। 'ইতিহাস : ৩', 'আষাঢ়ে' আর 'অথ কাব্য জিজ্ঞাসা'। রাজশাহী আষাঢ়ে ক্লাবের বার্ষিক সম্মিলনীতে পঠিত 'আষাঢ়ে'

উত্তরা পত্রিকার আষাঢ় ১৩৪১ সংখ্যায় প্রথম বেরয়। ফরিদপুর সাহিত্যসম্মিলনী সাহিত্য শাখার অভিভাষণ ‘অথ কাব্য জিজ্ঞাসা’ নামে প্রথম প্রকাশিত হয় পরিচয় পত্রিকার বৈশাখ ১৩৪১ সংখ্যায়। উত্তরা-র পৌষ ১৩৪১ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত ‘নবছন্দদিশারী’ কিন্তু ১৯৮৭তে ধূজটিপ্রসাদ রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডে যুক্ত হওয়ার আগে পর্যন্ত অগ্রস্থিত ছিল। ১৯৩৫। এই বছরটিতে ধূজটিপ্রসাদের শিক্ষা-শ্রম-সংলগ্ন দস্তের ন্যায্যতায় যুক্ত হল এক নতুন মাত্রা। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসত্রয়ের প্রথম খণ্ড *অন্তঃশীলা* ওইবছর প্রথম প্রকাশিত হয়। যাঁদের মতামতকে গুরুত্ব দিতেন ধূজটিপ্রসাদ, তেমন কয়েকজন ‘এই জীবন’ পড়ে বলেছিলেন, ওই গল্পের উপন্যাস-সম্ভাবনা প্রবল। ‘এই জীবন’ থেকেই *অন্তঃশীলা*। ১৯৩৩এ দুটি বই-ই বের করেছিলেন কুন্দভূষণ ‘ভাদুড়ী’। ১৯৩৫-এ *অন্তঃশীলা* বেরয় সরস্বতী লাইব্রেরী থেকে। একই বছরে বেরল একটি বিশিষ্ট পত্র-সংকলন *সুর ও সংগতি*। পত্রলেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ধূজটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—প্রথমজনের চিঠির সংখ্যা এগার, দ্বিতীয়জনের তিন। গ্রন্থশেষে ধূজটিপ্রসাদের মন্তব্যের তারিখ ১ শ্রাবণ, ১৩৪২ব। সংগীত এবং সুর সংক্রান্ত এই গুরুত্বপূর্ণ পত্রাবলির প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ধূজটিপ্রসাদের বিচিত্র আগ্রহ সম্বলিত বুদ্ধিবাদী প্রাপ্তিতে সংযোজিত হল এক নতুন মাত্রা। হিন্দুস্থানি গান আর বাংলাগানের দেওয়া-নেওয়ায় সৃজনের বিভিন্ন পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের যে বক্তব্য, তা পুরোপুরি মানতে পারেননি ধূজটিপ্রসাদ, বলেছেন :

বাংলা সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যের অস্তিত্ব নিয়েই যদি কোনো ব্যক্তি সন্দেহান হয়, তবে সে ব্যক্তি তার দোহাই‘এ মানবে না যে, ভবিষ্যতের বাংলাগান পুরাতন বাংলাগানের ধারাত্তেই চলবে। আপনি অবশ্য তা বলেন নি, বলেন না, বলতে পারেন না ; কারণ এই—আপনার আপত্তি পুনরাবৃত্তিরই বিপক্ষে, হিন্দুস্থানী গানের পুনরাবৃত্তির বিপক্ষে নয়, কারণ আপনার যুক্তি প্রাণধর্মের অনুযায়ী। কিন্তু, লোকে ভুল বোঝবার ও করবার সম্ভাবনা রয়েছে। তাকে গোড়া থেকেই হত্যা করা ভালো। গ্রাম্য সংগীতের পুনরুদ্ধার চলছে, ঠুংরী গজলের বিপক্ষে প্রতিক্রিয়ায় দেশে যা ছিল তাই ভাল ভাবতে লোকে শুরু করেছে—তাই আজ আপনার মন্তব্য পরিষ্কার করে শুঁয়ে বলার বড়োই দরকার। প্রদেশাঙ্গবোধের যুগ এসে গিয়েছে। (*সুর ও সংগতি*, র-৩, প্রথম সম্ভার, পৃ ৫৪)।

১৯৩৫-এ সুর এবং সংগীত বিষয়ক আরো দুটি লেখার হাদিস মেলে। উত্তরা-র পৌষ ১৩৪২ সংখ্যায় ‘কথা ও সুর অভিভাষণ’ প্রকাশিত হয়। হয়তো এই সূত্র থেকেই ধূজটিপ্রসাদের সংগীত-বিষয়ক দ্বিতীয় বাংলা সংকলন *কথা ও সুর* -এর উপক্রম। আরো কয়েকমাস আগে, পরিচয় পত্রিকার শ্রাবণ ১৩৪২ সংখ্যায় ধূজটিপ্রসাদ লেখেন ‘রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্বন্ধে দু-চারটি কথা’। রাজশাহীর আবাড়ে ক্লাবের দ্বিতীয় অধিবেশনে লেখাটি প্রথম পড়া হয়। ১৯৮৭ সালে ধূজটিপ্রসাদ রচনাবলী-র দ্বিতীয় খণ্ডে যুক্ত হওয়ার আগে পর্যন্ত প্রবন্ধটি অগ্রস্থিত ছিল। অগ্রস্থিত ছিল ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫-এর *দেশ* পত্রিকায় প্রকাশিত ‘অর্থশাস্ত্রের দুগতি’ শীর্ষক তীক্ষ্ণ এবং সাহসী প্রবন্ধটিও। আবার সমসময়ে, *বিচিত্র*র অগ্রহায়ণ ১৩৪২ সংখ্যায় ধূজটিপ্রসাদ *কবিতা* পত্রিকার প্রথম সংখ্যার বিজ্ঞত সমালোচনা লিখলেন। লেখাটির নাম ‘আধুনিক কবিতা’, ১৯৮৭তে র-২-তে অন্তর্ভুক্তির আগে পর্যন্ত এলেখাও অগ্রস্থিত ছিল। সংগীতের সূত্রে যিনি প্রদেশাঙ্গবোধের প্রসঙ্গে পৌছতে পারেন, অর্থশাস্ত্রের দুগতির কিন্যাসে যিনি অর্থনীতিক তত্ত্ব আর তার প্রথাগত প্রয়োগকে অর্থনীতির আদত সমস্যার প্রেক্ষিতে অদূরদর্শী বলে চিনতে পারেন, সে চেনাকে প্রকাশ করতে জাতীয় অথবা আন্তর্জাতিক চটক-তকমাকে যিনি পরোয়া

করেন না, তেমনি এক বিরল পাঠক এবং চিন্তাবিদ ছিলেন ধূর্জটিপ্রসাদ। ১৯৩৫ এ *অন্তঃশীলা* বেরনোর পরে তা নিয়ে লেখালেখি, হেঁচ হইয়েছিল, কম নয়। ১৯৩৬-এ অর্থাৎ মাঘ ১৩৪২-এর *চিত্রালী* পত্রিকায় ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী লেখেন ‘“অন্তঃশীলা”র বিচার’। একই সংখ্যায় প্রকাশিত হয় ধূর্জটিপ্রসাদের উত্তর ‘বয়ান্-ই-তহরির’। পরবর্তী দুটি বছরে দুটি বাংলা প্রবন্ধের হদিশ পাচ্ছেন পাঠক ধূর্জটিপ্রসাদের কলমে, ‘প্রগতি’ ১৩৪৪এ অর্থাৎ ১৯৩৭ সালে এবং ‘নূতন ও পুরাতন’ ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৯৩৮এ। দুটি প্রবন্ধই পরবর্তীকালে *বঙ্গব্যা* সংকলনে যোগ হয়। ১৯৩৭-এ প্রকাশিত হল উপন্যাসত্রয়ের দ্বিতীয় খণ্ড *আবর্ত*। পরের বছর ১৯৩৮-এ সংগীত বিষয়ক ধূর্জটিপ্রসাদের দ্বিতীয় প্রবন্ধসংকলন *কথা ও সূত্র* বেরলো। এ বই দিলীপকুমার রায়কে উৎসর্গ করা।

এ তো গেল লেখালেখির সালতামামি। গত শতকের একের, দুয়ের, তিনের দশক জুড়ে এমনি ছিল ধূর্জটিপ্রসাদের মনন আর লেখনের চিত্র। বৈচিত্র্যের সম্ভারে তা ভরাট। সুর থেকে সমাজে, সমাজ থেকে সাহিত্যে, সাহিত্য থেকে অর্থনীতিতে, অর্থনীতি থেকে আবার সুরে কিংবা ছবিতে অবাধ তাঁর আনাগোনা। তবু তো কালক্রমে অনুযায়ী যতগুলো নিবন্ধ-গল্প-প্রবন্ধকে, যে কটি বইকে আমরা সাজাতে পারছি, তার মধ্যে এখনো প্রচুর অসম্পূর্ণতা, অজস্র অজানা। এই লেখালেখির পাশাপাশি আছে সম্পাদকীয় দায়দায়িত্বের আখ্যান। *সবুজপত্র* আর *উত্তরা* র নিয়মিত লেখক ধূর্জটিপ্রসাদ। *কম্বোজ*, *বঙ্গবাণী*, *পূর্বাশা* ও তাঁর লেখার জায়গা। ১৯৩১ সালে শুরু হলো *পরিচয়* পত্রিকা, সুবীন্দ্রনাথ দত্তের সম্পাদনায়। সম্পাদকমণ্ডলীর আটজনের অন্যতম ধূর্জটিপ্রসাদ। প্রথমদিকে প্রায় প্রতিটি সংখ্যাতেই ধূর্জটিপ্রসাদের লেখা থাকত—গল্প, প্রবন্ধ, পুস্তক-সমালোচনা—স্বনামে, কখনো বা যুধিষ্ঠির দাস ছদ্মনামে। উপরন্তু ১৯৩৫ থেকে ১৯৪৩-এই দীর্ঘসময় ধূর্জটিপ্রসাদের কেটেছে প্রবল কর্মব্যস্ততার মধ্যে। ১৯৩৮-এর ২৫ জানুয়ারি তৎকালীন যুক্তপ্রদেশের (এখন তার নাম উত্তরপ্রদেশ) কংগ্রেস সরকারে ডিরেক্টর অভ্য ইনফরমেশন পদ গ্রহণ করেন ধূর্জটিপ্রসাদ। ১৯৪০-এর ১ অক্টোবর ওই পদে ইস্তফা দিয়ে ফিরে আসেন লক্ষ্মী বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে। সেবছর আর তার পরের বছর রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন তিনি। *পরিচয়* পত্রিকার বৈশাখ ১৩৪৭ সংখ্যায় প্রকাশিত ‘রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ও আধুনিক সাহিত্য’ এবং *কবিতা* পত্রিকার আষাঢ় ১৩৪৮ সংখ্যায় প্রকাশিত ‘রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি’ ১৯৮৭তে *ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী* দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আগে পর্যন্ত গ্রন্থিত হয়নি। ১৯৪০এ লেখা ‘রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি ও সমাজনীতি’। ১৯৪১এ প্রথম প্রকাশিত ‘রবীন্দ্রনাথ ও তুলনা’ আব ‘রবীন্দ্র-সৃষ্টি’ পরে *বঙ্গব্যা* প্রবন্ধসংকলনে যুক্ত হয়। এছাড়াও কার্তিক ১৩৪৭ সংখ্যা *পরিচয়ে* প্রকাশিত ‘মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প’ এবং ১৩৪৮এর বৈশাখ সংখ্যা *পরিচয়ে* প্রকাশিত ‘প্রমথ চৌধুরীর গল্প’ ও ১৯৮৭তে *ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী* প্রকাশের আগে কোনো বইতে যায়নি। ধূর্জটিপ্রসাদের ডায়েরিতেই আছে যে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি কথা বলেছেন দেশের অর্থনীতি নিয়ে ; প্রমথ চৌধুরীর কাছে শিখেছেন, জমিদার রায়ত সংক্রান্ত অনেক কথা।

এমন কিছু বিনিময় নিশ্চয় তার রেশ রেখে যায় ১৯৪৩ সালে বোম্বাইয়ের পদ্মা পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত *Tagore-A Study* গ্রন্থে। এই বই ধূর্জটিপ্রসাদ উৎসর্গ করেছিলেন বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে। বইটির দ্বিতীয় সংস্করণে সত্যেন বোস স্বাক্ষরিত একটি প্রারম্ভিক

টীকা যুক্ত হয়। একবছর আগে ১৯৪২ সালে এলাহাবাদ থেকে *Modern Indian Culture, A Sociological study* প্রকাশিত হয়েছে। আর *Tagore-A Study*-র সঙ্গে একই বছরে প্রকাশিত হল ধূজটিপ্রসাদের বিখ্যাত উপন্যাসত্রয়ীর শেষ খণ্ড *মোহনা*। ১৯৪৫-এ বেরলো আরো দুটি বই। *On Indian History, A Study in Method* এবং অন্যটি *Indian Music, An Introduction*। প্রথমটির প্রকাশক বোম্বাইয়ের হিন্দুকিতাব পাবলিশার্স এবং দ্বিতীয়টি বের করল পুনার কুতুব পাবলিশার্স। *সুর ও সংগতি* উৎসর্গ করেছিলেন অতুলপ্রসাদের স্মৃতিতে, *কথা ও সুর* দিলীপ রায়কে, *Indian Music* নামের এই স্বল্প দৈর্ঘ্যের বইটিতে অবশ্য কোনো উৎসর্গপত্র ছিল না। একদশক পরে ১৯৫৫ সালের ৫ অক্টোবর ধূজটিপ্রসাদ ডায়েরিতে লেখেন, ‘এক এক সময় মনে হয়, আলি আকবর, রবিশঙ্কর একটু বেশি পরীক্ষাশীল। অর্থাৎ সব মিশ্রণ আমার ঠিক কানে বসে না। নিশ্চয়ই আমার কানের দোষ। পরীক্ষা চলুক, পরে কানে বসবে, রূপ স্বকীয় হবে।’ (মনে এলো-র, ৩ দ্বিতীয় সত্তার পৃ ৫৬-৫৭)। এই আপাত বিনয়ের অন্তরালেও কি খুঁজে পাওয়া সম্ভব কোনো সংগত আত্মবিশ্বাসের আভাস? লক্ষ্মী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম পড়াতে এলেন ধূজটিপ্রসাদ, সেটা ১৯২২ সাল। তখন থেকেই অতুলপ্রসাদ সেনের সঙ্গে, পণ্ডিত ভাতখণ্ডজীর সঙ্গে তাঁর পরিচয়। গভীর সম্পর্কে রূপান্তর ঘটতে সে-পরিচয়ের সময় লেগেছিল খুবই অল্প। ভাতখণ্ডজীর ম্যরিস সংগীত বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন ধূজটিপ্রসাদ। সুরের সঙ্গে তাঁর সখ্য অবশ্য আরো অনেক পুরোনো। ১৯৫৮ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারির স্মৃতিকথায় আছে :

ছেলেবেলায়, কশিমবাজারের রাধিক গৌসাই-এর গান শুনি...সঙ্গে গাইলেন...গিরিজাবাবু...প্রপদ গাইলেন। রাগ ঠিক মনে নেই, তবে চাল মনে আছে...রাধিকাবাবু আবার কলকাতায় এলেন। সঙ্গে ...মহিমাবাবু...মহিমাবাবুর কণ্ঠের তুলনা মেলে একমাত্র অঘোর চক্রবর্তীর। মহিমাবাবুর জোয়ারী ছিল... যেন এক চাক ভোমরার বাসা...অঘোরবাবুর কণ্ঠ তখন পড়ে এসেছে, তবুও...তুলনা হয় না...সপ্তকে যাওয়া আসা নিত্য স্বাভাবিক। নাকি সুর একেবারে নেই... জোয়ারী গমগম করছে। বিষ্ণু দিগম্বরের কণ্ঠ...আমি যখন শুনি তখন পড়ে এসেছে, কেবল ভজ্ঞনই গাইছেন। দুবার তাঁর মুখে খোয়াল শুনি— শেষবার ভূপেন ঘোষের বাড়িতে, ভোরবেলা ঠৈরো। সে ঠৈরো আর কখনো শুনি, শুনবও না।... অঘোরবাবু, বিষ্ণু দিগম্বর, মহিমাবাবু, জ্ঞান গৌসাই, কৈয়জ খাঁ এদের কণ্ঠ তাদের। আর চন্দন চৌবে, রবীন্দ্রনাথের ছিল বাঁশির। বাঁশির কণ্ঠে প্রপদী গান চলে না, চলে তারের কণ্ঠে। আমাদের সঙ্গীতে প্রশ্নর পেয়েছে তারের। বাঁশির আওয়াজ খোলা হাওয়া, মাঠে-ঘাটে, নির্জনে; তারের আওয়াজ দরবারে। বাঁশিতে কাক্য, উদাস ডাবটাই বেশি। (*স্মিলিমিলি*, ২-৩, দ্বিতীয় সত্তার, পৃ ২০৯-১০)

শৈশব বাল্য কৈশোর থেকে যে সংগীত-স্মৃতি ধূজটিপ্রসাদ বহন করেছেন, তার উৎস পারিবারিক ঐতিহ্যে এবং শিক্ষায় অনেকখানি সংলগ্ন। তাই মেকলের ইংলণ্ডের ইতিহাস কিংবা মর্লের লেখা গ্যাডস্টোনের জীবনীর সঙ্গে বাল্য-কৈশোরের প্রান্তদেশ থেকেই যে নৈকট্য তাঁর, তাও যেমন ধূজটিপ্রসাদকে *On Indian History, A Study in Method*-এর উৎসর্গ পত্র লিখতে প্রাণিত করে, শৈশব-বাল্যের সংগীত-স্মৃতির প্রসাদও তেমনি ওই বয়ানে তাঁকে প্রেরণা দেয়—‘To the family in historical gratitude’। ১৯৫৮তে তারের কণ্ঠ আর বাঁশির কণ্ঠের ওই ফারাক করবার তিনবছর আগেকার ডায়েরিতে দেখি, সংগীতসাধনা বলতে কত দুর্দহ পথ পরিক্রমাকে বোঝেন ধূজটিপ্রসাদ। ১৯৫৫-র ৯ অক্টোবর সুমতি মৃত্যুংকারের

সংগীতচর্চায় মুগ্ধতা যেন অন্তহীন তাঁর দিনলিপিতে, ‘সাধনা অদ্ভুত। স্বামী পুত্র ছেড়ে লঙ্কৌ-এ সঙ্গীত শিখতে এলো, সাত-আট বছর প্রাণপণে শিখলো। তারপর ডক্টরেট অব মিউজিক নিলে। আমি একজন পরীক্ষক ছিলাম। এই না হলে মেয়ে। এই না হলে শেখা।’ (মনে এলো, ওই, পৃ ৬৩-৬৪)। অর্থাৎ সুমতি মৃত্যুকার যদি রেডিওসংগীত সম্মেলন উপলক্ষ্যে প্রকাশিতব্য পুস্তিকায়, ‘দি গ্রেট মাস্টারস অব মিউজিক আই হ্যাভ হার্ড’ শীর্ষক প্রবন্ধ লিখতে বলেন, তাঁর অনুরোধ ফেলা ধূজটিপ্রসাদের পক্ষে অসম্ভব। একই দিনে লিখছেন তিনি ‘সঙ্গীত সম্বন্ধে আমার আগ্রহ কমে গিয়েছে। খুব ভালো না হলে শুনতে পারি না।’ আবার লিখছেন নিজের বাবার কথা, ‘...বাবা বলতেন, হিন্দু খাঁর ভাই নখু খাঁর কেনারের রূপের কথা...’ (ওই, পৃ ৬৪)

১৯৪৬ সালে আরো দুটি গুরুত্বপূর্ণ বই বেরলো ধূজটিপ্রসাদের। একটি লঙ্কৌ থেকে দ্য ইউনিভার্সাল পাবলিশার্স প্রকাশিত *Views and Counterviews*, বয়ঃজ্যেষ্ঠ সহকর্মী অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করা। অন্যটি বোম্বাইয়ের হিন্দুকিতাবস্ থেকে প্রকাশিত *Problems of Indian Youth*। *Problems of Indian Youth* প্রকাশিত হওয়ার দু’বছর আগে, ১৯৪৪ সালে কলকাতার মহম্মদ আলি পার্কে সারা ভারত যুব সংগঠনের (All India Students Federation) সম্মেলনে সভাপতি ছিলেন ধূজটিপ্রসাদ। সেই সম্মেলনে প্রারম্ভিক বক্তৃতা দেন সরোজিনী নাইডু, উপস্থিত ছিলেন বিধানচন্দ্র রায়। ওই সম্মেলনের সমসময়েই সারা ভারত ছাত্রসংগঠনের নতুন সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হলেন সত্‌পাল ডাঙ, বিদ্যায়ী সাধারণ সম্পাদক প্রশান্ত সান্যালের জায়গায়। *Views and Counterviews* পনেরোটি প্রবন্ধের সংকলন। অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী অর্থনৈতিক পুনর্গঠন, যুদ্ধের রাজনৈতিক অর্থনীতি, ধর্মের সম্ভব-অসম্ভব, খৃষ্টধর্মের পুনরুত্থানের, ভালো-মন্দ, পাশাপাশি ভারতের মার্কসবাদীদের প্রতি সুপরামর্শ, ম্যালথাসকে নিয়ে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ, একদিকে সাম্প্রতিক জনসংখ্যা তত্ত্বে কাম্য অথবা সর্বোত্তমের (Optimal) ধারণাটির গুরুত্ব, আবার কার্যকারণ মানলে ওই কাম্যের শর্তপূর্তি আদৌ সম্ভব কিনা, সামাজিক কল্যাণের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অর্থনৈতিক সমস্যার বোঝাপড়া, চীন কিংবা রাশিয়ার সঙ্গে ভারতকে মিলিয়ে দেখা, এমন বিচিত্র সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সূচিস্থিত মতামত সেখানে গ্রথিত। আজ একুশ শতকে বসে ওইসব প্রবন্ধ পড়লে তাদের সবটুকুই কিন্তু আদ্যিকালে ঠেকে না। বরং এমন একটা সত্যি, একটা বিশ্বাস অথবা আস্থা মাঝেমধ্যে নাড়া দিয়ে যায় পাঠককে, যার হৃদিস আজকের গণিতে সমৃদ্ধ সুতীক্ষ্ণ বিশ্লেষণের ব্যুৎপত্তি করতেই ভুলে গেছে। এরকম মনে হওয়ার মধ্যে সরলীকরণ আছে হয়তো ; কিন্তু একনায়কত্ব থেকে ব্যবসাবাগিজ্যের স্বরূপসন্ধান পর্যন্ত সব বিন্যাসেই যেন একটা অঙ্গীকারের ইঙ্গিত মেলে। এমন চিন্তাবিদেই বলা সাজে ‘মার্কস...আমার স্বেচ্ছাকৃত অপরাধ। ১৯২২ সাল থেকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করছি। তবে এখনও নতুন ঘাসের খিঁদে যায়নি।’ (ওই, পৃ ১৪৫)। এই দিনলিপি লেখা হচ্ছে *Views and Counterviews* বেরনের প্রায় একদশক পরে—১৯৫৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি। ১৯৪৬-এ ধূজটিপ্রসাদ ‘বিল্লবের কথা’ নামের বাংলা প্রবন্ধটিও লিখছেন। এ’প্রবন্ধ *আমরা ও তাঁহারা*’র দ্বিতীয় সংস্করণে বাড়তি চারটি স্তবকের একটি। সেই নতুন সংস্করণ বেরতে বেরতে অবশ্য আবার সেই একদশক পরের ১৯৫৬।

১৯৪৭-৪৮-এ বক্তব্য সংকলনের অনেকগুলি প্রবন্ধ লেখা হয়। ১৯৪৭-এ ‘মার্কসবাদ

ও 'মনুষ্যধর্ম', 'অতঃকিম', ১৯৪৮-এ 'নব্যসমাজদর্শনের ভূমিকা ১/২', 'নব্যসমাজদর্শনের প্রতিজ্ঞা', 'বর্তমান সাহিত্যের মূল কথা' এবং 'রবীন্দ্রনাথের চিত্র'। রবীন্দ্রবিষয়ক আরো কয়েকটি প্রবন্ধ পরবর্তী কয়েকবছরে লেখা হয় এবং তারা গ্রন্থিত হয় ১৯৫৭তে প্রকাশিত বক্তব্য সংকলনে। যেমন ১৯৪৯-এ লেখা 'রবীন্দ্র জন্মতিথি উৎসব', ১৯৫০-এর 'রবীন্দ্র সমালোচনার পদ্ধতি', ১৯৫৩তে লেখা 'রবীন্দ্রসঙ্গীত ও গায়নপদ্ধতি' আর ১৯৫৬য় 'কবির নির্দেশ'। ১৯৪৮-এ লেখা হয় *আমরা ও তাঁহারা* দ্বিতীয় সংস্করণের আরো একটি স্তবক, 'সাহিত্যের কথা : মানদণ্ড'। বক্তব্য সংকলনের অন্য একটি নিবন্ধ 'গদ্য কবিতা' লেখা হয়ে গেছে ১৯৪৯এ। *পূর্বশা*র বৈশাখ ১৩৫৫ সংখ্যায় অর্থাৎ ১৯৪৮এ লেখা 'গান্ধী-স্মৃতি' অথবা ১৯৫৪তে প্রথম প্রকাশিত 'শুভচিহ্ন?' (ক্রান্তি, শ্রাবণ ১৩৬১ব.) মতো মূল্যবান প্রবন্ধ ১৯৮৭ পর্যন্ত অগ্রস্থিত পড়েছিল। বক্তব্য-র আগের বছর অর্থাৎ ১৯৫৬-য় ধূজটিপ্রসাদের দিনলিপি মনে এলো প্রকাশ করেন নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। গ্রন্থিত হওয়ার আগে তা ধারাবাহিক বেরিয়েছিল দেশ পত্রিকায়। বক্তব্য-র প্রকাশক বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড। বক্তব্যই ধূজটিপ্রসাদের জীবনকালে প্রকাশিত শেষ বাংলা বই। পরের বছর ১৯৫৮তে দিল্লির People's Publishing House থেকে ধূজটিপ্রসাদের জীবনকালের সর্বশেষ বই *Diversities, Essays in Economics, Sociology and other Social Problems* প্রকাশিত হয়। বইয়ের প্রথমভাগের প্রবন্ধগুলির বিষয় মূলত অর্থনীতি, বিভিন্ন বক্তৃতার লিখিত চোহারা, কিছু লেখা ইকনমিক উইকলি থেকেও নেওয়া। দ্বিতীয় ভাগে ইতিহাস, দর্শন, শিক্ষা, সমাজতত্ত্ব, ভারতীয় সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব, ধর্ম ও তার সামাজিক তাৎপর্য, এমন নানান বিষয়ের আনাগোনা। নিবন্ধ এবং বক্তৃতাগুলির নির্মাণকাল মোটামুটিভাবে চারের দশকের শেষ থেকে ১৯৫৬ পর্যন্ত। জীবিতকালের এই শেষ বই ধূজটিপ্রসাদ উৎসর্গ করেছিলেন পুত্র কুমারপ্রসাদ এবং ভ্রাতৃপুত্র সৌগতপ্রসাদকে। মানুষের জীবনের কোন বয়ান যে কখন কীভাবে অনেকখানি কাব্যিক ন্যায্যতার সংস্থান করে ফেলে, তা ব্যুৎপন্ন চিন্তাবিদেও নাগালে থাকে না। অবশ্য ধূজটিপ্রসাদ নিজের দুরারোগ্য ব্যাধি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন। ১৯৫৭তে প্রকাশিত বক্তব্য প্রবন্ধ সংকলনটি তিনি সহধর্মিণী ছায়া দেবীকে উৎসর্গ করেন। তাঁর দ্বিতীয় দিনলিপি *ঝিলিমিলি* প্রকাশিত হতে হতে ধূজটিপ্রসাদের মৃত্যুর পর চারবছর গড়িয়ে ১৯৬৫ সাল এসে পড়েছে।

জীবনভর অর্থনীতি-সমাজতত্ত্বের মাস্টারমশায় জীবনের ছয়দশক পার করে ভাবেন

...মুরগির ডিমের দাম এত বাড়ে কেন? ...ম্যালথাসের ব্যাখ্যা অচল। মার্কস যতদূর মনে পড়েছে এ সম্বন্ধে নীরব। কীন্সের কন্জাম্পশান ফাংশান? উহ। হীক্স? নাঃ...সিম্পেথটিক রাইজ নব তো? মুরগির ডিমের দাম কমে বাড়ে কেন তাই জানি না অথচ অর্থনীতির অধ্যাপক!...অর্থনীতিতে যে প্রাইস থিওরি আছে তার সাহায্যে সংসার চলে না... মেয়েরা আর বোনেরা সংসার চালায়—জেনে চালায় কিনা জানি না, তবে চলে তাঁদের কৃপায়...তাঁদের না হলে চলে না। হগ্‌ সাইকেল-এর মতো এগ-সাইকেল আছে কি...ইণ্ডাস্ট্রিয়াল প্ল্যানিং অসম্ভব, যতক্ষণ... ট্রেডিং সার্ভিস করায়ত্ত না হচ্ছে। সমাজতত্ত্বের দিক থেকে বলা চলে আমাদের বণিক সম্প্রদায় অর্থাৎ ছোট-বড়-মাঝারি বণিক সম্প্রদায়ের কয়েমী স্বত্ব অগ্রগতির অন্তরায়!...মার্কেটলিজম, কমার্স ক্যাপিটাল সম্বন্ধে যে সব বই পড়েছি তাতে মনে হয় না যে, আমাদের এই বণিকের দল কোনো ঐতিহাসিক কর্তব্যসম্পন্ন করছেন না। এঁদের সঙ্গে তাঁদের কোনো মূলগত মিল নেই। ...পড়েছি স্পেকুলেশন সব সময় নিরর্থক নয়, বাজারের দিক থেকে তার প্রয়োজন আছে...বলোবাজারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেও ওকালতি শুনেও পড়েছি...এগুলো অন্যান্য,

গান্ধীজী বলতেন, চরিত্রের দিক থেকে, আমি বলি আর্থিক ডেভেলপমেন্টের দিক থেকেও। ব্র্যাকমেলিং দেশে দেশে চালু হয়ে উঠলো। অথচ বলছি সোশিয়ালিস্ট পার্টার্ন। ঠিক বুঝি না... ম্যানিং মানে ফিজিকাল কন্ট্রোল, মালের উৎপাদনের ওপর ও তার বিতরণের ওপর। আপাতত সম্ভব নয় জানি, তবু... (৫.৪.৫৬, ওই, পৃ ১৭৪-৭৫)।

এমন সব টুকরো টুকরো চিন্তা ক্রমাগতই খুঁজে নেওয়া যায় ধূজটিপ্রসাদের দিনলিপি থেকে। এমন সব চিন্তায় আক্ৰান্ত যিনি, তাঁর পক্ষে আড়াইবছর পেরিয়েই যুক্ত প্রদেশের ডিরেক্টর অফ ইনফরমেশনের পদে ইস্তফা দেওয়া স্বাভাবিক এবং সংগত। কিন্তু যে ১৯৪৭-এ দেশ ভাগ হল আর স্বাধীন হল, সেই বছর ওই যুক্তপ্রদেশ সরকার লেবার এনকোয়ারি কমিটির সদস্য নির্বাচন করেন তাঁকে। ডায়েরিতে আছে :

উত্তরপ্রদেশের লেবার এনকোয়ারি কমিটি একবাক্যে সিফারিশ (সুপারিশ?) করলে যে, মজুরদের মাসিক বেতন খ্রিষ্ট টাকার কম কিছুতেই হবে না। সেটা মাত্র কনপুরের কাপড়ের কলে চালাতে সেক্সন ১৪৪-এর সাহায্য নিতে হয়েছিল। (১৪৪ না অর্ডিন্যান্স মনে পড়ছে না) অদ্ভুত দেশ, অদ্ভুত শহর কনপুর। (ওই, পৃ ১৭৪)

লেবার এনকোয়ারি কমিটিতে সদস্য হওয়ার দুবছর আগে ১৯৪৫ সালে ধূজটিপ্রসাদ লঙ্কৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে রীডার পদ পেলেন। ততদিনে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেওয়ার পর তাঁর বাইশ বছর কেটে গেছে। ১৯৪৯-এর ৫ নভেম্বর তিনি প্রফেসর হলেন। ওই বছরেই পয়লা জানুয়ারি থেকে শতিন চৌধুরির সম্পাদনায় ইকনমিক উইকলির সূচনা। ধূজটিপ্রসাদ প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয় লিখেছিলেন। ১৯৪৯-এ কি তার আগের বছরে কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির উদ্যোগে খোঁজ পরিষদ কয়েকদিনব্যাপী এক সেমিনারের আয়োজন করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারাভাঙ্গ হলো। সেমিনারের বিষয় ছিল, স্বাধীন ভারতের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ভবিষ্যৎ। প্রখ্যাত নেত্রী অরুণা আসফআলি এই সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন। ধূজটিপ্রসাদও সেখানে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ১৯৫২ সালে অর্থাৎ ভারতে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার দ্বিতীয় বছরে তিনি রাশিয়ায় যান ইকনমিক ডেলিগেট হিসেবে। ১৯৫৩-র ১৯ অক্টোবর থেকে ১৯৫৪-র ১৪ মে পর্যন্ত হেগ্-এ ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল স্টাডিজ-এ সমাজতন্ত্রের অতিথি অধ্যাপক (ভিজিটিং প্রফেসর) ছিলেন ধূজটিপ্রসাদ। ১৯৫৪তেই তিনি সভাপতি নির্বাচিত হলেন আন্তর্জাতিক সমাজতাত্ত্বিক সংগঠনের (International Sociological Association)। ওই বছরেই ১ অক্টোবর ধূজটিপ্রসাদ অবসর নিলেন লঙ্কৌ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। যোগ দিলেন আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে, অর্থনীতির অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান হিসেবে। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৫৫র এপ্রিল মাসে দেহাদানে সর্বভারতীয় সমাজতাত্ত্বিক সম্মেলনে (All India Sociological Conference) সভাপতি ছিলেন ধূজটিপ্রসাদ। অগাস্ট মাসে আবার বানডুং সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের অন্যতম সদস্য তিনি। ৩১ জুলাই, ১১ অগাস্ট এবং ১৮ অগাস্টের ডায়েরিতে বানডুং-এর জন্য বক্তৃতার প্রস্তুতির, তৎসংলগ্ন পরিশ্রমের আভাস মেলে—আন্দাজ পাওয়া যায় এই বিদেশযাত্রার। ১৯৫৬ থেকে পরপর তিন বছর তিনটি বই বেরলো ধূজটিপ্রসাদের—*মনে এলো* (১৯৫৬), *বহুব্যা* (১৯৫৭) এবং *Diversities* (১৯৫৮)। ১৯৫৯ ধূজটিপ্রসাদের অবসর গ্রহণের বছর। ২৭ অগাস্ট বিদায় নিলেন উত্তরপ্রদেশ সরকারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টার দায়িত্ব থেকে ; ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৫৯ হলো আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসরগ্রহণের তারিখ।

কেমন ছিল ধূজটিপ্রসাদের দীর্ঘ সাঁইত্রিশ বছরের শিক্ষকতা জীবন? অলোক রায়ের *ধূজটিপ্রসাদ* শীর্ষক বইতে আছে :

আসলে তিনি বঙ্গতা ভালোবাসতেন না...চাইতেন কথোপকথন...ধূজটিপ্রসাদের লেখাও...‘ডায়সেকটিক’, আসলে তাঁর ‘চরিত্র’ আত্মপ্রকাশ করতে চেয়েছে তাঁর চিন্তাপ্রবাহের মধ্যে দিয়ে—তাঁর চিন্তাপ্রবাহ স্বতোৎসারিত হয়েছে কখনো রূপস লেকচারে, কখনো প্রবন্ধে, এমনকি উপন্যাস-ছোটগল্পে। ...ছাত্রদের উপর তাঁর প্রভাব ছিল গভীর এবং ব্যাপক। (অলোক রায়, *ধূজটিপ্রসাদ*, বাগধ্ব, পৃ ১৬)।

কর্মজীবন থেকে বিদায় নেওয়ার দিনে তিনি ডায়েরিতে লেখেন :

গুনেছি তিন-চার দশক ছাত্রদের আমি ‘মানুষ’ করেছি। কথ্যটা ভুল, মানুষ আমি করিনি। এতদিনে মাত্র গুনে চার-পাঁচটি ছাত্র পেয়েছি। তারা এক হিসেবে মানুষ নয়, বাঁদর। অর্থাৎ তাদের স্বভাবে ভারসাম্য নেই।...আমি ঠিক অধ্যাপক নই। অধ্যাপকীয় মনোভাব আমার আছে নিশ্চয়, তার চেয়ে বেশি বুদ্ধিপ্রবণতা; আরো বেশি সন্দেহাকীর্ণতা। শেষে দাঁড়ায় অনধ্যাপকীয়তা...অনেকগুলি বিজ্ঞানকে একসঙ্গে মেলাবার চেষ্টা...অধ্যাপকীয় বিশেষজ্ঞতা নয়... ছেলেদের অত্যন্ত অসুবিধা হয়েছে জানি। নিজের ক্ষতি আরো...স্বাধীনতা পেয়েছি খুবই বেশি। তার ফলে অনধ্যাপকীয় ভাবটাই বেশি এসেছে। সাধনা কিছু হয়ত করেছি। কিন্তু কৃষ্ণ সাধন কখনও করিনি। এতে ক্ষতিও হয়েছে, লাভ হয়নি যে তাও বলতে পারি না। (৩০.৯.১৯৫৯, *ঝিলিমিলি* ৯-৩ ২য় সম্ভার পৃ ২৭১-৭৩)।

ধূজটিপ্রসাদের আগ্রহ, চিন্তা, পড়া, লেখা, আর এইসব কিছু নিয়ে অতৃপ্তি কখনোই কোনো একটি বিষয়ের সীমানা ঘেরাটোপে বাঁধা থাকে না। বরং সংগীতকেন্দ্রিক প্রবন্ধ অথবা তার উপক্রমণিকা লিখতে লিখতে তিনি সমাজবিজ্ঞানের অলিন্দে, সমাজতত্ত্বের দরজায় এসে দাঁড়াতেন। আবার অর্থনীতির কি সমাজতত্ত্বের গ্রন্থনায় ভর করে ঢুকে পড়তে পারতেন শিল্প-সাহিত্য-সুর-রেখার পৃথিবীতে। এসব যাতায়াত কখনো ব্যাকরণের ন্যায্যতা হারাতে না। হয়তো তাই তাঁর আপাতবিনয় সর্বদাই তাঁর তীক্ষ্ণ নিশ্চয়তার যুক্তি বুনে চলত। অবসর গ্রহণের দিনলিপিতে লেখেন, ‘লেখায়, বাক্যে আমার বিস্তর দোষ আছে। আমি বাঁধিনা—চলি, এইটাই আমার প্রধান কথা। তার দোষগুণ আছে, গুণের চেয়ে দোষই বেশি।’ (ওই, পৃ ২৭১) এই লিপিতে দস্ত আছে বিনয়ের সঙ্গে মিলে মিশে। আর ওই মিলমিশের মধ্যে সত্যি আছে মিথ্যের চেয়ে অনেক বেশি। ছবির অ্যালবাম পর্যন্ত সম্পাদনা করেছেন তিনি, লিখেছেন তার প্রাক্কথন। ১৯৪০ সালে লক্ষ্মী থেকে অসিতকুমার হালদার, রাইকৃষ্ণ দাস, এবং কুসুম শাহর সঙ্গে সহসম্পাদনায় সে বই বেরিয়েছিল, নাম *অঞ্জলি*। শরীর যখন তাঁর আর চলছে না দুরারোগ্য ব্যাধির তাড়নায়, তখন, সেই ১৯৬০ সালেও *চতুরঙ্গ* পত্রিকা থেকে ধূজটিপ্রসাদের ‘বাংলা কাব্য ও সুধীন্দ্রনাথ’ লেখাটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে *উত্তরসূরী* পত্রিকার আশ্বিন ১৩৬৭ সংখ্যায়। তাঁর কর্মজীবন আর বুদ্ধিবাদচর্চার নিত্যন্ত অসম্পূর্ণ আর সংক্ষিপ্ত সালতামামি থেকে এতক্ষণে যে ছবি পাওয়া গেল, তার নির্বাধ চলকে বুঝতে গেলে ধূজটিপ্রসাদ-কৃত অজস্র গুরুত্বপূর্ণ এবং বিচিত্র গ্রন্থের সমালোচনাকে ভুললে চলবে না। *ধূজটিপ্রসাদ রচনাবলী* অনেকখানি জায়গা জুড়ে সেইসব আলোচনা গ্রন্থিত আছে। উপরের সালতামামিতে তাঁর একটিও নতুন লেখার হৃদিস যেসব বছরে নেই, সেই বছরগুলি অনেকাংশেই এক বা একাধিক গ্রন্থসমালোচনায় সমৃদ্ধ।

এখনো পর্যন্ত যেটুকু পাওয়া গেল ধূজটিপ্রসাদের মনন, কর্ম আর জীবনের কথা, তার

থেকে বানিয়ে তোলা যায় বহু বিকল্প প্রশ্ন। আপাতত সেই বছর ভিতর থেকে বেছে নিই গোটা দুয়েক ; যেমন বিশিষ্টতার এবং অনেকটাই ন্যায্য এক প্রত্যয়ের বোধ কেমন করে আবাল্য গড়ে তুললেন তিনি তিলে তিলে? কীভাবে লালন করলেন সেই প্রত্যয়ের সংগতি? লক্ষ্যে দীর্ঘদিন, তারপর কিছুদিন আলিগড়, অর্থাৎ উত্তরপ্রদেশই মুখ্যত তাঁর প্রায় সারাজীবনের কর্মক্ষেত্র হয়ে রইল ; যদি আলাদা হতো ধূজটিপ্রসাদের জীবিকার ভূগোল, বদলে যেত কি তাঁর সাংগীতিক জীবন, সাহিত্যিক যাপন এবং সমাজ বৈজ্ঞানিক অন্বেষণ? এমন কিছু প্রশ্ন ধরে পিছনে তাকালে, পাঠক কি গড়ে তুলতে পারবেন ওই জীবনের বহু বিকল্প বিন্যাসের একটিকে?

‘আমরা কেবল ভয়ে মরি ধূজটি দাদার’

আগের অধ্যায়টিতে সবথেকে বেশিবার উচ্চারিত হয়েছে যে কথাগুলি, ‘অগ্রস্থিত’ তাদের অন্যতম। ধূজটিপ্রসাদের লেখা বহু মূল্যবান প্রবন্ধ তাঁর জীবদ্দশায় কেন, তাঁর মৃত্যুর আড়াইদশক কি তারও পরে *ধূজটিপ্রসাদ রচনাবলী* প্রকাশিত হওয়ার আগে পর্যন্ত কোনো বইতেই যোগ হয়নি। এর কারণ হয়তো লেখক নিজেই, যিনি পারেন জীবনের প্রথম বই সমালোচনার জন্য কোনো পত্রিকায় না-পাঠাতে ; পাশাপাশি পারেন তা পাঠাতে বইটির সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তুর বিশ্ববরেণ্য মণীষীদের কাছে, মতামতের জন্য। জগদ্বিখ্যাত বারোজন মণীষী যে লক্ষ্মী বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষককে চিঠি লিখতে পারেন *Personality and the Social Sciences* পড়ে, তা সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সে-আমলের স্ফূর্তি উপাচার্যের বিশ্বাসযোগ্য ঠেকেনি। প্রমাণ চাওয়ার ভঙ্গিতে চিঠি দেখতে চাইলে, ধূজটিপ্রসাদ জানান, ব্যক্তিগত চিঠি দেখাতে তিনি বাধ্য নন। তখন সুর নরম হয়, ‘এটা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব, যদি দেখাও খুশী হবো।’ চিঠি দেখবার পরে চায়ের নিমন্ত্রণে ডেকে যে বাসি কেক খাইয়েছিলেন ভদ্রলোক, এ তথ্যও আছে দিনলিপিতে। আর আছে নিজের বাবা ভূপতিনাথ মুখোপাধ্যায়ের কথা :

আমার বাবা হলডেনের অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন। বলতেন, ‘দ্যাখ দেখি, এখানে লর্ড-চ্যাম্পেলার, আবার যুদ্ধমন্ত্রী, আবার দার্শনিক, স্কলার, সব একত্রে...এই না হলে মানুষ!’ আইনস্টাইন তিনিই বোঝেন। বাবা জানতেন না যে, হলডেন আইনস্টাইন বোঝেননি...বাবার কথা স্মরণ করে হলডেনকে একখানি বই পাঠাই। যখন বসলো কর্ভারে একখানা চিঠি এল তাঁর কাছ থেকে (তাঁর বৃদ্ধা মা কিছুদিন আগে মারা যান), তখন বাবাকে চিঠিখানি দেখাতে ভীষণ ইচ্ছা হলো। তখন তিনি কোথায়। (মনে এলো, র-৩ ২য় সম্ভার, পৃ ১৬২)।

Personality and the Social Sciences প্রকাশিত হওয়ার চারবছর আগেই ধূজটিপ্রসাদের পিতা ভূপতিনাথ মারা গেছেন। সারাদিন মোকদ্দমা চালিয়ে ক্লান্ত হয়ে ফিরে ভূপতিনাথ চাইতেন, দশ-এগারো বছরের ছেলে তাঁকে পড়ে শোনাৎ মেকলের ইংলও-ইতিহাস কিংবা প্ল্যাডস্টোনের জীবনী। সেই ভূপতিনাথই মৃত্যুশয্যায় কৃষ্ণভামিনী দাসীর মূলতানের রেকর্ড শুনে, তিনমিনিটের রেকর্ড শেষ হতে-না-হতেই বলে উঠতেন, ‘উই, উই, উই—কেবল তানই হচ্ছে। যার গলায় স্বর বসেনি, সেই তান মারে। যার সরলরেখা হয় না, সেই রং চাপায়।’ উচ্চাঙ্গ-সংগীতে তাঁর অনুরাগ ছিল, জীবনের যদি কোনো শেষ সাধ থাকে, তা মেটানোর তাগিদেই ধূজটিপ্রসাদ শেষসময়ে তাঁকে তখনকার ভালো খেয়ালীর গান শোনাতে চেয়েছিলেন।

মৃত্যুপথযাত্রীর উক্তির কার্যকারণ খুঁজতে দিনলিপিতে বাবার মৃত্যুর পঁয়ত্রিশবছর পরে ধূজটিপ্রসাদ লেখেন, 'হয়তো ভুল, তবু একটা স্ট্যাগার্ড।' বাবার হলডেন-অনুরাগ প্রসঙ্গেও আরো কয়েকমাস পরে তিনি লেখেন, 'এ-সব স্ট্যাগার্ড...নিতান্ত ভিস্টোরিয়ান নিশ্চয়, তবু স্ট্যাগার্ড সামনে থাকলে সেখানে পৌঁছতে ইচ্ছে হয়...যাঁরা স্ট্যাগার্ড উঁচু করে ধরেন, তাঁদের কথা মনে এলে চোখে জল আসে।' (ওই, পৃ ৯৫, ১৬২)। মারাম্মক ছিল ভূপতিনাথের বৈষ্ণব-বিশ্বাস। ভাইঝি বিয়ে করেছিলেন বৈষ্ণব পরিবারে, সেই ভাইঝি-জামাই পথ-দুর্ঘটনায় অকালে মারা গেলে বলেন, 'ধর্মাস্তরের অভিশাপ ভোগ করতেই হবে।' ধূজটিপ্রসাদের অন্যতম অন্তরঙ্গ বন্ধু হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ছিলেন ভূপতিনাথের বিশেষ স্নেহের পাত্র, কিন্তু নাম ধরে না-ডেকে তাকে 'ওহে, শুনছো' সম্বোধন করতেন। একদিন বললেন, 'তুমি এত ভালো ছেলে, কিন্তু নামটি বাবা অমন কেন হলো? তবে...হরি শব্দটি...হ্রীও ক্রীও থেকেই এসেছে মনে হয়...' (ওই, পৃ ৯৫)। কীর্তনের আসরে যতবার ঢুকেছেন ভূপতিনাথ, কোনো-না-কোনো অঘটন ঘটেছে। তা নিয়ে গর্বও ছিল তাঁর।

এমন সব গর্বে, ওরকম সব উক্তিতে যে নিষ্ঠুরতা আছে, আছে অভব্যতা, তা দিনলিপিতে স্বীকার করেছেন ধূজটিপ্রসাদ। কিন্তু সে স্বীকারোক্তি পাওয়া গেল ১৯৫৫ সালের নভেম্বর মাসের শেষদিকে। ওই দিনলিপির একদশক আগে ১৯৪৫ সালে *On Indian History : A Study in Method*-এর উৎসর্গপত্রে ধূজটিপ্রসাদ লিখেছিলেন : 'To the family tree in historical gratitude'। তাঁর ছোটোভাই বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মতে, '...বংশের ধারা সম্পর্কে একটা প্রচ্ছন্ন গৌরববোধ মাঝে মাঝে তাঁর মধ্যে দেখেছি। বংশপরম্পরায় ইতিহাস ও সংস্কৃতির চর্চা এবং জ্ঞানগত উত্তরাধিকার সম্বন্ধে তিনি যে সচেতন ছিলেন, তার প্রমাণ "On Indian History" বইটির উৎসর্গে...' (বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, 'মানুষ ধূজটিপ্রসাদ: ঘরে ও বাইরে', প্রসঙ্গ : ধূজটিপ্রসাদ, জলার্ক প্রকাশন, আশ্বিন ১৩৯২ব. পৃ ২০৯)। আসলে ১৯৪৫-এর উৎসর্গপত্র এবং ১৯৫৫-র স্বীকারোক্তি—দুই-ই সমান সত্যি। একইরকম সত্যি ১৯৫৬র ৫ মার্চ তারিখের দিনলিপিতে লেখা মন্তব্য ; যা তিনি করেছিলেন জীবনে এবং কর্মে আচারিত আত্মবিশ্বাসের উৎস হিসেবে তাঁর পারিবারিক শিক্ষার ভূমিকা প্রসঙ্গে। ধূজটিপ্রসাদের স্মৃতিকথন আর আত্মকথা গঁথে গঁথে পাঠক যদি বানাতে চান তাঁর কোনো জীবনকাহিনি, সেখানে মানুষটির স্বাবলম্বনের ন্যায্যতা এবং সেই স্বাবলম্বনের অসংগতি—দুটিই তাঁর মনুষ্যত্বে অঙ্গাঙ্গি। ১৯৫৬ সালের প্রজাতন্ত্রদিবসে তিনি ডায়েরিতে লেখেন :

যখন সমাজতান্ত্রিকরা ধোঁয়া ছড়ায় তখন আমি ইকনমিস্ট—করণ ইকনমিক্স-এ যতটা বুদ্ধির শাসন ততটা এক জুরিসপ্রুডেন্স ছাড়া অন্য কোনো সমাজবিজ্ঞানে নেই। আবার যখন ইকনমিস্টরা অন্ধের ধোঁয়া ছাড়েন, তখন তাঁদের সামাজিক রিয়ালিটির কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। আমি কোনো লেবেল চাই না, প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। একটি জিজ্ঞাসা ছাত্র হিসেবেই জীবন কাটিয়ে এসেছি, এখনও তাই চাই। এই আমার গুরুদের শিক্ষা। আমি মানব-জীবনের ছাত্র...জীবন বাদ দিয়ে পাণ্ডিত্য আমি অনেক দেখেছি ভাটপাড়ায়—আর ইকনমিক জার্নালের পৃষ্ঠায়। ও-সব বুদ্ধির চালাকি জীবন ধরে ফ্যালে...আপাতত আমি ধোঁকা কুস্তা, না ঘরকন্যা বা ঘটিকা। কিন্তু এই কুস্তাগুলো খুব ভালো গুয়াডগ হয়, অন্তত গাধাকে ঘরে পৌঁছে দেয় কাপড় সমেত। (মনে এলো, র-৩, ২য় সম্ভার, পৃ ১৩৬-৩৭)।

অর্থনীতি এবং তার চর্চা নিয়ে কী ধরনের বেদনা ছিল ধূজটিপ্রসাদের? আর কখনই-

বা সেই বেদনার অন্তর থেকে প্রত্যাশার ইঙ্গিত ছুঁয়ে যেত তাঁর সদা-চিন্তাশীল মন-মননকে? ডবলিউ.এ.লিউইস-এর *দি থিওরি অব ইকনমিক গ্রোথ* পড়া সম্পূর্ণ হলে ধূজ্জিটপ্রসাদ ১৯৫৫ সালের ২৩ নভেম্বর ডায়েরিতে লেখেন :

লিউইস-এর ভাষা সর্বদাই প্রাঞ্জল...ডোমার-হারড-স্পেংলার-স্পীগেল প্রভৃতির রচনায় অনুমত দেশের চর্চা আছে নিশ্চয়, কিন্তু সর্বই যেন উন্নত দেশের এবং মাত্র অর্থনৈতিক ব্যাপারের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে...কেন সামাজিক ক্রমশে অনুমত দেশের উন্নতির পথে বাধা আছে...তার...বিশদ বিশ্লেষণ এই বইখানিতে প্রথম পেলাম। ...লিউইস-এর মতে আমাদের দেশে প্ল্যানিং মাত্র অর্থনীতির ব্যাপার নয়, সমাজতত্ত্বেরও বটে। বহুদিন থেকে আমি এই কথা বলছি, কেউ শোনেনি। একজন ম্যাঞ্চেস্টারের অধ্যাপকের রচনা পড়ে যদি কোনো ফল হয়।...বুদ্ধিবৃত্তিতে আমরা এখনও পশ্চিমের দাস। দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্ল্যান-পীরিয়ডের পরে হয়তো দাসত্ব ঘুচে। (ওই, পৃ ৯১)

পড়তে পড়তে মনে হয়, তৃতীয় পরিকল্পনার সমাপ্তি পেরিয়ে বাঁচতে হয়নি ধূজ্জিটপ্রসাদকে, এ হয়তো তাঁর জীবনভর চিন্তার সুকৃতি। দীর্ঘায়ু যদি হতেন, তবে দেখতে হতো, পরিকল্পনার পর পরিকল্পনা গড়িয়ে যায়, ভারতীয় বুদ্ধিবৃত্তি পশ্চিমি দাসত্বের জটিল থেকে জটিলতর বন্ধনে জড়াতে থাকে। অথচ সেই ১৯৫৫তেই লিউইসকে খাতির জানাতে গিয়ে নিজের অহংকে কত সংযত আর সংগত অবয়ব দিয়েছিলেন ধূজ্জিটপ্রসাদ। চিন্তার ওই ধরতাই থেকে আজও তৈরি হয়নি কোনো অর্থনীতির ভারত। পরের বছর নয়ামার্কসবাদী অর্থনীতিবিদ পল বারান ধূজ্জিটপ্রসাদের মনকে, চিন্তাসূত্রকে স্পর্শ করেন। স্ট্যানফোর্ডের এই অধ্যাপকটির সঙ্গে ধূজ্জিটপ্রসাদের আলাপ স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটে। সেই সূত্রে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশকেও কৃতজ্ঞতা জানাতে ভোলেন না ধূজ্জিটপ্রসাদ। পল বারানকে নিয়ে ১৯৫৬র ৫ মার্চ ডায়েরিতে লেখেন :

পল বারান...খুবই কম লেখেন, কিন্তু যা লেখেন তার মধ্যে ধোঁয়া সৃষ্টির প্রয়াস নেই...অস্তুষ্টি আছে গ্রোথ ও প্ল্যানিং সম্বন্ধে...একদম অনবদমিত—যা সত্য ভাবেন তাই খোলাখুলি বলেন...তাঁর মতামত...আমেরিকা সহ্য করে না—ভদ্রলোকের ছাত্রই নেই, যে রিসার্চের জন্য টাকা চাইলেই পাওয়া যায়, সে টাকা তাঁর কাছে আসে না—অর্থাৎ একপ্রকার একঘরে...বারানের কাছে খুব একটা সমর্থন পেলাম। প্ল্যানিং-সংক্রান্ত আমার চিন্তা সুবিখ্যাত ভারতীয় অর্থশাস্ত্রীদের চিন্তার সঙ্গে ঠিক যেন খাপ খায় না, অথচ সাহস-ভরে কিছু বলতেও পারি না...আত্মপ্রত্যয় আছে, অথচ কোথাও যেন নেই...বারান আমাকে আত্মপ্রতিষ্ঠিত করুক আর নাই করুক আমার মনে শানিকটা বিশ্বাস এনে দিলে। (ওই, পৃ ১৬১)।

যে বাঙালি অর্থনীতিবিদ পরবর্তীকালে মাতৃভাষায় অর্থনীতিচর্চাকে বেশ কিছুটা গুরুত্ব দিয়েছেন, সেই ভবতোষ দত্ত লিখেছিলেন,

ধূজ্জিটপ্রসাদ অর্থনীতির বিশেষজ্ঞ ছিলেন না এই কথা মেনে নিয়েও বর্তমান যুগের অর্থনীতির ছাত্র অনেক চিন্তার খোরাক পাকেন ধূজ্জিটপ্রসাদ যে প্রশ্নগুলি তুলেছিলেন তার উত্তর খুঁজতে। আমাদের উন্নয়নের পথে কোথায় আমরা ভুল করেছি, কেন আমরা আমাদের উৎপাদন বৃদ্ধি ও আর্থিক সাম্যের অসীম লক্ষ্যে পৌঁছতে পারি নি, পরিকল্পনানীতি গ্রহণের তিন দশক পরেও তার উত্তর মেলেনি। চিন্তার জগতে এবং বাস্তবজীবনের মৌলিক তাত্ত্বিক কাঠামোর বিশ্লেষণে সুসঙ্গত ও সু-সংহত প্রশ্ন তুলতে পারাটাই একটা মস্ত কাজ। ধূজ্জিটপ্রসাদ প্রশ্ন তুলেছিলেন। উত্তর তিনি দেননি, কিন্তু তাঁর উত্তরপুরুষ সেকাজের ভার নিতে সংকুচিত হবে কেন? (ভবতোষ দত্ত, 'ধূজ্জিটপ্রসাদের অর্থনীতি-চিন্তা', *প্রসঙ্গ ধূজ্জিটপ্রসাদ*, জলার্ক প্রকাশন, আশ্বিন ১৩৯২ব, পৃ ১০)।

তিন দশক ছেড়ে আজ পাঁচদশক কেটে গেছে, কিন্তু উত্তর মেলেনি। উত্তর খোঁজার কাজটাও কি খানিকটা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে? অন্তত যেমন করে খুঁজবার ইঙ্গিত ধূর্জটিপ্রসাদে মেলে? যেরকম অনুসন্ধানের আশা ভবতোষ দত্ত করতেন? পরিবর্তনের সম্পূর্ণটাই যে ভ্রান্ত, এমন কথা সমীচীন নয়। আর একথাও সঠিক যে, গবেষণার আর্থিক সুযোগ যেমন বেড়েছে, ঠিক তেমনি খানিকটা টাল খেয়ে গেছে গবেষণা সংলগ্ন যথার্থ তন্ময়তার ক্ষেত্র। সেটাও শুধুমাত্র অর্থনৈতিক অথবা কেবলই সামাজিক সমস্যা নয়। দিনলিপিতে লিউইস অথবা বারানকে নিয়ে ধূর্জটিপ্রসাদের লেখায় কিংবা ধূর্জটিপ্রসাদ প্রসঙ্গে ভবতোষ দত্তের ব্যাখ্যায় আজকের পাঠক খুঁজে পাবেন একজন পরিণত সমাজবিজ্ঞানীর বুদ্ধিবাদী একাকিত্বের ধ্যান, ইকনমিক জার্নালের কোনো কোনো নিবন্ধ নিয়ে তাঁর স্কোভের হেতু। আর ভাটপাড়ার পণ্ডিত? সেটা কতখানি দেখা ছিল ধূর্জটিপ্রসাদের? স্যার আশুতোষ প্রশ্ন করেছিলেন, ‘ওরে শোন, তুই সংস্কৃত জানিস?’ ‘আজ্ঞে না।’ ‘নিশ্চয়ই জানিস, বামনের ছেলে, ভাটপাড়ায় বাড়ি না তোর?’ ‘আজ্ঞে না, পাশের গ্রামে।’ (মনে এলো, র-৩ ২য় সম্ভার, পৃ ১৩০-৩১) হ্যাঁ, ধূর্জটিপ্রসাদের পিতা ভূপতিনাথের নিবাস ছিল ভাটপাড়া পৌরসভার অন্তর্গত কাঁঠালপাড়ার কাছে নারায়ণপুর গ্রামে। ভূপতিনাথের বড়ো ছেলে ধূর্জটিপ্রসাদের জন্ম অবশ্য নারায়ণপুরে নয়, ভূপতিনাথের মামাবাড়িতে, শ্রীরামপুরের চাতরা পল্লি। তারিখটা ছিল ১৮৯৪ সালের ৫ অক্টোবর, অর্থাৎ ২০ অশ্বিন ১৩০১। দিনটা আবার সেই বছরে দুর্গাপূজোর সপ্তমী তিথি। নারায়ণপুর গ্রামের বাড়িতে দুর্গাপূজো হতো। ধূর্জটিপ্রসাদের দিনলিপিতে সেই বালাস্মৃতির আখ্যান মেলে :

সন্ধিপূজা, আরতি, সঙ্কল্প, বাড়ির পূজোর দালানে ঠাকুর তৈরি হচ্ছে, চালচিত্র আঁকা হচ্ছে, ভিয়েন ঘরে বৌদে, পাঙ্করা, লুচি, ছাঁচড়া...কর্তারা ঘুরে বেড়াচ্ছেন, ভেতর মহলের উঠোনে বড় বড় ঝাঁটতে প্রকণ্ড মাছ কাটা, সেজগিনী...চার্জের, তরকারির ঘরে মেজগিনীর প্রভুত্ব...মিষ্টির ঘরে পিসেমশাই, আর গুস্তা তিনেক বোন গুস্তা পাঁচেক বাচ্চা নিয়ে কলরব করছে, প্রত্যেক মা বাচ্চাকে তাক্সা বৌদে খাওয়াতে ব্যস্ত, সব সাটিনের জামা পরে ছেলেমেয়েরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, অসহ্য গোলমাল, ঢাক, ঢোল, সানাই...তারা নাকি তিনপুরুষ বাড়িয়ে আসছে আমাদের বাড়িতে, ভিয়েনকারও তিনপুরুষ, কুমোরও তিনপুরুষ, কেউ তিনপুরুষের কম নয়। (ওই, পৃ ৭৯)।

একবার তাঁদের একঘরে করা হল, চার-পাঁচশ লোকের খাবার ফেলা যাওয়ার উপক্রম। পূজোর দালানে গ্রামের ছেলেমেয়েদের জন্য যে ফ্রি-স্কুল খুলেছেন কর্তারা, তার মাস্টারমশায়ের স্ত্রী নাকি বিয়ে করা বউ নয়। মাস্টারকে গ্রাম থেকে না-তাড়িয়ে মোড়লরা জলস্পর্শ করবেন না। সতিমিথ্যে না-খুঁজে কর্তারা বললেন, ভিনগাঁয়ের গরিব-দুঃখী ডেকে খাইয়ে দিতে। কিন্তু পরদিন রফা হলো পনেরোজন ব্রাহ্মণ-মোড়লকে স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে। মহাষ্টমীর দিন মোড়লরা এলেন, খেলেন, বললেন এমন আচারনিষ্ঠ সদ্রাহ্মণবংশ দেশে দুটি নেই। পূজোর একমাসের মধ্যে ম্যালেরিয়ায় গ্রাম ছেয়ে গেল। আরো আছে বাড়িতে কালীপূজোর কাহিনি—‘আমাদের বাড়িতে বহুবছর ধরে কালীপূজো হয়েছে। হালিশহরে, প্রকাশশ্রীশানকালীর তান্ত্রিকপূজা দেখেছি। উয়ে বুক কাঁপতো।’ (ওই, পৃ ১৪৭)। পূজো, কালীপূজো পার করে শীত পড়ে বাংলা জুড়ে :

পৌষ মাসে মাটির বারান্দায়, কী পুঁইমাচার নিচে কঁথা জড়িয়ে রোদ পোয়ানো, কোলে মুড়ি নারকেল কোরা, গেলাশে খেজুর রস, আর ঘরের ভেতরে ভাঁড় থেকে নলেন শুড়ের গন্ধ ভরভর, এ কেবল

বাংলা দেশেই সম্ভব। অবশ্য সেই সঙ্গে ম্যালেরিয়ার জ্বরও বটে। সব আশ্রয়স্থান শৈশব অধ্যায়টিই মধুর। স্মৃতির নির্বাচন একদেশদর্শী না হলে মানুষে বাঁচতে পারত না। (ওই, পৃ ৮৬)।

এই তবে ধূর্জটিপ্রসাদের যাত্রাশুরুর অবস্থান ; ভাটপাড়ার পণ্ডিত থেকে ইকনমিক জার্নালের পৃষ্ঠা পর্যন্ত যাঁর দেখাশোনার, চেনাছানার এবং স্ফোভ প্রকাশের ব্যাপ্তি। তাঁর পিতামহ কালিদাস (১৮৩৫-৮৮) ঙ্গলি কলেজের কৃতী ছাত্র—জুনিয়র-সিনিয়র স্কলার। ঙ্গলি ব্রাঞ্চস্কুলের প্রধান শিক্ষক কালিদাস। ছাত্রপাঠ্য ভূগোল বইয়ের প্রণেতা, রচয়িতা *অভিমন্যুবধকাব্য* নামের আরো একটি বইয়ের। ঙ্গলি কলেজে রেডারেণ্ড লালবিহারী দেব সহকর্মী ছিলেন তিনি। সে-কলেজে ইংরেজি আর ইতিহাসের সহকারী-অধ্যাপক হিসেবে বিশেষ খ্যাতি ছিল তাঁর। রাইট অনারেবল সৈয়দ আমির আলি, অনারেবল জাস্টিস সামসুদ হুদা এবং জাহিদ সুরাবর্দি, আচার্য বিজয়চন্দ্র মজুমদার, অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র মৈত্রী কালিদাস মুখোপাধ্যায়ের যশস্বী ছাত্র। কালিদাস-মনোমোহিনীর দশটি সন্তানের মধ্যে ভূপতিনাথ ষষ্ঠ এবং পুত্রদের মধ্যে চতুর্থ। তাঁর জন্ম ১৮৬৩ সালে। ঙ্গলি কলেজ থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-কোর্স-এ তিনি বি.এ. পাশ করেন ১৮৮৫ সালে। ১৮৮৮তে বি.এল. ডিগ্রি পান। কর্মজীবনের প্রথম তিনবছর তিনি ওকালতি করতেন ঙ্গলিতে। ১৮৯১ থেকে ১৯২০ পর্যন্ত তাঁর কর্মস্থান আলিপুর-বারাসত আদালত। রুজির কারণে ভূপতিনাথের স্থায়ী নিবাস ভাটপাড়ার নারায়ণপুর গ্রাম থেকে বারাসতে সরে এল। কালিদাসের অন্যান্য পুত্রদের মধ্যে রমানাথের অপরিণত মৃত্যু হয়। অন্য তিনজন হলেন মন্মথনাথ (১৮৫৬-৯৫), দুর্গাপ্রসন্ন (১৮৬০-১৯১৫) এবং পৃথ্বীরাজ (১৮৭১-১৯৪১)। তাঁর মেয়েরা হলেন নীরদা, মন্দাকিনী, ঘোরা, সাবিত্রী, গায়ত্রী।

১৮৮২ সালে ভূপতিনাথের বিবাহ হলো হেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা এলোকেশী দেবীর (১৮৬৯-১৯৪৪) সঙ্গে। ড. আলেকজান্ডার ডাফ-এর প্রিয় ছাত্র হেমচন্দ্র (১৮৩৮-৯৬) ডাফসাহেবের স্কুলে শিক্ষকতা করতে করতে এন্ট্রান্স থেকে দর্শনশাস্ত্রে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। কিছুকাল ঙ্গলি কলেজে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপনাও করেছেন। তারপর ঙ্গলি আদালতে তাঁর ওকালতির সূচনা। ফৌজদারি আইন ব্যবসায় তাঁর যে প্রতিষ্ঠা ছিল, তার তুলনা মেলা ভার। ধূর্জটিপ্রসাদের মাতামহ হেমচন্দ্র এবং পিতা ভূপতিনাথ, উভয়েই পরম সংগীতানুরাগী, মা এলোকেশীও ভালো গাইতেন। ভূপতিনাথ-এলোকেশীর নয় ছেলেমেয়ের মধ্যে বড়োছেলে ধূর্জটিপ্রসাদ তৃতীয় সন্তান। আগে দুই মেয়ে—উষা (১৮৮৬-১৯৫৪) আর বিভা (১৮৯৩-১৯৬৫)। মেজছেলে জয়ন্তীপ্রসাদ (১৯৯৮-১৯১৮) অকালে মারা যান বি.এ. পড়তে পড়তে। সেজ দেবীপ্রসাদও (১৯০৪-৪২) দীর্ঘায়ু নন। শহর কলকাতার বিশিষ্ট চিকিৎসক ছিলেন তিনি। অর্থাৎ ভূপতিনাথ জীবনে একবার পুত্রশোক পেয়েছিলেন। এলোকেশীর জীবনে সে-শোক এসেছে দুবার। তাঁদের ছোটোছেলে এবং সর্বকনিষ্ঠ সন্তান বিমলাপ্রসাদ (১৯০৬-১৯৮৯) যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। কবিতা, প্রবন্ধ, রম্যরচনায় তাঁর দক্ষতা সুবিদিত। ধূর্জটিপ্রসাদের বিখ্যাত উপন্যাসত্রয়ীর তৃতীয় কাহিনি *মোহানা* তাঁকে উৎসর্গ করা। ধূর্জটিপ্রসাদের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত দিনলিপি *কিলিমিলির* (প্রথম প্রকাশ ১৯৬৫) কথাযুগ বিমলাপ্রসাদের লেখা। আর জীবনের প্রথম বই *Personality and the Social Sciences* ধূর্জটিপ্রসাদ উৎসর্গ করেছিলেন অকালমৃত ভাই জয়ন্তীপ্রসাদের স্মৃতিতে। তাঁর এবং জয়ন্তীপ্রসাদের মাঝে আর এক বোন ছিলেন নিশা (১৮৯৬-১৯৫০)। অন্য

দুইবোন জয়ন্তীপ্রসাদ আর দেবীপ্রসাদের মাঝে। তাঁরা হলেন তম্বসী (১৯০১-৮১) এবং শোভনা (১৯০৩-৮৫)।

ধূজটিপ্রসাদ আদৌ পিতামহ কালিদাস কিংবা মাতামহ হেমচন্দ্রের মতো নিয়মিত ভালো ছাত্র নন। ১৯০৯ সালে বারাসত সরকারি স্কুল থেকে তিনি দ্বিতীয় বিভাগে এন্ট্রান্স পাশ করেন। পরীক্ষা বারাসত স্কুল থেকে দিলেও, কলকাতার হেয়ার স্কুলে ধূজটিপ্রসাদ কিছুদিন পড়েছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে আলাপ এবং সখ্য সেই স্কুল থেকেই। Tagore—A Study বইটির উৎসর্গের উপক্রমণিকা এতখানিই পুরানো। দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করলেন বটে, কিন্তু সেবছর এনট্রান্সে ইংরেজি আর সংস্কৃতে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছিলেন ধূজটিপ্রসাদ। সংস্কৃত থেকে দূরে সরে যাওয়ার দুঃখ পরিণত বয়সেও ছুঁয়ে যেত তাকে :

সংস্কৃত পড়তে পড়তে ছেড়ে দিলাম। বাড়িতে আমার শিক্ষক ছিলেন সতীশ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, তিনি Honours Standard-এ অঙ্ক কবাতেন। তাও ছেড়ে দিলাম। অনেকদূর এগিয়ে ফ্রেঞ্চও ভুলে গেলাম। এতিনটি আমার প্রধান দুঃখ। (কিলিমিলি ঐ, পৃ ২৭১)।

একথা যখন দিনলিপিতে লিখছেন ধূজটিপ্রসাদ, ১৯০৯ সালের পরে তখন কেটে গেছে পাঁচ-পাঁচটি দশক। সুদীর্ঘ আটত্রিশবছরের কর্মজীবন যেদিন শেষ করছেন, সেই ১৯৫৯ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর এঁডায়েরি লেখা। তার আগে থেকেই শরীরে জ্ঞানান দিয়েছে কর্কটরোগ। ১৯৫৮ সালের ১ মার্চ ডায়েরিতে লিখেছেন, ‘ভোরবেলা একজন একটু সংস্কৃত কবিতা পড়েন...শুয়ে শুয়ে চা খেতে খেতে কয়েকটা সংস্কৃত শব্দ কানে আসে। অত্যন্ত বাংলা ঘেঁষা...মারা গেলে এইরকম বাংলা শব্দের সুর করে সংস্কৃত ভাষা আর শোনা যাবে না। সংস্কৃত না পড়াই ভালো। সংস্কৃত ছন্দে মৃত্যুর ছাপ আছে।’ (ওই, পৃ ২১১)। এতবছর ধরে ইকনমিক জার্নালের পণ্ডিতির পৃথিবীটাকে খুব কাছে থেকে দেখতে দেখতে হঠাৎ-হঠাৎ কি ভাটপাড়ার পণ্ডিতির জীবনরিক্ততাকে তুলনায় সহনীয় মনে হতো? বিশেষত যখন সেই শ্রীরামপুরের চাতরা পল্লিতে শুরু হওয়া জীবন, ভাটপাড়া-কাঁঠালপাড়া-সংলগ্ন নারায়ণপুর গ্রামে শৈশব কাটানো জীবন সুদূর উত্তরপ্রদেশে কর্মজীবনের প্রাপ্তে পৌঁছতে পৌঁছতে যেন ইহজীবনের শেষকে অনুভব করতে পারছেন?

১৯০৯ থেকে ১৯১১ কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে আই.এসসি পাঠক্রমের নিয়মিত ছাত্র ছিলেন ধূজটিপ্রসাদ। কিন্তু অসুস্থ হয়ে পড়লেন ঠিক পরীক্ষার আগে। ১৯১২তে রিপন কলেজ থেকে আই.এসসি পরীক্ষা দেন তিনি। পাশ করে ওই কলেজেই ইংরেজিতে আর্নস্ট এবং সাধারণ পাঠক্রমে অর্থাৎ পাসে গণিত এবং রসায়ন সহ ভরতি হন বি.এ. ক্লাসে (অলোক রায়, ধূজটিপ্রসাদ পৃ ৬-৭)। ইতিমধ্যে ১৯১১ সালে বারাসতের স্থায়ী বাসিন্দা ভূপতিনাথ কলকাতার অখিল মিশ্রি লেনে বাড়িভাড়া করলেন ছেলের লেখাপড়ার জন্য। মধ্যকলকাতার এই অঞ্চলেই কি জেলেপাড়ার সঙ দেখেছিলেন ধূজটিপ্রসাদ? ১৯৫৬ সালের ১৩ এপ্রিল তিনি ডায়েরিতে লেখেন, ‘আজ কি চৈত্র-সংক্রান্তি? আজই তো জেলেপাড়ার সঙ বেরবে? আজই না চড়ক-পুজো?’ (মনে এলো, র-৩ ২-য় সম্ভার, পৃ ১৮৫)। সেই ১৯১১ থেকে জীবনের কুড়িটি বছর ওই অখিল মিশ্রি লেনের বাড়িই ছিল ধূজটিপ্রসাদের কলকাতার ঠিকানা। আর রিপন কলেজেই আলাপ হলো রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর সঙ্গে, যাঁকে বুদ্ধিবাদী যাপন ব্যোপে অন্যতম গুরুর আসনে রেখেছেন তিনি। ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত বক্তব্য

প্রবন্ধসংকলনটির যে আলোচনা পরের বছর বসুমতী পত্রিকায় বেরায়, তা ধূর্জটিপ্রসাদকে খুশি করেছিল। ১৯৫৯-এর ১৫ মের দিনলিপিতে আছে, ‘এমন যথার্থ লেখা আমি কম পেয়েছি। ...বলেছেন...আমি রামেন্দ্রসুন্দরের শিষ্য পরম্পরা!...এ-কথা অন্য কেউ লেখেননি, আমিই কেবল জানতাম।’ (ঝিলিমিলি, ঐ, পৃ ২৩৭)। কিন্তু বি.এ. পরীক্ষায় ১৯১৪ সালে কৃতকার্য হননি ধূর্জটিপ্রসাদ। স্নাতক ইংরেজিতে প্রথম শ্রেণীর নম্বর, গণিতের ফলও উৎকৃষ্ট, কিন্তু রসায়ন প্রায়টিকালে কয়েকনম্বরের জন্য অকৃতকার্য। নানান অনিয়মে এই সময়ে গুরুতর অসুস্থ হন তিনি। স্বাস্থ্য ফেরাতে দার্জিলিঙে গিয়ে আলাপ হলো ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সঙ্গে। ভূপতিনাথ ছেলের স্নাতকস্তরের অধ্যয়ন সম্পূর্ণ করাবার উদ্দেশ্যে তাঁকে লন্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্সে পড়তে পাঠানো মনস্থ করেন। সিসিলিয়া জাহাজে কলম্বো পর্যন্ত গিয়ে আবার শারীরিক অসুস্থতার কারণেই দেশে ফিরে এলেন ধূর্জটিপ্রসাদ। এবারে শরীর সারাতে গেলেন রাঁচী। মোরাবাদিতে জ্যোতিরিদ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িতে আলাপ হলো প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে। ততদিনে ১৯১৫ সাল পড়ে গেছে। পরের বছরই যে সবুজপত্র ধূর্জটিপ্রসাদের ‘দাদার ডায়েরি’ প্রকাশ করে, তা আগেই বলেছি। ‘দাদার ডায়েরি’ বেরনের সেই ১৯১৬তেই বঙ্গবাসী কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস-স্নাতকোত্তর আর আইন ক্লাসে ভরতি হলেন লেখক।

যখন ধূর্জটিপ্রসাদ ইতিহাসের এম.এ. ক্লাসের ছাত্র, সঙ্গে আইনেরও, সেই সময়েই, ১৯১৮ সালে, তাঁর পরের ভাই জয়ন্তীপ্রসাদের মৃত্যু। ওই বছরই অত্যন্ত অবহেলায় ইতিহাসে এম.এ. পরীক্ষা দেন ধূর্জটিপ্রসাদ এবং দ্বিতীয় শ্রেণিতে ত্রয়োদশ স্থান অধিকার করেন (অলোক রায়, ধূর্জটিপ্রসাদ, পৃ ৯)। শরীরও ভালো ছিল না সেসময়, আক্রান্ত হয়েছিলেন সাময়িক দৃষ্টিহীনতায়। তখনকার বুদ্ধিবাদ-চর্চায় ধূর্জটিপ্রসাদের ভূমিকার একটা বিবরণ মেলে বক্তব্য সংকলনের ‘নতুন ও পুরাতন’ প্রবন্ধে। যখন হেলাফেলায় ইতিহাসে এম.এ. দিচ্ছেন, তার আগে পড়া হয়ে গেছে kropotkin-এর *French Revolution*, গুলটপালট হয়ে যায় বিপ্লব সম্পর্কে ধারণা, তারপরই কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো আর ক্যাপিটাল পাঠের ক্রম। ততদিনে অবশ্য পরীক্ষার জীবন শেষ হয়ে শিক্ষকতার জীবন শুরু হয়েছে, কিন্তু শিক্ষার্থীসত্তা ধূর্জটিপ্রসাদকে ছেড়ে যায়নি কখনো (বক্তব্য, র-২, পৃ ১৮৩)। দুবছর বাদে ১৯২০ সালে ধূর্জটিপ্রসাদ অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এবার প্রথম শ্রেণিতে। তবে পরীক্ষায় অবশেষে এই ভালো ফল করার আখ্যানও প্রথামাফিক নিয়মিত ভালো ছাত্র-পরীক্ষার্থীর গল্প নয়। অর্থনীতিতে এম.এ. দেওয়ার কয়েকদিন আগে মারা গেলেন ভূপতিনাথ। পরীক্ষার্থীর মনে হল, ‘...মাথাটা খালি হয়ে গিয়েছে।’ (মনে এলো, র-৩ ২য় সম্ভার, পৃ ১২৯)। তার উপরে, হাত দিয়ে ফার্স্ট ক্লাস গলে না বলে যে সতীশ রায় মহাশয়ের নাম, তিনিই নাকি এবার একাধিক পত্রের পরীক্ষক। ধূর্জটিপ্রসাদ দিনলিপিতে লিখেছেন :

...পরীক্ষা তো দিলাম। অর্ধেক প্রশ্ন যথামতো ছেড়ে দিলাম...‘কিরে, কেমন হোলো’, ‘পাবো সেকেন্ড ক্লাশ, পাওয়া উচিত ফার্স্ট।’...মাস দেড়েক পরে একদিন দুপুর বেলা কে কড়া নাড়লো—...প্রায় বৃদ্ধ ভদ্রলোক...‘আমার নাম সতীশ রায়...অমুকদিন বিকেল সাড়ে চারটায় আমার সঙ্গে লাইব্রেরির পাশের ঘরে দেখা করবে...আশুবাবুর সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবো...সতীশবাবু আশুবাবুর ঘরে নিয়ে গেলেন...’অেকে পড়াতে হবে জুলাই থেকে—এখন থেকে তৈরি কর...দেখিস ঝাঁকি দিসনি...ভেবেছিলাম ঝাঁকি—অক্সফোর্ড—

কেমব্রিজ সব প্রয়ের উত্তর না দিয়েই ফার্স্ট ক্লাশ পাবি?...’ ...পরীক্ষার ফল বেরুলো—আমি তখন এলাহাবাদে। কলকাতায় ফিরলাম চাকরিতে যোগ দেবার জন্য। ফার্স্ট ক্লাশ পেয়েছিলাম—কিন্তু আশুতাবুর কৃপায়। শুনলাম কিছু নম্বর কম ছিল—কমিটিতে আশুতাবু বলেছিলেন, ‘ওর ফার্স্টক্লাশ পাওয়া উচিত।’ (ওই, পৃ ১২৯-৩০)।

এই গেল ধূর্জটিপ্রসাদের স্নাতকোত্তর অর্থনীতিতে প্রথম শ্রেণিতে দ্বিতীয় হওয়ার গল্প। কিন্তু তাঁর অমসৃণ বহিজীবনের শেষ এখানে নয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর চাকরি হয়নি, আর একজনের হয়েছিল। স্যার আশুতোষ অনুরোধ করেন, সংস্কৃত কলেজে পড়াতে। স্বাভাবিক যে ধূর্জটিপ্রসাদ উত্তরে বলেন, ‘আমি আপনার কাছে কাজ করতে চাই। আপনি তো আমাকে কথা দিয়েছিলেন।’ ...কথা রাখব, এখন নয়...যদি জানতিস কেন ওকে চাকরি দিলাম... তোর তো, হাঁড়ি চড়ানো নেই।’ ১৯২১-এ কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজে কিছুদিন পড়িয়েছিলেন ধূর্জটিপ্রসাদ; একবছরের মধ্যেই কাজ পেয়ে যান লঙ্কৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই চাকরির খবর পেয়ে আশুতোষ বলেন ‘...আমি কি চাই যে, তোরা সব চলে যাস? কিন্তু কী করবো...কাউকে মাইনে দিতে পাচ্ছি না-ক’মাস হয়ে গেল, তারা কী করে খাচ্ছে কে জানে। আশ্চর্য হয়ে যাই তাদের loyalty দেখে...(তুই) ঠিকই করেছিস।’ (ওই, পৃ ১৩১-৩২)। যদিও আশুতোষ বলেছিলেন কথা রাখবেন, যদিও ধূর্জটিপ্রসাদ লঙ্কৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতাকালীন কলকাতায় এলে যতবার দেখা হয়েছে, আশুতোষ প্রশ্ন করেছেন, ‘...কবে আসছিস’, এবং উত্তর পেয়েছেন, ‘যেদিন ডাকবেন’, কোনোদিন আশুতোষের ডাক পাননি ধূর্জটিপ্রসাদ। ১৯৪৮-এর শেষে কি ১৯৪৯-এর গোড়ায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের তৎকালীন প্রধান অধ্যাপক দ্বারকানাথ ঘোষের বিশেষ অনুরোধে সেই বিভাগে একবার বক্তৃতা দিতে এসেছিলেন তিনি। কলকাতায় তখনকার অর্থনীতি স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন যাঁরা, তাঁদের কারো-কারো স্মৃতিতে আজও অমলিন, মার্কস বর্ণিত মূল্যের শ্রমভিত্তিক তত্ত্ব এবং রূপান্তর সমস্যা বিষয়ে ধূর্জটিপ্রসাদের সেই আলোচনা। ১৯৪৮ সালেই ইকনমিক জার্নাল পত্রিকায় ওই সমস্যার এক নতুন গাণিতিক সমাধানের হদিস দিয়েছিলেন উইন্টারনিটস। ধূর্জটিপ্রসাদের সেই বক্তৃতায় এই সমাধানের প্রসঙ্গ এসেছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজের বক্তৃতার বিষয় নির্বাচনে এবং সেই বক্তৃতার চলনে তিনি অনায়াসে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, যে, মার্কসীয় তত্ত্ব সংক্রান্ত সমসাময়িক প্রশ্নগুলিতে তাঁর অবহিতি যথেষ্ট। আড়াই দশকের শিক্ষকতায় তাঁর চিন্তার সজীবতা এতটুকু ম্লান হয়নি, আদৌ ক্লান্ত হয়নি তাঁর অনুসন্ধিৎসা। কিন্তু জীবনে কোনোদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হয়নি তাঁর। অবসরগ্রহণের ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৫৯ তারিখটিতে দিনলিপিতে লেখেন, ‘৩৫ বৎসর ইউনিভারসিটিতে কাজ করলাম, এবং আরো তিন বৎসর সরকারের নোকরি। শেষবছর কিনা মাইনের economic adviser চিরটাকাল উত্তরপ্রদেশে।’ (ঝিলিমিলি, ওই, পৃ ২৭০)। লঙ্কৌ এবং আলিগড়ের যথেষ্ট প্রসাদ-সঞ্চিত জীবিকা-জীবন নিয়েও, কলকাতার সেরা ছেলেদের কোনোদিন পড়াতে না-পারার খেদ তাঁর ছিল। মৃত্যুর একবছর আগেও, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের কোনো প্রাক্তন ছাত্রের সঙ্গে চিন্তার আদান-প্রদানে খানিকটা খুশি লাগলে বলে ফেলতেন, ‘তোমাদের তো কখনো পড়ানোর সুযোগ পাইনি।’ কিন্তু আশুতোষকে নিয়ে তাঁর না-ছিল স্কেভ, না-ছিল অভিমান। দিনলিপিতে আছে :

চাকরি তিনি আমাকে দিতে পারেননি, দেননি নয়...তাঁর বিপক্ষে অনেক কথা শুনতাম, পড়তাম। ...বিদ্বান

হোন আপত্তি নেই, ভালো জজ হোন আপত্তি নেই, কিন্তু চাপরাসীকে মানুষ ভাবা, যার হাঁড়ি চড়ে না তার হাঁড়ি চড়াবার সুযোগ দেওয়ার জন্য নিজের কথার খেলাফ করা—এগুলোর ক্ষমা লোকে করবে কেন? ...আমার ইউনিভার্সিটি—আমার প্রফেসর—আমি মাইনে দিতে পাচ্ছি না—আমার প্রতি লয়ালটি, তারা কেনম করে খাচ্ছে... কোনটা প্রধান? অহংজ্ঞান, না হৃদয়ের একসাধন? নিশ্চয় শেষেরটা। এই ধরনের emotional identification গান্ধীজীর ছিল, নেপলিয়নের ছিল, লেনিনের ছিল, আশুবারুর ছিল। ... তাঁর মৃত্যুর সংবাদে যতটা আঘাত পাই ততটা আঘাত আর কোনো মানুষের মৃত্যুতে পাইনি। (মনে এলো, ওই, পৃ ১৩১-৩২)।

সব চিন্তাই যে ধূজটিপ্রসাদের সঠিক ছিল, সব মতই যে তাঁর নির্ভুল, এমন নয়। স্টালিন সম্বন্ধে মস্কোর ছাত্র থেকে এম.এন.রায় পর্যন্ত নানাজনের মত, মিকোয়ানের বক্তৃতা থেকে থ্রুশেভের রিপোর্ট পর্যন্ত তিনি উল্লেখ করেছেন দিনলিপিতে (ওই, পৃ ১৬৩-৬৪, ২৬৩-৬৪)। তাঁর নিজের মতামত নিশ্চয় এ প্রসঙ্গে স্পষ্টতর হতো, যদি তিনি পেতেন দীর্ঘতর জীবনের অবসর। জওহরলালকে নিয়ে তাঁর ধারণায় বা মন্তব্যেও খুবই সম্ভব এসে পড়ত প্রত্যক্ষ সমালোচনার রেশ। তাঁর কোনো বক্তব্যের ঠিক-ভুল বিচারটা আদত কথা নয়। আসল প্রশ্নটা বোধহয় এই যে, বিচিত্র বিষয়ে তাঁর ভাবনাচিন্তার ধরনটি কি অপরিবর্তিত থাকত, তাঁর জিজ্ঞাসাগুলির তীব্রতা কি সমমাত্রারই হতো, যদি তাঁর জীবন না-হতো প্রবাসী বাঙালির জীবিকা-অর্জনের উপমা? আত্মীয়-পরিজন থেকে বহুদূরে বছরের অনেকখানি সময় কাটানোর সেই জীবন কি শিক্ষিত পরাধীন বাঙালির অসংগত অবস্থানকে বুঝতে বাড়তি সহায় হতো? যে-জীবনে প্রতিটি সাফল্য, প্রতিটি ব্যর্থতাই নিরালম্ব, সেখানে আবার নতুন করে হারের ভয় বৃষ্টি হাস্যকর! আবার ওই লক্ষ্মী-প্রবাস ছাড়া কি এত সহজ নৈকট্য সম্ভব হতো ভাতখণ্ডের সঙ্গে, সম্ভব ছিল অতুলপ্রসাদ সেনের সঙ্গে এমন স্বতঃস্ফূর্ত সখ্য? জীবনে-জীবিকায় যাঁর শুধুই মসৃণতা, তিনি কি লিখতে পারেন রবীন্দ্রনাথকে :

...গানের, বিশেষত আলাপের গভিকে বৃদ্ধাকারে যদি পরিণত করতেই হয়, তাহলে asymptote-এই করা ভালো। যে অসীম পথের যাত্রী তাকে ঘরের সীমানায় আবদ্ধ রাখলে কী ক্ষতি হয় আপনি নিজে জানেন। আপনিই না স্কুল পালাতেন? আপনিই না স্বাধীন দেশে বছরে একবার অন্ততঃ ঘুরে আসেন? ...আকাশে আজ হঠাৎ মেঘ করেছে, জোরে হাওয়া চলছে—মেঘ ও আলো ছক আঁকতে আঁকতে কোথায় যাচ্ছে কে জানে। ওই তো আমাদের আলাপ। ...পরিশেষে এক্য চাইতে তিনিই পারেন যিনি সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের অতীত। ইতিমধ্যে'র অধিবাসীরা যখন শেষের এক্য চান তখন জীবনের organic processকে একটা মনগড়া অসীমের অসীম উদ্দেশ্যের উপায় বিবেচনা করেন। আমার সন্দেহ যে, আপনি আলাপ সম্বন্ধে technologically চিন্তা করেছেন। যে জিনিস চলছে, চলতে চলতে পথ কাটছে, চলিষ্ণু হয়েই পূর্ণতার দিকে এগুচ্ছে, তার আবার শেষ কোথায়?... শেষহীনতাই তার জীবন। তবে এ জীবনেরও ধর্ম আছে। (সুর ও সংগতি, র-৩, ১-ম সম্ভার, পৃ ৩৯-৪০)।

নিজের এই বক্তব্যকে ধূজটিপ্রসাদ বোঝাতে চান ছায়ানট, মালকোষ, বিলাবল অথবা কল্যাণের চলন ছুঁয়ে-ছুঁয়ে পরম গান্ধীর্যে; আবার অন্যত্র তাঁর কৌতুকের অন্ত নেই, যখন রবীন্দ্রসংগীতের সংখ্যাগরিষ্ঠ গায়ক-গায়িকার গায়নে নাকের অত্যধিক প্রয়োগ নিয়ে কথা বলছেন; কখনো বা তাঁকে পরম মুগ্ধ দেখায় সুচিত্রা মিত্রের ব্যতিক্রমী কণ্ঠ, গায়ন, উচ্চারণ এবং সুরক্ষেপ প্রসঙ্গে। সর্বত্রই তর্কে-বিতর্কে কঠিনতমের মোকাবিলায় আগ্রহী, সে-বিতর্কে জয়ের অঙ্গীকারে স্থিত, অথচ পরাজয়ের সম্ভাবনায় নিভীক এক ব্যক্তিত্ব মূর্ত হয়। সুরের

কথাকে তিনি জীবনরিস্ত ভাবতে পারেন না। আবার জীবনের এবং জ্ঞানের ভিন্নতর প্রদেশের বিন্যাসেও সূরের সংগতিসাধনে তৎপর হয়ে ওঠেন। এমন ব্যক্তিত্ব কি জীবিকায়-জীবনে অবিমিশ্র সাফল্যের প্রবাহ থেকে গড়ে ওঠা সম্ভব? নাকি এমন ব্যক্তিত্বই সফলতম হয়ে ওঠার পথে অন্তরায়? ধূজটিপ্রসাদের ছাত্রজীবনের পথ বন্ধুর, নিরন্তর চড়াই-উতরাই সেখানে, কখনো তা স্বাস্থ্যের কারণে, কখনো বা জিজ্ঞাসার এবং পাঠ্যভ্যাসের বিশেষ ধরনে; দ্বিতীয় বিভাগে এন্ট্রান্স থেকে, বি.এ. পরীক্ষায় অকৃতকার্যতা ছুঁয়ে, ইতিহাসে এম.এ. পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণিতে ত্রয়োদশ স্থান। আশুতোষের কৃপা ছাড়া অর্থনীতির এম.এ. তেও নাকি প্রথম শ্রেণি জুটত না। এসব মিলে-মিশেই কি গড়ে ওঠে তাঁর মতো ব্যক্তিত্বের উপক্রমণিকা? ধূজটিপ্রসাদের বুদ্ধিবাদ কি স্বপ্রতিষ্ঠার উপকরণ সাজায় ছকে ঢালা সফলতম ছাত্রের ব্যতিক্রম থেকে? পরীক্ষার্থীর বেনিয়ম থেকে? দীর্ঘ কর্মজীবনের শেষদিনের ডায়েরিতে আছে ‘নানা বিষয়ে বই পড়েছি, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, সাহিত্য, চারুকলা ইত্যাদি। কিছু বিজ্ঞানও। কেন পড়েছি তা জানি না। ভালো লেগেছে তাই পড়েছি—পড়বার জন্য পড়িনি’ অথবা ‘লেখায় বাক্য...আমি বাঁধি না-চলি...চলার পথে অনেক দুঃখ এসে জোটে। দুঃখ ঠিক বলব না, বলব বাধা-বিপত্তি।’ (ঝিলিমিলি, ৪-৩, ২-য় সম্ভার, পৃ ২১৭)।

এই বিপত্তির সূচনা কি ইংরেজিতে আর সংস্কৃতে সর্বোচ্চ নম্বর সম্বন্ধেও এন্ট্রান্স পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণতায়? ওই ফলাফল কি নির্দেশ করে পড়ার জন্য না-পড়ে ভালো লাগার জন্য পড়াকে? পরীক্ষার চালটাকে অস্বীকার করে প্রকাশভঙ্গির কোনো বাঁধনছাড়া চলনের ইঙ্গিতকে? ধূজটিপ্রসাদের মৃত্যুর পরবর্তী সাড়ে-চার দশক জুড়ে তাঁর দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় একটা প্রবণতা কোনো কোনো ক্ষেত্রে বড়ো হয়ে উঠেছে। তা হলো অনুসন্ধিৎসু প্রকৃত শিক্ষার্থী আর সফল পরিক্ষার্থীর বিরোধ। গত শতাব্দীর প্রথম-দ্বিতীয় দশকে ধূজটিপ্রসাদের পরীক্ষার্থীজীবনের অমসৃণতা কি এই পরবর্তী প্রবণতার অনুকূলে কোনো যুক্তি তৈরি করে? গড়ে তোলে ওই ভবিষ্যৎ-প্রবণতার কোনো ইঙ্গিত? শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে তাদের কার্যকরণ মিলিয়ে মিলিয়ে পাঠের নতুন বিশ্বনির্মাণ, সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগ গুলোর সীমানা ঘেরাটোপ ভেঙে ভেঙে মননের, চিন্তার পরম মুক্ত এক আকাশের অঙ্গীকার—এসব দিশা তো আজ আন্তর্জাতিক স্তর থেকে ধূজটিপ্রসাদের দেশের বুদ্ধিবাদেও মিশতে চাইছে। তাঁর নিজের ধরনে এই সমন্বয়কেই অস্বিষ্ট মেনেছিলেন ধূজটিপ্রসাদ। ১৯৫৫ সালের ২৩ নভেম্বর ডায়েরি শুরু করছেন এইভাবে :

ডবলিউ.এ. লিউইস-এর ‘দি থিওরি অব ইকনমিক গ্রোথ’ ও টি. আর. ডি. মূর্তির ‘দি সেট্টাল ফিলসফি অব বুদ্ধিজিবিম্’ শেষ করলাম। সকালে ইকনমিক্স, আর বিকেলে ও সন্ধ্যায় বৌদ্ধ দর্শন। এইপ্রকার শ্রমবিভাগে আমার শরীর ও মন ঠিক থাকে। (মনে এলো, ওই, পৃ ৯০-৯১)।

পূর্বোক্ত ওই সমন্বয়ের সাধনাই যে ধূজটিপ্রসাদের ব্রত, তার প্রমাণ অজস্র ছড়িয়ে আছে তাঁর রচনায়, দিনলিপিতে, চিন্তায়। এই সাধনায় তিনি যে তাঁর সমকালের থেকে কিছুদূর এগিয়ে রয়েছেন, এমন চৈতন্যে কি রিস্ত ছিলেন না ধূজটিপ্রসাদ? সেখানেই কি তাঁর জীবনচরণে দুর্বিনয় আর বিনয়ের জোয়ার-ভাটার সংগতি? সংগীত-সম্মেলনে সভাপতি হয়েছেন তিনি; কিন্তু সভাপতিত্বের আমন্ত্রণ দুরের কথা, *রিয়ালিস্ট-অন্তঃশীলা-আবর্ত-মোহানা*-র রচয়িতা সাহিত্য-সম্মেলনে যোগদানের আমন্ত্রণটুকুও পাননি কখনো। অথচ তিনি আলিগড়ে থাকাকালীন

সেখানে প্রবাসী বাঙালির সাহিত্য-সম্মেলন বসেছে দু-দুবার। এনিয়ে ধূজটিপ্রসাদের দুঃখবোধ ছিল। আবার ভেবেছেন, ‘মন থেকে এই ধরনের self-pity সম্পূর্ণভাবে ঝেড়ে ফেলতে হবে।’ (কিলিমিলি, ওই, পৃ ২৭৩, ২৬১)। এখানেও হয়তো প্রখর আত্মবিশ্বাস আর ভব্য বিনয়ের টানাপোড়েন। এমন সব অভিমানের মুহূর্ত আর তার উপশমনের আয়োজনও ছুঁয়ে থাকে বুদ্ধিবাদীর বৃহত্তর বেদনাকে, আরো বড়ো কোনো প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির আবর্তকে।

মরণের শব্দ জীবনের ঋণবোধ

১৯২২ সালে লঙ্কৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি পাওয়ার কয়েকবছর আগেই ধূজটিপ্রসাদ বিবাহ করেন। সেটা ১৯১৯ সাল। পাত্রী প্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা ছায়া দেবী। শ্বশুর-শাশুড়ির পর্যাণ্ড স্নেহশীলতার কথা ছায়া দেবী বলতেন। আরো বলতেন যে, সাবেককালে যৌথপরিবারের বড়দার আসনটি ধূজটিপ্রসাদের বড়ো প্রিয় ছিল। আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সদ্ব্যবহার, সকলের সঙ্গে হাস্যপরিহাস, অভ্যাগতের আপ্যায়ন, এসবই ছিল তাঁর একান্ত পছন্দের। ১৯১১ থেকে ১৯৩১ পর্যন্ত এই পরিবারটির কেটেছে অখিল মিস্ত্রি লেনের ভাড়াবাড়িতে। ১৯৩২ সালে বালিগঞ্জে বাড়ি করে, সেই নতুন বাড়িতে মায়ের সঙ্গে, ভাইদের সঙ্গে, পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে খুব আনন্দে কাটাতেন ধূজটিপ্রসাদ (‘স্বীর চোখে ধূজটিপ্রসাদ’, প্রসঙ্গ: ধূজটিপ্রসাদ, জলার্ক, পৃ ২১০-১১)। বালিগঞ্জের এই বাড়ির ঠিকানা ছিল ১৯ একডালিয়া রোড। বহুদিন পর্যন্ত ধূজটিপ্রসাদের এই পরিবারের আনন্দের কেন্দ্র ছিল বালিগঞ্জের বাড়ি। ১৯৫৪ সালে বাড়িটি বিক্রি করা হয়।

ধূজটিপ্রসাদের বন্ধু আর পরিচিতজনের পরিমণ্ডলটি ছিল বিরাট। হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের কথা আগেই বলেছি। অর্থনীতিতে এম.এ. পরীক্ষার শেষদিনে পরীক্ষাকেন্দ্রের তাঁরই হায়েত খাঁ লেনের বাড়ির উঠানে চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়েছিলেন ধূজটিপ্রসাদ। ‘কিরে, কেমন হলো’ প্রশ্নটি তাঁরই করা, জীবনের দ্বিতীয় ইংরেজি বই *Basic Concepts in Sociology*-র উৎসর্গপত্রে লেখক তাঁরই উদ্দেশে বলেছিলেন ‘To H.C. my best’। রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য ছিলেন ধূজটিপ্রসাদ। যতদিন তিনি কলকাতার স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন, নিয়মিত দেখাশোনা হতো রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। খুবই সম্ভব, *সবুজপত্র* -র আসরে পরিচয়ের সূচনা, তারপর সংগীতের আলোচনা, সাহিত্যের বিশ্লেষণ সে-পরিচয়কে ঘনিষ্ঠ করে। (অলোক রায়, *ধূজটিপ্রসাদ*, পৃ ২৬)। *কথা ও সুর* -এর উৎসর্গপত্রটি একান্ত আন্তরিক। দিলীপকুমার রায় আর তাঁর গানের প্রসঙ্গ ফিরে ফিরে এসেছে ধূজটিপ্রসাদের দিনলিপিতে। যেমন,

বিলেত থেকে ফিরে আসার সময় ও তার পরে যে গান (দিলীপ) গাইত তার তুলনা নাই। বিশেষত তার বাবার গান—‘আজ তোমার কাছে ভাসিবে যায় অন্তর আমার’—এর কি তুলনা মিলবে? ‘রাঙা জবা’ গাইবার সময় ফুল ফুটিয়ে দিত। (কিলিমিলি, র-৩ ২য় সত্তার পৃ ২৮২)।

কিন্তু ওই উৎসর্গ যেন সব মতভেদ, সব নিন্দা-প্রশংসার উর্ধ্বে, পোশাকি আচরণবিধি পেরিয়ে ‘মন্টু’র সঙ্গে ‘ধুকু’র সখ্যের দলিল। কত গানের মানুষই না আনুকূল্য পেয়েছেন ধূজটিপ্রসাদের। শতীন দেববর্মনের তেমন প্রাপ্তির স্বীকৃতি নথিভুক্ত আছে ধূজটিপ্রসাদের জীবনীতে (অলোক রায়, *ধূজটিপ্রসাদ*, পৃ ৩৭-৩৮)। শেষজীবনে, দেবাদুন-বাস-কালে রেডিওতে সাড়ে-আটটার সংগীতানুষ্ঠান শুনতেন ধূজটিপ্রসাদ : ‘...সেয়াল গান হয় ...দ্বিতীয় শ্রেণীর...অস্থায়ীর দিকটা

ঠাসা, তারপর গঠন নিতান্ত দুর্বল। এভুল মারাঠিরা করে না... গোড়া থেকে শেষপর্যন্ত বাঁধা-ছাঁদা...ফলে একটু mechanical হয় অবশ্য।' এইসময়েই একদিন সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়ের হিন্দি ভজন শুনে মুগ্ধ হলেন—অজানা গায়ক, কিন্তু যেমন হিন্দি, তেমন গান। (কিলিমিলি, ৩-৩ ২-য় সপ্তার, পৃ ২৮১-৮২)। অর্থাৎ প্রকৃত আগ্রহীর নিয়মেই কোনো ভালো-লাগা বা মন্দ-লাগা ধূজটিপ্রসাদের ক্ষেত্রে পূর্বনির্ধারিত ধারণা মেনে চলত না। তাঁর পরিচিত গুণীজনের সংখ্যাধিক্যের এও এক কারণ। তিনি যেমন স্ত্রী, তেমনি যথার্থ রসিকও বটে।

প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় কলকাতার ১নং ব্রাইট স্ট্রিটের কমলালয়ে বসত সবুজপত্রের আড্ডা। অতুলচন্দ্র গুপ্ত, কিরণশংকর রায়, সতীশচন্দ্র ঘটক, সত্যেন্দ্রনাথ বসু (তাঁর অবশ্য একটি লেখাও সবুজপত্র-এ বেরয়নি), ধূজটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বিশ্বপতি চৌধুরী, হারীতকৃষ্ণ দেব, বরদাচরণ গুপ্ত, প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়, সুবোধ চট্টোপাধ্যায়, সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়রা এই আড্ডার নিয়মিত অংশীদার। এখানেও তৈরি হয় লেখক-বন্ধুর একটি গোষ্ঠী। ধূজটিপ্রসাদেই ভাষায় 'বখা ছেলে, কুস্তিগির-খেলোয়াড়, গাইয়ে-বাজিয়ে থেকে সাহিত্যিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের রত্ন সবাই আসতো।' এদলের প্রধান মানসিক ধারা হল বুদ্ধিবাদ এবং ব্যক্তিস্বাভিত্ত্য। ১৯৩৮ সালে সেই প্রথম যৌবনের স্মৃতির একান্ত নির্মোহ রোমন্থন করেছেন ধূজটিপ্রসাদ

বুদ্ধিবাদ অর্থে (১) চরিত্র-শক্তি, ইচ্ছাশক্তির অপেক্ষা বুদ্ধির প্রাধান্য স্বীকার, (২) বুদ্ধির পরিচয় তর্কে, (৩) যে-তর্কের গোটাকয়েক রীতিনীতি আছে, এবং (৪) যার সাধারণ অন্তিহের জন্য আপেক্ষিকতার হাত থেকে, বাস্তবিকতার কবল থেকে, সাময়িকতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হওয়া যায়।... যেটা সাধারণ... (সাধারণের বুদ্ধি আছে সবুজপত্রের দল স্বীকার করেনি কখনও), সেটা মুক্ত। এই স্বাধীনতা থেকে আমরা অনুমান করেছিলাম যে, লেখক কর্মজীবনে কাকুর দাসত্ব করবে না, সাহিত্যিক-জীবনে সর্বদাই সমালোচনা করবে। সমালোচনার বিষয়...সমাজই ছিল প্রধান। পলিটিকস-এ আমাদের আগ্রহ ছিল না, তার বদলে পলিটিক্যাল গৌড়ামি, ধর্মের গৌড়ামি, এমনকী বিজ্ঞানের, দর্শনের।... লেখাষ এসেছিল ফুটি, এবং সাহিত্যে এল প্রবন্ধ, সর্ববিষয়ে জ্ঞানবার আগ্রহ।...তার বিপদও ছিল যথেষ্ট, হালকা বেহায়াপনা তার মধ্যে সবচেয়ে কম। সবচেয়ে বেশি ছিল জীবন থেকে, বিশেষত সামাজিক জীবন থেকে বিচ্ছাতি। বুদ্ধির চর্চায় আমরা বৃত্তচ্যুত হয়ে পড়ি। বুদ্ধিবাদের সর্বনাশ এ করেই ঘটে, আমরাও বাদ পড়িনি। ('নতুন ও পুরাতন', বক্তব্য, ৩-২ পৃ ১৮০-৮১)।

কল্লোল-এও ধূজটিপ্রসাদ লিখেছেন। তবে তৎকালীন পাঠক তাঁকে অনেক বেশি পেয়েছেন উত্তরা পত্রিকার নিয়মিত লেখক হিসেবে। যে রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের আগ্রহ আর আনুকূল্য লক্ষ্মী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে যাওয়ায় ধূজটিপ্রসাদের বিশেষ সহায় ছিল, তিনি এবং রাধাকুমল মুখোপাধ্যায় ছাড়াও উত্তরা-র নিজস্ব প্রাবন্ধিক গোষ্ঠীতে ছিলেন গোপীনাথ কবিরাজ, নলিনীকান্ত গুপ্ত, অমৃতলাল শীল, অরিনাশচন্দ্র মজুমদার এবং দিলীপকুমার রায়। উত্তরা প্রসঙ্গে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের লেখায় আছে, সে-পত্রিকার দুই নিজস্ব লেখকের কথা—দুজনেই পণ্ডিত এবং শিক্ষাদাতা, দুজনের কারো কলমেই এতটুকু জং ধরেনি, কলমে যেমন বুদ্ধির ধার, তেমন ভাবের জেমা। একজন বাক্যকুশল ধূজটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—লক্ষ্মী-এর, অন্যজন সুমিতাক্ষর মহেন্দ্রনাথ রায়—কাশীর। দুজনেই আসর-জমানো মজলিসি লেখক, দুজনেই আধুনিকতার পৃষ্ঠপোষক। সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর এই উত্তরা-র লেখক তালিকায় ক্রমে ক্রমে যোগ হলো নজরুল ইসলাম, জগদীশ গুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রবোধ

সান্যাল, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর নাম। (অলোক রায়, *ধূজটিপ্রসাদ* পৃ ৩৯-৪০)। সঞ্জয় ভট্টাচার্যর *পূর্বাশাতেও* পাওয়া যায় ধূজটিপ্রসাদের লেখা।

ধূজটিপ্রসাদকে উৎসর্গীকৃত সুধীন্দ্রনাথ দত্তের স্বগত আর সুধীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করা ধূজটিপ্রসাদের *আবর্ত*-র দেওয়া-নেওয়ায় যে সখ্যের মূর্তি, তার বিকাশ অনেকখানি ঘটেছিল *পরিচয়* পত্রিকাকে কেন্দ্র করে। ১৯৩১-এ সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সম্পাদনায় পরিচয়-এর সূচনা। সুধীন্দ্রনাথের মূল সহযোগী নীরেন্দ্রনাথ রায় এবং গিরিজাপতি ভট্টাচার্য। লঙ্কৌ-এর ধূজটিপ্রসাদ কলকাতায় এলেই *পরিচয়*-এর বৈঠকে যোগ দেন। এ'পত্রিকার নিয়মিত লেখকদের মধ্যে, হীরেন্দ্রনাথ দত্তকে বাদ দিলে, একমাত্র তাঁরই পরিচিতি আছে। বাকি সকলেরই প্রায় হাতে খড়ি *পরিচয়*-এ। ১৯৩০ সালে গিরিজাপতি ভট্টাচার্যর সূত্রে সুধীন্দ্রনাথ-ধূজটিপ্রসাদের পরিচয়। ১৯৩৭-এ *আবর্ত*, ১৯৩৮-এ স্বগত। তাঁদের রাজনৈতিক মতৈক্য ছিল না, কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের স্ট্যাগার্ড যে কতখানি উঁচু ছিল, তিনি যে সেই উচ্চতায় পৌছানোর অঙ্গীকার নিয়েই *পরিচয়*-কে নিয়মিত গল্প, প্রবন্ধ, পুস্তক পর্যালোচনা দিয়েছেন, একথা ধূজটিপ্রসাদের নিজের লেখাতেই আছে। ধূজটিপ্রসাদ *পরিচয়*-এর প্রথম সংখ্যার একমাত্র গল্পলেখক। প্রথম বছরের অন্যতম প্রাবন্ধিক এবং গ্রন্থসমালোচক। *সবুজ পত্র* অথবা *উত্তরা*-র সূত্রে উচ্চারিত হয়নি এমন বহু প্রাবন্ধিকের নাম পাওয়া যায় *পরিচয়*-এর প্রথম বছরে, যেমন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, সুশোভন সরকার, সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রলাল রায়, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র দত্ত, অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ রায়, নলিনীকান্ত গুপ্ত, প্রবোধচন্দ্র সেন, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। *সবুজপত্র*-এর অন্যতম লেখক অতুলচন্দ্র গুপ্ত এবং *উত্তরা*-র সম্পাদক সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীও ছিলেন *পরিচয়*-এর প্রথম বছরের প্রাবন্ধিক। দ্বিতীয় সংখ্যাতোই বেরিয়েছিল প্রথম চৌধুরীর গল্প। ধূজটিপ্রসাদই *সবুজপত্র* আর *পরিচয়*-এর সেতুবন্ধনে আদত ভূমিকা নিয়েছেন, এরকমই তখনকার প্রচলিত ধারণা (অলোক রায়, *ধূজটিপ্রসাদ*, পৃ ৪০-৪২)। সুশোভন সরকারের লেখায় আছে :

ধূজটিপ্রসাদ সুধীন্দ্রনাথের খুব অনুরক্ত ছিলেন এবং হয়তো সেই জন্যই পরিচয় যখন সুধীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে হস্তান্তরিত করলেন নতুন পরিচয়ের সঙ্গে ধূজটিপ্রসাদ কেনদিনই নিজেকে ঠিক মিলিয়ে নিতে পারেননি, তিনি বৈঠকে আসাও একরকম বন্ধ করে দিয়েছিলেন এবং পরিচয়ের নতুন কর্তৃপক্ষের সংগে খুব ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখেননি।...সাংসারিক কয়েকটি ব্যাপারে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সংগে তাঁর আগেকার বন্ধুবান্ধবদের একদম বিচ্ছেদ এসে পড়ে। সুধীন্দ্রনাথের জীবনযাত্রার ধরনও একেবারে পাল্টে যায়। পরিচয়ের পুরনো বন্ধুবান্ধবদের সংগে তাঁর সম্পর্ক শিথিল এমন কি ছিন্ন হয়ে যায়...এই বিচ্ছেদ ধূজটিপ্রসাদের কাছে অত্যন্ত মর্মান্তিক হয়েছিল বলে আমার বিশ্বাস। তিনি না পারতেন সুধীন্দ্রের নতুন ধরনের জীবনযাত্রা সমর্থন করতে, অন্যদিকে সুধীন্দ্রকে বর্জন করাও তাঁর পক্ষে দুঃসহ হোত। আমার মনে হয় এই ব্যক্তিগত ট্রাজেডি ধূজটিপ্রসাদকে পরিচয় থেকে দূরে সরিয়ে দিতে অনেকটা সাহায্য করেছিল (সুশোভন সরকার, 'স্মৃতিচারণ', *প্রসঙ্গ : ধূজটিপ্রসাদ*, জলার্ক, আশ্বিন ১৩৯২ব, পৃ ৩)।

আগেই বলেছি অধ্যাপনার জীবনেও ধূজটিপ্রসাদ ছিলেন একান্ত বিশিষ্ট। ছাত্রদের কাছে তাঁর বিশেষ জনপ্রিয়তার কারণ খুঁজতে খুঁজতে মূলক রাজ আনন্দ ছাত্রদেরই দেওয়া সম্ভাব্য কয়েকটি ব্যাখ্যা নির্দেশ করেছেন। যেমন, 'তার অসামান্য বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য, বহুপঠন, সত্যানুসন্ধিৎসা, সর্বোপরি সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যকর্মের প্রতিভা...সব মিলিতভাবে ধূজটিপ্রসাদের ব্যক্তিত্বের প্রকাশ।

সচরাচর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটি গুণ থাকলেও, তাঁদের অধ্যাপনার মধ্যে ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটে না, ফলে প্রধানুগত্যের দাসত্বই শিক্ষার প্রকৃত তাৎপর্যকে ব্যর্থ করে দেয়।' (অলোক রায়, *ধূজটিপ্রসাদ*, পৃ ১৬-১৭)। লক্ষ্মী বিশ্ববিদ্যালয়ে ধূজটিপ্রসাদের অন্যতম সহকর্মী অর্থনীতিবিদ ভি.বি.সিং-এর মতে, ধূজটিপ্রসাদ বিভাগীয় প্রধান হিসেবে ছিলেন গণতান্ত্রিক পরিচালকের মতো, আদৌ আমলাতান্ত্রিক ওপরওয়ালার মতো নয়। তিনি পছন্দ করতেন স্বাধীন অনুসন্ধান; তিনি বিশ্বাস করতেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিভাগ কখনোই কোনো সচিবালয়ের শাখার মতো চলতে পারে না। এখানেই ছিল তাঁর সাফল্যের সূত্র। সহকর্মীদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত খোলামেলা। প্রত্যেকের বউ-ছেলে-মেয়ের সঙ্গে পরিচয় ছিল তাঁর (ওই, পৃ ৫৪)। অনেক দেরিতে হলেও, ধূজটিপ্রসাদ যে লক্ষ্মীতে প্রোফেসর-পদটি পেয়েছিলেন, তাঁর মূলে ছিল তৎকালীন উপাচার্য নরেন্দ্র দেবের আগ্রহ। সেই যে 'খোঁজ পরিষদ আয়োজিত সেমিনারে অংশ নিতে কলকাতায় এসেছিলেন ধূজটিপ্রসাদ, সে-যোগদানের পিছনেও নরেন্দ্র দেবের অনুরোধ এবং আগ্রহ থাকা একান্তই সম্ভব। যে অধ্যাপক জাকির হোসেনের ডাকে ধূজটিপ্রসাদ আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান হিসেবে, তিনি মনে করতেন যে, ধূজটিপ্রসাদকে বন্ধু এবং সহকর্মী হিসেবে জেনেছেন, এ তাঁর পরম সৌভাগ্য। তাঁর উপস্থিতিই পারত, একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃজনশীল বুদ্ধিবাদী পরিমণ্ডলকে বাড়িয়ে দিতে। বিপুল জ্ঞান, আশ্চর্য সংবেদনশীলতা এবং অতুলনীয় সততা ধূজটিপ্রসাদকে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরিহার্য করে তুলেছিল। এই আলিগড়েই বিভিন্ন সময়ে তাঁর সহকর্মী ছিলেন নুরুল হাসান, অমলেন্দু বসু, হাবিব আবু সালিম, খালিক নক্ভি আর মুন্সি রাজার মতো বুদ্ধিজীবীরা। (ওই, পৃ ৫৮)।

সবুজপত্র-এর আমল প্রসঙ্গে বলতে বলতে ধূজটিপ্রসাদ বড় সুন্দর বিন্যস্ত করেছিলেন তাঁদের যৌবনের চরিত্র :

হিলাম এককথায় 'ফাজিল' ছেলে...পাঠ্যপুস্তক পড়তাম না, বাজে বই পড়তাম, যা পড়তাম তার চেয়ে বেশি কিনতাম, তারও বেশি ঘাটতাম, ও আরো বেশি 'চাল' দিতাম। টাকার ভাবনা এক হিসেবে ছিল না কেবল বাবা...মা চা চপ-কাটলেট, দর্জি ও বইএর দোকানে'র বিল শোধ দেবার সময় রাগারাগি করতেন...পড়াশুনার সঙ্গে চাকরির সম্বন্ধ আমার অজ্ঞাত ছিল। ভালো ছেলের সঙ্গে যেমন মিশেছি, বখা ছেলের সঙ্গে তেমনই, বোধ হয় একটু বেশি প্রাণ খুলে। একটা গোড়ামি ছিল চরিত্র সম্বন্ধে। গান শিখতাম ও ভালবাসতাম, তবে প্রপদ—তার নীচুতে নামিনি। থিয়েটার খেলাধুলোর শখ ছিল। মেয়েদের সঙ্গে মিশেছি, তবে আগ্রহ ছিল না লোভ তো নয়ই। বন্ধুত্ব করেছি প্রাণডরে... রোমাঞ্চ প্রধানত ওদেরই সঙ্গে...কল্পনা-বিলাসী হিলাম না তবে কল্পনা ছিল L...বাংলা বই' বলতাম বাংলা সাহিত্য বলতাম না। স্বদেশী যুগে 'বন্দেমাতরম্' গেয়েছি বটে...মনে ধরেনি। লাঠি বেলা, সাঁতার দেওয়া, গাছে চড়া, স্বেচ্ছাসেবক হওয়া, বন্যাপ্রাণিড়িতের উদ্ধার, গ্রাম-উদ্ধার, নাইট-স্কুল, ইংরেজীতে বক্তৃতা—কিন্তু বাদ দিইনি বটে, কিন্তু ছজ্জুকে পড়ে। মোন্দা কথা পলিটিক্যাল জীব হিলাম না। (নতুন ও পুরাতন, *বক্তব্য*, ৯-২, পৃ ১৭৮-৭৯)।

নিজের স্বভাবসুলভ কৌতুক, আপাতবিনয় আর প্রচ্ছন্ন অহংবোধ মিশিয়ে তাঁর পড়াশোনার যে-ছবি এখানে তৈরি হয়, তার স্বরূপকে আয়ত্তে পেতে পাঠক খুঁজে দেখতে পারেন ধূজটিপ্রসাদের দুটি দিনলিপি, অজস্র আলোচিত বই, আটটি ইংরেজি (যদি ১৯৪৬-এ বোম্বাই-এর 'হিন্দী কিতাবস' থেকে প্রকাশিত *Problems of Indian Youth*-কে বাদও দিই, কারণ তার কোনো

হৃদিস এখানো করা সম্ভব হয়নি) প্রবন্ধের বই, পাঁচটি বাংলা প্রবন্ধগ্রন্থ এবং বহু অগ্রস্থিত প্রবন্ধ। যদি সেখান থেকে বানানো যায় তাঁর পড়া বইয়ের তালিকা, সেটাই কিন্তু একটি পুস্তিকার আকার নেবে। তাঁর ফুটবলপ্রীতির কথা স্পষ্টই আছে ডায়েরিতে। উৎপল দত্তের অঙ্গার দেখেছিলেন তিনি, তখন তাঁর শরীর যথেষ্ট ভেঙে গেছে। খুশি যে হয়েছিলেন, তার প্রমাণ ১৯৬০ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারির দিনলিপি। ('ঝিলিমিলি', র-৩ ২-য় সম্ভার, পৃ ৩০১-০২)। আছে বঙ্কমণ্ডীর *পুতুল খেলা* নাটক দেখার কথা (ওই, পৃ ২১৮), আছে গিরীশ ঘোষ, দানীবাবুর অভিনয়ের প্রসঙ্গ, সে-অভিনয় যে গগন ঠাকুরদের পছন্দ ছিল না, সে-ব্যাপারে ধূজটিপ্রসাদের মতভেদের ইঙ্গিতও মেলে; স্পষ্ট বলেছেন শিশিরকুমার ভাদুড়ী তাঁর বিচারে দেশের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা—'অভিনয় কলা, অভিনয়ের অভিব্যক্তি ও রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসের দিক থেকে' ('মনে এলো', ওই, পৃ ৭০-৭২)। এসেছে বিনোদিনী, তিনকড়ি, নরসুন্দরী, সুশীলা, চারুশীলা, নীরদা, প্রভা, কঙ্কার কথা, পরের জমানার মলিনার কথা (ওই, পৃ ৭৩), আছে অমৃতলাল বসুকে নিয়ে চমকপ্রদ দু-একটি গল্প (*ঝিলিমিলি*, ওই, পৃ ২২০-২১)। তবে প্রাসঙ্গিক মতপ্রকাশে ধূজটিপ্রসাদের চরিত্রটি দিনলিপির একজায়গায় স্বতঃস্ফূর্ত মূর্ত হয়েছে :

For whom the bell tolls—এ ক্যাটারিনা যখন মেরিয়া অভিনয় করলেন তখন ধন্য ধন্য পড়ে গেল। আর চুণিবাবুর কিই বা খাতির হয়েছে? কেসুরোয় 'দিন তো গেল সন্ধ্যা হলো পার কর আমারে' কেউ গাইতে পারেন? রান্ধেস-খোকোসের গল্প কেউ করতে পারেন ঐভাবে? 'ও বৌ হলো কি—হলো কি—হলো কি?' তিনবার তিন পর্দায়?...একটা প্রকাশ সভা হোক, পাঁচ হাজার টাকা চাঁদা তোলা হোক, আর সেই টাকা শিশিরবাবু চুণিবাবুর হাতে তুলে দিন!...আমার মতে আমাদের দিল নেই। অথচ কালপ্রিয় জ্ঞাত নাকি! অবশ্য খানিকটা তো বটে। বাংলায় কত ভালো অ্যামেচার অভিনেতাই না হয়েছে! শম্ভু মিত্রের দল বঙ্কমণ্ডী চমৎকার অভিনয় করে। নতুন যা দু-একটা দেখলাম তা খুবই আশাপ্রদ। I.P.T.A ভেঙে যাওয়া (দেওয়া?) অন্যায় হয়েছে। সরকার পেছনে লাগলো। বিরাট মূর্খতা। Youth Festival, Children's Theatre শুরু হয়েছে। চমৎকার! কিন্তু ছেড়ে দিয়ে তেড়ে ধরা গোচ্ছেন... কান্সর করতে হয় তো আমরাই করছি, আমরাই করবো। কেমন যেন খারাপ লাগে!...মনে পড়ে পুরানো ধরনের শাস্ত্রীদের ব্যবহার। ('মনে এলো', ওই, পৃ ৭৪)।

এখানেই শেষ নয়। চিত্রকলা ভাস্কর্যেও ধূজটিপ্রসাদের আগ্রহ ছিল রবীন্দ্রনাথ, অমৃতা শেরগিল, হসেন কিংবা সতীশ গুজরালের ছবি নিয়ে, শম্ভু চৌধুরির ভাস্কর্য নিয়ে বক্তব্য আছে দিনলিপির পাতায় (ওই, পৃ ১২৬-২৭)। আর নন্দলালের ছবি যে তাঁর একান্ত প্রিয় ছিল, তার প্রমাণ তো *অন্তঃশীলা* উপন্যাসের অন্তিমে ঋগেনবাবুর পত্রের একেবারে শেষ বাক্যগুলিতে ছড়িয়ে আছে। এ প্রসঙ্গে 'রবীন্দ্রনাথের চিত্র'র (বক্তব্য, র-২, পৃ ৮৪-৮৮) মতো প্রবন্ধ ছাড়াও *Anjali*-র প্রাক্কথনের কথা আগেই বলেছি। (অলোক রায়, *ধূজটিপ্রসাদ*, পৃ ১১২)। ১৯৫৫ সালের ১২ সেপ্টেম্বরের দিনলিপিতে যামিনী রায়কে নিয়ে লেখা কথাগুলি মনে রাখবার মতো ('মনে এলো', র-৩, ২য় সম্ভার, পৃ ৪৮-৫০)। আর সংগীত? *সুর ও সংগতি*, *কথা ও সুর* এবং তার বাইরে বেশ কিছু অগ্রস্থিত সাস্রীতিক প্রবন্ধ যখন পাঠকের অভিজ্ঞতার অংশ, তখন নতুন আর কীই বা বলা যায় ধূজটিপ্রসাদের সুরের জীবন প্রসঙ্গে? সোরিমিএগর টপ্পা ভেঙে নিধবাবুর সৃজন, যদুভট্ট, গোসাঁইজি নিয়ে তাঁর আলোচনা হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে স্মৃতি রোমন্থন করছেন ধূজটিপ্রসাদ ১৯৫৯ সালের ২১ জুলাই; সঙ্গে আছে খেদ—রবীন্দ্রনাথ কখনো ভীষ্মদেবের গান শোনেননি। সেই বছরই ২৯ এপ্রিল রেডিওতে বড়ে গোলাম আলির

গান শুনে করছেন নিসার হসেন খাঁ আর পলুস্কারের চলন আর বিস্তারের তুলনা। স্মরণ করেছেন আমীর খাঁর অস্থায়ী। লিখেছেন কৈসার বাঈ ছাড়া বাকি আর কেউ অর্থাৎ ফৈয়াজ, আবদুল করিম, নসিরুদ্দীন, রজ্জব আলি, ওয়াহিদ খাঁ কেউই গান গাইতেন না, গাইতেন রাগ। ফৈয়াজ ইচ্ছা করলে পারতেন গান গাইতে, তবু গেয়েছেন শুধু রাগই। আর বড়ে গোলাম আলির পরেই গাইয়ে হিসেবে ধুজ্জটিপ্রসাদ জায়গা দিয়েছেন ভীমসেন যোশীকে। (বিলিমিলি, র-৩ ২-য় সম্ভার, পৃ ২৫৫-৫৬, পৃ ২২৯)। ১৯৫৬ সালের দিনলিপিতে আছে ওঙ্কারনাথ ঠাকুরের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবার স্মৃতি (মনে এলো, ঐ, পৃ ১৮২)। আর এতগুলি সাংগীতিক প্রবন্ধের প্রণেতা ১৯৫৬র ১৭ জানুয়ারি ডায়েরিতে লিখেছেন ‘সঙ্গীত-আলোচনা কথার মারফত হয় না ঠিক।’ (ওই, পৃ ১২৬)।

ধুজ্জটিপ্রসাদের পুত্র কুমারপ্রসাদ পিতার সাংগীতিক উত্তরাধিকার বহন করেছেন পরম ব্যুৎপত্তির সঙ্গে। সুরের প্রসঙ্গে তাঁর জ্ঞান, বস্তুব্য, একাধিক গ্রন্থ আজকের পাঠকমহলে, সুরশ্রোতামহলে সুবিদিত। ধুজ্জটিপ্রসাদ-ছায়া দেবীর একমাত্র সন্তান কুমারপ্রসাদের জন্ম ১৯২৭ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি। পিতার দিনলিপিতে অবশ্য পুত্রের যে উল্লেখ পাই, তা সংগীতের তেমন সংলগ্ন নয়। ১৯৫৫-র ২৭ ডিসেম্বর ধুজ্জটিপ্রসাদ লিখেছেন :

কুমারের ধারণা যে, ‘মনে এলো’র কিছুকিছু অংশ অস্পষ্ট ও খাপছাড়া হচ্ছে।... ছেলের কাছে সমালোচনা শোনার মধ্যে একটা গৌরববোধ আছে। তার মত এই : যে কালে ‘মনে এলো’ প্রকাশিত হচ্ছে তখন প্রকাশ একপ্রশনের ধর্ম রীতিনীতি মেনে চলতেই হবে—অর্থাৎ যুক্তির ফাঁক থাকলে এমনকী মূল্যবান মন্তব্য ও বস্তুব্যও অসার্থক হবে...যখন প্রকাশিত হচ্ছে, যখন সবলে পড়ক, বুঝক চাইছি তখন আমার আরো বিশদ কবে লেখা উচিত। (ওই, পৃ ১০৮)

পাঠকেরা আদৌ সমজাতীয় নন, একজনের কাছে যা দুর্বোধ্য, আর একতাকে পরম সহজ মনে করতে পারেন—পুত্রের বস্তুব্যের বিরুদ্ধে এরকম যুক্তি তৈরি করেছিলেন ধুজ্জটিপ্রসাদ। কিন্তু যে প্রশ্ন কুমারপ্রসাদ তুলেছিলেন, তা কিন্তু ধুজ্জটিপ্রসাদের রচনার সব থেকে বিতর্কিত-সমালোচিত, আবার হয়তো সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট আঙ্গিক। সে দিনলিপিতেই হোক আর ভারি প্রবন্ধেই হোক, অথবা হোক তা এক বা একাধিক গ্রন্থের পর্যালোচনা, সর্বত্রই ধুজ্জটিপ্রসাদ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সূত্রটিকে বিশদ বিন্যাস থেকে মুক্ত রাখেন। সর্বদাই তাঁর শৈলী ঋজু থেকে আরো ঋজু প্রক্ষেপে আশ্রয় খোঁজে। এই ধরতাই—এর সুবাদেই হয়তো সুশোভন সরকারের মতো নিকটজন এবং নিবিষ্ট পাঠকের ও মনে হয় ‘নিজেকে কখনো commit করলেন না...খুব definite point of view কোথাও দিয়ে গেছেন বলে তো মনে হয় না।’ (সুশোভন সরকার, ‘স্মৃতিচারণ’, প্রসঙ্গ : ধুজ্জটিপ্রসাদ, জলার্ক, পৃ ৫)। কিন্তু ধুজ্জটিপ্রসাদ আমার গণ তাঁর ওই ‘না-বাঁধার’ আর ‘শুধুই চলার’ মূদ্রা থেকে বিচ্যুত হননি। আশ্চর্য যে, ১৯৫৫ সালের ডিসেম্বর মাসে কঠিনালীতে কর্কটরোগের আক্রমণ হলো যখন, তখনও শরীরের যন্ত্রণার কথা বলতে সেই প্রক্ষেপের শৈলী হার মানেন না। যেমন, ‘এক চুমুকে অমলের (হোম) “পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ” শেষ করলাম। গলার কষ্টটা বেঞ্জইন ভেপারে যাচ্ছিলো না, হঠাৎ চলে গেল।’ (মনে এলো, র-৩, ২-য় সম্ভার, পৃ ১৭৮-৭৯)।

বাচনে, বয়ানে, আচরণে এই প্রক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণতা আদৌ কমল না, সুইটজারল্যান্ডের জুরিখে অস্ত্রোপচার সেরে ফিরে এসে মনের জোরে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে পুনরায় যোগ

দেওয়ার পরেও। বরং তা নাকি বেড়েই চলে, আর নামতে থাকে গলার স্বর। চেলাপতি রাউ-এর মতো নিকট সহকর্মী বন্ধুদের সেটাই অভিজ্ঞতা (অলোক রায়, *ধূজটিপ্রসাদ*, পৃ ৭০)। অস্ত্রোপচার ভিন্ন এ রোগের সঙ্গে লড়াই নাকি অসম্ভব। তাই ১৯৫৬-ব ৪ মে ধূজটিপ্রসাদ রওনা হলেন সুইটজারল্যান্ডে জুরিখের উদ্দেশে। ৯ মে ক্যান্টন স্পিটাল হাসপাতালে অস্ত্রোপচার হল। অস্ত্রোপচার সফল হল বটে, কিন্তু ২২ মে তারিখে ঘোরতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন ধূজটিপ্রসাদ। ১৪ জুন পর্যন্ত কোনো জ্ঞান ছিল না তাঁর। নভেম্বরে দেশে ফিরলেন, ফিরেই পড়লেন নিমোনিয়ায়। স্বাস্থ্যের সামান্য উন্নতি হতে হতে ১৯৫৭র ফেব্রুয়ারি। মনের জোরে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে ফিরলেন। ১৯৫৭-য় প্রকাশিত *বক্তব্য উৎসর্গ* করলেন ছায়া দেবীকে। পরের বছর পিপলস পাবলিশিং হাউস প্রকাশিত *Diversities*-এর উৎসর্গ পুত্র কুমারপ্রসাদ এবং ভ্রাতৃপুত্র সৌগতপ্রসাদকে। নিকটজনের প্রতি আচরণে কি এসে পড়ছিল কোনো মায়ার বিন্যাস, কোনো বিরহের পরোয়ানা, যদিও সেই আচরণকে অস্বীকার করতে তখনও তিনি বচনে-লেখনে বেজায় তীক্ষ্ণ, স্বভাবসুলভ প্রক্ষিপ্ত?

বেঞ্জাইন ভেপার আর *পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ* -এর ধূজটিপ্রসাদীয় অংশটির পরেই লেখা হয় :

অমৃতসরে মোতিলালজীর মুকুণ্ডন, রামেন্দ্রসুন্দরের মৃত্যুর কয়েকঘণ্টা পূর্বে রবীন্দ্রনাথের পায়ে ধুলো নেওয়া, সি.এফ. এন্ডরুজের গুরুদেবের চাহনিকে ভয়, শমী ‘তাহার পর আর ফিরিল না’, এগুলো অনন্তমুহূর্ত। এদের ভেতর দিয়ে যে মূল্যজ্ঞান বিচ্ছুরিত হচ্ছে, তাকে সম্মান দেওয়া প্রকৃত শাশ্বততার লক্ষণ। মনে রাখা, মনে করিয়ে দেওয়া—এইটাই ঐতিহ্যের প্রাণ-প্রক্রিয়া। অর্থাৎ কৃতজ্ঞতা। মার্সেল তাকে বলেন উইসডম, আমরা বলি ঋণ-শোধ। (মনে এলো, ২-য় সন্ধ্যা, পৃ ১৭৯)।

তবে কি প্রক্ষেপ থেকে বিন্যাসের দিকে যাচ্ছে ধূজটিপ্রসাদের ব্যক্তিগত দিনলিপি? মনে হয় না। কারণ এই অসামান্য উপক্রমণিকাটি আসলে সেই ১৯৫৬-র ৯ এপ্রিল, অর্থাৎ বিদেশে অস্ত্রোপচার হওয়ার ঠিক একমাস আগে কামুর লেখা নিয়ে মৌলিক চিন্তার উপক্রমণিকা—‘আগামী ইতিহাসের ঋণ পরিশোধ হয় না, চক্রাকারে সুদে বেড়েই যাচ্ছে। পুরনো কথার অর্থ ঋণ পরিশোধের প্রয়াস।’ সেই প্রয়াসের মধ্যেই থাকবে সব কিছু—কামুর ভাষায় ফ্রীডম, রিভোল্ট আর প্যাশান (ওই)। এর মাস দুয়েক আগে, শরীরের অস্বস্তিতে যখনও পর্যন্ত কর্কটরোগ বলে চেনা যায়নি, ডাক্তারের চা-কফি-সিগারেটের নিষেধ নিয়ে ধূজটিপ্রসাদকে চরম ত্রুণ দেখি—‘বলে কিনা ভড়কা সিগারেটের চেয়ে কম ক্ষতিকর। বলে কিনা সিগারেট খেলে ক্যান্সার হবে। আমি সিগারেট খেয়ে ক্যান্সারই করি আর যাই করি, সেটা আমার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, আমার হিউম্যান ডিগ্নিটি, আমার কন্জিউমারস্ সভারেন্টি। ওপ্রকার চিকিৎসা...ভারতবর্ষে চলে, তো লক্ষ্যে-এ কখনও চলবে না। এমন স্বাধীন শহর আর হয় না।’ (ওই, পৃ ৫৬)। এই ৫ই অক্টোবরের ঠিক পনেরো দিন পরে ২০-১০-১৯৫৫তে ধূজটিপ্রসাদ ডায়েরিতে লেখেন :

এই প্রথম স্বাস্থ্যভঙ্গের ভয় পেলাম। মৃত্যু ভয় নয়। বহু মৃত্যু দেখেছি, রাগই হয়েছে বেশি, দুঃখের চেয়ে। বৃদ্ধের মৃত্যু কম দেখেছি বলেই। মৃত্যুর সময় বৃদ্ধ-বৃদ্ধার মুখে একটা বোকামির ছায়া পড়ে, যাকে ভক্তিমত্তে কিংবা স্নেহভরে বলি শান্তি, হাসিমুখ ইত্যাদি। (ওই, পৃ ৭৪)।

এমনই ছিলেন ধূজটিপ্রসাদ। যিনি বুদ্ধিবাদের সর্বনাশের দিকটাও নির্দেশ করতে কুণ্ঠিত নন।

আবার সেই আজীবনের বুদ্ধিবাদের অবলম্বনে যেন নিজের মারণব্যাপ্তিকেও তচ্ছল্য করতে দিনলিপি সাজান। ১৯৫৫-র ৪ ডিসেম্বর, অর্থাৎ যেসময়ে প্রথম তাঁর শারীরিক অস্বস্তিকে কর্কটরোগ বলে চিহ্নিত করা গেছে, সেইসময়েও দিনলিপির পাঠকের মুক্তি নেই তাঁর তীব্র কৌতুকপ্রবণতা থেকে :

ননী (নীরেন) বলে মা হলো খুঁটি। হাঁ, তাঁর মা খুঁটিই ছিলেন, তাঁর একার নয়। অমন মা হয় না।...মনে হচ্ছে বুড়ো হয়ে গেলাম। এত পুরানো কথা মনে আসছে। শরীরটা অতোটা অপটু হওয়া নিবুজির লক্ষণ। ...অসুখের সময় লোকে মাগো বলে কেন? আবার 'ওগো' বলতেও শুনেছি। মা ছেলেকে, স্ত্রী স্বামীকে একটু কাবু হয়েছে দেখতে চান, অসহায় হলে কড়ই ভালো লাগে তাঁদের, কজ্জার মধ্যে এসে গেল। দুর্বলের ধর্ম। কিন্তু কে বলে মা ভূমি অবলে। (ওই, পৃ ৯৯)।

১৯৫৯-এর ৩০ সেপ্টেম্বর আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসরগ্রহণের পরে দেবাদুনে ২২এ মোহিনী রোডের বাড়ির বাসিন্দা হলেন ধুজটিপ্রসাদ। অবসরের পরে যে দেবাদুনে থাকবেন, এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরে ব্যক্তিগত সংগ্রহের বেশ কিছু বই যে তিনি বিক্রি করে দেন, এখনও দিনলিপিতে যোগ করেন যেন একান্তই আবেগবর্জিত বয়ানে। এ বয়ান যে আসলে এক অভিনব আড়াল, পাঠক কি তা অনুভব করতে পারেন, যদি তিনি ডুব দেন দিনলিপির প্রক্ষেপগুলির অন্তর্বর্তী নীরবতায়? ১৯৫৯এর ১৫ মে ধুজটিপ্রসাদ ডায়েরিতে লেখেন, 'আমার চার হাজার বইয়ের মধ্যে ঠিক এক হাজার, শুধু Economics-এর বই বিক্রি করে দিলাম। মাত্র একশ রেখেছি। তার বেশি পড়তে পারব না। তবু প্রিয় জিনিস হাত থেকে বেরিয়ে গেল। একটু আপসোস আছে, ঠিক দুঃখ নেই।' (ঝিলিমিলি, ঐ পৃ ২৩৮-৩৯)। তারপরে স্মৃতি ভর করেছে আজীবন বই কেনার আখ্যান। শিয়ালদা স্টেশনে আট আনায় জর্জ এলিয়টের Adam Bede, প্রথমে কলেজ স্ট্রিট আর বৌবাজারের কোণে সেন ব্রাদার্স, তারপর সে দোকান উঠে আসে প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনে। সেন ব্রাদার্স-এর সঙ্গে লেনদেনের স্মৃতি কলেজ জীবনের থেকে। বুক কোম্পানি, বোম্বাই-এর কোঅপারেটরস বুক ডিপো, আরো কত বই কেনার স্মৃতি—'এত বই জমে গেছে, এত নিয়ে কী করব। অথচ ছাড়তেও মন চায় না। দেবাদুনে বসে মাত্র দু হাজার বই রাখব ভাবছি। আর্ট, সাহিত্য, ইতিহাস এবং সভ্যতা, আর কিছু সামান্য ইকনমিক্স ও সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে। ...বই পড়া weariness of the flesh জানি, কিন্তু না পড়েও ত গতি নেই। প্রায় বছর দুই অকর্মণ্য ছিলাম। এখন আবার যেন ভালোই লাগছে। কাজ না করে থাকতে পারব কি?' (ওই, পৃ ২৩৯)।

মনের সচলতা সত্যিই একটুও কমেনি। ১৯৫৯-এর ১৬ সেপ্টেম্বর লিখছেন, 'ভারত-চীনের ব্যাপারটা হয়ত ঘুচে যাবে। ...ব্রুসডব আমেরিকা যাচ্ছেন, তাতে অবশ্য ফল হবে।...ভারতে culture-lag যেন বেশি...অসম্ভব বোকামি করেছেন এঁরা। ভারতের কম্যুনিষ্ট দল, অন্তত নম্বুদ্রিপাদ সুবুদ্ধির পরিচয় দিলেন এই প্রথম। ১৯৪০ সাল থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত তাঁদের বোকামির অন্ত নেই।' (ওই, পৃ ২৬৩)। আবার আলিগড় ছেড়ে যাওয়ার সময় মনে হচ্ছে, 'পাঁচ বছর রইলাম মুসলমানদের সঙ্গে। লঙ্কো-এও বহু বৎসর। আমি ত কিছুতেই হিন্দু মুসলমানদের পার্থক্য খুঁজে পাচ্ছি না—সবই যুবক, ছাত্র, শিক্ষক। এর বেশি কিছু চোখে পড়েনি। ...একটা নতুন জিনিস উঠছে শুনছি...‘জামাৎ’ অর্থাৎ ইসলামের অভ্যুত্থান। কোনো ধর্মের অভ্যুত্থানই আমার পছন্দ নয়।' (ওই, পৃ ২৬৭)। ছায়া দেবীর কথা থেকে জানা যায়,

পুঞ্জো, অঞ্জলি দেওয়া, ধর্মীয় আচার, এসবে আদৌ যোগদান করতেন না ধূজটিপ্রসাদ। যা যোগদান, সবই সামাজিক আমন্ত্রণে।

২২এ মোহিনী রোডের বাড়ির পাশেই বেদের ঋষিপর্যা নদী, সামনে চারধারে হিমালয় আর শিবালিক। দৃশ্য নাকি অপূর্ব! কিন্তু ২০০২ সালের অক্টোবর মাসে দেবাদুনের ৬৩বি রাজপুর রোডের বাসিন্দা পি.কে. সেনের কাছে জানা গেল, সে বাড়ির নাকি ছিল ভদ্রুর অবস্থা। সার্ভে অভ ইন্সিয়ার মুখ্য চিকিৎসা আধিকারিক অমৃতলাল দত্ত দেবাদুনে ধূজটিপ্রসাদের গৃহচিকিৎসক ছিলেন। ১৯৬১ সাল থেকেই পি. কে. সেনের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। ডাক্তারের মতে, বাড়িটি ধূজটিপ্রসাদের মতো কঠিন রোগগ্রস্ত মানুষের উপযুক্ত ছিল না। দিনলিপিতে বাড়িটির মনোজ্ঞ প্রাকৃতিক পরিবেশ লিপিবদ্ধ করার কয়েকমাসের মধ্যেই ধূজটিপ্রসাদের দিনলিপিতে দেখি :

আমার বাড়ির ওপরই শুকনো নদী, বর্ষা ছাড়া জল থাকে না। জমির ওপর মধ্যে মধ্যে সংস্কার করে; মাটিতে পৌঁতে, মরা পোড়ায়...পুলিসে কিছু করতে পারে না, লুকিয়ে লুকিয়ে কাজ শেষ করে। শেষ আর কী। আধখানা ফেলে চলে যায়। আমার স্ত্রীর অবস্থা ভাবা যায় না। তিন চারদিন মড়ার মতন পড়ে থাকে, এক একবার উঠে নদীর দিকে কাঠের পুতুলের মতন স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। (ওই, পৃ ২৭৭)।

ধূজটিপ্রসাদ শতবর্ষ সংখ্যা দেশপত্রিকায় (৩ জুন ১৯৯৫) অশোক মিত্র ‘ধূজটিপ্রসাদ : কিছু স্মৃতি’ নিবন্ধে ধূজটিপ্রসাদের জীবনযাপনের বিশেষ ধরনটিতে ছায়া দেবীর ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন (দেশ, ৩.৬.১৯৯৫, পৃ ২৮)। লক্ষ্যেতে বাদশাবাগের বাড়ির অতিথি অভ্যাগতের উষ্ণ আপ্যায়নে ছায়া দেবী ছিলেন স্বতঃস্ফূর্ত। কবিতা পত্রিকার সম্পাদক বুদ্ধদেব বসু নাকি দুঃখ করতেন, এত ভালো কবিতার হাত তাঁর, কিন্তু এত কম লেখেন। কবিতা পত্রিকায় ছায়া দেবীর মাত্র দুটি কবিতার হদিস মেলে। দ্বিতীয় বর্ষ চতুর্থ সংখ্যায় ‘অনন্য’ এবং তৃতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যায় ‘বর্ষারাত্রি’। তাঁর কয়েকটি লেখা উত্তরা পত্রিকাতেও বেরিয়েছিল, এমন অনুমান ধূজটিপ্রসাদের পূর্বতন জীবনীকার করেছেন (অলোক রায়, ধূজটিপ্রসাদ, পৃ ৪০)। ধূজটিপ্রসাদ তাঁর সুদীর্ঘ দিনলিপিগুলিতে স্ত্রীর প্রায় কোনো উল্লেখই করেননি, এতখানিই যত্নবান ছিলেন তিনি ব্যক্তিগত আর প্রকাশ্য সর্বজনীনতার ফারাকটাকে সসম্মানে রক্ষা করতে। অশোক মিত্রের স্মৃতিচারণে আছে ‘নেপথ্যে থেকে, নিঃশব্দে, ছায়ামাসি নিখুঁত পাটিগণিতের মতো গৃহকর্ম সম্পন্ন করেছেন, হাজার-হাজার বইয়ের ধুলো ঝেড়েছেন, বইয়ের জন্য পোকা-মারবার ওষুধের ব্যবস্থা করেছেন, শেলফের পর শেলফ জুড়ে, এ-ঘর পেরিয়ে ও-ঘরের গহনে বইয়ের স্থপতি সাজিয়েছেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে আমাদের কফি-বিস্কুট-সন্দেশ জুগিয়েছেন, প্রায়ই দ্বিপ্রাহরিক বা নৈশভোজনের জন্য থেকে যেতে বলেছেন।...ধূজটিপ্রসাদের বর্ষাফলকের মতো সুতীক্ষ্ণ বাক্যবাণের পাশে, নিচু-গ্রামে মমতা-চুঁইয়ে পড়া ধীর উচ্চারণে, ছায়ামাসির আলাপ, ...তাঁর কাতর উদ্বেগ, খুঁটিয়ে কুশলসন্ধান।’ (অশোক মিত্র, ‘ধূজটিপ্রসাদ : কিছু স্মৃতি’, দেশ ৩.৬.১৯৯৫, পৃ ২৮)।

তবে কি যখন বইয়ের শেলফ সংখ্যায় কমে গেল, যখন ধূজটিপ্রসাদের বৈঠকখানার অপ্রতিরোধ্য আড্ডা আর রইল না, প্রাকৃতিক প্রতিকূলতায় হারিয়ে গেল তাঁর কণ্ঠস্বরের তীব্রতা আর ভার, তখন ধূজটিপ্রসাদের চোখ পড়েছিল ঘরনীর বিপন্ন স্থিরদৃষ্টির দিকে? যখন ছায়া

দেবী কঠনালীতে ককট-আক্রান্ত স্বামীকে নিয়ে এমনই এক প্রবাসে বসবাস করছেন, যেখানে মৃতদেহের দহন অথবা অর্ধদহ মৃতদেহ দর্শন জীবিত মানুষদের প্রায় নিত্যকার অভিজ্ঞতা? ১৯৫৭ সালে যখন ছায়া দেবীকে বস্তু উৎসর্গ করেছিলেন ধূজটিপ্রসাদ, তখন দুরারোগ্য অসুখ আর ভগ্নস্বাস্থ্য তাঁর জীবনযাপনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। দেবাদুনের দৈনন্দিন একমাস কাটতে-না-কাটতেই জীবনযাপনের আবহে প্রায় অবিরত মৃত্যু দেখবার যজ্ঞগায় ছায়া দেবীকে বিপর্যস্ত দেখলেন ধূজটিপ্রসাদ সেটা ১৯৫৯-এর অক্টোবর মাস। তবে কি রোগের সঙ্গে পাঞ্জা কষবার এই দিনগুলিতে ঘরের কাছে ধূজটিপ্রসাদের নিভৃত নির্ভরতা প্রক্ষেপের স্বজুতা ছেড়ে নিশ্চিতি খুঁজত বিন্যাসের পরিসরে? ২৭ অক্টোবর, ১৯৫৯ তারিখে মৃতদেহ দেখতে দেখতে ছায়া দেবীর বিষাদগ্রস্ততার অনুশব্দেই ধূজটিপ্রসাদ ডায়েরিতে লেখেন :

আমি তখন ছেলেমানুষ, স্কুলে পড়ি বারাসতে। শীতের রাতে পুলিশের বড় কর্মচারী মারা গেলেন...হঠাৎ চোখ খুলে বিছানার মধ্য থেকেই শুনলাম দূরে কুড়ুল কোপানির শব্দ হচ্ছে...মনে হলো বাঁশ কাটার শব্দ, কেউ বোধ হয় মারা গেছে...তারপর কী ভীষণ চিংকার। তার পরের সারাদিন পর্যন্ত চোখ বুজে পড়ে রইলাম, কিছুতেই বিছানা থেকে উঠলাম না। অনেক বৎসর ধরে গভীর রাতে ঐ বাঁশ কাটার শব্দ কানে আসত। মৃত্যুর শব্দ ক্রমেই ম্লিয়মাণ হয়ে পড়ল। সব ফুরিয়ে যায়, কিন্তু এই পঞ্চাশ বছর পরে হঠাৎ গভীর রাতে বাঁশ কাটার শব্দ কানে এল। (কিলিমিসি, র-৩ ২-য় সজার, পৃ ২৭৭-৭৮)।

সটান, স্বনির্ভর ব্যক্তিত্বের ধূজটিপ্রসাদ কি দেবাদুনবাসকালে প্রায়ই শুনতে পেতেন ওই মৃত্যুর শব্দ? ১৯৫৯-এর বছরটিতে বেশ কিছু মৃত্যুসংবাদও এসে পৌঁছছিল তাঁর কাছে। অবশ্য বলা যায় না, সত্যিই ১৯৫৯-এ আগের আগের বছরগুলির তুলনায় ধারে-কাছে মৃত্যু বেশি দেখেছিলেন, নাকি ৩৬৫ দিনের একটি প্রবাহে গুরুত্বপূর্ণ শেষসংবাদ তিনি আগেও পেয়েছেন! এখন শুধু সংবাদগুলি তাঁর কাছে দিনলিপিতে নথিভুক্ত হওয়ার মতো গুরুত্ব পাচ্ছিল। বিখ্যাত নট শিশির ভাদুড়ি, বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বন্দরনায়েক, নিকটবঙ্গুর যুবতী কন্যা—এছাড়াও ফিরে ফিরে এসেছে বহু পুরনো মৃত্যুর স্মৃতি।

আবার স্বষিপর্ণা নদীর দিকে তাকিয়ে ভেবেছেন, রাজনীতির কথা, কেরালার গোলমাল একাধিকবার এসেছে তাঁর ডায়েরির পাতায়, তাঁর দেশের সমাজবিজ্ঞান-গবেষণার ধরন নিয়ে শেষদিন পর্যন্ত স্ফোভ তাঁর এতটুকু কমেনি। দেবাদুনে পাকাপাকি বসবাস শুরু হওয়ার আগে ১৯৫৯এর ২২ জুন ডায়েরিতে লেখেন ৮ মের *Times Literary Supplement*-এ প্রকাশিত *Diversities*-এর নাতিদীর্ঘ সমালোচনা প্রসঙ্গে—‘সুখ্যাতি কিন্তু নিরর্থক।’ (ওই, পৃ ২৪৩) ১৯৫৫-র অক্টোবর মাসে নতুন করে গেজেটিয়ার লিখবার জন্য যে কয়েকজন ডাক পেয়েছিলেন, ধূজটিপ্রসাদ তাঁদের অন্যতম (মনে এলো, ওই, পৃ ৫৪)। কিন্তু যে কোনো সমস্যারই রাজনীতি, সমাজ আর অর্থনীতির যে-সমন্্বয় ধূজটিপ্রসাদের মতে একান্ত জরুরি, তার অভাব ভগ্নস্বাস্থ্যের বাধা পেরিয়ে তাকে চিন্তাক্রান্ত করেছে। ১৯৫৯-এর ডিসেম্বর মাসের ১৭ তারিখের দিনলিপিতে আছে :

ধারের চোটে পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ স্বাধীনতার নামে পরাধীন হয়ে যাচ্ছে। ভারতবর্ষেরও এই দুর্দশা—খাদ্য আমাদের জুটছে না, তার ওপর industrialisation-এর চাহিদা, তারও ওপর সংখ্যাধিক্য। ইকনমিস্টের এই মোটা কথাগুলি তুললেও এতটা ধার নেবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের political স্বাধীনতা হ্রাস পাচ্ছে না কি? এঁরা বলেন politics is not our pigeon.

না হয় লোহ-সঙ্কড়ের অতটা দরকার ছিল না, না হয় ডি.ভি.সি., ভাকড়া নাই হজে, না হয় শাক-মুলো খেয়েই থাকতাম, না হয় মানুষ দিয়েই কাজ চালাতাম। আধুনিকতার যুগে শুনেছি এ-সব দরকার। আমারও মন চায়, প্রাণ চায়, আমিও আধুনিক, কিন্তু মনের নীচে প্রাণের তলায় একটা কিছু আছে যার অভাবে আধুনিকতা মেলে না। গান্ধীর কথা মনে হয়, স্বাধীন হতে আমরা পারলাম না। (বিদ্যিমিলি, ওই, পৃ ২৮৭-৮৮)।

১৯৫৯ থেকে ২০০৫-এর পরিক্রমায় যে-দিশায় চলেছে আমাদের আধুনিকতা, সে-যাত্রা তো ইতিহাসের কাছে ‘ঋণশোধ’ করতে করতেই তার পথ কেটেছে। ওই ইতিহাসের কোনো এক কোণে তো ধূজটিপ্রসাদ আছেন, তাঁর ব্যতিক্রম নিয়ে, স্ফোভ নিয়ে, প্রক্ষিপ্ত হাহাকার নিয়ে! শতাব্দীর এপারে কি প্রমাণ করতে পারে তাঁর দেশের অর্থনীতি-সংস্কৃতি-রাজনীতি যে, কোনো ঋণ তাঁর কাছেও ছিল আমাদের? শোধের কথা দূরে থাক, ঋণস্বীকারের অধিকারটুকুও কি আজ নাগালের বাইরে চলে যায়নি?

অবসরগ্রহণের কয়েকমাস আগে, ১৯৫৮-র ৯মে, যেদিন জুরিখে ক্যান্টন স্পিটাল হাসপাতালে তাঁর অস্ত্রোপচারের ঠিক দুবছর পূর্ণ হলো সেদিন দিনলিপিতে লেখা হয় :

মৃত্যু নষ্টরক। অর্থাৎ ব্যক্তিগত মৃত্যু মিথ্যা। ব্যক্তিগত জীবনের পরে যে জীবন, সে জীবন আমার কাছে নেই... অন্য জীবন থাকতে পারে... সেখানে ব্যক্তিগত জীবনদর্শন থাকে না, সব সবে যায়... তার দর্শন কালপ্রত্যয়... গোড়ায় থাকে গ্রীনউইচ, তারপর ঋতু, তারও পরে সমাজ, শেষে আবার দর্শনও পৃথক হতে বাধ্য। তারও শেষে, যুক্তির দিক থেকে, কালপ্রত্যয় থাকে না। অতএব মৃত্যু নিরর্থকই মনে হয়। (ওই, পৃ ২১৪)।

পরের মাসে ৩০ জুন ১৯৫৯এ লিখলেন, ‘মার কাছে শুনতাম, সবই কর্মফল... আচ্ছা যদি কর্মফলই হয় তবে কোটি কোটি অস্পৃশ্যরা সকলেই কর্মফল ভোগ করে কেন, কোটি কোটি লোক গরীব কেন?’ (ওই, পৃ ২৪৯)। অর্থাৎ ভগ্নস্বাস্থ্যের সঙ্গে লড়তে লড়তে, কখনো বাল্যস্মৃতির মেদুরতায়, কখনো বা বুদ্ধিবাদের পরিসরে ধূজটিপ্রসাদ যেন কানে আসা মরণের ক্ষনিকে সর্বদাই মিলিয়ে দিতেন আজীবন চর্চিত আর্থ-সামাজিক সমস্যাগুলির সমাধান-সমাধানহীনতার উভটানে। ১৯৬১ সালের ৫ ডিসেম্বর কলকাতায় কুমারপ্রসাদের ৪ শত্চনাথ পণ্ডিত স্ট্রিটের বাসায় ধূজটিপ্রসাদের মৃত্যু হয়। দেবাদুনে থাকাকালীন শরীরের অবনতি হলে কলকাতায় আসতে হতো ঠিকই। কিন্তু ওই ১৯৬১-তে গরমের শেষে জোর করেই কলকাতা থেকে দেবাদুন ফেরেন। ১৯৬২ সালে দেবাদুনের ২২এ মোহিনী রোডের বাড়িটি কুমারপ্রসাদ শ্রীমতী মীরা সাহগালকে বিক্রি করেন ৪৮০০০ টাকা মূল্যে। পি. কে. সেন ও-বাড়ি সম্বন্ধে অমৃতলাল দস্তের কাছে যে-তথ্যই পান, কুমারপ্রসাদ একতলায় তিনটি এবং দোতলায় দুটি ঘর সমেত একটি দোতলা বাড়ির কথা বলেছেন। সে-বাড়ি বনের ছায়ায় ঘেরা Cheshire Home-এর (যার উল্লেখ আছে ধূজটিপ্রসাদের ডায়েরিতে, ওই, পৃ ২৪৮) উলটোদিকে, ঠিক পাশে দুমরাহো (Dumraoh) হাউস—২২এ মোহিনী রোডের বাড়িটির চিরুমাত্রও আজ নেই। দুমরাহো হাউসের ঠিক পর থেকে শুরু হয়েছে সঞ্জয় কলোনি। মনে হয় ১৯৮১তে সঞ্জয় গান্ধীর মৃত্যুর পরে তাঁর নামে ওই কলোনির পত্তন। তবে কলোনির অধিবাসীরা বেজায় সতর্ক—কলোনির কোনো ইতিহাসই উচ্চারণ করতে নারাজ। কলোনির শুরু একটি শিবমন্দির এবং সংলগ্ন দাতব্য চিকিৎসালয় থেকে। মোহিনী রোডের উপরে এম.এন.রায়ের বাড়িটি এখনো পুষ্পশোভিত এবং সযত্নরক্ষিত। ২০০২ সালে ঠিক তার পাশের বাড়িতেই ছিলেন

বিরানবাই বছরের এস.এন.পুরী। তিনি এম.এন.রায়ের শিষ্য। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে এম.এন.রায়ের যাতায়াত আলোচনা, তর্কবিতর্ক সবই ওই বৃদ্ধের স্মৃতিতে কিছু কিছু ধরা ছিল। মোহিনী রোড সংলগ্ন রিসপাম্মা অর্থাৎ ঋষিপর্ণা নদী এখনকার শীতে একান্তই ক্ষীণস্রোতা, আবর্জনায় আকীর্ণ।

কর্মফলের প্রসঙ্গে যাঁর মনে আসে বর্ণভেদ বা দারিদ্র্যের প্রসঙ্গ, তেমন একজন মানুষের জীবনকেই ইতস্তত পড়তে চাইছি আমরা। এপাঠে কোনো কালক্রমের বলাই মানা হয়নি। তাই এই শেষবেলায় একবার ফিরে যাই ১৯১৪ সালে, যখন রিপন কলেজ থেকে ইংরেজি স্নাতকে প্রথম শ্রেণীর নম্বর, গণিতে ভালো ফল ইত্যাদি সম্ভেও রসায়ন প্র্যাকটিকালে অকৃতকার্য ধূজটিপ্রসাদ বি.এ. পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ। সবুজপত্র-র আমলকে চেনাতে চেনাতে সেই যে লিখেছিলেন, স্বচ্ছাসেবক হওয়া, কন্যাপ্রীড়িতদের গ্রামোদ্ধার কিছুই নাকি বাদ দেননি। তেমন এক কাহিনী দামোদরের বন্যাপ্রীড়িতদের ত্রাণকার্যে ওই ১৯১৪তে ধূজটিপ্রসাদের তারকেশ্বর যাওয়ার :

...দামোদর বন্যাপ্রীড়িতদের উদ্ধারকল্পে আমরা জনকয়েক তারকেশ্বর অঞ্চলে যাই...আজ চল্লিশ বৎসরেরও পূর্বে। ...ববরের কাগজে যা ছাপিয়েছিলাম তার চারভাগের তিনভাগও সত্য ঘটনা ছিল না...কিন্তু আমাদের হাতে ছিল সংবাদপত্র। সেই থেকে পরোপকারের ওপর আস্থা কমছে। ...মনে পড়ে...মাঠের মধ্যে স্টীমলঞ্চের ওপর বসে একজন আমেরিকা ফেরত বাঙালির হাতে মদের গলাস ও বস্তুতা—...লঞ্চটি আটকে গিয়েছিল, আমরা ঠেলে গভীর জলে নিয়ে যাই। ভদ্রলোকটি লঞ্চের ওপর থেকেই আমাদের ডাইরেক্টিভ (আদেশ) দিচ্ছিলেন...মনে আসে হেমেন্দ্র রায়ের কবিতা পাঠ নৌকার ওপর, সুধীর সরকারের গান ও কাঠের ওপর বাঁয়াতবলা বাঙ্গানো, রাত্রে শাল মুড়ে শোয়া, পেটে ঝিদে মুখে সিগারেট, মোহন্তের সঙ্গে ঝগড়া—আর এক বিধবা জমিদার গৃহিণীর সংযত সমাদর। বাংলাদেশে তখন অনেক মা ছিল।

দামোদর বন্যাপ্রীড়িতদের (তখন সর্বহারা, বাস্তহারাদের চলন হয়নি) উদ্ধার করে এসেই গড়ের মাঠে ফুটবল খেলা দেখতে গোলাম। ভিজ্ঞে এসে জ্বর হলো। জ্বরের ঘোরে শিবে-বিজ্ঞের নামোচ্চারণ করি। ডাক্তার এসে মাকে বোঝালেন নামটি কোনো মেয়ের নয়, দুজন খেলোয়াড়ের।

পথ্য পেয়েই দানিাবুর অভিনয় দেখতে গোলাম লুকিয়ে। (মনে এলো, ওই, পৃ ৬৮-৬৯)।

যদি ১৯১৪ থেকে দু'দশক এগিয়ে আসি ১৯৩৪-এ, দেখা যাবে যুগিষ্ঠির দাস ছদ্মনামে ধূজটিপ্রসাদ পরিচয়ে লিখছেন 'এই জীবন'-এর মতো গল্প। ১৯৩৫-এ ওই গল্পের থেকেই তৈরি হলো তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসত্রয়ীর প্রথম খণ্ড *অন্তঃশীলা*। সেখানে খগেন্দ্রনাথের ছাত্রজীবনে দামোদরের বন্যাপ্রীড়িতদের উদ্ধারকাজে যাওয়ার গল্প আছে। আছে ভদ্র গৃহস্থ বাড়ির অধিকারিণীর স্নিগ্ধ আতিথেয়তার বর্ণনা। সাহায্যপ্রার্থী গরিব-গুরবাদের নিয়ে স্বচ্ছাসেবকদের অসহিষ্ণুতার জ্বাবে সেই মহিলা বলেছিলেন ধূজটিপ্রসাদের উপন্যাসত্রয়ীর শ্রেষ্ঠ সংলাপগুলির একটি—'বাবা তোমরা যদি এদের মানুষ না ভাব, তাহলে এদের উপকার করতে এলে কেন?' (২-১, পৃ ৪৩-৪৪)।

১৯৫৫-র ১৩ অক্টোবর ধূজটিপ্রসাদ ছাত্রজীবনের স্বচ্ছাসেবার রম্যরচনা উপহার দিচ্ছেন তাঁর দিনলিপির পাঠককে। তারপরে দুমাসও কাটেনি, ৪ ডিসেম্বরের ডায়েরিতে আছে ঘরের উপরে বাঙালি পুরুষের নিরাপদ নির্ভরতা সংক্রান্ত 'মাগো'-'ওগো' আর বাঙালি নারীতে সরলা-অবলার মিশেল নিয়ে তাঁর স্বভাবসুলভ তির্যক কৌতুক। বাংলাদেশের মায়েরা

অবলা ; জ্বরের ঘোরে ছেলে যদি নামি ফুটবলারের নাম করে, তাঁরা ভাবেন, সে বুঝি রমলা দেবীর মতো সর্বজ্ঞ কোনো নারীর নামজপ করছে। অথচ ১৯১৪তে বাংলার যে-মায়েরা সংযত সমাদরের উপকরণ সাজিয়ে বীরশিশুদের তুষ্ট করেন, তাঁরা অন্তত কিছুটা সবলা না-হলে তো বন্যাভ্রাণের স্বেচ্ছাসেবকরা তাঁদের নাগাল পাবে না। অথচ তাঁদের শক্তি তো ততটুকুই বাঞ্ছনীয়, যার জ্বারে তাঁরা অন্দের প্রাপ্তে দাঁড়িয়ে বীরদের যাত্রাপথের সূচনায় তাদের কপালে দেবেন দইয়ের ফোঁটা। অথবা অন্দের আরো ভিতরে ঘরে-পাতা দইয়ের আয়োজনে সুন্দরতর করে তুলবেন পাতা-আসন আর বাড়ি ভাতের শৃঙ্খলাকে। যতই তীক্ষ্ণ হোক ধূজটিপ্রসাদের আধুনিকতা আর বুদ্ধিবাদ, অবলা-সবলার ওই মিশেলটুকু তাঁর প্রয়োজন ছিল, ভগ্নহাস্তের অনিশ্চিতি আলোকিত জীবনে এসে পড়বার আগে থেকেই। যে-বছর আবর্ত গ্রন্থিত হচ্ছে, সেই ১৯৩৭এ ছায়া মুখোপাধ্যায় কবিতা পত্রিকায় লিখছেন, ‘এতো ক্লান্ত শব্দরীর/স্পন্দিত মুকতার/ মৌন বন্ধু আমি।’ (‘বর্ষারাত্রি’, কবিতা আধিন ১৩৪৪, পৃ ৫৮)। বুদ্ধদেব বসুর যতই খেদ থাক তাঁর কম লেখা নিয়ে, ছায়া দেবী সম্ভবত সামান্য লেখিকার অকিঞ্চিৎকর পরিচয় বহন করে (‘স্বীর চোখে ধূজটিপ্রসাদ’, প্রসঙ্গ : ধূজটিপ্রসাদ জলার্ক, পৃ ২১২) ধূজটিপ্রসাদের অন্তঃপুরকে, তাঁর বাহিরের অন্দেরকে মুখ্য ভাবতেন। তাঁর সে-ভাবনা নিশ্চয় কোনো নিশ্চিত প্রসাদের অভিলাষে সম্পৃক্ত ছিল।

নিজের এবং খগেন্দ্রনাথের বীরত্বের যৌবন জুড়ে বাংলাদেশে বহু মাতৃমূর্তি কল্পনা করতে পেরেছিলেন অন্তঃশীলা-র নির্মাতা। সে-উপন্যাসের উৎসর্গপত্রে লেখা হয়েছিল, ‘মা তোমার কাছে আমি যে কতো স্বর্গী তা আমিই জানি। সে স্বর্গের পরিশোধ হয় না। তাই উৎসর্গকে স্বীকারোক্তি ভেবো। ধুকু ১লা আষাঢ় ১৩৪২’। দুবছর আগে রিয়ালিস্ট গল্পসংকলন উৎসর্গ করা হয়েছিল বন্ধু হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী নীলিমা চট্টোপাধ্যায়ের অকালমৃত্যুর স্মৃতিতে—‘লিলি আমার প্রথম গল্পের বই তোমার হাতে দিতে পারলাম না এই আমার দুঃখ। ধূজটি মহাষষ্ঠী ১৩৪০’। আজ জানা প্রায় অসম্ভব যে ধূজটিপ্রসাদের পরম সুহৃদ H.C.-র ঘর আর তাঁর বাহিরের অন্দের কতখানি লালন পেত ওই লিলির অর্থাৎ নীলিমার কাছে। তেমন উত্তরের অনুসন্ধানও হয়তো নিভৃতি আর প্রকাশ্যের মধ্যে একটা টনাপোড়েন থাকে। কিন্তু ধূজটিপ্রসাদের জীবনের শেষ বাংলা প্রবন্ধ সংকলনের উৎসর্গ ‘ছায়া দেবীকে’। ১৯১৪-র প্রথম যৌবনবেলায় যে-মায়েরা ছিলেন দেশ জুড়ে, তাঁদের উত্তরাধিকার কতখানি বহন করতেন পরবর্তী প্রজন্মের মেয়েরা, মায়েরা? বক্তব্যের উৎসর্গে যা অনুভূত এবং নীরব, তা কি আসলে পরম নিশ্চিত ধূয়ো গেয়ে যায় অন্তঃশীলা-র উৎসর্গপত্রের সরব স্বীকারোক্তি?

ধূজটিপ্রসাদের জীবন যিরে অনেক প্রশ্ন তৈরি হল। সে-জিজ্ঞাসার কোনো একটি সমাধান বানিয়ে তোলা সমীচীন নয়। আমরা, যারা আজ তাঁর জীবনের পাঠক, তারাও না- হয় নাই বা বাঁধলাম। চলাটাকেই ধরে নিলাম সারকথা। বিচিত্র কর্মের সেই জীবনের অনেক কিছু নিশ্চয় না-বলাও রইল। এ’পাঠ তো ধূজটিপ্রসাদের জীবনের বহু বিকল্প পাঠের একটি।

রবীন্দ্র-স্নেহধন্য উদয়ন পত্রিকার ইতিহাস ও রচনাসূচি

অশোককুমার রায়

প্রথম বাংলা পত্রিকা দিগদর্শন (এপ্রিল, ১৮১৮) থেকে বিগত দেড়শো বছরে ক্ষণস্থায়ী প্রকাশকালের মধ্যেই প্রচণ্ড অলোড়ন তুলে গেছে এমন সব পত্রিকার নামোল্লেখ করতে গেলেও বেশ দীর্ঘ হয়ে যাবে। এই সরণী থেকে প্রাসঙ্গিকতার বিচারে রবীন্দ্র স্নেহধন্য উদয়ন (বৈশাখ, ১৩৪০-চৈত্র, ১৩৪১) পত্রিকার ইতিহাস ও রচনা পঞ্জি প্রকাশ করা হল সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার এই সংখ্যায়।

প্রথম সংখ্যা থেকেই উদয়ন মাসিক পত্রিকাটির যে বৈশিষ্ট্য আনবার চেষ্টা করেছিলেন তার সম্পাদক যুগল নৃপেন্দ্রনাথ রায় (১৯০৬-১৯৭৭) ও প্যারীমোহন সেনগুপ্ত (১৮৯৩-১৯৪৭) তা কেবল আয়তন বিন্যাসেই ছিল না, ছিল বিষয় বৈচিত্র্যে, লেখকসূচিতে এবং অবশ্যই নিয়মিত বিভাগ সমূহের পরিকল্পনায়। কৌতুহলী পাঠক লক্ষ্য করবেন প্রথম সংখ্যার সূচি ও ‘ঘরে-বাইরে’ (সম্পাদকীয়) অংশে এই পরিকল্পনা তথা ধারণার স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে একটি কথা অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে যে উদয়ন-এর এই সার্থক রূপায়ণে সম্পাদকদ্বয়ের কৃতিত্ব যেমন আছে বিষয় নির্বাচন ও শ্রেষ্ঠ লেখক সম্মেলন ঘটানোয়, তেমনিই এর আর্থিক যাবতীয় দায়িত্ব যিনি দরাস্ত হাতে নির্বাহ করেছিলেন তিনি হলেন পত্রিকাটির পরিচালক মধ্যকলকাতার তালতলা অঞ্চলের সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যবসায়ী দে পরিবারের অনিলকুমার দে। অন্যান্য ব্যবসার সঙ্গে অনিলকুমারের একটি উচ্চাঙ্গের মূদ্রণাগার ছিল। বলা বাহুল্য সেই স্বয়ংসম্পূর্ণ মূদ্রণাগার থেকেই উদয়ন-এর মূদ্রণ, চিত্রের ব্লক নির্মাণ, বাঁধাই সবই সম্পন্ন হয়েছিল। মূদ্রণ বিশেষজ্ঞ রূপে তিনি সে যুগে কলকাতার ‘মাস্টার প্রিন্টার্স এসোসিয়েশন’-এর সভাপতির পদও অলঙ্কৃত করেন কয়েকবার। নিজে সাহিত্যিক না হয়েও বাংলা সাহিত্য ও তার অষ্টা সাহিত্যিকবৃন্দের কাছে তিনি ছিলেন যথার্থ ‘সাহিত্য বন্ধু’। উদয়ন-এর পৃষ্ঠায় পত্রিকার স্বত্বাধিকারী রূপেও বড়োবড়ো অঙ্করে মুদ্রিত হয়েছে ‘পরিচালক সাহিত্য বন্ধু অনিলকুমার দে’ নামটি। যদিও আছে এরকম আশ্চর্যের আরো কিছু নমুনা যেমন কোনো প্রসঙ্গ ছাড়াই তাঁর পিতৃদেব অতীন্দ্রনাথ দে’র সচিত্র জীবন কথা ও কোনোও উপলক্ষে দে পরিবারের কিছু কিছু সমাচার। কিন্তু ব্যাস, এই পর্যন্তই। এর-বাইরে সর্বার্থেই উদয়ন এক সার্থক পত্রিকা, যার প্রতিটি লেখা যেমন উন্নতমানের তেমনি সুনির্বাচিত। সম্পাদনা নৈপুণ্য স্বরণ করায় সমকালীন প্রবাসী [সম্পাদনা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (১৮৬৫-১৯৪৩)] ও বিচিত্রা [সম্পাদনা উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮১-১৯৬০)] পত্রিকার কথা।

উদয়ন-এর ইতিহাস ও প্রকাশিত রচনাটির অলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার আগে অল্প কথায় এর সম্পাদকদ্বয়ের কিছু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন এই কারণে যে যার প্রভাবেই উদয়ন

বিশিষ্টতা অর্জন করে। বয়সে তরুণ হলেও সম্পাদনা ক্ষেত্রে নৃপেন্দ্রনাথের দান এক্ষেত্রে বেশি বলেই লক্ষিত হয়। নৃপেন্দ্রনাথের কোনো পূর্ণাঙ্গ জীবনী বা রচনাবলীও সম্পূর্ণ গ্রন্থবদ্ধ রূপে পাওয়া যায় না। বিভিন্ন ব্যক্তির লেখা স্মৃতিকথায় ও বিচ্ছিন্নভাবে তাঁকে নিয়ে এ'পর্যন্ত যা' লেখালিখি হয়েছে তা'ও খুব বেশি নয় বলেই মনে হয়। ড. সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত সম্পাদিত সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান ও ড. হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত বঙ্গ-সাহিত্যাভিধান গ্রন্থে নৃপেন্দ্রনাথ সম্পর্কে জানানো হয়েছে ১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৬ তাঁর জন্ম হয় বাংলার বিপ্লবতীর্থ মেদিনীপুর শহরে ও ৩০শে এপ্রিল, ১৯৭৭ তাঁর মৃত্যু হয় কলকাতায়। সংস্কৃতবিদ, আদর্শ শিক্ষাব্রতী অধ্যাপক নৃপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ শাস্ত্রী ছিলেন তাঁর পিতা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পালিতে এম. এ. (১৯৩০) ও বি. এল. (১৯৩৬) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কিছু কাল কলকাতার রিপন কলেজে অধ্যাপনা করেন। গান্ধীজীর ডাকে লবণ সত্যাগ্রহে যোগ দিলেও বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষক হিসেবে এই সময় যেমন তিনি যুক্ত ছিলেন তেমনি পঞ্চপুষ্প পত্রিকার সম্পাদনার কাজেও নিয়োজিত ছিলেন। তারপর বরোদা রাজ্যের সয়াজী গাইকোয়ার যাদুঘর ও চিত্রশালার অধ্যক্ষপদে যোগদান করে সংগ্রহশালার একটি মূল্যবান সঠিক তালিকা অল্প সময়ের মধ্যে সংকলিত করে উচ্চ প্রশংসিত হন। রাজ্য সচিবের সঙ্গে সামান্য মত পার্থক্য ঘটায় বরোদা ত্যাগ করে চলে যান ভূপাল রাজ্যের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধিকর্তা রূপে। সেখানেও প্রশাসনিক কাজের মাঝেই সাঁচী স্তূপ ও পার্শ্ববর্তী বিদিশা ও বাঘগুহা প্রভৃতির প্রথম প্রত্নতাত্ত্বিক সংরক্ষণ প্রচেষ্টা তাঁরই উদ্যোগে সংঘটিত হয়। সাঁচী স্তূপ বৌদ্ধ সঙ্ঘের অনুরোধে তিনি ভারতীয় বৌদ্ধ মঠ ও মন্দিরের পালি ও সংস্কৃতে রচিত গ্রন্থের ইংরাজিতে পাণ্ডিত্যপূর্ণ টীকা রচনা করেন। খ্যাতি ও ক্ষমতার অভিলাষ নয়, সংস্কৃতি চর্চা তথা লোক শিক্ষার প্রেরণায় তরুণ নৃপেন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনা ছাড়াও সাংবাদিক জীবনে দ্য জুডী (১৯৩৩), দ্য অ্যাডভান্স (১৯৩৫), দ্য কমার্স (১৯৩৬), দ্য ওরিয়েন্ট (১৯৩৮), দ্য উইকলী স্টার অব ইণ্ডিয়া (১৯৪০), দ্য মাদোয়ারী এসোসিয়েশন জার্নাল (১৯৪৪) প্রভৃতি ইংরাজি ও পঞ্চপুষ্প, উদয়ন, উত্তরায়ণ প্রভৃতি বাংলা পত্রিকা সম্পাদনা কালে সেইসব পত্রিকার আর্থিক দায়িত্ব যারা বহন করতেন, পত্রিকার গুণগত মান তথা সম্পাদকীয় নীতির প্রক্ষেপে নৃপেন্দ্রনাথ কখনো তাঁদের প্রশ্রয় দেননি। সম্পাদনা সূত্রে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, অনুরূপা দেবী, প্রভাবতী দেবীসরস্বতী, হাসিরামি দেবী, রাজশেখর বসু, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, জগদীশ ভট্টাচার্য, অতুল সুর, নলিনীকান্ত ভট্টাশালী, বিমানবিহারী মজুমদার, বিশ্বপতি চৌধুরী, কদার নাথ চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র বাগল প্রভৃতি লেখকদের সঙ্গে প্রজালাপ-বন্ধুত্ব হয়। ব্যক্তিগত জীবনে একান্ত বন্ধু বৎসল এবং খুবই মৃদুভাবী ছিলেন। তাঁর সৌজন্য বোধে, হৃদয়িক ব্যবহারে ছিল এক দুর্লভ আভিজাত্য। কিন্তু এরই ভিতরে ছিল পাথরে মোড়া এক পণ্ডিত ও অনমনীয় মনের মানুষ। এই আকর্ষণী শক্তির জন্যই তিনি যে কোন বিদ্যোৎসভায় ছিলেন চমৎকার বক্তাও। প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বসুমতী, বিচিত্রা, পঞ্চপুষ্প, পঞ্চপাত্র, রূপম, রোচনা, নবশক্তি, পূর্ণিমা, গল্পলহরী, গল্পভারতী, উদয়ন, উত্তরায়ণ, শ্রীভারতী, ভাষা, মন্দির, নবজাতক, বাঙলা, ভবিষ্যৎ প্রভৃতি তৎকালীন সাময়িক পত্রিকার পাতায় ছড়িয়ে আছে তাঁর অনেক প্রবন্ধ, ছোট গল্প, কবিতা ও বিশ্বসাহিত্য থেকে

বিবিধ অনুবাদ। সব মিলিয়ে নৃপেন্দ্রনাথের রচনাবলির পরিধি ও বৈচিত্র্য কম নয়। অগ্রস্থিত এইসব প্রবন্ধ সাময়িক পত্রিকাতে মুদ্রিত থাকলেও আজ বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হয়েছে। নৃপেন্দ্রনাথের নিলিপ্তি এবং আমাদের সময়োচিত অবহেলায় তাঁর বহু রচনার আজ সন্ধান পাওয়াই দুষ্কর। চল্লিশ থেকে ষাটের দশকের মধ্যে ভারত সরকারের নানা উচ্চ পদে কাজ করেছেন। ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে ভারত সফররত আন্তর্জাতিক রেডক্রস সংস্থায় তিনি ভারত সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন। স্বল্প রোগভোগের মধ্যে দিয়ে ১৯৭৭ সালের ৩০শে এপ্রিল নৃপেন্দ্রনাথের জীবনাবসান হয়।

নৃপেন্দ্রনাথ ও উদয়ন যে কতটা পরিপূরক এ সম্পর্কে উদয়ন পত্রিকার কর্মসচিব জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ ১৫ই এপ্রিল, ১৯৫১ তারিখে অমৃতবাজার পত্রিকায় An Old Memory Lane নামে একটি প্রবন্ধে যে কথা লেখেন তাকে উদয়ন-এর সূচনা পর্বের নেপথ্য ইতিহাস বললেও অতুষ্টি হয় না। জিতেন্দ্রনাথ শুধু অনিলকুমার দে'র প্রেস তথা কর্মসচিবই ছিলেন না, দে পরিবারের সঙ্গে আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। এখানে আমরা সেই দীর্ঘ রচনাটির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি— “...I have known the late Anil Kumar Dey fairly intimately for a fairly long period. I can not praise him enough for his highly conscientious and hard work in printing. I had it from him that he started his printing business with a capital of Rs. 60/- and Rs. 2000/- of a partner. He built up a medium. sized letter-press of very high reputation-doing job work of a European concerns. In the 3rd year of his business he came to be the sole proprietor. Most assuredly he knew his printing job very well and no doubt of it, he was quite an astute business-man.

He had, however, little to do with Literature. Prof. Bimalendu Kayel wrote that he practically lost his job as a Sub-Editor of Udayan on his failing readily to provide the meaning of Roosevelt's policies.

There can be no two opinions that Udayan was absolutely, wholly and solely the brain-child of Shri Nripendra Nath Ray (Who was also a founder of the Illustrated Weekly of the Vishwamitra Gorup. 'Trinankur' (a diary) of Bibhutibhusan Boudyopadhyaya records that in a joint-sitting Bibhutibabu christened “Nripen Rays magazine-Udayan”.

Bibhutibhusan's memory played him a trick. Not very unnatural in case of a creative writer of his order of mind. In that small gathering of name-finding were besides a few others : Sajanikanta (Who offered the name, Kinjalkar”), Shailajananda, Probodhkumar, Budhadev, Shashibhusan Das Gupta, Sudhir Kumar Das Gupta and a few others. Not all were present all the time. Each came and went away as he liked. Anil Kumar Dey and his brother-in-law Dunibabu Looked after the creatures comforts of the distinguished visitors—who would hardly ever expected to be seen in a job press.

The name, ‘Udayan’, most assuredly first flashed in the brain of Nripendrababu. And, very naturally so—as he was a bonafide scholar in Pali, Sanskrit and Ancient Indian Culture. Not long before this he served in the

Archaeological Survey Department, Bhopal. He was a keen student of Fine Arts. It was he who commissioned the artist, Jatindrakumar Sen at the place of Girindra Sekhar as to the design of the cover of Udayan : the sun (Arun driving) shooting up in the seven-horsed chariot. Almost all the articles of the issues (from first issue to second year last issue) were of his teachers, namely, Sunitikumar Chatterjee, Surendranath Das Gupta, Nalinaksha Dutta, D.R. Bhandarkar, Stalla Kramrisch and Probodh Chandra Sen wrote articles in English to be translated by Nripendra Babu. Achintya Kumar and Buddhadev wrote two stories without female character at Nripendra Babu's request. On editing Buddhadev's story delicious and changes—he was the fury of youth. Nripendra Babu stuck to his editorial right of making amendments.

There was another most unhappy furore. On approaching Tagore earlier his blessings in a most quartraine had been obtained he agreed to offer a story at Rs. 500/-. Next morning on seeing prof. Charuchandra Bandyopadhyaya for delivery of the story on payment of Rs. 500/- but he gave out that the price was refixed at Rs. 1,000/-. The reason accounting for the changing being information subsequently coming into possession that the financier of Udayan' was a very rich business man. Charubabu advised Nripendra Babu to meet Rabindranath next evening at the Howrah Station on his way back to Shantiniketan.

If Nripendra Babu desired Anil Babu was ready to pay Rs. 1000/-. He was totally a lost man in an almost undreamt-of land. His sure instinct of a business man appreciated and accepted something of the quality of a genius of Nripendra Babu.

In all my life I have not met another man of the diamond-quality of intellect as that of Nripendra Babu. Quickest he was to find the finest point in favour or disfavour of an argument. No more a straight forward, strong minded and worm-hearted a man I have ever known. Ever defiant—no compromise for him—ever paying willingly the full price there of.

Nripendra Babu went with proposition of the new term. Duly he went to the Howrah Station : all whom he asked to accompany him refused to beard the lion.

Tagore was confirmed blandly the revision of the terms of sale. On altercation, in anger he rented out : Have I signed any papers? Nripendra Babu was shocked terribly. But Tagore was smiling and said Young man, what ever remuneration I am asking to you that is not for me, but for the Shantiniketan Brahmacharya School. You pay me only Rupees Five Hundred, Charu Babu will give you a new article on Sanskrit Poetics which I just finished. People accompanied Tagore to see him off ; Pandit Madan Mohan Malviya's daughter was accompanying Tagore and there were people to see her off. Sunitikumar Chatterjee recall in one of his writings the echo of this unwhole some incident.

Editor Nripendra Babu and Parymohan Babu left 'Udayan' due to

publish 2-sub-standard poems by a relative of Parichalak AnilKumar Dey had without the knowledge of Editor. After sometime same incident take place when further 1. poem published without the knowledge of Editor by the Parichalak AnilKumar Dey.

The period of inception was some 7/8 months, Nripendra babu would not less than 10/12 hours a day. 'Udayan', first year issue No. 1 and necessarily the next few issues at a moderate estimate bears favourable comparison with the first issue of any Bengali-literary magazine-both in its contents and individuality. It goes to the credit of AnilKumar Dey that it was easily the best printed and produced Bengali Magazine.

AnilKumar Dey did his best to Nripendranath and Parrymohan back all unvain. Resultantly Nripendranath neither asked nor was paid a pic. Especially on numerous occasions Nripendranath was verbally assured that in appreciation and affection AnilKumar Dey was too delighted..."

নৃপেন্দ্রনাথের সঙ্গে যুক্ত সম্পাদক রূপে প্যারীমোহন সেনগুপ্তের কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। প্যারীমোহন ছিলেন মূলত কবি ও শিশু সাহিত্যিক। জন্ম হুগলী জেলার গোপীনাথপুরের পল্লিভবনে ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের ৩ মার্চ। বাল্যকালে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় সম্বলহীন বিধবা মাতার একমাত্র অবলম্বন প্যারীমোহন কঠিন জীবন সংগ্রামের সম্মুখীন হন। স্বল্প কালের জন্যে মাতুলালয়ে আশ্রয় মিললেও ছাত্রবৃত্তি পাঠ সমাপ্ত হবার সঙ্গেই মাতুলালয়ের আশ্রয়পর্ব শেষ হয়। সেই বিপদের দিনে চাঁপদানী হাইস্কুলের পণ্ডিত মহাশয়ের অনুরোধে চাঁপদানীর ধনাঢ্য জমিদার ভ্রাতৃদ্বয় নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও কুমুদবান্ধব মুখোপাধ্যায়ের আনুকূল্যে ১৯১৫ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। সাহিত্য সাধক চরিতমালার অন্তর্গত ১১৯ সংখ্যক জীবনীটি হল প্যারীমোহন সেনগুপ্তের। লেখক হারাধন দত্ত লিখেছেন এরপর কবি স্থায়ীভাবে কলকাতায় চলে এসে স্কটিশচার্চ কলেজের কলা বিভাগে ভর্তি হন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত ইন্টারমিডিয়েট আর্টস পরীক্ষায় সকল বিষয় পারদর্শিতা প্রদর্শন করেও ইতিহাসে অসাফল্যের জন্যে পরীক্ষায় অকৃতকার্য হন। দারিদ্র্যতা নিবন্ধন এখানেই তাঁর প্রথাবদ্ধ শিক্ষার পরিসমাপ্তি ঘটে। কলেজে অধ্যয়ন কালই ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে পাটনার টি. কে. আকাদেমির প্রধান শিক্ষক সিদ্ধেশ্বর গুপ্তের দ্বিতীয়া কন্যা উমা দেবীর সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। শৈশব থেকেই মাতৃভাষা বাংলার প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ যেমন তাঁকে কলেজের পাঠ্যপুস্তকগুলির প্রতি আগ্রহ শিথিল করেছিল তেমনি আবার পারিবারিক দায়-দায়িত্বে সদা বিব্রত হলেও কলকাতায় মিলিটারি সান্দ্রাই একাউন্টস অফিসের ৩০ টাকা মাসিক বেতনের সরকারি চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছিলেন সাহিত্যের টানেই। জীবনে বিভিন্ন সময়ে আর্থিক অনটন মেটাতে সাময়িকভাবে ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোনো কাজে যোগ দিলেও বেশি দিন সে কাজে থাকতে পারেন নি। আবার মনোমতো কাজও যেহেতু ধনির অর্থে সম্পন্ন হয়, ফলে সেখানেও মত পার্থক্য বার বার অনিবার্য হয়ে ওঠায় পদত্যাগ করতে হয়েছে। সম্পাদনা ব্যাপারে স্বত্বাধিকারী অনিলকুমার দে-র সঙ্গে নৃপেন্দ্রনাথের মতো প্যারীমোহনেরও মত পার্থক্য হওয়ায় তিনি উদয়ন সম্পাদনার দায়িত্ব ত্যাগ করেন। সহকারী রূপে পঞ্চপুষ্প, মাসিক বসুমতী (সাময়িকী বিভাগ), কুচবিহার দর্পণ, ভারতী, প্রবাসী, মডার্ন

রিভিয্যু প্রভৃতি পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত থাকলেও কোথাও তাঁর নিজের মত করে সম্পাদনা করা হয়ে ওঠেনি বোঝা যায়, কারণ উল্লিখিত পত্রিকাগুলির সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে অমূল্যচরণ বিদ্যাহুষণ, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ও সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক অমূল্যরতন গুপ্ত, সরলা দেবী চৌধুরাণী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখেরা। এঁরা সকলেই ছিলেন স্বনামধন্য সম্পাদক ও লেখক।

যাইহোক, প্যারীমোহন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের দেওয়া একটি প্রশংসা পত্রের জোরে বঙ্গ বাসী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক গিরিশচন্দ্র বসুর আনুকূল্যে উক্ত কলেজে অধ্যাপক পদ লাভ করেন। কিন্তু প্যারীমোহন অচিরেই পাণ্ডিত্যের জন্য ও আদর্শ শিক্ষক রূপে খ্যাতি অর্জন করেন।

প্যারীমোহন কবিতা, ছড়া ও গদ্য-পদ্যময় সরস রচনায় বিশেষ দক্ষ ছিলেন। *অরুণিমা*, *বেদবাণী*, *মেঘদূত*, *কোজাগরী*, *জয় সুভাষ*, *পৃথিবীর জাতীয় সঙ্গীত* [অনুবাদ] প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ১৯৪৭ সালের ২০শে মে এক পথ দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়।

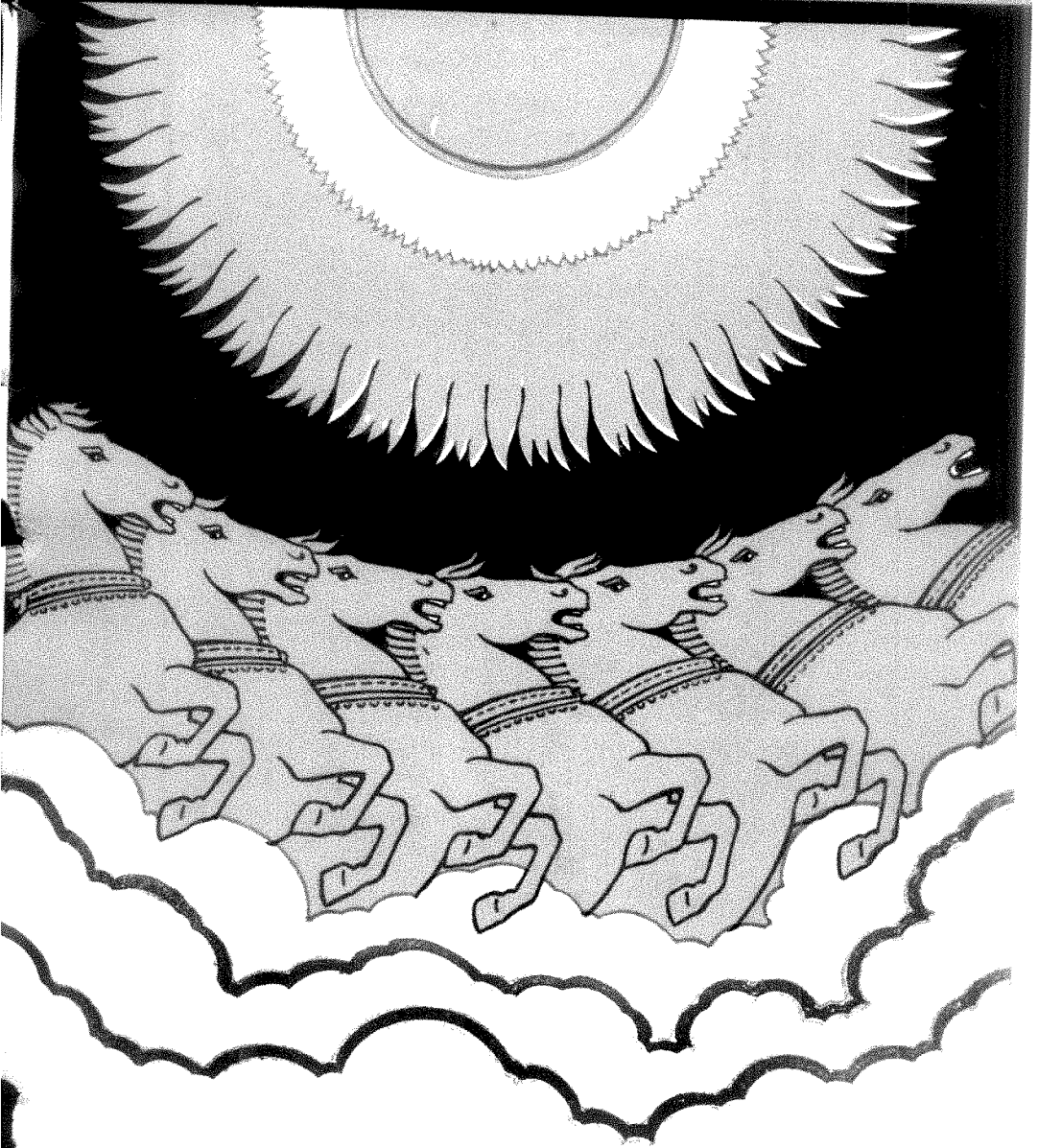
প্রবাসী (১৩০৮ বঙ্গাব্দ), সবুজপত্র (১৩২১), উত্তরা (১৩৩২), বিচিত্রা (১৩৩৪), পরিচয় (১৩৩৮), উদয়ন (১৩৪০), কবিতা (১৩৪২) প্রভৃতি সাহিত্য পত্রিকাগুলির সঙ্গে কখনও সম্পাদনা সূত্রে যুক্ত না থেকেও রবীন্দ্রনাথের বিবিধ মূল্যবান সৃষ্টি ও নানা বিষয়ে তাঁর চিন্তার ধারা যে ভাবে প্রকাশিত হয়েছে তাতে তাদের “রবীন্দ্র স্নেহধন্য” বলে আখ্যাত করা যায়। রবীন্দ্রনাথের জীবন সায়াহ্নে উদয়ন-এর জন্ম হলেও রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ, স্নেহ-মমতা সে অর্জন করেছিল পরিপূর্ণ ভাবেই। কিন্তু এমন সম্ভাবনাময় পত্রিকাটি সুযোগ্য সম্পাদক ও আর্থিক দায় গ্রহণে সক্ষম সাহিত্য প্রেমিক স্বত্বাধিকারী থাকা সত্ত্বেও অজ্ঞাত কারণে মাত্র দু বছর স্থায়ী হয়েছিল। উদয়ন কার্যালয় ছিল ৭৯/৯ লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতায়।

রবীন্দ্রনাথ জীবনের সুদীর্ঘকাল বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত থাকলেও সময়াভাবে মাত্র ভারতী (১২৮৪), সাধনা (১২৯৮), নবপর্যায় বঙ্গদর্শন (১৩০৮) এবং ভাণ্ডার (১৩১২) পত্রিকা কিছুকাল করে হলেও সম্পাদনা করেছিলেন। যে ভাবেই দেখা যাক, জীবনের নানা ভাবনা এই সব সাময়িক পত্রের প্রয়োজনে তিনি লিখেছিলেন এবং আমাদের পাঠের সুযোগ দিয়েছিলেন। পরিণত পর্যায়ের উন্মেষকাল থেকে রোগশয্যাতেও এক একটি পত্রিকা-গোষ্ঠীর কাছে এক এক ধরনের লেখা দিয়েছেন প্রকাশার্থে। উদয়ন-এর প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন, “‘উদয়ন’ সেকালে জাত লিখিয়েদের লোভনীয় পত্রিকা ছিল। আর এই জাত লিখিয়েদের অন্যতম ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ...তবে উদয়নের লেখাগুলিতে কিছুটা বিদায়ী মানসিকতায় কাজের পথ ছেড়ে অলক্ষিতের আগমন লক্ষ্য করা যায়।”

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে বাংলা সাহিত্য পত্রিকাগুলির সঙ্গে যুক্ত হয় উদয়ন পত্রিকা (বৈশাখ, ১৩৪০)। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রকে স্মরণ করেই ‘উদয়ন’ স্বীকার করেন রবীন্দ্রনাথকে। লিখেছেন, “আজ অদম্য বঙ্গ রবি জগতের আকাশে সমুজ্জ্বল। উদয়ন-এর সম্পাদক এইভাবে রবীন্দ্রনাথকে জানিয়েছেন আন্তরিক শ্রদ্ধা। রবীন্দ্রনাথও প্রত্যুত্তরে শান্তিনিকেতন থেকে নিম্নোক্ত অশীর্বাণী পাঠান—

উদয়ন

বিশাখ
২২৪০



YOU WILL BE INTERESTED

If you turn to page 17 of the Advertisement Section of this Issue
MARSHALL, SONS & CO. (India) LTD. 99, CLIVE STREET, CALCUTTA
Also at — Bombay, Madras, Karachi, Lahore, Bezwada, Tanjore and Coimbatore

আশীର୍বাদ

৩

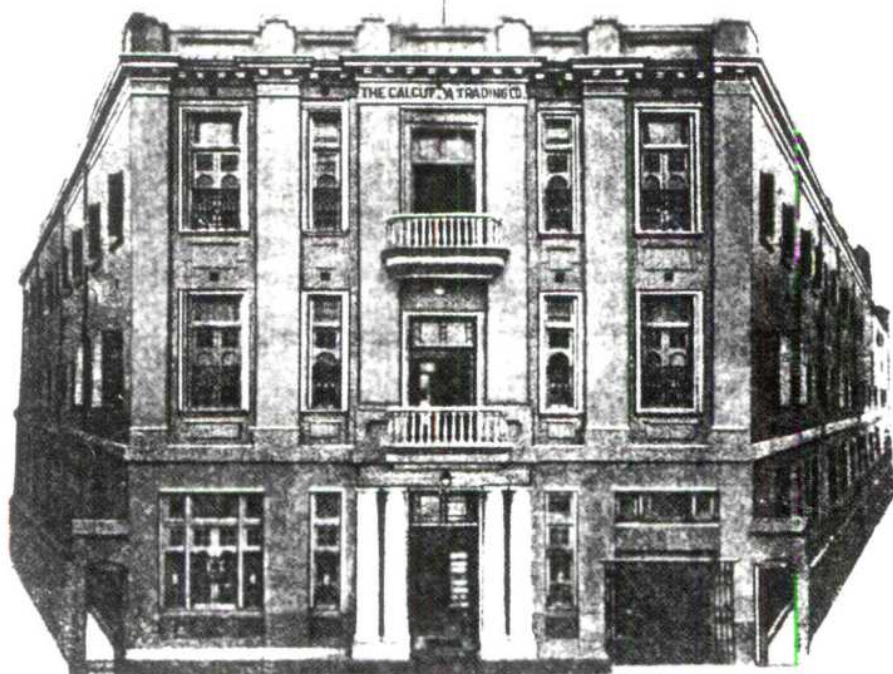
জাদুঘর বিহীন

এক অসামান্য উদয়ঃ কলিকাতা
কলিকাতা মনে দিগন্তমাল।

কলিকাতা কলিকাতা কলিকাতা
কলিকাতা এক না চলেই পলায়ন;
কলিকাতা এক কলিকাতা হইয়াছে ॥

ব্রজেন চন্দ্র

৪ চৈত্র ১৩৩১



“উদয়ন”-কলিকাতা

৭৯-৯, লোহার সাকুলার রোড, কলিকাতা

ফোন — কলিকাতা, ৫৫৫২

যেন প্রসারিয়া উদয় রশ্মি জ্বাল
বৈজয়ন্তী মেলে দিগন্তরাল—।
কলির কলুষে কালো মেঘ যত সব
আলোকের যেন না ঘটায় পরাভব।

৪ঠা চৈত্র, ১৩৩৯

যে আদর্শ পথে, আদর্শ মতে, আদর্শ চিন্তায় সাহিত্য-সারথ্য দিতে চেয়েছেন কবি, উদয়ন-এর ক্ষেত্রেও সেই একই আন্তরিকতা প্রকাশ পেয়েছে। উদয়ন পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথকে একদিকে প্রাবন্ধিক, অন্যদিকে হাস্য হাস্যরসের মধ্যে পাই। যেখানে অবসরের সহজ কথা বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যক্ত হয়। তাতে ‘অদ্ভুত’ ধরনের হাস্যপ্রিয়তার সঙ্গে কবির সদাজাগ্রত কর্তব্যবোধ ব্যক্ত। পত্রিকা সম্পাদনের সহমর্মিতায়, আদর্শচারিতায়, মহৎ চিন্তায় তিনি চিরদিনের হয়ে আছেন বলেই সম্পাদক লিখেছেন—“বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ— এই দুই মনীষার মাসিক পত্র সম্পাদনা বঙ্গসাহিত্যে চিরদিনের জন্য পত্র সম্পাদনের আদর্শস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে.... উদয়নের সূচনায়-আমরা এই মনীষীর সূচিত মহতী বাণীর অনুবর্তনের অভিপ্রায় লইয়াই সাহিত্যপথে যাত্রা করিলাম। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় আমাদেরও উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় হউক-ইহাই আমাদের কামনা।” এই বিনীত কামনার মধ্যেই বোঝা যাবে, বাংলা সাহিত্যের পত্রিকাগুলির প্রতি রবীন্দ্র-মমতা কতখানি গভীর ছিল। এই অভিনব সচিত্র মাসিক উদয়ন-এর দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের ‘প্রশাম’ কবিতাটি। উদয়নের সাহিত্য তীর্থে প্রশাম পাঠিয়েছেন কবি। আর তাঁর মধ্যে ব্যক্ত করেছেন নিজ জীবনের প্রথম প্রভাত থেকে বিদায় দিনের শেষপ্রহর পর্যন্ত নানা স্মৃতির ‘বাষ্পলিপি’। যার মধ্যে মিশে আছে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক জীবনের সুদীর্ঘকালের পথ-পরিক্রমা—

প্রশাম আমি পাঠানু গানে
উদয়গিরি শিখর পানে....
প্রথম সেই প্রভাত দিনে
পড়েছি বাঁধা ধরার ঋণে
কিছু কি তার দিয়েছি শোধ করি?
চির রাতের দুয়ার থেকে
বিদায় বাণী গেলেম রেখে,
নানা রঙের বাষ্পলিপি ভরি।

ইত্যাদি

ছন্দ সম্পর্কে সেই ভারতীর যুগ থেকেই তো রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে নানা কথা বলেছেন। উদয়ন পত্রিকায় ছন্দ সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেন—“কোন মানুষের চলাকে বলি সুন্দর, কোনটা কে বলি তার উন্টো। তফাৎটা কিসে? সে কেবল একটা সমাধান নিয়ে। দেহের ভার সামলিয়ে দেহের চলা একটা সমস্যা। ভারটাই যদি অত্যন্ত প্রত্যক্ষ হয়, তাহলেই অসারিত সমস্যা প্রমাণ করে অপটুতা। যে চলায় সমস্যার সমুৎকৃষ্ট মীমাংসা সেই চলাই সুন্দর।” এই তুলনা দিয়ে তিনি জানান—“ছন্দের একটা দিক আছে যেটাকে বলা যেতে পারে কৌশল কিন্তু তার চেয়ে আছে বড় জিনিষ যেটাকে বলি সৌষ্ঠব। বাহাদুরি তার মধ্যে নেই, সমগ্র কাব্য সৃষ্টির কাছে ছন্দের আত্মবিশ্মৃত আত্মনিবেদনে তার উদ্ভব।” ‘ছন্দের মাত্রা’ সম্পর্কে কবি অন্যত্রও বলেছেন—“ছান্দসিক যাই বলুন এখানে ছন্দ রচয়িতা হিসাবে আমার আবেদন

আছে। ছন্দের তত্ত্ব সম্বন্ধে আমি যা' বলি সেটা 'আমার অশিক্ষিত বলা। সুতরাং তাতে দোষ স্পর্শ করতে পারে, কিন্তু ছন্দের রস সম্পর্কে আমি যদি কিছু আলোচনা করি, সঙ্কোচ করবো না, কেননা ছন্দ সৃষ্টিতে অশিক্ষিত পটুত্বের মূল্য উপেক্ষা করবার নয়।" শুধু তাই নয়, ছন্দের রূপ-কল্পের কথা বলতে গিয়ে কবি সরল অথচ সংক্ষিপ্ত বাচনে বোঝালেন—“যেখানে ছন্দের রূপকল্প একাদিক পদের দ্বারা সম্পূর্ণ হয় সেখানে পদ সংখ্যাও বিচার্য, যথা—

বর্ষণ শাস্ত

পাতুর মেঘ হুসে ক্লাস্ত

বন ছাড়ি, মনে এল নাঁপ রেণু গন্ধ

ভরি দিল কবিতার ছন্দ।

এখানে চারটি পদ এবং প্রত্যেক পদ নানা অসমান মাত্রায় রচিত-সমস্তটাকে নিয়ে ছন্দের রূপকল্প।" আলোচনায় এ সত্য নিশ্চয়ই প্রতিভাত হবে যে, রবীন্দ্রনাথ একই সঙ্গে কত বিচিত্র চিন্তার নায়ক। হাস্যরসের লঘুকথা আবার পাণ্ডিত্যের গুরুগম্ভীর বিষয়ও তিনি স্বল্প কথায় সহজ করে বুঝিয়ে বলেন। উদয়ন রবীন্দ্র স্নেহধন্য একটি পত্রিকারূপে এর স্বরূপ সন্ধানই উল্লেখিত উদাহরণগুলির সার্থকতা। 'মূলতানের সুরে' যে কবি বলেছেন—

গ্রহর শেষের আলোয় রাঙা

সেদিন চৈত্র মাস,

তোমার চোখে দেখেছিলেম

আমার সর্বনাশ।

সেই চিরন্তন রোমান্টিকতাই আবার 'বিদায়ের বাণী'তে বিবাদগ্রস্ত কবি লেখেন 'যাবার সময় হোলো বিহঙ্গের'। এবং সেই কারণেই 'বন্দনা করিয়া যাব এ জন্মের অধি- দেবতারে'।

উদয়ন পর্বে কবির আগেকার লেখা গদ্য-পদ্যের তুলনায় প্লট-গঠন, চরিত্র-চিত্রণ, ভাষারীতি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। এদিক থেকে 'উদয়ন'কে রবীন্দ্র সাহিত্যের শেষ পর্বের সূচনা স্থল বলা যায়।

এই সঙ্গে উদয়ন-এর ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার সম্পাদকীয় : ঘরে-বাহিরে [শিরনামে প্রকাশিত] পুনর্মুদ্রিত করা হল পত্রিকার উদ্দেশ্য তথা আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পাঠককে ছব্ব জ্ঞানাত। এরপর কৌতুহলী পাঠক লক্ষ্য করবেন পত্রিকার মাসিক সূচি অংশে কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনি, রস রচনার পাশাপাশি মাধুকরী [সমকালীন বিভিন্ন পত্রিকার প্রকাশিত চিন্তাশীল প্রবন্ধাবলীর উল্লেখ], নতুন বই [গ্রন্থ সমালোচনা], শিল্প-বাণিজ্য [আলোচনা], খুঁটিনাটি [সাংসারিক ছোট ছোট বিষয়ে জানা-অজানার খবর], বঙ্গ-পরিচয় [ইতিহাস], জিজ্ঞাসু [প্রশ্নোত্তর], ব্যঙ্গচিত্র ইত্যাদি বিভাগগুলি উদয়ন পত্রিকাকে এক আলাদা মাত্র দেয়-যা শুধু সেদিনই নয়, আজকের পত্র-পত্রিকায়ও দুর্লভ।

এভাবেই 'উদয়ন' সাময়িক পত্র জগতে বৈচিত্র্য এনেছিল, লেখায়, ছাপায়, চিত্রে, অঙ্গ সৌষ্ঠবে। বিশেষ করে উদয়নের প্রবন্ধগুলি ছিল উৎকৃষ্ট সাহিত্যগুণ সম্পন্ন। উদয়নের সব লেখাই ছিল ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের নিদর্শন স্বরূপ। আজ নৃপেন্দ্রনাথ, প্যারীমোহন, অনিলকুমার ও জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ কেউই আর জীবিত নেই কিন্তু তাঁদের উদয়ন সাময়িক সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে।

ঘরে-বাইরে

বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বঙ্গদর্শন’ বাংলার সাহিত্য-জগতে নবযুগের প্রবর্তক। সেই পত্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

“বঙ্গদর্শনের পূর্ববর্তী এবং তাহার পরবর্তী বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে যে উচ্চনীচতা তাহা অপরিমিত। দাঙ্জিলিং হইতে যাঁহারা কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখরমালা দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন সেই অজ্ঞেয় শৈলসম্রাটের উদয়বিরশ্চিসমুজ্জ্বল তুষার-কিরীট চতুর্দিকের নিস্তরূ গিরিপারিষদবর্গের কত উর্দ্ধে সমুথিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্তী বঙ্গসাহিত্য সেইরূপ আকস্মিক অত্যুন্নতি লাভ করিয়াছে; একবার সেইটি নিরীক্ষণ এবং পরিমাণ করিয়া দেখিলেই বঙ্কিমের প্রতিভার প্রভূত বল সহজে অনুমান করা যাইবে।”

এহেন “বঙ্গদর্শনের” প্রকাশমুখে পত্র-সূচনায় মাসিক পত্র বাহির করার কৈফিয়ৎ স্বরূপ বঙ্কিমচন্দ্র ১২৭৯ সালে যে-সব কথা বলিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ এই—

“বাঙ্গালা ভাষার প্রতি বাঙ্গালীর অনাদরেই, বাঙ্গালীর অনাদর বাড়িতেছে। সুশিক্ষিত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা পাঠে বিমুখ বলিয়া, সুশিক্ষিত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা রচনায় বিমুখ।

“আমরা এই পত্রকে সুশিক্ষিত বাঙ্গালীর পাঠোপযোগী করিতে যত্ন করিব। যত্ন করিব, এই মাত্র বলিতে পারি। যত্নের সফল তা ক্ষমতাধীন। এই আমাদের প্রথম উদ্দেশ্য।

“দ্বিতীয়, এই পত্র আমরা কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের হস্তে, আরও এই কামনায় সমর্পণ করিলাম যে, তাঁহারা ইহাকে আপনাদিগের বার্তাবহ স্বরূপ ব্যবহার করুন। এই পত্র, কোন বিশেষ পক্ষের সমর্থন জন্য বা কোন সম্প্রদায় বিশেষের মঙ্গল সাধনার্থ সৃষ্ট হয় নাই।

“....যাহাতে এই পত্র সর্বজনপাঠ্য হয়, তাহা আমাদের বিশেষ উদ্দেশ্য।

“....তৃতীয়, যাহাতে নব্য সম্প্রদায়ের সহিত আপামর সাধারণের সহৃদয়তা সম্বন্ধিত হয়, আমরা তাহার সাধ্যানুসারে অনুমোদন করিব।....”

এই “বঙ্গদর্শন” আবার ১৩০৮ সালে যখন নব পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করে তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সম্পাদকীয় উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—

“এখনকার সম্পাদকের একমাত্র চেষ্টা হইবে, বর্তমান বঙ্গচিন্তের শ্রেষ্ঠ আদর্শকে উপযুক্তভাবে এই পত্রে প্রতিফলিত করা। আমরা একান্ত মনে আশা করি, বঙ্গদর্শন সকল সাময়িক কোলাহল হইতে নিজেকে সুদূরে রক্ষা করিয়া সাহিত্যের আদর্শকে নিত্যকালের অচল শিখরের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিবে।

“....ভীষণতা, রুচিবংশ, সত্যের অপলাপ এবং সর্বপ্রকার সাহিত্যনীতির শৈথিল্য, আমাদের পক্ষে অমাজ্জনীয়। আশা করি, সতর্ক পাঠকগণ আমাদেরকে সেই গ্রন্থপথে স্থির রাখিবেন এবং সতর্ক লেখকগণ সেই দুর্গম পথে আমাদেরকে চালনা করিবেন।”

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ—এই দুই মহামনীষীর মাসিক পত্র পরিচালন বঙ্গসাহিত্যে চিরদিনের জন্য পত্র-সম্পাদনের আদর্শ স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। যুগ-ধর্মের কোন কোন সমস্যা ছাড়া তাঁহাদের সম্পাদকীয় উদ্দেশ্যের অভিব্যক্তির উপর নূতন রকমের কিছু অভিব্যক্তি আমাদের নাই। “উদয়নের” সূচনায় আমরা এই দুই মনীষীর সূচিত মহতী বাণীর অনুবর্তনের অভিপ্রায় লইয়াই সাহিত্যপথে যাত্রা করিলাম। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় আমাদেরও উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় হউক—ইহাই আমাদের বিনীত কামনা।

*

*

*

আমাদের কাগজের বিশেষ উদ্দেশ্য সম্পর্কে এখানে একটি বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। একথার পুনরুক্তি নিম্নয়োজন যে, আমাদের দেশ পল্লীপ্রাণ ও পল্লীপ্রধান। যে কয়টি বৃহৎ শহর নব্য-সভ্যতার যুগে গড়িয়া উঠিয়াছে, কোন বিখ্যাত ইংরেজ সাহিত্যিক, এই দেশ পর্যটন করিয়া শহরগুলির পরিচয়ের কালে বলিয়াছিলেন—'mongrel cities'; কথটি প্রায় নির্জলা সত্য। আমাদের সংস্কৃতির ভালো মন্দ যাহাই থাকুক—দেশের সত্যকার পরিচয় লইতে হইলে পল্লীতে পল্লীতে তাহার বিশেষ অনুসন্ধান করিতে হইবে। দেশের জন্য সত্যই যদি কোন কার্য করিবার প্রচেষ্টা করি, দেশের মাটিতে সে প্রচেষ্টা যেন শিকড় গাড়িতে পারে। শূন্যোদ্যান-সৃষ্টির বিলাসিতার আপাত-রম্যতা হইতে মুক্ত হইতে হইবে। আমরা বাঙ্গালা দেশের পল্লীগুলির বিবিধ তথ্যের বিবরণের জন্য আবেদন পত্রস্থ করিলাম। ভরসা করি, দেশপ্রেমিক বাঙ্গালী আমাদিগের প্রচেষ্টাকে সার্থক করিয়া তুলিবেন। এইসব বিবরণ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমরা, বিভিন্ন স্থানের মুখপত্র স্বরূপ বিবিধ পত্রিকা হইতে পল্লীগুলির অভাব-অভিযোগ ও উন্নতিমূলক তথ্যাদির বিবরণও সাগ্রহে প্রকাশিত করিব। বাঙ্গালা দেশ ও বাঙ্গালী জাতির সর্ব্বাঙ্গীণ পরিচয় দান ও উন্নতি-কার্যে নিজেদের নিয়োজিত করা আমাদের বিশেষ লক্ষ্য।

*

*

*

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহাশয়ের “বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী” নামক গ্রন্থের পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠায় বাঙ্গালী জাতির অধ্যবসায় ও কর্মশক্তির অপূর্ব পরিচয় পাওয়া যায়। বর্তমান কালে ইহার সবচেয়ে বড় পরিচয় পাওয়া যায়—বিমান-পথ-যাত্রায় বাঙ্গালীর উদ্যমে। রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে Bengal World Flight Club নামে যে সমিতি স্থাপিত হইয়াছে তাহার কার্য সুনিয়মে চলিতে থাকিলে বাঙ্গালী ‘কুণো’ এই দুর্নাম লোপ পাইবে এবং অন্যান্য কার্যের ন্যায় এই একটি অসমসাহসিক কার্যেও ভারতীয়দিগের মধ্যে তাহার শক্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। আমরা বাঙ্গালীর এই উদ্যমের সাফল্য সম্বন্ধে বিশেষ আশা পোষণ করি।

*

*

*

বাঙ্গালা দেশের দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকাগুলিতে প্রায়ই দুই চারিটি নারী-ধর্মণ বা নারীহরণের সংবাদ দেখিতে পাওয়া যায়। দুর্বৃত্ত গুণ্ডাদের হাত হইতে নারীদের রক্ষা সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছে ও হইতেছে। বাঙ্গালী নারীরা দুর্বল, সুতরাং তাঁহাদিককে শক্তিমতী করিতে পারিলে, তাঁহারা নিজেরাই আত্মরক্ষা করিতে পারিবেন, এরূপ অনুমান অনেকে

করিয়ামনে। এ সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার আছে। নারীদের শক্তিমত্তা হওয়া প্রয়োজন বটে, কিন্তু যে দেশের পুরুষরা শক্তিহীন বলিয়া আপনাদের অন্তঃপুরিকাদিককে রক্ষা করিতে অসমর্থ, সে-দেশে কেবল নারীদের শক্তিমত্তা হইতে বলাটুকি একটা হাস্যকর ব্যাপার নহে? আমাদের মনে হয়, বাঙ্গালী পুরুষরা যে-মাত্রায় সাহসী, নির্ভীক ও শক্তিমান হইয়া উঠিবে, সেই মাত্রায় নারী-ধ্বংস বা হরণ ব্যাপারটিও কমিয়া আসিবে। হিন্দু সমাজের লোকে পরস্পরের বিপদ-আপদে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিহীন হওয়ায়ও নারী-হরণ ইত্যাদি ব্যাপারের সুযোগ ঘটিয়াছে। সুতরাং বর্তমানে সম্ভব হওয়া হিন্দুর বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

*

*

*

আদিমকালে যে-মানুষ একদিন রিক্ত, অসহায় ও শক্তিহীন ছিল সে আপনার বুদ্ধি-প্রভাবে ধীরে ধীরে স্থল ও জল জয় করিয়া ‘পৃথিবীরাজ’ হইয়া উঠিয়াছে। আজ আবার সে ‘আকাশরাজ’ হইবার আকাঙ্ক্ষায় উন্মত্ত হইয়াছে। বিমানপথে আজ তাহার গতি অব্যাহত; পৃথিবীর উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ অতিক্রম করিবার জন্য সে ব্যাকুল। কয়েক বৎসর পূর্বে নটন্ সাহেবের নেতৃত্বে যে বীরের দল পায়ে হাঁটিয়া এভারেস্ট শৃঙ্গ প্রায় অতিক্রম করিয়াছিল, তাহাদের সাহস ও শক্তি প্রভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া লর্ড ক্লাইডস্‌ডেলের নেতৃত্বে আর একটি বীরের দল উড়োজাহাজের সাহায্যে এভারেস্ট অতিক্রম করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছেন। রাটলেজ সাহেবের পরিচালিত অপর একটি দলও পায়ে হাঁটিয়া এভারেস্ট জয়ের আয়োজন করিতেছেন। তাহারা সাফল্য লাভ করিতে পারিলে সমগ্র মানব-সমাজেরই মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।

*

*

*

বৃহত্তম মনুষ্য-সমষ্টির সমস্যা বলিয়াও চীন-সমস্যার গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। নানা কারণে আন্তর্জাতিক সম্বন্ধের দায়িত্ব ও গুরুত্ব এই শতাব্দীতে বিশেষ করিয়া বাড়িয়া গিয়াছে এবং বহু স্থানীয় সমস্যাও যে আন্তর্জাতিক সমস্যা হইয়া উঠে, গত মহাযুদ্ধই তাহার বিশিষ্ট উদাহরণ। আমাদের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থায় আমাদের মনের স্বাভাবিক সহানুভূতির গতি আমাদের মতই প্রাচীন সদ্য-বিস্কম্প্ত চীনের দিকে যাইবে, পশ্চিমের ‘গুরু-মারা চেলা’ জাপান, ব্যবসা-ক্ষেত্রে নিতান্ত দুর্দমনী জাপান, আজ চীন-সম্পর্কে আমাদের সহানুভূতি পাইবে না। কিন্তু আরও প্রশ্ন আছে। জাপান সহানুভূতির দাবী করিতে পারে কি না? জাপান মহাচীনের যে প্রদেশে নিজ অধিকারের প্রশ্ন তুলিয়াছে—সে-স্থান সুদীর্ঘ দিন হইতে মহাচীন হইতে বিচ্ছিন্ন; মহাচীনের ইতিহাসের সহিত সে-অংশের যে যোগ, মহাচীনের-সে হইল বড় মানির কথা। সে-স্থানের অধিবাসীদের সহিত খাস চীনের জাতিগত ও কৃষ্টিগত বিশেষ পার্থক্য আছে। ঐ স্থান জাপানের নব-জাগরণের দিন হইতে জাপানের কমবেশী ‘প্রভাবাধিত’ বা ‘রক্ষিতাংশ’ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। জাপান তাহাকে নিজ অংশ বিবেচনা করিয়া নিজ অর্থ-সামর্থ্য দিয়া তাহার উন্নতি বিধান করিয়াছে। নব-জাগ্রত চীন আজ সে সকলের প্রতিবাদ করিতে পারে তাহা নিঃসন্দেহ, করাও নিশ্চয় উচিত, তথাপি কর্ণপাত করার মত বস্তুব্য জাপানও কিছু নিবেদন করিতে পারে। বার্ট্রাণ্ড রাসেলের বই—The Problem of China প্রথম প্রকাশিত দয় ১৯২২ খৃঃ এবং অন্ততঃ ১৯২৬ খৃঃ পর্যন্ত সংবর্ধিত হইয়াছে। চীনে বাস করিয়া, সে-দেশকে কর্মক্ষেত্র করিয়া,

জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী এই পুস্তকখানি রচনা করেন। ইহাতে চীন সম্বন্ধে সুগভীর ভাবে অত্যন্ত দরদ দিয়া চীনের কথা বলা হইয়াছে। রাসেল প্রতীচ্য-সভ্যতায় আস্থাহীন, তিনি প্রাচ্যের এই সভ্যতাকে মহনীয় বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন এবং সেইজন্যই পুস্তকখানি একটু চিন্তা করিয়া পাঠ করা আবশ্যিক। এত সংক্ষেপে চীন-জাতি ও চীন-সভ্যতার অসুদৃষ্টির সহিত আলোচনা বিরল।

*

*

*

“উদয়নের” মলাটের পৃষ্ঠার পরেই স্বর্গীয় অতীন্দ্রনাথ দে মহাশয়ের যে একখানি ছবি ও ‘পিতৃ-তর্পণ’ নামে যে একটি নিবন্ধ ছাপা হইল সে-সম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে। “উদয়নের” স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত অনিলকুমার দে মহাশয় অতীন্দ্রবাবুর পুত্র। সাহিত্য-পত্রিকা প্রকাশের গুরুভার গ্রহণ করিবার সময় অনিলবাবু তাঁহার পিতাকে প্রণতি জানাইয়া কার্যে অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহার পিতা অতীন্দ্রবাবু একজন কৃতী বঙ্গসন্তান ছিলেন। তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে ‘লাহা স্কলারশিপ’ লইয়া প্রবেশ করেন এবং সেখান হইতে বি-এ পাশ করেন। শেক্সপীয়ার-সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজের সুবিখ্যাত অধ্যাপকব্রয় “রো” এবং “টনি”র তিনি প্রিয় ছাত্র ছিলেন। ‘সুপ্রভাত’ নামে বাংলা দৈনিক পত্রের এবং কয়েকখানি ইংরেজী পত্রেরও সম্পাদকীয় কার্যে অতীন্দ্রবাবু কিছুকাল লিপ্ত ছিলেন। এমন সময়ে অকালে ২৮ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তিনি বিশেষ সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁহার স্বল্প-জীবনকালের মধ্যেই তিনি বহু কর্ম নিযুক্ত ছিলেন। এই সাহিত্যসেবী কৃতী ব্যক্তির পুত্রই আজ তাঁহাকে প্রণতি জানাইয়া “উদয়ন” সাহিত্য-পত্রিকা প্রকাশে উদ্যোগী হইলেন।

উদয়ন : সংখ্যানুক্রমিক সূচি

অশোককুমার রায়

১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৪০

- বহ্নিম তর্পণ ১। আর্শীবাদ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃষ্ঠা ৩।
সাহিত্য (প্রবন্ধ)—ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। পৃষ্ঠা ৪—১৪।
অভিমান (গল্প)—আশালতা দেবী। পৃষ্ঠা ১৫—২৬।
রূপকথার দেশ (গান)—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃষ্ঠা ২৭।
বৌদ্ধ ধর্ম (প্রবন্ধ)—ডঃ নলিনাক্ষ দত্ত। পৃষ্ঠা ২৮—৩১।
বিমান পথে চলার ভবিষ্যৎ (প্রগতি)—সুবিনয় রায়চৌধুরী। পৃষ্ঠা ৩২—৩৮।
প্রবাস মাতা (কবিতা)—কালিদাস রায়। পৃষ্ঠা ৩৯।
নব্য সাহিত্যের নীতি (প্রবন্ধ)—বসু বঙ্কু। পৃষ্ঠা ৪০। বাকি অংশ ৪৬—৪৯।
আলোক চিত্র প্রতিযোগিতা (বিজ্ঞপ্তি) ৪৯।
বিশ্বমাতা (কবিতা)—দিলীপকুমার রায়। পৃষ্ঠা ৪০।
আধুনিক কথাসাহিত্য (প্রবন্ধ)—সরোজনাথ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৪১—৪৫।
মানসী ও প্রেয়সী (কবিতা)—প্যারীমোহন সেনগুপ্ত। পৃষ্ঠা ৫০।
দেহের দাবি (গল্প)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। পৃষ্ঠা ৫১—৫৭।
ভারতীয় কলাশিল্প কথা (প্রবন্ধ)—নৃপেন্দ্রনাথ রায়। পৃষ্ঠা ৫৮—৬৩।
গল্প প্রতিযোগিতা। পৃষ্ঠা ৬৩।
জিজ্ঞাসু (প্রশ্নোত্তর)। পৃষ্ঠা ৬৪।
হাসি (সচিত্র প্রবন্ধ)—সুবিনয় রায়চৌধুরী। পৃষ্ঠা ৬৫—৬৭।
সর্বাঙ্গী (উপন্যাস)—অনুরূপা দেবী। পৃষ্ঠা ৬৮—৭১।
মাধুকরী [বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকা থেকে সংকলিত]—পৃষ্ঠা ৭২—৭৩।
বেকারের ব্যবস্থা (ব্যঙ্গচিত্র)—পৃষ্ঠা ৭৪।
হিন্দু সভ্যতার পত্তন (প্রবন্ধ) ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৭৫—৮৫।
বঙ্গপরিচয় (প্রবন্ধ)—নৃপেন্দ্রনাথ রায়। পৃষ্ঠা ৮৬—৮৭।
জাতির পাঁতি (প্রবন্ধ)—বসুবঙ্কু। পৃষ্ঠা ৮৮। বাকি অংশ পৃষ্ঠা ৯৫—৯৯।
অস্পৃশ্যতা-সমস্যা (প্রবন্ধ)—সত্যেন্দ্রনাথ সেন। পৃষ্ঠা ৮৯—৯৪।
রঙীলা নায়ের মাঝি (ভাটিয়াল গান)—জসীমউদ্দীন। পৃষ্ঠা ৯৭।
কনক লেখা (সচিত্র গল্প)—ননীমাধব চৌধুরী। পৃষ্ঠা ১০০—১১৫।

শুভাগমন (কবিতা)—কুমদরঞ্জন মল্লিক। পৃষ্ঠা ১১৩।
নূতন বই : [শতনরী করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় সমালোচনা শুভ। পৃষ্ঠা ১১৬-১১৮।
অরুণোদয় (উপন্যাস)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ১১৯-১২২।
বাঙ্গালার কাপড়ের কল (শিল্প-বাণিজ্য)—নীহাররঞ্জন মিত্র। পৃষ্ঠা ১২৩-১২৪।
ঘরে-বাইরে [সম্পাদকীয়]—পৃষ্ঠা ১২৫-১২৮।
খেলাধুলা : পরলোকে রঞ্জি। পৃষ্ঠা ১২৮। (সচিত্র)।

১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০

আশীর্বাদ—লেডী অবলা বসু। পৃষ্ঠা ১২৯।
সংস্কৃত কাব্যের অনুবাদ (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃষ্ঠা ১৩১।
ছোটগল্প (প্রবন্ধ)—প্রমথ চৌধুরী। পৃষ্ঠা ১৩২-১৩৬।
উদয়ন পোষ্টার প্রতিযোগিতা বিজ্ঞপ্তি। পৃষ্ঠা ১৩৬।
সর্বাঙ্গী (উপন্যাস)—অনুরূপা দেবী। পৃষ্ঠা ১৩৭-১৪০।
আদর্শ স্বাস্থ্য (প্রবন্ধ)—ডঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র। পৃষ্ঠা ১৪১-১৪৪।
অরুণোদয় (উপন্যাস) (পূর্বানুবৃত্তি)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ১৪৫-১৫২।
অসময়ে (কবিতা)—হাসিরামি দেবী। পৃষ্ঠা ১৫২।
বাংলায় আর্থ সভ্যতার বিস্তার (প্রবন্ধ)—প্রবোধচন্দ্র সেন। পৃষ্ঠা ১৫৩-১৬৩।
চাঁপা (গল্প)—রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ১৬৪-১৬৫।
জলাঙ্গী (কবিতা)—হেমচন্দ্র বাগচী। পৃষ্ঠা ১৬৬।
সতী (গল্প)—সীতা দেবী। পৃষ্ঠা ১৬৭-১৭৪।
দেশীয় ফিল্মের ভবিষ্যৎ (শিল্প-বাণিজ্য)—শ্রীবিলাস। পৃষ্ঠা ১৭৫-১৭৮।
বেকারের ব্যবস্থা (শিল্প-বাণিজ্য)—বেকার বান্ধব। পৃষ্ঠা ১৭৮-১৮০।
চটের আসন বোনা (শিল্প-বাণিজ্য)—তুষারমালা দেবী। পৃষ্ঠা ১৮০-১৮১।
অনাগতা প্রিয়া (কবিতা)—রামেন্দু দত্ত। পৃষ্ঠা ১৮২।
চণ্ডীদাসের প্রেম সাধনা (প্রবন্ধ)—সত্যেন্দ্রকুমার বসু। পৃষ্ঠা ১৮৩-১৮৮।
বাংলা ও বাঙ্গালীর শক্তির অভিব্যক্তি (প্রবন্ধ)—হরিন্দাস পালিত। পৃ ১৮৯-৯৫।
আকাশে ও ধরায় (কবিতা)—প্যারীমোহন সেনগুপ্ত। পৃষ্ঠা ১৯৬-১৯৭।
আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা পৃষ্ঠা ১৯৭।
পদব্রজে ভারতবর্ষ (ভ্রমণ)—দুর্গাপদ ভট্টাচার্য। পৃষ্ঠা ১৯৮-২০৪।
খেলাধুলায় বাঙ্গালী [অধ্যক্ষ সারদারঞ্জন রায়]। পৃষ্ঠা ২০৫-২০৬। (লেখকের নাম মুদ্রিত নেই)
খুঁটিনাটি : দাগ (জানা-অজানা) [দাগ উঠানো] পৃষ্ঠা ২০৭-২০৮। (লেখকের নাম মুদ্রিত নেই)
বৈশাখ-দুপুর (কবিতা)—লতিকা দে। পৃষ্ঠা ২০৮।
পখবণা (সচিত্র প্রবন্ধ)—হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ২০৯-২১৭।
ভারবাহী (গল্প)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ২১৮-২৩১।

- গল্প প্রতিযোগিতা বিজ্ঞপ্তি। পৃষ্ঠা ২৩১।
 রয়েল বেঙ্গল টাইগার (কবিতা) কুমুদরঞ্জন মল্লিক। পৃষ্ঠা ২৩২।
 কুল কুণ্ডলিনী রহস্য (সচিত্র গল্প)—বিশ্বপতি চৌধুরী। পৃষ্ঠা ২৩৩-২৪৩।
 [লেখক অঙ্কিত]।
 ভারতের লুপ্ত অতিকায় সরীসৃপ (প্রগতি)—সুবিনয় রায় চৌধুরী। পৃষ্ঠা ২৪৪-২৪৫।
 নূতন বই : [দি ইনসিওরেন্স এ্যান্ড ফাইন্যান্স রিভিউ—সম্পাদক মণীন্দ্রমোহন মৌলিক।
 —মিত্র। পৃষ্ঠা ২৪৬। বঙ্গের বাহিরে বাদ্গালী (তৃতীয় ভাগ)—জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস।
 —গুপ্ত। পৃষ্ঠা ২৪৬।
 ঘরে-বাইরে (সম্পাদকীয়)—পৃষ্ঠা ২৪৭-২৪৮।

১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩৪০

- প্রশস্তি : আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। পৃষ্ঠা ২৪৮খ।
 উদয়ন (কবিতা)—কুমুদরঞ্জন মল্লিক। পৃষ্ঠা ২৪৯।
 মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। [অরবিন্দ সরদার কর্তৃক অনুদিত]
 পৃষ্ঠা ২৫০-২৫২।
 নতুনে পুরাতনে (প্রবন্ধ)—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃষ্ঠা ২৫৩-২৫৬।
 প্রকৃতি (গল্প)—বিজয়রত্ন মজুমদার। পৃষ্ঠা ২৫৭-২৬৪।
 প্রাচীন কলিকাতা (বাগবাজারের ইতিহাস)—পূর্ণচন্দ্র দে, উদ্ভটসাগর।
 পৃষ্ঠা ২৬৫-২৬৯।
 বন্যজন্তুর ব্যবসায় (প্রগতি)—সুবিনয় রায়চৌধুরী। পৃষ্ঠা ২৭০-২৭৩ (সচিত্র)।
 সর্বাণী (উপন্যাস) (পূর্বনিবৃত্তি)—অনুরূপা দেবী। পৃষ্ঠা ২৭৪-২৮৪।
 রবীন্দ্রনাথের প্রতি শান্তিনিকেতন (কবিতা) কবিশেখর কালিদাস রায়।
 পৃষ্ঠা ২৮৪-২৮৫।
 ঈশ্বর (গল্প) বুদ্ধদেব বসু। পৃষ্ঠা ২৮৬-২৯৪।
 পদ্মজ্ঞে ভারতবর্ষ (ভ্রমণ)—দুর্গাপদ ভট্টাচার্য। পৃষ্ঠা ২৯৫-২৯৮। (পূর্বনিবৃত্তি)
 রবীন্দ্রনাথের লুপ্ত কাব্য (প্রবন্ধ)—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ২৯৯-৩০৯।
 “আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে” (কবিতা)—প্রভাতকিরণ বসু। পৃষ্ঠা ৩১০।
 জেজুরের কাহিনী (বঙ্গপরিচয়)—সুধীরকুমার মিত্র। পৃষ্ঠা ৩১১।
 উদয় ও অস্ত (গল্প)—প্রভাবতী দেবী সরস্বতী। পৃষ্ঠা ৩১২-৩২০।
 কৃতিবাসের গঙ্গাবতরণ (প্রবন্ধ)—নলিনীকান্ত ভট্টাশালী। পৃষ্ঠা ৩২১-৩৩০।
 দরদী (কবিতা)—দিলীপকুমার রায়। পৃষ্ঠা ৩৩১।
 অরুণোদয় (উপন্যাস) (পূর্বনিবৃত্তি)—শৈলজ্ঞানন্দ মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৩৩২-৩৩৬।
 আমরা কিসে কম? কি উৎসাহে? কি উদ্যমে? (ব্যঙ্গ চিত্র)—পৃষ্ঠা ৩৩৭।
 নূতন স্বাস্থ্য-তত্ত্ব (প্রবন্ধ)—ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র। পৃষ্ঠা ৩৩৮-৩৪২।
 জিহ্বাসু (প্রশ্নোত্তর)। পৃষ্ঠা ৩৪৩-৩৪৪।
 বর্ষাতি (গল্প)—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৩৪৫-৩৫৪।

শিশিরকুমার ইনস্টিটিউট [ত্রয়োদশ বার্ষিক অধিবেশন]। পৃষ্ঠা ৩৫৪-৩৫৫।

নূতন বই : ভারত কি সভ্য? [শ্রী অরবিন্দের Is India Civilised? এর বঙ্গানুবাদ]—
অনুবাদ অনিলবরণ রায়।—বীকন। দায়ী (উপন্যাস) হাসিরাশি দেবী।—নীহাররঞ্জন
মিত্র। দিদির বর (উপন্যাস) রাসবিহারী প্রসঙ্গ—নীহাররঞ্জন মিত্র। যোগ-বিয়েগ
(উপন্যাস)—শচীন সেন।—প্রভাতকিরণ বসু। Women of India by Otto
Rothfeld, FRGS, ICS—'ন'।

Do We Agree? [বার্নার্ড শ ও জি. কে. চেম্বারটনের মধ্যে বিতর্ক সভাপতি বেলক]
The New Webster's Collegiate Dictionary [বিশ্ববিখ্যাত Webster
অভিধানের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ] New Discoveries relating to the Antiquity of
Man - by Sir Arthur Keith, Fariduddin' Attar : The Persion Mystics :
Attar - by Margaret Smith ['Wisdom of the East' series-এর বই খানিতে
কবির একটি ছোটজীবনী, তাঁর দার্শনিক মতের পরিচয় আছে] — "ন"। পৃষ্ঠা
৩৫৬-৩৫৮।

মাধুকরী : প্রবর্তক বৈশাখ, ১৩৪০ / বঙ্গলক্ষ্মী / প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০ / বঙ্গশ্রী /
মাসিক মোহাম্মদী / প্রদীপ / অভ্যুদয়, বৈশাখ, ১৩৪০ / বিচিত্রা-বৈশাখ, ১৩৪০ /
অর্চনা, চৈত্র, ১৩৩৯ / ভারতবর্ষ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০ / পুষ্পপাত্র জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০ /
মাসিক বসুমতী বৈশাখ, ১৩৪০, ক্লাইড স্ট্রীট, বৈশাখ ১৩৪০। জীবনবীমা, চৈত্র,
১৩৩৯। কৃষিলক্ষ্মী, বৈশাখ ১৩৪০ / জয়শ্রী, বৈশাখ, ১৩৪০। পৃষ্ঠা ৩৫৯-৩৬০।
ঘরে বাইরে (আলোচনা)।—প্রমথ চৌধুরী। পৃষ্ঠা ৩৬১-৩৬৪।

১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০

প্রশস্তি (শুভেচ্ছাবার্তা)—সন্তোষকুমার বসু (কলিকাতার মেয়র)। পৃষ্ঠা ৩৬৪(খ)।

উদয়ন কথা—স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী। পৃষ্ঠা ৩৬৪(গ)।

স্বর্গদ্বারে (কবিতা)—কবিশেখর কালিদাস রায়। পৃষ্ঠা ৩৬৫।

মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন (প্রবন্ধ)—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। পৃষ্ঠা ৩৬৬-৩৬৯।

অপ্রেমিক (কবিতা)—কুমুদরঞ্জন মল্লিক। পৃষ্ঠা ৩৬৯।

ফরাসী জাতির স্বরূপ (প্রবন্ধ)—প্রবোধচন্দ্র বাগচী। পৃষ্ঠা ৩৭০-৩৭৩।

স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের অপ্রকাশিত রচনা (প্রবন্ধ)—ভূদেব মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা
৩৭৪-৩৭৫।

ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের গোড়ার কথা (প্রবন্ধ)—অশোকনাথ শাস্ত্রী। ৩৭৬-৩৮০।

প্রকৃতি (গল্প) (পূর্বপ্রকাশিতের পর)—বিজয়রত্ন মজুমদার। পৃষ্ঠা ৩৮১-৩৯০।

প্রাচীন কলিকাতা (বাগবাজারের ইতিহাস)—পূর্ণচন্দ্র দে, কাব্যরত্ন, উদ্ভট সাগর
(পূর্বানুবৃতি)। পৃষ্ঠা ৩৯১-৩৯৮।

ইংরাজি শিক্ষা ও তাহার প্রথম যুগ (প্রবন্ধ)—অনাদিনাথ মুখোপাধ্যায়।

পৃষ্ঠা ৩৯৯-৪০৫।

মহানাদে প্রাচীন নগরী আবিষ্কার (বঙ্গ পরিচয়) (প্রবন্ধ)—গুরুদাস রায়।

পৃষ্ঠা ৪০৬-৪১১।

- গঙ্গা সিদ্ধু নর্মদা কাবেরী যমুনা ওই (গান) কথা ও সুর কাজী নজরুল ইসলাম, স্বরলিপি জগৎ ঘটক। পৃষ্ঠা ৪১২-৪১৪।
- অরুণোদয় (উপন্যাস) (পূর্বানুবৃতি)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৪১৫-৪২২।
- ভালোবাসা—মরে সেও (কবিতা)—হেমেন্দ্রলাল রায়। পৃষ্ঠা ৪২৩-৪২৪।
- ছক্ ওয়ার্ম (গল্প)—রাধাচরণ চক্রবর্তী। পৃষ্ঠা ৪২৫-৪৩৩।
- পদব্রজে ভারতবর্ষ (ভ্রমণ) পূর্বানুবৃতি—দুর্গাপদ ভট্টাচার্য। পৃষ্ঠা ৪৩৪-৪৩৮ (পূর্বানুবৃতি)
- বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয় ও দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান (প্রবন্ধ)—সুরেশচন্দ্র নন্দী। পৃ ৪৩৯-৪৪।
- “কতদিনে ফিরিবে?” (গল্প)—মানিক ভট্টাচার্য। পৃষ্ঠা ৪৪৫-৪৫১।
- সর্বাণী (উপন্যাস) (পূর্বানুবৃতি)—অনুরূপা দেবী। পৃষ্ঠা ৪৫৩-৪৫৯।
- আমরা কিসে কম? নিখিল ভারত হরিজন দিবস। [রঙ্গচিত্র সহ]—পৃষ্ঠা ৪৫২।
- জিজ্ঞাসু (প্রশ্নোত্তর)—বিনয় দাশগুপ্ত / প্রাণকৃষ্ণ পাল / অনিল সরকার / সুধাংশু কুমার দত্ত / নীহাররঞ্জন মিত্র / শিশির মুখোপাধ্যায় / সুধাংশুকুমার দত্ত। পৃষ্ঠা ৪৬০।
- মাধুকরী (আবাড়, ১৩৩০ সংখ্যায় প্রকাশিত অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, জীবনরচিত, ভ্রমণ, দেশ পরিচয়, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য ও শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ পঞ্জি)। পৃষ্ঠা ৪৬১-৪৬২।
- অসাধারণ (গল্প)—প্রবোধকুমার সান্যাল। পৃষ্ঠা ৪৬৩-৪৭০।
- কবি (কবিতা)—শ্বেতকুমার মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৪৭১।
- নূতন বই (সমালোচনা) : সন্তানপালন, (রমেশ শর্মা), *Wood & Lino-cuts* (সুবিনয় রায়চৌধুরী), *দিবধু* (কাব্য) (রামেন্দু দত্ত), *দক্ষিণ হাওয়া* (কাব্য) (রামেন্দু দত্ত), *পদ্মা*, (কাব্য) (প্রভাতকিরণ বসু), *নিশিপদ্ম* (গল্প) (নীহাররঞ্জন মিত্র), *মধুরা* (কাব্য) (সুরবালা ঘোষ)। পৃষ্ঠা ৪৭২-৪৭৪।
- প্রগতি : অতি আধুনিক ‘অটো গাইরো’; আমে ভিটামিন; ওজনে (OZONE) জল পরিস্কার, নূতন ধরণের নিব্ (বিজ্ঞান সংবাদ)। পৃষ্ঠা ৪৭৫-৪৭৬।
- শেষের বাঁশী (কবিতা)—কর্মযোগী রায়। পৃষ্ঠা ৪৭৬
- ঘরে-বাইরে (প্রসঙ্গ শিক্ষাব্যবস্থা)—প্রমথ চৌধুরী। পৃষ্ঠা ৪৭৭-৪৮৪।
- প্রবাসে বাঙ্গালী ছাত্র (সচিত্র সংবাদ)। পৃষ্ঠা ৪৮৪।

১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩৪০

- দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত (চিত্র)
- দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন (কবিতা)—যতীন্দ্রমোহন বাগচী। পৃষ্ঠা ৪৮৫-৪৮৬।
- ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিদ্যাশিক্ষা (প্রবন্ধ)—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। পৃষ্ঠা ৪৮৭-৪৯০।
- স্বর্গত সূরী জগদানন্দের উদ্দেশে (কবিতা)—কবিশেখর কালিদাস রায়। পৃষ্ঠা ৪৯০।
- শিশু সাহিত্য (প্রবন্ধ)—শান্তা দেবী। পৃষ্ঠা ৪৯১-৪৯৩।
- আবরণ (গল্প)—রামপদ মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৪৯৪-৫০০।
- জড়, জীব ও ধাতুপুরুষ (প্রবন্ধ)—ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। পৃষ্ঠা ৫০১-৫১৫।
- সত্যই আজ আর জাতির চোখে ঘুম নাই (ব্যঙ্গ চিত্র)। পৃষ্ঠা ৫১৬।

অরুণোদয় (উপন্যাস) (পূর্বানুবৃত্তি)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৫১৭-৫২৬।

বঙ্গালার তিনটি প্রাচীন মন্দির (বঙ্গ পরিচয়) (প্রবন্ধ)—বলাইচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পৃষ্ঠা ৫২৭-৫৩২।

তির্যক পঞ্চক (কবিতা)—কপিঞ্জল। পৃষ্ঠা ৫৩২।

মারাতী ও বাংলা ভাষায় সংস্কৃত হইতে শব্দ গ্রহণ (প্রবন্ধ)—কাশীনারায়ণ দীক্ষিত।

পৃষ্ঠা ৫৩৩-৫৩৪।

কলমীলতা (কবিতা)—বন্দে আলী মিয়া। পৃষ্ঠা ৫৩৪।

সর্বগী (উপন্যাস) (পূর্বানুবৃত্তি)—অনুরূপা দেবী। পৃষ্ঠা ৫৩৫-৫৪১।

চোক গেল (কবিতা)—ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী। পৃষ্ঠা ৫৪১।

জলসার গল্প (গল্প)—হেমেন্দ্রলাল রায়। পৃষ্ঠা ৫৪২-৫৫২।

প্রিয়া (কবিতা)—দেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৫৫২।

কথা সাহিত্যের কথা—নৃপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী। পৃষ্ঠা ৫৫৩-৫৫৬।

ক্ষমতার জয় (গল্প)—শৈলবালা ঘোষ জায়া। পৃষ্ঠা ৫৫৭-৫৬২।

নূতন বই : Saintsbury (Ethel Bruce) : A Calander of the Court Minutes

etc. of the East India Company (1671-1673, before, London—

সমালোচনা by W. T. Otte will, সমালোচনা—S. Kumar, ইতালিতে বারকয়েক—

বিনয়কুমার সরকার।—ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। প্রবাসের কথা—শচীন

সেন।—বীকন। Butenschon (Andrea) : The life of Mughal Princess

Jahanara Bagam। by Lauranc Binyon. London (1931)—S. Kuman.

Tarberville (A.S.) : The Spanish Inquisition. Landon. Butter Worth

(1932) সমালোচনা এস. কুমার। পৃষ্ঠা ৫৬৩-৫৬৬।

আলোক চিত্র-প্রতিযোগিতা (বিজ্ঞপ্তি)। পৃষ্ঠা ৫৬৬।

বাঙালীর বিলোপ (প্রবন্ধ) রাধাকমল মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৫৬৭-৫৮৪।

শ্রাবণ-সঙ্ঘায় (কবিতা)—রামেন্দু দত্ত। পৃষ্ঠা ৫৮৫।

জিঞ্জাসু—(প্রশ্নোত্তর)। পৃষ্ঠা ৫৮৬-৫৮৮।

চক্রনেমি (গল্প)—সতীপতি বিদ্যাভূষণ। পৃষ্ঠা ৫৮৯-৫৯৯।

গীত ও রূপ (গান) আষাঢ়ের ধারাজল ছন্দে কথা সুর ও স্বরলিপি—নির্মলচন্দ্র

বড়াল, বাণীকণ্ঠ। পৃষ্ঠা ৬০০-৬০১।

মাধুকরী (শ্রাবণ, ১৩৩০ সংখ্যায় প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ)। পৃষ্ঠা ৬০২।

ঘরে-বাইরে—(আলোচনা)—প্রমথ চৌধুরী। পৃষ্ঠা ৬০৩-৬০৮।

১ম বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা আশ্বিন, ১৩৪০

শরৎ-বন্দনা (চিত্র) ৬০৮খ

ঋতুদের দেবতা (প্রবন্ধ) বিনয়তোষ ভট্টাচার্য। পৃষ্ঠা ৬০৯-৬১৫।

সাপ ও বাজপাখি (গল্প)—সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃষ্ঠা ৬১৬-৬১৭।

ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্ন সমস্যায় বাঙালীর পরাজয়—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ৬১৮-৬২০।

- আকাঙ্ক্ষা (কবিতা)—কুমুদরঞ্জন মল্লিক ৬২১।
- হাজারভূজা বাঙালি জাতি (প্রবন্ধ)—বিনয়কুমার সরকার ৬২২-৬৩৭
- “হিমাদ্রির স্বর্গভূমি” পরিক্রমা (সচিত্র ভ্রমণ)—যামিনীকান্ত সেন। ৬৩৮-৬৪৮
- দ্বিজেন্দ্রলালের স্বরবৃত্ত ছন্দ (প্রবন্ধ)—প্রবোধচন্দ্র সেন। ৬৪৯-৬৫৮।
- যট্‌স্বর স্বরবৃত্ত ও দ্বিজেন্দ্রলাল—দিলীপকুমার রায় ৬৫৯-৬৬২
- ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের অপ্রকাশিত রচনা। পৃষ্ঠা ৬৬৩-৬৬৪।
- সাড়ে চার আনা (কবিতা) কবিশেখর কালিদাস রায়। ৬৬৫-৬৬৬।
- রাস্কেল (গল্প)—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। ৬৬৭-৬৭১।
- ভিক্ষুক (প্রবন্ধ)—ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। ৬৭২-৬৭৫।
- কিশোর শরৎ (কবিতা)—রাধারানী দেবী। পৃষ্ঠা ৬৭৬।
- শ্রী শ্রী দুর্গমূর্তি পরিচয়—ছায়াদেবী। পৃষ্ঠা ৬৭৭-৬৮৪।
- প্রাচীন কলিকাতা (ইতিহাস)—পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভট সাগর। ৬৮৫-৬৮৮
- অদ্ভুত (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃষ্ঠা ৬৮৯-৬৯২
- বৈজ্ঞানিক মনীষ মিস্ত্রির (গল্প)—তুলসীদাস মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৬৯৩-৭০০
- রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প (প্রবন্ধ)—সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত। পৃষ্ঠা ৭০১-৭০৮
- গান—শান্তি পাল। পৃষ্ঠা ৭০৯।
- সর্বাঙ্গী (উপন্যাস) অনুরূপা দেবী পৃষ্ঠা ৭১০-৭১৪
- বঙ্গ পরিচয় বাঙ্গলার দেবমন্দির—নলিনীকান্ত ভট্টশালী। পৃষ্ঠা ৭১৫-৭২২।
- গীত ও রূপ কথা—অনুরূপা দেবী
- সুর গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বরলিপি রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৭২৩-৭২৪।
- নবকিশোরের পরিচয় (গল্প) বুদ্ধদেব বসু। পৃষ্ঠা ৭২৫-৭৩৬।
- চিরদিনের সাধী (কবিতা)—হেমেন্দ্রলাল রায়। পৃষ্ঠা ৭৩৭-৭৩৮।
- অরুণোদয় (উপন্যাস)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৭৩৯-৭৪২।
- প্রথম যৌতুক (কবিতা) সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৭৪৩।
- আঁধারে আলো (গল্প)—প্রভাবতী দেবী সরস্বতী। পৃষ্ঠা ৭৪৪-৭৫২।
- অতীত (কবিতা)—কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৭৫২-৭৫৩।
- নূতন বই / গ্রন্থ সমালোচনা : স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ—জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার। বিমলেন্দু কয়াল, গল্পের মায়াপূরী (গল্প)—হেমেন্দ্রলাল রায়—শচীন সেন, বড় অবতার—নরেন্দ্রনাথ বসু (বিমলেন্দু কয়াল)। Savarkar (V. D.)—J. Kumar।
- পৃষ্ঠা ৭৫৪-৭৫৫।
- বিদায় ক্ষণে (কবিতা)—যতীন্দ্রমোহন বাগচী। পৃষ্ঠা ৭৫৬-৭৫৭।
- ঘরে বাইরে (সম্পাদকীয়)—প্রমথনাথ চৌধুরী। পৃষ্ঠা ৭৫৮-৭৬২।
- সাময়িকী—পৃষ্ঠা ৭৬৩-৭৬৮।

১ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৪০

প্রশস্তি—রাজা স্যার মন্মথনাথ রায়চৌধুরী, প্রেসিডেন্ট বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল। পৃষ্ঠা ৭৬৮খ।

কোথায় ভগবান? (প্রবন্ধ)—নলিনীকান্ত গুপ্ত। পৃষ্ঠা ৭৬৯-৭৭১।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প (প্রবন্ধ)—সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত। পৃষ্ঠা ৭৭২-৭৮৩।

বিজয়ায় (কবিতা)—কালিদাস রায়। পৃষ্ঠা ৭৮৪।

আদ্য বাংগালীর সামাজিক শক্তির উদ্বোধন (প্রবন্ধ)—হরিদাস পালিত।

পৃষ্ঠা ৭৮৫-৭৯৫।

বিধবার ঠাকুর (গল্প) পূর্বানুবৃত্তি—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৭৯৬-৮০৬ (ক্রমশ)।

রূপের দেহ (কবিতা)—ভূজঙ্গধর চৌধুরী। পৃষ্ঠা ৮০৭।

‘যন্তর-মন্তর’ (সচিত্র প্রবন্ধ)—বিমলেন্দু কয়াল। পৃষ্ঠা ৮০৮-৮১২

গঙ্গৈব পরমাগতিঃ (প্রবন্ধ)—দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী। পৃষ্ঠা ৮১৩-৮১৮।

পাথর (কবিতা)—সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃষ্ঠা ৮১৯

পত্র পরিচিতি (গল্প)—আশালতা দেবী। পৃষ্ঠা ৮২০-৮২৯।

শিক্ষার ট্রাজিডি (সচিত্র)। পৃষ্ঠা ৮২৯।

শরৎচন্দ্রের ‘চরিত্রহীন’ (প্রবন্ধ)—ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৮৩০-৮৩৫।

অকরণ (কবিতা)—গিরিজাকুমার বসু। পৃষ্ঠা ৮৩৫।

সর্বাঙ্গী (উপন্যাস) (পূর্বানুবৃত্তি)—অনুরূপা দেবী। পৃষ্ঠা ৮৩৬-৮৪২।

কবিতা—। যতীন্দ্রমোহন বাগচী। পৃষ্ঠা ৮৪২।

বাণীমন্দিরের পূজারী (গ্রন্থাগার বিষয়ক সচিত্র প্রবন্ধ)—মুনীন্দ্র দেব রায়।

পৃষ্ঠা ৮৪৩-৮৫১।

লর্ড ডাক্তার (গল্প)—মানিক ভট্টাচার্য। পৃষ্ঠা ৮৫২-৮৬০।

পৃথিবীর ব্যথা (কবিতা)—সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী। পৃষ্ঠা ৮৬১-৮৬২।

কবিরাজ গোবিন্দ দাস (প্রবন্ধ)—হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৮৬৩-৮৭২।

গীত ও রূপ : গান—কথা রামেন্দু দত্ত/সুর ও স্বরলিপি—দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পৃষ্ঠা ৮৭৩-৮৭৪।

পদ্মজ্ঞে ভারতবর্ষ (সচিত্র ভ্রমণ কাহিনী) (পূর্বানুবৃত্তি)—দুর্গাপদ ভট্টাচার্য।

পৃষ্ঠা ৮৭৫-৮৭৯।

অরুণোদয় (উপন্যাস) (পূর্বানুবৃত্তি)—শৈলজ্ঞানন্দ মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৮৮০-৮৮৩।

আলোর পাথেয় (কবিতা)—হেমেন্দ্রলাল রায়। পৃষ্ঠা ৮৮৪।

ভারতে চিনির যুগ (শিক্ষ-বাণিজ্য)—মণীন্দ্রমোহন মৌলিক। পৃষ্ঠা ৮৮৫-৮৮৮।

ঘরে-বাইরে (প্রবন্ধ)—প্রমথ চৌধুরী। পৃষ্ঠা ৮৮৯-৮৯৪।

মর্মর (গল্প)—কর্মযোগী রায়। পৃষ্ঠা ৮৯৫-৯০১।

নূতন বই : [মণি দীপা—হেমেন্দ্রলাল রায়]—সমালোচনা জলধর সেন। [কথা/গুচ্ছ—

প্রমথ চৌধুরী]—পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। [মানসকমল—নরেন্দ্রনাথ বসু]—নীহাররঞ্জন

মিত্র। [শিশুবার্ষিকী—সম্পাদনা যতীন্দ্রমোহন বাগচী]—বিমলেন্দু কয়াল। [আরতি—

ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস]—বিনয় দত্ত। পৃষ্ঠা ৯০২-৯০৪।

সাময়িকী : বিজয়ায়। স্বর্গীয় ডক্টর আনি বৈশান্ত। মেদিনীপুরে হত্যা। জাপ-ভারত-

ল্যাঙ্কাসায়রের বাণিজ্য-বৈঠক। মহাত্মা ও ডিম্ফু ফুজী। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিল। রাজা

রামমোহন রায়। বহুশিক্ষ। সংরক্ষণ আইন। ভারতীয় সংবাদপত্র সেবী সঙ্ঘ। স্বর্গীয়
বিজ্ঞানচাৰ্য ডাঃ মহেন্দ্ৰলাল সরকার। ওরিয়েন্টাল থ্রাস ওয়ার্কস। ছবিঘর। বালীবন্দ
শিশু বিদ্যালয়। উদয়নের গল্প প্রতিযোগিতা। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প। পৃষ্ঠা ৯০৫-
৯১২।

১ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৩৪০

মৃত্যু সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণা (প্রবন্ধ)—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৯১৩-৯২৪।
অন্ন সমস্যা ও বাঙ্গালীর পরাজয় [বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতি কি বিদ্যার্জনের সহায়ক?]
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। পৃষ্ঠা ৯২৫-৯২৭।
বিধবার ঠাকুর (গল্প) (পূর্বানুবৃতি)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৯২৮-৯৩৮।
পরশ (কবিতা)—কুমুদরঞ্জন মল্লিক। পৃষ্ঠা ৯৩৮।
বিদ্যাসাগর বাণীভবন (প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস : সচিত্র)—লেডী অবলা বসু।
পৃষ্ঠা ৯৩৯-৯৪৫।
স্পর্শের মায়া (গল্প)—পূর্ণশশী দেবী। পৃষ্ঠা ৯৪৬-৯৫৩।
প্রাচীন ভারতে ঐন্দ্রজালিক প্রদর্শনী (প্রবন্ধ)—অর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।
পৃষ্ঠা ৯৫৪-৯৫৬।
প্রতিষ্ঠায় বিসর্জন (কবিতা)—প্রভাবতী দেবী সরস্বতী। পৃষ্ঠা ৯৫৭।
কাব্যপুরুষ ও সাহিত্যবিদ্যাবধু (রূপক)—অশোকনাথ ভট্টাচার্য। পৃষ্ঠা ৯৫৮-৯৬২।
সন্ধান (কবিতা)—প্রতিভা ঘোষ। পৃষ্ঠা ৯৬২।
বিহারীলাল (জীবনী) [সচিত্র)—মন্মথনাথ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৯৬৩-৯৭৫।
চার্বাক-পন্থী (গল্প)—রামপদ মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৯৭৫-৯৮৩।
গঙ্গা, গীতা ও গায়ত্রী (প্রবন্ধ)—জিতেন্দ্রনাথ বসু। পৃষ্ঠা ৯৮৪-৯৮৬।
কঙ্কাল (গল্প)—কালিদাস রায়। পৃষ্ঠা ৯৮৭-৯৮৮।
চিরতারুণ্য (কবিতা)—জগৎমোহন সেন। পৃষ্ঠা ৯৮৮।
সর্বাঙ্গী (উপন্যাস) (পূর্বানুবৃতি)—অনুরূপা দেবী। পৃষ্ঠা ৯৮৯-৯৯৩।
গীত ও রূপ : বেহাগ-তেতলা—কথা, সুর ও স্বরলিপি রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
পৃষ্ঠা ৯৯৪-৯৯৫।
বিচিত্রা : কবরের পরেও, গ্যাসের যুগ; ক্রীতদাসদের কাহিনী। পৃষ্ঠা ৯৯৬-১০০৪।
আশা (গল্প)—ফাঙ্কনী মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ১০০৪-১০১৫।
প্রাচীন কলিকাতা (ইতিহাস)—পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর। পৃষ্ঠা ১০১৫-১০১৭।
শার্দূল-শূদ্রে উদয়ন (গল্প)—বরেন্দ্রসুন্দর চট্টোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ১০১৭-১০২০।
অরুণোদয় (উপন্যাস) (পূর্বানুবৃতি)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ১০২১-১০২৪।
নূতন বই : [মার্কিন সমাজ ও সমস্যা—নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী]—সৌরীন্দ্রমোহন
মুখোপাধ্যায়। [দক্ষিণ আফ্রিকা দৌত্য-কাহিনী—দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী] বিমলেন্দু
কয়াল। পৃষ্ঠা ১০২৫-১০২৬।
ঘরে-বাইরে—প্রমথ চৌধুরী। পৃষ্ঠা ১০২৭-১০৩২।

সাময়িকী : মহেন্দ্রলাল সরকার; বিঠলভাই প্যাটেল; ভারতে নারী জাগরণ; জগন্তারিণী স্বর্ণপদক; কলিকাতার স্বাস্থ্য ; বাংলায় প্রথম চিনির কল ; মন্দির প্রবেশ; সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত ও ভাই পরমানন্দ। পৃষ্ঠা ১০৩৩-১০৪০।

১ম বর্ষ, নবম সংখ্যা, পৌষ, ১৩৪০

ত্যাগের জয় (প্রবন্ধ)—রমাপ্রসাদ চন্দ্র। পৃষ্ঠা ১০৪১-১০৪৮।

ব্যবধান (কবিতা)—শ্যামাপদ চক্রবর্তী। পৃষ্ঠা ১০৪৯।

রাজা রামমোহন রায় (প্রবন্ধ)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ১০৫০-১০৫৬।

পাষণের ফুল (কবিতা)—নীলিমা দাস। পৃষ্ঠা ১০৫৬।

ছবি (গল্প)—হেমেন্দ্রলাল রায়। পৃষ্ঠা ১০৫৭-১০৬৪।

বসুন্ধরা (কবিতা)—প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ১০৬৫।

বাঙলা সাহিত্যের মূলসূত্র (প্রবন্ধ)—সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত। পৃষ্ঠা ১০৬৬-১০৭৮।

উত্তরাধিকারী (গল্প)—সরোজকুমার রায়চৌধুরী। পৃষ্ঠা ১০৭৯-১০৮৭।

পসারী (কবিতা)—মমতা মিত্র। পৃষ্ঠা ১০৮৮।

মন্তেসরি প্রণালী অনুযায়ী শিক্ষাদান (প্রবন্ধ)—মায়া সোম। পৃষ্ঠা ১০৮৯-১০৯২।

হরিজন জাতক (প্রবন্ধ)—নরেন্দ্র দেব। পৃষ্ঠা ১০৯৩-১১০২।

কৈলাসী (গল্প)—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ১১০৩-১১১৩।

বুদ্ধের মুখশ্রী (সচিত্র প্রবন্ধ)—যামিনীকান্ত সোম। পৃষ্ঠা ১১১৪-১১২৫।

অরুণোদয় (উপন্যাস) (পূর্বনিবৃত্তি)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ১১২৬-১১৩০।

চিত্র-শিল্পী (কবিতা)—চন্দ্রশেখর আঢ্য। পৃষ্ঠা ১১৩০।

আধুনিক যুগের লুপ্ত পক্ষী (সচিত্র প্রবন্ধ) (প্রবন্ধ) অশেষচন্দ্র বসু।

পৃষ্ঠা ১১৩১-১১৩৪।

দাবী (গল্প)—অরবিন্দ দত্ত। পৃষ্ঠা ১১৩৪-১১৪৬।

মার্কিনের আর্থিক দুর্গতি ও তাহার সমাধানের প্রচেষ্টা (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ ঘোষ।

পৃষ্ঠা ১১৪৭-১১৫১।

নূতন বই : [Rammuhan Roy the Man and his Work : Centenary Publicity

Book Let No. 1 : Compiled and Edited by Amal Home] সুনীতিকুমার

চট্টোপাধ্যায়। [বহুদূরপী (গল্পের বই)—বিশ্বপতি চৌধুরী]—যতীন্দ্রমোহন বাগচী।

[পরিগাম (উপন্যাস)—নরেন্দ্রচন্দ্র সেনগুপ্ত]—কর্মযোগী রায়। [বিস্মৃতি (কাব্যগ্রন্থ)

—সতীশচন্দ্র মিত্র]—রামেন্দু দত্ত। [নারী হরণের প্রতিকার (প্রবন্ধ)—জিতেন্দ্রমোহন

চৌধুরী]—কামাখ্যাপ্রসাদ রায়। পর্দানসীন (গল্পের বই)—প্রভাতকিরণ বসু।]

বিনয় দত্ত। পৃষ্ঠা ১১৫২-১১৫৭। আরও ৪৮টি বইয়ের নাম, লেখক, প্রকাশকের

নামসহ তালিকা।

ঘরে-বাইরে—প্রমথ চৌধুরী। পৃষ্ঠা ১১৫৮-১১৬০।

সাময়িকী : আচার্য জগদীশচন্দ্র ; রাজা রামমোহনের স্মৃতি বার্ষিকী; রবীন্দ্রনাথের বাণী;

অজ্ঞাত দাবী; গ্রন্থাগারিকের কাজ শিক্ষার ব্যবস্থা; আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সম্মান; টেক্সট

বুক কমিটি। পৃষ্ঠা ১১৬১-১১৬৮।

১ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, মাঘ, ১৩৪০

- কৃতিবাসের 'হরধনু ভঙ্গ' (প্রবন্ধ)—নলিনীকান্ত ভট্টাচার্য। পৃষ্ঠা ১১৬৯-১১৭৬।
 শিষ্টাচার (প্রবন্ধ)—ভূদেব মুখোপাধ্যায়-এর অপ্রকাশিত রচনা। পৃষ্ঠা ১১৭৭-১১৭৮।
 রাতের ফুল (গল্প)—পূর্ণশশী দেবী। পৃষ্ঠা ১১৭৯-১১৯১।
 বাঁধন নাই (কবিতা)—প্রফুল্ল সরকার। পৃষ্ঠা ১১৯১।
 বিহারীলাল (জীবনী) (পূর্বানুবৃত্তি)—মন্মথনাথ ঘোষ। পৃষ্ঠা ১১৯২-১১৯৭।
 অকাল বোধন (গল্প)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ১১৯৮-১২০২।
 সর্বজয়া (কবিতা)—জগদীশ ভট্টাচার্য। পৃষ্ঠা ১২০২।
 দ্বীপময় ভারতের সভ্যতায় বাঙালীর দান (প্রবন্ধ)—হিমাংশুভূষণ সরকার।
 পৃষ্ঠা ১২০৩-১২০৮।
 চিরমুকুল (কবিতা)—দক্ষিণারঞ্জন কর চৌধুরী। পৃষ্ঠা ১২০৯-১২১০।
 শিক্ষাবিস্তারের গ্রন্থাগার (প্রবন্ধ)—নৃপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী। পৃষ্ঠা ১২১০-১২১৫।
 জগদীশের দিদি (গল্প)—সুধীরবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ১২২৫-১২২৮।
 বয়ঃসন্ধি (কবিতা)—বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। পৃষ্ঠা ১২২৮।
 দেবমূর্তি শিল্পের ক্রমবিকাশ (প্রবন্ধ)—অমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ১২২৯-১২৩২।
 (সচিত্র)।
 সর্বাণী (উপন্যাস) (পূর্বানুবৃত্তি)—অনুরূপা দেবী। পৃষ্ঠা ১২৩৩-১২৩৮।
 'রাইতোর' গোরস্থান (কবিতা)—কাদের নওয়াজ। পৃষ্ঠা ১২৩৯-১২৪০।
 বাঙলা সাহিত্যের মূলসূত্র (প্রবন্ধ)—সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত। পৃষ্ঠা ১২৪১-১২৫৩।
 বিস্তার ঠাকুর (গল্প)—কালীপদ চট্টোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ১২৫৪-১২৬৩।
 জাগিবে না মৃত্যু-স্নান সে যে পুনরায় (কবিতা)—মৃণাল সর্বাধিকারী। পৃষ্ঠা ১২৬৪।
 সরোজনলিনী নারী-মঙ্গল সমিতি (প্রবন্ধ)—সুধাংশুকুমার রায়। পৃষ্ঠা ১২৬৫-১২৭১।
 (সচিত্র)।
 শিল্পীর স্ত্রী (গল্প)—রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ১২৭২-১২৭৩।
 বঙ্গনারীর আত্মরক্ষা—অন্তঃপুরে ও বাহিরে (প্রবন্ধ)—মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা।
 পৃষ্ঠা ১২৭৪-১২৭৮।
 প্রতীক্ষা (কবিতা)—সরোজরঞ্জন চৌধুরী। পৃষ্ঠা ১২৭৮।
 অরুণোদয় (উপন্যাস) (পূর্বানুবৃত্তি)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ১২৭৯-১২৮৫।
 নূতন বই : [মহাপ্রস্থানের পথে—প্রবোধকুমার সান্যাল]—যতীন্দ্রমোহন বাগচী।
 [আরব্য উপন্যাস—হেমেন্দ্রলাল রায়]—অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল। [তখনচ (উপন্যাস)
 —অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল]—মৃণাল সর্বাধিকারী। পৃষ্ঠা ১২৮৬-১২৮৮।
 সাময়িকী : বাংলায় নারী ধর্ষণ; বোম্বাই এ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভ্যর্থনা, উদারনৈতিক
 দলের বৈঠকের সভাপতির অভিভাষণ ; বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতির অভিভাষণ;
 রক্ষণ শুদ্ধ; নিখিল ভারত নারী সম্মিলন; পূর্ব ও পশ্চিম; বেথুন কলেজের নতুন
 মহিলা অধ্যক্ষ : তটিনী দাস। পৃষ্ঠা ১২৮৯-১২৯৬।

১ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩৪০

প্রশস্তি—মহারাজা বাহাদুর প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর, কে. টি.। পৃষ্ঠা ১২৯৬খ।

আদ্য বাংগালী জাতি : মারাং বুরু মানব (প্রবন্ধ)—হরিন্দাস পালিত। পৃষ্ঠা ১২৯৭

অতনুর জন্ম (কবিতা)—হেমেন্দ্রলাল রায়। পৃষ্ঠা ১৩০২।

রবীন মাষ্টার (উপন্যাস)—নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। পৃষ্ঠা ১৩০৩-১৩১১।

বিহারীলাল (সচিত্র প্রবন্ধ)—মম্বথনাথ ঘোষ। পৃষ্ঠা ১৩১২-১৩১৬।

সঙ্ঘায় (কবিতা)—কবিশেখর কালিদাস রায়। পৃষ্ঠা ১৩১৬।

উমাচরণের কবিতা (গল্প)—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ১৩১৭-১৩২৫।

‘বর্গী এল দেশে’ (প্রবন্ধ)—রায় জলধর সেন। পৃষ্ঠা ১৩২৬-১৩২৯।

সর্বানী (উপন্যাস) (পূর্বানুবৃত্তি)—অনুরূপা দেবী। পৃষ্ঠা ১৩৩০-১৩৩৫।

রাতের আকাশ (কবিতা)—নীলিমা দাস। পৃষ্ঠা ১৩৩৬।

সাহিত্যের ভাষা (প্রবন্ধ)—মহেন্দ্রচন্দ্র রায়। পৃষ্ঠা ১৩৩৭-১৩৪২।

বৈদ্যনাথ (গল্প)—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ১৩৪৩-১৩৪৮।

আচার্য জগদীশচন্দ্রের সাধনা (সচিত্র প্রবন্ধ)—গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য।

পৃষ্ঠা ১৩৪৯-১৩৫৪।

লোচনের খোল (কবিতা)—কুমুদরঞ্জন মল্লিক। পৃষ্ঠা ১৩৫৫-১৩৫৬।

সামরিক ব্যয়-হ্রাস (প্রবন্ধ)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ১৩৫৬-১৩৫৯।

রাতের ফুল (উপন্যাস)—পূর্ণশশী দেবী। পৃষ্ঠা ১৩৬০-১৩৬৩। (ক্রমশ)

নিখিল ভারতীয় রম্যকলা প্রদর্শনী (সচিত্র প্রবন্ধ)—যামিনীকান্ত সেন।

পৃষ্ঠা ১৩৬৪-১৩৭০।

সমাপন (গল্প)—জ্যোৎস্না ঘোষ। পৃষ্ঠা ১৩৭১-১৩৮১।

বাণীবোধন (কবিতা)—করণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ১৩৮২।

নব্য মনোবিজ্ঞান ও আমাদের মন (প্রবন্ধ)—বাণী দত্ত। পৃষ্ঠা ১৩৮৩-১৩৮৭।

ভোজ (গল্প)—ফণীভূষণ রায়। পৃষ্ঠা ১৩৮৮-১৩৯২।

বিচিত্রা : ভূমিকম্প—হেমেন্দ্রলাল রায়। পৃষ্ঠা ১৩৯৩-১৩৯৮।

ছোটগল্প ও প্রভাতকুমার (প্রবন্ধ)—অবনীনাথ রায়। পৃষ্ঠা ১৩৯৯-১৪০২।

চুস্বন (কবিতা)—সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃষ্ঠা ১৪০২।

মার্কিনের সংরক্ষণ-নীতি (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। পৃষ্ঠা ১৪০৩-১৪০৬।

ঘরে-বাইরে (প্রবন্ধ)—প্রমথ চৌধুরী। পৃষ্ঠা ১৪০৭-১৪১১।

নূতন বই (সমালোচনা) : মঞ্জুলা (দীনেশচন্দ্র সেন), ডিক্টার (হেমেন্দ্রলাল রায়),
মাধুকরী। (নিধিরাজ হালদার), ময়ূরপঙ্খী রাজকন্যা (বিনয় দত্ত)।

পৃষ্ঠা ১৪১২-১৪১৩।

সাময়িকী (সাময়িক সংবাদ)। [১লা মাঘের ভূমিকম্প। বাঙ্গালীর কর্তব্য; পরলোকে
স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্র; ট্যারিফ বোর্ডের প্রস্তাব; মহাধ্বাজীর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ;
পরলোকে মধুসূদন দাস; বাংলায় লাইনো টাইপ; ট্রপিক্যাল ইনসিওরেন্স কোম্পানী;
ইতালীতে শিক্ষার্থী বাঙালী। পৃষ্ঠা ১৪১৪-১৪২৪।

১ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, চৈত্র, ১৩৪০

- সাহিত্য ও জন সমাজ (প্রবন্ধ)—বিজয়চন্দ্র মজুমদার। পৃষ্ঠা ১৪২৫-১৪২৮।
- বাঘিনী (কবিতা) কুমুদরঞ্জন মল্লিক। পৃষ্ঠা ১৪২৮।
- রবীন মাষ্টার (উপন্যাস) (পূর্বানুবৃতি)—নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। পৃষ্ঠা ১৪২৯-১৪৩৪।
- বিহারীলাল (জীবনী)—মন্মথনাথ ঘোষ। পৃষ্ঠা ১৪৩৫-১৪৪৩।
- বন্দী সে রহিবে অনুক্ষণ (কবিতা)—অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ১৪৪৩।
- মালতী (গল্প)—মনীন্দ্রলাল বসু। পৃষ্ঠা ১৪৪৪-১৪৫৩।
- প্রাচীন ভারতবর্ষে লীডিয়, পারসিক ও গ্রীসিয় মুদ্রা (প্রবন্ধ)—চারুচন্দ্র দাশগুপ্ত।
পৃষ্ঠা ১৪৫৪-১৪৬৩।
- প্রবাহ (কবিতা)—বজ্রানন্দ গুপ্ত। পৃষ্ঠা ১৪৬৪।
- জ্যোতিষের জয় (গল্প)—বিজয়রত্ন মজুমদার। পৃষ্ঠা ১৪৬৫-১৪৭৪।
- নিখিল ভারতীয় রম্য কলা প্রদর্শনী (প্রবন্ধ) পূর্বানুবৃতি—যামিনীকান্ত সেন।
পৃষ্ঠা ১৪৭৫-১৪৮০। (সমাপ্ত)
- বসন্ত জাগ্রত দ্বারে (কবিতা)—চন্দ্রশেখর আঢ্য। পৃষ্ঠা ১৪৮০।
- রাতের ফুল (উপন্যাস) (পূর্বানুবৃতি)—পূর্ণশশী দেবী। পৃষ্ঠা ১৪৮১-১৪৮৪।
- বাঙলা সাহিত্যের মূল সূত্র (প্রবন্ধ)—সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত। পৃষ্ঠা ১৪৮৫-১৪৯৩।
- রাখালী মেয়ে (কবিতা)—বন্দে আলি মিয়া। পৃষ্ঠা ১৪৯৪।
- ‘—সকলি গরল ভেল’ (গল্প)—অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ১৪৯৫-১৫০৫।
- জনৈক ফরাসী স্ত্রী কবি [অনা কঁতেস্ দ্য নোয়াইল (১৮৭৬-১৯৩৩)]—ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী। পৃষ্ঠা ১৫০৬-১৫১৪।
- সর্বগী (উপন্যাস) (পূর্বানুবৃতি)—অনুরূপা দেবী। পৃষ্ঠা ১৫১৫-১৫১৮।
- শিশু-সাহিত্য কিরূপ হওয়া উচিত ও এ বিষয়ে মহিলাদিগের কর্তব্য (প্রবন্ধ)—
পূর্ণিমা বসাক। পৃষ্ঠা ১৫১৯-১৫২১।
- আলো-ছায়া (গল্প)—গীতা দেবী। পৃষ্ঠা ১৫২২-১৫২৫।
- গীত ও রূপ : নাচারী তোড়ী—তেতালা—কথা ও সুর সঙ্গীতনায়ক গোপেশ্বর
বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বর সরস্বতী। স্বরলিপি রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
পৃষ্ঠা ১৫২৬-১৫২৭।
- স্যার চারুচন্দ্র ঘোষ (জীবনী)—জিতেন্দ্রনাথ বসু। ১৫২৮-১৫২৯।
- বিচিত্রা : মিশরের মমি ও তার পিরামিড (সচিত্র প্রবন্ধ)—হেমেন্দ্রলাল রায়। পৃষ্ঠা
১৫৩০-১৫৩৬।
- ঘরে-বাইরে—প্রমথনাথ চৌধুরী। পৃষ্ঠা ১৫৩৭-১৫৪৩।
- নূতন বই : [Rupakari—Protuma Tagore]—যামিনীকান্ত সেন। [শান্তি-সোপান—
এমাম গাজালী। বঙ্গানুবাদ খানবাহাদুর মৌলবী চৌধুরী কাজেমদ্দীন আহমদ
সিন্ধিকী]—সুফী মোতাহার হোসেন। [আমার ব্যবসা জীবন—বিনোদবিহারী সাধু]—
মণীন্দ্রমোহন মৌলিক। পৃষ্ঠা ১৫৪৩-১৫৪৫।
- সাময়িকী : বিহারের পুনর্গঠন; মুসলমান সম্প্রদায় ও বাংলা ভাষা; সাহিত্য সম্মেলন;

১৩০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১২ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা

প্রাদেশিক স্বার্থপরতা; আবার যুদ্ধের আশঙ্কা; স্বর্গীয় গোলাপলাল ঘোষ; রায় জলধর সেন বাহাদুরের জন্মতিথি; ভূমিকম্পে মহিলাদের সাহায্য [জ্যোৎস্না দেবী ও লাবণ্য দেবী]। পৃষ্ঠা ১৫৪৬-১৫৫২।

২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৪১

প্রণাম (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ছন্দ (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃষ্ঠা ১-১৩।

রবীন মাষ্টার (উপন্যাস)—নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। (পূর্বানুবৃত্তি)। পৃষ্ঠা ১৩-২০।

ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের গোড়ার কথা (প্রবন্ধ)—অশোকনাথ শাস্ত্রী। পৃষ্ঠা ২১-২৪।

বিদ্যুৎ মণ্ডল (প্রবন্ধ)—শিশিরকুমার মিত্র। পৃষ্ঠা ২৫-২৯।

স্বয়ম্বর (গল্প)—সীতা দেবী। পৃষ্ঠা ৩০-৩৯।

বিহারীলাল (সচিত্র প্রবন্ধ) (পূর্বানুবৃত্তি)—মন্মথনাথ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৪০-৪৪।

স্বর্গ (কবিতা)—হেমেন্দ্রলাল রায়। পৃষ্ঠা ৪৫।

সর্বানী (উপন্যাস) (পূর্বানুবৃত্তি)—অনুরূপা দেবী। পৃষ্ঠা ৪৬-৫২।

প্রাচীন ভারতে সম্পদ বিকিরণ (প্রবন্ধ)—বিনয়তোষ ভট্টাচার্য। পৃষ্ঠা ৫৩-৫৭।

আকস্মিক (কবিতা)—সুফী মোতাহার হোসেন। পৃষ্ঠা ৫৭।

চণ্ডীদাস সমস্যা (প্রবন্ধ)—বিভাস রায়চৌধুরী। পৃষ্ঠা ৫৮-৬৫।

বন্দী বসন্ত (গল্প)—অমিয়জীবন মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৬৬-৮২।

কেওঞ্জুর রাজ্য (সচিত্র প্রবন্ধ)—তমোনাশ দাশগুপ্ত। পৃষ্ঠা ৮৩-৮৭।

রবীন্দ্র কথাসাহিত্য পরবর্তী স্তর (প্রবন্ধ)—কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়।

পৃষ্ঠা ৮৭-৯২।

শেষ দান (কবিতা)—জীবনকৃষ্ণ শেঠ। পৃষ্ঠা ৯৩-৯৫।

অষ্টভুজের অনুসন্ধান (প্রবন্ধ)—জীবনকৃষ্ণ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৯৬-৯৯।

নারীচরিত্র (গল্প)—আশালতা দেবী। পৃষ্ঠা ১০০-১০৮।

সনেট (চতুর্দশপদী কবিতা)—সুধীর মিত্র। পৃষ্ঠা ১০৮।

বিচিত্র বার্তা (বিজ্ঞান আলোচনা)—গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য। পৃষ্ঠা ১০৯-১১৬।

রাতের ফুল (উপন্যাস) (পূর্বানুবৃত্তি)—পূর্ণশশী দেবী। পৃষ্ঠা ১১৭-১২৩।

নূতন বই : (মনীষী রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—মন্মথনাথ ঘোষ)—জলধর সেন।

[The Genealogical History of India [Part I]—by Jnanendranath

Kumar—মন্মথনাথ ঘোষ। [ব্যখিতার গান—চারুলতা দেবী]—সুধীন্দ্রকুমার দেব।

পৃষ্ঠা ১২৪-১২৬।

সালান্ধারা (গল্প)—প্রফুল্লকুমার মণ্ডল। পৃষ্ঠা ১২৬-১৩২।

সাময়িকী (সমসাময়িক বাংলার সংবাদ সংকলন)। পৃষ্ঠা ১৩৩-১৪০।

২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১

ছন্দের মাত্রা (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃষ্ঠা ১৪১-১৪৯।

রবীন মাষ্টার (উপন্যাস) (পূর্বানুবৃতি)—নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। পৃষ্ঠা ১৪৯-১৫৫।
 মিলন-ক্ষণ (অনুবাদ কবিতা)—দক্ষিণারঞ্জন কর চৌধুরী। পৃষ্ঠা ১৫৫।
 ত্রৈভাসিক শিলালিপি (প্রবন্ধ)—পূরণচাঁদ নাহার। পৃষ্ঠা ১৫৬-১৫৮।
 অলস মুহূর্ত (গল্প)—ভবানী মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ১৫৯-১৬৮।
 বিহারীলাল (সচিত্র জীবনী)—মন্মথনাথ ঘোষ। পৃষ্ঠা ১৬৯-১৭৪।
 বরুণার তীর (কবিতা)—বিরামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ১৭৫-১৭৬।
 অজ্ঞাতের অনুসন্ধান. (প্রবন্ধ)—জীবনকৃষ্ণ সরকার। পৃষ্ঠা ১৭৬-১৮১।
 সর্বাঙ্গী (উপন্যাস) (পূর্বানুবৃতি)—অনুরূপা দেবী। পৃষ্ঠা ১৮১-১৮৪।
 বাঙলা সাহিত্যের মূলসূত্র (প্রবন্ধ) (পূর্বানুবৃতি)—সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত।
 পৃষ্ঠা ১৮৫-১৯২।

বাংলাদেশে জলবিজ্ঞান চর্চার প্রয়োজনীয়তা (প্রবন্ধ)—মেঘনাদ সাহা ও জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র
 মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ১৯২-১৯৫।
 শুফফা (কবিতা)—রাজকুমারী অর্চনা ঘোষ। পৃষ্ঠা ১৯৫-১৯৬।
 নতুন খাতা (গল্প)—মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ১৯৬-২০৪।
 প্রজ্ঞাবনী (প্রবন্ধ)—অনিন্দিতা দেবী। পৃষ্ঠা ২০৫-২১০।
 সার্থকতা (কবিতা)—সরোজরঞ্জন চৌধুরী। পৃষ্ঠা ২১০।
 উড়ো জাহাজের পথ (সচিত্র প্রবন্ধ)—কনক রায়। পৃষ্ঠা ২১১-২১৮।
 রাতের ফুল (উপন্যাস) (পূর্বানুবৃতি)—পূর্ণশশী দেবী। পৃষ্ঠা ২১৯-২২৯।
 কড়া চিঠি (কবিতা)—সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ২৩০-২৩১।
 রবীন্দ্রনাথের কাব্যে জীবন-দেবতা (প্রবন্ধ) (ক্রমশ)—সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত।
 পৃষ্ঠা ২৩১-২৩৭।

স্রোত বহে যায় (গল্প)—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ২৩৮-২৪৬।
 চর কুহকী (কবিতা)—হেম চট্টোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ২৪৭-২৪৮।
 চণ্ডীদাস-সমস্যা (প্রবন্ধ) (পূর্বানুবৃতি)—বিভাস রায়চৌধুরী। পৃষ্ঠা ২৪৮-২৫৩।
 কুকুর [মাইকেল জোসচেনকোর রুশীয় গল্প হইতে]—অনুবাদ নৃপেন্দ্রনাথ রায়।
 পৃষ্ঠা ২৫৪-২৫৫।

নতুন বই : [রামচরিতমানস—সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত অনূদিত]—সমালোচনা
 হেমেন্দ্রলাল রায় [বিশ্বকোষ—নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত]—সৌরীন্দ্রমোহন
 মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ২৫৬-২৫৭।

গীত ও রূপ : পলাশ রাঙা বাসনাগুলি—কথা ও সুর দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর / স্বরলিপি
 রবীন্দ্রমোহন বসু। পৃষ্ঠা ২৫৮-২৫৯।

বিদায় বাণী (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃষ্ঠা ২৬০।

ঘরে বাইরে : ভাবতবাসীর গৌরীশঙ্কর অভিযান, সিংহলে রবীন্দ্রনাথ, বাংলার স্বাস্থ্য,
 জীবনের মেয়াদ, নারী নির্যাতন, নারীর সাহস, ডঃ রমন ও বিজ্ঞান পরিষৎ, রাণী
 চন্দ্রাবতীর দান, একটা সুখবর, মহাত্মা গান্ধীর প্রতি আক্রমণ, হায়দ্রাবাদ রেজিমেণ্টের
 সৈন্য সংগ্রহ, ওরিয়েন্টাল গভর্নমেন্ট সিকিউরিটি লাইফ অ্যাসিওরেন্স কোম্পানি
 লিমিটেড, কোরিয়ায় জাপানের শাসন। পৃষ্ঠা ২৬১-২৬৮।

২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩৪১

- কাব্যানন্দে বিষয়ানন্দ (প্রবন্ধ)—সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। পৃষ্ঠা ২৬৯-২৭৮।
রবীন মাষ্টার (উপন্যাস) (পূর্বানুবৃত্তি)—নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। পৃষ্ঠা ২৭৯-২৮৪।
প্রীতির জ্যোত্স্নালোকে (কবিতা)—সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী। পৃষ্ঠা ২৮৫।
রবীন্দ্রনাথের কাব্যে জীবন দেবতা (প্রবন্ধ) (পূর্বানুবৃত্তি)—সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত।
পৃষ্ঠা ২৮৬-২৯১।
হাবা (গল্প)—জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। পৃষ্ঠা ২৯২-২৯৬।
চণ্ডীদাস সমস্যা (প্রবন্ধ) (পূর্বানুবৃত্তি)—বিভাস রায়চৌধুরী। পৃষ্ঠা ২৯৭-৩০০।
ভারতীয় ভাস্কর্যে বাস্তবতা (সচিত্র প্রবন্ধ)—যামিনীকান্ত সেন। পৃষ্ঠা ৩০১-৩০৯।
জীবন-মরণ (কবিতা) কুমুদরঞ্জন মল্লিক। পৃষ্ঠা ৩০৯-৩১০।
হতভাগা (গল্প)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৩১০-৩২৩।
রাজরোপা। (ভ্রমণ)—কৃষ্ণকুমার মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৩২৩-৩২৫।
দেবদাসী (কবিতা)—বাসবেন্দ্র ঠাকুর। পৃষ্ঠা ৩২৬-৩২৭।
মেয়েলী ছড়া (প্রবন্ধ)—রামেন্দু দত্ত। পৃষ্ঠা ৩২৭-৩৩১।
নির্বাকের পথে (জাতকের গল্প)—অপর্ণা দেবী। পৃষ্ঠা ৩৩২-৩৩৬।
অঙ্ক-কুশাণ যুগে প্রাচীন ভারতের বহির্বাণিজ্য (প্রবন্ধ)—বিজয়কৃষ্ণ দত্ত।
পৃষ্ঠা ৩৩৭-৩৪৪।
দুলারীর প্রেম (গল্প)—সুধাংশুকুমার গুপ্ত। পৃষ্ঠা ৩৪৪-৩৪৭।
আকাঙ্ক্ষা (কবিতা)—মমতা মিত্র। পৃষ্ঠা ৩৪৮।
পাশ্চাত্য প্রতিভা : সুরশিল্পী বেটোফেন (জীবনী)—অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
পৃষ্ঠা ৩৪৯-৩৫৪।
রাতের ফুল (উপন্যাস) (পূর্বানুবৃত্তি)—পূর্ণশশী দেবী। পৃষ্ঠা ৩৫৫-৩৫৯।
বিচিত্রা : সুমাত্রা দ্বীপের বিচিত্র পুষ্প; গো-পাদপ বা দুগ্ধ বৃক্ষ—অশেষচন্দ্র বসু।
পৃষ্ঠা ৩৬০-৩৬১।
পথের পরিচয় (গল্প)—মলিনা চট্টোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৩৬২-৩৬৮।
বিরহে (কবিতা)—জীবনকৃষ্ণ শেঠ। পৃষ্ঠা ৩৬৮।
রমণী চপল (প্রাচীন চৈনিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত নাটক)—সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত।
পৃষ্ঠা ৩৬৯-৩৮২।
কনক চাঁপা কন্যা (কবিতা)—হেমেন্দ্রলাল রায়। পৃষ্ঠা ৩৮৩।
আসা-যাওয়া (গল্প)—সুবলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৩৮৪-৩৮৮।
নৃতন বই [নিম্নিত পুরী—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়]—সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত। [সরল
জ্যোতিষ—জ্যোতিষ বাচস্পতি]—কনক রায়। [যুগের বাংলা : অরুণচন্দ্র দত্ত]—
অবনীনাথ রায়। [আগামীবারে সমাপ্য—প্রভাতকিরণ বসু]; [হিন্দুদের পুনরুত্থান :
মতিলাল রায়]—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। [খাদ্যকথা—নরেন্দ্রনাথ বসু]—
কনক রায়। [বিকিমিকি—যতীন সাহা]—বিনয় দত্ত। পৃষ্ঠা ৩৮৮-৩৯১।
ঘরে বাইরে : সিংহলে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ / স্যার রমেশ অ্যান্টিটিউবার কিউলোসিস্

এনডাউমেন্ট / উদয়ন গল্প প্রতিযোগিতার পুরস্কার / শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী ও সর্বাঙ্গী উপন্যাস / কলিকাতা করপোরেশন ও মেয়র নির্বাচন / ভূদেব স্মৃতিপূজা সভা / ঘোষ ট্র্যাভেলিং ফেলোশিপ / করপোরেশন ও তার মসকিটো বিগ্রেড / ইণ্ডিয়া ওয়েয়িং স্কেলস্ এণ্ড ইনজিনিয়ারিং কোম্পানীর ক্যালেন্ডার / হিন্দুস্থান বীমা কোম্পানী লিমিটেড। পৃষ্ঠা-৩৯২-৩৯৬।

দ্বিতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৪১

- নব পরিচয় (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃষ্ঠা ৩৯৬ক-৩৯৬খ।
 শক্তির সাধনা (প্রবন্ধ)—বিনয়তোষ ভট্টাচার্য। পৃষ্ঠা ৩৯৭-৪০১।
 রবীন মাস্টার (উপন্যাস) (পূর্বানুবৃত্তি)—নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। পৃষ্ঠা ৪০২-৪০৯।
 দেবতা ও ডক্টর (কবিতা)—হেমেন্দ্রলাল রায়। পৃষ্ঠা ৪০৯।
 রবীন্দ্রনাথের কাব্যে জীবনদেবতা (প্রবন্ধ) (পূর্বানুবৃত্তি)—সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত।
 পৃষ্ঠা ৪১০-৪১৪। (সমাপ্ত)।
 সোপান (গল্প)—রামপদ মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৪১৪-৪২২।
 বৈষ্ণব পদাবলীতে দেশবন্ধু কথিত অকিঞ্চন সমরস (প্রবন্ধ)—গিরিজাশঙ্কর
 রায়চৌধুরী। পৃষ্ঠা ৪২৩-৪২৮।
 মানবের দেব জন্ম (কবিতা)—সুধীরচন্দ্র সেনগুপ্ত। পৃষ্ঠা ৪২৮।
 ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃষ্ঠা ৪২৯-৪৩৩
 [Ideals of an Indian University প্রবন্ধের অনুবাদ। অনুবাদক সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ
 গুপ্ত।] পৃষ্ঠা ৪২৯-৪৩৩।
 হর-পার্বতী সংবাদ (গল্প)—অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৪৩৩-৪৪৪।
 আদি মানব (সচিত্র প্রবন্ধ)—গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য। পৃষ্ঠা ৪৪৪-৪৫২।
 স্মৃতি যজ্ঞ (কবিতা)—প্রবোধচন্দ্র সেন। পৃষ্ঠা ৪৫২-৪৫৩।
 সাহিত্যের বিষয় (প্রবন্ধ)—মহেন্দ্রচন্দ্র রায়। পৃষ্ঠা ৪৫৩-৪৬১।
 কাশফুল (গল্প)—হেম চট্টোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৪৬১-৪৬৮।
 সাহিত্যে নিজস্ব ও পরস্ব (প্রবন্ধ)—জগৎমোহন সেন। পৃষ্ঠা ৪৬৮-৪৭১।
 শ্রাবণ-নিশীথে (কবিতা)—সরোজরঞ্জন চৌধুরী। পৃষ্ঠা ৪৭১-৪৭৩।
 ধর্মতত্ত্বের বিশ্লেষণ (প্রবন্ধ)—সচী শীল। পৃষ্ঠা ৪৭৩-৪৭৬।
 বন্ধন ও মুক্তি (গল্প)—মতিলাল দাশ। পৃষ্ঠা ৪৭৭-৪৮৪।
 মরমিয়া (কবিতা)—সুভো ঠাকুর। পৃষ্ঠা ৪৮৪-৪৮৫।
 কঃ পছা? (প্রবন্ধ)—দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী। পৃষ্ঠা ৪৮৫-৪৯০।
 জ্যোতের শৈবাল (গল্প)—সরোজকুমার রায়চৌধুরী। পৃষ্ঠা ৪৯১-৪৯৭।
 উর্মিলা (কবিতা)—ফণীভূষণ রায়। পৃষ্ঠা ৪৯৭-৪৯৮।
 বাঁশীর সুর [প্রতিযোগিতার গল্প : ১ম পুরস্কার প্রাপ্ত]—বিজয় মুখোপাধ্যায়।
 পৃষ্ঠা ৪৯৯-৫০৭।
 স্বপ্ন ও কল্পনা (কবিতা)—মৃণাল সর্বাধিকারী। পৃষ্ঠা ৫০৮।

রাতের ফুল (উপন্যাস) (পূর্বানুবৃত্তি)—পূর্ণশশী দেবী। পৃষ্ঠা ৫০৯-৫১৪।
(সমাপ্ত)।

নূতন বই : [লক্ষাহারা (উপন্যাস)—ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়]—শৈলজ্ঞানন্দ
মুখোপাধ্যায়। [বিশ্বকোষ (সচিত্র)—নগেন্দ্রনাথ বসু সঙ্কলিত]—সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত।
[মায়াকাজল (কাব্যগ্রন্থ)—হেমেন্দ্রলাল রায়] সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত। [ক্লাইভ ট্রীট :
বার্ষিক বীমা সংখ্যা—সম্পাদক সুধাংশুবিকাশ রায়চৌধুরী]—সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত।

পৃষ্ঠা ৫১৫-৫১৮।

ঘরে-বাইরে : কলিকাতায় দেশবন্ধু দিবস; মহাত্মা গান্ধীর প্রতি বোমা নিক্ষেপ;
মাইকেল মধুসূদন; নাট্যকার অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়; পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ;
শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টরের রিপোর্ট; বাঙলার ব্যবস্থাপক সভা; হাইকোর্টের প্রধান
বিচারপতি; কলকাতার নূতন মেয়র ও ডেপুটি মেয়র; ভয়াবহ প্রতিশোধ; অন্ধ
বালকের কৃতিত্ব; সহশিক্ষা; আসামের বন্যা ও প্লাবন; মাদাম কুরী। পৃষ্ঠা ৫১৯-
৫২৪।

২য় বর্ষ পঞ্চম সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩৪১

বৃহত্তর বঙ্গ (প্রবন্ধ)—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৫২৪-৫৩৮।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস (পূর্বানুবৃত্তি)—নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। পৃষ্ঠা ৫৩৯-৫৪৪।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (সনেট)—মাইকেল মধুসূদন দত্ত। পৃষ্ঠা ৫৪৪।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস (প্রবন্ধ)—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৫৪৫-৫৫০।

তাতল সৈকতে (গল্প)—হেমেন্দ্রলাল রায়। পৃষ্ঠা ৫৫০-৫৬০।

স্বস্তিক চিহ্ন (প্রবন্ধ)—কল্যাণী দেবী। পৃষ্ঠা ৫৬১-৫৬৭।

নবোন্মেষ (কবিতা)—সুফী মোতাহার হোসেন। পৃষ্ঠা ৫৬৮।

সোপান (বড় গল্প)—রামপদ মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৫৬৮-৫৮২। (সম্পূর্ণ)।

পা পূজা (প্রবন্ধ)—বিজয়চন্দ্র মজুমদার। পৃষ্ঠা ৫৮২-৫৮৪।

মর্মর (কবিতা)—বিমল মিত্র। পৃষ্ঠা ৫৮৫।

বাংলা কবিতার ছন্দ (প্রবন্ধ) (পূর্বানুবৃত্তি)—প্রবোধচন্দ্র সেন। পৃষ্ঠা ৫৮৬-৫৯১।

প্রতিযোগিতার গল্প : হাটের কথা—দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৫৯১-৬০৩।

প্রেম কম্পন (কবিতা)—প্যারীমোহন সেনগুপ্ত। পৃষ্ঠা ৬০৪।

কালিমপুত্র ও সিকিমে কয়েকদিন (ভ্রমণ) (পূর্বানুবৃত্তি)—বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়।

পৃষ্ঠা ৬০৫-৬০৮।

ফাদার মিল (অনুবাদ গল্প)—ফণীভূষণ রায়। পৃষ্ঠা ৬০৮-৬১২।

রাতের ব্যাধা (কবিতা)—আভা গুপ্তা। পৃষ্ঠা ৬১২।

‘জগৎ-মঙ্গল’-এর কবি গদাধর দাস—নৃপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী। পৃষ্ঠা ৬১৩-৬১৭।

নারীর মন (উপন্যাস) (পূর্বানুবৃত্তি)—অরবিন্দ দত্ত। পৃষ্ঠা ৬১৮-৬২৪।

“শেষের কবিতা” (সচিত্র গল্প)—কথা প্রভাবতী দেবী সরস্বতী।

চিত্র হাসিরামি দেবী। পৃষ্ঠা ৬২৪-৬৩০।

রাত্রি ও পৃথিবী (কবিতা)—করুণাময় বসু। পৃষ্ঠা ৬৩১।

ভাবিবার কথা : স্ত্রী শিক্ষার ভবিষ্যৎ (প্রবন্ধ)—নলিনীকান্ত ভট্টশালী।

পৃষ্ঠা ৬৩২-৬৩৬।

নৃতন বই : [উপনিষদ রহস্য বা গীতার যৌগিক ব্যাখ্যা—শ্রী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী]—
অশোকনাথ শাস্ত্রী। [অভিনেতার পত্নী—প্রসন্নকুমার মিত্র]—নিধিরাজ হালদার।
[জাতিস্মরণ—শরদ্দিন্দু বন্দোপাধ্যায়]—নিধিরাজ হালদার। [লীলা মুকুল—অমলেশ
সেন]—কনক গুপ্ত। [রুবাইয়াৎ-ই-ওমরখৈয়াম—সতীশচন্দ্র মিত্র]—চারুচন্দ্র
বন্দোপাধ্যায়। [হেলেধরা (ছোটদের উপন্যাস)—নীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়]—
বিশ্বপতি চৌধুরী। [জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম—কানুপ্রিয় গোস্বামী]—বিনয় দত্ত।

পৃষ্ঠা ৬৩৭-৬৪০।

ঘরে-বাইরে : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর; লোকমান্য তিলক; রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ; দেশপ্রিয়
যতীন্দ্রমোহন; প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন; ডন হিগেন বার্গ; শ্রীমতী অমৃত কাউর;
মহিলা শিক্ষা প্রদর্শনী, শোচনীয় দুর্ঘটনা; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার।
দেশী প্রসাধন দ্রব্য; ইণ্ডিয়া মিউচুয়াল বেনিফিট সোসাইটি। পৃষ্ঠা ৬৪১-৬৪৮।

দ্বিতীয় বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৪১

মূলতানের সুরে (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃষ্ঠা ৬৪৯-৬৫০।

দুর্গামূর্তি পরিচয় (প্রবন্ধ)—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৬৫০-৬৫২।

রাজতন্ত্র বনাম প্রজাতন্ত্র (প্রবন্ধ)—বিনয়তোষ ভট্টাচার্য। পৃষ্ঠা ৬৫৩-৬৫৯।

বিভিন্ন দেশের সমাধির কথা (প্রবন্ধ)—কনক রায়। পৃষ্ঠা ৬৫৯-৬৬৪।

রবীন মাষ্টার (উপন্যাস)—নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। (পূর্বানুবৃত্তি)। পৃষ্ঠা ৬৬৫-৬৭০।

নারী যার কেশে মেঘের থর (কবিতা)—হেমেন্দ্রলাল রায়। পৃষ্ঠা ৬৭০।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস (প্রবন্ধ) (পূর্বানুবৃত্তি)—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

পৃষ্ঠা ৬৭১-৬৭৬।

বনলতিকা (বড় গল্প)—সরোজকুমার রায়চৌধুরী। পৃষ্ঠা ৬৭৭-৬৮৭।

ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের গোড়ার কথা (প্রবন্ধ)—অশোকনাথ শাস্ত্রী।

পৃষ্ঠা ৬৮৭-৬৯৪।

আগমনী (কবিতা)—চন্দ্রশেখর আঢ্য। পৃষ্ঠা ৬৯৪।

বড় ও বৃষ্টি (গল্প)—প্রভাতকিরণ বসু। পৃষ্ঠা ৬৯৫-৭০৪।

বাংলা কবিতার ছন্দ (প্রবন্ধ)—অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন। (পূর্বানুবৃত্তি)

পৃষ্ঠা ৭০৫-৭১১ (সম্পূর্ণ)।

চিত্রলেখা (কবিতা)—গোপাললাল দে। পৃষ্ঠা ৭১২-৭১৩।

সংস্কার (গল্প)—বিজয়রত্ন মজুমদার। পৃষ্ঠা ৭১৪-৭২৩।

ভারতের রূপমূর্তিত কন্দর (সচিত্র প্রবন্ধ)—যামিনীকান্ত সেন। পৃষ্ঠা ৭২৪-৭৩৪।

চণ্ডীদাস-প্রসঙ্গ। (প্রবন্ধ)—হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরত্ন। পৃষ্ঠা ৭৩৫-৭৪২।

কঠোর (গল্প)—অমিয়কুমার ঘোষ। পৃষ্ঠা ৭৪৩-৭৪৬।

“জ্যোতির্ময় কর বঙ্গ” (প্রবন্ধ)—শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৭৪৭-৭৪৮।

মানিক মালা (কবিতা)—সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৭৪৯-৭৫০।
 নারীর মন (উপন্যাস) (পূর্বানুবৃত্তি)—অরবিন্দ দত্ত। পৃষ্ঠা ৭৫১-৭৫৭।
 পাশ্চাত্য প্রতিভা : জর্জ বার্নার্ড শ (জীবনী)—অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
 পৃষ্ঠা ৭৫৮-৭৬৩।
 প্রতিযোগিতার গল্প : বৃদ্ধ—অতুলচন্দ্র ভট্টাচার্য। পৃষ্ঠা ৭৬৪-৭৬৯।
 শতাব্দী পূর (প্রবন্ধ)—দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী। পৃষ্ঠা ৭৭০-৭৭৪।
 শরঙ্গী (উপন্যাস) (পূর্বানুবৃত্তি)—অনুরূপা দেবী। পৃষ্ঠা ৭৭৫-৭৮০।
 জীবনের তাঁত (কবিতা)—সুকোমল বসু। পৃষ্ঠা ৭৮০।
 কালিম্পঙ ও সিকিমে কয়েক দিন (সচিত্র ভ্রমণ), (পূর্বানুবৃত্তি)—বিশ্বনাথ
 মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৭৮১-৭৮৫।
 ডানপিটে (গল্প)—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৭৮৬-৭৯৬।
 গান (কবিতা)—জগদীশচন্দ্র সেনমজুমদার। পৃষ্ঠা ৭৯৬।
 গীত ও রূপ : কাফীতোড়ী—দাদরা—কথা, সুর ও স্বরলিপি সঙ্গীত নায়ক গোপেশ্বর
 বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৭৯৭-৭৯৮।
 নূতন বই : [বিশ্বকোষ—নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত]—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
 [সোনার কাঠি—মণীন্দ্রলাল বসু]—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। [ডাউন দিল্লী
 এন্ড প্রেস্—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত]—অবনীনাথ রায়। [মাটির মেয়ে—রাসবিহারী
 মণ্ডল]—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। [সাকী ও সুরা—বীরেন্দ্র ভট্টাচার্য]—
 প্রভাতকিরণ বসু। [তুমি আর আমি—সুধীর মিত্র]—রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
 [অঞ্জলি (উপন্যাস)—শচীন সেন]—হেমেন্দ্রলাল রায়। [ফরাসী বিপ্লব—রেজাউল
 করীম]—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। [তাইত। (শিশুসাহিত্য)—হেমদাকান্ত
 বন্দ্যোপাধ্যায়]—বিনয় দত্ত। পৃষ্ঠা ৭৯৯-৮০২।
 ঘরে বাইরে : বন্যার কুপ্রলীলা। পরলোকে কবি অতুলপ্রসাদ। নারী ধর্ষণ। শব্দ
 বিজ্ঞান সম্মিলনে বাঙালী অধ্যাপক [ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়]। পরলোকে
 স্যার চরুচন্দ্র ঘোষ। জাপানের হরিজন প্রীতি। সপদংশনের চিকিৎসার পুরস্কার।
 মেডিক্যাল কলেজের শতবার্ষিকী। পৃষ্ঠা ৮০৩-৮০৮।

২য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৪১

বাঙ্গালার প্রেমধর্ম (প্রবন্ধ)—খগেন্দ্রনাথ মিত্র। পৃষ্ঠা ৮০৯-৮১৫।
 অতীত ভারতের আবহাওয়া-তত্ত্ব (প্রবন্ধ)—ডঃ শচীন্দ্রনাথ সেন।
 পৃষ্ঠা ৮১৫-৮১৮।
 শ্রীদুর্গা-ভাস্কর্য ও চিত্রে (প্রবন্ধ)—যামিনীকান্ত সেন। পৃষ্ঠা ৮১৯-৮২৪।
 সোসিয়ালিজম : পাশ্চাত্য ও ভারতীয় আদর্শ (প্রবন্ধ)—কালীপ্রসন্ন দাশ।
 পৃষ্ঠা ৮২৫-৮৩২।
 রবীন মাস্টার (উপন্যাস) (পূর্বানুবৃত্তি)—নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। পৃষ্ঠা ৮৩৩-৮৩৭।
 স্বীপময় ভারতে অগস্ত্য-ঠাকুরের পূজা (প্রবন্ধ)—হিমাংশুভূষণ সরকার।
 পৃষ্ঠা ৮৩৮-৮৪৩।

মুৎ-শিল্পের কথা (সচিত্র প্রবন্ধ)—কনক রায়। পৃষ্ঠা ৮৪৩-৮৪৮।

সন্ধি (গল্প)—রমিপদ মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৮৪৯-৮৫৬।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস (প্রবন্ধ) (পূর্বানুবৃতি)—শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়।

পৃষ্ঠা ৮৫৬-৮৬৪। (সম্পূর্ণ)।

পেরমাণুর কথা (প্রবন্ধ)—স্নেহময় দত্ত। পৃষ্ঠা ৮৬৫-৮৬৯।

শরতের নিরমল প্রভাতে (কবিতা)—প্রতিভা ঘোষ। পৃষ্ঠা ৮৬৯।

আবার আগামী কাল (গল্প)—ভবানী মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৮৭০-৮৭৯।

কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস (প্রবন্ধ)—ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৮৭৯-৮৮৪।

প্রতিযোগিতার গল্প : বিশনী (গল্প)—নকুড়চন্দ্র মিত্র। পৃষ্ঠা ৮৮৫-৮৯১।

বঙ্গপরিচয় : মহাস্থান গড় (ইতিহাস সচিত্র)—প্রভাসচন্দ্র সেন। পৃষ্ঠা ৮৯২-৯০৩।

স্বৈরিনী (কবিতা)—কিনায়ক সান্যাল। পৃষ্ঠা ৯০৪।

সর্বাণী (উপন্যাস) (পূর্বানুবৃতি)—অনুরূপা দেবী। পৃষ্ঠা ৯০৫-৯১৩।

ভাঙ্গা জাহাজের বুক (মোঁপাসার গল্পের অনুবাদ)—হেমেন্দ্রলাল রায়।

পৃষ্ঠা ৯১৪-৯২২।

ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভার গোড়ার কথা (প্রবন্ধ)—নরেন্দ্রনাথ বসু।

পৃষ্ঠা ৯২৩-৯২৮।

শারদ শ্রী (কবিতা)—বন্দে আলী মিয়া। পৃষ্ঠা ৯২৮।

আয়না (গল্প)—মণীন্দ্রলাল বসু। পৃষ্ঠা ৯২৯-৯৩৬।

সাহিত্যে রিয়ালিজম (প্রবন্ধ)—আশালতা দেবী। পৃষ্ঠা ৯৩৬-৯৪৩।

হাটের পশারী। (কবিতা)—হাসিরামি দেবী। পৃষ্ঠা ৯৪৩।

দোলা (গল্প)—ফাহুর্নী মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৯৪৪-৯৫০।

ভাটিয়ালি গান (কবিতা)—হেম চট্টোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৯৫০।

অহিংসা (প্রবন্ধ)—পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী। পৃষ্ঠা ৯৫১-৯৫২।

অমাবস্যা (কবিতা)—কর্মযোগী রায়। পৃষ্ঠা ৯৫২।

গীত ও রূপ : ভৈরবী-সাদরা—কথা; সুর ও স্বরলিপি নির্মলচন্দ্র বড়াল।

পৃষ্ঠা ৯৫৩-৯৫৫।

নূতন বই : [গীতি-গাথা—ইন্দ্রি দেবী]—সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। [মুক্তির
রূপ—বারীন্দ্রকুমার ঘোষ]—অবনীনাথ রায়। [সাঁঝের প্রদীপ—কালীকঙ্কর
সেনগুপ্ত]—হেম চট্টোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৯৫৫-৯৫৬।

ঘরে-বাইরে : দুর্গা পূজা ; বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিক কার্য শিক্ষা, ভারতীয় সভ্যতার
অনুসন্ধানে অভিযান; স্বা. আবদুল গফুর খাঁর সম্বর্ধনা; বাংলার ক্ষয়রোগ; ক্ষয়
রোগগ্রস্তদের জন্য হাসপাতাল; বন্যার প্রাণ; জার্মানীর উপদেশ; বীরত্বের পরিচয়;
বৃহত্তর-এশিয়া স্বাধীনতা সমিতি; বিশ্ববিদ্যালয়ে বিধুশেখর শাস্ত্রী; দুর্গাদাস লাহিড়ী
স্মরণে; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর সম্পাদক; শ্রীমতী কমলা নেহেরু; অধ্যাপকের
গৌরব; পরলোকে ডাঃ মুগেন্দ্রলাল; বনকুসুম তেল; পা-ও রোটারী ডুপ্লিকেটর;
ইউনাইটেড কেমিক্যাল ওয়ার্কস। পৃষ্ঠা ৯৫৭-৯৬৪।

২য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৩৪১

বৈদিক যুগের সামাজিক ব্যবস্থা (প্রবন্ধ)—বিজয়চন্দ্র মজুমদার। পৃষ্ঠা ৯৬৫-৯৬৭।

স্বপ্নবাসবদন্তা ও উত্তর রামচরিত্র : ডাস ও ভবভূতি (প্রবন্ধ)—প্রভুলকৃষ্ণ

বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৯৬৭-৯৭৩।

বাংলা সাহিত্যের মূল-সূত্র (প্রবন্ধ)—সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ শূণ্ড। পৃষ্ঠা ৯৭৩-৯৮০।

রবীন মাস্টার (উপন্যাস) (পূর্বানুবৃতি)—নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। পৃষ্ঠা ৯৮১-৯৮৬।

অপর্ণা (কবিতা)—জীবনকৃষ্ণ শেঠ। পৃষ্ঠা ৯৮৬-৯৮৮।

মারাৎবুক্ষ-মানবের সম্প্রসারণ বা আদ্য বান্দালী জাতির বিস্তারণ (সচিত্র ইতিহাস)
—হরিদাস পালিত। পৃষ্ঠা ৯৮৯-৯৯২।

ভোরের আলো (গল্প)—মানিক ডট্টাচার্য। পৃষ্ঠা ৯৯২-৯৯৯।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস (প্রবন্ধ)—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৯৯৯-১০০৩।

অন্তর-লীনা (গল্প)—সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ১০০৩-১০০৪।

শরৎ সাহিত্যে সমাজতত্ত্ব (প্রবন্ধ)—কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়।

পৃষ্ঠা ১০০৫-১০০৮।

লালন ফকিরের গান (প্রবন্ধ)—মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন। পৃষ্ঠা ১০০৮-১০১০।

দুদিনের আলাপ (গল্প)—বিনয় রায়চৌধুরী। পৃষ্ঠা ১০১১-১০২১।

আবাহন (কবিতা)—প্রভাবতী দেবী সরস্বতী। পৃষ্ঠা ১০২২।

আংকোর (প্রবন্ধ)—কনক রায়। পৃষ্ঠা ১০২৩-১০৩০।

সর্বানী (উপন্যাস) (পূর্বানুবৃতি)—অনুরূপা দেবী। পৃষ্ঠা ১০৩১-১০৩২।

নারী শিক্ষার আদর্শ (প্রবন্ধ)—রাজা স্যার মন্মথনাথ রায়চৌধুরী।

পৃষ্ঠা ১০৩৩-১০৩৬।

অদৃশ্য ক্ষতের যন্ত্রণায় (গল্প)—হেমেন্দ্রলাল রায়। পৃষ্ঠা ১০৩৬-১০৪৩।

সেই বেদনাই গুমরি উঠিছে (কবিতা)—অপূর্বকৃষ্ণ ডট্টাচার্য। পৃষ্ঠা ১০৪৩।

জাপানের রাজস্ব সম্বন্ধে দু'চার কথা (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ ঘোষ।

পৃষ্ঠা ১০৪৪-১০৫০।

ছিনিমিনি (গল্প)—হেম চট্টোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ১০৫০-১০৫৭।

সৃষ্টি ও সমালোচনা (প্রবন্ধ)—রাইমোহন সামন্ত। পৃষ্ঠা ১০৫৭-১০৬২।

তিনদিনের ভ্রমণ কাহিনী (সচিত্র ভ্রমণ)—তারাপদ ভট্টাচার্য। পৃষ্ঠা ১০৬২-
১০৭১।

মরণ (গল্প)—বিমল মিত্র। পৃষ্ঠা ১০৭২-১০৭৮।

চলবো আমি চলবো গো (কবিতা)—ক্ষিতীন্দ্রনাথ সেন। পৃষ্ঠা ১০৭৮-১০৭৯।

লীলা মিত্র ও অঞ্জলি বসু [প্রতিযোগিতার গল্প]—সুবিমল মজুমদার।

পৃষ্ঠা ১০৭৯-১০৮২।

গীত ও রূপ : ভৈরবী ও কাওয়ালী—কথা অনুরূপা দেবী। স্বরলিপি ও সুর—
নরেন্দ্রম ঘোষ। পৃষ্ঠা ১০৮৩।

নূতন বই : [পৃথিবীর ইতিহাস—পণ্ডিত দুর্গাদাস লাহিড়ী]—প্রিয়দর্শী [নৃপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী]। [পূর্বাণর (গল্প পুস্তক)—অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়]—নীহাররঞ্জন মিত্র। [গল্পপ্রিয়া এবং শ্রীমঙ্গল—পদ্মেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়]—প্রভাতকিরণ বসু। [সাতরাণীর গল্প—নীরেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত]—বিনয় দত্ত। পৃষ্ঠা ১০৮৪-১০৮৬।
ঘরে-বাইরে : বিজয়ার অভিযান, কংগ্রেস সভাপতির অভিভাষণ; মহাত্মা গান্ধীর কংগ্রেস ত্যাগ; কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি; কংগ্রেসের প্রতিনিধি সংখ্যা ও আয়-ব্যয়ের হিসাব; নিখিল ভারত পক্ষী শিল্প সঙ্ঘ; পরলোকে সুরেন্দ্রভূষণ সেন; বিঠল ভাই প্যাটেলের উইল; ব্রিটানের মিউনিসিপ্যালিটিতে ভারতীয় সদস্য, দুঃসাহসী বাঙ্গালী পরিব্রাজক [শরৎচন্দ্র রায়], বয়ন-শিল্পের উন্নতির চেষ্টা; গৌরীশঙ্কর জয়ের অভিযান, নোবেল পুরস্কার, জার্মানীর ব্যবস্থা। পৃষ্ঠা ১০৮৭-১০৯২।

২য় বর্ষ ৯ম সংখ্যা, পৌষ, ১৩৪১

বান্দালার বৈষ্ণব ধর্ম (প্রবন্ধ)—খগেন্দ্রনাথ মিত্র। পৃষ্ঠা ১০৯৩-১১০১।
বারাণসী ও সারনাথ (প্রবন্ধ)—লেখকের নাম মুদ্রিত নেই। পৃষ্ঠা ১১০২-১১০৮।
রবীন মাষ্টার (উপন্যাস) (পূর্বানুবৃত্তি)—নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। পৃষ্ঠা ১১০৯-১১১৩।
রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস (প্রবন্ধ)—শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ১১১৩-১১২০।
রূপকথা নয় (গল্প)—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ১১২০-১১২৯।
বান্দা কি সান্দা বাদশাহ? (প্রবন্ধ)—ভূপেন্দ্রলাল দত্ত। পৃষ্ঠা ১১২৯-১১৩৭।
অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্ (গল্প)—চারুচন্দ্র রায়। পৃষ্ঠা ১১৩৭-১১৪৬।
অবগুপ্তিতা (কবিতা)—হেমেন্দ্রলাল রায়। পৃষ্ঠা ১১৪৬-১১৪৮।
জাপানের রাজস্ব-সম্বন্ধে দু'চার কথা (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ ঘোষ।
পৃষ্ঠা ১১৪৯-১১৫৭।
নাচের ছন্দ (গল্প)—কেশবচন্দ্র গুপ্ত। পৃষ্ঠা ১১৫৮-১১৬৪।
পাশ্চাত্য প্রতিভা : স্যার ওয়ালটার স্কট (জীবনী)—পিনাকীলাল রায়।
পৃষ্ঠা ১১৬৫-১১৭১।
এস একদিন (কবিতা)—হরিনন্দ মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ১১৭২।
মিথ্যা (গল্প)—হেমেন্দ্রলাল রায়। পৃষ্ঠা ১১৭৩-১১৮০।
কবি বিদ্যাপতি (জীবনী)—গোপালকৃষ্ণ রায়। পৃষ্ঠা ১১৮১-১১৮৫।
নারীর মন (উপন্যাস) (পূর্বানুবৃত্তি)—অরবিন্দ দত্ত। পৃষ্ঠা ১১৮৬-১১৯২।
বাসীফুলের মালা (কবিতা)—সুধীন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী। পৃষ্ঠা ১১৯২।
প্রতিযোগিতার গল্প : অকর্মণ্য (গল্প)—ননী গোপাল মজুমদার।
পৃষ্ঠা ১১৯৩-১১৯৭।
যন্ত্রযুগের জয় (প্রবন্ধ)—মৃণালকান্তি সর্বাধিকারী। পৃষ্ঠা ১১৯৮-১২০৪।
গল্পের প্লট (গল্প)—নিধিরাজ হালদার। পৃষ্ঠা ১২০৪-১২০৬।
গীত ও রূপ : গান—কথা, সুর ও স্বরলিপি সন্তোষকুমার দাস।
পৃষ্ঠা ১২০৭-১২০৮।

বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ (প্রবন্ধ)—বিনয় দত্ত। পৃষ্ঠা ১২০৯-১২১১।

নূতন বই : [স্পর্শের প্রভাব (উপন্যাস)—বীরেন্দ্রনাথ রায়]—জিতেন্দ্রনাথ বসু। [অমিতার প্রেম (উপন্যাস)—আশালতা দেবী।]—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। [ভারতীয় কুস্তি ও তাহার শিক্ষা—বীরেন্দ্রনাথ বসু।] নাম নেই। [দি কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেট—সম্পাদক অমল হোম]—নাম নেই। [নব অগ্রদূত—সম্পাদক পঞ্চানন নাগ] নাম নেই। পৃষ্ঠা ১২১১-১২১৩।

ঘরে-বাইরে : কুটির শিল্প সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী; পরলোকে বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন, কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি; নারীর প্রতি অত্যাচার; স্বর্গত রায় জনকীনাথ বসু বাহাদুর; সহশিক্ষা; পরলোকে সুরেন্দ্রনাথ সেন; নারী শিক্ষা সম্বন্ধে মৃত, বলডুইন হেয়ার লোশেন। পৃষ্ঠা ১২১৪-১২১৯।

স্ট্রীলোকের যক্ষারোগ (প্রবন্ধ)—ডাঃ কামাখ্যাচরণ মুখোপাধ্যায়।

পৃষ্ঠা ১২১৯-১২২০।

২য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, মার্চ, ১৩৪১

কৃতিবাস ও অঙ্কতাচার্য (প্রবন্ধ)—ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টাচার্যী। পৃষ্ঠা ১২২১-১২৩১।
প্রাচীন দর্ভবতী ((সচিত্র বরোদা রাজ্য ভ্রমণ)—বিনয়তোষ ভট্টাচার্য।

পৃষ্ঠা ১২৩২-১২৪১।

ময়ির দেহে প্রাণ-সম্ভার (প্রবন্ধ)—দীনেশচন্দ্র চৌধুরী। পৃষ্ঠা ১২৪১-১২৪৪।
রবিন মাস্টার (উপন্যাস) (পূর্বনিবৃত্তি)—নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। পৃষ্ঠা ১২৪৫-১২৫১।
ময়ূর নৃত্য (কবিতা)—কুমুদরঞ্জন মল্লিক। পৃষ্ঠা ১২৫২-১২৫৩।
যাত্রী (গল্প) (ক্রমশ)—রামপদ মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ১২৫৩-১২৬১।
রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস (প্রবন্ধ) (পূর্বনিবৃত্তি)—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

পৃষ্ঠা ১২৬২-১২৬৮।

কবি বিদ্যাপতি (জীবনী)—গোপালকৃষ্ণ রায়। (পূর্বনিবৃত্তি)। পৃষ্ঠা ১২৬৯-১২৭৪।
'ঘরের হ'য়ে পরের মতন' (গল্প)—অমৃতলাল আচার্য। পৃষ্ঠা ১২৭৫-১২৮২।
কাজল লতার কুঁড়ে (কবিতা)—গোপালচন্দ্র দাস। পৃষ্ঠা ১২৮৩-১২৮৪।
ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভা স্থাপনার উদ্যোগ (প্রবন্ধ)—বীরেন্দ্রনাথ বসু।

পৃষ্ঠা ১২৮৪-১২৯০।

জ্ঞান-যোগ (গল্প)—কলক রায়। পৃষ্ঠা ১২৯১-১২৯৫।
বাংলার রেশম-শিল্পের অবনতি ও তাহার প্রতিকার (শিল্প বাণিজ্য বিষয়ক প্রবন্ধ)—দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ১২৯৬-১৩০৩।

প্রতিভার খেয়াল (সচিত্র প্রবন্ধ)—হেমেন্দ্রলাল রায়। পৃষ্ঠা ১৩০৪-১৩০৯।

প্রতিযোগিতার গল্প : ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল—ত্রিপুরাচরণ সরকার।

পৃষ্ঠা ১৩১০-১৩১৪।

বলেছিলে ভালবাসি (কবিতা)—অরুণচন্দ্র চক্রবর্তী। পৃষ্ঠা ১৩১৪।

নাচের-ছন্দ (গল্প) (পূর্বানুবৃতি)—কেশবচন্দ্র গুপ্ত। পৃষ্ঠা ১৩১৫-১৩২৪।

রম্যকলা পরিষদের নূতন প্রদর্শনী (প্রবন্ধ)—যামিনীকান্ত সেন।

পৃষ্ঠা ১৩২৫-১৩৩২।

নারীর মন (উপন্যাস) (পূর্বানুবৃতি)—অরবিন্দ দত্ত। পৃষ্ঠা ১৩৩২-১৩৩৭।

গীত ও রূপ : বাগেশ্বরী-তেওড়া-কথা অনুরূপা দেবী; সুর ও স্বরলিপি অধ্যাপক নরোত্তম ঘোষ।

নূতন বই : [বীর আশানন্দ (জীবনী)—চণ্ডীচরণ দে]—রামপদ মুখোপাধ্যায়। [বিদ্যাপতি-চণ্ডিদাস ও অন্যান্য বৈষ্ণব মহাজন গীতিকা-চাক্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত]—কর্মযোগী রায়। [প্রেম ও প্রতিমা—রমেশচন্দ্র দাস]—কর্মযোগী রায়। [রোগ ও পথ্য—কবিরাজ বীরেন্দ্রনাথ রায়]—বিনয় দত্ত। [একটি রূপ কথা—মুদস্সদ মনসুরউদ্দীন]—বিনয় দত্ত। [ঝড় (উপন্যাস)—বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়]—মৃণাল সর্বাধিকারী। পৃষ্ঠা ১৩৩৯-১৩৪১।

ঘরে-বাইরে : প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন; রবীন্দ্রনাথের উদ্বোধন বাণী; সভাপতি স্যার লালগোপাল মুখোপাধ্যায়ের অভিভাষণ; আচার্য জগদীশচন্দ্রের উদ্বোধন বাণী; নিখিলভারত গ্রন্থাগার সম্মিলন; সাম্প্রদায়িক শিক্ষা-ব্যবস্থা; ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস; পরলোকে অভয়ঙ্কর; কবিরাজ হারানচন্দ্র চক্রবর্তীর দান; নিখিল-বঙ্গ আয়ুর্বেদ সম্মিলন ও প্রদর্শনী; গডরেজ এণ্ড বইস্ ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি লিমিটেড; উলসলি মোটরের প্রসার; প্রাগ-ঐতিহাসিক অনুসন্ধান : ভারতে। পৃষ্ঠা ১৩৪২-১৩৪৮।

২য় বর্ষ ১১শ সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩৪১

মুক্তি লাভের দার্শনিক বিচার (প্রবন্ধ)—বিজয়চন্দ্র মজুমদার। পৃষ্ঠা ১৩৪৯-১৩৫২।

সংস্কৃত সাহিত্যের গীতি কবিতা (প্রবন্ধ)—হেমেন্দ্রলাল রায়। পৃষ্ঠা ১৩৫২-১৩৫৯।

হোসেনপুরের রিল (গল্প)—রমাপদ ভট্টাচার্য। পৃষ্ঠা ১৩৬০-১৩৬৪।

রম্যকলা পরিষদের নূতন প্রদর্শনী (প্রবন্ধ) (পূর্বানুবৃতি)—যামিনীকান্ত সেন।

পৃষ্ঠা ১৩৬৫-১৩৭২।

রবীন মাষ্টার (উপন্যাস) (পূর্বানুবৃতি)—নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। পৃষ্ঠা ১৩৭৩-১৩৭৮।

বসন্ত (কবিতা)—সরোজরঞ্জন চৌধুরী। পৃষ্ঠা ১৩৭৯।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস (প্রবন্ধ) (পূর্বানুবৃতি)—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

পৃষ্ঠা ১৩৮০-১৩৮৫।

মরীচিকা (কবিতা)—অনুরূপা দেবী। পৃষ্ঠা ১৩৮৫।

যাত্রী (গল্প) (পূর্বানুবৃতি)—রামপদ মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ১৩৮৬-১৩৯৩। সম্পূর্ণ।

মধুমাল্য (গল্প)—মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন। পৃষ্ঠা ১৩৯৩-১৩৯৯।

পুষ্প-শর (গল্প)—মতিলাল দাশ। পৃষ্ঠা ১৩৯৯-১৪১২।

দেহাতীত (কবিতা)—বনবিহারী গোস্বামী। পৃষ্ঠা ১৪১২।

কাব্য ও ছন্দ (প্রবন্ধ)—রাইমোহন সামন্ত। পৃষ্ঠা ১৪১৩-১৪১৭।

সাধু সাজার শাস্তি (গল্প)—শৈলবালা ঘোষজায়া। পৃষ্ঠা ১৪১৮-১৪২৩।

ঐতিহাসিক সাহিত্য (প্রবন্ধ)—সচী শীল। পৃষ্ঠা ১৪২৪-১৪২৭।
বঙ্গ পরিচয় : প্রাচীন গৌরব (সচিত্র প্রবন্ধ)—লেখকের নাম মুদ্রিত নেই [নৃপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী] পৃষ্ঠা ১৪২৮-১৪৩৫।
পারঘাট (গল্প)—দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ১৪৩৬-১৪৪৪।
সনেট (চতুর্দশপদী কবিতা)—মৃণাল সর্বাধিকারী। পৃষ্ঠা ১৪৪৪।
নারীর মন (উপন্যাস) (পূর্বনিবৃত্তি)—অরবিন্দ দত্ত। পৃষ্ঠা ১৪৪৫-১৪৪৯।
কবি বিদ্যাপতি (জীবনী)—গোপালকৃষ্ণ রায়। পৃষ্ঠা ১৪৪৯-১৪৫৩।
প্রাচীন ভারতে অস্ত্র-চিকিৎসা (প্রবন্ধ)—ফণীন্দ্রভূষণ রায়। পৃষ্ঠা ১৪৫৩-১৪৫৯।
আর কোথাও (গল্প)—রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ১৪৫৯-১৪৬০।
বঙ্গলার বসন্ত-পঞ্চমী (প্রবন্ধ)—যামিনীকান্ত সেন। পৃষ্ঠা ১৪৬১-১৪৬৫।
নূতন বই : [কমলা সাগর (ঐতিহাসিক উপন্যাস)—অধরচন্দ্র দাস খাসনবিশ]—
নৃপেন্দ্রনাথ রায়। [প্রিয় বাঙ্কবী—প্রবোধকুমার সান্যাল]—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।
[ছায়া সীতা (উপন্যাস)]—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। [জলধর কথা—ব্রজমোহন
দাশ]—জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। [গীতা কাব্য (গীতার পদ্যানুবাদ)—মণীন্দ্রনাথ সাহা]
—বিনয় দত্ত। [বৈজ্ঞানিক ভোজ (ছোটদের গল্পগ্রন্থ)—সুশীলচন্দ্র মিত্র]—বিনয়
দত্ত। [নবশক্তি (নবপর্যায়) সপ্তাহিক-সম্পাদক বিজয়ভূষণ দাশগুপ্ত]—বিনয় দত্ত।
গীত ও রূপ : সিদ্ধাস্বাজ-দাদরা (ভঙ্গন)—কথা ও সুর গোপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,
সঙ্গীত-নায়ক। স্বরলিপি রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ১৪৬৮-১৪৬৯।
ঘরে-বাইরে : সর্বনাশের পথে; ভারতের কৃষিজাত পণ্য; সারের প্রত্যার্ণণ; মুসোলিনির
ইস্তাহার, লিঙ্গিং-এর উত্তেজনার প্রায়শ্চিত্ত; অর্দ্ধোদয় যোগ; ব্যবস্থা পরিষদের
সভাপতি ও সহ-সভাপতি; মেডিক্যাল কলেজের শতবার্ষিকী; বিশ্ববিদ্যালয়ের
প্রতিষ্ঠাদিবস; স্বর্গীয় সূর্যকুমার সর্বাধিকারী; স্বর্গীয় জিতেন্দ্রকুমার বসু; সহ শিক্ষা;
শীতের হাতের মার। পৃষ্ঠা ১৪৭০-১৪৭৬।

২য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৪১

ক্রোচের বীক্ষা-শাস্ত্র বা ইস্ত্রেক্টিক (প্রবন্ধ)—সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। পৃ ১৪৭০-৮৯।
রবীন মাষ্টার (উপন্যাস) (পূর্বনিবৃত্তি)—নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। পৃষ্ঠা ১৪৯০-১৫০০।
সমাপ্ত।
রম্যকলা-পরিষদের নূতন প্রদর্শনী (প্রবন্ধ) (পূর্বনিবৃত্তি)—যামিনীকান্ত সেন।
পৃষ্ঠা ১৫০১-১৫০৭।
প্রণতোষ্মি (কবিতা)—অমূল্যরতন ভট্টাচার্য। পৃষ্ঠা ১৫০৮।
রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস (প্রবন্ধ) (পূর্বনিবৃত্তি)—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
পৃষ্ঠা ১৫০৯-১৫১১।
মন ময়ূরীর নাচ (গল্প)—অমূল্যকৃষ্ণ ঘোষ। পৃষ্ঠা ১৫১২-১৫২১।
ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের গোড়ার কথা (প্রবন্ধ)—অশোকনাথ ভট্টাচার্য। পৃ ১৫২১-২৫।
সাজি (গল্প)—আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ১৫২৬-১৫২৯।

কবি বিদ্যাপতি (জীবনী)—গোপালকৃষ্ণ রায়। পৃষ্ঠা ১৫৩০-১৫৩৫। সম্পূর্ণ।
 হাসি (কবিতা)—সুরেশ্বর শর্মা। পৃষ্ঠা ১৫৩৫।
 অবাস্তুর (গল্প)—অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ১৫৩৬-১৫৪৩।
 ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র (প্রবন্ধ)—হের্ষচন্দ্র চক্রবর্তী। পৃষ্ঠা ১৫৪৪-১৫৪৬।
 কোথা সত্য মোর (কবিতা)—জীবনকৃষ্ণ শেঠ। পৃষ্ঠা ১৫৪৬।
 নারীর মন (উপন্যাস) (পূর্বনিবৃত্তি)—অরবিন্দ দত্ত। পৃষ্ঠা ১৫৪৭-১৫৫০।
 শেষের কবিতার লাভ্য (প্রবন্ধ)—শচীন সেন। পৃষ্ঠা ১৫৫১-১৫৫৪।
 বিয়ের পোষাক (গল্প) [শেখডের গল্পের অনুবাদ]—বিনয় দত্ত। পৃষ্ঠা ১৫৫৪-৫৮।
 লক্ষণ সেন কি সত্যই পলাইয়া ছিলেন? ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন। পৃ. ১৫৫৯-৬৪।
 কবি দুঃখীশ্যাম দাস (প্রবন্ধ)—নৃপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী। পৃষ্ঠা ১৫৬৫-১৫৬৯।
 দুর্গম পথের যাত্রী (গল্প)—হেমেন্দ্রলাল রায়। পৃষ্ঠা ১৫৬৯-১৫৭৮।
 পথের কথা (ভ্রমণ)—অমলেশ সেন। পৃষ্ঠা ১৫৭৮-১৫৮৮।
 বেদিয়া ছন্দ (গল্প)—রাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ১৫৮৯-১৫৯৫।
 তুমি আর আমি (কবিতা)—অনিলকুমার বিশ্বাস। পৃষ্ঠা ১৫৯৬।
 নৃতন বই : [অতি বোগাস—কেশবচন্দ্র গুপ্ত]—রামপদ মুখোপাধ্যায়। [হৈমন্তী
 (কাব্যগ্রন্থ)—কালিদাস রায়]—মৃণাল সর্বাধিকারী। [কল্পলতা (গল্প সংগ্রহ)—
 মণীন্দ্রলাল বসু।]—প্রভাতকিরণ বসু। [মধুসূদন (কাব্যগ্রন্থ)—অপূর্বকৃষ্ণ
 ভট্টাচার্য]—রবীন্দ্রনাথ সেন। [ব্রতচারিণী (উপন্যাস)—হেমমালা বসু]—প্রভাতকিরণ
 বসু। [সঙ্গীত পরিচয় (১ম খণ্ড)—রমাপ্রসাদ রায়। সমালোচনা ভবানী মুখোপাধ্যায়।
 [সনাতন (ছোটদের নাটক)—বিজয়মাধব মণ্ডল]—বিনয় দত্ত। পৃষ্ঠা ১৫৯৬-১৫৯৮।
 ঘরে-বাইরে : শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী; ইউরোপ-আমেরিকা ও ম্যাল্‌থাসের
 মতবাদ; ভারতবর্ষের মতবাদ ও ম্যাল্‌থাসের মতবাদ; মাদাম হালিদা হানুম;
 বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীর চিত্র; প্রিয়দ্বন্দা দেবী; রায়বাহাদুর নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়;
 পরলোকে ডঃ গণেশ প্রসাদ; স্বাস্থ্য-প্রদর্শনী; বাঙ্গালী যুবকের সম্বন্ধ; কলিকাতা
 সাহিত্য সম্মেলন। পৃষ্ঠা ১৫৯৯-১৬০৪।

স্বদেশি আন্দোলন : ফিরে দেখা

সোনালি চক্রবর্তী বন্দ্যোপাধ্যায়

প ট ভূ মি রা

ব্রিটিশ রাজশক্তি এবং উদীয়মান ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে যে সংঘাতের আরহ বা পরিমণ্ডল রচিত হয়েছিল, স্বদেশি আন্দোলনকে সেই পটভূমিকাতেই দেখতে হবে। নানা কারণে ভারতীয় সমাজ (বিশেষত, বঙ্গীয় ভদ্রলোক শ্রেণি) সেই সময় ঔপনিবেশিক শাসন সম্পর্কে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। স্বদেশি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এই ক্ষোভেরই তীব্র প্রকাশ ঘটে।

স্বদেশি আন্দোলনের পিছনে যে অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটটি আছে, সেটি দিয়ে আলোচনা শুরু করা যায়। নরমপন্থী ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা প্রথম দিকে ব্রিটিশ রাজত্বের অর্থনৈতিক শোষণের চরিত্রটি ঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারেননি। এ-কথা সত্য যে, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে, গ্রামাঞ্চলে, কৃষকরা ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোকরা বিক্ষিপ্তভাবে, বিভিন্ন রিড্রোহের মাধ্যমে, ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই প্রতিবাদ জানিয়ে আসছিলেন। কিন্তু মধ্যবিত্ত নাগরিক শ্রেণি এইসব আন্দোলনে কার্যত প্রভাবিত হননি। বস্তুত ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহে বহু মানুষের প্রতিবাদ ঘোষিত হলেও মধ্যবিত্ত বাঙালি ভদ্রলোক শ্রেণি এই বিদ্রোহে বিশেষ রিচলিত হননি। ঊনবিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে, নীলবিদ্রোহের পটভূমিকায় আমরা প্রথম এই মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে কৃষকদের অর্থনৈতিক দুর্দশা সম্পর্কে সহানুভূতিশীল হতে দেখি। দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ নাটকে এরই ছবি পাই। ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে ঔপনিবেশিক শোষণের চরিত্রটি ক্রমেই আরও বেশি করে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক শ্রেণির নজরে আসে। প্রথমে অবশ্য দাদাভাই নোরজিই ইংরেজের অর্থনৈতিক লুণ্ঠনের কথা বললেন। তারপরই রমেশচন্দ্র দত্ত ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক শোষণের চরিত্রটি তাঁর ইকনমিক হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া গ্রন্থে ব্যাখ্যা করেন। এর প্রথম খণ্ডটি বেরোয় ১৯০১ সালে, দ্বিতীয় খণ্ডটি ১৯০৩ সনে। এরই ফলে, বঙ্গভঙ্গের প্রাক্কালে দেশের সর্বত্র জাতীয়তাবাদীরা ব্রিটিশ শাসনের অর্থনৈতিক শোষণ বিষয়ে অবহিত হন।

শুধু তাত্ত্বিক উপলব্ধিতেই নয়, দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনেও ঔপনিবেশিকতার অর্থনৈতিক যন্ত্রণা দুঃসহ হয়ে উঠেছিল। বিশেষত জীবনে মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত, নাগরিক যুবকদের বেকারত্বের সমস্যা ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল। ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতে এমনিতেই কৃষি ছিল ভারাক্রান্ত। শিল্পের যে সুখ রিক্রাশ ঘটলে উদ্বৃত্ত কৃষিজীবী মানুষের কর্মসংস্থান হতে পারত, ঔপনিবেশিক

অর্থনীতিতে শিল্পের সেই বিকাশ হয়নি। এ ছাড়া, বিশেষতঃ শহরগুলোর শিক্ষিত তরুণদের জ্ঞান, চাকরি ছিল প্রয়োজনের তুলনায় যৎসামান্য। প্রতিবছর কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যতজন ডিগ্রি নিয়ে বেরোতেন, তাঁদের খুব সামান্য অংশই চাকরি পেতেন। উপরতলার ভালো চাকরিশুলিতে শ্বেতাঙ্গদেরই ছিল একচেটিয়া অধিকার। ঊনবিংশ শতকের শেষে এবং বিংশ শতকের শুরুতে এই অর্থনৈতিক হতাশাই ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে ক্রমে চরমপন্থী করে তোলে। স্বদেশি আন্দোলনের তীব্রতার পিছনে এই অর্থনৈতিক হতাশার একটা বড়ো ভূমিকা ছিল।

স্বদেশি আন্দোলনের পটভূমিতে যে দ্বিতীয় কারণ উল্লেখ্য, সেটি হল ইংরেজের বর্ণবিদ্বেষনীতি।

ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ভাগের শ্বেতাঙ্গদের বর্ণবিদ্বেষ ক্রমেই বাড়ছিল। পরিণতিতে বর্ণবৈষম্য-বিরোধী ভারতীয় প্রতিবাদও তীব্র হচ্ছিল। ১৮৮৩ সালে ইলবার্ট বিল বিতর্কে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, ইউরোপীয়রা ভারতীয়দের ঘণার দৃষ্টিতে দেখত। ভাইসরয় লর্ড রিপন এবং তাঁর আইন উপদেষ্টা ইলবার্ট এই বিলের মাধ্যমে ভারতীয় জেলাশাসক ও বিচারকদের হাতে ফৌজদারি মামলায় ইউরোপীয়দের বিচার করার অধিকার দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এই বিলের বিরুদ্ধে ভারত-নিবাসী ইউরোপীয়রা সোচ্চার হয়ে ওঠে। এই ঘটনায়, ভারতীয় নাগরিক ভদ্রলোকশ্রেণি স্পষ্টভাবে ইউরোপীয় বর্ণবৈষম্যবাদের প্রকৃত চিত্রটি দেখতে পান।

বাস্তবিকই, ঊনবিংশ শতকের শেষপ্রান্তে এসে ইংরেজরা ক্রমেই বর্ণবাদী হয়ে পড়ে। কখনও কখনও শারীরিক নিগ্রহে এই বর্ণবাদের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। বহু ক্ষেত্রে শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের হাতে কৃষাঙ্গ ভৃত্যদের প্রহৃত, আহত, এমনকি নিহত হওয়ার ঘটনা ঘটে। শ্বেতাঙ্গ-প্রভাবিত আদালতে নিগ্রহকারীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লঘু শাস্তি পেত।

ঔপনিবেশিক শোষণের অর্থনৈতিক বঞ্চনার সঙ্গে শ্বেতাঙ্গদের বর্ণবৈষম্য মিলিত হয়ে ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। ইংরেজের শাসন, শোষণ ও বর্ণবৈষম্যবাদ কীভাবে মিলে গিয়েছিল তা বুঝবার জন্য ১৯০৩ সালে বরাকরের শ্বেতাঙ্গ খনি-মালিকদের সভায় প্রদত্ত একটি ভাষণে লর্ড কার্জনের উক্তি উল্লেখ্য : ‘আমার রাজ্য শাসন করা, আপনাদের রাজ্য শোষণ করা। কিন্তু এই দুই কাজই আসলে একই প্রণের অংশ এবং একই কর্তব্যের অঙ্গ।’

তৃতীয় যে কারণটি আলোচনা করা দরকার, সেটি হল ইংরেজের ক্রমবর্ধমান দমনমূলক নীতি।

বাস্তবিকই, ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক শোষণ এবং শ্বেতাঙ্গ বর্ণবৈষম্যবাদের পাশাপাশি প্রশাসনিক নিপীড়নও এইসময় ক্রমেই বেড়ে চলেছিল। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এবং বিংশ শতকের প্রথম কয়েক বছরে বিভিন্ন দমনমূলক আইন প্রণয়ন করে ইংরেজ শাসকেরা ক্রমেই ভারতীয়দের কাছে অগ্রিয় হয়ে ওঠেন।

১৮৭৮ সালের অস্ত্র আইন বিনা লাইসেন্সে অস্ত্র বহন ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করে দেয়। ভারতীয়রা মনে করেন, এটা ভারতীয় জাতির শক্তিশালির কারণ হল। ওই বছরেই ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্টের মাধ্যমে ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলির স্বাধীনতা খর্ব করার চেষ্টা হয়। একই বছরে আই. সি. এস. পরীক্ষায় বসার জন্য রয়সের উর্ধ্বসীমা ২১ বছর থেকে কমিয়ে করা হয় ১৯ বছর। আই. সি. এস. পরীক্ষা দিতে তখন ভারতীয় ছাত্রদের ইংল্যান্ডে

যেতে হত। স্বাভাবিকভাবেই এই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ভারতীয় ছাত্রদের থেকে ব্রিটিশ ছাত্রদের বেশি সুবিধা হত। বয়সের ঊর্ধ্বসীমা কমানোয় পরিবেশ আরও প্রতিকূল হলে বলে ভারতীয়রা মনে করলেন।

লর্ড কার্জন ভাইসরয় হয়ে পরপর কয়েকটি কঠোর ও অগ্রিয় পদক্ষেপ নেন। তার পরিণতিতে ব্রিটিশ প্রশাসনের সঙ্গে ভারতীয় (বিশেষত বঙ্গীয়) জাতীয়তাবাদীদের সংঘর্ষ ঘনীভূত হতে থাকে। ১৮৯৯ সাল কলকাতা পুরসভার ভারতীয় সদস্যদের সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হয়। ১৯০৪ সালে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাশ করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সেনেটে নির্বাচিত সদস্যদের সংখ্যা ও গুরুত্ব কমিয়ে দেওয়া হয় এবং অনেক ক্ষমতাই সরকারি অফিসারদের হাতে চলে আসে। ওই একই বছরে সরকারি গোপনীয়তা রক্ষার নামে আইন পাশ করে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করা হয়। এই সবকিছু দমনমূলক ব্যবস্থাই কার্জনের প্রশাসনকে ভারত তথা বাংলাদেশে অগ্রিয় করে তোলে, এবং কার্জনের বঙ্গভঙ্গ-সিদ্ধান্তকে এই নিপীড়নেরই তুঙ্গ প্রকাশ বলে গণ্য করা হয়।

চতুর্থ কারণটি মতাদর্শগত। এটি বিভিন্ন স্তরে, বিভিন্নভাবে প্রভাব ফেলেছিল। একদিকে, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবনা তরুণ ভারতীয়দের গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। বিশেষত, স্বাধীনতা, সাম্য, ন্যায় ইত্যাদি ধারণাগুলি আধুনিক ভারতীয়দের উদ্বুদ্ধ করেছিল। ভলটেয়ার, রুশো, জন স্টুয়ার্ট মিল প্রমুখকে আধুনিক ভারতের রাজনৈতিক গুরু বললে অত্যুক্তি হবে না। ভারতীয় যুবকরা আমেরিকান, ফরাসি ও আইরিশ স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছিল। এ ছাড়া ম্যাথজিনি, গ্যারিবন্দির মতাদর্শও ভারতীয়দের কিছু কম অনুপ্রাণিত করেনি।

অন্যদিকে, ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধ্বে অতীত গৌরব ও মহিমার পুনরুদ্ধার গুরুত্ব পেতে থাকে। ভারতের অতীত ইতিহাস যে অতি গৌরবজনক ছিল তা ম্যাক্স মূলারের মতো পণ্ডিতরাও বলতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হননি। এই সময়েই ভারতের অতীত ইতিহাসের বিভিন্ন ধ্বংসাবশেষ আরও বেশি করে আবিষ্কৃত হতে শুরু করে, এবং এর ফলে অতীতকে নিয়ে আবার ভাবনাচিন্তা শুরু হল। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী তাঁদের লেখায় ভারতের গৌরবময় ইতিহাসকেই নতুন করে তুলে ধরলেন, এবং অনেকাংশে তারই পরিণামে স্বাধীনতা সংগ্রামের চরমপন্থী ধারার ভিত্তি স্থাপিত হল।

পঞ্চম কারণটি হল সমসাময়িক আন্তর্জাতিক ঘটনাবলির প্রভাব।

বাস্তবিকই, এইসময় বেশ কিছু আন্তর্জাতিক ঘটনায় ভারতীয় জনমানস নাড়া খেয়েছিল এবং উদ্বুদ্ধ বোধ করেছিল। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আধুনিক জাপানের উত্থানে একথা প্রমাণিত হয়েছিল যে, এশিয়ার একটি অনগ্রসর দেশের পক্ষেও মহাশক্তিধর হওয়া সম্ভব। ১৯০৫ সালে জাপানের হাতে রাশিয়ার পরাজয়ের ফলে ভারতীয়রা বুঝতে পারলেন যে, ইউরোপীয় দেশ মানেই যে অপরাধের তা নয়। এর আগে ১৮৯৬ সালে ইথিওপিয়ার হাতে ইটালির পরাজয়েও ভারতীয়রা উৎফুল্ল ও অনুপ্রাণিত বোধ করেছিলেন।

হেতুনির্ণয় পর্বের উপসংহারে বলা প্রয়োজন তৎকালীন নেতৃত্বের কথাও।

ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বেশ কিছু জাতীয়তাবাদী সমিতি ও প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। ঊনিশ শতকের সত্তরের দশক পর্যন্ত এই জাতীয় যত্ন সমিতি গড়ে উঠেছিল, তার মধ্যে

প্রধান ছিল ১৮৭৬ সালে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন। ১৮৮৫ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস জন্ম নেয়। এই নতুন মঞ্চের সহায়তায় বহু জাতীয় নেতাই জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। উনবিংশ শতকের শেষ কয়েক বছরে কয়েকজন চরমপন্থী নেতাও সক্রিয় হয়ে ওঠেন, এবং এঁদের মধ্যে অগ্রণী ভূমিকা নেন বাল গঙ্গাধর তিলক, লাল লাজপত রায়, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, এইসময় অধিকাংশ প্রধান নেতাই নিষ্কণ্ট সংবাদপত্র বা সাময়িক পত্র ছিল, এবং এগুলির মাধ্যমে তাঁরা নিজেদের বক্তব্য প্রকাশ করতেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেঙ্গলি পত্রিকা বের করতেন, তিলকের পত্রিকার নাম ছিল কেশরী, অরবিন্দ ঘোষ বন্দে মাতরম্ পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। এভাবেই স্বদেশি আন্দোলনের প্রাথমিক পর্বে ভারতের জাতীয় মঞ্চে আমরা যোগ্য ও জনপ্রিয় কয়েকজন জাতীয় নেতাকে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে দেখি।

সব মিলিয়ে বলা যায় যে, ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশি আন্দোলনের প্রাক্কালে সবদিক থেকেই ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল। ভারতীয়দের অর্থনৈতিক বঞ্চনাবোধ তখন ক্রমেই তীব্র হচ্ছিল; শ্বেতাঙ্গ বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে ক্ষোভ বাড়ছিল; বিভিন্ন প্রশাসনিক নীতি সম্পর্কে প্রতিবাদ বাড়ছিল; জাতীয় আত্মবিশ্বাস ও আত্মপ্রতিষ্ঠার মতাদর্শ গড়ে উঠেছিল; বিভিন্ন অন্তর্জাতিক ঘটনাবলি থেকে শ্বেতাঙ্গ-বিরোধী সংগ্রামের অনুপ্রেরণা পাওয়া যাচ্ছিল; সর্বোপরি আমাদের জাতীয় মঞ্চে সমাবেশ ঘটেছিল প্রতিষ্ঠিত ও জনপ্রিয় নেতাদের। এই পটভূমিকাতেই স্বদেশি আন্দোলকে বুঝতে হবে।

আ ঘা ত

১৮৬৬ সালে ওড়িশায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ওড়িশা তখন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির অংশ ছিল। বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি বলতে তখন বোঝাত প্রকৃত বাংলা ছাড়াও, বিহার, ওড়িশা এবং অসমকে একসঙ্গে নিয়ে একটা বড়ো এলাকা। বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির এই বৃহৎ আকার যে ভালোভাবে শাসন করার পক্ষে অন্তরায়, তা ব্রিটিশ শাসকরা এরই মধ্যে মাঝে-মাঝে বলতে শুরু করেছিলেন। তাঁরা যুক্তি দিচ্ছিলেন যে, ভালোভাবে শাসন করা যায়নি বলেই ওড়িশায় এই দুর্ভিক্ষ। এরপর থেকেই বাংলাকে ভেঙে টুকরো করার পরিকল্পনা শুরু হল।

১৮৭৪ সালে অসমকে বাংলা প্রেসিডেন্সি থেকে বিচ্ছিন্ন করা হল। এই সময় শ্রীহট্টকে বাংলা প্রেসিডেন্সি থেকে সরিয়ে নিয়ে অসমের অংশ করে দেওয়া হয়। শ্রীহট্টের লোকেরা কিন্তু বাংলাভাষী। স্বভাবতই সেখানকার বাংলাভাষী মানুষ বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া মেনে নিতে পারেননি। তাঁরা এই ঘটনার প্রতিবাদ করেন। ইংরেজরা তাঁদের প্রতিবাদে কান দেয়নি।

উনিশ শতকের পুরো নব্বইয়ের দশক জুড়েই বাংলা প্রেসিডেন্সিকে আরও খণ্ড-খণ্ড করার পরিকল্পনা চলতে থাকে। কোনও কোনও ইংরেজ শাসক চট্টগ্রাম বিভাগকে বাংলা থেকে সরিয়ে আসাম প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত করে দিতে চাইলেন। কেউ-কেউ আবার ঢাকা এবং ময়মনসিংহ জেলাকে অসমের সঙ্গে যুক্ত করতে বললেন।

বঙ্গভঙ্গ নিয়ে আলোচনা ১৯০২-১৯০৩ নাগাদ জোরদার হয়ে ওঠে। ভাইসরয় লর্ড কার্জন ১৯০৩-এ একটি নোট জারি করলেন। এরপর কিছু সরকারি অফিসার পুরো পূর্ববঙ্গকেই যুক্ত করে নিতে চাইলেন অসমের সঙ্গে। ১৯০৫ সালে কার্জন বঙ্গভঙ্গের একটি খসড়া পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য ইংল্যান্ডে পাঠান। ব্রিটেনের সরকার এতে অনুমোদন দেয়।

ভারত সরকার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে ১৯০৫ সালের জুলাই মাসে। এই ঘোষণা অনুযায়ী পূর্ববঙ্গ ও অসমকে নিয়ে একটি আলাদা প্রদেশ গঠন করা হল। চট্টগ্রাম, ঢাকা, রাজশাহী বিভাগ, ত্রিপুরা অঞ্চল, মালদা জেলা এবং অসমকে নিয়ে এই নতুন প্রদেশটি গঠিত হয়।

১৯০৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত হয় বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্তটি। ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর বাংলা ভাগ হয়ে গেল।

আদৌ কেন বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, তা নিয়ে বিতর্ক আছে। ব্রিটিশ শাসকেরা সবসময়েই বঙ্গভঙ্গের পিছনে যে প্রশাসনিক কারণ ছিল, সেটিকেই বড়ো করে তুলে ধরতেন। হয়তো কিছু প্রশাসনিক কারণ সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সেই সময় বঙ্গদেশের আয়তন ছিল ১,৮৯,০০০ বর্গ মাইল। ১৯০১ সালে বাংলাদেশের লোকসংখ্যা ছিল ৮ কোটির মতো। সুতরাং বাংলাকে শাসন করতে ইংরেজের কিছু প্রশাসনিক অসুবিধে তো হচ্ছিলই। কার্জন ও তাঁর অফিসাররা এই কারণগুলিকেই সবার সামনে তুলে ধরতে লাগলেন।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা কিন্তু বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনার পিছনে রাজনৈতিক কারণটিকে বুঝতে পেরেছিলেন। আধুনিক ঐতিহাসিকরাও বিশ্বাস করেন যে, কার্জনের বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনাটি মূলত একটি রাজনৈতিক পরিকল্পনা। প্রশাসনিক সুবিধার ব্যাপারটা গৌণ। এই সময় ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা শক্তিশালী হচ্ছিলেন। এতে ইংরেজরা ভয় পেয়ে যাচ্ছিল। বাংলা ছিল ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পীঠভূমি এবং জাতীয়তাবাদী নেতারা বেশিরভাগই ছিলেন বাঙালি। এইসময় কলিকাতার ভদ্রলোক সমাজও ইংরেজ শাসন সম্পর্কে তিক্ত হয়ে উঠছিলেন। কার্জন চেয়েছিলেন এই বাঙালি সমাজকে দুইভাগে ভাগ করে দুর্বল করে দিতে।

ইংরেজের এই 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' নীতির একটি সাম্প্রদায়িক দিকও ছিল। পূর্ববাংলা ছিল প্রধানত মুসলমান-প্রধান এলাকা এবং পশ্চিমবাংলা ছিল হিন্দু-প্রধান। ইংরেজরা হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের খেপিয়ে দিতে চেয়েছিল। তারা ভেবেছিল, বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে হিন্দু ও মুসলমানদের আলাদা করে দিলে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ দুর্বল হয়ে যাবে। ব্রিটিশ শাসকরা যুক্তি দিলেন যে, পূর্ববাংলায় প্রায় ২ কোটি মুসলমান এবং ১ কোটির মতো হিন্দুর বাস। তারা মুসলমানদের জন্য পূর্ববাংলায় একটি আলাদা প্রদেশ গঠনের প্রস্তাব দিলেন। হিন্দুরা এবং বেশিরভাগ মুসলমান তাদের এই প্রস্তাবে সায় দেয়নি। বস্তুত, বহু মুসলমান জাতীয়তাবাদী নেতাই ইংরেজের এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ছিলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ঢাকার নবাবের মতো কিছু প্রভাবশালী অভিজাত মুসলমান কিন্তু কার্জনের এই প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছিলেন।

প্রত্যাঘাত

বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী স্বদেশি আন্দোলন গোড়া থেকেই অতিশয় তীব্র ছিল। এই আন্দোলনে বাঙালির আবেগ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। প্রথম দিকে এই আবেগ প্রকাশিত হয়েছিল প্রচারপত্র, পুস্তিকা, বক্তৃতা, সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রভৃতির মাধ্যমে। অন্যভাবে বলা যায় যে, আবেদন-নিবেদনের নরমপন্থী পদ্ধতিগুলি প্রথম দিকে বেশি প্রযুক্ত হত। স্বদেশি আন্দোলনের এই প্রথম পর্বে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো নরমপন্থী নেতারা প্রধান ভূমিকা পালন করেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বোঝা গেল যে, এই নরমপন্থী পদ্ধতিগুলি বিশেষ কার্যকর হচ্ছে না। তখন চরমপন্থার প্রাবল্য দেখা দেয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, বিদেশি পণ্যের বয়কট (বর্জন) ক্রমে জনপ্রিয় হয়। পাশাপাশি কোনও কোনও চিন্তাবিদ গঠনমূলক স্বদেশির উপর জোর দেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মশক্তি-তত্ত্ব এই সময়েরই ফসল। কিন্তু এই দুই পদ্ধতির কোনওটিই যখন সম্পূর্ণ সাফল্য এনে দিতে পারল না, তখন যুব সমাজের একাংশ বৌকেন-বিপ্লবী সম্মানবাদের দিকে।

স্বদেশি আন্দোলনের প্রথম দিক এবং নরমপন্থীদের প্রাধান্য

১৯০৩ সালের ডিসেম্বর মাসে বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব সম্পর্কে খবর জানার সঙ্গে-সঙ্গেই সাধারণ মানুষ এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ১৯০৪ সালের প্রথম দুই মাসেই পূর্ববাংলায় অন্তত ৫০০ টি প্রতিবাদ সভা হয়। প্রধানত ঢাকা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম জেলাতেই এগুলি আয়োজিত হয়েছিল। বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে অন্তত ৫০,০০০ প্রচারণা বিলি করা হয়। বেঙ্গলি, হিতবাদী, বা সঞ্জীবনীর মতো খবরের কাগজগুলিতে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তখন বহু লেখা প্রকাশিত হয়েছে। একটি বিরাট প্রতিবাদ সভা হয় কলকাতার টাউন হলে। বঙ্গভঙ্গ রদ করার দরখাস্ত ভারত সরকার এবং ব্রিটিশ সরকারের কাছে পাঠানো হল। হাজার হাজার মানুষ এই দরখাস্তগুলিতে সই করেন। শুধুমাত্র ঢাকা বিভাগ থেকেই ৬৯ টি স্মারক লিপি ভারত সরকারের কাছে পাঠানো হয়।

এইসময় জনসমাবেশে ভাষণ, বক্তৃতা ইত্যাদি নরমপন্থী পদ্ধতিগুলিই গুরুত্ব পাচ্ছিল। মনে করা হচ্ছিল যে, এগুলির মাধ্যমেই ব্রিটিশ সরকারকে এবং ব্রিটিশ জনমানসকে প্রভাবিত করা যাবে।

অবশেষে ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ হয়ে গেল। এই দিনটি সারা বাংলাদেশে পালিত হল শোকদিবস হিসেবে। প্রতিটি বাড়িতে অরক্ষন। মানুষ সারাদিন উপবাসে থাকলেন। কলকাতা শহরে 'হরতালি' হল। খালি পায়ে মানুষ গঙ্গা পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে নদীতে স্নান করলেন। 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি দিতে-দিতে তারা পথ পরিক্রমা করলেন। 'বন্দেমাতরম' একদিনের মধ্যে জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা পেল। বাংলার মানুষ একে অপরের হাতে ভ্রাতৃত্বের প্রতীক হিসেবে রাশি পরালেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এইসব পরিক্রমায় অংশ নিলেন। স্বদেশি আন্দোলনের

পটভূমিকায় অত্যল্পকালের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এমন কয়েকটি গান রচনা করেন, যেগুলি মুহূর্তে জনপ্রিয়তা পায় এবং অসংখ্য মানুষের মুখে-মুখে ফিরতে থাকে।

১৬ অক্টোবরের বিকেলে এক বিশাল প্রতিবাদ-সভায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসু পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি লোকের সামনে বক্তৃতা দিলেন। এত বড়ো জনসমাবেশ কলকাতায় এর আগে কখনও হয়নি। এই সভায় বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রস্তাব পেশ হয়। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ৫০,০০০ টাকা তুলে একটি স্বদেশি তহবিলও গঠন করা হল।

অনেক আবেগ সত্ত্বেও স্বদেশি আন্দোলনের পছাড়া এই পর্বন্ত নরমপছীই ছিল। সেই আবেদন-নিবেদন এবং দরখাস্ত দেওয়ার পছা।

দ্বিতীয় পর্ব : চরমপছীদের উত্থান

মহারাষ্ট্রের বাল গঙ্গাধর টিলক, পঞ্জাবের লালা লাজপত রায় এবং বাংলার বিপিনচন্দ্র পাল ও অরবিন্দ ঘোষ ছিলেন প্রথম সারির চরমপছী নেতা।

চরমপছীরা ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চেয়েছিলেন। টিলকের বিখ্যাত উক্তি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় : ‘পূর্ণ স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার। আমি তাকে অধিকার করবই।’ যেখানে নরমপছীরা সীমাবদ্ধ প্রশাসনিক সংস্কার চেয়েছিলেন, সেখানে চরমপছীরা ভারতের পূর্ব স্বরাজ দাবি করলেন।

পদ্ধতি ব্যবহারেও পার্থক্য ছিল। নরমপছীরা যেখানে আবেদন-নিবেদনের পদ্ধতিতেই সীমাবদ্ধ ছিলেন, সেখানে চরমপছী আন্দোলনের পথ ছিল নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বলতে বোঝাত :

১) বিদেশি পণ্য বর্জন। চরমপছীদের এই পদ্ধতিটি কিন্তু প্রথম থেকেই সবার কাছে গ্রহণীয় ছিল। এমনকি নরমপছীরাও এই পদ্ধতিটিকে মেনে নিয়েছিলেন। এই পদ্ধতিটি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। স্বদেশি আন্দোলনের প্রথম থেকেই বাংলাদেশে বিদেশি পণ্য বর্জন করার আহ্বান জানিয়ে বহু মিটিং হয়। বিদেশি পণ্য বিক্রি করে এমন দোকানের সামনে ছাত্ররা পিকেটিং করত। বিদেশি বস্ত্র একজায়গায় জড়ো করে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হত। মনে করা হচ্ছিল যে, এইভাবে ব্রিটিশ শাসকদের ধাক্কা দেওয়া যাবে। এটাও ভাবা হচ্ছিল যে, এর ফলে স্বদেশি শিল্পগুলি গড়ে উঠবে ও প্রাণ পাবে। গুণগত মানের দিক থেকে নিকৃষ্ট হলেও মানুষ বিদেশি দ্রব্য বর্জন করে স্বদেশি জিনিসকেই সাদরে গ্রহণ করছিল। এই প্রসঙ্গে আমরা স্মরণ করতে পারি রজনীকান্ত সেনের গান,

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়

মাথায় তুলে নে রে ভাই।

২) ঔপনিবেশিক স্কুল, কলেজ, আদালত এবং সরকারি চাকরি বর্জনও ছিল চরমপছী কর্মসূচির অন্তর্গত। চরমপছীরা বিশ্বাস করতেন যে, শুধুমাত্র বিদেশি পণ্যেরই বর্জন নয়, ঔপনিবেশিক স্কুল, কলেজ, আদালত এবং সরকারি চাকরিরও বর্জন করতে হবে। ১৯০৫ সালের অগস্ট মাসে স্টার থিয়েটারে বিপিনচন্দ্র পাল একটি সভা ডাকলেন। এই সভায় ২০০ ছাত্র অঙ্গীকারবদ্ধ হল যে, তারা কখনও কোনও সরকারি চাকরিতে যোগ দেবে না। ১৯০৬ সালে বিপিনচন্দ্র পাল সমস্ত ভারতীয় টোকিদার, কনস্টেবল, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, সিপাই এবং

করণিকদের সরকারি চাকরি ছেড়ে বেরিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানানেন। এইভাবে তিনি ব্রিটিশ শাসনের মূলে আঘাত করতে চেয়েছিলেন। ১৯০৭ সালে অরবিন্দ ঘোষ নিক্টিয় প্রতিরোধের একটি বিস্তারিত তত্ত্ব দিলেন। তিনি বললেন যে, ব্রিটিশের অন্যায় আইন আর মানা হবে না। তাঁর তত্ত্ব অনুসারে, বিদেশি পণ্যের পরিবর্তে স্বদেশি পণ্য, বিদেশি শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তে স্বদেশি শিক্ষাব্যবস্থা, ঔপনিবেশিক আদালতের পরিবর্তে স্বদেশি আদালতকে স্থান দিতে হবে। 'বিশ্বাসঘাতক'দের সামাজিকভাবে বয়কট করতেও আহ্বান জানান তিনি।

৩) শিল্পশ্রমিক ধর্মঘট : চরমপন্থীরা শিল্পশ্রমিকদের ধর্মঘটেও উৎসাহ দিয়েছিলেন। এইসময় বহু শিল্পশ্রমিক ধর্মঘট হয়। সবসময় যে এই ধর্মঘটগুলি রাজনৈতিক চরিত্রের ছিল, তা নয়। কিন্তু চরমপন্থীরা কোনও কোনও সময় ধর্মঘট শ্রমিকদের স্বদেশি আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে নিতে চেয়েছিলেন।

৪) হিংসাত্মক কার্যকলাপের প্রতি গোপন ও প্রচ্ছন্ন সমর্থন : যদিও নিক্টিয় প্রতিরোধ হিংসাত্মক কার্যকলাপকে সরাসরি সমর্থন করত না, কিন্তু অনেক সময়ই চরমপন্থী নেতাদের সঙ্গে সশস্ত্র বিপ্লবীদের গোপন যোগাযোগ থাকত। ১৯০৭ সালে অরবিন্দ ঘোষ যখন নিক্টিয় প্রতিরোধের বিস্তারিত তত্ত্ব দিলেন, তখন তিনি বললেন যে, ব্রিটিশের দমনমূলক কার্যকলাপ যদি সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়, তা হলে ভারতীয়রা সহিংস পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারবে। টিলক, লাজপত্ রায় বা বিপিনচন্দ্র পালের মতো নেতারা অনেক সময়ই সশস্ত্র বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন।

৫) হিন্দুত্ব : চরমপন্থী নেতারা খানিকটা পুনরুত্থান-মূলক দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করেছিলেন। টিলক শিবাজির শৌর্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে ও তাঁর আদর্শকে জনচিহ্নে গেঁথে দিতে মহারাষ্ট্রে শিবাজি উৎসবের সূচনা করেন। তিনি গণপতি উৎসবকেও জনপ্রিয় করে তোলেন। বাংলায় বিপিনচন্দ্র পাল দুর্গা এবং কালীর নাম করে যুবসমাজকে অনুপ্রাণিত করতে চাইলেন। এইভাবেই রাজনীতির অঙ্গনে হিন্দু পুনরুত্থানবাদের প্রবেশ ঘটল।

এই সময় অনেক জাতীয়তাবাদী নেতাই ভারতের উন্নয়নের জন্য গঠনমূলক ব্যবস্থার উপর জোর দিচ্ছিলেন। এঁদের মনে হচ্ছিল, নরমপন্থী এবং চরমপন্থী উভয় ধরনের নেতাই অনেকসময় স্বদেশির নামে রাজনীতির উপর বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন। গঠনমূলক স্বদেশির সমর্থকেরা নিক্টিয় প্রতিরোধের নঞর্থক দিকের পরিবর্তে আত্মশক্তি বা গঠনমূলক ব্যবস্থার উপর জোর দিলেন।

এই গঠনমূলক স্বদেশিকে নিম্নলিখিত বিন্যাসে আলোচনা করা যায়।

অর্থনৈতিক স্বদেশি : আবেগ ও অর্থনীতি, এই দুইই ছিল অর্থনৈতিক স্বদেশির ভিত্তিভূমি। ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধ্বে থেকেই অনেক বাঙালি স্বাধীনভাবে ব্যাবসা করা শুরু করলেন। হৃদয়ের আবেগ এবং নিজস্ব বিশ্বাসের জায়গা থেকেই তাঁরা এই উদ্যোগ নিয়েছিলেন। স্বদেশি আন্দোলনের পটভূমিতে তাঁদের এই উদ্যোগ একটা নতুন মাত্রা পায়। অর্থনৈতিক স্বদেশি উদ্যোগগুলি এইসময় খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। বস্তুত অর্থনৈতিক স্বদেশি ছিল বিদেশি পণ্য বর্জনেরই পরিপূরক। বিদেশি পণ্য বর্জন করে স্বদেশি জিনিস তৈরি করা অর্থনৈতিক স্বদেশির মূল কথা।

১৯০৫ থেকে একের পর এক স্বদেশি বস্ত্রালয় এবং স্বদেশি ভাণ্ডার খুলতে লাগল।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বেঙ্গল কেমিক্যাল এই সময়ে খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। বেঙ্গল কেমিক্যাল ছাড়াও বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস, মোহিনী মিলস প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের পণ্য এই সময় জনপ্রিয় হয়। এই সময়েই ডাক্তার নীলরতন সরকার স্বদেশি সাবানের কারখানা খুললেন। রাসবিহারী ঘোষ 'বন্দেমাতরম' দেশলাই কারখানা শুরু করলেন। বহু স্বদেশি তেলকল এবং চিনি তৈরির কারখানা নতুন করে তৈরি হল। একইসঙ্গে তৈরি হল অনেক বেসরকারি স্বদেশি ব্যাংক।

এই স্বদেশি উদ্যোগগুলির হয়তো কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল। কিন্তু এরই মধ্যে স্যার রাজেন মুখার্জির মতো কয়েকজন বাঙালি ব্যবসায়ী খুবই সফল হন। সাফল্য ছাড়াও অর্থনৈতিক স্বদেশির আদর্শটিও বাঙালি যুবসমাজকে খুবই নাড়া দিয়েছিল।

জাতীয় শিক্ষা : ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতারা ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে সন্ধিগ্ধ হয়ে উঠছিলেন। জাতীয়তাবাদী নেতারা বিশ্বাস করতেন যে, ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থা ভারতীয়দের স্বার্থপর ও দেশদ্রোহী করে তুলছে। এইসময় সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং তাঁর 'ডন সোসাইটি' ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থা বর্জনের জন্য ভারতীয় তরুণদের আহ্বান করলেন। ১৯০১ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতীয় ছাত্রদের ভারতীয় সংস্কৃতিতে শিক্ষিত করার জন্য শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০৫ সাল নাগাদ এই জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠল।

ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থা বর্জনের জন্যই জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন শুরু হয়েছিল। শতশত ছেলে এইসময় ইংরেজি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ছেড়ে বেরিয়ে আসে। একটি জাতীয় শিক্ষা পরিষদ স্থাপিত হয়। এই পরিষদ সাধারণ মানুষের কাছ থেকে টাকা তুলে বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ অ্যাণ্ড স্কুল তৈরি করে। অরবিন্দ ঘোষ ছিলেন এর প্রথম অধ্যক্ষ। এই প্রতিষ্ঠানে তিনটি বিভাগ ছিল : কলা, বিজ্ঞান ও কারিগরি। শিক্ষাদানের সময় ভারতীয় ইতিহাস, ভারতীয় দর্শন, ভারতীয় সাহিত্য ইত্যাদির উপর সচেতনভাবে গুরুত্ব দেওয়া হত।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিকল্প হিসেবে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু কার্যত দেখা গেল, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত একটি কলেজও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে এসে জাতীয় শিক্ষা পরিষদে যোগদান করেনি। তবে একথা অনস্বীকার্য, জাতীয় শিক্ষা সম্পর্কে ধারণা সেইসময় বহু ভারতীয় তরুণকে অনুপ্রাণিত করেছিল।

শুধু কলকাতা শহরেই নয়, জাতীয় শিক্ষা সম্পর্কে ধারণা বাংলার জেলাগুলিতেও ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৯০৭ সালের মধ্যে রংপুর, ঢাকা, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, মালদা প্রভৃতি জেলায় জাতীয় স্কুল স্থাপিত হয়ে যায়। জেলার এই জাতীয় স্কুলগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করত কলকাতায় অবস্থিত জাতীয় শিক্ষা পরিষদ।

জাতীয় শিক্ষা সম্পর্কে অনুরাগ ছড়িয়ে পড়েছিল বাংলার বাইরেও। এই সময়েই পুনা, বম্বে ও মাদ্রাজে জাতীয় স্কুল এবং কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

স্বদেশি সমিতি : এই সময় বাংলায় অনেক সমিতি ও স্বেচ্ছাসেবক সংস্থা স্থাপিত হয়েছিল। এই সমিতিগুলি গ্রামীণ পুনর্গঠন এবং জাতি-নির্মাণ সম্পর্কিত কাজের উপর জোর দিত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, বরিশাল জেলায় অম্বিনীকুমার দত্ত এরকম বহু স্বেচ্ছাসেবক সংস্থা তৈরি করেছিলেন। তিনি স্বদেশ বান্ধব সমিতি নামে যে সমিতিটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন,

সেটির বহু গ্রামীণ শাখা ছিল। অনেক স্বেচ্ছাসেবক এই সমিতিতে কাজ করতেন এবং এই সমিতি সমাজ-সেবামূলক বহু রকমের কাজ করত। অনুশীলন সমিতি প্রভৃতি সংগঠন পরে বিপ্লবী চরিত্র ধারণ করে।

স্বদেশি সমাজ : স্বদেশি সমাজ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি সুস্পষ্ট নিজস্ব ধারণা ছিল। তাঁর মতে, আত্মশক্তির মাধ্যমে এই স্বদেশি সমাজ গড়ে উঠবে। আত্মশক্তির অর্থ হল, স্বাবলম্বনের মাধ্যমে সমাজের পূর্ণাঙ্গ পুনর্গঠন। সমাজের সমবেত উদ্যোগের মাধ্যমে এই পুনর্গঠন সম্ভব হবে। ব্রিটিশ সরকারের উপর নির্ভরশীলতার পরিবর্তে সমাজকে নিজস্ব সমস্যার সমাধান নিজেই করতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'স্বদেশি সমাজ' নামক প্রবন্ধে বললেন যে, সমাজের নেতা কে হবেন, তা সমাজই ঠিক করবে। এই নেতার নাম হবে সমাজপতি। সমাজপতি তাঁর পরামর্শদাতাদের নিয়ে ভারতীয় সমাজকে ভারতীয় আদর্শে শাসন করবেন। স্বদেশি সমাজ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকারকে অস্বীকার করবে।

রবীন্দ্রনাথ একবার সমাজপতি হিসেবে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম প্রস্তাব করেছিলেন। আরেকবার তিনি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামও উত্থাপন করেছিলেন। অন্য প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন যে, একজন হিন্দু ও একজন মুসলমান একসঙ্গে সমাজপতি হলে তা হবে আদর্শ ব্যবস্থা।

রবীন্দ্রনাথ গ্রামীণ পুনর্গঠনের জন্য কিছু নির্দিষ্ট কর্মসূচি ঠিক করেছিলেন। তিনি কৃষির জন্য উন্নত পদ্ধতি গ্রহণ করার কথা ভেবেছিলেন। এ ছাড়া, সমবায় ব্যাংকের মাধ্যমে গ্রামীণ ঋণ দেওয়ার কথাও চিন্তা করেছিলেন। গ্রামে-গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার, পরিশুদ্ধ পানীয় জলের সরবরাহ, চিকিৎসার সুযোগ তাঁর গ্রামীণ কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল।

পূর্ববঙ্গে নিজেদের জমিদারিতে এবং শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ গ্রামীণ পুনর্গঠন কর্মসূচি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন।

১৯০৮ সাল নাগাদ দেখা গেল যে, নরমপন্থী নেতারা তাঁদের জনপ্রিয়তা হারিয়েছেন এবং চরমপন্থী নেতারাও আর কার্যকর নেই। এই সময় বহু চরমপন্থী নেতাই কারারুদ্ধ, এবং তার ফলে যোগ্য নেতৃত্বের একটা অভাব অনুভূত হচ্ছিল। বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীদের গুপ্ত সংগঠনগুলি এই সময়ই গঠিত হয়।

বিপ্লবীরা দ্রুত ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চেয়েছিলেন। নরমপন্থীদের সীমাবদ্ধ প্রশাসনিক পরিবর্তন এঁরা চাননি। চরমপন্থীদের মতো ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতাই বিপ্লবীরা চেয়েছিলেন এবং তাও অতি দ্রুত গতিতে।

এই গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠনগুলি বীর ও সাহসী তরুণদের দেশের কাজের জন্য নির্বাচিত করেছিল। এঁদের মধ্যে অনেকেই সরকারি অফিসার, গুপ্তচর এবং বিশ্বাসঘাতকদের হত্যা করায় বিশ্বাস করতেন। টাকা সংগ্রহ করার জন্য ডাকাতিতেও এঁদের দ্বিধা ছিল না। অনেক সময় এঁরা বড়ো মাপের সশস্ত্র অভ্যুত্থানেরও পরিকল্পনা করতেন। এই বিপ্লবী নেতারা ব্যক্তিগত সন্ত্রাসের পথেই বিশ্বাসী ছিলেন। এঁরা বেশিরভাগই ছিলেন আবেগপ্রবণ মধ্যবিত্ত তরুণ। অনেকক্ষেত্রে এই বিপ্লবীদের সঙ্গে ব্রিটিশ-বিরোধী দেশগুলির সম্পর্ক ছিল। এই দেশগুলির কাছ থেকে এঁরা অস্ত্র পেতেন বা অস্ত্র পাওয়ার চেষ্টা করতেন।

প্রথমদিকে শুণ্ড বিপ্লবী সংগঠনগুলির সঙ্গে চরমপন্থী নেতা এবং গঠনমূলক স্বদেশি নেতাদের যোগাযোগ ছিল। যেমন, চরমপন্থী নেতা অরবিন্দ ঘোষ ও সমাজ সংগঠক অশ্বিনীকুমার দত্তের সঙ্গে বহু বিপ্লবী সম্ভ্রাসবাদী নেতারই যোগাযোগ ছিল। কিন্তু ১৯০৮ সাল থেকে বিপ্লবীরা ক্রমশ একক হয়ে গিয়ে কাজ করতে থাকলেন।

১৯০৮ সালে হেমচন্দ্র কানুনগো ইউরোপ থেকে বিপ্লব বিষয়ে শিক্ষা নিয়ে এলেন। অনেক জিনিসের সঙ্গে তিনি বোমা বানানোর পদ্ধতি সম্পর্কিত পুস্তিকা নিয়ে আসেন। এই সময়ই মানিকতলার কাছে মুরারিপুকুরে একটি বাগানবাড়িতে বারীন ঘোষ বোমা বানানোর কারখানা তৈরি করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের রসায়ন বিভাগের ছাত্র উদ্ভাসকর দত্তকে বোমা বানানোর ভার দেওয়া হল।

১৯০৮ সালেই হেমচন্দ্র কানুনগো মজঃফরপুরের চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যা করার জন্য বইয়ের মধ্যে ঢুকিয়ে একটি বোমা পাঠিয়ে দেন। কিন্তু কিংসফোর্ড সেই বইটি খোলেননি। হেমচন্দ্র কানুনগো তখন ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকীকে মজঃফরপুরে পাঠান। কিংসফোর্ডকে হত্যার উদ্দেশ্যে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল তাঁর গাড়িতে বোমা ছোড়েন। কিন্তু সেই গাড়িতে কিংসফোর্ড ছিলেন না। পুলিশ ক্ষুদিরামকে গ্রেপ্তার করে ও তাঁর ফাঁসি হয়। পুলিশের হাতে ধরা পড়ার আগেই প্রফুল্ল চাকী আত্মহত্যা করেন।

মুরারিপুকুরের বাড়িতে বোমা বানানোর সরঞ্জাম পাওয়ায় বারীন ঘোষকে গ্রেপ্তার করা হয়। এর কিছুদিন পরেই বিপ্লবী নরেন গোস্বামী রাজসাক্ষী হন। বিপ্লবীরা আলিপুর জেলের মধ্যেই তাঁকে খুন করেন। কয়েক মাস পর বাংলার লেফট্যান্যান্ট গভর্নর ফ্রেজার বিপ্লবীদের হাতে আক্রান্ত হন।

এই সময় বহু স্বদেশি ডাকাতি হয়েছিল। বিপ্লবীরা এই সময় অনেক ভারতীয় অফিসারের উপরেও হামলা চালিয়েছিলেন।

সী মা ব দ্ব তা

স্বদেশি আন্দোলনের স্পষ্টতই কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল। প্রথমত, বিদেশি ব্যাবসা বাণিজ্যের উপর বয়কট আন্দোলন তেমন কোনও প্রভাব ফেলেনি। স্বদেশি দ্রব্যগুলি গুণগত মানে খুব উৎকৃষ্ট ছিল না। দ্বিতীয়ত, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা খুব একটা সফল হয়নি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিকল্প হিসেবে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ কখনওই স্থান করে নিতে পারেনি। তৃতীয়ত, খুব অল্প সংখ্যক লোকই সরকারি চাকরি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন।

১৯১১ সালে দুই ভাঙা বাংলা আবার এক হয়ে যায়। এটি নিঃসন্দেহে একটি স্মরণীয় ঘটনা। কিন্তু এটি ছাড়া স্বদেশি আন্দোলনের অন্যান্য লক্ষ্যগুলি কিন্তু অধরাই থেকে যায়। ১৯০৯ সালে যে মর্লে-মিস্টো সংস্কার হল, তা মূল লক্ষ্যের তুলনায় কিছুই না। ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্য স্বপ্নই থেকে গেল।

সামাজিক-সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে স্বদেশি আন্দোলনের সীমাবদ্ধতাকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়।

প্রাদেশিক সীমাবদ্ধতা : শেষ পর্যন্ত কিন্তু স্বদেশি আন্দোলন মূলত একটি প্রাদেশিক আন্দোলনই হয়ে থাকল। যদিও মহারাষ্ট্র, পঞ্জাব, মাদ্রাজ এবং ভারতের অন্যান্য জায়গার

জাতীয়তাবাদী নেতারা স্বদেশি আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন, তবুও প্রধানত এই আন্দোলন ছিল মধ্যবিত্ত বাঙালির আন্দোলন। অনেক সময় বাংলার নেতারা অসম বা ওড়িশা সম্পর্কে কটু মন্তব্য করতেন। এর ফলেও স্বদেশি আন্দোলন সর্ব-ভারতীয় আন্দোলন হয়ে ওঠার পথে বাধা পেয়েছে। এই প্রাদেশিক সীমাবদ্ধতাকে অস্বীকার করা যায় না।

সাম্প্রদায়িক সীমাবদ্ধতা : স্বদেশি নেতারা (বিশেষত, চরমপন্থী এবং বিপ্লবী সন্তোষবাদী নেতারা) অনেক সময়ই হিন্দু প্রতীক ব্যবহার করতেন। মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তাঁরা হিন্দু দেবীদের নাম বেশি করে উল্লেখ করতেন। গীতা থেকে অনেক সময়ই উদ্ধৃতি দেওয়া হত। মুসলমানরা এর ফলে অনেক সময়ই দূরে সরে গিয়েছিলেন।

প্রথম থেকেই কয়েকজন মুসলমান নেতা স্বদেশি আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন। কার্জন মুসলমানদের এই অংশকে খুশি করে তাদের হিন্দুদের থেকে দূরে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। বস্তুত, এইভাবে তিনি হিন্দু এবং মুসলিমদের মধ্যে একটি বিভেদ সৃষ্টি করেন।

হিন্দু এবং মুসলমানদের এই বিভেদের পিছনে অর্থনৈতিক কারণও ছিল। স্বদেশি আন্দোলনের অনেক নেতাই ছিলেন হিন্দু জমিদার। এঁদের জমিদারি ছিল পূর্ববাংলায়। আর এঁরা নিজেরা থাকতেন কলকাতায়। এই জমিদারদের প্রজারা বেশিরভাগই ছিলেন পূর্ববাংলার দরিদ্র মুসলমান। এই দরিদ্র মানুষেরা বেশি টাকা দিয়ে খারাপ মানের স্বদেশি দ্রব্য কিনতে সক্ষম হতেন না। এই প্রসঙ্গে আমরা রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে উপন্যাসে নিখিলেশের কথা স্মরণ করতে পারি।

ব্রিটিশ শাসকরা চতুরতার সঙ্গে বিভেদনীতি প্রয়োগ করেছিল। স্বদেশি নেতারা একে প্রতিরোধ করতে পারেননি। ফলত, স্বদেশি আন্দোলনের শেষভাগে এসে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সম্পর্ক খুব তিক্ত হয়ে গিয়েছিল। এই সময় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গাও কম হয়নি। ১৯০৬-০৭ থেকে এই সব দাঙ্গা ভয়াবহ হয়ে ওঠে। পরবর্তী কালে ভারতীয় রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা স্থায়ী ক্ষতের রূপ নেয়। অনেক ঐতিহাসিকের মতে, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্পর্কের তিক্ততাই স্বদেশি আন্দোলনের সর্বপ্রধান সীমাবদ্ধতা।

বর্ণগত বা জাতপাতের সীমাবদ্ধতা : হিন্দুদের মধ্যেও প্রধানত উচ্চবর্ণের মানুষেরাই স্বদেশি আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য এবং ব্রাহ্মণরাই স্বদেশি আন্দোলনে বেশি যুক্ত হয়েছিলেন। বাংলার নিম্নবর্ণের মানুষ স্বদেশি আন্দোলন থেকে দূরে ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের গোরা উপন্যাসে আমরা এই সীমাবদ্ধতার ইঙ্গিত পাই।

শ্রেণীগত সীমাবদ্ধতা : স্বদেশি আন্দোলনের কিছু শ্রেণীগত সীমাবদ্ধতা ছিল। ভারতের কৃষক সমাজ এই আন্দোলন সম্পর্কে ছিল নিষ্পৃহ। এইসময় কিছু শ্রমিক ধর্মঘট হলেও সেগুলি খুব বেশি রাজনৈতিক চরিত্রের ছিল না। অনেকেই বলেন, স্বদেশি আন্দোলন মূলত জমিদার, উকিল এবং মধ্যবিত্ত মানুষের আন্দোলন। মার্কসবাদী ঐতিহাসিকরা অনেকসময় স্বদেশি আন্দোলনকে এটি বুর্জোয়া বা পাতি-বুর্জোয়া শ্রেণির আন্দোলন বলেন। ক্রমফিল্ডের* মতে এই আন্দোলনকে মূলত ভদ্রলোক শ্রেণির আন্দোলন ছিল। অনেকের মতে বুদ্ধিজীবী শ্রেণিই এই আন্দোলনকে চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। বাস্তবিকই স্বদেশি আন্দোলন শেষ পর্যন্ত মধ্যবিত্ত-উচ্চবর্ণীদের আন্দোলন হয়ে থাকল।

* ডে. এইচ. ক্রমফিল্ড, এলিট কনফ্লিক্ট ইন এ প্রুরাল সোসাইটি : টুয়েন্টিয়েথ সেন্টুরি বেঙ্গল

ত ব ম নে রে খো

সাংস্কৃতিকভাবে স্বদেশি আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে ভারতীয় জাতির নবজন্ম হল। অতীতের পুনরুদ্ধার এবং বর্তমানের পরিবর্তনের হাত ধরে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা নতুনভাবে একটি জাগ্রত সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করতে সক্ষম হলেন।

বিশেষত বাংলাদেশে স্বদেশি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সাংস্কৃতিক জগতে নতুন জোয়ার এসেছিল। সংগীত, কবিতা, নাটক, ছোটগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, ঐতিহাসিক লেখা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে বঙ্গ সংস্কৃতি যেন নতুন করে জেগে উঠল।

১৯০৫ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অসামান্য কয়েকটি স্বদেশি গান লেখেন। এইসময় রজনীকান্ত সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও মুকুন্দ দাসও অনেক দেশাত্মবোধক গান ও কবিতা লিখেছিলেন। আঞ্চলিক ভাষাতেও এইসময় অনেক গান লেখা হয়। ভাদুগান এবং অন্যান্য পল্লিগীতির মধ্যে স্বদেশ-প্রীতির ঝংকার শুনি। বিপ্লবী সম্ভ্রাসবাদীরা অনেকসময় গানের মাধ্যমে তাঁদের হৃদয়ের আবেগ প্রকাশ করতেন। বিপ্লবী উল্লাসকর দত্ত আলিপুর জেলে তাঁর বিচার চলাকালীন গেয়ে উঠেছিলেন :

সার্থক জনম আমার

জন্মেছি এই দেশে।

এইসময় অনেক দেশাত্মবোধক নাটকও লেখা হয়। ১৯০৫-১৯০৮ সালের মধ্যে গিরিশচন্দ্র ঘোষ সিরাজদৌল্লা, মির কাশেম বা ছত্রপতি শিবাজির মতো বিখ্যাত নাটকগুলি লেখেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এই সময় লেখেন প্রতাপসিংহ, দুর্গাদাস এবং মেবার পতন। সবক'টি নাটকই ছিল নবজাগ্রত স্বদেশবোধের ফসল।

ছোটগল্পের ক্ষেত্রে আমরা বিশেষ করে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করতে পারি। তাঁর 'খালাস' ছোটগল্প একজন বাঙালি ম্যাজিস্ট্রেটের (স্বদেশি জীবীর প্রভাবে) দেশপ্রেমী হয়ে ওঠার কাহিনি।

এই পর্বে যেসব উপন্যাস লেখা হয়েছিল, তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল রবীন্দ্রনাথের গোরা। এই উপন্যাসে সমকালীন বহু দ্বন্দ্ব অসামান্য দক্ষতায় চিত্রিত হয়েছে। এর কিছুদিন পরেই রবীন্দ্রনাথ ঘরে বাইরে লেখেন। ঘরে বাইরে উপন্যাস এক হিসেবে চরমপন্থী ভাবনার সীমাবদ্ধতার কাহিনি।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মতো কিছু প্রাবন্ধিকের রচনাতেও এইসময় স্বদেশি ভাবনার পরিচয় পাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'স্বদেশি সমাজ' লেখেন এই সময়েই।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, যদুনাথ সরকার এই পর্বে ভারতের ইতিহাস নিয়ে লেখা শুরু করেন। বাংলার পল্লিকথার উপর গবেষণা করেন দীনেশচন্দ্র সেন। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারও বাংলার প্রাচীন রূপকথাগুলি সংগ্রহ করে তাঁর বিখ্যাত বই ঠাকুরমার ঝুলি লেখেন এই সময়েই।

বৈজ্ঞানিক রচনার ক্ষেত্রেও স্বদেশির প্রভাব চোখে না-পড়ে পারে না। জগদীশচন্দ্র বসু এবং প্রফুল্লচন্দ্র রায় দেশপ্রেমী বিজ্ঞানসাধক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। প্রফুল্লচন্দ্রের হিন্দু রসায়নের ইতিহাস নামক গ্রন্থটি স্বদেশি আন্দোলনেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ ফসল।

চিত্রকলার উপরেও স্বদেশি আন্দোলনের প্রভাব গভীরভাবে পড়েছিল। অবনীন্দ্রনাথ

ঠাকুর এবং তাঁর ছাত্ররা এই সময় চিত্রশিল্পে একটি নতুন ধারার প্রবর্তন করেন। অবনীন্দ্রনাথের কিছু ছবিতে আমরা সোজাসুজি রাজনৈতিক বার্তা পাই। তাঁর ‘ভারতমাতা’ চিত্রটির কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

স্বদেশি আন্দোলনের রাজনৈতিক প্রভাব ও তাৎপর্য নিয়ে আলাদা করে কিছু বলা দরকার। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উপর স্বদেশি আন্দোলনের বিপুল প্রভাবকে কোনওমতেই অস্বীকার করা যায় না। এমনকি স্বাধীনতার পরেও ভারতীয় রাজনীতিতে এই প্রভাব অক্ষুণ্ণ আছে। ভারতীয় রাজনীতির বিভিন্ন ধারা, দর্শন এবং পদ্ধতির প্রথম মূর্ত প্রকাশ ঘটে স্বদেশি আন্দোলনের মধ্য দিয়েই। ভারতীয় রাষ্ট্রের বিবর্তনের ইতিহাসে স্বদেশি আন্দোলন গভীর প্রভাব ফেলেছে।

যদিও স্বদেশি আন্দোলনের কিছু প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক সীমাবদ্ধতা ছিল, তবুও আধুনিক জাতীয়তাবাদের ইতিহাসে এই আন্দোলনকেই প্রথম সর্বভারতীয় আন্দোলন বলা যায়। এ কথা সত্য যে, ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহও সর্বভারতীয় চরিত্রের ছিল। কিন্তু সেই বিদ্রোহের মধ্যে আধুনিক উপাদানগুলি উপস্থিত ছিল না। তাতে নেতৃত্বে ছিলেন মূলত ইংরেজ শাসনে হতাশাগ্রস্ত অভিজাতবর্গ। স্বদেশি আন্দোলনের মধ্য দিয়েই সর্বপ্রথম আধুনিক জাতীয়তাবাদী নেতারা তাঁদের আধুনিক মতাদর্শ নিয়ে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন।

তা ছাড়া, স্বদেশি আন্দোলনের মধ্য দিয়েই সর্বপ্রথম ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন আন্তর্জাতিক ব্যাপ্তি ও মাত্রা পায়। এই আন্দোলনের বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী নেতাদের অনেকের সঙ্গেই আন্তর্জাতিক স্তরে ব্রিটিশ-বিরোধী শক্তির যোগাযোগ ছিল। এঁরা অনেকেই বিপ্লবকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিদেশে গিয়েছিলেন। বিদেশ থেকে এঁরা বোমা বানানোর পদ্ধতিও শিখে এসেছিলেন। এই সময়ের অনেক বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী নেতার সঙ্গে আন্তর্জাতিক স্তরে কমিউনিস্ট নেতাদের যোগাযোগ হয়েছিল। ১৯০৭ সালে জার্মানিতে দ্বিতীয় কমিউনিস্ট মহাসম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে উপস্থিত ভারতীয় নেতারা ভারতের স্বাধীনতার প্রস্তাবটি সর্বসমক্ষে পেশ করেন। লেনিন এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

স্বদেশি আন্দোলনের মধ্য দিয়েই যে প্রথম ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার কথা উচ্চারিত হয়েছিল, তাও স্মর্তব্য। চরমপন্থী এবং বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী—এই উভয় ধারার নেতারা ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতাকে তাঁদের লক্ষ্য বলে ঘোষণা করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, স্বদেশি আন্দোলনের পর আবার বহু বছর ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার কথাটি উচ্চারিত হয়নি। ১৯৩০ সালে এসে আবার ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতাকে তাদের লক্ষ্য বলে ঘোষণা করে।

স্বদেশি আন্দোলনের মধ্য দিয়েই ভারতে প্রথম জন-আন্দোলনের সূচনা। স্বদেশি আন্দোলনের পদ্ধতিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ, জনসমাবেশ ইত্যাদি। গান্ধীজির নেতৃত্বে পরে স্বাধীনতা আন্দোলনে এই পদ্ধতিগুলি গৃহীত ও জনপ্রিয় হয়েছিল।

ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে গান্ধীজি কিন্তু প্রথম দিকে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার কথা বলেননি। তখনও পর্যন্ত তাঁর কথাবার্তা ছিল অনেকটা নরমপন্থীদের মতোই। কিন্তু পদ্ধতিগত দিক থেকে প্রথমাধি তিনি স্বদেশি আন্দোলনের পদ্ধতিতেই গ্রহণ করেছিলেন। বয়কট আন্দোলনের মাধ্যমে ব্রিটিশ পণ্য, ইস্কুল, কলেজ, অফিস, কাছারি বর্জনের পদ্ধতিটিও

প্রথমাধি তাঁরই। বস্তুত ১৯২০ সাল থেকে গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনে নরমপট্টী লক্ষ্যের সঙ্গে চরমপট্টী পদ্ধতির মেলবন্ধন ঘটেছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, অহিংসার পথ ছিল গান্ধীজির নিজস্ব অবদান।

স্বদেশি আন্দোলনের মধ্য দিয়েই প্রথম চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছিল জাতিকে গঠন করার। ১৮৫৭ সনের মহাবিদ্রোহের পর থেকে একের পর এক ব্রিটিশ-বিরোধী বিদ্রোহের ঘটনা ঘটে। এই সব বিদ্রোহ ছিল চরিত্রের দিক থেকে নেতিবাচক। ব্রিটিশ শোষণের অবসান ঘটানোই ছিল এই সব বিদ্রোহের একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু ভারতকে নতুন করে গঠন করার কোনও উদ্যোগ তখনও পর্যন্ত নেওয়া হয়নি।

স্বদেশি আন্দোলনের সময়ই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বদেশি সমাজ নিয়ে তাঁর চিন্তাভাবনার কথা দেশবাসীকে জানান। তাঁর চিন্তার অন্যতম বিষয় ছিল সামাজিক সমবায়। অশ্বিনীকুমার দত্তের মতো অনেকে সমাজ পুনর্গঠনের জন্য গ্রামে-গ্রামে স্বেচ্ছাসেবক সংস্থা গড়ে তুলেছিলেন। এই সময়ই বহু স্বদেশি কলকারখানার প্রতিষ্ঠা হয়। এই সময়ই প্রফুল্লচন্দ্র রায় বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রতিষ্ঠা করেন এবং জামশেদজি টাটা ইস্পাত কারখানা তৈরি করার কথা ভাবেন। সাংস্কৃতিক জগতে স্বদেশি মেলা এবং উৎসবের জনপ্রিয়তা বাড়ে। রাজনৈতিক সম্মেলনগুলিতে মাতৃভাষায় বক্তৃতা দেওয়া শুরু হয়। সুতরাং, অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি—সর্বক্ষেত্রেই জাতি গঠন নিয়ে চিন্তাভাবনা এই স্বদেশির সময়েই শুরু হয়।

স্বদেশি আন্দোলনের সময়েই সমাজের দুর্বলতর শ্রেণিগুলি প্রথম খানিকটা মাথা তুলতে পেরেছিল। আধুনিক শ্রমিক আন্দোলনের সংগঠিত শুরুটাও হয়েছিল এইসময়ই। শ্রমিকের অসন্তোষ আগেও ছিল, কিন্তু জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের মূর্ত প্রকাশ এই সময়েই হয়।

সমাজের নিম্নতর জাতিগুলিও এইসময়েই আধুনিক পছায় সংগঠিত হতে শুরু করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, পূর্ববাংলার নমঃশূদ্র জাতি এই সময়েই সংগঠিত হয়। সাম্প্রতিক কালের গবেষকেরা বলছেন যে, ভাগচাষী এবং প্রান্তিক চাষীরাও স্বদেশির সময়েই প্রথম সংগঠিত হতে থাকে।

এই স্বদেশি আন্দোলনের মধ্য দিয়েই মহিলারা প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলনে পদক্ষেপ করেন। বরিশালের মনোরমা বসুর নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। দুকড়ি বালা দেবী এবং ননীবালা দেবী নামে দুজন বিধবা ভদ্রমহিলা বিপ্লবী সম্মানস্বাবে অংশ নেন। সরলা দেবী চৌধুরানিও এই আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন।

আবার, সাম্প্রদায়িকতার বীজও অঙ্কুরিত হয় এই আন্দোলনের সময়ই। ১৯০৬ সালে ঢাকায় মুসলিম লিগের প্রতিষ্ঠা হয়। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এই বিরোধ পরবর্তীকালে প্রচুর বিষবাপ্স ছড়িয়েছে। হিন্দুত্বের পুনরুত্থানও হয় এই সময়েই। ১৯০৬ সাল থেকে শুরু হয় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা। সেই ভয়াবহ অতীতের কথা আগেই বলেছি।

সংক্ষেপে, স্বদেশি আন্দোলনের মধ্যে পরবর্তী কালের ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সবকিছু বৈশিষ্ট্য, শক্তি এবং দুর্বলতা নিহিত ছিল। পরবর্তীকালের গান্ধীবাদী স্বাধীনতা আন্দোলনে এই স্বদেশি আন্দোলনেরই ধারাবাহিকতা বজায় থেকেছে, এমন কথা বললে বোধহয় অন্যায় হবে না।

বর্ণপরিচয়-এর দেড়শো বছর

অমিতাভ মুখোপাধ্যায়

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগের দুমাস পরে বেরিয়েছিল দ্বিতীয় ভাগ। সেটা ১২৬২ বঙ্গাব্দের পয়লা বৈশাখ আর পয়লা আষাঢ়। খ্রিস্টীয় অব্দের হিসাবে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের গোড়ায়। ওই সময় আরও কতকগুলি বাংলা প্রাইমার প্রচলিত ছিল। তার পরেও ওই শতকে বেশ কিছু বাংলা প্রাইমার প্রকাশিত হয়। কিন্তু বিদ্যাসাগরের বইয়ের মতো জনপ্রিয়তা আর কারও জোটেনি। এমনকি, উনিশ শতক গাড়িয়ে পরেকার গোটা বিশ শতক জুড়ে এবং আজও একুশ শতকের গোড়ায় বর্ণপরিচয়-এর দাপট অব্যাহত আছে। যদিও এখন রবীন্দ্রনাথের সহজ পাঠ আর যোগীন্দ্রনাথ সরকারের হাসিখুশির বাজারও বেশ ভালো।

১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে যখন ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা বর্ণপরিচয়-এর দুটি খণ্ড লেখেন তখন তাঁর বয়স পঁয়তেরিশ। তিনি তখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ। এর আগে ১৮৪৭এ বঙ্কু মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সহযোগিতায় স্থাপন করেছেন সংস্কৃত যন্ত্র নামে মুদ্রণালয়। এরই মধ্যে রচনা করেছেন বোধোদয়, ঋজুপাঠ-এর তিনটি ভাগ, ব্যাকরণ কৌমুদীর প্রথম তিনটি ভাগ, শকুন্তলা এবং আরও কয়েকখানি বই। এই বছরেই লিখবেন বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিব্যক প্রস্তাব সংক্রান্ত দুটি পুস্তক, পরের বছর কথামালা ও চরিতাবলী। একই সঙ্গে চলবে জেলায় জেলায় মডেল স্কুল স্থাপনের কাজ। বঙ্কুর্মা বিদ্যাসাগর আত্মনিয়োগ করবেন পুস্তক রচনায়, প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার সাধনে, ইস্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠায়, সমাজসংস্কারে ও নানা হিতৈষণামূলক কার্যধারায়।

উনিশ শতকের একেবারে শুরুতেই বাংলায় বই ছাপার কাজ হাতে নিয়েছিলেন মিশনারিরা। বাংলা গদ্যের সেটা উন্মেষপর্ব। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্য পাঠ্যবই লেখানো হতে থাকে। প্রকাশিত হতে আরম্ভ হয় বাংলা সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্র। রামমোহন রায় কলকাতায় বসবাস করতে শুরু করেন ১৮১৫ সাল থেকে। কলকাতায় স্কুল সোসাইটি আর স্কুল বুক সোসাইটি গঠিত হয়। স্থাপিত হয় হিন্দু স্কুল, তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা প্রভৃতি। প্যারীচাঁদ মিত্র টেকচাঁদ ঠাকুর ছদ্মনামে লিখলেন আলালের ঘরের দুলাল। সেটি বর্ণপরিচয় প্রকাশের আগের বছর মাসিকপত্রিকা নামের পত্রে ধারাবাহিকভাবে ছেপে বেরোতে থাকে। এর বছর তিন-চার পরেই লিখতে আরম্ভ করবেন মাইকেল মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ দিকপালেরা। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে রবীন্দ্রনাথ ভূমিষ্ঠ হবেন ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বর্ণপরিচয় লিখলেন তখন যেসব বাংলা প্রাইমার প্রচলিত ছিল তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য দুখানির নাম হল শিশুবোধক আর শিশুশিক্ষা। বিস্মনাথ

তর্কবাগীশের *শিশুবোধক*-এর প্রথম প্রকাশ ১৮৩০এ। এর পর বইটি নানা জনের সম্পাদনায় বিভিন্ন প্রেস থেকে ছেপে বার হতে থাকে। উনিশ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত *শিশুবোধক* সুপ্রচলিত ছিল। বিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বইটি পাওয়া যেত। মদনমোহন তর্কালঙ্কারের *শিশুশিক্ষা*-র প্রথম ভাগ ১৮৪৯এ আর দ্বিতীয় ভাগ ১৮৫০এ প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রাইমারটি সম্বন্ধে একটু বিস্তৃতভাবে বলার দরকার হবে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আর যে একখানি বাংলা প্রাইমার খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল—বিশেষত পূর্ববঙ্গে—তার নাম *বাল্যশিক্ষা*। রামসুন্দর বসাক প্রণীত এই প্রাইমারের প্রথম প্রকাশকাল ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দ। *শিশুশিক্ষা* এখন দুস্তাপ্য, কিন্তু এখনও কলকাতায় ছাপা *বাল্যশিক্ষা* পাওয়া যায়।

বলে রাখা ভালো, প্রথম মুদ্রিত বাংলা প্রাইমারটি সম্ভবত প্রকাশিত হয়েছিল ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে। *লিপিদারা* নামে এই বইখানি মিশনারিরা শ্রীরামপুর থেকে ছেপে বার করেন। স্কুল বুক সোসাইটি থেকে ১৮১৮ সালে বেরোয় জেমস স্টুয়ার্টের *বর্ণমালা*। ১৮৩৫এ প্রকাশিত হয় ঈশ্বরচন্দ্র বসুর *শব্দসার* নামে বাংলা প্রাইমার। এরপর হিন্দু কলেজ পাঠশালার জন্য *শিশুসেবধি* আর তত্ত্ববোধিনী সভার পাঠশালার জন্য অন্যতর এক *বর্ণমালা* প্রকাশিত হয়েছিল।

বিদ্যাসাগর মশায়ের স্বরচিত আত্মচরিত থেকে জানতে পারা যায় তাঁর পাঁচ বছর বয়সের সময় (অর্থাৎ ১৮২৫এ) বীরসিংহ গ্রামের কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পাঠশালায় ভরতি হয়েছিলেন। ওই কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়কে তিনি ‘গুরুমহাশয় দলের আদর্শস্বরূপ’ বলে উল্লেখ করেছেন। গ্রামের পাঠশালায় ঈশ্বরচন্দ্র এক বছর পড়েছিলেন। পরে অসুস্থ হয়ে পড়েন। বছর দুই বাদে বাবার সঙ্গে কলকাতায় চলে আসার পর ঈশ্বরচন্দ্র বড়োবাজারে শিবচরণ মন্ট্রিকের বাড়িতে স্বরূপচন্দ্র দাসের পাঠশালায় কিছুদিন পড়েছিলেন। কলকাতার এই শিক্ষক গ্রামের গুরুমহাশয়ের চাইতে ‘শিক্ষাদান বিষয়ে, বোধ হয়, অধিকতর নিপুণ ছিলেন’। ঈশ্বরচন্দ্র যখন লেখাপড়া শুরু করেন তখন ছাপানো বাংলা প্রাইমার চালু হয়ে গেছে। ভবিষ্যতের *বর্ণপরিচয়*-এর প্রণেতা নিজে বীরসিংহে কিংবা কলকাতার পাঠশালায় কী কী বই পড়ে অ আ ক খ শিখেছিলেন সেটা জানতে পারলে বেশ হত। কিন্তু সে-সম্বন্ধে কোনো তথ্য আজও পর্যন্ত সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

মদনমোহনের *শিশুশিক্ষা* রচনার একটু ইতিহাস আছে। জন ড্রিকওয়ার্ডার বেথুনের উদ্যোগে ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় মেয়েদের একটি ইস্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। এই স্কুলে পড়ানো শুরু হয় যে গুটিকতক ছাত্রী নিয়ে তাদের দুজন এই তর্কালঙ্কার মশায়ের শিশুকন্যা। বিশেষ করে ওই স্কুলের কথা ভেবেই মদনমোহনকে ‘এতদেশীয় বালিকা বিদ্যালয়ের ব্যবহারার্থ’ বাংলা প্রাইমার লেখায় হাত দিতে হয়। বিদ্যাসাগর ১৮৫০এ এই স্কুলের সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। বন্ধু তর্কালঙ্কারের প্রাইমার লেখার পশ্চাতে বিদ্যাসাগর মশায়ের কোনো অনুপ্রেরণা কাজ করেছিল কি না তা অনুমানের বিষয়। তবে এর পাণ্ডুলিপি যে বিদ্যাসাগরের অনুমোদিত ছিল তা ধরে নেওয়া হয়তো অনুচিত হবে না। দুই সুহৃদের সম্মিলিত উদ্যোগে স্থাপিত ছাপাখানা থেকেই *শিশুশিক্ষা*র খণ্ডগুলি বেরিয়েছিল। আমরা স্মরণ করতে পারি, বিদ্যাসাগরের আর এক সুহৃদ প্যারীচরণ সরকারের লেখা ইংরেজি প্রাইমার *ফার্স্ট বুক অব রিডিং*-এর প্রথম প্রকাশকাল ওই ১৮৫০ যখন *শিশুশিক্ষা*র দ্বিতীয় ও তৃতীয় এ-দুটি ভাগ ছাপা হয়। আরও একটি উল্লেখনীয় বিষয় হল *শিশুশিক্ষা*র চতুর্থ ভাগটির রচয়িতা স্বয়ং বিদ্যাসাগর।

সেই বইটির উপনাম *বোধোদয়*। কয়েক বছর পরে বিদ্যাসাগরকে যখন নতুন বাংলা প্রাইমার লিখতে হবে তখন তার দ্বিতীয় ভাগ-এ তিনি বহু তর্কালঙ্কারের *শিশুশিক্ষা* থেকে কিছু পাঠাংশ অন্তর্ভুক্ত করবেন।

মদনমোহনের *শিশুশিক্ষা* নানা দিক থেকে বাংলা প্রাইমারে অভিনবত্ব নিয়ে এসেছিল। এই প্রথম অসংযুক্ত বর্ণ আর তাদের বানান শেখাবার জন্য আলাদা একটি পুস্তিকা, আবার সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের জন্য আর একটি পুস্তিকা রচিত হল। তাছাড়া এই প্রথম বাংলা বর্ণমালা সাজানো হল গোড়ায় স্বরবর্ণ তারপরে ব্যঞ্জনবর্ণ দিয়ে। এতদিন অবধি বাঙালি শিশুর পাঠ শুরু হত ব্যঞ্জনবর্ণ দিয়েই। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যগুলিতে যেখানে শিক্ষারস্ত্রের কোনো বিবরণ আছে সেখানেও দেখা যায় গুরুমশায় তাঁর পড়য়াকে ব্যঞ্জনবর্ণ শিখিয়েই লেখাপড়া আরম্ভ করাচ্ছেন। এমনকি ১৮২৫এ প্রকাশিত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *নববাবুবিলাস* গ্রন্থেও ‘অথ গুরুমহাশয়ের নিকট বাবুদিগের বিদ্যাভ্যাসরীতি’ অধ্যায়ে শিক্ষার্থীদের ‘চতুস্ত্রিংশদক্ষর’ অর্থাৎ চৌত্রিশ অক্ষর বা ব্যঞ্জনবর্ণ দিয়ে শিক্ষা শুরুর কথা বর্ণিত হয়েছে। মদনমোহনের *শিশুশিক্ষা*-র আগে থেকেই প্রচলিত *শিশুবোধক* পুস্তকেও বর্ণমালার পাঠ ব্যঞ্জনবর্ণ দিয়ে আরম্ভ করা হয়েছে। তাছাড়া ওই *শিশুবোধক* আর পরবর্তীকালের জনপ্রিয় প্রাইমার *বাল্যশিক্ষা*-তেও একই বইয়ে পরপর অযুক্ত আর সংযুক্তবর্ণের পাঠ সম্মিলিত হয়েছে।

তর্কালঙ্কার মহাশয়ের *শিশুশিক্ষা*-র প্রথমভাগের একেবারে গোড়ায় সরল বর্ণযোজনার উদাহরণের পর আ-কার ই-কার ইত্যাদি যোগে শব্দগঠনের জন্য এক একটি পাঠ দেওয়া হয়েছে। এই পাঠগুলি পদ্যছন্দে গাঁথা। যেমন, ‘পাত পাড়/ভাত বাড়’, ‘মণি হারা/ফণি পারা’, ‘নুন খাই/গুণ গাই’ ইত্যাদি। এরপর দুই থেকে পাঁচ শব্দ সহযোগে ছোটো ছোটো বাক্যের কতকগুলি পাঠ আছে। তারপরে কয়েকটি পাঠ আকারে ঈষৎ বড়ো। সেগুলি দু-তিন অনুচ্ছেদে ভাগ করা। বই শেষ হয়েছে একটি পদ্যপাঠ দিয়ে যার প্রথম দুটি পঙ্ক্তিরূপে হল ‘পানী সব করে রব রাতি পোহাইল/কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল।’ বারো ছত্রের এই ‘প্রভাত বর্ণন’ পদ্যটি পরে আরও নানা বাংলা প্রাইমারে স্বীকৃতি বিনাই গৃহীত হতে দেখা যায়।

শিশুশিক্ষা-র দ্বিতীয় ভাগের পাঠ্যবিষয় হল সংযুক্তবর্ণের পরিচয়। এখানেও ফলা-যোগ শেখাতে বাক্যের আশ্রয়ই নেওয়া হয়েছে। তবে তাতে আছে ছন্দের দোলা। যেমন— ‘পাঠ্য পুথি হাতে কর/জ্ঞাদ্যদোষ পরিহর’, ‘বিদ্যাধন আছে যার/সকলি সুসাহ্য তার’। দুই ও তিন ব্যঞ্জনের যুক্তাক্ষর শেখানোর পর আছে একটি গদ্যপাঠ যার শিরোনাম ‘মাধবের সন্ধ্যাবহার’। তারপর আছে সপ্তবার, দ্বাদশ মাস ও-ছয় ঋতুর নাম। এরপর ক্রমান্বয়ে ছ-টি ঋতুর সংক্ষিপ্ত বর্ণনার গদ্যপাঠ দিয়ে এই খণ্ডটি সম্পূর্ণ হয়েছে।

বাল্যশিক্ষা নামে প্রাইমারটির কথাও এখানে একটু বলে নেওয়া যাক। *শিশুশিক্ষা* ও *বর্ণপরিচয়* প্রকাশের পরে এটির আবির্ভাব। *বাল্যশিক্ষা*-র বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে ‘পূর্বে বাংলার স্কুল-ইনস্পেক্টর ও ঢাকা শিক্ষাকমিটির অনুমত্যানুসারে’ পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয়েছে। এখন কলকাতায় ছাপা যে *বাল্যশিক্ষা* পুস্তিকা পাওয়া যায় তাতে অক্ষর পরিচয় করানো হয়েছে প্রথমে স্বরবর্ণ ও পরে ব্যঞ্জনবর্ণ দিয়ে। তারপর আ-কার ই-কার এসব বর্ণযোজনা শেখানোর কতকগুলি পাঠ দেওয়া হয়েছে। এরপর আছে চারটি সংক্ষিপ্ত গদ্যপাঠ। তারপরেই শুরু হয়েছে সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের বানান শেখানো। প্রতিটি ফলা-যোগের দৃষ্টান্তশব্দাবলির নীচে প্রয়োগবাক্যসহ

গদ্যপাঠও দেওয়া হয়েছে। দুটি বা তিনটি ব্যঞ্জনের যোগে গঠিত যুক্তাক্ষরে যেসব আকারভেদ হয় সেগুলির জন্য দুটি আলাদা পাঠ আছে। এরপর পদ্যাকারে ন-টি চরণে রামায়ণ এবং সাতটি চরণে মহাভারতের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। তা ছাড়া আছে পশু, শস্য, বৃক্ষ, ফল; পক্ষী, বস্তু, মৎস্য, বাদ্যযন্ত্র, ফল এসবের নাম সম্বন্ধে দু-চার পঙ্ক্তির পদ্য। আরও আছে বাংলা, মুসলমানি ও ইংরেজি সাতবার ও বারো মাসের নাম। দশ দিক, ছয় স্বত্ব, তিথি ও পক্ষ ইত্যাদিও আছে। এরপর ‘বড় কে?’ (আপনাকে বড় বলে বড় সেই নয়) আর ‘সময়’ নামে পদ্যের পর আছে সেই ‘প্রভাত বর্ণনা’ পদ্যটি। এরপর তিনটি গদ্যপাঠ (কাক ও জলের কলসী, মা ও ছেলে, পড়ার সময় গোল করিও না)। বই শেষ হয়েছে ‘মহারানী ভিক্টোরিয়া’ শিরোনামে একটি সচিত্র পাঠ দিয়ে। মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা চল্লিশ।

বন্ধু মদনমোহনের জনপ্রিয় শিশুশিক্ষার দুখানি খণ্ড ১৮৪৯-৫০এ প্রকাশের পাঁচ বছরের মাথায় বিদ্যাসাগর মশায়কে লিখতে হল *বর্ণপরিচয়*-এর দুটি ভাগ। *ফার্স্ট বুক*-এর রচয়িতা প্যারীচরণ সরকার এ-ব্যাপারে বিদ্যাসাগরকে উৎসাহ জুগিয়েছেন বলে জানা যায়। ১৮৫৫এর এপ্রিলের মাঝামাঝি প্রথম ভাগ বেরোবার অব্যবহিত পরেই মে মাসের গোড়ায় ঈশ্বরচন্দ্র নিযুক্ত হলেন দক্ষিণবঙ্গের স্কুল ইন্সপেক্টরের পদে। এটি সংস্কৃত বলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্বের অতিরিক্ত। এজন্য বাড়তি বেতনও বরাদ্দ হল। কথিত আছে বিদ্যালয় পরিদর্শনে যাবার পথে পালকিতে বসেই বিদ্যাসাগর দ্বিতীয় ভাগের পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছিলেন।

প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো, বিদ্যাসাগরের নামে কম দামের বা বেশি দামের যেসব প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ এখন বাজারে মেলে সেগুলি সবই সম্পাদিত সংস্করণ। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর কয়েক বছর পরেই এই কাজটি প্রথম হয়েছিল তাঁরই পুত্র নারায়ণচন্দ্রের হাত দিয়ে। *বর্ণপরিচয়* দুটি খণ্ডেরই রিসিভারের সংস্করণে বলা আছে বিদ্যাসাগরপুত্র ১৩০৩ বঙ্গাব্দে ‘তদীয় পূজ্যপাদ পিতৃদেব পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রণীত’ বাংলা প্রাইমারের ‘যেখানে যেরূপ পরিবর্তন, পরিবর্জন ও পরিবর্ধন আবশ্যিক মনে করিয়াছেন’ সেইমতো ‘আদ্যোপান্ত সংশোধন’ সম্পন্ন করেন। উত্তরাধিকারী হওয়ার সুবাদে ওই নারায়ণচন্দ্র তাঁর পিতা বিদ্যাসাগরের পুস্তিকায় যথোচ্ছ্রভাবে দৃষ্টান্তশব্দ বর্জন ও সংযোজন করেছেন, গদ্যপাঠের অনুচ্ছেদ অদলবদল করেছেন, বাক্যের গঠন পালটেছেন, এমনকি বিদ্যাসাগরের অভিপ্রেত নয় এমন বানানও ঢুকিয়েছেন। বিদ্যাসাগর স্বয়ং প্রায় প্রতিটি সংস্করণে নিজের বইয়ের সংস্কার সাধন করতেন। তাঁর জীবদ্দশায় প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ-এর সর্বশেষ সম্পাদনা করেন ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে। ওই বছর প্রথম ভাগ-এর ষাটতম আর দ্বিতীয় ভাগ-এর বাষট্টিতম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ওই সংস্করণ দুটিকেই প্রামাণ্য বলে ধরা হয়ে থাকে। আজকাল বাজারে নন্দন সংস্করণ বা নির্মল সংস্করণ সহ নবরূপের যে-সমস্ত বই পাওয়া যায় তাতেও মূল্যের উপর হস্তক্ষেপ করা হয়েছে, কোথাও স্থূলভাবে কোথাও বা সূক্ষ্মভাবে। প্রকাশকদের সাফাই হল—তাঁরা বিদ্যাসাগরকে একালের মতো করে পরিবেশন করতে চান। কিন্তু অমনভাবে সম্পাদনা করলে তা তো আর বিদ্যাসাগরের বই রইল না।

বিদ্যাসাগরের *বর্ণপরিচয়*-এ নারায়ণচন্দ্রের হস্তক্ষেপ ঘটে ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ। পরে বইটি চলে যায় রিসিভারের হাতে এবং শেষ পর্যন্ত নিলাম থেকে ১৯১৯এ স্বত্ব কেনেন এ. টি. দেব। স্বত্বমুক্তির পর এখন যে-কেউ ও বই ছাপতে পারেন। এইসব ঘটনার অন্তরালে

লুকিয়ে আছে ‘করণার সিদ্ধি’-র প্রয়াণের পর তাঁকে নিয়ে এক সঙ্কল্প কাহিনি। সেটি সংক্ষেপে এই রকম :

বিদ্যাসাগর তাঁর উইল বা ইচ্ছাপত্রে নিজের পুত্রটির জন্য কোনো ব্যবস্থা রেখে যাননি। ‘যারপরনাই যথেষ্টচারী ও কুপথগামী’ নারায়ণচন্দ্রকে ত্যাগ্যপুত্র ঘোষণা করেছিলেন। পিতার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে নারায়ণচন্দ্র কিন্তু আদালতের শরণাপন্ন হয়ে হিন্দু উত্তরাধিকার আইন মোতাবেক নিজেকে বিদ্যাসাগরের খাস ওয়ারিশান হিসেবে অধিকার আদায় করে নিলেন। সেটা ১৮৯২ সাল। উত্তরাধিকারের পরোয়ানা পেয়েই নারায়ণচন্দ্র দুটি কাজ করলেন—এক. বিদ্যাসাগরের উইলে যে সব বৃত্তি বা মাসোহারার ব্যবস্থা ছিল তার দায় অস্বীকার, দুই. বর্ণপরিচয়-এর দুটি খণ্ডে বাপের লেখার উপর কলম চালানো। এদিকে ১৯০৪ সালে বিদ্যাসাগরের উইলের বৃত্তিভোগীদের পক্ষ থেকে তাদের ষাণ্ডনা শোধ করে দেওয়ার আবেদন জানিয়ে মামলা দায়ের করা হল। তখন আদালত নির্দেশ দিলেন এই প্রাপ্য অর্থ মেটাবার জন্য বিদ্যাসাগরের সম্পত্তি বন্ধক দেওয়া হোক। সেইমতো ১৯১১ সালে রিসিভার নিযুক্ত হলেন। রিসিভার অর্থ সংগ্রহের জন্য বন্ধক রাখলেন এইসব সুপ্রচলিত পাঠ্যপুস্তক—বর্ণপরিচয় দুটি ভাগ, আখ্যানমঞ্জরী, কথামালা, বোধোদয়, চরিতাবলী আর উপক্রমণিকা। নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে রিসিভার সেই বন্ধক ছাড়াতে অপারগ হলে রিসিভারের নামে সমন জারি হল। তিনি আদালতে হাজিরা দিলেন না। এরপর চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য ধার্য দিনে রিসিভার কিংবা নারায়ণচন্দ্র কেউই আদালতে হাজির হওয়ার গরজ বোধ করলেন না। তখন বইগুলির স্বত্ব বিক্রির জন্য নিলাম ডাকা হল। সেখানে সর্বোচ্চ ডাক দিয়ে বইগুলির স্বত্ব হস্তগত করলেন আশুতোষ দেব।

থাক সে-কথা। এবার আমরা মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসি।

বিদ্যাসাগর তাঁর প্রথম ভাগ লিখতে গিয়ে প্রথমেই যে কাজটি করলেন তা হল বাংলা বর্ণমালার সংস্কার। এটি একটি বিরাট সাহসী পদক্ষেপ। এর আগে পর্যন্ত বাংলা বর্ণমালা বিন্যস্ত ছিল ষোলো স্বর আর চৌত্রিশ ব্যঞ্জনে। শিশুবোধক কিংবা শিশুশিক্ষায় বর্ণমালা সাজানো হয়েছিল এভাবে—

অ	আ	ই	ঈ	
উ	ঊ	ঋ	ঌ	
৯	৯	এ	ঐ	
ও	ঔ	অং	অঃ	
ক	খ	গ	ঘ	ঙ
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
ত	থ	দ	ধ	ন
প	ফ	ব	ভ	ম
য	র	ল	ব	
শ	ষ	স	হ	ক্ষ

বিদ্যাসাগর স্বরবর্ণমালা থেকে দীর্ঘ ঋ আর দীর্ঘ ৯ তুলে দিলেন। অনুস্বার আর বিসর্গকে নিয়ে গেলেন ব্যঞ্জন বর্ণমালার শেষ দিকে। ক্ আর ষ এই দুটি ব্যঞ্জন মিলে তৈরি হয়েছে ক্ষ এই যুক্তবর্ণটি, তাই ওই অক্ষরটি বর্ণমালা থেকে বর্জন করলেন। আবার ড় ঢ় য় ঞ এই পাঁচটি বর্ণ প্রচলিত বাংলা লিপির অন্তর্গত হওয়া সত্ত্বেও বর্ণমালার মধ্যে সেগুলিকে গণ্য করা হত না, বিদ্যাসাগর এগুলিকেও বর্ণমালায় গ্রহণ করলেন। প্রথম ভাগ-এর বিজ্ঞাপনে লেখা হল—

কর্ণ পরিচয়ের প্রথম ভাগ প্রচারিত হইল। বহুকাল অবধি কর্ণমালা বোল স্বর ও চৌদ্দিশ ব্যঞ্জন, এই পঞ্চাশ অক্ষরে পরিগণিত ছিল। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায়, দীর্ঘ ঋ-কার ও দীর্ঘ ৯-কারের প্রয়োগ নাই; এই নিমিত্ত, ঐ দুটি কর্ণ পরিত্যক্ত হইয়াছে। আর, সবিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে, অনুস্বার ও বিসর্গ স্বরবর্ণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না; এজন্য ঐ দুই কর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে পঠিত হইয়াছে। আর চন্দ্রবিন্দুকে ব্যঞ্জনবর্ণস্থলে, এক স্বতন্ত্র বর্ণ বলিয়া গণনা করা গিয়াছে। ড, ঢ, ষ এই তিন ব্যঞ্জন, পদের মধ্যে অথবা পদের অন্তে থাকিলে, ড়, ঢ়, ষ্ হয়; ইহারা অভিন্ন কর্ণ বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু যখন আকার ও উচ্চারণ উভয়ের পরস্পরের ভেদ আছে, তখন উহারা স্বতন্ত্র বর্ণ বলিয়া উল্লিখিত হওয়া উচিত; এই নিমিত্ত, উহারাও স্বতন্ত্র ব্যঞ্জনবর্ণ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। ক ও ষ মিলিয়া ক্ষ হয়, সূত্রায় উহা সংযুক্তবর্ণ; এজন্য অসংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের গণনাস্থলে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

এই বিজ্ঞাপনে খণ্ড-ত নিয়ে কিছু বলা হয়নি। প্রথম ভাগের ষষ্টিতম সংস্করণের বিজ্ঞাপনের শেষ অনুচ্ছেদে বলা হল—

বাঙ্গালা ভাষায় তৎকালের ত, ঞ, এই দ্বিবিধ কলেবর প্রচলিত আছে; দ্বিতীয় কলেবরের নাম ঋণ্ড তৎকর। ঈষৎ, জগৎ, প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দ লিখিবার সময়, ঋণ্ড তৎকার ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঋণ্ড তৎকরের স্বরূপ পরিজ্ঞানের নিমিত্ত, কর্ণপরিচয়ের পরীক্ষার শেষভাগে তৎকরের দুই কলেবর প্রদর্শিত হইল।

অথচ প্রথম ভাগের ওই বাটতম সংস্করণে ব্যঞ্জনবর্ণমালার মধ্যেই ঋণ্ড ত বর্ণটি ঠাই পেয়েছে এবং বানান শেখানোর বিভিন্ন পাঠেও ‘অসৎ ঈষৎ জগৎ বৃহৎ সুহৎ’ এসব শব্দ মেলে।

যাই হোক, বিদ্যাসাগরের এই সংস্কারের ফলে বাংলা বর্ণমালার বিন্যাসটা দাঁড়াল এরকম—

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৯ এ ঐ ও ঔ

ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম য র ল ব
শ ষ স হ ড় ঢ় য় ঞ ঃ ৎ ৭।

এইভাবে বিদ্যাসাগরের হাতে বাংলা বর্ণমালা শৃঙ্খলাবদ্ধ হল এবং তার বর্ণ সংখ্যা হল ১২ স্বর আর ৪০ ব্যঞ্জন নিয়ে ৫২। তারপর থেকে এতদিন ধরে বাংলা বর্ণমালার এই বিন্যাসটিই প্রচলিত হয়ে এসেছে। তবে সম্প্রতি স্বরবর্ণের তালিকা থেকে অনাবশ্যিক বর্ণ ৯ (লি) আর ব্যঞ্জনবর্ণের তালিকা থেকে একটি ব (বর্গীয়-ব আর অন্তঃস্থ-ব বর্ণদুটির আকারে কোনো তফাত বাংলায় করা হয় না) বাদ দেওয়ায় বাংলা বর্ণমালার আর একটু সংস্কার হয়ে তা পঞ্চাশে নেমে এসেছে। আধুনিক বাংলা অভিধানেও এখন আর আলাদা করে বর্গীয় ব ও অন্তঃস্থ ব-যুক্ত শব্দ তালিকাভুক্ত করা হয় না, বর্গীয় ব-এর সঙ্গেই অন্তঃস্থ ব-কে মিশিয়ে দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে—বিদ্যাসাগরের করা বর্ণমালার এই নতুন বিন্যাস তখনকার বিদ্বৎসমাজ ভালোভাবে নেয়নি। বিরোধিতায় নেমেছিলেন অনেকে। বাঙ্কব পত্রিকার সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষ এরকম একজন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র অভিযোগ আনলেন যে বিদ্যাসাগর পাণিনিকে লঙ্ঘন

করেছেন। তবে রেভারেন্ড লালবিহারী দে-র মতো কেউ কেউ তাঁর পক্ষে ছিলেন। বিদ্যাসাগর অবশ্য অবিচল ছিলেন। বাংলা ভাষার নিজস্ব চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলতে এই সংস্কারে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ছিল।

বিদ্যাসাগর মশায় প্রথম ভাগ-এর গোড়ায় আ-কার ই-কার ইত্যাদি বর্জিত সরল বর্ণযোজনার পাঠের পর বিভিন্ন কার-যোগে বানানের নমুনা দিয়েছেন। স্বতন্ত্র একটি পাঠে গ, র, শ ও হ বর্ণে উ-কার উ-কার ও ঋ-কার যোগ করলে চেহাঁরার যে-বদল ঘটে যায় তা দেখিয়ে দিয়েছেন। কার-যোগে বর্ণের এই রূপ পরিবর্তন দেখিয়ে দেওয়া ছাড়া শব্দের উচ্চারণে প্রভেদ ঘটান বিষয়টির প্রতিও বিদ্যাসাগর নজর টানতে চেয়েছেন। উচ্চারণ সংক্রান্ত দুটি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রথম ভাগের ষাটতম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে। সেখানে বলা হয়েছে—

১. প্রায় সর্বত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে, বালকেরা অ, আ এই দুই বর্ণস্থলে স্বরের অ, স্বরের আ, বলিয়া থাকে। যাহাতে তাহারা সেরূপ না বলিয়া, কেবল অ, আ এইরূপ বলে, তদ্রূপ উপদেশ দেওয়া আবশ্যিক। আমরা মনে করতে পারি, রবীন্দ্রনাথের ‘পোস্টমাস্টার’ গল্পে বালিকা রতনের অক্ষর পরিচয় হয়েছিল স্বরে অ স্বরে আ বলে। ‘পোস্টমাস্টার’ বেরিয়েছিল হিতবাদী পত্রে ১২৯৮ বঙ্গাব্দে। তার মানে, বিদ্যাসাগর তাঁর সতর্কবাণী উচ্চারণ করার পনেরো বছর পরেও আগেকার ভ্রান্তরীতি প্রচলিত ছিল। আজও কি নেই?

২. যে সকল শব্দের অস্ত্র বর্ণে আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ এই সকল স্বরবর্ণের যোগ নাই, উহাদের অধিকাংশ হলন্ত, কতকগুলি অকারান্ত, উচ্চারিত হইয়া থাকে। যথা, হলন্ত—কর, বল, ঘট, জল, পথ, রস, বন ইত্যাদি; অকারান্ত—ছোট, বড়, ভাল, ঘৃত, তৃপ, মৃগ ইত্যাদি। কিন্তু অনেক স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়, এই বৈলক্ষণ্যের অনুসরণ না করিয়া, তদ্রূপ শব্দমাঝেই অকারান্ত উচ্চারিত হইয়া থাকে। বর্ণযোজনার উদাহরণস্থলে যে সকল শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে যেগুলি অকারান্ত উচ্চারিত হয়, উহাদের পার্শ্বদেশে * এইরূপ চিহ্ন বোঝিত হইল। যে সকল শব্দের পার্শ্বদেশে তদ্রূপ চিহ্ন নাই, উহারা হলন্ত উচ্চারিত হইবে।

স্বরান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত উচ্চারণ সম্বন্ধে এমন পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে বলা সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত দেখা যায় কী শিক্ষার্থী কী শিক্ষক অচল্ অধম্ না বলে অসতর্কভাবে অচলো অধমো উচ্চারণই করে থাকে।

প্রথম ভাগ-এ অসংযুক্ত বর্ণের বানান শেখানোর জন্য বিদ্যাসাগর মশায় দৃষ্টান্তবাক্য চয়ন করেছেন অতি সতর্কভাবে। সরল বর্ণযোজনা কিংবা কার-যোগে বানানের উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি শুধু দুই আর তিন অক্ষরের শব্দই বেছেছেন। আসলে বাংলায় এরকম দুই আর তিন অক্ষরের শব্দেরই প্রাধান্য। অবশ্য মিশ্র উদাহরণ দেওয়ার সময় বিদ্যাসাগর মশায় ওই দুই ও তিন অক্ষরের শব্দের সঙ্গে চার ও পাঁচ অক্ষরের শব্দও দিয়েছেন। সুনির্বাচিত ওইসব শব্দ বারবার অভ্যাস করার মধ্য দিয়েই বানান রপ্ত করিয়ে নেওয়ার প্রণালীকে তিনি গ্রহণীয় মনে করেছিলেন। উদ্দেশ্য, তাঁর বন্ধু প্যারীচরণের ইংরেজি প্রাইমারেও এই একই পদ্ধতি গৃহীত হয়েছে। সত্যি বলতে কী—এই ডিলিং প্রথাই বানান শেখার পক্ষে সব থেকে ফলপ্রসূ।

প্রথম ভাগ-এ সুপরিকল্পিতভাবে অসংযুক্ত ব্যঞ্জনের বর্ণযোজনা বা বানান শেখানোর পর বিদ্যাসাগর আটটি গদ্যপাঠ রচনা করেছেন দুটি করে মাত্র শব্দ দিয়ে। এগুলির মধ্যেও একটি পরিকল্পনার আভাস রয়ে গেছে। প্রথমে বিশেষণ-বিশেষ্য (বড় গাছ, ভাল জল), তারপর

বিশেষ্য-ক্রিয়া (পথ ছাড়, কথা কয়), প্রস্তাবোধক (কি পড়, কোথা যাও), অনুজ্ঞাবাচক (বাহিরে যাও, ভিতরে এস) সংক্ষিপ্ত বাক্য, তারপর ক্রিয়ার বিভিন্ন কালবোধক বাক্য (আমি যাইব, আমরা যাইতেছি, তিনি গিয়াছেন)। এরপর ক্রমে তিন থেকে পাঁচ বা ছয় শব্দের সমাহারে তৈরি সহজ বাক্য। এরপর পাঁচটি ছোটো ছোটো পাঠে কিছুটা কাহিনির ছোঁয়া আছে। এইসব গল্পমূলক পাঠের কেন্দ্রে আছে ঠিকভাবে পাঠাভ্যাসের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব। গোপাল আর রাখালকে নিয়ে শেষ দুটি পাঠ বেশ বিস্তৃত। একজন সুবোধ এবং সকলের ভালোবাসার পাত্র ও বালকদের অনুসরণীয়। অপরজন তার বিপরীত আর তাই কেউ তাকে ভালোবাসে না, কোনো বালকেরই তার মতো হওয়া উচিত নয় কারণ তা হলে ‘সে লেখাপড়া শিখিতে পারিবে না’। বইয়ের শেষের ওই উনিশ আর কুড়ি নম্বরের পাঠদুটিতে বেশ কিছু বড়ো বড়ো বাক্য আছে। তবে সেগুলি যাতে ঠিকমতো পড়তে পারা যায় সেজন্য যথেষ্ট বিরামচিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে।

একই সঙ্গে ভাষাবিজ্ঞান আর শিশুমনস্তত্ত্ব উভয়ক্ষেত্রে অধিকার ছিল বলেই বিদ্যাসাগরের পক্ষে এধরনের একটি শিশুপাঠ রচনা করা সম্ভব হয়েছিল। এইখানেই আর সব রচয়িতা ও প্রাইমারের সঙ্গে বিদ্যাসাগর আর তাঁর প্রথম ভাগ-এর তফাত বা অনন্যতা।

প্রথম ভাগ-এর মতোই দ্বিতীয় ভাগ-এও বিদ্যাসাগর মশায়ের সেই বিশিষ্টতা ও মননশীলতার নিদর্শন ফুটে উঠেছে পুস্তিকাটির সবখানে। হয়তো বা একটু বেশি করেই। এখানেও বানান শেখাতে ড্রিলিং পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। শব্দ বাছা হয়েছে সযত্নে। যুক্ত ব্যঞ্জননের বানান শেখানো শুরু হয়েছে য-ফলা দিয়ে। তারপর এক একটি পাঠে পরপর র-ফলা, ল-ফলা, ব-ফলা, গ-ফলা, ন-ফলা ও ম-ফলার পর রেফ যোগে গঠিত শব্দের উদাহরণ সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। এরপর এসেছে দুই, তিন ও চার বর্ণের মিশ্র সংযোগের উদাহরণ। একটি বা দুটি বর্ণসংযোগ শেখানোর পরপরই আছে একটি করে গদ্যপাঠ।

বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগ-এর গদ্যপাঠগুলি বেশ বড়ো এবং কতকগুলি অনুচ্ছেদে বিন্যস্ত। পাঠসমূহ প্রধানত কাহিনিমূলক হলেও নীতি-উপদেশও আছে। শেষের দিকের পাঠগুলিতে সুসন্তান হওয়ার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। ‘চুরি করা কদাচ উচিত নয়’ শিরোনামে ছুবনের মাসির কান কেটে নেওয়ার গল্প (এই গল্পের মূল ভিত্তি ইশপের একটি কাহিনি) দিয়ে বই শেষ হয়েছে।

বিদ্যাসাগর মশায় তাঁর দ্বিতীয় ভাগ-এর মুখবন্ধ বা বিজ্ঞাপনে খুব স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যে এই পুস্তিকার অন্তর্ভুক্ত দৃষ্টান্তশব্দগুলি শুধু বানান শেখাবার উদ্দেশ্যেই গৃহীত, ওগুলির শব্দার্থ শেখানো মোটেই অভিপ্রেত নয়। এ কথা বিশদ করে তিনি বলেছেন—

বালকদিগের সংযুক্তকর্ণপরিচয় এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। সংযুক্তবর্ণের উদাহরণস্থলে যে সকল শব্দ আছে শিক্ষক মহাশয়েরা বালকদিককে উহাদের কণ্ঠবিভাগ মাত্র শিখাইবেন, অর্থ শিখাইবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইবেন না। কণ্ঠ বিভাগের সঙ্গে অর্থ শিখাইতে গেলে, শুরু শিষ্য উভয় পক্ষেরই বিলম্ব কষ্ট হইবেক, এবং শিক্ষা বিষয়েও আনুষঙ্গিক অনেক দোষ ঘটিবেক।

ওই বিজ্ঞাপনেই বইয়ের মধ্যকার গদ্যপাঠগুলি সম্বন্ধে তাঁর নির্দেশ এইরকম—

ক্রমাগত শব্দের উচ্চারণ ও বর্ণবিভাগ শিক্ষা করিতে গেলে, অতিশয় নীরস বোধ হইবেক ও বিরক্তি জন্মিবেক, এজন্য মধ্যে মধ্যে এক একটি পাঠ দেওয়া গিয়াছে। অল্পবয়স্ক বালকদিগের সম্পূর্ণরূপে

বোধগম্য হয়, এরূপ বিষয় লইয়া ঐ সকল পাঠ অতি সরল ভাষায় সংকলিত হইয়াছে। শিক্ষক মহাশয়েরা উহাদের অর্থ ও তাৎপর্য স্ব স্ব ছাত্রদিককে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবেন।

অর্থাৎ, বানান শেখানোর জন্য সাজিয়ে দেওয়া শব্দগুলির অর্থ শেখাবার চেষ্টা করা উচিত হবে না, কিন্তু গদ্যপাঠের শব্দগুলির অর্থ ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। বিদ্যাসাগরের এই অনুজ্ঞা কি অক্ষরে অক্ষরে মানা হয়ে থাকে?

বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগ-এর গোড়ার দিককার কোনো সংস্করণে মদনমোহনের শিশুশিক্ষা থেকে কিছু পাঠাংশ নেওয়া হয়েছিল। পরে সেগুলি বর্জিত হয়। দ্বিতীয় ভাগের বাষট্টিতম সংস্করণে সংক্ষিপ্ত একটি বিজ্ঞাপন দিয়ে জানানো হয় : ‘এই সংস্করণে, কোনও কোনও অংশ পরিবর্তিত এবং চারিটি নূতন পাঠ সংকলিত ও সম্মিবেশিত হইয়াছে। পুস্তকের শেষ ভাগে শিশুশিক্ষা হইতে যে অংশ উদ্ধৃত হইয়াছিল, তাহা নিষ্কাশিত হইয়াছে।’ তর্কালঙ্কারের বই থেকে ঠিক কেন্‌ কেন্‌ অংশ বিদ্যাসাগর তাঁর বইয়ে ব্যবহার করেছিলেন তা বার করবার মতন উপকরণ আমাদের হাতে নেই। যাই হোক, শিশুশিক্ষার ওই পাঠাংশ উঠিয়ে দেওয়ার ফলে দ্বিতীয় ভাগের ওই বাষট্টিতম সংস্করণটি একান্তভাবে বিদ্যাসাগর মশায়ের নিজস্ব রচনা হয়ে উঠতে পারল।

বিদ্যাসাগরের প্রাইমারে আর একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এ বইয়ের আগেই প্রকাশিত মদনমোহনের শিশুশিক্ষায় পাই—‘ধর্মপথের পাছ হও’, ‘বেদ ছাড়ে খেদ বাড়ে’ কিংবা ‘ব্রহ্মোপাসনা করা সকলেরই উচিত’ জাতীয় বাক্যবদ্ধ। বর্ণপরিচয়-এর পরে প্রকাশিত বাল্যশিক্ষা পুস্তিকায় আছে ‘দিলে বিধি মিলে নিধি’ কিংবা ‘দৈববাণী বৈধ জানি’-র মতো বাক্য। কিন্তু বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয়ে কোথাও এ ধরনের কথার জায়গা হয়নি। ব্রাহ্মণপণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের মনটি ছিল সংস্কারমুক্ত। তিনি নবীন শিক্ষার্থীদের মগজে এমন সব ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়াটা নিষ্প্রয়োজন বোধ করেছিলেন।

বিদ্যাসাগরের জীবিতকালের মধ্যে ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দ অবধি যে-হিসাব পাওয়া যায় তাতে প্রথম ভাগ-এর সংস্করণ হয়েছিল ১৫২টি আর দ্বিতীয় ভাগ-এর ১৪০টি। গোড়ার দিকে এক এক সংস্করণে ৫/১০ হাজার কপি ছাপা হলেও ক্রমান্বয়ে তা ২০/৩০/৪০ হাজারে পৌঁছোয়। ১৮৯০-এর সংস্করণে প্রথম ভাগ-এর প্রিন্ট রান ছিল ৫০০০০ কপি, আর দ্বিতীয় ভাগ-এর ৩০০০০ কপি। এই হিসাব থেকেই বর্ণপরিচয়ের জনপ্রিয়তা মাপা যেতে পারে। পরিকল্পনা আর বিন্যাসের উৎকর্ষের ফলেই বিদ্যাসাগর প্রণীত প্রাইমারের চাহিদা স্বাভাবিক কারণেই ওই ধরনের আর সব বইকে ছাপিয়ে গিয়েছিল। এমনকি মিশনারিরাও তাঁদের পরিচালিত স্কুলে অ-খ্রিস্টানের লেখা এই বইকে পাঠ্য করেছিলেন।

বাজালি শিশুর পরম সৌভাগ্য যে তাদের মাতৃভাষা শিক্ষার প্রারম্ভিক বইখানি লিখতে কলম ধরেছিলেন বিদ্যাসাগরের মতো একটি মানুষ যিনি একাধারে মহান শিক্ষাব্রতী ও অনন্য গদ্যশিল্পী। তাঁর বইয়ে পদ্য নেই, কিন্তু আছে অন্তর্লীন ছন্দের স্পন্দন। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতি-তে লিখেছেন—

তখন ‘কর খল’ প্রভৃতি বানানের তুফান কাটাইয়া সবেমাত্র কুল পাইয়াছি। সেদিন পড়িতেছি ‘জল পড়ে পাতা নড়ে’। আমার জীবনে এইটেই আদিকবির প্রথম কবিতা।

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য বর্ণপরিচয় কিংবা অন্য কোনো বইয়ের নাম উল্লেখ করেননি। বিদ্যাসাগরের

প্রথম ভাগে ওই ‘জল পড়ে পাতা নড়ে’ পাঠ পাওয়া যায় না। তবে বানান শেখানোর পর তিন নম্বর পাঠে এরকম দুটি লাইন আছে—জল পড়ে/মেঘ ডাকে। আর আট নম্বর পাঠে রয়েছে—জল পড়িতেছে/পাতা নড়িতেছে। হয়তো ওই গদ্যাংশটুকুই শিশুকবিকে আপন মনে নিজের মতো করে পদ্যে রূপান্তরিত করে নিতে সহায়তা করেছিল। ‘রবীন্দ্রকবী’-র লেখক প্রশান্তকুমার পাল পারিপার্শ্বিক নানা তথ্য যাচাই করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে রবীন্দ্রনাথের অক্ষর পরিচয় হয়েছিল মদনমোহনের শিশুশিক্ষা অবলম্বনে, তাঁর বানান শেখার বই ছিল বিদ্যাসাগরের *বর্ণপরিচয়* এবং তারপর তাঁকে পড়ানো হয় *শিশুবোধক*। রবীন্দ্রনাথ তাঁর *সহজ পাঠ* প্রথম ভাগে বর্ণমালার শেষ ছড়ায় যুক্তব্যঞ্জন ক্ষ-কে অসংযুক্তবর্ণের মধ্যে ঠাই দিয়েছেন (‘শাল মুড়ি দিয়ে হ ক্ষ/কোণে বসে কাশে খ ক্ষ’)—এটা তাঁর অতিশৈশবে *শিশুশিক্ষা* থেকে বর্ণমালা শেখার দূরস্মৃতি দ্বারা প্রভাবিত বলেই অনুমান করা হয়ে থাকে। বিদ্যাসাগরের *বর্ণপরিচয়*ই প্রথম বাংলা বর্ণমালা থেকে যুক্তব্যঞ্জন ক্ষ-কে উচ্ছেদ করা হয়।

বিদ্যাসাগরের *বর্ণপরিচয়* প্রথম প্রকাশের পর আজ দেড়শো বছর ধরে প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ বাঙালি শিশুর বিদ্যারস্ত্রের প্রথম সোপান হিসেবে আদৃত হয়ে আসছে। তবে এই দীর্ঘ সময়ের অবকাশে বাঙালির জীবনে প্রভূত ওলটপালট ঘটে গেছে। বাংলা ভাষার ব্যবহারেও ঘটেছে প্রচুর অদলবদল। সেদিনকার সমাজ আর মূল্যবোধের সঙ্গে আজকের সমাজ আর মূল্যবোধের ফারাক অনেকখানি। তাই স্বীকার করতে হবে—বিদ্যাসাগরের প্রাইমার নানা দিক দিয়ে তার উপযোগিতা থেকে কিছুটা বিচ্যুত হয়েছে। তাঁর গৃহীত বেশ কিছু দৃষ্টান্তশব্দ এখনকার শিশুশিক্ষার্থীর কাছে অপরিচিত ও অপ্রয়োজনীয়। গদ্যপাঠগুলিতে উপদেশের বাঙ্ল্য আর কাহিনি-পরিবেশের সুদূরতার দরুন পড়ুয়াদের তেমন টানতে পারে না। সেই সঙ্গে আবার বাংলা বানানের ব্যাপক সংস্কার সাধিত হওয়ায় *বর্ণপরিচয়*-এ শেখা অনেক শব্দের বানানের সঙ্গে *সহজ পাঠ* যা অন্যান্য বইয়ের বানানে তফাত ঘটে গেছে আর তার ফলস্বরূপ মস্ত একটা বিভ্রান্তির জায়গা তৈরি হয়েছে। তদুপরি শিক্ষাদান প্রণালীতেও এসেছে নতুন নতুন ভাবনা। সেই ভাবনার সঙ্গে তাঁর পদ্ধতি ও পরিকল্পনা এখন আর সবটা ঠিকমতো খাপ খাচ্ছে না। এসব সত্ত্বেও কিন্তু প্রথম ভাগ আর দ্বিতীয় ভাগ-এর শুরুত্ব হ্রাস পায়নি। প্রথাগতভাবে অক্ষর পরিচয় আর বানান শেখাতে একটি আদর্শ প্রাইমার হিসাবে *বর্ণপরিচয়* এখনও স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। তাকে অতিক্রম করে এ ধরনের বই আজও লেখা হয়নি। যদিও স্বীকার্য, আনন্দময় শিশুপাঠ হিসেবে *হাসিখুশি* আর *সহজ পাঠ* নিজের নিজের দিক থেকে খুবই সার্থক। তাই তো দেড়শো বছর পার করেও বিদ্যাসাগরের *বর্ণপরিচয়* আজও প্রাসঙ্গিক।

সকৃতজ্ঞ স্বীকৃতি ॥ এই লেখায় ব্যবহৃত বিবিধ তথ্য নেওয়া হয়েছে এইসব সূত্র থেকে : ১. শিশুশিক্ষা : মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত—ড. আশিস খান্দগীর, পুস্তক বিপণি ; ২. *আকাদেমি পত্রিকা*, মে ১৯৯৪—পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি ; ৩. *বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ* (গোপাল হালদার সম্পাদিত)—প্রথম খণ্ড, নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, কলকাতা ; ৪. *বাল্যশিক্ষা* (রামসুন্দর বসাক)—সীতানাথ আদর্শ লাইব্রেরী, কলকাতা ৯ ; ৫. *বর্ণপরিচয়* : ১ম ভাগ ও ২য় ভাগ—দেব সাহিত্য কুটির প্রা. লি.। এছাড়া বিদ্যাসাগরের প্রামাণ্য জীবনীগ্রন্থসমূহ।

“দৈব ও পুরুষকার” কিংবা দৌহিত্রীর দৃষ্টিতে বিদ্যাসাগর

সরযুবালা দেবী

আমার জননী শ্রীমতি বিনোদিনী দেবী। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তৃতীয়া ও পিতৃমুখী কন্যা। পৈতৃক বাসস্থান মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহা গ্রামে হইলেও তিনি কলিকাতা মহানগরীতে জন্ম পরিগ্রহণ করেন এবং আশৈশব ত্রয়োদশ বর্ষ পর্যন্ত কলিকাতায় পিত্রালয়ে অবস্থান পূর্বক মহা ভোগসুখে প্রতিপালিত হইতে থাকেন। বাটীতেই লেখাপড়া শিখেন, তবে কিছুকাল বেথুন স্কুলে পড়িয়াছিলেন।

আমার পিতা শ্রীযুক্তবাবু সূর্যকুমার অধিকারী বি. এ, এফ. সি. ইউ*। ইহার পৈতৃক বাসভূমি ফরিদপুর জেলার অন্তর্বর্তী ভূষণা থানার অন্তর্গত একখানি ক্ষুদ্র গণ্ডগ্রাম। যশোহর জেলার অন্তর্বর্তী মাগুরা সর্বাভিভিনের নিকট বাড়িয়ালা-চন্দনপ্রতাপ নামক একখানি ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে মাতামহ আলায়ে তিনি জন্ম পরিগ্রহ করেন। তিনি বংশ মর্যাদায় এক প্রকার বিশেষরূপে শ্রেষ্ঠ। তাঁহার আদিপুরুষ শুকদেব অধিকারী যশোহর জেলার অন্তর্গত ভূষণায় বার ভুঁইয়ার এক ভুঁইয়া রাজা সীতারাম রায়ের সভা পণ্ডিত ছিলেন। এবং সেই বাড়ীতে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ দেবমন্দিরটি তিনিই নিৰ্ম্মাণ করেন। এক সময়ে ঐশ্বর্য্যশালী থাকিলেও কালবশে এই বংশ বিশেষরূপে দরিদ্র ও নিঃস্ব হইয়া পড়ে। আমার পিতামহের এমন কোনও সংস্থান ছিল না যে তিনি পুত্রের উপযুক্তরূপ শিক্ষা বিধানের ব্যবস্থা করেন। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি সেই সময়ে গ্রামে গ্রামে বা শহরে শহরে স্কুল পাঠশালার প্রসার হয় নাই। পিতা শৈশব কাল হইতেই ভগবদ্ পরায়ণ ছিলেন এবং নিজ বাটীতে প্রতিষ্ঠিত রাধাকৃষ্ণ মূর্তি ভগবানের সাক্ষাৎ প্রতিকৃতি প্রকৃতি যুগলমূর্তিধারী ভগবান জ্ঞানে নিজ হৃদয়-পুণ্ডরীকে সেই মূর্তি অঙ্কিত করিয়া নিত্য অনুধাবন করিতেন এবং সেই হৃদয়ান্বিত পরমদেবের প্রেরণাতেই তাঁহার জীবনগতি পরিকল্পিত হইতেছে এইরূপ জ্ঞান করিতেন। হৃদয়ের যাবতীয় বাসনাই সেই দেবদেব মহাদেবের প্রাণোদিত এইরূপ তাঁহার মনে হইত।

তখন ইংরাজ দেশে আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। তাহাদের ভাষা রাজভাষা। এই ভাষা না শিখিলে তাহাদের সহিত মনের ভাব সম্যকরূপে বিনিময় করিবার উপায় নাই এবং তাহাদের সহিত মেলামেশা করিতে না পারিলে উন্নতির আশা দুরাশা মাত্র। এদিকে পিতার পরিবার কপর্দক শূন্য। বিদেশে গিয়া ইংরাজী শিক্ষা করা ব্যয় সাপেক্ষ। কিন্তু ইংরাজী শিক্ষার জন্য প্রবল

* Fellow, Calcutta University.

পিপাসা জন্মিয়াছে। এ পিপাসার নিবৃত্তি ও শান্তি কিসে হয়? পিতা অতি শৈশব কালেই চিন্তায় বিলোড়িত হইতে থাকেন। এইরূপ অবস্থায় (যখন) দৌদুল্যমান হইয়া আছেন, এমন সময়ে তিনি একদিন শুনিলেন, ফরিদপুরের নিকটবর্তী মাধবপুর নামক একখানি গ্রামে একটি জমিদারের বাস এবং তাহাদের বাটীতে একটি ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। সেই গ্রামের নিকটবর্তী ছুপড়ি কাঁদি গ্রামে আমার পিতামহের একটি জ্ঞাতি ভগিনীপতির বাস। তিনি ইহাও শুনিলেন যে সেই জমিদারের নিকট বার্ষিক কিছু কিছু খাজনা আমার পিতামহও পাইয়া থাকেন। তখন আমার পিতার বয়স সাত বৎসরের অধিক হইবে না। এই কথা শুনিয়া তিনি যেন হাতে স্বর্ণ পাইলেন। ভাবিলেন, যে উপায়েই হউক মাধবপুর স্কুলে প্রবিষ্ট হইয়া ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করিব। যাদুশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। অনন্তর নিজ পিতার সঙ্গে গিয়া মাধবপুর স্কুলে তাঁহার প্রথম ইংরাজী শিক্ষার হাতে খড়ি হয়। পরে মাগুরা স্কুলে কিছুকাল পড়াশুনা করেন, এবং পরিশেষে ফরিদপুর জেলা স্কুলে প্রবিষ্ট হইয়া প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক ১৪ টাকার বৃত্তি পাইয়া প্রথমে হুগলী কলেজে ২/১ মাস পড়িয়াই কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া তথা হইতে এফ.এ. এবং বি. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৭৫ সালের জানুয়ারী মাসে হেয়ার স্কুলে মাসিক ৫০ পঞ্চাশ টাকা বেতনে শিক্ষকতা কার্যে নিযুক্ত হন। তখন তাহার বয়স ২০/২১ বৎসর মাত্র।

যুগল মিলন

আমরা সচরাচর শুনিয়া থাকি ও বলিয়া থাকি যে জীবের (মানবের) জন্ম মৃত্যু বিবাহ এই তিনটি প্রধান জৈবিক ঘটনা বা ব্যাপার বিধি-পরিকল্পিত, বিধি-নিয়মিত ও বিধি-নির্দিষ্ট। কিন্তু যদি একটু স্থির চিন্তে ভাবিয়া থাকি তাহা হইলে বেশ বুঝিতে পারি যে জীবনের এমন কোনও ঘটনা বা ব্যাপারই নাই যাহা বিধি-নির্দিষ্ট নহে। বিধাতার অমোঘ বিধান অনুসারেই যাবতীয় জগৎ ব্যাপার পরিচালিত হইতেছে। আমরা যে যুগলমিলনের আভাস দিয়া আসিয়াছি তাহা এতকালে পরিণত হইবার উপযুক্ত কাল সমাগত হইয়া আসিয়াছে। এই দুইটি জীবাত্মা এতকালে পৃথক ও স্বতন্ত্রভাবে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিচরণ করিয়া এখন মিলিত হইবার জন্য মহানগরী কলিকাতায় সমুপস্থিত।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে আমার পিতা ১৮৭৫ সালে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হেয়ার স্কুলে শিক্ষকতা পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অপরিচিত কলিকাতা মহানগরীতে ভগবান এই নিঃসহায় যুবককে সর্ব প্রথমে দুইটি প্রধান সহায় জুটাইয়া দেন। ইহাদের একজন বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সহায় ব্যক্তি তখন প্রেসিডেন্সি কলেজের লাইব্রেরিয়ান পদে কিছুদিন থাকিয়া পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার (Assistant Registrar) হন। দ্বিতীয় ব্যক্তি রায়বাহাদুর অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি তখন কলিকাতা হাইকোর্টের সিনিয়র গভর্নমেন্ট প্লিডার (Senior Govt. Pleader), ইহার পৈতৃক বাটী নৈহাটি স্টেশনের নিকটবর্তী নারায়ণপুর গ্রামে। কার্যোপলক্ষ্যে ভবানীপুরেই বসবাস করিতেন। ত্রৈলোক্যবাবুর বাটী চোরবাগানের মুক্তারাম বাবুর স্ট্রীটে। এই ত্রৈলোক্যবাবুই ১৮৭১ সালে পিতা অপরিচিত

ও অপরিজ্ঞাত কলিকাতা মহানগরীতে সমুপস্থিত হইলে অন্নদাবাবুর ডবানীপুরের বাটীতেই তাঁহার বসবাসের ও আহারাদির বিধিব্যবস্থা করিয়া দেন। উভয়েই পিতাকে পুত্রবৎ ভালোবাসিতেন।

পিতা হেয়ার স্কুলে চাকরী করিতেছেন, এমন সময়ে ১৮৭৫ সালের এপ্রিল মাসের, ১২৮২ সালের বৈশাখ মাসের একদিন চারিটার সময়ে ত্রৈলোক্যবাবু পিতাকে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের নিমিত্ত প্রেসিডেন্সী কলেজের লাইব্রেরীতে ডাকিয়া পাঠান। পিতা চারিটার পরে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে ত্রৈলোক্যবাবু বলিলেন, ‘তুমি ভাসিয়াই বেড়াইতেছ, চল, কলিকাতার একজন অতি প্রধান বড়লোকের সহিত তোমার আলাপ পরিচয় করিয়া দিই।’ অনন্তর উভয়ে পদব্রজে পটলডাঙ্গা হইতে আমহার্স্ট স্ট্রীট ও সুকিয়া স্ট্রীটের সম্মিলন স্থলে ৬৩ নং আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাটীর বিতলে উপস্থিত হইলাম। বাটীতে প্রবেশের সময় কেবলমাত্র বলিলেন, এই বাটীতে বিদ্যাসাগর থাকেন, তাঁহার সহিত পরিচিতি করিবার জন্য তোমাকে এখানে আনিয়াছি।’ এই কথা শুনিয়া পিতার একপ্রকার ভাবান্তর উপস্থিত হইল। যে ভাব বাক্য দ্বারা প্রকাশ করিবার নহে।

এ বাটীর ছাদের উপর দিয়া কিঞ্চিৎ দক্ষিণ দিকে গিয়াই দেখিলেন ডানদিকে একখানি ছোট কুঠরী। সেই কুঠরীতে একখানি সাদাসিদে টেবিলের সামনে চেয়ারে একজন টিকিধারী ব্রাহ্মণপণ্ডিত উপবিষ্ট। গৃহে বিশেষ কোনও আসবাব নাই। একখানি পালঙ্ক, একটা আলনা এবং একটা আলমারী। টেবিলের-উপর কতকগুলি কাগজপত্র, একটা কলমদান এবং একটি বাতিদান মাত্র। আলনায় কতকগুলি পরিষ্কার ধূতি ও চাদর এবং কয়েকটি আঙ্গারাখা (আঙ্গা) এবং আলনার পাদালে ২/৩ জোড়া তালতলার চটী-সুতা।

গৃহে প্রবেশ পূর্বক পিতা বুঝিলেন ঐ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতটি বিদ্যাসাগর, সুতরাং ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রাণাম করিলেন। ত্রৈলোক্যবাবুও তাহাকে অভিবাদন করিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পিতার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া নিকটস্থিত চেয়ার দুখানিতে উভয়কে বসিতে বলিয়া তাঁহার পরিচারক উপেন্দ্রনাথ পালিতকে চুপি চুপি কি বলিয়া দিলেন এবং ত্রৈলোক্যবাবুর সহিত দুটি একটি খোষ গল্প করিয়া পিতাকে তাঁহার বংশপরিচয়, বাসস্থান প্রভৃতি সমস্ত জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইলেন। পিতা বিশেষ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তবে কিঞ্চিৎ সলজ্জভাবে ও সসম্মানে সমস্ত বিষয়ের জবাব দিলেন।

এমন সময়ে উপেন্দ্রনাথ পালিত এক বালতি জ্বল, একখানি তোয়ালিয়া ও একটা ঘটি আনিয়া ছাদের এক কোণে একটি নরদমার নিকট রাখিয়া গেল, এবং অনতিবিলম্বেই দুখানি গালিচা আসন পাতিয়া দুখানি থালায় মিষ্টান্ন এবং দুই গ্লাস জ্বল রাখিয়া গেল। বিদ্যাসাগর মহাশয় ত্রৈলোক্যবাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আপনারা এই রৌদ্রে অনেকটা পথ চলিয়া আসিয়াছেন, তাহাতে আবার বেলা অপরাহ্ন হইয়া আসিয়াছে, একটা জলযোগ করিয়া শ্রান্তি দূর করুন। তাঁহারা উঠিলেন, ত্রৈলোক্যবাবু খাবার দেখিয়া একটু মুচকে হেসে বলেন, ‘একি আবার? একি সেই “মিষ্টান্নমিতরে জন্না” ব্যাপার নাকি।’ বিদ্যাসাগর মহাশয় হাসিলেন আর কিছুই বলিলেন না। অনন্তর তাহারা হাতমুখ ধুইয়া জলযোগ করিয়া তাম্বুল চিবাইতে চিবাইতে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন। পথিমধ্যে বিদ্যাসাগর সংক্রান্ত অনেক কথা এবং তাঁহার দুইটি হৃদয়ের বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় এই দুইটি মহারথী সংক্রান্ত অনেক কথাবার্তা হইল। অনন্তর ত্রৈলোক্যবাবুকে চোরবাগানের বাটীতে

রাখিয়া পিতা ভবানীপুরের বাটীতে চলিয়া গেলেন। রাজকৃষ্ণবাবু তখন প্রেসিডেন্সী কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক। ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় সংস্কৃত প্রেসে মুদ্রিত পুস্তকালয়ের (Sanskrit Press Depository) দানপ্রাপ্ত স্বত্বাধিকারী।^২ আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাদুড়বাগান বৃন্দাবন লেনস্থিত ভদ্রাসন বাটী কিংবা শঙ্কর ঘোষের লেন স্থিত স্কুল ও কালেজের বাটী নির্মিত হয় নাই। স্কুল কালেজের কাজ সেই সময় ২৪ নং সুকিয়া স্ট্রীটের ২৭ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনের এবং ৬৩ নং আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাটীর একাংশে নির্বাহিত হইত। বিদ্যাসাগর মহাশয় কখনো আমরা সে ঘরখানির কথা বলিয়াছি তাহাতেই থাকিতেন। ৬২ নং কখনও বা রাজকৃষ্ণ বাবুর ২৫নং সুকিয়া স্ট্রীটের বাটীতেই থাকিতেন। পরিজনবর্গ ৬১ নং আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাটীতে থাকিতেন এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় আহালাদি কখনই এই বাটীতে করিতেন, কখনও বা রাজকৃষ্ণবাবুর বাটীতেই করিতেন। ৬২ নং আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাটীতে তাঁহার ছাপাখানা সংস্কৃত প্রেস (Sanskrit Press) থাকিত।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন কলিকাতায় ট্রামগাড়ী হয় নাই।

মটোর ট্যাক্সি, মটোর লরি প্রভৃতির চিহ্নমাত্র ছিল না, কেবল ছ্যাকড়া গাড়ী ও বেহারাদের পালকিই সাধারণ লোকের চলাফেরার যান ছিল। তখন জলের কলেরও প্রসার হয় নাই, পায়খানা, নর্দমা প্রভৃতির অবস্থা অতিশয় কদর্য ও জঘন্য ছিল।

যুগল মিলন—উদযোগ আয়োজন—উভয়ের—প্রথম দর্শন

পূর্বোক্ত ঘটনার কয়েকদিন পরে এক রবিবারের অপরাহ্নে একখানি পাঙ্কী করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় অন্নদাবাবুর ভবানীপুরের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। অন্নদাবাবু দীর্ঘকাল পরে তাঁহার বাল্যবন্ধুর সমাগম লাভে বিশেষ আনন্দিত হইলেন এবং তাহার অভ্যর্থনার জন্য তামাক সেবনের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। দুই বন্ধুতে অনেকক্ষণ পর্যন্ত অনেক বিষয়ের কথাবার্তা হইল। সেই সকল কথোপকথনে প্রধান বিষয়ই আমার পিতা। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন*, ‘তোমার বাটীতে সূর্যকুমার নামে যে ছেলেটি থাকে আমি তাহাকে দেখিয়াছি, ত্রৈলোক্যবাবু আজ কয়েকদিন হইল তাহাকে আমাকে দেখাইয়াছেন। আমি স্থির করিয়াছি এই ছেলেটির সহিত আমার তৃতীয়া কন্যার বিবাহ দিই এবং উহাকে পুত্র-নির্বিশেষে প্রতিপালন করি। তুমি জান, আমার একই মাত্র পুত্র। সে অতিশয় দুরাচার ও দুর্কিনীত। যে আমার বিষয় রক্ষা ও স্কুল কালেজ রক্ষা করিবারও উপযুক্ত নয়।’^৩ সে অনেকগুলি গর্হিত কাজ করিয়াছে। এজন্য আমি তাহাকে তাজ্য পুত্র করিয়া তাহার সহিত সমস্ত সংস্রব পরিত্যাগ করিয়াছি। আমি ত্রৈলোক্যবাবুর নিকট শুনিয়াছি সূর্যকুমার তোমাকে তাঁহার পিতারও অধিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি করে। এরূপ ক্ষেত্রে তোমার মত হইলেই এ শুভকার্য্যটি যাহাতে সত্ত্বর সম্পন্ন হয় তাঁহার ব্যবস্থা করিয়া আমাকে নিরুদ্বেগ সুখী কর। সূর্যকুমারকে দেখা অবধি তাহার উপর আমার অপত্য স্নেহের সঞ্চার হইয়াছে।’

অন্নদাবাবু বলিলেন, ‘এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য সমস্তই তোমাকে জানাইয়াছি; আর কয়েকটি কথা সূর্যকুমারের সম্বন্ধেই জানাইতে ইচ্ছা করি। তাহাতে তোমার মত কি?’

বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, ‘আপত্তি কি?’ তখন পিতাকে ডাকান হইল। তিনি পাশের ঘরেই ছিলেন এবং তথা হইতে উভয়ের কথাবার্তা প্রায় সমস্তই শুনিয়াছিলেন। এখন তাহাদের সমক্ষে ডাকিবামাত্র তথায় উপস্থিত হইলেন এবং উভয়কে প্রণামপূর্বক তাঁহাদের সামনে বসিলেন।

অন্নদাবাবু পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—‘দেখ সূর্য্যকুমার। আজ ৪/৫ বৎসর তোমাকে আমি পুত্রবৎ পালন করিয়া আসিতেছি। আমি তোমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেছি, তুমিও আমাকে পিতৃবৎ শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিয়া থাক। আজ আমার এই বন্ধু বিদ্যাসাগর আমার কাছে তোমাকে চাহিতেছেন। তোমাকে ইনি তাঁহার একটি কন্যা সম্প্রদান করিবেন এবং তোমাদের ভবিষ্যতের সমস্ত ভার লইবেন এরূপ অঙ্গীকার করিতেছেন। আমাদের উভয়ের সম্মতি লইবার জন্য ইনি স্বয়ং আজ আমার বাটীতে আসিয়াছেন। তোমার মত কি অসম্বোধে সরলভাবে বল।’

এইকথা শুনিয়া পিতার মুখমণ্ডল সলজ্জভাবে ধারণ করিল। তিনি নীরব রহিলেন। ক্ষণকাল পরে বলিলেন, ‘আমি এ সম্বন্ধে আর কি বলিব। পূর্বে এ প্রসঙ্গে যখনই যে কথা হইয়াছে আমি সরলভাবে সে সকলের উত্তর দিয়াছি। তবে দেশে আমার পিতামাতা ভাই-ভগিনী সকলেই আছেন, তাঁহাদিককে না জানাইয়া এবং তাঁহাদের সম্মতি না লইয়া আমি কেমন করিয়া কি বলিব। তবে এটি ঠিক আপনার মতে তাঁহাদের কোনও অমত হইবে না এবং আপনি এ সম্বন্ধে যে রূপ ব্যবস্থা করিবেন তাহাই হইবে।’

বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, ‘তোমার বাটীতে একখানি পত্র লিখিয়া পাঠাও।’

পিতা বলিলেন, ‘আমাদের বাড়ী পল্লীগ্রামে। সেখানে সামাজিক দলাদলি বিলক্ষণ। সমাজপতির সামান্য কারণেই তাঁহাদের মতের বিরুদ্ধাচারিদিককে সমাজচ্যুত করিয়া তাহাদিককে বিশেষ-রূপে নিগূহীত করেন, এমনকি ধোবা-নাপিতাদি বন্ধ করিয়া দেন এবং আদান-প্রদানাদিতে বিশেষ বিঘ্ন ঘটাইয়া থাকেন। বিদ্যাসাগর বহুবিবাহ প্রথা নিবারণ এবং বিধবাবিবাহ প্রচলন প্রভৃতি বর্তমান সমাজবিরুদ্ধ কার্যের নেতা বলিয়াই তথাকার লোকের বিশ্বাস। তাঁহারা বলিয়া থাকেন তিনি নাস্তিক, খ্রীষ্টান ইত্যাদি। তাঁহার নাম শুনিলেই তাঁহারা শিহরিয়া উঠে এবং তাঁহার সহিত আদান-প্রদান কার্যের বিরোধী হইয়া দাঁড়ায়। এক্ষেত্রে আমার বাড়ীর অভিভাবকগণ বিদ্যাসাগরের কন্যাকে স্বগৃহে লইতে সম্মত হইবেন বলিয়া বিশ্বাস হয় না। বিশেষ আমার অবিবাহিতা ভগিনী আছে।’ বিদ্যাসাগর মহাশয় নীরবে এসকল কথা শুনিয়া বিষমভাবে প্রকাশ করিলেন।

অন্নদাবাবু বলিলেন, ‘বিদ্যাসাগর আমাদের সমাজচ্যুত নহে। বিশেষ আমি বরকর্তা স্বরূপ ভরানীপুর এবং কলিকাতা সমাজের প্রধান সমাজপতিদিককে সঙ্গে করিয়া লইয়া শুভবিবাহ কার্য সম্পাদন করিয়া আসিব।’ পিতা বলিলেন, ‘আমাদের দেশের সঙ্কীর্ণমনা সমাজপতির অন্যরূপ প্রকৃতির লোক। তাহারা কি ইহাতে নিরস্ত হইবে যদি তাহারা বিরুদ্ধভাবে অবলম্বন করিয়া দেশে একটা অনর্থ ঘটায় এবং তাহাতে আমার পিতামাতার একটা বোর অশান্তির কারণ ঘটে তবে কি তাহাতে সুখশান্তি পাইবেন।’ বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, ‘আজকাল সমাজের বন্ধন অনেকটা শিথিল হইয়াছে। এখনকার সমাজপতিরা কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থ পাইলেই নিরস্ত হইবেন।’*

পিতা বলিলেন, ‘আমরা যে নিঃস্বা। আমাদের যে অর্থসামর্থ্য নাই তাই এত ভয়।’ বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, ‘সেরূপ আশঙ্কার কারণ নাই। ঘটক, কুলিন এবং সমাজপতির কিছু কিছু বিদায় এবং একটি ভোজ পাইলেই সম্ভব হইবেন। পাক-স্পর্শ বিবাহের একটি অঙ্গ। পাক-স্পর্শ উপলক্ষ্যে এই কার্য্য সহজেই সমাধা করা যাইবে। সেজন্য ভাবিবার বিশেষ কোনও কারণ নাই। যদি তাহাও না হয়, তবে আমি আমার জ্যেষ্ঠা ও মধ্যমা কন্যার বিবাহ দিয়া যেরূপ কলিকাতা সমাজে আনিয়া প্রতিপালন করিতেছি, তোমার বাড়ী সকলকেও এখানে আনিয়া সেরূপ ভরণপোষণ করিব।’

পিতা কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ মনে এবং ক্ষুব্ধভাবে বলিলেন, “আমার পিতাকে আপনারা জানেন না। তিনি দরিদ্র হইলেও অতি স্বাধীনভাবাপন্ন ও তেজস্বী। তিনি পর-প্রত্যাশী হইতে কিছুতেই সম্মত হইবেন না। তিনি কিছুতেই নিজগ্রাম এবং নিজ ভদ্রাসন বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইবেন না। বিশেষ আমাদের বাসভবনে যে দেবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন সেই মূর্তির ধ্যানেই তিনি নিয়ত নিরত। তিনি বলেন আমার জীর্ণ কুটির আমার বৃন্দাবন এবং এই কুটিরেই অধিষ্ঠিত দেবমূর্তিই আমার বৃন্দাবনচন্দ্র তিনি আরও বলেন ‘এই বৃন্দাবনঃ পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি।’ একারণ একাল পর্য্যন্ত তিনি কাশী, পুরী, বৃন্দাবন পর্য্যন্ত কোনও তীর্থভ্রমণ করেন নাই।”

বিদ্যাসাগর মহাশয় ক্ষণকাল নীরব ও নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, ‘আমার এই সকল কথা বিশেষরূপে ব্যস্ত করিয়া তোমার পিতাকে একখানি পত্র লিখিলে ক্ষতি কি?’

পিতা বলিলেন, ‘আমি পত্র লেখার পরিবর্তে আমার মনে হয় একবার আমার বাড়ী যাওয়া দরকার, সাক্ষাৎ করে আমার পিতামাতাকে সকল কথা বুঝাইয়া বলিলে অমত হইবার আশঙ্কা নাই। আমার মাতা এক অতি প্রসিদ্ধ অধ্যাপকের কন্যা। তিনি আমাকে অত্যন্ত ভালোবাসেন। যে বিষয়ে আমার মত হয় মাতা তাহাতে অমত করেন না; পিতাও কখনও আমার বিরুদ্ধাচারী হন না। আমাদের সংসারের যাবতীয় ভারই মায়ের উপরে; পিতা কেবল পূজা আহ্নিক লইয়াই থাকেন। আমার ইহাও দৃঢ় বিশ্বাস যখন একার্য্যে আমার পূজাপাদ পিতৃস্থানীয় অন্নদাবাবুর মত আছে তখন আমার পিতামাতার অবশ্যই মত হইবে। আমি দুই-এক দিনের মধ্যেই প্রস্তাবিত পত্রখানি লিখিব এবং গ্রীষ্মাবকাশেরও বিলম্ব নাই; আমি সে অবকাশকালে বাড়ী গিয়া তাহাদের মত করিয়া সবিশেষ আপনাদিককে নিবেদন করিব।’ এইরূপ ব্যবস্থাই স্থির হইল।

তখন অন্নদাবাবু বাস্পাকুল লোচনে গদগদ বচনে বলিলেন, ‘দেখ বিদ্যাসাগর, আমি সূর্য্যকুমারকে নিজ পুত্রের ন্যায় জ্ঞান করি এবং উহার ভাবী মঙ্গল বিধানের জন্য সচেষ্ট। বন্ধুত্বের খাতিরে আজ আমি উহাকে তোমার হস্তে ন্যস্ত করিতেছি। উহার ভাবী মঙ্গলের জন্য তুমি সর্কোতোভাবে দায়ী। ধর্মসাক্ষী করিয়া আজ তুমি উহার মঙ্গল বিধানের জন্য যে সকল প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতি করিলে তাহা কঠোর হইলেও তাহা হইতে তুমি বিচ্যুত হইবে না, এ আমার বিশ্বাস।’ বিদ্যাসাগর বলিলেন, ‘প্রতিশ্রুতি আমি এ যাবৎ স্থলিত হই নাই এবং কখনো স্থলিত হইব না নিশ্চয় জানিবে।’

অনন্তর পিতাকে বিদায় দিয়া দুই বন্ধুতে পরস্পর আরও আধঘণ্টাকাল কথোপকথন করিলেন, পরে অন্নদাবাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়কে তাঁহার পালকীতে উঠাইয়া দিয়া আসিলেন।

যাইবার সময়ে অন্নদাবাবুকে বলিয়া গেলেন আগামী রবিবার বেলা ৭/৮ টার সময়ে সূর্যকুমার তাহার গৃহে আহ্বার করিবে।

অনন্তর আগামী রবিবার বেলা ৮/৯ টার সময় পিতা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ৬৩ নং আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। তথায় তখন পূর্বোক্ত উপেন্দ্রনাথ পালিত তাঁহার প্রতীক্ষায় ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন তথায় উপস্থিত ছিলেন না।

ক্ষণকাল পরে তিনি আসিলেন এবং সূর্যকুমারকে সঙ্গে করিয়া ৬১ নং আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাটীর উপরের বারান্দায় লইয়া গেলেন। তথায় একখানি গালিচা আসনের সামনে অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ইঙ্গিতে পিতা আহ্বার করিতে বসিলেন এবং আহ্বারান্তে আচমন করিয়া নিকটস্থ একটি বড় আম কাঠের সিঁদুরের উপর বসিলেন। তথায় বসিবামাত্র একটি দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা* ডিবা লইয়া আসিল এবং সলজ্জভাবে একটিবার তাঁহার দিকে চাহিল এবং ডিবাটি তথায় রাখিয়াই চলিয়া গেল। পিতাও ডিবা হইতে ৪টি খিলি হাতে করিয়া সেই উপেন্দ্র চাকরের সঙ্গেই ৬৩ নম্বরের বাটীতে চলিয়া গেলেন এবং ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া অপরাহ্নে ভবানীপুরের বাসায় গেলেন।

এ ঘটনা দৃষ্টে পিতা বুঝিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয় কৌশল করিয়া বরকনের পরস্পর দেখাশুনা করাইলেন, এবং পরিজনবর্গকেও বর দেখাইলেন।

এই ঘটনার ১০/১২ দিন পরে পিতার জ্যেষ্ঠসহোদর এবং জ্যেষ্ঠতাত কলিকাতায় আসিয়া অন্নদাবাবুকে জানাইলেন যে প্রস্তাবিত বিবাহ বিষয়ে তাঁহার উপরই সম্পূর্ণ ভার ন্যস্ত হইল। তিনি এ সম্বন্ধে যাহা করিবেন তাহাতে তাঁহাদের কোন প্রকার অন্যমত হইবে না। তার উপস্থিত বিবাহের পর যেকোন সময়ে সূর্যকুমার সস্ত্রীকে দেশে যাইবেন তখনই পাকস্পর্শ ও সামাজিক বিদ্যাাদি কার্য-সম্পন্ন হইবে।

এই সংবাদ অচিরে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে জ্ঞাপন করিলেন এবং তিনি অন্নদাবাবুকে ধন্যবাদ দিয়া একখানি পত্র লিখিলেন।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর দয়ার সাগর

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সি. আই. ই.

পণ্ডিতপ্রবর বিদ্যাসাগর অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান ছিলেন। দারিদ্র্য, দুঃখ, ক্লেশ ও যন্ত্রণা তাঁহার বিশেষ অনুভূতির বিষয় ছিল। তিনি পরোপকারী এবং দীনপালক বলিয়া দয়ার সাগর নামে অভিহিত হইতেন। আতীর দুঃখ দূর করিতেও তিনি সাধ্যানুসারে যত্ন ও চেষ্টা করিতেন এবং রোগীর পরিচর্যাতেও তিনি বিশেষ সুখানুভব করিতেন। তিনি মহাপণ্ডিত ছিলেন এবং সমাজ সংস্কার কল্পে তিনি ‘বহুবিবাহ’ এবং ‘বিধবা বিবাহ’ নামক দুখানি গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রচার করেন। এই কার্যে তৎকালিক হিন্দুসমাজ বিশেষ রূপে বিলোড়িত হয় এবং “বিধবা বিবাহ” প্রচলিত করিতে গিয়া তিনি প্রভূত পরিমাণে ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়েন। এই সময়ে তিনি ‘হিন্দু সমাজদ্রোহী’, ‘নাস্তিক’ প্রভৃতি অপূর্ব আখ্যায় আখ্যায়িত হইতে থাকেন। গভর্ণমেন্টের প্রধান প্রধান কর্মচারীগণ মধ্যে তাঁহার বিশেষ খাতির ও প্রতিপত্তি থাকায় তিনি তখন তাঁহার অনেক বন্ধুবান্ধব অথচ

নিঃস্ব কৃতবিদ্যাদিকে গভর্নমেন্টের চাকরীতে প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া তাঁহাদের ও তাঁহাদের পরিজনবর্গের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজনও হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার নিকট কুটুম্ব বা আত্মীয়স্বজনের যে এরূপ কোনও উপকার করিয়াছেন তাহার একটি দৃষ্টান্তও দেখিতে পাওয়া যায় না। পরন্তু অনেকের যে বিশেষ অনিষ্টসাধন করিয়া গিয়াছেন তাহার দৃষ্টান্তও নিতান্ত বিরল নহে। এজন্য আমার মাতামহী তাঁহাকে ‘ঘর জ্বালানে’ ‘পর ভালানে’ এরূপ অপূর্ব আখ্যায় আখ্যায়িত করিতেন।

কুলীন ও ভদ্রকুলীনদিগের মধ্যে তাঁহার অনেক কুটুম্ব ছিল। “বহুবিবাহ নিবারণ” ও “বিধবাবিবাহ প্রচলন” সংকল্প হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার অভিপ্রায়ে এক সময়ে তাহাদের অনেকে মিলিত হইয়া তাঁহার নিকট আসিয়া সবিনয়ে আবেদন করেন, ‘বিদ্যাগাগর! তুমি বিবিধ শাস্ত্রানুশীলন করিয়াছ সত্য বটে; কিন্তু তাহার ফল কি হইল? এই হইল যে তুমি সনাতন হিন্দু ধর্মের ও হিন্দুসমাজের বক্ষে ছুরিকাঘাত করিতেছ? নিবৃত্ত হও, স্নেহাচার হিন্দু সমাজে প্রবিষ্ট করাইও না। ইহাতে অধর্ম হইবে।’

এই উক্তি শুনিয়া বিদ্যাগাগর মহাশয় হাসিয়া উত্তর করিলেন, ‘আমার জ্ঞানবুদ্ধিমতে যাহা ভালো বুঝিয়াছি তাহাই প্রচার করিয়াছি।’

ব্রাহ্মণেরা সক্রোধে বলিলেন, ‘তুমি কি সমাজের ভয় রহিত? সমাজ তোমাকে পতিত করিবে; তোমার সহিত কন্যা আদান প্রদান করিবে না, আহার বিহার করিবে না, এবং চারিটি মেয়ে’ নিয়ে ঘর কর, তাহাদিককে কি চিরকুমারী রাখিবে, না যবনে সম্প্রদান করিবে।’

তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজনও কুলীন ছিলেন। বিদ্যাগাগর মহাশয় তাঁহাদের প্রতি ঈষৎ কটাক্ষ করিয়া বলিলেন, ‘মেয়েদিককে চিরকুমারী রাখিব কেন? যদি এমনই দাঁড়ায় যে আপনাদের ঘর ভিন্ন আর মেয়েদের পাত্র না জুটে তবে যবনেই কন্যা সম্প্রদান করিব কারণ আপনারা ত নকল যবন; নকল যবন অপেক্ষা আসল যবনই ভাল। আর বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে যাহা বলিলেন, তাহাতে আমার বস্তুব্য এই যে সমাজের ভিতরে একবার বিশেষরূপে প্রবিষ্ট হইয়া দেখুন, এই সনাতন হিন্দুসমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলিত না থাকায় কত অনাচার কত কদাচার ঘটিতেছে, কত ভ্রংশহত্যা রূপ পাপশ্রোত সমাজমধ্যে প্রবাহিত হইতেছে।’

ব্রাহ্মণেরা সক্রোধে পৈতা ছিঁড়িয়া অভিসম্পাত করিয়া চলিয়া গেলেন; বলিলেন— ‘তুমি নিপাত যাও, তোমার বংশ নিপাত যাউক। এই অভিসম্পাতের অমোঘ ফল কালে ফলিবেই ফলিবে।’ এই মহাপুরুষ কলিকাতায় ১৮৯১ খ্রীঃ ২৯এ জুলাই বাঙ্গলা ১৩ই শ্রাবণ মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন।

বিদ্যাগাগরের অনেক সদৃশ গুণ ছিল বটে, কিন্তু তিনি পূর্ণ মানব ছিলেন না। দোষে গুণেই মানব। সুধারশির অধিকারী সুধাংশুতেও কলঙ্ক। নিষ্কলঙ্ক লোক মনুষ্যকুলে দুর্লভ।

আমরা জানি মহৎ ব্যক্তির গ্লানি করাই যে পাপের কার্য কেবল তাহাই নহে। সে ত পাপী হয়ই, আর যাহারা সেই গ্লানিকর কথা শুনে তাহারাও পাপভাগী হইয়া থাকে। একারণে আমরা অতি ভয়ে ভয়ে কেবলমাত্র সত্যের অনুরোধে, কেবলমাত্র ন্যায়ের অনুবোধে এবং লোকশিক্ষার জন্যই তাঁহার চরিত্রগত দুটি একটি অপূর্ণতার কথা উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম। এই অপূর্ণতা হেতুই তিনি অনেক সময়ে অনেক গর্হিত, নিন্দিত, ঘৃণিত কর্ম করিয়া গিয়াছেন তাহাতে তাঁহার কর্তব্যকর্ম অপালন জন্য তাহার মহাপাপ হইয়াছে এবং তাহার প্রায়শ্চিত্ত জন্য (তাঁহাকে)

পর্যন্ত জগতে তাঁহাকে অন্তর্দাহে দক্ষীভূত হইতে হইতেছে এবং যাহার জন্য তাঁহার পার্শ্ব কীর্্তি সমূহ অকীর্্তিতে পরিণত হইয়া বর্তমানে বিনাশের পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ব্রাহ্মণের অভিশম্পাৎ অপেক্ষাও প্রতিজ্ঞাভঙ্গ, প্রতিশ্রুতিচ্যুতি এবং অকারণ একটি নিরীহ শরণাগত জীবাত্মার সমূলে উচ্ছেদ সাধন অতি গুরুতর পাপ মহাপাপ। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই। তবে তিনি ইহার নিমিত্ত কারণমাত্র ছিলেন, সেই জীবাত্মারূপী আত্মার প্রাপ্তন কৰ্মফলে (অদৃষ্ট) বা ভাগ্যফলে এইরূপ হইয়াছিল।

তবে এ স্থলে আমরা সামান্যভাবে কয়েকটি কথা বলিতে বাধ্য হইলাম। তিনি দরিদ্রঘরে জন্মগ্রহণ করিলেও বুদ্ধি, প্রতিভা, পাণ্ডিত্য ও ভাগ্যবলে বিপুল অর্থ উপার্জন করিতে সমর্থ হন। এজন্য তাঁহার একটি বিশেষ অহঙ্কার ও আত্মাভিমান জন্মে। তিনি নিজেকে ক্ষণজন্মা পুরুষ মনে করিতেন এবং কখনো কাহারো সহিত মিলেমিশে ঐক্যমতে কেনও কাজ করিতে পারিতেন না। তাঁহাতে ব্রাহ্মণসুলভ সংযম, তিতিক্ষা ও ক্ষমা লক্ষিত হইত না। তিনি সত্যধর্ম পালন করেন নাই এবং প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছেন। তিনি ক্রোধাদি ষড়রিপুর প্রবল তাড়নে অনেক সময়ে অনেক অবৈধ কাজ করিয়া ফেলিতেন। এবং যাহার উপর যখন একবার চটিতেন তাহাকে একেবারে ছারখার না করিয়া ছাড়িতেন না। ইহাতে তাঁহার আপন-পর বিবেচনা থাকিত না। এবং কখনো এরূপ অকার্য্যের পরিণাম ভাবিতেন না। ক্রোধভরে কোনও অকার্য্য করিয়া ফেলিলেও ক্রোধের উপশমে নিজের ভ্রম বুঝিয়াও সে ভ্রমের সংশোধন করিতে পারিতেন না।* অসৎ কার্য্য যেমন কাল বিলম্ব হইত না আবার রাবণের পৃথিবী হইতে স্বর্গ পর্যন্ত সিঁড়ি প্রস্তুতের ন্যায় সংকার্য্য সম্পাদনে এতই কাল বিলম্ব হইত যে উহা আর জীবনকালে সম্পন্ন হইত না। অনেক সময়ে প্রতিহিংসা বৃত্তিটিও তাহাতে বিশেষ বলবতী দেখা যাইত। আমরা মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি এবং সপ্রমাণ করিতে প্রস্তুত আছি যে, তিনি যে সকল নগণ্য ব্যক্তির সাহায্যে ও সহায়তায় তাঁহার সাংসারিক কীর্্তি স্থাপন করিয়াছেন তাহাদের অনেককে একেবারে বিনাশ করিয়া গিয়াছেন। যশঃলিপ্সা এবং নিন্দাভয় তাঁহার আর একটি চরিত্রগত বিশেষ ত্রুটি ছিল।

শ্যালক সম্বন্ধী সংবাদ—১

আমার মাতামহ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নূতন উইল একেবারে অদৃশ্য হইল^{১০}। তাহা আর দেখা গেল না। ঐ উইল নিরুদ্দেশ হইল বটে, কিন্তু আমার মাতুল নারায়ণবাবুর পথ তখনও সর্কোতোভাবে পরিষ্কার হয় নাই। ১৮৭৫ সালের ৩১শে মে বাংলা ১২৮২ সালে রেজেষ্টারী করা একখানি পুরাতন উইল ছিল, সুতরাং সেখানি বিলোপের যখন উপায় নাই তখন নারায়ণবাবুর পথ নিষ্কণ্টক নহে। সেই উইলের ২৫ ধারায় লিখিত আছে—

“আমার পুত্র বলিয়া পরিচিত শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যারপরনাই যথেষ্টাচারী ও কুপথগামী। এজন্য ও অন্যান্য গুরুতর কারণবশতঃ আমি তাঁহার সংস্রব ও সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়াছি। এই হেতুবশতঃ বৃত্তি নির্বন্ধ স্থলে তাঁহার নাম পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং এই হেতু বশতঃ তিনি চতুर्वিংশ ধারা নির্দিষ্ট ঋণ পরিশোধ কালে বিদ্যমান থাকলেও আমার উত্তরাধিকারী

বলিয়া পরিগণিত অথবা দ্বাবিংশ ও ত্রয়োদশ ধারা অনুসারে এই বিনিয়োগ পত্রের কার্যদর্শী নিযুক্ত হইতে পারিবেন না। তিনি চতুর্বিংশ ধারা নির্দিষ্ট ঋণ পরিশোধ কালে বিদ্যমান না থাকিলে যাঁহাদের অধিকার ঘটিত তিনি তৎকালে বিদ্যমান থাকিলেও তাঁহারা চতুর্বিংশ ধারার লিখিত মত আমার সম্পত্তির অধিকারী হইবেন।” সেই উইল ট্রেগাছা নিবাসী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কালীচরণ ঘোষ, পাথরা নিবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদনাথ সিংহ ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাগিনেয় পুশপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বেণীমাধব মুখোপাধ্যায়, এই তিন জন কার্যদর্শী নিযুক্ত হইয়াছিলেন।^{১১} নূতন উইল নিরুদ্দেশ হওয়ায় কালীচরণ বাবু উক্ত পুরাতন উইলের প্রোবেটের দরখাস্ত করিতে সম্মত হইলেন না। তমলুকের উকিল পূর্কোত্ত ক্ষীরোদনাথ সিংহ আমার মাতুলের একজন বিশ্বাসী বন্ধু ছিলেন। তিনিই আমার মাতুল মহাশয়কে আমার মাতামহের স্থলে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বিশেষ উদযোগী ও কৃতসংকল্প হইলেন। পুরাতন উইলখানি অনুবাদিত হইয়া হাইকোর্টের উকিল কৌনসিলিদিগের নিকট মতামত জন্য প্রেরিত হইল। আইনজ্ঞ উকিল ব্যারিস্টার ও এটর্নী মহোদয়েরা একমত হইতে পারিলেন না। অনেকে বলিলেন উইল অনুসারে নারায়ণবাবু ত্যজ্যপুত্র সাব্যস্ত হইয়া সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারিবেন না। নারায়ণবাবুর পুত্র শ্রীযুক্ত প্যারীমোহনের বিষয় সম্পত্তির অধিকার ঘটিবে। আবার কেহ কেহ বলিলেন, পিতাপুত্রের কাহারো সম্পত্তিতে কোনও অধিকার ঘটিবে না। বিদ্যাসাগরের কন্যারাই শাস্ত্রানুসারে তাঁহার ত্যজ্য সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইবেন। যদি নিজে পুত্র বিষয়ের উত্তরাধিকারী হন কিংবা ভগিনীরা বিষয় পান তবে ত নারায়ণচন্দ্রের জীবন ধারণ করা বিড়ম্বনা মাত্র। নিজে যাহাতে বিষয় পান তাহার ব্যবস্থার জন্য ক্ষীরোদনাথ সিংহের সহায়তায় এবং অন্যান্য পরামর্শদাতাদিগের পরামর্শ ক্রমে ক্ষীরোদনাথ সিংহের দ্বারা প্রোবেটের দরখাস্ত এবং পিতা পুত্রে আপোষে উত্তরাধিকারী ধার্য করাইবার জন্য হাইকোর্টের আদিম বিভাগে মোকদমা দায়েরের চেষ্টা ও উদ্যোগ চলিতে লাগিল। নারায়ণবাবুর পুত্র প্যারীমোহন তখন নাবালক। এ কারণে নারায়ণবাবুর শাশুড়ীকে নাবালকের গার্জনে সাব্যস্ত করিয়া মোকদমা চালানোই যুক্তি স্থির হইল।

এমন সময়ে আমার পিতামহ মহাশয়ের পরলোকগমন বার্তা শুনিয়া আমরা সকলে দেশে যাই। আমার জ্যেষ্ঠা মাসী হেমলতা দেবী ও কনিষ্ঠামাসী শরৎকুমারী দেবী আজীবন পিতৃগৃহে থাকিয়া পিতৃ অম্নেই প্রতিপালিত হইতে থাকেন। বিষয় সম্পত্তি দখল করিয়া লওয়ার পরক্ষণেই নারায়ণবাবু ক্ষীরোদবাবুর সাহায্যে আমার তিন মাসীকে তাঁহাদের পিতৃগৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। তাঁহারা পরিজনবর্গসহ অনাথিনী কাঞ্চালিনী বেশে রাস্তায় দাঁড়াইলেন। তখন তাঁহারা তিন ভগিনীতে একযোগে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া এবং শীঘ্র কলিকাতায় আসিবার জন্য বিশেষরূপে অনুরোধ করিয়া পিতাকে পত্র লেখেন।

তদনুসারে পিতা আমার ঠাকুরদাদার শ্রাদ্ধাদি কার্য সম্পন্ন করিয়া কলিকাতায় আইসেন। তখন তিনি বালুচরে চাকরীতে যাইবেন স্থির হইয়াছে, কিন্তু কলিকাতার বাসা তখন পর্যন্ত তুলিয়া দেওয়া হয় নাই। তখন তিনি তাঁহার কলিকাতার বাসাতেই আমাদিগের সকলকে লইয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন।

যখন বালুচরে যাওয়াই স্থির হইল, তখন আমার মাতা পূর্ণগর্ভা। এ প্রকার অবস্থায় তাঁহাকে রেলের গাড়ী করিয়া বালুচরে লইয়া যাওয়া নিরাপদ ও শ্রেয় নয়, বিবেচনায় আমার পিতা আমার মাতুল মহাশয়ের নিকট আমার মাতাকে প্রসবকালতক তাঁহাদের নিকট রাখিয়া

যাইতে প্রস্তাব করায় আমার মাতুল মহাশয় সে প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। বিদ্যাশাগরের বাটীতে তাঁহার পরলোক গমনের অব্যবহিত পরেই তাঁহার কন্যাদের অবস্থিতির স্থান হইল না। আসন্ন-প্রসবা আমার মাতারও তথায় অবস্থিতি ঘটিয়া উঠিল না। কাজে কাজেই এরূপ অবস্থাতেই মাতাকে এবং আমাদের সকলকে সঙ্গে লইয়া সেই অজানিত দেশে এবং অবাকব পুরীতে পিতাকে কলিকাতার বাসা ভাঙ্গিয়া বালুচরে যাইতে হইল। বলা বাহুল্য, যে বিদ্যাশাগরের বাটীতে পিতৃবর্ন্তমানে নারায়ণবাবুর প্রবেশাধিকার পর্যন্ত ছিল না, এবং কন্যারাই যে বাটীতে সর্বেসর্ব্বা ছিলেন, সেই বাটীতে পিতৃমুখী কন্যাটির প্রসবকালেও তাঁহার অবস্থিতির স্থান হইল না। সংসারের বিচিত্র গতি। ইহাকে ইংরাজীতে Irony of fate বলা হইয়া থাকে।

এদিকে নারায়ণবাবু ও তাঁহার পুত্র প্যারীমোহন উভয়ে যোগসাজশে নারায়ণবাবুকে পিতৃ পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পিতার পরিত্যক্ত পুত্র নারায়ণচন্দ্রকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বিপুল আয়োজন ও হাইকোর্টে মোকদ্দমা রুজু করিবার জন্য উদ্যোগ ও আয়োজন হইতে লাগিল। পিতাকে দক্ষ উদরের এবং দুস্থ পরিজনবর্গের ভরণপোষণ করিবার জন্য বালুচরে আর না গেলে কিছুতেই চলিবে না। তিনি কলিকাতা পরিত্যাগ করিবার পূর্বে তাঁহার একটি প্রিয় ছাত্র এবং বন্ধু এটর্নী যাদব চন্দ্র দত্তের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করাইয়া বলিলেন নারায়ণবাবু যদি তাঁহার শেষ উইলের (যে উইল নষ্ট বা গোপন হইতেছে) বিধান অনুসারে কন্যাগণের অন্ততঃ ভরণপোষণের এবং অবস্থানের কোনও ব্যবস্থা না করেন, তবে হাইকোর্টে নারায়ণবাবু ও তাঁহার পুত্রের পক্ষ হইতে উক্ত মোকদ্দমায় পক্ষভুক্ত হইবার যথাবিহিত ব্যবস্থা তাঁহাকে করিতে হইবে। যাদববাবু সম্মত হইলেন, এবং পিতা বাসাস্থ সকলকে লইয়া বালুচরে চলিয়া গেলেন।

এ সংসারে ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মাকর্ম্ম কিছুই নাই। অধর্ম্মেরই এবং টাকাকড়িরই জয় সর্ব্বদা দেখা যায়। এখন নারায়ণবাবু নিজ অদৃষ্ট বলে পিতা কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াও এবং পিতার ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে পিতার পরিত্যক্ত সমস্ত সম্পত্তি দখল করিয়া লইয়া বিলাসে গা ঢালিয়া দিলেন। সংসারে সকলেই পয়সার দাস; কাজে কাজেই কলিকাতার অনেক ভদ্রাভদ্র এবং অনেক বড়লোক নারায়ণবাবুর অভিপ্রায়ানুসারী কার্যের সহায়তা করিতে লাগিলেন। এই সকল লোকের মধ্যে পূর্বেই কীরোদনাথ সিংহ এবং মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন^{১০} সর্বপ্রধান। ন্যায়রত্ন মহাশয় সংস্কৃত কালেজের তাৎকালিক প্রিন্সিপ্যাল এবং বিদ্যাশাগর মহাশয়ের পরম বন্ধু ছিলেন। তিনি নারায়ণবাবুকে গৌরবান্বিত করিবার জন্য নারায়ণচন্দ্রকে বিদ্যারত্ন উপাধি দিয়া ভূষিত করিলেন। অবশ্যই এই উপাধি গভর্ণমেন্ট বা সংস্কৃত কালেজ প্রদত্ত উপাধি নহে।^{১১} অথচ নারায়ণবাবু এরূপ উপাধি গ্রহণ করিতে সম্মত বা লজ্জিত হইলেন না।

শ্যালক সম্বন্ধী সংবাদ—২

এদিকে মোকদ্দমা দায়ের সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় স্থির হইলে কার্যদর্শী কীরোদনাথ নারায়ণবাবু বা তাঁহার পুত্রের পক্ষে এটর্নী নিযুক্ত করিবার জন্য যাদববাবুর সহিত সাক্ষাত করিলেন। যাদববাবু বিদ্যাশাগর মহাশয়ের কন্যাদের পক্ষে নিযুক্ত হইবার জন্য আমার পিতা সূর্যকুমারবাবুর

নিকট অঙ্গীকার করিয়াছেন ; সুতরাং ক্ষীরোদবাবুর প্রস্তাবে এখন আর তাঁহার সম্মত হইবার উপায় নাই। ক্ষীরোদবাবুর মুখে নারায়ণবাবু এই উক্তি শুনিয়া একেবারে ত্রোণে অধীর হইলেন এবং ভয়াকুলচিত্তে শিহরিয়া উঠিলেন ; এবং ক্ষণবিলম্ব না করিয়া শ্যামবাজারে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বাটীতে গিয়া তাঁহাকে পিতার অভিপ্রায় সমস্ত জানাইয়া যাহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কন্যাগণের পক্ষ হইতে তাঁহার ইচ্ছার প্রতিকূলতাচরণ না হয় তাহার যুক্তি ও পরামর্শ স্থির করিতে বলিলেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় তৎক্ষণাৎ কলিকাতা একবার আসিবার জন্য পিতাকে বিশেষ করিয়া লিখলেন। পিতা তদনুসারে কলিকাতা আসিয়াই ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। আমাদের দেশের শাস্ত্র ব্যবসায়ী পণ্ডিতগণ সাধারণত বড়ই কোপন স্বভাব হইয়া থাকেন। ন্যায়রত্ন মহাশয়ও এই সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত ছিলেন না।

তিনি পিতাকে দেখিবামাত্রই একেবারে অগ্নিশর্মা হইয়া ত্রোণে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং যথেষ্ট তীরষ্কার করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, ‘তুমি কি জন্য অকারণ একটা ফ্যাসাদ বাঁধাইতেছ এবং একটি বৃহৎ মোকদ্দমার অনুষ্ঠান করিয়া তুলিতেছ। ইহাতে পরিণামে কোনও পক্ষেরই শুভ হইবে না। অথবা এই মোকদ্দমায় বিদ্যাসাগরের সম্পত্তিটী একেবারে ছারখার হইবে এবং তাহার নামে একটি দূরপন্যে কলঙ্ক রটিবে। অতএব এই কার্য হইতে বিরত হও।’

পিতা অতি বিনীতভাবে অথচ দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, আমার কার্যেই আপনি দোষ দেখিতেছেন ; কিন্তু বিদ্যাসাগর মরিতে না মরিতেই তাহার গুণধর পুত্র যে যে অকার্য্য করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার কোনও দোষ দেখিতেছেন না। আপনিই বলুন দেখি ইহারই মধ্যে নিজের ভগিনী, ভাগিনেয়, ভগিনীপতিদিগকেও বাটী হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেওয়ায় কি ধর্ম্মের, পৌরুষের কার্য্য হইয়াছে। তাঁহার একটি পূর্ণগর্ভা ভগিনী যিনি এ প্রকার অবস্থাতেও প্রায় তিন মাস কাল রাত্রি জাগিয়া দিবারাত্র পিতার সেবা গুশ্রাবা করিয়াছেন, তাঁহাকেও অন্ততঃ প্রসবকালতক বিদ্যাসাগরের বাটীতে অবস্থিতি করিতে দেওয়া হইল না। কলিকাতায় তাঁহার জন্ম হয় ; কলিকাতায়ই তিনি এতাবৎকাল বসবাস করিয়া আসিতেছেন, এক্ষণে এরূপ পূর্ণ গর্ভাবস্থায় তাঁহাকে একটি অপরিচিত নূতন স্থানে যাইতে হইল। আপনি বলিয়াছেন, বিদ্যাসাগরের কন্যারা মোকদ্দমা দায়ের করিলে নারায়ণবাবু ও তাঁহার পুত্র বিদ্যাসাগরের কন্যাদিককে রাস্তায় দাঁড় করিবার অভিপ্রায়ে যে বিপুল আয়োজন ও ঘোর ষড়যন্ত্র করিয়াছেন তাহা কৃতকার্য হইলে কি বিদ্যাসাগরের মুখোজ্জ্বল হইবে এবং তাঁহার নামে দূরপন্যে কলঙ্ক রটিবে না? বিদ্যাসাগর মহাশয় যে আসন্ন কালে নূতন একখানি উইল করিয়াছিলেন এবং যাহাতে কলিকাতায় অনেক বড় বড় লোক সাক্ষী হইয়াছিলেন এবং সেই উইলের জন্ম প্রায় সকলেই অবগত আছেন, সেই উইল এরূপ অতর্কিতভাবে অন্তর্হিত হইল কেন? এই উইল সরাইয়া ফেলায় কাহার স্বার্থ? মানুষ মাত্রই নিজ নিজ স্বার্থ-খুঁজিয়া থাকে। নারায়ণবাবু নিজের পদগৌরবের জন্য, সম্পত্তির জন্য নিজ বিলাস সাধনের জন্য নিজের আর তাঁহার ভগিনীরা কেবলমাত্র গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যই ব্যাকুল। ইহারই মধ্যে যখন নারায়ণবাবু ভগিনী প্রভৃতির সহিত এরূপ ব্যবহার করিতেছেন তখন অতঃপর তাঁহারা তাঁহার নিকট আর কি প্রত্যাশা করিতে পারেন?

ন্যায়রত্ন মহাশয় বলিলেন, ‘কেন, নারায়ণচন্দ্র ত আমার নিকট স্বীকার করিয়াছেন যে তিনি ভগিনী প্রভৃতির জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবেন এবং তোমাকেও পুনর্ব্বার স্কুল কালেজে প্রতিষ্ঠিত করিবেন।’

পিতা বলিলেন, “নারায়ণবাবুর সেরূপ স্বীকার উক্তির মূল্য কি? ভাবিয়া দেখুন, নারায়ণবাবুর পিতা আমার সম্বন্ধে যে সকল উক্তি করিয়াছিলেন, এবং আমার নিকট যে সকল অঙ্গীকার করিয়াছিলেন এবং প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হইয়াছিলেন সে সকলের কোনটিই বা পালন করিয়া গেলেন। ন্যায়রত্ন মহাশয়, কিছু মনে করিবেন না, ‘মানুষ মাত্রেই স্বভাব ও প্রকৃতি এই যে তাঁহারা কাহারও দ্বারা কোনও প্রকার স্বার্থসিদ্ধি করিয়া লইবার পূর্বে তাহার নিকট যে সকল প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকার করে, কার্য সুসিদ্ধ হইবার পরে সে সকল একেবারে ভুলিয়া যায়। আপনি ত সকলই জানেন যে বিদ্যাসাগর মহাশয় স্কুল কলেজ সমধিক উন্নতিশালী হইবার পূর্বে আমার নিকট যে সকল প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন তাহার কোনটি পালন করিয়া গিয়াছেন। তদ্বিপরীতে আমাকে একেবারে ছারখার করিয়া যান নাই? নারায়ণবাবু যে প্রতিজ্ঞা পালন সম্বন্ধে পিতৃপদাঙ্ক অনুসরণ করিবেন না তাহাই বা কে জানে? প্রকৃত প্রস্তাবে, যদি নারায়ণবাবু তাঁহার ভগিনীদের সম্বন্ধে কোনও ব্যবস্থা করিতে চাহেন তবে পূর্বেই করুন এবং তৎসম্বন্ধে পূর্বেই দলিলাদি-সম্পাদন করুন। আর আমার সম্বন্ধে যাহা বলিলেন সে কথা একেবারে ছাড়িয়া দিন। পাকা রেজেষ্ট্রীকৃত দলিল ব্যতীত আমি তাঁহার কথার উপর বিশ্বাস ও নির্ভর করিতে পারিব না। নারায়ণবাবু আমার সম্বন্ধে প্রস্তাবিত এগ্রিমেন্টে দলিল তামিল করিতে পারিবেন না। এ কারণ আমার আর স্কুল কলেজে পুনঃ প্রবেশ ঘটিয়া উঠিবে না।”^{১৫} আর আমি এখন উক্ত কার্যের জন্য লালায়িতও নহি। আমি আজ আমার হৃদয়ের শোণিত দ্বারা যে কলেজের পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছিলাম তাহা হইতে আজ ৩ বৎসর বিচ্যুত হইয়া পথে পথে বেড়াইতেছি। আর এখন আমার নির্মম-নিষ্ঠুর, কপট আত্মীয়, স্বজন পরিবৃত স্থানে থাকিবার আর ইচ্ছা নাই। তবে নারায়ণবাবু তাঁহার ভগিনীদের যদি গ্রাসাচ্ছাদনের কোনও উপযুক্ত ব্যবস্থা করেন এবং এখনই তদুপযুক্ত দলিল সম্পাদন করিয়া দেন তবে তাহারা নিশ্চয় নীরব থাকিবেন এবং নারায়ণবাবু নিরুদ্বেগে পিতৃ পরিত্যক্ত সমস্ত সম্পত্তি ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন। বিদ্যাসাগর যেমন স্তোকবাক্যে ও মিষ্ট কথায় ভুলাইয়া মানুষকে বশীভূত করিতেন, পরিশেষে কার্যোদ্ধার হইয়া গেলেই পরিত্যাগ করিতে পারিতেন, নারায়ণবাবুও সেই গুণে শুনী এবং সেই বিদ্যায় পারদর্শী। দেখুন পিতার মৃত্যুর ৭/৮ দিন পূর্বেই কলকাতায় আসিয়াই কেমন কৌশল জাল বিস্তারিত করিলেন। তিনি কলিকাতা পদার্পণ করিতে না করিতেই বিদ্যাসাগরের চরম উইলখানি অদৃশ্য হইল। গৃহস্থিত মজুত টাকাগুলিও অন্তর্হিত হইল। গৃহস্থিত বস্তা বস্তা কাপড়চোপড় বাসনাদি সরিতে লাগিল। অবশ্যই এসকল কার্যে যে নারায়ণবাবু সহায়ক ছিল না তাহা নহে। যখন নারায়ণবাবুর অভ্যুদয়ের প্রধান কণ্টক অপসারিত হইল তখনই নারায়ণবাবু একেবারে নিজমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক কি প্রকার গর্হিত কার্য করিতে লাগিলেন। এজন্যই আমি বলিতেছি যে নারায়ণবাবু তাহার ভগিনীদের সঙ্গে একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা করুক, পরে নিষ্কণ্টকে পিতৃপরিত্যক্ত সম্পত্তি সুখে ভোগ করুক। নচেৎ যে আমি এখন ধূমায়িত হইতেছে তাহা অচিরেই প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখায় প্রদীপ্ত হইবে এবং সেই প্রজ্জ্বলিত অনলে নারায়ণবাবু ভস্মীভূত হইবেন এবং বিদ্যাসাগরের বিপুল বৈভবও ছারখার হইবে। আপনি রাগ করিবেন না বা বিরক্ত হইবেন না; কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখুন যে আপনার সমক্ষে যে নিরপরাধ জীব দণ্ডায়মান তিনি বিদ্যাসাগরের কুহকে পড়িয়া কিরূপ অসময়ে নাস্তানাবুদ হইলেন। আচ্ছা, তর্কস্থলে স্বীকার করা যায় যে আমি বিশেষ অপরাধী কিন্তু, তাহা হইলেও আমার স্ত্রী, পুত্র

ও কন্যাগণ তো আমার দোষে লিপ্ত নন ; কিন্তু তাহার ভরণপোষণের একটা সম্যক ব্যবস্থা করা সেই দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের উচিত ছিল না, আপনারা তো হয়তো বলিবেন বিদ্যাসাগর নতুন উইল করিয়া সকল বিষয়ের সম্যক ও সুচারু বণ্টন করিয়াছিলেন কিন্তু তোমার ভাগ্যদোষে তাহা বলবতী ও কার্যকরী হইল না। ইহার উত্তরে আমি বলিতেছি নারায়ণবাবু পিতৃসত্য পালনে সর্বপ্রকারে বাধ্য। তাহা না করিলে তিনি নিশ্চয় নিরয়গামী হইবেন এবং অন্তিমে ভগবানের নিকট তাহাকে দোষী সাব্যস্ত হইতে হইবে। আর ইহাও জানিবেন যে এই হতভাগ্য দক্ষ পরিবারবর্গের অন্তর্দাহপূর্ণ তপ্ত হৃদয়োচ্ছ্বাস নিশ্চয় অনন্তকাল পর্যন্ত অনন্ত আকাশে—চিদাকাশের যেকোন প্রদেশেই সেই মহাশ্মার জীবাশ্মা অবস্থিত আছেন ও থাকেন—তথ্যেই তাকে জ্বালাতন করিতে থাকিবে। মৃত পিতার জীবাশ্মাকে শাস্তি দেওয়া নারায়ণবাবুর একান্ত কর্তব্য ও পরম ধর্ম। সত্য বটে, দৈব প্রতিকূলতা বশতঃই আমাদের এরূপ ভাগ্য বিপর্যয় ঘটিয়াছে। কিন্তু দেখিবেন এই সূর্য্যকুমার দৃঢ় অধ্যবসায় সহকারে পুরুষকার অবলম্বনে কিয়দংশও বর্তমান ভাগ্যবিপর্যয়ের পরিবর্তন ঘটাইতে পারেন কিনা? আপনারা জানেন এই সূর্য্যকুমার দরিদ্র সন্তান, দীনহীন কাঙাল ক্ষুদ্রপিপাসায় কাতর ; আর নারায়ণচন্দ্র ইহারই মধ্যে বিপুল ঐশ্বর্যের অধীশ্বর হইয়া ভোগ বিলাসে গা ঢালিয়া দিয়াছেন। নিজ গৃহেই বিদ্যাসাগরের বাসভবনেই বারবিলাসিনী দ্বারা [***] করিয়াছেন। দেখিবেন এই ক্ষণভঙ্গুর ঐশ্বর্য্য দেখিতে দেখিতে উড়িয়া যাইবে। যে ব্যক্তি স্বজন প্রভৃতিকে বঞ্চিত করিয়া কেবলমাত্র নিজ ভোগ সুখে উন্মত্ত হন এবং কামবিলাসকেই পরমার্থ জ্ঞান করেন তাহার কামভোগ কখনোই স্থায়ী হয় না। দেখুন ভগবান বলিয়াছেন, ‘আমি যাহার প্রতি দয়া করি তাহার সমস্ত অর্থ সমস্ত বৈভব হরণ করিয়া থাকি, অর্থের দ্বারা মত্ততা জন্মে, তাহাতে মানব লোককে ও আমাকে অবজ্ঞা করে,’ দেখুন ইহারই মধ্যে নারায়ণবাবুর কিরূপ মত্ততা জন্মিয়াছে। আমার বক্তব্য সমস্তই আপনাকে বিশদরূপে জানাইলাম। এখন যদি নারায়ণবাবু তাহার অবশ্যকর্তব্য আংশিক রূপেও প্রতিপালন করেন তাহা হইলে নারায়ণবাবু চিরজীবন শাস্তি ভোগ করিবেন। অন্যথায় ইহকালে ও পরকালে তাহার অশান্তিভোগ অনিবার্য ও অপরিহার্য। পিতৃসত্য পালন জন্য শ্রীরামচন্দ্র বনগমন করিয়াছিলেন, নারায়ণবাবু পিতৃসত্য পালনের জন্য সামান্য কিঞ্চিৎ ত্যাগ স্বীকার করিতেও সম্মত নন। যে যাহা হউক যদি নারায়ণবাবু কপটতা পরিহার পূর্ব্বক সরলভাবে ধর্মজ্ঞানে তাহার ভগিনীদিগের গ্রাসাচ্ছাদনের ও বসবাসের উপযোগী ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে সকল গোল মিটিয়া যাইবে। নারায়ণবাবু নির্বিবাদে ও নির্গোলে বিদ্যাসাগরের বিষয় সম্পত্তি ভোগ করিতে পারিবেন।”

ন্যায়রত্ন মহাশয় ও নারায়ণবাবু পিতার এই সকল তীব্র তিরস্কার বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্ষণকাল নীরব রহিলেন অনন্তর দুইজনে ক্ষণকাল চুপি চুপি কথাবার্তা কহিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয় বলিলেন—

- ১) নারায়ণচন্দ্র তাঁহার প্রত্যেক ভগিনীকে বসবাসের উপযোগী একখানি করিয়া পাকাবাড়ী এই কলিকাতা শহরে খরিদ করিয়া দিবেন। তাহা না হইলে বাড়ীর মূল্য স্বরূপ প্রত্যেককে এককালীন দশ হাজার করিয়া টাকা দিবেন।
- ২) তাঁহার পিতার ১৮৭৫ সালের সম্পাদিত উইলে তাহার কন্যা দৌহিত্র ও দৌহিত্রীগণের সে বৃত্তি নির্দিষ্ট আছে তাহা তাঁহারা পাইবেন।

৩) এই মর্মে একখানি এগ্রিমেন্ট দলিল তিনি সন্তুর সম্পাদন ও রেজেষ্ট্রারী করিয়া দিতে প্রস্তুত আছেন।^{১২}

এইরূপে দলিল সম্পাদিত হইলে পিতা কর্মজ্বল বালুচরে চলিয়া গেলেন। পিতাপুত্রের যোগসাজসী মোকদ্দমা হাইকোর্টে দায়ের হইয়া জাস্টিস্ ট্রিবেলিয়ন সাহেবের এজলাসে নিষ্পত্তি হইল যে, যখন উইলে উত্তরাধিকারীর নাম নির্দিষ্ট হয় নাই তখন নারায়ণচন্দ্রই বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইবেন। ধন্য আইন, ধন্য আইনের কূটতর্ক, ধন্য বিচার। উইলকারীর ইচ্ছার ও অভিপ্রায়ের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধাচারী মীমাংসা হইল। এই জন্যই পিতা বলিয়া থাকেন মানবীয় ইচ্ছা এ জগতে এ সংসারে বলবতী ও ফলবতী হয় না। নারায়ণবাবুর ভাগ্য প্রসন্ন, তিনি তাঁহার পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও তাঁহার উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত হইলেন। এ মীমাংসার বিরুদ্ধে আপীল হইল না। সুতরাং ইহাই স্থির রহিল।

পিতা কলিকাতা হইতে চলিয়া যাওয়ার পর নারায়ণবাবু তাঁহার জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠা ভগিনীদ্বয়ের অনুকূলে ইহাদের প্রত্যেককে আরো পাঁচ হাজার টাকা করিয়া দিবেন এইরূপ একখানি চুক্তিপত্র তামিল ও রেজেষ্ট্রারী করিয়া দিলেন। ইহার নিগূঢ় কারণ আমরা প্রকাশ করিতে অসমর্থ। পাঠক পাঠিকারা অনায়াসেই তাহা অনুমান করিয়া লইতে পারেন। এই দুই ভগিনী তাঁহাদের টাকা অনতিবিলম্বেই আদায় করিয়া লইলেন। মধ্যমা কুমুদিনী দেবীও তাঁহার প্রাপ্ত টাকা আস্তে আস্তে আদায় করিয়া লইতে সমর্থ হইলেন। কিন্তু আমার মাতা বিনোদিনী কোনও মতে সহজে তাঁহার প্রাপ্য টাকা আদায় করিতে না পারিয়া বিদ্যাসাগরের এস্টেটভূক্ত ১৮ নং গড়পার রোড স্থিত ৪০০০ চারি হাজার টাকা মূল্যের বাড়ীখানি তাঁহার প্রাপ্য দশ হাজার টাকার বিনিময়ে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। বাকী টাকা আদায়ের আর কোনো উপায় হইল না। কিন্তু এই বাড়ীখানিও মাতার ভোগে আসিল না। তিন বৎসরকাল পিতা বেকার অবস্থায় কলিকাতায় থাকেন, এবং এই তিন বৎসরের মধ্যেই আমাদের দুই ভগিনীর বিবাহ হয়। এই সকল কারণে ঋণগ্রস্ত হওয়ায় পিতামাতা সেই বাড়ীখানি হস্তান্তরিত করিয়া ঋণদায় হইতে মুক্তি লাভ করেন।

শ্যালক সম্বন্ধী সংবাদ—৩

হাইকোর্টের পিতাপুত্রের যোগসাজসী মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইল। নারায়ণবাবু পিতৃপরিভাজ্য সম্পত্তির উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত হইলেন এবং উইলে নির্দিষ্ট বৃত্তি প্রদানপূর্বক উপস্বস্ত ভোগ দখলের অধিকারী হইলেন।

পিতা কালেজ হইতে অপসৃত হইবার পর হইতেই কালেজের ছাত্রসংখ্যা কমিতে থাকে। এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় *** স্কুল কালেজ পরিদর্শন করিতে থাকেন তাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। বিদ্যাসাগর মহাশয় শেষ জীবনে তিন বৎসর কাল পূর্বের ন্যায় আবার নিজ তহবিল হইতে অনেক টাকা দিয়া স্কুল কালেজ রক্ষা করিতে থাকেন। তাঁহার মৃত্যুর পর নারায়ণবাবু আর বিদ্যাসাগর এস্টেট হইতে স্কুলে কালেজের ব্যয় নির্বাহার্থে টাকা দিতে অস্বীকার করিলেন। শিক্ষকগণ নিয়মিত (মত) বেতন না পাইয়াও কেবলমাত্র ভবিষ্যতের আশায়

কাজকর্ম করিতে লাগিলেন। কালেজ আর থাকে না। এমন সময়ে নারায়ণবাবুর নিজ বন্ধুবর্গের পরামর্শক্রমে কালেজের ম্যানেজমেন্ট মাননীয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হস্তে ন্যস্ত হয়। এই সুরেন্দ্রনাথ সিটি কালেজেরও সংশ্লিষ্ট পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র নিজের স্থাপিত রিপন কালেজই চালাইতে ছিলেন। তিনি ইতিপূর্বে পিতার আমলে বিদ্যাসাগর কালেজের ইংরাজী সাহিত্যাধ্যাপক ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথবাবু যখন এই কালেজ পরিত্যাগ করেন তখন পিতা ব্যারিস্টার নগেন্দ্রনাথ ঘোষকে আনিয়া সেই পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথবাবুর হস্তে গিয়াও কালেজের অধোগতি নিবৃত্ত হয় না। তখন অনন্যোপায় হইয়া সুরেন্দ্রনাথবাবুর হস্ত হইতে কালেজ পরিচালন ভার ছাড়াইয়া লইয়া প্রফেসর বৈদ্যনাথ বসু, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, ক্ষুদিরাম বসু, গোপালচন্দ্র সরকার, নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও সারদারঞ্জন রায় প্রভৃতি একটি কমিটি করিয়া কালেজ পরিচালন করিতে থাকেন।^{১৭} কিন্তু এই নতুন ম্যানেজমেন্টেও কালেজের অধোগতি নিবৃত্ত না হইয়া একেবারে যায় যায় হইল। এই সময়ে ল' ক্লাসগুলি একেবারে উঠিয়া গেল। তখন নারায়ণবাবু অনন্যোপায় হইয়া বালুচরে পিতাকে সম্পূর্ণরূপে কালেজের কর্তৃত্বভার গ্রহণ জন্য এক পত্র লেখেন। পিতা তাহার জবাব দিলেন, তাঁহার পূর্ব প্রস্তাব সম্বলিত পত্রখানি পাকাপাকি এগ্রিমেন্ট না হইলে তিনি এ দায়িত্ব গ্রহণে প্রস্তুত নহেন। তবে নারায়ণবাবু এগ্রিমেন্ট দিতে প্রস্তুত হইলে পিতা মাননীয় সারদাচরণ মিত্র ও গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দ্বিকৈ তাঁহার শর্তসকল জানাইবেন। নারায়ণবাবুর অহঙ্কার ও আত্মত্তরিতা পিতার এ প্রস্তাবের বিরোধী হইল সুতরাং পিতার আর বালুচর হইতে কলকাতা যাওয়া হইল না।^{১৮} এদিকে শিক্ষকগণ বিনা বেতনে আর কতদিন কাজ করিবেন এমন সময়ে কালেজের অধ্যাপকগণ নারায়ণবাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া গভর্নমেন্টের সাহায্য গ্রহণ করাই শ্রেয় স্থান করিলেন। পাঠকগণ এখন একবার স্থির চিত্তে ভাবিয়া দেখুন যে কালেজ পিতার আমলে বার বৎসর মধ্যে উন্নতির চরমসীমায় উপনীত হয়, বিনা সাহায্যে উহার বাড়ীঘর প্রভৃতি নিশ্চিহ্ন হয় এবং উহাতে বিস্তার টাকা ব্যয়ে লাইব্রেরী ও ল্যাবরেটরী স্থাপিত হয়, সেই কালেজের এখন স্বাধীনতা লোপ হইয়া গভর্নমেন্টের সাহায্যকৃত কালেজে পরিণত হইল। অথচ বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮৮৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিকৃতমস্তিষ্কে লিখিতে কুষ্ঠিত হইলেন না যে, 'কালেজ বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে এবং পিতা কালেজ ম্যানেজমেন্টে অপটু।'

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অতএব প্রিয় পাত্র তারচন্দ্র কালেজ হইতে বহিস্কৃত হন। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বৈদ্যনাথ বসু, ক্ষুদিরাম বসু এবং পণ্ডিত নবীনচন্দ্র বিদ্যারত্ন কর্মচ্যুত হন। বৈদ্যনাথবাবু কর্মচ্যুত হইয়া মুঙ্গের কালেজের প্রিন্সিপাল পদ গ্রহণ করেন^{১৯} ক্ষুদিরামবাবু কলিকাতায় সেণ্ট্রাল কালেজ খুলিয়া তাহাই চালাইতে থাকেন, বৃদ্ধ পণ্ডিত নবীনচন্দ্র বিদ্যারত্ন ফ্লোভে ও দুঃখে প্রাণত্যাগ করেন। পিতা অবসৃত হইলে, বৈদ্যনাথবাবু প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার পরে নগেন্দ্রনাথ প্রিন্সিপাল হন এবং তদনন্তর সারদারঞ্জনবাবু—প্রিন্সিপাল পদে নিযুক্ত হন। সারদারঞ্জনবাবু ইতিপূর্বে ঢাকা কালেজের গণিতের প্রফেসর ছিলেন। তথাকার প্রিন্সিপাল বৃথ সাহেবের সহিত বিবাদ হওয়ায় গভর্নমেন্টের চাকরী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। পিতাই তাঁহাকে বিদ্যাসাগর কালেজে প্রবিষ্ট করাইয়াছিলেন।^{২০}

পিতা যখন হটিখোলা হইতে স্কুল কালেজ বিস্তিৎ জন্য লোন করিয়াছিলেন।^{২০} সেই

সময় বলা হয় যে যতকাল কালেজ থাকিবে ততকাল তাহারা ভারতবর্ষে চারিটি করিয়া ছাত্র কালেজে বিনা বেতনে পড়াইতে পারিবেন। এটি মৌখিক অঙ্গীকার, লিখিত অঙ্গীকার নহে। যতদিন ছিলেন ততদিন এই অঙ্গীকার প্রতিপালিত হইয়াছিল ; কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় পিতার অবসর গ্রহণের পর থেকে এই অঙ্গীকার ভঙ্গ হইয়া যায়।^{২১}

শ্যালক সম্বন্ধী সংবাদ—৪

আমার মাতুল নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন কতিপয় বৎসর-কাল ভগিনী-ভাগিনেয়দিগের নির্দিষ্ট বৃত্তি দিতে থাকেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এস্টেটের আয় তাঁহার মৃত্যুকালে মাসিক পাঁচ হাজার টাকার কম ছিল না। এই প্রভূত আয় যে পিতার চেষ্টাতেই হয়^{২২} এবং এই এস্টেটের আয় বৃদ্ধির কারণ তিনি যে রাজকৃষ্ণবাবুর কোপদৃষ্টিতে পড়েন তাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। এই সময়ে অতি সামান্য মাসিক বৃত্তি দেওয়ার পর যে মাস মাস উদ্বৃত্ত টাকা থাকিত তাহা নারায়ণবাবু, তাহার পুত্র প্যারীমোহন এবং পত্নী ভাগ করিয়া লইতেন এবং তিনজনেই উহার যথেষ্ট ব্যয় করিতেন।

নারায়ণবাবুর চরিব্রদোষ বরাবরই ছিল। পিতার সহিত মনোমালিন্য ঘটবার এইটি একটি গুরুতর কারণ। একটি চাকরাণীর সহিত তাঁহার প্রসক্তি ছিল। সে নারায়ণ বাবুর সঙ্গে পটরাণী হইয়া সংসারে বিরাজ করিতে লাগিল। এবং তাঁহার সংসারের সর্ব হইল। ইহাতেই তাঁহার কুৎসিৎ বৃত্তি না হওয়ায় তিনি প্রকাশ্য ভাবে বারবণিতাকে রক্ষিতা রাখিয়া তাঁহার বাটীর সন্নিহিত সুকিয়া স্ট্রীটে একখানি বাড়ী ভাড়া করিয়া রাখেন। এই স্ট্রীলোকটির কতকগুলি ছেলে মেয়ে ছিল। তাহাদিককে দাঙ্গিলিঙে বা খরচপত্র দিয়া রাখা হয়। সে নামমাত্র ভাড়াটিয়া বাটিতে থাকিত কিন্তু অধিকাংশ সময়েই বিদ্যাসাগরের ভদ্রাসন ***। বাটিখানি এবং পুস্তকের কপিরাইট মর্গেজ দিলেন এবং এই বাটীর উত্তরের দিকে আর একখানি বাটি ও পূর্বদিকের কতকটা জমি বেনাম করিয়া রাখিলেন এবং স্কুল কলেজের বিল্ডিং এর ভাড়া বাবদে মাস মাস যে টাকা আদায় হয় তাহা স্টেটে জমা না দিয়া নিজেই ব্যয় করিতে থাকিলেন।

যখন মাতুল মহাশয় বৃত্তিভোগীদের বৃত্তি বন্ধ করিলেন তখন আমার তিন মাসী মাতা কাদিয়া পিতাকে ইহার একটা উপায় নির্ধারণ জন্য বার বার পত্র লিখিতে লাগিলেন। পিতা কলিকাতা আসিয়া তাঁহার প্রিয় বন্ধু শ্রদ্ধাস্পদ কৌনসিলি বি. চক্রবর্তী, এটর্নী ভূপেন্দ্রনাথ বসু এবং তৎকালে হাইকোর্টের উকিল এবং পরে জজ সারদাচরণ মিত্র মহাশয়দিগের সহিত পরামর্শ করিয়া হাইকোর্টের আদিম বিভাগে সুট দায়ের করিলেন (সুট নং ১৯৯/১৯০৪)। পিতার কেনও অর্থ বলও নাই। আর আয় বৃত্তিতে *** সবঙ্গই নিঃস্ব। এই মোকদ্দমা দায়ের করার পর হইতে ২/১ বৎসরের মধ্যেই পিতার প্রায় ২/৩ হাজার টাকা ব্যয় হইয়া গেল। আর খরচের যোগাড় করিয়া মোকদ্দমা চালানো তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য একপ্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিল। এদিকে নারায়ণবাবুও আবার আপোষ মীমাংসার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কাজে কাজেই তখন একটা আপোষ মীমাংসা হইল এবং হাইকোর্ট হইতে একটি decree

করাইয়া লওয়া হইল (২৯-৮-১৯০৬)।^{২৩} তখন এরূপ মীমাংসা হইল যে—

- ১) বিদ্যাসাগরের ষ্টেট রিসিভারের জিন্মা হইবে।
- ২) ভদ্রাসন বাটী মর্গেজ দিয়া নারায়ণবাবুর ঋণ ও বৃত্তিধারীদের বাকী পড়া বৃত্তি পরিশোধিত হইবে।

হাইকোর্টের এটর্নীবাবু জ্যোতিষচন্দ্র মিত্র প্রথম রিসিভার হন তৎপর হাইকোর্টের ব্যারিস্টার প্রভাত কুসুম রিসিভার হন।

রিসিভার নিযুক্ত হইবার পূর্বেও যাহা পরেও তাহা। বৃত্তিভোগীরা কখন কখন ভিক্ষাস্বরূপ হাত-তোলা কিছু কিছু পান আর অবশিষ্টাংশ নারায়ণবাবুরা তিনজনে ভাগ করিয়া লইতে থাকেন। পরে শুনিলাম ও বিদ্যাসাগর বাটী নারায়ণবাবুর দেনার জন্য নীলাম হইয়া গিয়াছে বা নীলামের পথে দাঁড়াইয়াছে। এই বিদ্যাসাগরের ষ্টেট সম্বন্ধে একটি গুঢ় রহস্য আছে তাহা এ পর্যন্ত উদ্ভেদ হয় নাই। ইহা উদ্ভেদ করিতে হইলে বিশেষ লোকবল ও ধনবল সাপেক্ষ। এ সংসারে নিঃস্বার্থভাবে পরোপকার ব্রতে দীক্ষিত হইতে পার এ প্রকার লোক পাওয়া অসম্ভব। পিতা এখন বৃদ্ধ, জরাগ্রস্ত, শোকসন্তপ্ত এবং রুগ্ন। তাঁহার দ্বারা এ কার্য সাধিত হওয়ার কোনও উপায় নাই। বিদ্যাসাগর কালেজ পিতার আমলের অনেক ছাত্র বিশেষ লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠি হইয়া এখন সংসারে বিচরণ করিতেছেন। তাঁহাদের সমবেত চেষ্টায় যে বিদ্যাসাগরের এষ্টেটও বিদ্যালয়গুলিও উহাদের উন্নতি সাধন না হয় এমন নহে। তবে পিতা সংসারগতি যে রূপ দেখিতেছেন তাহাতে তিনি আদবেই সেরূপ আশা করেন না। তিনি আরও বলেন বিদ্যাসাগরের বংশে ও এষ্টেটে ব্রহ্মশাপ পড়িয়াছে। উহার ক্ষয় অবশ্যজ্ঞাবী। পাপের প্রায়শ্চিত্ত অনিবার্য। উহার বিষময় ফল ফলিবেই ফলিবে।

শ্যালক সম্বন্ধী সংবাদ - ৫

[পাতুলিপির শ্যালক-সম্বন্ধী সংবাদের ৫ ও ৬ অধ্যায়কে একত্রে

শ্যালক-সম্বন্ধী সংবাদ-৫ অধ্যায় করা হোল।—সম্পাদক]

গোলাপচন্দ্র সরকার প্রমুখ চরিত্রীগণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বারা তাঁহার স্কুল কালেজ সাধারণের সম্পত্তি বলিয়া কোনও দলিল প্রস্তুত করাইয়া উহা সাধারণের ইস্তে অর্পণ করা হইতে অসমর্থ হইয়া, তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই উহা সাধারণের সম্পত্তি, বিদ্যাসাগরের নিজস্ব private property নহে এইরূপ প্রচার করিতে লাগিলেন। এবং নিজেদের অভিপ্রেত সিদ্ধির বাসনায় এক অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করিলেন।^{২৪} বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তৃতীয় ভ্রাতা শত্ৰুচন্দ্র বিদ্যারত্ন তাঁহাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিবার অভিপ্রায়ে “বিদ্যাসাগর কালেজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস” নাম দিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিয়া প্রচারিত করেন। উহা প্রচারিত হইবার পরে তাঁহারা বিফল মনোরথ হইয়া সেই চেষ্টা হইতে বিরত হন। আমরা সেই প্রবন্ধটি অবিকল এ স্থলে উদ্ধৃত করিলাম।^{২৫}

শাস্ত্রকারেরা বলিয়া থাকেন, অর্থই অনর্থের মূল। কিন্তু এ দক্ষ সংসারে সংসারী লোকের অর্থের অভাবে আদবেই চলিবার উপায় নাই। গ্রাসাচ্ছাদন, শিক্ষাবিধান, সামাজিক ত্রিয়াকলাপ

শারীরিক স্বাস্থ্যবিধান প্রভৃতি যাবতীয় কার্যসিদ্ধির জন্যই অর্থের প্রয়োজন। আমার মাতামহের ত্যাজ্যপুত্র নারায়নচন্দ্র শৈশবে পিত্রালয়ে মহা ভোগ সুখে লালিত পালিত হন। পিতার সহিত মনান্তর হইবার পর হইতে তাঁহার কথঞ্চিৎ অর্থচেষ্টা ঘটিলেও তাঁহাকে কখনো অভাবে পতিত হইতে হয় নাই। এজন্য অর্থভাবে সংসারী লোকের যে কি দুর্গতি ঘটে তাহা তাঁহার অনুভব শক্তির অতীত।

তিনি যখন কিঞ্চিৎ পরিমানে অর্থের অসচ্ছলতা অনুভব করিয়া একেবারে অকস্মাৎ পিতৃপরিত্যক্ত বিপুল সম্পত্তির একমাত্র অধিকারী হইলেন, তখন তাঁহার চিন্তাবিকৃতি সম্পূর্ণরূপে ঘটিল। তিনি অর্থকেই সমস্ত সুখের মূলাধার জ্ঞান করিয়া একেবারে ভোগসমুখে গা ঢালিয়া দিলেন এবং সর্বপ্রকারে ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকল পরিতৃপ্ত করিবার জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতে লাগিলেন। তিনি ঐশ্বর্য্য মদোমত্ত হইয়া নিজ কর্তব্য ভুলিয়া গেলেন, ভগবানকে ভুলিয়া গেলেন, দণ্ডধারী ভগবান যে দণ্ডবিধান জন্য দণ্ডহস্তে দণ্ডায়মান তাহাও তিনি দেখিতে পাইলেন না বা বুঝিতে পারিলেন না।

পিতৃ-পরিত্যক্ত সম্পত্তির প্রকৃত স্বত্বাধিকারীদিকে বঞ্চিত করিবার জন্য নানাপ্রকার উপায় উদ্ভাবন ও অবলম্বন করিতে লাগিলেন এবং ছলে, বলে, কৌশলে যাহাদের যাহা প্রাপ্য তাহাও রহিত করিতে লাগিলেন। এই সময়ে পিতা তাঁহাকে কর্তব্য পথে পদার্পণ করিবার জন্য অনেকগুলি পত্র লেখেন। নিম্নে তাহার একখানি উদ্ধৃত করা হইল।^{২৬}

“ভাই! একবার নিবিস্ট চিন্তে ভাবিয়া দেখ, তুমি এখন যে পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ তাহাতে কতশত লোকের হিতসাধন করিবার ক্ষমতা তোমার করায়ত্ত্ব হইয়াছে। তুমি কিন্তু ধনবলে বলীয়ান হইয়া, অহঙ্কারী হইয়া আত্মনাশ করিতেছ এবং ঋণসের দিকে নিয়ত অগ্রসর হইতেছ। একটিবার ভাবিয়া দেখ, তুমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছ এবং দুদিন পরেই বা কোথায় চলিয়া যাইবে। আর যাহাদিগের তুমি ছলে বলে কৌশলে তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিতেছ তাহাদের কি দারুণ কষ্টশ্বাস, দীর্ঘনিশ্বাস তোমাকে ব্যথিত করিতেছে না? তোমার পিতাকে তাঁহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করাইয়া তুমি এখন মহাগৌরব ও গ্লান্যের বিষয় মনে করিতেছ; কিন্তু দেখিবে ইহার বিষময় ফল অচিরেই ফলিবে। তোমার এই পাঞ্চভৌতিক ভোগায়তন দেহ কদিনের জন্য? ইহার ভোগ-পিপাসা অচিরেই নিবৃত্তি পাইবে। তোমার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত এ জীবনে পূর্ণমাত্রায় না হইলেও পরলোকে ও পরবর্তী জীবনে সম্পূর্ণ নিশ্চয়ই হইবে। আর ইহাও দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি তুমি জীবনে শাস্তি পাইবে না অশাস্তি অনলে নিয়ত দক্ষীভূত হইতে থাকিবে। অপরের প্রাপ্য অপহরণ করা মহাপাপের কার্য্য যাহার যাহা ন্যায্য প্রাপ্য তাহাকে বিনা বাক্যব্যয়ে দিয়া তোমার জীবনের সার্থকতা লাভ কর। নচেৎ ভাই, ভাগ্যবলে তুমি যে বিপুল ঐশ্বর্যের অধীশ্বর হইয়াছ তাহা অচিরে ধূলিকণাবৎ উড়িয়া যাইবে। যে বিধাতা তোমাকে এই সকল সম্পদ দান করিয়াছেন তিনিই আবার সমস্ত হরণ করিবেন। তুমি অশাস্তি রূপ দাবানলে দক্ষীভূত হইতে থাকিবে এবং মৃত্যুর পর-পারেও ঐ অশাস্তি তোমার নিত্য সহচরী হইবে।

ভাই। তোমার সর্বজনপূজ্য পিতার মৃত্যুদৃশ্য কি তুমি ইহারই মধ্যে বিস্মৃত হইলে? তোমার কি স্মরণ নাই কুচক্রীদের ষড়যন্ত্রণায় তোমার পিতার শেষ ইচ্ছা^{২৭} ফলবতী না হওয়ায় তিনি কিরূপ শিরে করাঘাত করিয়া মুর্ছিত হইয়া পড়েন এবং সেই মুর্ছাই তাঁহার মৃত্যু ইচ্ছায়

পরিণত হইল। তাঁহার বাসনাদি জড়িত নম্বর শরীরে আবদ্ধ জীবাত্মা প্রয়াণ করিল, এই অতৃপ্ত বাসনাজালে জড়িত হইয়া তিনি দেহত্যাগ করায় তিনি অনন্তকাল পর্যন্ত যে দক্ষীভূত ও জঞ্জরিত হইবেন তাহা কি তোমার পাপমনে একবারও উদ্ভিত হইতেছে না। অতএব আমার সাক্ষর অনুরোধ তোমার পিতার শেষ ইচ্ছাকে সম্পূর্ণরূপে না হউক, আংশিক রূপে প্রতিপালন করিয়া নিজের শান্তি লাভ কর ও তোমার পরলোকগত মহাত্মা পিতার আত্মার শান্তি প্রদান কর। নিশ্চয় জানবে ইহার ব্যতীত আর উপায়ান্তর নাই। বিধাতা একজনের অতৃপ্ত কামবাসনা পরিতৃপ্ত সাধন জন্য কাহাকেও বিপুল অর্থদান করেন না। পাঁচজনের মধ্যে বিভাগ করিয়া তাহাদের কষ্ট নিবারণের জন্যই এরূপ দিয়া থাকেন। তাঁহার উদ্দেশ্য সাধিত না হইলে সে ধনসম্পত্তি অচিরে ধ্বংস হইয়া যায়। তাই বলিতেছি, এখনও সময় আছে তুমি বুঝিয়া চল এবং সংসারে যশস্বী এ ও প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়া সংসারলীলা করিয়া যাও।

ভাই! সংসারে হিত ও মনোহারী বাক্য দুর্লভ। আমার কথাগুলি তোমার মনোহারী না হইলেও হিতকারী। তোমার অবগতির জন্য একটি গল্প প্রকটিত করিতেছি। এক মনে বারংবার তাহা পাঠ করিয়া নিজ কর্তব্য স্থির কর। সেই গল্পটি এই—

কোনও এক পম্প্রিগ্রামে এক অতি দীন দরিদ্র গৃহস্থ বাস করিত। দুইটি কন্যা, স্ত্রী ও নিজে স্বয়ং এই চারিটি লইয়া তাহাদের সংসার। জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ একটি দীন দরিদ্রের সঙ্গে দেওয়া হয় এবং তাহার অনেকগুলি ছেলেপিলে হয়। একারণ তাহাদের আর দুঃখের কষ্টের সীমা থাকে না। কনিষ্ঠার বিবাহ একটি ধনকুবেরের সঙ্গে হয়। ইহার সন্তানাদি হয় নাই। সংসারে স্বামী স্ত্রী ভিন্ন দ্বিতীয় লোক থাকে না। এমন সময়ে গৃহস্থ সস্ত্রীক মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই সময় বংশের জ্যেষ্ঠা কন্যাটিও বিধবা হয়। সুতরাং তাহাদের দুর্গতির একশেষ হইতে লাগিল। তখন সে অনোন্যোপায় হইয়া ছেলেপিলে সঙ্গে লইয়া গ্রামাচ্ছাদনের আশায় কনিষ্ঠা ভগিনীর বাটিতে উপস্থিত হইল। তিনি ধনগর্বে গর্বিতা এবং ধনের অহংকারে উন্মত্তা হইয়া স্বীয় সহোদরা ও তাহার পুত্র কন্যাগণকে আশ্রয় না দিয়া ছেলেপিলেগুলিকে দুটি না খাওয়াইয়া বাটি হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিলেন। এমন সময়ে গৃহস্থস্বামী ক্ষুধাতৃষ্ণায় নিতান্ত কাতর ও অবসন্ন হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন পূর্বক বারংবার ব্যাকুলভাবে অন্নজল চাহিতে লাগিলেন। এদিকে কোনও অলৌকিক শক্তি প্রভাবে গৃহস্থিত দ্রব্যসামগ্রী এমন কি খাদ্য ও পানীয় একেবারে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। গৃহে কিছুই নাই। অদৃষ্টপূর্ব ঘটনা দৃষ্টে উভয়েই হতবুদ্ধি হইলেন।

অনন্তর ক্ষুধা তৃষ্ণার জ্বালায় অতিমাত্রায় কাতর হইয়া গৃহস্থস্বামী উন্মত্তবৎ গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া পথে ছুটিতে লাগিলেন। গৃহিনীও তাঁহার অনুসরণ করিলেন। কিয়দূর গিয়া একটি জলাশয়ের নিকটে গৃহস্থস্বামী মুর্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং গৃহিনী কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া তাহার পায়ের তলে বসিয়া অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। তখন আর তাঁহার অহঙ্কার, আত্মাভিমান কিছুই নাই। তিনি যে নিজ ভগিনী ও তাহার সন্তান-সন্ততির প্রতি অমানুষিক ব্যবহার করায় ভগবানের বিরাগভাজন হইয়া সর্বস্ব হারাইয়াছেন এবং এখন একমাত্র জীবনের সম্বল পতিকেও হারাইতে বসিয়াছেন সে বিষয়ে তাঁহার আর কিছুমাত্র সংশয় রহিল না। তিনি তখন অনুতাপনলে দগ্ধ হইতে হইতে স্বীয় শিরে করাঘাত করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। সংসার এবং সাংসারিক যাবতীয় ভোগ্যবস্তুই তাহার নিকট অসার বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

এমন সময়ে মন্তকে জটাঙ্গুট সমন্বিত এবং হস্তে কমণ্ডলু ধারণ করিয়া সন্ন্যাসী মূর্তি তথায় উপস্থিত হইয়া অভয় দিয়া বলিলেন, ‘মা ভয় পাইও না, তুমি কী কারণে রোদন করিতেছিলে আমাকে সমস্ত খুলিয়া বল।’

তখন গৃহিনী তাঁহাকে যথাযথ সমস্ত খুলিয়া বলিলে সেই সাধু কমণ্ডলু হইতে জল লইয়া তাঁহার মুমূর্ষু-ভাবাপন্ন স্বামীর সর্বাঙ্গে ছিটাইয়া দিলে তাঁহার চেতনার সঞ্চার হইল। পরে উভয়কে নিজ আশ্রমে লইয়া গিয়া তাঁহাদিকাকে স্নানাহারাদি করাইয়া সুস্থ করিলেন। সেই আশ্রমেই ইতিপূর্বে পুত্রবন্ধ্যাসহ দুঃস্থা রমণী আশ্রয় পাইয়া সুস্থ হইয়া শান্তি লাভ করিতেছিল। তাঁহারা পতি পত্নী উভয়ে এই দৃশ্যটি দেখিয়া বিমোহিত হইলেন।

অনন্তর সন্ন্যাসী সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বাবা। মা! এই অনন্ত রহস্যপূর্ণ সৃষ্টি সংসারে একই মহাশক্তিশালী সৎবস্তু আছেন। তাঁহারই অমোঘ ইচ্ছাতে এই সংসারের যাবতীয় কার্যাবলী সংঘটিত ও সম্পন্ন হইতেছে। জীবমাত্রেরই তাঁহারই অংশ ও তাঁহারই আদেশে ও ইচ্ছায় বিবিধ প্রকারে কর্মে নিরত। তাঁহার দ্বারাই উৎপত্তি, তাহাতেই স্থিতি ও তাঁহাতেই বিলয় প্রাপ্ত হয়। সংসারে অজ্ঞান বশে যাহা ভালো মন্দ জীবের অনুভূত হয়, সে সমস্তই তাঁহা হইতে উদ্ভূত। সংসারের ধনশালী ব্যক্তিগণ সকলেই তাঁহার ধনভাণ্ডারের ভাগুরীমাত্র। এই ধন দ্বারা সমস্ত জীবের পোষণ তাঁহার অভিপ্রেত কার্য। মানুষে যখন অহঙ্কার বশতঃ নিজেই কর্তা সাজিয়া সেই ধনের অপব্যবহার করে, স্বজন বা স্বজাতি পোষণে পরান্মুখ হয় তখনই সে ব্যক্তি সেই ধনচ্যুত হয়। এখন বুঝিয়া দেখ কি কারণে আজ তোমাদের কি দশা ঘটিয়াছে। যাহা হইবার হইয়াছে, এখন সকলে গৃহে গমন কর, একসঙ্গে অবস্থিতি কর এবং সাধ্যমত ভগবানের কার্যরূপ জীবহিতে রত হও।

অতঃপর তাঁহারা সকলে সেই সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া গৃহে গমন করিলেন, দেখিলেন গৃহের যেখানকার যাহা তাহা সমস্তই রহিয়াছে, কিছুই অন্তর্হিত হয় নাই।

বলা বাহুল্য সেই সাধুপুরুষের সদুপদেশ এই পরিবার মধ্যে আর ব্যর্থ হইল না।”

ভাই, এই দীর্ঘপত্রের উপসংহারে তোমাকে বলিতেছি যে, এখনও সময় আছে। মানুষ হও। পিতৃ সত্য সকল পালন কর। যথাসাধ্য আত্মীয়স্বজনকে ভরণপোষণ কর। এই ভাবে সকলের সহিত মিলিত হইয়া এই সংসারেই ব্রহ্মানন্দ ভোগ কর। ইহার অন্যথাচরণ করিলে তুমি সর্বতোভাবে বিপন্ন হইবে, সর্বস্ব হারাইবে এবং অতি ক্রেশে দুর্কহ দেহভার বহন করিবে।”

পাঠক পাঠিকাগণ, একটি সাধারণ কথায় বলে, ‘চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী’। আমার মাতুল নারায়ণচন্দ্র এই দীর্ঘ পত্রখানি পড়িয়া তেলেবেগুণে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং আমার পিতামাতার প্রতি যারপর নাই পরুষ ব্যবহার করিতে লাগিলেন।

ভ্রাতা-ভগিনী সংবাদ

আমার পিতার সহিত আমার মাতামহের প্রথম সাক্ষাৎ ও আলাপ পরিচয়াদির পর হইতে তিনি তাঁহাকে যেরূপ স্নেহ ও যত্ন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার সম্বন্ধে সেসকল ব্যবস্থা করিবেন প্রচারিত করিলেন তাহাই আমার পিতামাতার কাল হইল। কি গৃহে, কি বাহিরে পিতার বিরুদ্ধে

যে ষড়যন্ত্র হইতে লাগিল তাহার মূলই পিতার প্রতি তাঁহার একমাত্র নিরতিশয় স্নেহ প্রদর্শন। এই কারণেই আমার মাতামহের পরিজনবর্গ, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন সকলেই পিতাকে বিঘ্ননয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার সর্বনাশের যোগাড় ও সূত্রপাত করেন। যতদিন মাতামহ সুস্থ সবল বলিষ্ঠ ছিলেন ততদিন তাঁহাদের ষড়যন্ত্র কোনও কার্য্যকারী হয় না ; পরে তাঁহার বার্ষক্যে তিনি জরাজীর্ণ হইয়া পড়িলে এবং তাঁহার বুদ্ধি ও বিচারশক্তির হ্রাস(তা) ঘটিলে তাঁহাদের ষড়যন্ত্র কার্য্যকারী হয় এবং পিতা নির্দোষিত হন।

আমার স্বর্গগত মাতামহের চরম ইচ্ছা ফলবতী হইতে পারিল না। পিতামাতা দেশান্তরিত হইলেন ; মাতুল মহাশয় নিশ্চিন্তে তাঁহার যাবতীয় ত্যাগ্য সম্পত্তি হস্তগত করিয়া লইলেন। কিন্তু ইহাতেও কেবলমাত্র পিতার উদ্যোগে তিনি ভগিনীদের সহিত বন্দোবস্ত করিতে বাধ্য হন এবং সেই বন্দোবস্ত অনুসারে কার্য্য না করায় হাইকোর্টে এডমিনিস্ট্রেশন সুট দায়ের করা হয়, একারণ আমার পিতা আমার মাতুলের নিকট পরম শত্রু রূপে গণনীয় হইলেন। এডমিনিস্ট্রেশন সুট দায়ের হইল বটে, কিন্তু তাহার বৃহৎ ব্যয় কে বহন করে? এদিকে পিতাকে বৃহৎ পরিজনবর্গ লইয়া তাহাদের ভরণপোষণের জন্য বিদেশে থাকিতে হইল সুতরাং মোকদ্দমার রীতিমত ব্যবস্থা করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। কাজে কাজেই অগত্যা তাঁহাকে আপোষ নিষ্পত্তি করিতে হইল। এ সংসারে 'টাকা যার মূলুক তার'। কাজে কাজেই মাতুল মহাশয় কেবল টাকার জোরে আমার মাতাকে তাহার ন্যায্য প্রাপ্য হইতে নিরাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে এগ্রিমেণ্টের শর্তও সম্যকরূপে কার্য্যকর করা হইল না এবং তাঁহার অন্যান্য কন্যাগণেরও নির্দিষ্ট বৃত্তিসকল যথাবিধি দেওয়া হইত না। এদিকে পিতামাতা উভয়েই রোগে, শোকে ও দুঃখে জঞ্জরিত হইতে লাগিলেন। সর্বপ্রকারে আমার মাতুলের নিকট তাহার প্রায়..... টাকার উপর পাওনা সত্ত্বেও তিনি তাহার..... কপর্দকই পান না। গত ১৩২৫ সালের ভাদ্র মাসে তিনি অন্ততঃ কিছু পাইবার জন্য এক মাসের অধিক কাল কলকাতায় থাকিয়া আশ্বিন মাসের শেষে বালুচরে রিস্ত হস্তে ও শূন্য হৃদয়ে ফিরিয়া আইসেন এবং ৪ঠা কার্তিক তারিখে শোকে, দুঃখে ও অভিমানে জীর্ণ জরা-দেহ ত্যাগ করেন।^{২৮}

আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে ১৮৯১ সালে তাঁহার পিতার মৃত্যুর দুই মাস পরে তিনি পূর্ণ গর্ভাবস্থায় অপরিচিত এবং বান্ধবহীন বালুচরে আইসেন ; তাহার পিত্রালয় কলিকাতায় তাহার প্রসবের স্থান হইল না। আবার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বেই যখন শেষ কলিকাতায় যান তখনও পিত্রালয়ে স্থান হয় নাই।

আমার মাতা তো ইহজীবনের মত এ দক্ষ সংসার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন, কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় স্বাধীনচেতা বিদ্যাসাগরের একমাত্র কুলস্বজ্ঞ পুত্র তাঁহার ভগ্নিপতি, ভাগিনেয়, ভাগিনেয়ী প্রভৃতিকে এই দারুণ সংবাদ পাইয়া একখানি পত্র লিখিতে পারিলেন না। আমার মাসীমাতারা, যাঁহারা সুসময়ে পুত্রকন্যা প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া বালুচরের বাটীতে আসিতেন, তাহাদের একজনও এই ঘোর দুঃসময়ে একদিনের জন্যও আসিলেন না। ধন্য সংসার! ধন্য তাই ভগবান বলিয়াছেন, 'লোকে ঐশ্বর্য্যমদে আমাকে ভুলিয়া যায়। আমি যে দণ্ড হস্তে করিয়া আছি তাহারা দেখিতে পান না, উহার মধ্যে আমি যাহাকে বঞ্চিত করিতে ইচ্ছা করি তাহাকেই সম্পত্তি হইতে বিমুক্ত করি।"

পাঠকবর্গ, বৃদ্ধবয়সে আমার পিতামাতা সম্পত্তিচ্যুত হইয়া দারিদ্র্যে পতিত হইয়াছেন,

সুতরাং ভগবান যে তাহাদের প্রতি কৃপাবান হইয়াছেন সে বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহা তাহাদের সৌভাগ্য বলিতে হইবে।

গুরুশিষ্য সংবাদ

[এই অধ্যায়ের প্রথম চারিটি পৃষ্ঠায় যে ‘বিশ্বাশ্বা ভগবান অনাদিকাল হইতে জীবসৃজন, পালন ও সংহাররূপ বিশ্বলীলা বা বিশ্বখেলা খেলিতেছেন’ : তারই কথা বলা হইয়াছে। তাই এই কয়েকটি পৃষ্ঠা বাদ দেওয়া হল।—সম্পাদক]

জীবকে সৎপথে পরিচালনা করিবার জন্য, যেসকল মহাত্মারা সময়ে সময়ে জগতে আবির্ভূত হন এবং প্রতিনিয়ত যাহারা অলক্ষিতভাবে এইরূপ মহৎকার্য সাধন করিতেছেন তাঁহারা ই জগতের গুরুস্থানে বরণীয়। ভগবান স্বয়ং এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের আদিগুরু। তাঁহার বিভূতি সকল তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপে এই গুরুপদে সমাসীন। গুরুসকল ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র। পরম যত্ন ও ভক্তি সহকারে তাঁহাদের সেবা ও জীবের একান্ত কর্তব্য ও পরম ধর্ম।

অনাদিকাল হইতে জগতের-সকল দেশে সকল সময়ে এই গুরুর কার্য ও শিষ্য কর্তৃক গুরু-সেবার্যো অগ্রণী। অবশ্যই ভগবান স্বয়ং গুরুশ্রেষ্ঠ। তিনিই জগৎগুরু—বিশ্বগুরু। তাঁহারই বিভূতি জনক জননী, শিক্ষাগুরু, দীক্ষাগুরুগণও বিশেষরূপে বরণীয়। সকল গুরুর সেবায় যাহারা নিযুক্ত না হন তাঁহারা অতি ...। তাঁহাদের জন্মই বৃথা। যাহারা বৃদ্ধ পিতামাতা ..., শিশুসন্তান এবং গুরুগণকে ভরণপোষণ না করে তাহারা জীবন্মৃত এবং তাহাদের জন্মই বৃথা।

অবতীর্ণ ভগবান শ্রীরামচন্দ্র এবং শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টান্ত জগতে অতুলনীয়। শ্রীরামচন্দ্র তাঁহার গুরুদেবকে গুরুদক্ষিণা স্বরূপ সমগ্র কোশল রাজ্য দান করিতে উৎসুক ছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় শিক্ষাগুরু সন্দীপনীর প্রার্থনানুসারে তাঁহার দুই মৃত পুত্রের প্রাণদান করিয়া গুরুদক্ষিণা-স্বরূপ প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন। এ কার্য ঈশ্বরেই সম্ভবে। মানুষে যাহা সম্ভব তাহা মানুষের একান্ত কর্তব্য। অনার্য্য কিরাতনন্দন একলব্যের গুরু ভক্তি, তাঁহার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দান, জগতে অতুলনীয়। একমাত্র ভারতভূমি ব্যতীত এরূপ মহাত্যাগের দৃষ্টান্ত জগতে আর কোথাপি দৃষ্ট হয় না। পাশ্চাত্য প্রদেশেও গুরুভক্তি ও গুরুদক্ষিণার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে। সম্রাট নেপোলিয়ান গুরুদক্ষিণা দানের চরম দৃষ্টান্ত। বর্তমান সময়ে কাশিমবাজারে ও বর্ধমানের মহারাজাদিগের গুরুদক্ষিণা দানও জগতের দৃষ্টান্তস্বরূপ।

পিতা কালেন্দ্র হইতে বাহির হইয়াই কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। তিনি ১৮৭৫ খ্রী: হেয়ার স্কুলে (কলিকাতা) শিক্ষকপদে নিযুক্ত হন। পরে ১৮৭৬ খ্রী: বিদ্যাসাগর কালেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ১২ বৎসরকাল উক্ত কালেন্দ্রের উন্নতিকল্পে সমর্পণ করেন। এই কালে তাঁহার কলিকাতার বাসায় বিদেশী স্বজাতি বিজাতি ১৫/১৬ টি স্কুলের ছাত্র থাকিত। তাঁহারই ব্যয়ে প্রতিপালিত হইয়া লেখাপড়া শিখিত। সেই সময়ে তাঁহার অনেক আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবও ছিল। তিনি প্রাণ দিয়া যথাসাধ্য সকল প্রকারে সকলের উপকার করিতেন। জীবনে কখনও কাহারও কোনও ক্ষতি করেন নাই। তাঁহার আমলে অসংখ্য ছাত্র শিক্ষালাভ করিয়া এখন বিশেষ কৃতি ও পদস্থ হইয়া নানা স্থানে নানাপ্রকার কার্যোপলক্ষে বিচরণ করিতেছেন। তবে অতীত দুঃখের বিষয় তাহাদের অনেকে পিতার বর্তমান দুঃখ দুর্দিনে পিতার সহিত সহানুভূতি মাত্রও করেন না।

সাধারণ নিয়ম ও ব্যবস্থা এরূপ হইলেও ইহার যে ব্যভিচার নাই তাহা বলিতে পারি না। এই সকল ছাত্রদের মধ্যে অনেক কৃতী ভারতের সুসন্তানগণের নাম ও পরিচয়াদি আমরা এখানে দিতেছি এবং তাঁহাদের নিকট পিতা বিশেষ কৃতজ্ঞ আছেন।

এই সকল ছাত্রদের মধ্যে চট্টগ্রামের বর্তমান কমিশনার শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে।^{২৬} বিদ্যাসাগর কালেক্টরের সহিত পিতার সংস্রব রহিত হইলেই তিনি সহানুভূতি প্রকাশ পূর্বক পিতাকে একখানি পত্র লেখেন। তিনি তখন রাণাঘাটের সব ডিভিসনল অফিসার ছিলেন। সেই সময় থেকে তিনি পিতাকে সময়ে সময়ে পত্রাদিও লিখিয়া থাকেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ভাইস চ্যান্সেলার এবং গভর্নমেন্টের আইন বিভাগের সদস্য নীলরতন সরকার^{২৭} এম এ এম ডি। তিনি গভর্নমেন্টের সদস্য এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পিতাকে যে দু খানি পত্র লেখেন তাহাতে তাঁহার পদোচিত গৌরব ও গুরুভক্তির পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ সার্জ্ঞন শ্রীযুক্ত লেফটেন্যান্ট কর্ণেল সুরেশ প্রসাদ সর্বাধিকারী^{২৮} সি, আই, ই, পিতা, ১৮৯৮ খ্রী: উৎকট পৃষ্ঠাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়া কলিকাতায় গিয়া তাঁহার চিকিৎসাধীনে থাকিয়া আরোগ্যলাভ করেন। তাঁহার তাত্কালিক সহদয় ব্যবহার আমরা এবং আমাদের বংশাবলী কখনও ভুলিতে পারিব না বা পারিবে না। তাঁহাকে চিকিৎসার ফিঙ্গ দিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা সত্ত্বেও তিনি তাহা গ্রহণ করেন না, পরন্তু পিতা আরোগ্য লাভ করিবেন এরূপ আশার সূত্রপাত হইলে তিনি পিতার নিকট উপবেশন করিয়া করজোড়ে ও অতি বিনীতভাবে 'যে কথা বলেন তাহা পিতার এবং আমাদের সকলের হৃদয়ে একেবারে গাঁথা হইয়া রহিয়াছে। সে কথাগুলি, 'আপনি কি আমাকে চিনিতে পারেন নাই? চিকিৎসার ফি দিবার জন্য এত পীড়াপীড়ি হইতেছিল, যাহা দিয়াছেন, যাহার প্রসাদাৎ সংসারে উপজীবিকা লাভ করিয়াছি, আপনার নিকটে আমার যে ঋণ আছে তাহা পরিশোধিত হইবার নহে। আপনাকে যে চিকিৎসা করিবার সুযোগ পাইলাম এবং ভগবানের আশীর্বাদে এ যাত্রা আপনার জীবন রক্ষা হইল তাহাতেই কি আমার জীবনের সার্থকতা হইল না?'

কলিকাতা মেয়ো হাসপাতালের রেসিডেন্ট সার্জ্ঞন শ্রীযুক্ত ডি. এন. মৈত্র। এই মহাপুরুষ পিতাকে পিতৃসদৃশ জ্ঞান করেন এবং মাতাকে মাতৃস্বরূপ ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিয়া আসিতেছেন। গত ১৩২৪ খ্রী: পিতা আবার কারবানকেস আক্রান্ত হইয়া কলিকাতা গেলে তিনি চিকিৎসা করেন। দুইটি ভাইয়েরও উৎকট রোগে তিনি চিকিৎসা করিয়াছিলেন। পিতাকে চিকিৎসা করিবার সময়ে তিনি ২ দিন কাটিবার জন্য ছুটি আনিয়াও পিতৃশরীরে তিনি ছুরিকাঘাত করিতে পারিলেন না। তাঁহার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ ঔষধ প্রয়োগেই পিতা সে যাত্রা বাঁচিয়া উঠেন। এতদ্ব্যতীত পিতার ছাত্রগণের মধ্যে আরও গণ্যমান্য কতিপয় কৃতী ব্যক্তির নামোদ্ধেখ করিতেছি।

শ্রীযুক্ত জে. এন. শুপ্ত আই. সি. এস, এম. এ কমিশনার বর্তমান বিভাগ, অনরেবল রায় রাধা চরণ পাল বাহাদুর, ডা: সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ডা: পি. সি. রায় (কেমিষ্ট)^{২৯}, এটর্নী শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম. এ. বি. এল.^{৩০}, এটর্নী হেমচন্দ্র দে, এটর্নী জ্যোতিশচন্দ্র মিত্র^{৩১}, এটর্নী পান্নালাল দে, রায় বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র এম. এ. বি. ল., বাবু ললিত চন্দ্র মিত্র এম. এ., বাবু চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম. এ, ভাইস চেয়ারম্যান কলিকাতা কর্পোরেশনস রায় চট্টোপাধ্যায়

এম. এ, ... স্টেট রায় রাধিকামোহন লাহিড়ী বাহাদুর বি. এ., বাবু রমণী মোহন ঘোষ বি. এ ; বাবু এম. এ^{৩৭}, বাবু নৃত্যগোপাল বসু এম. এ ; রায় বিশ্বাস এম. এ ; মি. পি. সি. দে আই. সি. এস. ডিসট্রিকট জজ ইত্যাদি ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত পিতার আরও দুইটি ছাত্রের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে একজন হলেন হরেন্দ্রকৃষ্ণ রায় বি. এল.। ইনি কাশিমবাজারের মহারাজার সুযোগ্য সেক্রেটারী। এই মহাপুরুষ দীর্ঘকালাবধি পিতার সহিত বিশেষ সহানুভূতি করিয়া তাঁহার অনেক বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করিয়া আসিতেছেন। আর একজন গোবিন্দচন্দ্র দাসগুপ্ত বি. এ.। ইনি আমাদের কলিকাতার বাসায় থাকিয়া বি. এ. পর্যন্ত পাস করিয়া এক্ষণে শিলং এ গবর্ণমেন্টের কার্যে নিযুক্ত আছেন। এই মহাপুরুষ আমার মাতৃ রিযোগ সংবাদ পাইবা মাত্র পিতার সহিত বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশপূর্বক সময়ে সময়ে চিঠিপত্রাদি লিখিয়া তাঁহার খোঁজ তল্লাস করিয়া থাকেন।

অভিশপ্ত বিদ্যাসাগর বংশ

কলিকাতার অনেক প্রাচীন লোকের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায় যে বিদ্যাসাগরের বংশ অভিশপ্ত। উহাতে অভিশাপ আসিয়াছে, সুতরাং এ বংশের সাংসারিক উন্নতি হওয়ার আশা নাই। এ বংশ দম্ভপ্রায়।

এরূপ জনশ্রুতির মূল অনুসন্ধান আমার মাতামহের তৃতীয় ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় এক সময়ে পিতার নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন যে বিধবা বিবাহ ও বহুবিবাহ পুস্তক দুখানি প্রচারিত হইলে, তাঁহার নিকট কতিপয় শুদ্ধশাস্ত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আসিয়া বলেন, ‘বিদ্যাসাগর। সনাতন হিন্দু সমাজের মূলে কুঠারাঘাত করা তোমার উচিত হয় নাই। বিধবা বিবাহ প্রচলিত হইলে হিন্দু সমাজে বিশৃঙ্খলা ঘটিবে, বিধবাদিগের ব্রহ্মচার্য ধর্ম লোপ হইয়া যাইবে এবং ব্যভিচারের পথ প্রসার হইবে। আর বহুবিবাহ প্রথা ত’ আপনা হইতেই ক্রমে রহিত হইয়া আসিতেছে, ইহা রহিত করিবার জন্য বিপুল আয়াশ ও প্রয়াশ পাইবার কোনও প্রয়োজন নাই। তুমি যদি সমগ্র হিন্দুসমাজের সহিত বিবাদ আরম্ভ করিলে, ইহা তোমার পুত্র কন্যা বা বংশাবলীর পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে না। এই দেখ আমরা কুলীন সন্তানগণ তোমার দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত, তোমাকে অনুনয় বিনয় করিয়া বলিতেছি অবৈধ চেষ্টা হইতে বিরত হও।’ আমার মাতামহ অতি গর্বিতভাবে প্রগল্ভতার সহিত বলিলেন, ‘বিরত বা নিরস্ত হইব বলিয়া এ কার্যে ব্রতী হই নাই।’

তখন তাঁহার মেশোপিসে সম্পর্কীয় কতিপয় কুলীন সন্তান বলিলেন, ‘দেখ বিদ্যাসাগর। তুমি অনুচর কন্যা লইয়া ঘর কর। তুমি যে আমাদের সঙ্গে সমগ্র কুলীন ও ব্রাহ্মণ সমাজের সহিত বিবাদ আরম্ভ করিয়াছ ইহা ভাল হইতেছে না। দেখিবে দুদিন আগেই হউক বা পরেই হউক এই কন্যাগুলিকে পাঠস্থ করিবার জন্য আমাদের পক্ষে পড়িতে হইবে।’

আমার মাতামহ অতি দান্তিকতার সহিত বলিলেন, ‘দেখিবে বিদ্যাসাগর কখনই আপনাদিগের নিকট মাথা নত করিবেন না।’

এই কথা শুনিয়া তাঁহারা বলিলেন, ‘তবে কি কন্যাগুলিকে যবনে দিবে।’

আমার মাতামহ ঈষৎ ব্যঙ্গস্বরে বলিলেন, ‘যদি এরূপ দাঁড়ায়, এক দিকে আপনারা

অন্যদিকে যখন, এতদ্বিত্ত গত্যন্তর নাই, তবে নিশ্চয়ই কন্যাগুলিকে আসল যবনে দিব, নকল যবনে দিব না। স্মরণ করিয়া দেখুন, আপনারা নকল যবন, আপনাদের অপবাদ প্রসিদ্ধ।’

এই কথা শুনিয়া তাহারা সকলে সঙ্গোথে অভিশম্পাৎ করিয়া চলিয়া গেলেন। যাইবার সময়ে বলিয়া গেলেন, ‘বিদ্যাসাগর তোমার এই অহঙ্কারের ফল হাতে হাতে ফলিবে। নিকর্ষ হইবে। এবং তোমার কন্যারাও বংশাবলী ক্রমে দুঃখে দুর্দশায় জীবন কাটাইবে।

অনন্তর নারায়ণবাবু তোমার মাতুল্য যে বিধবা বিবাহ করিয়াছিলেন সেই বিধবা কন্যার স্বসম্পর্কীয় কতিপয় ব্রাহ্মণও পৈতা স্পর্শ করিয়া পূর্বোক্তরূপে অভিশম্পাৎ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন।

এক্ষণে অভিশম্পাতের ফল ফলে কিনা তাহার বিচার আমরা করিতে চাহিনা। তবে এটি শ্রব সত্য যে ব্যক্তিবিশেষের কার্য বা বাক্য দ্বারা যদি ব্যক্তিবিশেষের হৃদয়ে বিশেষ আঘাত দেওয়া যায় এবং আঘাত পাইয়া তাহার হৃদয় হইতে যে সকল বাক্য নিঃসারিত হয় তাহার ফলে সংসারে ঘটিবেই ঘটবে। জীবের হৃদয়ে শান্তি দেওয়ার নাম পূণ্য ; আর অশান্তি দিবার নাম পাপ। বিশ্বপতির অমোঘ নিয়মানুসারে কর্মমাত্রেরই ফল অবশ্যস্বাভাবী। ভগবানের এই মায়িক জগৎ—মায়িক সৃষ্টিকর্মের উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

এখন আমার মাতামহের বংশাবলীর পরিণাম দৃষ্টে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে এই বংশ অভিশপ্ত। উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত ব্যতীত এ বংশের পরিত্রাণ নাই। তবে ব্রহ্মশাপ উপলক্ষ্য মাত্র ভগবানের ইচ্ছাই সকলের মূল।^{৩৩}

সূত্র - নির্দেশ

- ১ সূর্যকুমার অধিকারীর (১৮৫৩-১৯২৬) সঙ্গে বিদ্যাসাগরের তৃতীয়া কন্যা বিনোদিনীর বিবাহ হয় ১৮৭৫ সালে। সেই সময় তিনি হেয়ার স্কুলের শিক্ষক। শত্ৰুচন্দ্র লিখছেন, “অগ্রজ মহাশয় সূর্য্যবাবুকে ঐ পদ পরিত্যাগ করাইয়া মেট্রোপলিটানে সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে সূর্য্যবাবু প্রথমে অসম্মতি প্রকাশ করেন।” পরে তিনি রাজি হয়েছিলেন এবং বিদ্যাসাগর প্রথমে তাঁকে বিদ্যালয়ের শিক্ষক, পরে মেট্রোপলিটান স্কুল-কলেজের সেক্রেটারি নিযুক্ত করেন। “১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ইন্সটিটিউশনে বিশেষ করে কলেজে কতকগুলি পরিবর্তন ঘটে। বছরের গোড়াতেই বিদ্যাসাগর জামাতা সূর্য্যকুমার অধিকারীকে ইন্সটিটিউশনের সেক্রেটারী করে আনেন বহু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থলে। সূর্য্যবাবুর নামে ব্যাঙ্কে হিসেব খুলে দেওয়া হোল। ইন্সটিটিউশনের হিসেবপত্র ও অফিস তিনিই দেখাশুনা করতেন। ১৮৮২ সালের আগে বিদ্যাসাগর তাঁকে কলেজের সেক্রেটারী রূপে ঘোষণা করেন নি।” (শতবর্ষ স্মরণিকা, বিদ্যাসাগর কলেজ, ১৮৭২-১৯৭২, পৃ: ৩৭৫-৩৭৬)। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে সূর্য্যকুমারকে বিদ্যাসাগর ৮০ টাকা বেতনে অধ্যাপক বৈদ্যনাথ বসুর সহকারী নিযুক্ত করেন। বৈদ্যনাথ বসু তখন মাসে ২০০ টাকা বেতন পেতেন।

১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দের আগে থেকেই বিদ্যাসাগর নানা কারণে পুত্র নারায়ণকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন। বিদ্যাসাগর তাঁর জ্যেষ্ঠ জামাতা গোপালচন্দ্র সমাজপতির উপর বিভিন্ন বৈষয়িক কাজকর্ম বেশি নির্ভর করতেন। কিন্তু ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে কলীতে কলেরা রোগে গোপালচন্দ্রের মৃত্যু হয়। সূর্য্যকুমারকে জামাতা হিসাবে পাওয়ার পর তাঁর উপর নির্ভর করতে শুরু করলেন। সূর্য্যকুমারের আলাদা বাসা থাকলেও বিদ্যাসাগরের বাদুড়বাগানের বাড়িতেই অনেক সময় অবস্থান করতেন। ১৮৮২তে তাঁকে মেট্রোপলিটান কলেজ ও স্কুলগুলির সেক্রেটারি নিযুক্ত করেন।

বিদ্যাসাগর কলেজ ও স্কুলগুলির উন্নতি বিধানে অমানুষিক পরিশ্রম করতেন। সূর্যকুমারও বিদ্যাসাগরকে যথাসাধ্য সাহায্য করেছেন। বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ ছিলেন বলে নারায়ণ ছাড়াও অন্য আত্মীয়-স্বজন সূর্যকুমারকে স্বাভাবিক নিয়মে কিছুটা ঈর্ষা করত।

বিদ্যাসাগরের সম্ভ্রম প্রশ্নে ও পরিচালনায় এবং আপন পরিশ্রম ও কর্মদক্ষতায় সূর্যকুমার যথেষ্ট ক্ষমতাবান হয়ে উঠেছিলেন। বিদ্যাসাগর সেই সঙ্গে তাঁকে পুস্তক রচয়িতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতেও প্রয়াস পেয়েছিলেন। এই সম্পর্কে সুরেশপ্রসাদ নিয়োগী লিখেছেন, “সংস্কৃত কলেজে অধ্যক্ষ থাকার সময় তিনি অনেক তরুণকে লেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে তাদের আয়ের পথ করে দিয়েছেন। ...সূর্যবাবু প্রথমে উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত হন। তাঁর প্রথম রচনা ‘কনন কুসুম’ ১৮৭৭ সালে প্রকাশিত হয়। ...প্রায় একই সময়ে তাঁর দ্বিতীয় পুস্তক Elements of Physical Geography প্রকাশিত হয়। এই বইটির প্রকাশক বিদ্যাসাগর এবং বিক্রী হত সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী থেকে। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সূর্যকুমার সম্পাদিত কবিতার বই “নীতি মঞ্জরী” প্রকাশিত হয়। ছাপা হয় সংস্কৃত প্রেসে, গ্রন্থস্বত্ব ছিল মেট্রোপলিটান ইন্সটিটিউশনের।” (বিদ্যাসাগর কলেজ শতবর্ষ স্মরণিকা, ১৮৭২-১৯৭২; পৃ: ৩৮৮)। বইটি পাঠ্যপুস্তক হিসাবে জনপ্রিয় হয়েছিল। পরে সূর্যকুমার গ্রন্থস্বত্ব নিজেদের নামে করে নিয়েছিলেন। ১৮৮৪ সালের পর সূর্যকুমার আরও ৮।১০টি পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করেছিলেন। মেট্রোপলিটান কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে এই বইগুলি লিখেছিলেন বলে এই বইগুলির বিক্রী ছিল অনেক বেশি। বিদ্যাসাগরের প্রকাশন সংস্থাই ছিল বই গুলির প্রকাশক। ১৮৮৪ সালেই প্রকাশিত হয় প্রকৃতি বিজ্ঞান; প্রকাশক ছিল সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী। তখন ডিপজিটরীর মালিক ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়। ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যাসাগর তাঁর এই ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে ‘ডিপজিটরী’ দান করেছিলেন। “১৮৮৬ সালে ব্রজবাবুর সঙ্গে বিদ্যাসাগরের গোলমাল হলে বিদ্যাসাগর Calcutta Library নামে একটি নতুন প্রকাশনী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এখান থেকে সূর্যবাবুর নীতি মঞ্জরী, Practical Geography Part I, Practical Hints to English Composition, Part I Practical Grammar Part I ইত্যাদি বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।” (“প্রকাশক বিদ্যাসাগর”—সুরেশ প্রসাদ নিয়োগী—গ্রন্থজগত, জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দ)।

১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে মেট্রোপলিটান কলেজের খ্যাতি সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছিল। ব্যক্তিগত মালিকানা ও পরিচালনায় এত বড়ো শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান আর ছিল না। এই বৎসরেই সর্বপ্রথম অধ্যক্ষের পদ সৃষ্টি হয়, আর বিদ্যাসাগর ৩১ বৎসর বয়স্ক জামাতা সূর্যকুমারকে ওই পদে নিয়োগ করেন। কলেজে প্রসন্নকুমার লাহিড়ী, বৈদ্যনাথ বসু ইত্যাদির ন্যায় বয়স্ক ও অধিক যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাদের দাবি উপেক্ষিত হওয়াতে একটি চাপা ক্ষোভ ও অসন্তোষের আবহ সৃষ্টি হয়েছিল। কলেজের ছাত্র সংখ্যা সর্বাধিক এবং ফলাফলও ভালো; সরকার পুরস্কার স্বরূপ সূর্যকুমার অধিকারীকে সিনেটের সদস্য মনোনীত করে। এটি প্রকৃতপক্ষে বিদ্যাসাগরের কৃতিত্বেরই স্বীকৃতি।

১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যাসাগরকে মেট্রোপলিটানের নিজস্ব ভবন নির্মাণে উদ্যোগ নিতে হয়, কারণ ভাড়া বাড়ির মালিক বাড়ি ছেড়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানান। শঙ্কর ঘোষ লেনে জমি কেনা থেকে শুরু করে, শ্রীনাথ রায়ের (হটিখোলা) নিকট শঙ্কর ঘোষ লেনের জমি মার্চগেজ রেবে ঋণ নিয়ে বাড়ি তৈরি, ইত্যাদি সমস্ত বিষয়েই বিদ্যাসাগরের অগ্রাণী ভূমিকা। সন্দেহ নেই সূর্যকুমার পরিশ্রম করেছিলেন এবং বিদ্যাসাগরকে সাহায্য করেছিলেন কিন্তু চালকের ভূমিকায় ছিলেন বিদ্যাসাগরই।

জমি কেনা ও বাড়ি তৈরির জন্য তিনি যে ঋণ করেছিলেন তা তিনি কলেজের আয় থেকেই শোধ করেছিলেন। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়, যাকে বিদ্যাসাগর ১৮৬৮ সালে তাঁর ‘সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী’ দান করেছিলেন, বিদ্যাসাগরের নামে কুৎসা রটনার জন্য সালিশির আশ্রয় নিতে হয়। ব্রজনাথ ও তাঁর কতিপয় বন্ধু সূর্যকুমারকে মদ্যপ বলে অভিহিত করার চেষ্টা করেছিলেন। বিদ্যাসাগর দৃঢ়ভাবে তার প্রতিবাদ করেন। এই বিবরণ বিদ্যাসাগর রচিত অপূর্ব ইতিহাস নামক পুস্তিকায় (প্রকাশক : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি) বিবৃত আছে।

১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বিদ্যাসাগর সূর্যকুমারকে অধ্যক্ষপদ থেকে অপসারণ করেন। এই সম্পর্কে শম্ভুচন্দ্র লিখেছেন, “১লা ভাদ্র জ্যৈষ্ঠা বধুদেবী পরলোক গমন করায় অগ্রাঙ্ক মহাশয় নানারূপ দুর্ভাবনায় অভিভূত হইলেন এবং ক্রমশ তাঁহার শারীরিক ও মানসিক অবস্থার অবনতি হইতে লাগিল। ঐ বৎসর ২৫শে ভাদ্র সূর্যবাবুকে পদচ্যুত করেন।” আর একজন সমসাময়িক শরৎকুমার মিত্র লিখেছেন, “একদিন সূর্যকুমারের একটা কী সামান্য দোষ দেখিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাকে কলেজ হইতে তাড়াইয়া দিলেন।” বর্তমানে প্রকাশিত রচনাটিতে সরযুবালা লিখেছেন, “অপরিচিত লোকের অস্বাক্ষরিত পত্র পড়িয়া বিদ্যাসাগরের ধারণা হয় যে “স্কুল-কলেজে বিপুলখলা ঘটিয়াছে।” এরই ফলশ্রুতিতে সূর্যকুমারের পদচ্যুতি। বিদ্যাসাগরের কোনও জীবনীকার বা সমসাময়িক কোনও স্মৃতিচারণে সূর্যকুমারের কোনও গুরুতর ত্রুটি বা “তহবিল তছরূপের” ন্যায় অপরাধমূলক ঘটনার ইঙ্গিত নেই।

অথচ প্রায় ৬৫ বৎসর পরে *বিদ্যাসাগর কলেজ পত্রিকার* ১৩৬০ সালের আশ্বিন সংখ্যায় যতীন্দ্রমোহন ঘোষ নামে জনৈক অধ্যাপক বিদ্যাসাগরের সম্পর্কে প্রচলিত কয়েকটি বহুপ্রত কাহিনির সঙ্গে এটিও যোগ করেন যে বিদ্যাসাগর একদিন হিসাবের খাতায় দুতিন হাজার টাকার গরমিল পেয়ে সূর্যকুমারকে পদচ্যুত করেন। এই কাহিনির কোনও সূত্র উল্লেখ নেই। কোনও একজননের নিকট শোনা গল্প বলে লিখেছেন—কিন্তু তিনিও পত্রিকা প্রকাশের বহুকাল আগে মৃত। অধ্যাপক ঘোষ বিদ্যাসাগর সম্পর্কে এই রচনা প্রকাশের আগে বা পরে কোনও রচনা প্রকাশ করেন নি। সুতরাং তাঁর এই গল্পটিকে প্রামাণিক বলে স্বীকার করে নেওয়া যায় না। ইন্দ্রমিত্র তাঁর বহুপ্রতিষ্ঠিত *কল্লনা সাগর বিদ্যাসাগর-এ* এই কাহিনিটি সংযোজিত করে এটিকে বহুল প্রচলিত করেছেন। ফলে সূর্যকুমারের প্রতি অবিচার করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সূর্যকুমারের সমসাময়িক অধ্যাপক কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ১৯২৬ সালের মার্চ মাসের *কলেজ পত্রিকা*য় দীর্ঘ স্মৃতিচারণ করেছেন। তিনি এইরূপ ঘটনার উল্লেখ করেন নি। উল্লেখ্য যে ১৩৬০ সালে বিদ্যাসাগর কলেজের গভর্নিং-বডির সভাপতি ছিলেন নারায়ণের দৌহিত্র ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। শম্ভুচন্দ্র স্পষ্ট ইঙ্গিত করেছেন যে কিছুদিন আগে বিদ্যাসাগরের জীবন মৃত্যুর পর তাঁর মানসিক দিক থেকে বিচলিত হয়েছিল। বিদ্যাসাগরের অন্য জীবনীকারগণও বিশেষ করে চরিত্রচরণও সূর্যকুমারের কোনও অপরাধের কথা উল্লেখ করেন নি। এই পরিশ্রেক্ষিতে সরযুবালা দেবীর উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে বাক্যটিই সূর্যকুমারের পদচ্যুতির কারণ বলে মনে হয়।

বিদ্যাসাগরের প্রায় সমস্ত আত্মীয় স্বজনই মনে করেন যে মেট্রোপলিটান কলেজ ও বিদ্যালয় বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। তাঁর জীবনীকারেরাও এতে সায় দিয়েছেন। এই ধারণা সঠিক নয়। (দ্রষ্টব্য : *বিদ্যাসাগর*, অমিয়কুমার সামন্ত, পৃ: ২২৮ - ২৩২)। বিদ্যাসাগর নিজে কখনও তা ভাবেন নি। ১৮৮৮ সালের মার্চমাসে কলেজ পরিচালনার জন্য অধ্যাপকদের নিয়ে তিনি একটি ম্যানেজিং কমিটি গঠন করতে চেয়েছিলেন। ম্যানেজিং কমিটির নির্দেশে অধ্যক্ষকে কলেজ পরিচালনা করতে হত। তখন সূর্যকুমার অধ্যক্ষ। স্বাভাবিক কারণে অধ্যক্ষ এই প্রস্তাবের সমর্থক ছিলেন না। এই পরিকল্পনার কথা প্রচারিত হওয়াতে স্বনামে-কোনামে অনেক সমর্থন ও প্রতিবাদ হয়। ২১ মার্চ *স্টেটসম্যান* পত্রিকায় একটি কেনামী চিঠিতে প্রস্তাবিত ম্যানেজিং কমিটির সমালোচনা করাও হয়। বিদ্যাসাগর কমিটি গঠন নিয়ে আর অগ্রসর হননি। কিন্তু কলেজ ও স্কুলের ভবিষ্যৎ নিয়ে বিশেষ উদ্বিগ্ন ছিলেন। ১৮৯১ সালের জুলাই মাসে (মৃত্যু ২৯শে জুলাই) শয্যাশায়ী অবস্থাতেও কলেজ-বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য একটি ট্রাস্ট গঠনের প্রয়াস পেয়েছিলেন, সে শব্দ সংবাদপত্রে ছাপাও হয়েছিল (১৫ই জুলাই ১৮৯১)। কিন্তু শেষপর্যন্ত ট্রাস্ট গঠনের সুযোগ পাননি বিদ্যাসাগর। পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে এই ধারণাই সম্ভব যে মৃত্যুর সময় বিদ্যায়তনগুলির ভবিষ্যতই তাঁর সমস্ত চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। ট্রাস্ট গঠনের চেষ্টা করে বিদ্যাসাগর অন্তত এই কথাটি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছেন যে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাঁর উত্তরাধিকারীদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে ভোগ করতে দেওয়ার কোনও ইচ্ছা তার ছিল না।

সূর্যকুমার কলেজ ও স্কুলগুলির সংগে যুক্ত থাকার সময় আরও দু'একটি প্রাসঙ্গিক ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়। ১৮৮৫ সালে বৌবাজারের ১৫নং সিদ্ধেশ্বর চন্দ্র লেনের বাড়িতে মেট্রোপলিটানের

বৌবাজার শাখা খুলেন বিদ্যাসাগর। ১৮৮৬ সালের জুন মাসে নরেন্দ্রনাথ দত্ত (পরে স্বামী বিবেকানন্দ) ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। একমাস পরে নরেন্দ্রনাথ পদচ্যুত হন। এই বিষয়ে শ্রীম (মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত) লিখছেন, “বিদ্যাসাগর মশাই-এর জামাই ছিলেন ঐ স্কুলের সেক্রেটারী। তিনি তাঁকে দাবিয়ে রাখতে চান। নরেন্দ্র মোটেই সেই পাত্র নন, ঝাপখোল তলোয়ার। জামাই এক ফন্দি করলেন। ফার্স্ট ও সেকেন্ড ক্লাসের ছেলেরা লিখলে, তিনি পড়াতে পারেন না ভাল। বিদ্যাসাগর মশাই আমাকে (শ্রীমকে) বললেন, “তাহলে নরেন্দ্রকে বোলো আর না আসে। দরকার হবে না।” (শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত, চতুর্থ খণ্ড, পৃ: ৫৭)

‘শ্রীম’ বা মহেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধেও কয়েকজন ছাত্র অভিযোগ করেছিল যে তিনি মন দিয়ে পড়ছেন না। এই ঘটনার আগে বিদ্যাসাগর একবার মহেন্দ্রনাথের গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে তীর্থক মন্তব্যও করেছিলেন। ছাত্রদের অভিযোগের পর মহেন্দ্রনাথ চাকুরি ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং কয়েকদিন পরে চাকুরি ছেড়ে দেন। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর অধ্যাপক নরেন্দ্রনাথ ঘোষ অধ্যক্ষ হলে তাঁর অনুরোধে মহেন্দ্রনাথ আবার অধ্যাপক হিসাবে ফিরে আসেন। (মন্তব্য : শতবর্ষ স্মরণিক বিদ্যাসাগর কলেজ, পৃ: ৩৯৯)

মেট্রোপলিটান কলেজ থেকে পদচ্যুতির পর সূর্যকুমার তিন বৎসর কলকাতাতেই ছিলেন। বিদ্যাসাগরের বাদুড় বাগানের বাড়িতে তাঁর যাতায়াত বন্ধ হয়নি। বসন্তপক্ষে বিদ্যাসাগরের শারীরিক অসুস্থতার সময় তার সেবা অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এ সম্পর্কে অধ্যাপক কলীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য লিখেছেন, “আমরা যখনই যাইতাম পুত্র নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্নের পিতৃসেবা, জামাতা সূর্যকুমার অধিকারীর স্বস্তুর সেবা ও ডাক্তার অমূল্যচরণের তত্ত্বাবধান দেখিয়া হৃদয়ে অতুল প্রীতি পাইতাম।”

বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর কয়েকমাস পরে সূর্যকুমার সপরিবারে কলকাতার বাস তুলে মর্শিদাবাদের বালুচরে পৈতৃক বাড়িতে ফিরে যান। মর্শিদাবাদেই জমিদার শ্রীপৎ সিংহের সেরেস্তার চাকুরি নেন।

অবশিষ্ট কর্মজীবনে তিনি এই কাজেই বহাল ছিলেন। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। একথা বললে অসঙ্গত হবে না যে মেট্রোপলিটান কলেজের অধ্যক্ষপদ থেকে অপসারিত হওয়ার পর সূর্যকুমার আর সারস্বত সাধনা করেন নি এবং অর্থোপার্জনেও বিশেষ সাফল্য লাভ করেন নি।

২. ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় বিদ্যাসাগরের সুহৃদ। কৃষ্ণনগরে তাঁর নিজের বাড়িতে একবার গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন ব্রজনাথ। বিদ্যাসাগর কলকাতায় পুত্র নারায়ণের বিবাহ অনুষ্ঠানে ব্যস্ত ছিলেন। খবর শোনামাত্র, চণ্ডীচরণের কথায়, “সুহৃদানুগত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সকল অনুষ্ঠান পড়িয়া রহিল। তিনি তৎক্ষণাৎ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারকে সঙ্গে লইয়া কৃষ্ণনগর যাত্রা করিলেন।” এ তো ১৮৭১ সালের কথা। তার আগে ১৮৬৪ সালে বিদ্যাসাগর ব্রজনাথকে সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী দান করেন। বিদ্যাসাগরের নিজেই কথায়, “একদিন, এই বিষয় উপলক্ষে, কতিপয় আত্মীয় বন্ধুর নিকট আমি দুঃখ প্রকাশ করিতেছিলাম; সেই সময়ে শ্রীযুত বাবু ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় ঐ স্থানে উপস্থিত ছিলেন। আমি বলিলাম আমার নিশ্চিত এত লাভ হইবার কথা; লাভ দূরে থাকুক আমার এত ক্ষতি হইল। অতএব যদি কেহ এই পুস্তকালয় লহেন আমি ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত আছি। আমি এই কথা বলিলামাত্র ব্রজনাথ বাবু সবিশেষ ব্যগ্রতা প্রদর্শন পূর্বক বলিলেন, আমায় দেন, আমি লইতেছি। আমি অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া, তৎক্ষণাৎ ব্রজনাথবাবুকে বলিলাম, “আচ্ছা আপনাকে দিলাম; ইহাতে যে উপসব্দ হইবে আপনি তা ভোগ করিবেন।” পরে অনেকে বিদ্যাসাগরকে পাঁচহাজার টাকা পর্যন্ত দিতে চেয়েছিলেন; কিন্তু বিদ্যাসাগর যা বলেছেন তার অন্যথা করা সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন। শত্ৰুচন্দ্র জানাচ্ছেন যে এই ডিপজিটরীর আয়ে ব্রজনাথ কৃষ্ণনগরের এক সম্ভ্রান্ত ধনীলোক বলে গণ্য হয়েছিলেন। এই ব্রজনাথ ও তার পুত্র যদুনাথ ১৮৮৫ সালে বিদ্যাসাগরের নামে কুন্সার রটনা করতে শুরু করেন। এমনকি সূর্যকুমারকেও মৃত্যু বল রটনা করা হয়। বিদ্যাসাগর বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাহায্যে সালিশি করিয়ে তাঁর কুন্সার বন্ধ করেন। তারপর সংস্কৃত ডিপজিটরী থেকে তাঁর সমস্ত বই তুলে নিয়ে ‘কলকাতা পুস্তকালয়’ নামে একটি প্রকাশক সংস্থা তৈরি করে তাদের হাতেই প্রকাশ ও বিক্রয়ের ভার দেন। “কৃত্তম্ব” ব্রজনাথের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। বিদ্যাসাগরের

অপূর্ব ইতিহাস-এ পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায়।

- ৩ “পূর্বোক্ত ঘটনার” সাক্ষী সূর্যকুমার অধিকারী স্বয়ং। সরযুবাবা পিতামাতার নিকট এই কাহিনিটি শুনেছেন। দ্বিতীয় ঘটনার সাক্ষীও সূর্যকুমার ও বিনোদিনী। অনুমান করা যায়, এই ঘটনা একটি স্মরণীয় কাহিনি হিসাবে পরিবারে প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল।
- ৪ ১৮৭৫ সালে বিদ্যাসাগর যে উইল করেছিলেন তাতে নারায়ণকে ত্যাজ্যপুত্র করেছিলেন।
- ৫ এটি বিদ্যাসাগরের খুব পরিচিত মন্তব্য। শুধু কথোপকথনেই নয়, তিনি তার বিধবাবিবাহ বিষয়ক প্রবন্ধেও একথা লিখেছেন।
- ৬ ১৮৭৫ সালে সূর্যকুমারের সঙ্গে বিবাহের সময় বিনোদিনীর বয়স ১৫ বৎসর, দ্বাদশ বর্ষ নয়।
- ৭ বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয় ১৮৫৬ সালে (Act XV of 1856)। সেই সময় বহুবিবাহ বন্ধ করার জন্য আলোচনা সরকারি স্তরে অনেকদূর পর্যন্ত এগিয়েছিল, কিন্তু আইন পাশ হয়নি। এই ঘটনা যদি ১৮৫৬-১৮৫৯ সালের মধ্যে ঘটে থাকে তবে তখন বিদ্যাসাগরের মাত্র দুই কন্যা, আর দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করেনি। তবে কিছু আত্মীয় যে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন তার প্রমাণ আছে।
- ৮ সূর্যকুমার অধিকারীর পদচ্যুতির কথা বলা হয়েছে।
- ৯ শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, “বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রকৃতি তো জানাই আছে, তাঁর কাছে স্বর্গ-নরক ভিন্ন মাঝামাঝি একটা স্থান নাই। যাহাকে ভাল জানিবেন তাহাকে স্বর্গে দিবেন ; যাহাকে মন্দ জানিবেন তাহাকে নরকে দিবেন।” বিহারীলাল লিখেছেন, “মৈত্রী-বিচ্ছেদে বিদ্যাসাগর মহাশয় কখন স্বতঃপ্রযুক্ত হইয়া কিংবা মৈত্রীর পুনরুদ্ধারার্থ অগ্রসর হইতেন না। মৈত্রী উদ্ধারের এরূপ অনাকাঙ্ক্ষা মানব চরিত্রের মহত্ব পরিচায়ক নহে নিশ্চয়ই ; কিন্তু কৃত্য...-নির্ভর তেজস্বী পুরুষে প্রায়ই এইরূপ দৃষ্টি গোচর হইয়া থাকে।”
- ১০ নারায়ণের দৌহিত্র ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে এক প্রবন্ধে লিখেছেন Two other wills drawn up and signed by Iswar Chandra prior to 1875, which he cancelled by his last will and testament.” বিদ্যাসাগরের চরিত্রকাররা একটির বেশি উইলের উল্লেখ করেন নি। তবে বিদ্যাসাগর ১৮৭৫ এর আগে যে একটি উইল করেছিলেন তার প্রমাণ ১৮৭৫ সালের উইলেই আছে। সেখানে লিখছেন, “এই বিনিয়োগ দ্বারা আমারকৃত পূর্ণাঙ্গ সমস্ত বিনিয়োগ নিরস্ত হইল।” আগের উইল বাতিল করার একটি বিশেষ কারণ ছিল নারায়ণকে তাঁর বিচ্যুতির জন্য উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা। ১৮৭২ সালে মধ্যমা কন্যা কুমুদিনীর বিয়ের সময় থেকেই নারায়ণের উপর তার বিরাগ জন্মে। ১৮৭৫ এর পর আর কোনও উইল তৈরির প্রমাণ নেই।
- ১১ বিদ্যাসাগরের উইল ও সম্পত্তি সংক্রান্ত বিবাদের উপর ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, হাইকোর্ট ও মহাফক্সখানায় অনেক নথিপত্র আছে। তার উপর ভিত্তি করে রচিত অমিয়কুমার সামন্তের *বিদ্যাসাগর* পুস্তকের “বিদ্যাসাগরের উত্তরাধিকার সমস্যা” অধ্যায় দ্রষ্টব্য।
- ১২ প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩০) নারায়ণের একমাত্র পুত্র। অকৃত্যদার প্যারীমোহন ছিলেন পিতার ছায়ামাত্র।
- ১৩ মহেশচন্দ্র নায়রত্ন (১৮৩৬-১৯০৬) সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কার শাস্ত্রের অধ্যাপক। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে ওই কলেজের অধ্যক্ষ হন এবং ১৮৯৫-এ অবসর নেন। তিনিই সংস্কৃতের আদ্য, মধ্য ও উপাধি পরীক্ষার প্রবর্তক। টীকা-টিপ্পনী সহ অনেক চিরায়ত সংস্কৃত গ্রন্থের সম্পাদনা ছাড়াও তিনি অনেক জনহিতকর কার্যের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।
- ১৪ সংস্কৃত কলেজের সমসাময়িক নথিপত্রে নারায়ণের “বিদ্যারত্ন” উপাধি লাভের কোনও সমর্থন পাওয়া যায় না। তিনি কিছুদিন সংস্কৃত কলেজে পড়লেও, কোনও উপাধি না নিয়েই কলেজ ত্যাগ করেন। অতএব বর্ণিত কাহিনিটি সত্য। প্রসঙ্গত বিদ্যাসাগরের জীবদ্দশায় নারায়ণ ওই উপাধি ব্যবহার করেন নি।

- ১৫ ১৮৯৩ সালের ১৫ জুন নারায়ণ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একটি চুক্তি করে এক কালীন দুই হাজার টাকা এবং মাসে মাসে দুইশত টাকার বিনিময়ে মেট্রোপলিটান কলেজ তাঁর হাতে তুলে দেন। কলেজ পরিচালনায় নারায়ণের কোনও কর্তৃত্ব ছিল না। সেই জন্যই সূর্যকুমার বলেছেন যে নারায়ণ আর তাকে কলেজে নিয়োগ করতে পারবেন না।
- ১৬ সরযুবালা মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন ও সূর্যকুমারের কথোপকথনের যে বিবরণ দিয়েছেন তা সর্বাংশে সত্য না হতেও পারে; কিন্তু নারায়ণ ভগিনীদের সঙ্গে একটি চুক্তি যে করেছিলেন তাতে কোনও সন্দেহ নাই। শত্বচন্দ্র ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে স্যার অলিফ্রেড ক্রফোর্ডকে বিদ্যাসাগরের কলেজ ও স্কুলগুলির অবস্থা সম্পর্কে লিখতে গিয়ে বলেছেন, "He (Narayan) lost no time in entering into an agreement with his four sisters, and two nephews (sister's sons) to the effect that in consideration of their not opposing the suit pending in the High Court, he should pay them Rs. 50 thousand in a lump and further that some of them should receive every month an allowance exceeding what had been settled on them by the will" (Education Department Proceedings B - 144-51 File no. 5E/5, August, 1899)। চুক্তি সম্পর্কে সরযুবালা দেওয়ার তথ্যটির সমর্থন ও বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে।
- ১৭ এটি একটি নূতন তথ্য। বিদ্যাসাগর কলেজের কোনও ইতিহাসে এই প্রস্তাবের সমর্থন পাওয়া যায় না। নারায়ণের তখন এগ্রিমেন্ট করার অধিকার ছিল না। অবশ্য শেষ পর্যন্ত এ প্রস্তাব কার্যে পরিণত হয় নি।
- ১৮ ওই সময়ের ঘটনা উপস্থাপনায় স্বাভাবিক ভাবে কিছু বিচ্যুতি হয়েছে। সূর্যকুমার তখন কলকাতায় ছিলেন না। সরযুবালা বেহালাতে থাকলেও তিনি ঘটনা জ্ঞাত থেকে দূরে ছিলেন। তাছাড়া বিদ্যাসাগরের প্রায় সমস্ত আর্থীয়-স্বজন মেট্রোপলিটান কলেজ ও স্কুলগুলিকে বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারতেন না। বিদ্যাসাগর অবশ্য কোনও দিন তা মনে করেন নি। দেশের মানুষ, কিংবা মেট্রোপলিটান ইন্সটিটিউশনের মূল স্বত্বাধিকারীরাও তা মনে করতেন না। নারায়ণ মেট্রোপলিটান কলেজকে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট মর্টগেজ দিয়ে দিলে কলকাতার বিশিষ্ট নাগরিকরা “বিদ্যাসাগর ইন্সটিটিউট” গঠন করে কলেজের দায়িত্বভার নেওয়ার জন্য নারায়ণের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। মেট্রোপলিটান কলেজ স্বদেশি আবেগের প্রতীক হয়ে গিয়েছিল, এবং সেই আবেগকে অনুধাবন করেই নারায়ণ মামলার পথে না গিয়ে সমঝোতার রাস্তায় আসেন। বিদ্যাসাগর ইন্সটিটিউট পরিচালনভার গ্রহণ করার পরে কিছু অব্যবস্থা ও আর্থিক সংকট হয়েছিল, ফলে সরকারি সাহায্য নিতে হয়েছিল। [দ্রষ্টব্য : *A Short History of Vidyasagar College*, Chapter V, 1892 - 1896, Appendices VII & VIII.]
- ১৯ সারদারঞ্জন রায় যখন মেট্রোপলিটান কলেজে যোগ দেন তখন সূর্যকুমার অধ্যক্ষ ছিলেন। তবে কলেজের সমস্ত নিয়োগের সিদ্ধান্ত ও ব্যক্তি নির্বাচন করতেন বিদ্যাসাগর স্বয়ং।
- ২০ হাট খোলার শ্রীনাথ রায়ের নিকট শঙ্কর ঘোষ লেনের এক বিঘা এগারো কাঠা জমি এবং তার উপর নির্মায়মাণ তিনতলা বাড়ি মর্টগেজ রেখে ঋণ করেছিলেন বিদ্যাসাগর। সূর্যকুমার মর্টগেজের কাগজে সাক্ষী হিসাবে সাক্ষর করেছিলেন। মর্টগেজ দলিলে বিদ্যাসাগর লিখেছিলেন, “সমস্ত টাকা আদায় না হইলে আমার অপর স্বামী-বেনামী সম্পত্তির দ্বারা বাকী টাকা আদায় লইতে বদ্ধবান হইবেন।” সেরকম কোনও অবস্থার সৃষ্টি হয়নি বরং বিদ্যাসাগর যথাসময়ে সমস্ত টাকা পরিশোধ করেছিলেন। কলেজের আয় থেকেই অবশ্য সমস্ত টাকা শোধ করা হয়েছিল। দ্রষ্টব্য : অমিয়কুমার সামন্ত : *বিদ্যাসাগর*, (পৃ: ২২৮ - ২৩১)।
- ২১ এই দাবির কোনও সমর্থনসূত্র পাওয়া যায়নি। তবে বিদ্যাসাগর গৃহ প্রবেশের সময় কয়েকটি বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। ১৮৮৮ সালের জানুয়ারি মাসে শঙ্কর ঘোষ লেনের বাড়ি তৈরির কাজ শেষ হয়। অধ্যাপক কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য লিখেছেন যে তৎকালীন অধ্যক্ষ সূর্যকুমার অধিকারী লটিসাংহেবকে

এনে জীকজমক করে একটা উৎসব করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বিদ্যাসাগর বলেছিলেন যে ওই উৎসবে যে চার পাঁচশো টাকা খরচ হবে তা দিয়ে যেন গরিব ছাত্রদের বৃত্তির ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। তাই করা হয়েছিল। হিন্দু পেট্রিয়টও লিখেছিল, "There was no ceremonial observed at the opening of the new building." অধ্যাপক এন, এন ঘোষও লিখেছেন, "Vidyasagar could not brook the idea of a tamasha in an educational institution or of any sort of pomp in which he could be the hero."

কলেজের নতুন ভবনের উদ্বোধন উপলক্ষে অন্তত ৮টি বৃত্তি চালু করা হয়েছিল। দ্রষ্টব্য : সুরেশ প্রসাদ নিয়োগী : 'মেট্রোপলিটান ইন্সটিটিউশনের ইতিহাস', *বিদ্যাসাগর কলেজ শতবর্ষ স্মরণিকা* (১৮৭২-১৯৭২) পৃ: ৪০২-৪০৩।

- ২২ বিদ্যাসাগরের আয়ের উৎস ছিল তাঁর বইয়ের কপিরাইট, প্রেস ও সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী। তার মধ্যে ১৮৬৪ সালে ডিপজিটরী ব্রহ্মনাথ মুখোপাধ্যায়কে দান করেন। ১৮৬৯ সালে প্রেসের দ্বিতীয়বার বিক্রি করে দেন। বিধবা বিবাহের জন্য তিনি যে ঋণ করেছিলেন সেই ঋণ শোধের জন্য প্রেস বিক্রি করতে হয়েছিল। কিন্তু তার বইয়ের বিক্রি বেড়েই চলেছিল। সূর্যকুমার রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জায়গায় মেট্রোপলিটানের সুপারিন্টেন্ডেন্ট নিযুক্ত হন। কিন্তু কলেজ বা স্কুল থেকে বিদ্যাসাগরের কোনও আয় ছিল না। সুতরাং সরবুবারা বস্তু মেনে নেওয়া যায় না।

বিদ্যাসাগরের আয় মাসে চার হাজার টাকার বেশি কোনও সময়ে ছিল বলে কেউই উল্লেখ করেনি।

- ২৩ এই ডিগ্রি থেকে জ্ঞান যায়, অনুদান বা বৃত্তি প্রাপকদের বৃত্তি নারায়ণ অনেকদিন বন্ধ করে দিয়েছিলেন। রিসিভারকে হাইকোর্ট সেই সমস্ত বৃত্তির টাকা মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। একত্রিশজন প্রাপকদের মধ্যে সবথেকে বেশি পাওয়া ছিল বীরসিংহ ভগবতী বিদ্যালয়ের, মাসে ১০০ হিসাবে ৪৬০০ টাকা; তারপরই সরবুবালা দেবীর ২৩০০ টাকা। এছাড়াও অন্যান্য আত্মীয়বর্গ এবং সূর্যকুমারের পরিবারের সকলেরই প্রাপ্য ছিল। রিসিভার প্রথমে কিছু টাকা দেওয়ার পর আবার বৃত্তি বন্ধ করে দেয়। [দ্রষ্টব্য : *বিদ্যাসাগর* : অমিয়কুমার সামন্ত, ২০০৪, পৃ ২৩২-২৩৭] সম্পত্তি থেকে আয় কমে গিয়েছিল, কারণ নারায়ণ কয়েকটি কপিরাইট বিক্রি করে দেন ও জনপ্রিয় পাঠ্যপুস্তকগুলির সম্মোপযোগী সংস্কার না করার ফলে, তাদের বিক্রি কমে যায়। সম্পত্তি বেনামি হস্তান্তর করে, যাকে এ্যাডভোকেট জেনারেল বলেছেন collusive transfer, তিনি নিজেকে ঋণগ্রস্ত বলে জানিয়েছেন। যাই হোক হাইকোর্টের নির্দেশ অনুসারে বিদ্যাসাগরের বাদুড়বাগানের বাড়ি মর্টগেজ দিয়ে অর্থসংগ্রহের চেষ্টা করেন রিসিভার। শেষপর্যন্ত বৃত্তিপ্রাপকদের বৃত্তি বন্ধ হয়ে যায়। বাড়ি রিসিভারের হাতে গেলেও, এই বাড়িটি 'বিদ্যাসাগর মন্দির' হিসাবে ঘোষণা করিয়া সেই মন্দিরের সেবাইত হিসাবে নারায়ণ (মৃত্যু ১৯২৩) ও তাঁর পুত্র প্যারিমোহন (মৃত্যু ১৯৩০) এই বাড়িতেই বাস করেছিলেন।

- ২৪ ১৮৯৬-৯৭ খ্রিস্টাব্দে অধ্যাপক গোলাপচন্দ্র শাস্ত্রী (সরকার) ও ব্রহ্মনাথ দে *The History and Documents Relating to a Great Institution* নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে মেট্রোপলিটান যে বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, সর্বসাধারণের সম্পত্তি, একথা প্রমাণ করার প্রয়াস পান। বিদ্যাসাগর ইন্সটিটিউট গঠন ও পরে নারায়ণের সঙ্গে চুক্তি করে মেট্রোপলিটান কলেজ ও স্কুলের পরিচালন ভার গ্রহণকে সরবুবালা চক্রান্ত বলে ইঙ্গিত করেছেন। তবে তাঁর এই বাক্যের প্রথমংশটি বিশেষ ইঙ্গিত পূর্ণ। তিনি লিখছেন, "গোলাপচন্দ্র সরকার প্রমুখ চক্রীণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বারা তাঁর স্কুল-কলেজ সাধারণের সম্পত্তি বলিয়া কোনও দলিল প্রস্তুত করাইয়া উহা সাধারণের হস্তে অর্পণ করাইতে অসমর্থ হইয়া.....।" অর্থাৎ বিদ্যাসাগর মৃত্যুশয্যায় কলেজ পরিচালনার জন্য যে ট্রাস্ট বোর্ড গঠন করতে চেয়েছিলেন এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে তাঁর বাক্যবাহিরা ছিলেন তাঁরই এই ব্যবস্থা বানচাল করতে সক্রিয় ছিলেন। সেইসময় বিদ্যাসাগর শয্যাশায়ী; যন্ত্রণায় প্রায়ই সংজ্ঞাহীন থাকেন। ডাক্তার

- অমূল্য বসু ছাড়াও তাঁর সেবা করে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন নারায়ণ ও সূর্যকুমার। তিনি ট্রাস্ট বোর্ডের সদস্য হিসাবে কয়েকজনের নাম বলেছিলেন। কিন্তু তারপর আর ভা গঠন করতে পারেন নি। সরযুবালায় বাক্যাংশটিতে অন্তত এইটুকু বোঝা যায় যে ‘সাধারণের সম্পত্তি’ হিসাবে গণ্য হতে দেওয়ার বিরুদ্ধে একটি শক্তি সক্রিয় ছিল। বিদ্যাসাগরের তৎকালীন মানসিক ও শারীরিক অবস্থায় তাঁরা যে আত্মজ্ঞানদের অন্তর্গত এরূপ অনুমান অসঙ্গত নয়।
- ২৫ সরযুবালা তাঁর পাণ্ডুলিপিতে শত্ৰুচন্দ্রের “বিদ্যাসাগর কলেজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস” নামের প্রবন্ধটি উদ্ধৃত করেন নি। তবে শত্ৰুচন্দ্র নিজেই তাঁর ডিপিআই আলফ্রেড ব্রফটকে লেখা ২৩ জানুয়ারি, ১৮৯৭ ও ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৭ এর দুটি দীর্ঘ চিঠিতে [Education Department Proceedings nos. B-144-51, File no. 5E/5, August 1899] বিদ্যাসাগর কলেজ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য ও গোলাপচন্দ্র শাস্ত্রীর পুস্তিকার সমালোচনা বিস্তারিত ভাবে জানিয়েছেন। তাঁরও মূল কথা একটাই : মেট্রোপলিটান কলেজ ও স্কুল বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিগত সম্পত্তি।
- ২৬ এই চিঠিতে আছে আশাভঙ্গ জনিত অকরুদ্ধ ক্ষোভ ও হ্রোথের প্রকাশ। এতে উপদেশের কোনও কথাই নাই। এ শুধু সরযুবালায় ক্ষোভ নয়—এ সমস্ত পরিবারের ক্ষোভ বলে মনে হয়।
- ২৭ “পিতার শেষ ইচ্ছা” কী তা খুলে বলেননি সরযুবালা। “অদৃশ্য হওয়া উইল”, “বিদ্যাসাগরের শেষ ইচ্ছা” ইত্যাদি বাক্যবন্ধের সাহায্যে বিদ্যাসাগর তাঁর জামাতাদের, বিশেষ করে সূর্যকুমারকে সম্পত্তির, অন্তত মেট্রোপলিটান কলেজ ও স্কুলের মালিকানা দিতে চেয়েছিলেন এরূপ একটি কিংবদন্তির সৃষ্টি করার অসফল প্রয়াস হয়ত ছিল। কিন্তু বিদ্যাসাগরের জীবনী পাঠকরা জানেন যে বিদ্যাসাগর মৃত্যুব্যায় একটি বিষয়ে বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন তা হল মেট্রোপলিটান কলেজ ও স্কুলের জন্য একটি ট্রাস্ট গঠন করে প্রতিষ্ঠানগুলির ভবিষ্যত নিশ্চিত করা। পরবর্তী অধ্যায়েও সরযুবালা “মাতামহের চরম ইচ্ছা ফলবস্তী হইতে পারিল না” বলে আক্ষেপ করেছেন, কিন্তু সেই চরম ইচ্ছা কী ‘ট্রাস্ট গঠন’, অথবা সমস্ত সম্পত্তির, স্কুল ও কলেজসহ, পুনর্বন্টন, তা স্পষ্ট করে বলেননি।
- ২৮ ৫৭।৫৮ বৎসরের বৃদ্ধা বিনোদিনী একাকী কলকাতায় রিসিভার, পি, কে, রায়চৌধুরী ও নারায়ণের নিকট প্রাপ্য অনুদানের বকেয়া আদায় করার জন্য ঘোরাঘুরি করেছিলেন মাসাধিক কাল। নারায়ণ তখন বাদুড়বাগানের বাড়িতে “বিদ্যাসাগর মন্দিরের” সেবাহিত হিসাবে বাস করেন। বাড়ীর আইনও মালিক হাইকোর্টের রিসিভার পি, কে, রায়চৌধুরী। নারায়ণ বিনোদিনীকে বাড়িতে আশ্রয় দেন নি। এইরূপ অসহায় অবস্থায় বৃদ্ধা বিনোদিনী কলকাতায় মাসাধিক কল কাটিয়েছিলেন। তাঁর কলকাতা-যাত্রা পরিবারের ইচ্ছাতেই ঘটেছিল বলে অনুমান করা অসঙ্গত হবে না।
- ২৯ কিরণচন্দ্র দে (১৮৭১-১৯৪৩) : মেট্রোপলিটান থেকে এফ এ এবং প্রেসিডেন্সী থেকে বি.এ ও এম.এ পাশ করে আই.সি.এস হন। শিলং-এ তার বাড়ি Bookside এ রবীন্দ্রনাথ আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন ১৯১৬ সালে। বাড়িটি বর্তমানে মেঘালয় সরকারের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। তিনি Board of Revenue-এর সদস্য হিসাবে অবসর নেন। দক্ষ অফিসার হিসাবে পরিচিত ছিলেন।
- ৩০ নীলরতন সরকার (১৮৬১-১৯৪৩) : মেট্রোপলিটান থেকে এফ. এ ও বি. এ পাশ করেন। কিছুদিন চাতরা স্কুলে প্রধান শিক্ষকের কাজ করার পর ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে এম বি এবং ১৮৯০ এ এম ডি হন। ১৯১৯-১৯২১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর ছিলেন। তিনি ক্যান্সেল মেডিকেল স্কুলে পড়েছিলেন পরে অরই নামে এই প্রতিষ্ঠান নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজে রূপান্তরিত হয়। প্রখ্যাত শিশু সাহিত্যিক যোগীন্দ্রনাথ সরকার তাঁর ছোটোভাই।
- ৩১ সুরেন্দ্রনাথ সর্বাধিকারী (১৮৬৫-১৯২১) : বৌবাজার মেট্রোপলিটান স্কুলের ছাত্র, পরে প্রেসিডেন্সী কলেজ ও মেডিকেল কলেজে পড়াশুনা করেন। বিখ্যাত সার্জন হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন।
- ৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় : (১৮৬১-১৯৪৪) প্রখ্যাত রসায়নবিদ ও ভারতে রসায়ন শিল্পের প্রতিষ্ঠাতা।

কলকাতার আলবার্ট স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করে স্বদেশীয় কলেজে পড়বার ইচ্ছানুসারে মেট্রোপলিটান কলেজে ভরতি হন এবং এফ. এ পাশ করেন। পরে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি এ পাশ করেন। রসায়ণ শাস্ত্রে মৌলিক গবেষণার জন্য এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি এস সি ডিগ্রি লাভ করেন। পরে প্রেসিডেন্সী কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকপাল অধ্যাপক।

- ৩৩ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৬৮-১৯৮২) : মেট্রোপলিটান স্কুলে শিক্ষা শুরু। প্রেসিডেন্সী বি.এ. এবং ১৮৮৮ তে বি. এল। ১৮৮৯ তে ইংরেজিতে প্রথম স্থান অধিকার করে এম. এ পাশ। ১৮৯৩ সালে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিলাভ করেন। পরবর্তীকালে বিখ্যাত এ্যাটর্নী। তিনি স্বদেশি ও কংগ্রেস আন্দোলনের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন এবং স্বদেশি বঙ্গলক্ষী কটন মিল, ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ইত্যাদি স্থাপনে সহায়তা করেছেন। ধর্মতত্ত্বের উপর অনেক গ্রন্থ রচনা ছাড়া *পছা* ও *ব্রহ্মবিদ্যা* নামক দুটি ধর্মবিষয়ক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। *ব্রহ্মবিদ্যা*র পাঁচটি সংখ্যায় সরযুবালার পাঁচ কিত্তি স্বপ্নদর্শন বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।
- ৩৪ ইনিও হাইকোর্টের এ্যাটর্নী ছিলেন। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যাসাগরের সম্পত্তি রিসিভার নিযুক্ত করার আবেদন জানানো হলে, জ্যোতিষচন্দ্র মিত্রই রিসিভার নিযুক্ত হন। এই সময় সূর্যকুমারের পত্নী বিনোদিনী এবং পুত্রকন্যারা যথাযথ বৃত্তি পেয়েছিলেন। জ্যোতিষচন্দ্র মেট্রোপলিটানের ছাত্র ছিলেন।
- ৩৫ এখানে উল্লেখিত প্রমথনাথ বসু এম. এ. বিখ্যাত ভূতত্ববিদ প্রমথনাথ বসু নন। কারণ ভূতত্ববিদ প্রমথনাথ কৃষ্ণনগর থেকে এন্ট্রান্স ও এফ. এ পাশ করেন এবং সেন্টজেরিয়ার্স-এ বি.এ পড়ার সময় গিলক্রিষ্ট বৃত্তি নিয়ে বিলেত চলে যান। মেট্রোপলিটানের সঙ্গে তাঁর কোনও যোগ ছিল না। “গুরু-শিষ্য সংবাদে” সূর্যকুমারের ছাত্র বা ছাত্রস্থানীয়দেরই উল্লেখ করা হয়েছে।
- ৩৬ পাণ্ডুলিপির বানান অবিকল রাখা হয়েছে।

অমিয়কুমার সামন্ত

“দৈব ও পুরুষকার” কিংবা দৌহিত্রীর দৃষ্টিতে বিদ্যাসাগর*

অমিয়কুমার সামন্ত

প্রাক-কথন

বিদ্যাসাগরের (১৮২০-১৮৯১) তৃতীয়া কন্যা বিনোদিনী দেবীর (১৮৬০-১৯১৮) দ্বিতীয়া কন্যা সরযুবালা দেবীর (সেপ্টেম্বর ১৮৮০-আগস্ট ১৯৪৫) বয়স যখন এগার বৎসর তখন বিদ্যাসাগরের মৃত্যু হয়। তাঁর জন্ম ও পড়াশুনা কলকাতায়। বিদ্যাসাগরের অন্যান্য নাতি-নাতিদের মতো সরযুবালা তাঁকে খুব নিকট থেকে দেখেছেন এবং তাঁর স্নেহ-ভালোবাসাও পেয়েছেন। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর তিন বৎসরের মধ্যে কলকাতায় সরযুবালার বিবাহ হয় বেহালার বিখ্যাত রায়বাড়ির ক্ষিতীশ রায়ের সঙ্গে। কিন্তু মাত্র ২১।২২ বৎসর বয়সে, ১৩০৮ সালে, তিনি বিধবা হন। তাঁর তিন পুত্র-কন্যার মধ্যে কেবলমাত্র কন্যা উষাই জীবিত ছিলেন। বিধবা হওয়ার পর কন্যাকে নিয়ে তিনি মুর্শিদাবাদের বালুচরে পিতৃগৃহে অনেকদিন অবস্থান করেন। ৬৫ বৎসর বয়সে কলকাতায় সরযুবালার জীবনাবসান হয়।

অল্পবয়সে গভীর আঘাত পেয়ে সরযুবালা ঈশ্বরের বিধানে ও দৈবশক্তিতে প্রবল ভাবে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন। তিনি স্বপ্নকে ঈশ্বরের নির্দেশ বলে মনে করতেন এবং বিশ্বাস করতেন যে স্বপ্নদর্শনের মধ্যে ভবিষ্যতের সম্ভাবনা প্রতিভাত হয়। ঈশ্বরে গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তিনি হিন্দুধর্মের আচার-ব্যবহার সম্পর্কেও রক্ষণশীল হয়ে পড়েছিলেন। অবশ্য সূর্যকুমার অধিকারীর পরিবারও বেশ কিছুটা রক্ষণশীল ছিল। সূর্যকুমার নিজেই বলেছেন বিদ্যাসাগরের পরিবারের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে তার পরিবারের সম্ভাব্য আপত্তির কথা। সূর্যকুমারও স্বপ্নদর্শনের তত্ত্বে বিশ্বাস করতেন। সরযুবালা বাংলা ও ইংরেজি লেখাপড়া ভালোই জানতেন। হিন্দুশাস্ত্র ছাড়াও স্বপ্ন, দৈব ও মরণোত্তর জীবন নিয়ে পড়াশুনা ও আলোচনা-আলোচনা করতেন। ১৩২৫ সালে বিনোদিনী দেবীর অকস্মাৎ মৃত্যুতে তিনি শোকে বিহ্বল হয়ে পড়েন। ১৩২৬ সালে তিনি ‘দৈব ও পুরুষকার’ নাম দিয়ে ঈশ্বর, আত্মা, পরমাত্মা, স্বপ্ন ইত্যাদি আধিদৈবিক বিষয়ে লেখা শুরু করেন। এই সমস্ত বিষয়ের সঙ্গে তাঁর পিতামাতার ও মাতামহের কাহিনি, পিতার উত্থান-পতনের কথাও প্রসঙ্গ-ক্রমে এসেছে এবং কোনও কোনও ঘটনার বিস্তারিত বিবরণও দেওয়া হয়েছে। লেখাটি বৎসরাধিক কাল ধরে চলেছিল বলে মনে হয়। পাণ্ডুলিপিটি ছিল নূনাধিক দুই শত পৃষ্ঠার। এটি তিনি কোথাও বই হিসাবে ছাপাবার চেষ্টা করেছিলেন বলে মনে হয় না। তবে স্বপ্ন দর্শন বিষয়েই তিনি ১৩২৭ সালে পূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ ও

* সরযুবালা দেবীর পাণ্ডুলিপির শিরোনাম “দৈব ও পুরুষকার”। রচনার মূল বক্তব্যের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে আমরা দ্বিতীয় শিরোনাম যোগ করেছি।

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন সম্পাদিত ব্রহ্মবিদ্যা নামক মাসিক পত্রিকার পাঁচটি সংখ্যায় পাঁচটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। প্রবন্ধগুলির নাম ছিল “বিচিত্র স্বপ্নদর্শন”। তিনি বেশ কিছু কবিতাও লিখেছিলেন, কিন্তু সেগুলি প্রকাশিত হয়নি। “বিচিত্র স্বপ্নদর্শন” প্রবন্ধগুলির বেশ কিছু অংশ “দৈব ও পুরুষকার” থেকে নেওয়া। সরযুবারা মৃত্যুর কিছুদিন পরে তাঁর কন্যা উষা চন্দ্রস্বর্গীর বাড়ি থেকে জীর্ণ, কীট-দষ্ট পাণ্ডুলিপিটি উদ্ধার করেন তাঁর ভ্রাতৃপুত্র সন্তোষকুমার অধিকারী। ততদিনে পাণ্ডুলিপিটির বেশ কিছু পাতা নষ্ট হয়ে গেছে, অনেকগুলির গরিষ্ঠ অংশ কীটদষ্ট। নষ্ট না হওয়া অংশটিকে সাজিয়ে নেওয়ার পর দেখা গেল যে সেখানে সূর্যকুমার, বিদ্যাসাগর, নারায়ণ, মেট্রোপলিটান কলেজ ইত্যাদি সম্পর্কে বেশ কিছু নতুন তথ্য আছে, আর আছে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে তীব্র সমালোচনা। সন্তোষকুমারের সম্মতি নিয়েই, আধির্দৈবিক বিষয়গুলি বাদ দিয়ে প্রাসঙ্গিক ঘটনা ও সরযুবারা মন্তব্যগুলি এখানে ছাপান হল। লক্ষ্যণীয়, সরযুবারা গদ্যের হাত বেশ সাবলীল।

যে তথ্যগুলি পাওয়া গেছে তার মধ্যে কিছু কিছু তথ্য বা অংশ বিশেষ অন্যসূত্রের তথ্য দ্বারা সমর্থিত। কিন্তু তথ্য ছাড়া আমাদের যা আশ্চর্য করে তা বিদ্যাসাগর সম্পর্কে তীব্র ক্ষোভের প্রকাশ। বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে বহুদিন লালিত এই ক্ষোভ তীব্র আকারে কলম থেকে নির্গত হয়েছে। এই প্রেক্ষিতেই প্রশ্ন উঠবে, এতখানি ক্ষোভ-সম্পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিতে কি নির্ভুল তথ্যের উপস্থাপনা সম্ভব? আর রচনাতে নির্ভুল, অন্তত আংশিক নির্ভুল, তথ্যই যদি না পাওয়া যায় তবে সেই রচনার, পুরাতন হলেও, ঐতিহাসিক মূল্য কিছুই নেই। এই প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয় যে সরযুবারা যে সমস্ত ঘটনা বা সংঘাতের উল্লেখ করেছেন তার সমর্থন, কখনও আংশিক কখনও বা সম্পূর্ণ, অন্য সূত্র থেকেও পাওয়া যায়। অনেক সময় তাঁর বিবরণে কিছু অতিরঞ্জন অবশ্যই আছে; কিন্তু কেন্দ্রীয় ঘটনাটির সত্যতা সম্পর্কে কোনও সন্দেহ নাই। সরযুবারা বেশ কয়েকটি ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ পারিবারিক কথোপকথন থেকে কিংবা পরিবারের মধ্যে প্রচলিত কাহিনি থেকে সংগ্রহ করেছেন। পারিবারিক কাহিনি তৈরি হয় কতকগুলি বিশিষ্ট চরিত্র কিংবা পরিবারের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটনাকে কেন্দ্র করে। সূর্যকুমারের পরিবারে বিদ্যাসাগর ও মেট্রোপলিটান নিয়ে অনেক কাহিনি গড়ে উঠেছিল। এই সমস্ত কাহিনিতে কিছু অতিশয়োক্তি থাকতেই পারে তবে সাধারণভাবে এগুলি বাস্তব ভিত্তিক। সরযুবারা নিজেই কিছু ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী এবং অনেক ঘটনার বিবরণ তিনি পিতা-মাতার নিকট পেয়েছিলেন। সুতরাং এই সমস্ত ঘটনার উপস্থাপনায় ও বিদ্যাসাগরের মূল্যায়নে শুধু সরযুবারার দৃষ্টিভঙ্গিই প্রতিফলিত নয়, সমস্ত পরিবারের চিন্তা ভাবনাও ধরা পড়েছে। সরযুবারা অবশ্য মাঝে মাঝে অতিপ্রাকৃতের প্রভাবের অবতারণা করলেও ঘটনার মূল বিষয় থেকে কখনও বিশেষ সরে যান নি। তাই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তথ্যের সত্যতাকে অগ্রাহ্য করা যায় না। তাছাড়া, দৌহিত্রীর ক্ষোভের রূপ প্রকাশই তো একটি তথ্য যা বিদ্যাসাগরের পারিবারিক জীবনের একটি ছবি প্রকাশ করে।

বিদ্যাসাগরের প্রতি যে ক্ষোভ প্রকাশিত হয়েছে তার উৎস ছিল পরিবারের আর্থিক অনটন। অপেক্ষাকৃত উচ্চবিস্ত বিদ্যাসাগরের (সে যুগে কয়েক বছর ধরে তাঁর মাসিক আয় ছিল তিন থেকে চার হাজার টাকা) ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনদের আর্থিক প্রত্যাশা তো ছিলই, আরও ছিল বিভিন্নভাবে প্রাপ্তির আশা। আর এক দৌহিত্র সুরেশ সমাজপতি বিলেতে ব্যারিষ্টারি পড়তে

চেয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর রাজি না হওয়াতে তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন এবং তীব্রভাবে সেই ক্ষোভ প্রকাশও করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর বেশ কিছুদিন পরে সমাজপতি অনুতপ্ত হয়ে লিখেছিলেন, ‘আজ দিব্যেন্দুর (বঙ্কিমচন্দ্রের নাতি) দাদা ও আমার দাদামশায়ের কথা মনে পড়িতেছে। তাঁহাদের কত যত্ন, কত চেষ্টা ভ্রমে ঘৃতাঘতি হইয়াছে। কত আশা বিফল করিয়াছি।’ (বঙ্কিম প্রসঙ্গ, সুরেশ সমাজপতি সংকলিত ; পৃ: ৩৪১-৩৪২)।

সরযুবালা দাবি করেছেন যে বিনোদিনীর বিবাহের সময় কন্যা-জামাতার পরিবার প্রতিপালনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। এই দাবির কোনও নিরপেক্ষ সমর্থন নেই।

এই দাবির যথার্থতা বিচারের মধ্যে না গিয়েও আনুপূর্বিক ঘটনাবলির প্রতি নজর দিলে দেখা যায় সে বিদ্যাসাগর মৃত্যু পর্যন্ত নিজের অনেক পরিজনদের তাঁর বিপুল প্রভাব ও আর্থিক সঙ্গতির ছত্রছায়ায় প্রতিপালন করেছিলেন। ১৮৮৮ সালে অধ্যক্ষপদ থেকে অপসারিত হওয়ার পর তিন বৎসরের অধিককাল তিনি কলকাতায় ছিলেন। এই সময় তিনি ছিলেন কর্মহীন। বিদ্যাসাগরই ছিলেন সূর্যকুমারের পরিবারের অবলম্বন। বিদ্যাসাগর তাঁর উইলে কন্যাদের জন্য অনুদান বা বৃত্তির ব্যবস্থা করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর মামলা-মোকাদ্দমা সম্বন্ধে তাঁর কন্যারা অনুদানের কিছু অংশ অবশ্যই পেয়েছিলেন। তাছাড়া নারায়ণের সঙ্গে চুক্তিমতো অন্যান্য ভগিনীদিগের সঙ্গে আরও কিছু সম্পত্তি পেয়েছিলেন। একথা সরযুবালাও স্বীকার করেছেন। সূর্যকুমার কলকাতায় আর কোনও চাকুরি করেন নি ; তবে সংসার প্রতিপালনের জন্য জিয়াগঞ্জের জমিদার শ্রীপৎ সিংহের জমিদারি সেরেস্তায় চাকুরি নেন কলকাতা ছেড়ে স্বগ্রামে ফিরে যাওয়ার পর।

উইল এবং হাইকোর্টের আদেশ অনুসারে প্রাপ্য অনুদান সমস্তটা পাননি সূর্যকুমারের সন্তান-সন্ততিরা। সম্পত্তি হস্তান্তরিত হওয়ায় এবং অবশিষ্ট সম্পত্তির আয় কমে যাওয়াতে রিসিভারের পক্ষে আদালতের আদেশ মতো অনুদান দেওয়া সম্ভব হয়নি। সূর্যকুমারের পদচ্যুতিতে পরিবারের মধ্যে যে ক্ষোভ জমা হয়েছিল, তা মাসিক অনুদান বন্ধ হয়ে যাওয়াতে এবং সংসারের অনটন বৃদ্ধি পাওয়াতে আরও তীব্র হয়ে উঠেছিল। সেই তীব্র ক্ষোভের প্রকাশ ঘটেছে সরযুবালার ভাষা ব্যবহারের মধ্যে। সংসারের মধ্যে এই ক্ষোভের ফলশ্রুতিতেই ১৩২৫ সালের ভাদ্রমাসে বকেয়া অনুদান আদায়ের জন্য ৫৭।৫৮ বৎসরের বৃদ্ধা বিনোদিনী দেবীকে একাকী বালুচর থেকে কলকাতায় এসে প্রায় মাসাধিক কাল ধরে রিসিভার পি. কে. রায়চৌধুরী ও নারায়ণের নিকট পুনঃপুনঃ যাতায়াত করতে হয়েছিল। নারায়ণ তখন “বিদ্যাসাগর মন্দিরের” সেবাইত পরিচয়ে বাদুড় বাগানের বাড়িতে বাস করছিলেন। বাড়ির মালিক ছিলেন রিসিভার পি. কে. রায়চৌধুরী। নারায়ণ বিনোদিনীকে বাড়িতে থাকতে দেন নি। এই অবস্থায় বৃদ্ধা কীভাবে কলকাতায় ছিলেন তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। বালুচরে ফিরে যাওয়ার পর গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ৪ঠা কার্তিক (১৩২৫) তাঁর মৃত্যু হয়। ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যু হয় সূর্যকুমারের। মাতার মৃত্যুর পর সরযুবালা প্রধানত কলকাতাতে বাস করতেন। ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে কন্যার বাড়িতেই তাঁর মৃত্যু হয়।

পরিষৎ-সংবাদ

সভা - পুরস্কার - স্মারক বক্তৃতা

১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪১২ রবিবার ২৯ মে ২০০৫
পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি সভাঘরে
বর্ষপরিচয়-এর দেড়শো বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে
বাংলা আকাদেমি ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের
যৌথ উদ্যোগে একটি মনোজ্ঞ সভা অনুষ্ঠিত
হয়। সভার সূচনায় স্বাগত ভাষণ দেন পরিষদের
সম্পাদক অধ্যাপক রমাকান্ত চক্রবর্তী। প্রথমে
অধ্যাপক অশিস খাস্তগীর তাঁর ভাষণে বাংলা
বর্ষশিকার রচনা ও প্রবর্তনার ইতিহাস এবং তার
প্রসার বিষয়ে পরিসংখ্যান সহ তথ্যপূর্ণ বক্তব্য
রাখেন। দ্বিতীয় বক্তা শ্রীঅমিতাভ মুখোপাধ্যায়
বিদ্যাসাগরের বর্ষপরিচয় সম্পর্কে বক্তব্য পেশ
করেন। এরপর অধ্যাপক পবিত্র সরকার
বিদ্যাসাগরের বর্ষপরিচয় ও পরবর্তী ভাষা পাঠ
যা প্রকাশিত হয়েছে তার তুলনামূলক আলোচনা
করেন। সভার সভাপতি শ্রীনিরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
আলোচ্য তিনটি ভাষণের সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন করে
বর্ষপরিচয় প্রকাশের সমসাময়িক অবস্থান বিষয়ে
নিজের অভিমত জানান। সভার শেষে ধন্যবাদ
জ্ঞাপন করেন বাংলা আকাদেমির প্রকাশন
আধিকারিক শ্রীউৎপল ঝা।

১১ আষাঢ় ১৪১২ রবিবার ২৬ জুন ২০০৫
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ পাঠক সমাজের উদ্যোগে
পরিষদ সভাকক্ষে, পরিষদের সম্পাদক ও
এশিয়াটিক সোসাইটির সদ্য মনোনীত সম্পাদক
প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অধ্যাপক রমাকান্ত
চক্রবর্তীকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় একটি
মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে। সভায় সভাপতিত্ব করেন
পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির সচিব সনৎকুমার
চট্টোপাধ্যায়, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত

ছিলেন শ্রীঅতীশ দাশগুপ্ত। এই অনুষ্ঠান
উপলক্ষ্যে পাঠক সমাজের শ্রদ্ধাঞ্জলি হিসেবে
অধ্যাপক চক্রবর্তী রচিত ‘আমার কথা’ শীর্ষক
একটি সুন্দর পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে, সেটি
তিনি পাঠ করেছিলেন। এরকম প্রাঞ্জল ভাষায়
রচিত অনন্য সাধারণ আত্মকথার পাঠ এই
অনুষ্ঠানের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে।

৮ শ্রাবণ ১৪১২ সোমবার ২৫ জুলাই ২০০৫
পরিষদের ১১২-তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপিত
হল পরিষদ ভবনে। সভায় সভাপতিত্ব করেন
পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক পবিত্র সরকার।
প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন
অধ্যাপক বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য। সভায় অর্চনা চৌধুরী
স্মৃতি পুরস্কার ও লীলা চন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার প্রদান
করা হয় যথাক্রমে প্রখ্যাত প্রাবন্ধিক অধ্যাপক
অরবিন্দ পোদ্দার এবং কথা সাহিত্যিক অনিতা
অগ্নিহোত্রীকে। পুরস্কার গ্রহণ করে অভিভূত
উভয় প্রাপক তাঁদের কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করেন।
এরপর একালের প্রধান নাট্যকার-নির্দেশক-
অভিনেতা মনোজ মিত্র প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর ভাষণ
দেন। তাঁর নিজের লেখা নাটকের চলচ্চিত্র ও
মঞ্চাভিনয়ের প্রসঙ্গে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী
অভিজ্ঞতার কথা জানান। সভার শেষে সংগীত
পরিবেশন করেন ড. রঞ্জিত চক্রবর্তী।

৮ আশ্বিন ১৪১২ রবিবার ২৫ সেপ্টেম্বর
২০০৫ বিকেল সাড়ে পাঁচটায় পরিষদ সভা
কক্ষে রামকমল স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন
বাংলাদেশের সুবিখ্যাত গবেষক অধ্যাপক আবুল
আহসান চৌধুরী। তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল
লালন ফকির ও তাঁর গান। সভার শেষে সংগীত

পরিবেশন করেন একালের জনপ্রিয় লোক সংগীত শিল্পী শ্রীতপন কর। সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সম্পাদক অধ্যাপক রমাকান্ত চক্রবর্তী।

১৭ অগ্রহায়ণ ১৪১২ শনিবার ৩ ডিসেম্বর ২০০৫ সন্ধ্যা ছ-টায় পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি সভা ঘরে বাংলা আকাদেমি ও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ পাঠক সমাজের যৌথ উদ্যোগে পঞ্চম বর্ষীয় মীর মশাররফ হোসেন স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন অধ্যাপক অশু-কুমার সিকদার। তাঁর বিষয় ‘দেশ ভাগ ও মুক্তির পথে মেয়েরা’। মীর মশাররফ হোসেন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক লায়েক আলি খান। সভায় সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির সভাপতি শ্রীনিরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

প্রদর্শনী

১ শ্রাবণ ১৪১২ সোমবার ১৮ জুলাই ২০০৫ বিকেল পাঁচটায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ব্যবস্থাপনায় পুনর্গঠিত চিত্রশালায় কবি বিষ্ণু দে-র সংগ্রহ নিয়ে তাঁর পরিবারের সহায়তার একটি চিত্তাকর্ষক প্রদর্শনী আয়োজিত হয়। কবির স্বকণ্ঠে আবৃত্তি এবং জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের কণ্ঠে বিষ্ণু দে-র কবিতার গীতিরূপের রেকর্ড বাজিয়ে একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। দর্শকশ্রোতা ভরতি সভাকক্ষে, নিছক বক্তৃতাহীন অনুষ্ঠানটি একটি ভাবগন্তীর পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। বিষ্ণু দে-র আঁকা ছাব্বিশ-সাতাশটি ছবি, তাঁর সংগৃহীত লোকশিল্পের অমূল্য সব নিদর্শন (এই সংগ্রহটি জিষ্ণু দে পরিষৎ-সংগ্রহশালায় দান করেছেন), তাঁর কবিতার পাণ্ডুলিপি, যামিনী রায় ও জন আরউইনের চিঠি প্রদর্শিত হয়। যৌবন থেকে পরিণত বয়স পর্যন্ত প্রায় তিরিশটি আলোক চিত্র এই প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছিল যেগুলি তুলেছিলেন

জন আরউইন, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ভাইডু সান্যাল, রজত মিত্র, মহেন্দ্রকুমার, মোনা চৌধুরী, সুনীল জানা, ছিল ই এম ফরস্টার-এর তোলা বিষ্ণু দে-র কলকাতার বাড়ির ছবিও। নীরদ মজুমদার ও অমিয় রায়ের আঁকা কবির দুটি প্রতিকৃতি, সত্যজিৎ রায়ের আঁকা রেখা চিত্র, প্রাণকৃষ্ণ পাল ও নীরদ মজুমদারের আঁকা রিখিয়ার নিসর্গ চিত্রও এই প্রদর্শনীর গুরুত্ব বাড়িয়েছিল। বিষ্ণু দে-র লেখা বই, এবং তাঁকে নিয়ে লেখা গবেষণা গ্রন্থও প্রদর্শিত হয়।

এই প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে চিত্রশালাধ্যক্ষ শ্রীহরেন্দ্রজিৎ চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে একটি ক্ষীণকায় কিন্তু পরিচ্ছন্ন সুন্দর সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। কবির সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি শিল্পভাবনা ও তাঁর লেখা শিল্প বিষয়ক প্রবন্ধের একটি নির্বাচিত সূচি প্রস্তুত করেছেন শ্রীঅরুণ সেন। নীরদ মজুমদার, শানু লাহিড়ীর রচনাংশ ছাড়া শ্রীশঙ্ক ঘোষ রচিত ‘যেখানে সমুদ্র গোটা দেশ আর কাল’ এই সংকলনকে স্বাক্ষর করেছে। ৩১ জুলাই পর্যন্ত এই প্রদর্শনী বিষ্ণু দে-র বহু অনুরাগী ও শিল্পদপ্রমী মানুষ এসে দেখেছেন।

২৮ শ্রাবণ ১৪১২ রবিবার ১৪ আগস্ট ২০০৫ ‘বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের শতবর্ষ’ শীর্ষক একটি আলোচনাচক্র ও প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন মাননীয় উচ্চশিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক সত্যসাধন চক্রবর্তী। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য লেখাগারের অধিকর্তা অধ্যাপক বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়। আলোচনাচক্রে প্রবন্ধ পাঠ করেন অধ্যাপক রমাকান্ত চক্রবর্তী অধ্যাপক অনিন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনিতাপ্রিয় ঘোষ, অধ্যাপক সুদীপ বসু, এবং শ্রীসন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। সভার শেষে সংগীত পরিবেশন করেন শ্রীস্বপন সোম ও শ্রীমতী দেবারতি সোম।

রাজ্য লেখাগারে সংরক্ষিত নানা ধরনের

মূল্যবান নথির প্রতিলিপির সঙ্গে যাত্রা-থিয়েটারের বিরুদ্ধে ঘোষিত সরকারি নিবেদনস্বরূপ বৈশ্য কয়েকটি বিজ্ঞপ্তির প্রতিলিপি এই প্রদর্শনীতে স্থান পায়। বঙ্গভঙ্গ-প্রতিরোধ আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বাড়িঘর, প্রতিষ্ঠান ও নানা ব্যক্তির নতুন-পুরোনো অর্ধশতাব্দিক আলোকচিত্র, পরিষৎ-সংগ্রহ থেকে বঙ্গভঙ্গ-সংক্রান্ত বহু বই ও পত্রপত্রিকাও এই সঙ্গে প্রদর্শিত হয়। পুলিশ বিভাগের সৌজন্যে প্রথম কয়েকদিন বিপ্লবীদের ব্যবহৃত কিছু আগ্নেয়াস্ত্র এই উপলক্ষ্যে উৎসাহী দর্শকরা দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন।

নবগঠিত প্রদর্শনশালায় এই দুটি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়।

পুথিশালা সংগ্রহ

পুথিশালাধ্যক্ষ অধ্যাপক সুবিমল মিশ্রের আগ্রহ ও উদ্যোগের পরিণতিতে পুথি বিষয়ক কাজকর্ম নতুন উৎসাহে সঞ্চালিত হয়েছে। প্রয়াত প্রাক্তন পুথিশালাধ্যক্ষ ও প্রাক্তন সভাপতি অধ্যাপক বিজিতকুমার দত্ত প্রদত্ত পুথিগুলির একটি বিবরণীস্বরূপ তালিকা প্রস্তুতির কাজ শুরু হয়েছে। পরিষদের প্রাক্তন পুথিশালাধ্যক্ষ প্রয়াত পঞ্চানন চক্রবর্তী সংগৃহীত বৈশ্য কিছু পুথি, কার্যনির্বাহী সদস্য শ্রীঅমিতাভ মুখোপাধ্যায় পুথিশালায় দান করেছেন। কথকথা বিষয়ক দুটি মূল্যবান পুথি সম্প্রতি সংগৃহীত হয়েছে, তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে দিয়েছেন চন্দননগরের শ্রীমতী ক্ষান্তিলতা দেবী। অধ্যাপক সুবিমল মিশ্র, অধ্যাপক স্বপন বসুও পরিষদের সদস্য শ্রীনির্মাল্য কোলের সহযোগিতায় এগুলি পরিষদের পুথিশালায় স্থান পেয়েছে।

চিত্রশালা সংগ্রহ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ চিত্রশালার পুনর্গঠন পর্বে অনেকেই ব্যক্তিগত সংগ্রহ প্রদান করে সংগ্রহের

গুরুত্ব ও গবেষকদের কাছে তার প্রয়োজনীয়তা বাড়িয়ে তুলেছেন। ২৯মে ২০০৫ কবি বিষ্ণু দে-র পুত্র-পুত্রবধূ শ্রীজিৎ দে ও শ্রীমতী মীরা দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালায় লোকশিল্পের অমূল্য সংগ্রহ দান করেছেন। পুতুল, তৈজসপত্র, চিত্রিত সরা ইত্যাদি মিলিয়ে এই সংগ্রহের নিদর্শন সংখ্যা ১৪২। ৩১মে ২০০৫ এবং পরে দু'দফায় শ্রীঅপূর্বকুমার মুখোপাধ্যায় মহামহোপাধ্যায় নীলমণি ন্যায়ালংকার সম্পর্কিত বহু চিঠিপত্র, মূল নথি এবং এর আগে সংস্কৃত কলেজ ও এশিয়াটিক সোসাইটিতে প্রদত্ত চিঠিপত্রের ফটোকপি পরিষৎ-সংগ্রহে দিয়েছেন। ২১সেপ্টেম্বর ২০০৫ শ্রীধীরেশ সেন দিয়েছেন কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্যের দিনলিপি 'স্মরণী ও সরণি'-র (২ ডিসেম্বর ১৯৪৫-২৩ জুন ১৯৫০) পাণ্ডুলিপি। ২ অক্টোবর ২০০৫ শ্রীঅলোক বন্দ্যোপাধ্যায় দিয়েছেন শিক্ষাবিদ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৩৩টি পাণ্ডুলিপি, ৩৭টি ডায়েরি, ছবি ও পাণ্ডুলিপির কয়েকটি ফাইল ও ৪১টি বই। একই দিনে শ্রীমতী রেখা সান্যাল দিয়েছেন পারিবারিক তৈজসপত্রের সংগ্রহ, কাঠের কারুকার্যখচিত একটি নারকেল কোরানি এবং লখনউয়ের কয়েকটি দুর্লভ পুতুল। ৭ অক্টোবর ২০০৫ শ্রীমতী অসীমা গোস্বামীও পারিবারিক তৈজসপত্রের বড়ো সংগ্রহ, পুরোনো পুতুল ইত্যাদি দান করেছেন। নৃত্ত্ববিদ ও সমাজতাত্ত্বিক নির্মলকুমার বসুর বই, পাণ্ডুলিপি, বিভিন্ন বিষয়ের ফাইল, মানচিত্র, ব্যক্তিগত ব্যবহারের জিনিসপত্র ইত্যাদি দান করেছেন। নৃত্ত্ববিদ ও সমাজতাত্ত্বিক নির্মলকুমার বসুর বই, পাণ্ডুলিপি, বিভিন্ন বিষয়ের ফাইল, মানচিত্র, ব্যক্তিগত ব্যবহারের জিনিসপত্র ইত্যাদি পরিষৎ-সংগ্রহে দিতে সম্মত হয়েছেন শ্রীরবীন্দ্রনাথ বসু। কবিশেখর কালিদাস রায়ের চিঠিপত্র ও পাণ্ডুলিপিগুলিও পরিষৎ-সংগ্রহে সংরক্ষণের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন কবিরঞ্জন ও কবিকঙ্কণ রায়। ইতিমধ্যে যে সংগ্রহগুলি হাতে এসেছে,

সেগুলি নথিভুক্ত করে তালিকা তৈরির কাজ শুরু হয়েছে।

সাধারণ বার্ষিক সভা

৪ অগ্রহায়ণ ১৪১২ রবিবার ২০ নভেম্বর ২০০৫ পরিষদ ভবনে ১১১তম বর্ষের সাধারণ বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক পবিত্র সরকার। সম্পাদক অধ্যাপক রমাকান্ত চক্রবর্তী তাঁর বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠ করেন। সভায় কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক অশোক রায় চৌধুরী ১৪১২ বঙ্গাব্দের পরীক্ষিত আয় ব্যয়ের বিবরণ এবং ১৪১৩ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয় ব্যয়ের বিবরণ পেশ করেন। নিম্নলিখিত কর্মাধ্যক্ষ ও কার্যনির্বাহী সদস্যের নাম সভায় অনুমোদিত হয় :

সভাপতি

শ্রীপবিত্র সরকার

সহ সভাপতি

শ্রীহিমাংশুশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীঅলক রায় শ্রীকুমদকুমার ভট্টাচার্য
শ্রীনির্মলকুমার নাগ শ্রীবন্দিরাম চক্রবর্তী
শ্রীগৌতম ভদ্র শ্রীসনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়
শ্রীকল্যাণকুমার রায়

সম্পাদক

শ্রীরমাকান্ত চক্রবর্তী

সহ সম্পাদক

শ্রীঅলোক দাস শ্রীঅভিজিৎ রায়

কোষাধ্যক্ষ

শ্রীঅশোককুমার রায় চৌধুরী

প্রকাশনাধ্যক্ষ

শ্রীপ্রভাতকুমার দাস

গ্রন্থশালাধ্যক্ষ

শ্রীঅমিয়কুমার সামন্ত

পুথিশালাধ্যক্ষ

শ্রীসুবিনয় মিশ্র

চিত্রশালাধ্যক্ষ

শ্রীইন্দ্রজিৎ চৌধুরী

শাখা পরিষদ

শ্রীঅভয় চরণ দে

পৌরপ্রতিনিধি

শ্রীদীপু সাহা

আমন্ত্রিত সদস্য

শ্রীকানাইচন্দ্র পাল

সরকারি প্রতিনিধি

শ্রীশঙ্কু ঘোষ

শ্রীসনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়

সদস্য

শ্রীমতী সরস্বতী মিশ্র

শ্রীমতী বাসন্তীরানি দত্ত চৌধুরী

শ্রীকল্যাণবন্ধু মিত্র শ্রীগৌতম বসু মল্লিক

শ্রীতাপস মুখোপাধ্যায় শ্রীদেবাশিস বসু

শ্রীবিভূতিভূষণ বিশ্বাস শ্রীমতী রুমা ঘোষ

শ্রীসুনীল দাস শ্রীঅমিতাভ মুখোপাধ্যায়

শ্রীসুমন ভট্টাচার্য শ্রীগৌরকুমার মৌলিক

শ্রীরমেন সর শ্রীশেখর ভৌমিক

শ্রীআশিস খাঙ্গারী শ্রীবিশ্বজিৎ রায়

শ্রীউৎপল বা

শ্রীমতী অনিন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীশুভাশিস চট্টোপাধ্যায় শ্রীসুদীপ বসু

প্রকাশন

সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকার ১১১ বর্ষের ৩য়-৪র্থ সংখ্যা (কার্তিক-চৈত্র ১৪১১) প্রকাশিত হয়েছে গত ১৪১২-র বৈশাখে। চিঠিপত্র ও

পত্রিকার সূচি ছাড়াও দশটি মূল্যবান নিবন্ধ সংখ্যাটিকে সমৃদ্ধ করেছে। সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার অন্তর্ভুক্ত ভবতোষ দত্ত রচিত চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর জীবনী প্রকাশিত হয়েছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত বৌদ্ধগান ও দৌহা নতুন করে মুদ্রিত হচ্ছে অধ্যাপক পবিত্র সরকারের ভূমিকা সম্বলিত হয়ে। সাবিত্রী রায়, বুদ্ধদেব বসু, আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় শীর্ষক জীবনীগুলি শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।

নবপরিকল্পিত ও প্রতীক্ষিত দুস্ত্রাপ্য গ্রন্থমালার প্রথম খণ্ডটি ১১২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে পরিষদের সভাপতি পবিত্র সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেন স্বপন বসুর সম্পাদনায় উনিশ শতকের জ্ঞানশিক্ষা নামে। এই সংকলনে গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের জ্ঞানশিক্ষা বিধায়ক, তারশঙ্কর তর্করত্নের ভারতবর্ষীয় জ্ঞানগণের বিদ্যাশিক্ষা ; দ্বারকানাথ রায়ের জ্ঞানশিক্ষা-বিধান সংকলিত হয়েছে।

স্মরণ

২৬ কার্তিক ১৪১২ রবিবার ১৩ নভেম্বর ২০০৫ সাড়ে পাঁচটায় পরিষদ ভবনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, সাহিত্য পরিষৎ কর্মী সংঘ, সাহিত্য পরিষৎ পাঠক সমাজ-এর সম্মিলিত উদ্যোগে সদ্য প্রয়াত পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি ও প্রবীণ নাট্যবিদ অধ্যাপক অজিতকুমার ঘোষের স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক পবিত্র সরকার। পরিষদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে প্রথমে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন পরিষদের সম্পাদক অধ্যাপক রমাকান্ত চক্রবর্তী। এরপর তাঁর শিক্ষকতা, গবেষণা, বিশেষ করে নাটক বিষয়ে তাঁর গভীর আগ্রহ পরিষদ কর্মকাণ্ডে তাঁর ভূমিকা গ্রহণ, পারিবারিক পরিমণ্ডলে তাঁর পরিচয় বিষয়ে স্মৃতিচারণ ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন শ্রীপ্রভাতকুমার দাস, অধ্যাপক অমিত ঘোষ, অধ্যাপক দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক অশোক রায়চৌধুরী, শ্রীমতী অরুণা চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅলোক দাস, শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ মাজী।

প্র.

১৪১১ বঙ্গাব্দের উপহৃত পুস্তক তালিকা

অজয়কুমার নন্দী কালিন্দী হাউসিং এস্টেট

১ কর্মযোগী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র—অজয়কুমার নন্দী

অজিতকুমার কাণ্ডার রত্নেশ্বরবাটী, মেদিনীপুর (পশ্চিম)

১ রত্নেশ্বরবাটী মা আমার—অজিতকুমার কাণ্ডার

অজিতকুমার সিংহ রায় ২৮১ জি. টি. রোড, কোতরং, হিন্দমোটর, হুগলী

১ ছক : অসি রায়ের নির্বাচিত ছড়া ও কবিতা সংকলন—অসি রায়

অঞ্জনা রেজ ভট্টাচার্য ১০৬/১৩ ব্যাচারাম চ্যাটার্জী রোড বেহালা। কলকাতা-৩৪

১ মেঘ ভেজা রোদুর—অঞ্জনা রেজ ভট্টাচার্য

অনিরুদ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬২ ডি. এম. এন. সাহা রোড, শ্যামলা এপার্টমেন্ট। কলকাতা-৭৪

১ মিছিলের শেষ লোক—অনিরুদ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায়

অনুপ মিত্র (স্পেশাল অফিসার) কলকাতা পুরশ্রী, ১, হগ স্ট্রিট, হগ বিল্ডিংস, কলকাতা-৮৭

১ কলকাতা পুরশ্রী : ৬ ষষ্ঠ বর্ষ, ২৮মে ১৯৮৩-১৬ জুন ১৯৮৪

২ " ৮ম " ১২ এপ্রিল ১৯৮৬- জুন ১৯৮৭

৩ " ১০ম " ১১ এপ্রিল ১৯৮৭-১৩ ফেব্রু ১৯৮৮

৪ " ১২শ " ১৫ এপ্রিল ১৯৮৯-২৪ মার্চ ১৯৯০

৫ " ১৩শ " ২১ এপ্রিল ১৯৯০-১৬ মার্চ ১৯৯১

৬ " ১৪শ " ২০ এপ্রিল ১৯৯১-২৯ ফেব্রু ১৯৯২

৭ " ১৫শ " ১১ এপ্রিল ১৯৯২-১৩ মার্চ ১৯৯৩

৮ " ১৬শ " ২৪ এপ্রিল ১৯৯৩-১৩ নভে ১৯৯৩

৯ " ১৭শ " ২৪ সেপ্টে ১৯৯৪-১৫ মার্চ ১৯৯৭

১০ " ১৮শ " ১৯ এপ্রিল ১৯৯৭-২৩ মার্চ ১৯৯৮

১১ " ১৯শ " ২৬ এপ্রিল ২০০০- মার্চ ২০০১

১২ " ২০শ " এপ্রিল ২০০১- মার্চ ২০০২

১৩ " ২১শ " এপ্রিল ২০০২- মার্চ ২০০৩

অন্তরা চৌধুরী প্রযত্নে : পুস্তক বিপণি, ২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কোলকাতা-৯

১ সাহিত্য অধীক্ষা—অন্তরা চৌধুরী

অমলেন্দু ভট্টাচার্য লছমীধর রোড, তারাপুর, শিলচর-৭৮৮ ০০৩, কাছাড়, আসাম।

১ রাখামাধব দত্তের মনসা পাঁচালি—অমলেন্দু ভট্টাচার্য সম্পাদিত।

অমিতাভ চক্রবর্তী ১২ ডি. জগবল্লু লেন, কলকাতা-১২

১ মধন—অমিতাভ চক্রবর্তী

২১২/সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১২ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা

অপর্ণা দাশ প্রযত্নে : পুস্তক বিপণি, ২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কোলকাতা-৯

১ অতিপ্রাকৃতের উদ্ভাস : বাংলা কথাসাহিত্য—অপর্ণা দাশ

অপূর্ব কুণ্ড নরহরি মুখার্জি লেন, উকিলপাড়া, কৃষ্ণনগর, নদীয়া, সূচক ৭৪১১০১

১ নাট্যসাধক গিরিশচন্দ্র—অপূর্ব কুণ্ড, সম্পাদিত

অপূর্ব সাহা ৮৯৫/১, অশোকনগর, ২৪ পরগণা (উঃ)

১ খির বিজুরি, জ্যৈষ্ঠ ১৪১১

অম্বরনাথ সেনগুপ্ত ই ৩২০ নীলাম্বর বিহার ৪০ দমদম রোড, কোলকাতা-৭৪

১ রাঢ়ের বিরল মাতৃপূজা—অম্বরনাথ সেনগুপ্ত

অরবিন্দ রায় ১৭/১৮ কে.পি. রায় লেন গাঙ্গুলী পুকুর ঢাকুরিয়া, কোলকাতা-৩১

১ সাঁঝবাতি—সুরেশচন্দ্র রায়

অরুণ কুণ্ড গীতা প্রিন্টার্স, ৫১ বামাপুকুর লেন, কলকাতা-৯

১ জীবন শিল্পী সুকান্ত—অনুনয় চট্টোপাধ্যায়

২ সম্প্রচারের ভাষা—প্রণবশ সেনের স্মৃতিতে—ভবেশ দাশ ও সংযুক্তা সিংহ

৩ আদিবাসী লোককথা—দিব্যজ্যোতি মজুমদার

৪ তথ্য প্রযুক্তি ও আমাদের জীবনযাপন—সৌমিত্র লাহিড়ী ও মানসপ্রতিম দাস

৫ সৃজন প্রতিভা নজরুল—সৌমিত্র লাহিড়ী, সম্পাদিত।

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় উৎক প্রকাশনী, ৪০, মহারানী ইন্দিরা দেবী রোড, কলকাতা-৬০

১ এবং এই সময় : ২০ বর্ষ, ৬৬ সংখ্যা (গ্রীষ্ম) ১৪১১

২ ” ” ” : ২০ বর্ষ, ৬৭ ” (বর্ষা) ১৪১১

৩ ” ” ” : ২০ বর্ষ, ৬৮ ” ১৪১১

৪ ” ” ” : ২০ বর্ষ, ৬৯ ” (শীত) ১৪১১

অরুণ মুখোপাধ্যায় হাটখোলা, মোড়ারপাড়া জোড়াপুকুর ধার, চন্দননগর, হুগলী-৭১২১৩৬

১ শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত ‘দারোগার দপ্তর’—অরুণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

২ ওই, ২য় খণ্ড

অরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রযত্নে : রত্না প্রকাশনী, ১২বি চৌধুরী লেন, শ্যামবাজার, কল-৪

১ যবাণু : ১ম খণ্ড—ডঃ অরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

অরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৪০ মহারানী ইন্দিরা দেবী রোড, কলকাতা-৬০

১ পূর্ণশশী দেবীর রচনাবলী, ৩য় খণ্ড

অরুণচাঁদ দত্ত ৩৯, ফিয়ার লেন, কোলকাতা-৭৩

১ মানবদরদী মহান লেনিন—এল. কুনেৎস্কায়া ও অন্যান্য

২ সমিকভ দেশ—ভ্লাদিমির ওব্রুচেভ

৩ সোভিয়েত পররাষ্ট্রনীতির ইতিহাস—বি. পোনোমারিয়ভ ও অন্যান্য

৪ যস্তের মানব—বেরিল বেকার

৫ ভূমণ্ডলের যন্ত্রবিদ্যা—আই. আদাবাশেভ

৬ ব্যবস্থাপনা মনস্তত্ত্ব—হ্যারল্ড জে লিভিট

৭ ধাতু ও মানুষ—এম. ভাসিলিয়েভ

অরুণলাল ধর ২৮/৩সি, এইচ. কে. শেঠ লেন, কলকাতা-৫০

- ১ মা—অরুণলাল ধর
- ২ অপরূপ—ওই

অরুণা চট্টোপাধ্যায় ৩সি শিবশঙ্কর মল্লিক লেন, কলকাতা-৪

- ১ হত্যারহস্য—পাঁচকড়ি দে
- ২ নীল বসনা সুন্দরী—পাঁচকড়ি দে
- ৩ জয় পরাজয়—পাঁচকড়ি দে
- ৪ মায়াবিনী—পাঁচকড়ি দে
- ৫ রঘু ডাকাত—পাঁচকড়ি দে
- ৬ হত্যাকারী কে—পাঁচকড়ি দে
- ৭ বিশ্বের চোখে শটীন—বাণীকুমার চট্টোপাধ্যায়
- ৮ পুরস্কারী : সেপ্টেম্বর ২০০৩, প্রেমেন্দ্র মিত্র সংখ্যা
- ৯ সোনার মেয়ে স্টেফি—অরুণাভ গুপ্ত ও সুমন ভট্টাচার্য
- ১০ দেশ : সাহিত্য সংখ্যা ১৩৯৫
- ১১ ওই ১২ জুন ১৯৯৯
- ১২ কলকাতা পুরস্কারী, জীবনানন্দ সংখ্যা, ১৪০৫
- ১৩ ওই অমর্ত্য সেন সংখ্যা, ১৪০৫
- ১৪ কৃষ্ণভাবিনী দাসের নির্বাচিত প্রবন্ধ—অরুণা চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদিত
- ১৫ পরিব্রজ্যা—শিরীণ আখতার
- ১৬ পথ বেঁধে দিল—শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
- ১৭ সেই আমি সেই তুমি—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

অরুণ আস আলা/ধনিয়াখালি, ষ্ণগলি-৭১২৩০২

- ১ তাঁতঘর/ ৪র্থ বর্ষ ৬-৭ সংখ্যা, ২০০৪
- ২ তাঁতঘর/ ৫ম

অশোক অধিকারী ৫/এইচ/৯ সচ্চাষী পাড়া রোড, কাশীপুর, কলকাতা-২

- ১ শব্দভেদী : (সাহিত্য পত্রিকা) ৮ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা ১৪১০
- ২ গল্প বিশ্ব : গল্প এবং গল্প সংক্রান্ত পত্রিকা, ৩য় সংখ্যা, মাঘ ১৪১০
- ৩ ক্ষুধার্ত সময় : জানুয়ারি ২০০৪

অশোক ভট্টাচার্য ১৭১, সুভাষনগর রোড, দমদম ক্যান্টনমেন্ট, কলকাতা-৬৫

- ১ সুমনা—অশোক ভট্টাচার্য

অশোককুমার দে ২০নং গ্রিগ এডেনিউ, কোলকাতা-৭৫

- ১ নায়কের সন্ধানে—সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, সম্পাদিত

অশোক রায়চৌধুরী বি.সি-১৭, দেশবন্ধু নগর, কলকাতা-৫৯

- ১ বর্তমান : শারদ সংখ্যা ১৪০৯
- ২ বর্তমান : শারদ সংখ্যা ১৪০৭

- ৩ দেশ শারদীয় ১৪০৯
- ৪ দেশ শারদীয় ১৪১০
- ৫ আনন্দবাজার পত্রিকা শারদীয় ১৪০৯
- ৬ আনন্দবাজার পত্রিকা শারদীয় ১৪১০
- ৭ ছড়া ও কবিতা সংকলন (নির্বাচিত)—অরুণ ভট্টাচার্য।
- ৮ মিষ্টি ছড়ার বৃষ্টি—ওই
- ৯ ফুল ফোটে অন্ধকারে—অমিত দাস
- ১০ মীরাসিকা জননী আমার—সুনীলকুমার ভট্টাচার্য
- ১১ পদ্মের ভিতর আলো—শান্তিকুমার ঘোষ
- ১২ বিশ্ব-মঞ্জুষা : ২৩ বৈশাখ ১৪১০
- ১৩ হে মহাজীবন
- ১৪ রবিবাসর : বার্ষিক সংখ্যা ১৪১১
- ১৫ সম্পর্ক ও অন্যান্য গল্প—প্রদীপরঞ্জন সেনগুপ্ত
- ১৬ হঠাৎ কবিতা তুমি রাতদুপুরে [কাব্য সংকলন]—সুনীতা মুখোপাধ্যায়
- ১৭ অরূপ রূপের সন্ধানে—আলপনা সেনগুপ্ত
- ১৮ সাবিত্রী—অরুণ শীল, অনুবাদক
- ১৯ সূত্রধর শিল্প ও দাসপুর—ত্রিপুরা বসু
- ২০ University of Calcutta : Financial Estimates 2005-06 and Revised Estimates 2004-2005.

আদ্যাশক্তিপ্রসাদ রায় জেড-৭, গভঃ হাউসিং এস্টেট, ভি. আই. পি. রোড, কোলকাতা-৫৪

- ১ দেশ : জানুয়ারি ২০০১-ডিসেম্বর ২০০১
- ২ ওই : জানুয়ারি ২০০২-ডিসেম্বর ২০০২
- ৩ ওই : জানুয়ারি ২০০৩-ডিসেম্বর ২০০৩
- ৪ ওই : জানুয়ারি ২০০৪-ডিসেম্বর ২০০৪
- ৫ ওই : শারদীয়া সংখ্যা-১৪০৬
- ৬ ওই : শারদীয়া সংখ্যা ১৪১১
- ৭ পত্রিকা : শারদীয়া সংখ্যা-১৪০৩
- ৮ আনন্দবাজার পত্রিকা শারদীয়া ১৪১১

আনন্দপ্রসাদ রায় কথাকলি, দেবপ্রসাদ পন্নি, মধ্যমগ্রাম, কলকাতা-১২৯

১. *ঋপদে লোকায়তে*—আনন্দপ্রসাদ রায়

আলপনা মাইতি মোহন-মায়া, টাঠারিবাড় দক্ষিণ কাশিয়নগর, মেদিনীপুর-৭২১৬৩২

১. *কিছুকথা কিছু অনুভব*—রমণীমোহন মাইতি,

আশাবরী পাবলিকেশন প্রযত্নে : শিশিরকুমার মাইতি, ২৪, ঠাকুর রামকৃষ্ণ লেন,
হাওড়া-৭১১১০৪

- ১ *দুপুরের উঠোন*—প্রভাতকুমার মিশ্র।

- ২ সীমানা ছাড়িয়ে—ঋণা ঘোষ।
 - ৩ এসো সৌজন্য রোদে দাঁড়াই—নিমাই দাস।
 - ৪ বৈকালিক শরসন্ধান—জনার্দন গোস্বামী।
 - ৫ তেভাগা আন্দোলনে হাওড়া জেলা—দুঃখহরণ ঠাকুর চক্রবর্তী
 - ৬ কবিতার বসতবাটি—পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়।
 - ৭ এ পৃথিবী শিশুদের : যুদ্ধের নয়—দিলীপ সেন
 - ৮ এক আকাশ—কাজী হাবিবুর রহমান
 - ৯ আশাবরী : জানুয়ারি ২০০৪
 - ১০ — এপ্রিল ২০০৪
 - ১১ — জুলাই ২০০৪
 - ১২ — অক্টোবর ২০০৪
 - ১৩ প্রবন্ধ সমুচ্চয়—শিশিরকুমার মাইতি
 - ১৪ ত্রিবেণী—গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় ও সুখেন্দুবিকাশ পাল
 - ১৫ জীবনের মুখোমুখি—অশোকা বসুদাশ
 - ১৬ ছড়িয়ে ছড়া—ঋণা ঘোষ
 - ১৭ এ আমার কেমন রাণী—মৈনাক বন্দ্যোপাধ্যায়
 - ১৮ নবাগত—অমলেন্দু বাগচী
 - ১৯ ভিক্ষে বিকেল ও সাদা মেঘ—বিজ্ঞানবিহারী নন্দী
- আশিস খাস্তগীর দেবীগড়, দ্বিতীয় সরণি, মধ্যমগ্রাম, কলকাতা-১২৯
- ১ বাংলা গদ্যে নীতিশিক্ষা (১৮০২-১৮৫৬)—আশিস খাস্তগীর
- আশিস বসুমল্লিক হাডকো, ব্লক-১০/১৭৮, কলকাতা
- ১ রবীন্দ্রনাথের ভাঙা গান—অশিস বসু মল্লিক
- আশুতোষ ভট্টাচার্য 'রাহা কমপ্লেক্স', ২৪, নিউ পঞ্চাননতলা রোড, ফ্ল্যাট নং-বি/খ্রি, কলকাতা-৫৬
- ১ পরমাপ্রকৃতি শ্রীমা ও বঙ্গরঙ্গালয়—আশুতোষ ভট্টাচার্য
- ইন্দ্রিরা মুখোপাধ্যায় ২৬/২এ, ভুবনমোহন ব্যানার্জী রোড, বেলঘরিয়া-৭০০ ০৫৬
- ১ তোমার ডানার নীলে পাড়ি দিতে উধাও আকাশ—ইন্দ্রিরা মুখোপাধ্যায়
- উমা বন্দ্যোপাধ্যায় সোদপুর।
- ১ দীক্ষা : মুক্তির উপায়
 - ২ শ্রীশ্রীহরিচাঁদ ঠাকুর ও মাতৃয়া সম্প্রদায়—নিতাই দাসী
- ঋতা মুখোপাধ্যায় ১৪ পি, কেলুপাড়া লেন, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৩১
- ১ ভারততীর্থ—ঋতা মুখোপাধ্যায়
- কণা শীল ২৬/বি, রামমোহন সাহা লেন, কোলকাতা-৬
- ১ শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী, ২য় খণ্ড—মহেন্দ্রনাথ দত্ত
 - ২ স্বামী বিবেকানন্দের বালা জীবনী—মহেন্দ্রনাথ দত্ত

কনকতিলক বন্দ্যোপাধ্যায়

১ দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে—কনকতিলক বন্দ্যোপাধ্যায়

২ ডিগবী সাহেবের বাংলো—ঐ

কমল ঘোষ প্রজেক্ট ডাইরেকটর, করিমগঞ্জ, পো: + জে, করিমগঞ্জ, আসাম, পিন : ৭৮৮৭১০

১ এদিন বিকেলে—কমল ঘোষ

কমল চৌধুরী বারাসাত

১ মুকুলের গন্ধ—অনিল ঘড়াই

২-৫ ঈশ্বরের বাগান (১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ খণ্ড)—অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

৬ হনিমুন লজ্জ—সৈয়দ মুজতবা সিরাজ

৭ কলের পুতুল—অনিল ঘড়াই

৮ জন্মদাগ—

”

৯ স্বপ্নের খরা পাখি—

”

১০ বক্ররেখা—

”

১১ পূর্বপার্বতী—

প্রফুল্ল রায়

১২ স্বজ্ঞদার সঙ্গে বকসার জঙ্গলে এবং—বুদ্ধদেব গুহ

১৩ পলাতক—

মহাশ্বেতা দেবী

১৪ লায়লী অ্যাশমানে আয়না—ওই

১৫ মিলুর জন্ম—

ওই

১৬ প্রকৃতি পাঠ—

কিম্বর রায়

১৭ দুই জীবনের গল্প—

শচীন দাশ

১৮ টাড় বাংলার উপাখ্যান—

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯ বেনে বউ—

মহাশ্বেতা দেবী

২০ পলাশপুরের পিকনিক—

নবনীতা দেব সেন

২১ ভাবাসমগ্র ১—

দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২২ সানু আলির নিজের জমি—

আফসার আমেদ

২৩ এক আশ্চর্য বশীকরণ কিসসা—

ওই

২৪ কাঙ্গপোকপি—

বুদ্ধদেব গুহ

২৫ পঞ্চম প্রবাস—

ওই

২৬ পরিযারী—

ওই

২৭ হাজার দুয়ারী—

ওই

২৮ বাসনাকুসুম—

ওই

২৯ চান ঘরে গান—

ওই

৩০ পাখসাট—

ওই

৩১ সমুদ্র মেখলা—

ওই

৩২ পরদেশীয়া—

ওই

৩৩ দূরের দুপুর—

ওই

৩৪	অবরোহী—	ওই
৩৫	দূরের ভোর—	ওই
৩৬	অভিলাষ—	ওই
৩৭	ছায়ারা দীর্ঘ হলো—	ওই
৩৮	সবিনয় নিবেদন—	ওই
৩৯	ধুলোবালি—	ওই
৪০	ঝাড়ুদার সঙ্গে সেশ্যালসে—	ওই
৪১	বাংরিপোসির দু'রাস্তির—	ওই
৪২	শালডুংরি—	ওই
৪৩	যুযুধান—	ওই
৪৪	আগুন জ্বলোছিল—	মহাশ্বেতা দেবী
৪৫	প্রস্থান পর্ব—	ওই
৪৬	ব্যাধকণ্ড—	ওই
৪৭	ইটের পরে ইট—	ওই
৪৮	দৌলতি—	ওই
৪৯	অস্তঃপুর—	আফসার আহমেদ
৫০	অলৌকিক নয়, লৌকিক—	প্রবীর ঘোষ
৫১	জলাঞ্জলি—	তারাপদ রায়
৫২	তরণী—	অনিতা অগ্নিহোত্রী
৫৩	স্ব-নির্বাচিত গল্প—	হুমায়ূন আহমেদ
৫৪	সংঘর্ষ—	কিম্বর রায়
৫৫	দেশভাগের পর—	ইমদাদুল হক মিলন
৫৬	তৃণভূমি—	সাধন চট্টোপাধ্যায়
৫৭	ইউক্যালিপটাস ও দু'টি কাব্যনাটক—	অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়
৫৮	ক্রান্তিকাল—	প্রফুল্ল রায়
৫৯	মম্বালপুর—	সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়
৬০	নির্বাচিত স্পন্দনের গল্প—	
৬১	অন্য পাঁচালি—	স্বপ্না রায়
৬২	শববাহক—	সমীর চৌধুরী
৬৩	নদীবসত—	অমর মিত্র
৬৪	নবম পর্ব—	স্বপ্নময় চক্রবর্তী
৬৫	শামুক ও অন্যান্য গল্প—	জগন্নাথ প্রামাণিক
৬৬	সাহেব গলি—	মধুময় পাল
৬৭	হিকরি-ডিকরি ডক রহস্য—	মুস্তাফা সিরাজ
৬৮	জনগণ—	অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

২১৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১২ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা

কল্যাণব্রত চক্রবর্তী কলকাতা-৪৭

১ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ভাগবতধর্ম : উৎপত্তি, বিকাশ এবং স্বরূপ—

কল্যাণী ঠাকুর ২৩৪/এইচ কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৯

১ নীড় : দশম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা

কানাইপদ রায় ঘটকপাড়া, মণিরামপুর, পো: বারাকপুর, উ: ২৪ পরগনা

১ উত্তর চক্ষিণ পরগনার সেকাল একাল, ২য় খণ্ড—কানাইপদ রায়, সম্পাদিত

২ বারাকপুর মহকুমা এবং রবীন্দ্রনাথ—কানাইপদ রায়

কানাইলাল বসু কলকাতা

১ ঐয়ী—কানাইলাল বসু

কালীশঙ্কর মল্লিক সেক্টর-৫, হাউস নং ৯৮ 'রচনা', বৈশালী

১ পৌরাণিক কবিতাশুদ্ধি—কালীশঙ্কর মল্লিক

কাশীনাথ মুখোপাধ্যায় ১৯/এ, নেপাল ভট্টাচার্য ফার্স্ট লেন, কলকাতা-২৬

১ কৈদারনাথ দত্ত : একটি অনাবিষ্কৃত সাহিত্য প্রতিভা—কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়

২ Rigveda : A Reassessment in Science, History & Divinity—

কুমারশঙ্কর সেনগুপ্ত ৮৯, মহাত্মাগান্ধী রোড, কলকাতা-৭

১ এখন চলমানে—কুমারশঙ্কর সেনগুপ্ত

২ এই রৌদ্রে উদার—গুই

কুশল চৌধুরী সম্পাদক 'মাতৃশক্তি' পত্রিকা, দক্ষিণেশ্বর

১ দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরের ইতিবৃত্ত—নির্মলকুমার রায়

২ 'মাতৃশক্তি' : শারদীয়, ১৪১১

গোপীকান্ত কোঙার বর্ধমান

১ পত্র-পত্রিকা পরিচিতি : বর্ধমান—গোপীকান্ত কোঙার, সঙ্কলক ও সম্পাদিত প্রয়াত

চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য কল্যাণনগর, উত্তর ২৪ পরগনা

১ ভারতভাবনা ও মূল্যবোধ : যবনিকার অন্তরালে কিছুক্ষণ—শীতাংশুকুমার চক্রবর্তী

চন্দ্রা মুখোপাধ্যায় শ্যামনগর, উ: ২৪ পরগনা

১ মণিপুষ্প : কবি রণজিত মুখোপাধ্যায় স্মরণ সংখ্যা, বৈ: ১৪১১

চায়না পাবলিকেশন ২১এ, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা-৯

১ এলো শুভ রজনী—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

জয়ন্তী সান্যাল ১০২ সাদার্ন এভিনিউ, কলকাতা-২৯

১ অনুষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা এবং অন্যান্য—জয়ন্তী সান্যাল

জীবশরণ দাস নিত্যানন্দ জন্মস্থান, একচক্রাধাম বীরচন্দ্রপুর-৭৩১২৪৫, বীরভূম

১ ধীমহি : ১৪১০

জ্ঞানপ্রকাশ মণ্ডল ৪৮ কে. কে. মজুমদার রোড, কলকাতা-৭৫—

১ রবীন্দ্রনাট্য চিত্তার বিবর্তন—জ্ঞানপ্রকাশ মণ্ডল

২ A sporting Spree : A Boy from vidyar Baon—J. P. Mondol

৩ Sunrit Mondal : A Loving Soul—J. P. Mondal

ডিরোজিও স্মরণ সমিতি নীলাঘর বিহার হাউজিং কমপ্লেক্স, ফ্ল্যাট-এইচ/৩৩২,

৪০, দমদম রোড। কলকাতা-৭৪

১ ডিরোজিও : সময়ের অ্যালবাম—শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়, অধীর কুমার
তনুজ লস্কর ৫১/৩, রাণী হর্ষমুখী রোড, কলকাতা-২

১ আশ্চর্য পৃথিবী—তনুজ লস্কর

তাপস সরদার জেড/৩/৫৪৬ জেলিয়াপাড়া রোড, কলকাতা-৪৪

১ টেরাকোটা শহরের নদী—তাপস সরদার

তারক রেজ ১০৬/১৩ ব্যাচারাম চ্যাটার্জী রোড, বেহালা, কলকাতা-৩৪

১ অন্যবৃন্তে—তারক রেজ

তারক লাহিড়ী স্বরূপ এপার্টমেন্ট, গড়িয়া স্টেশন রোড তেঁতুল বেড়িয়া, কলকাতা-৮৪

১ ড্রিম সি ড্রোম ও অন্যান্য গল্প—তারক লাহিড়ী

২ মাটির ডানায়—

”

দিলীপকুমার মিত্র পি-৯৬, সি. আই. টি. স্কিম. ৬ এম কলকাতা-৫৪

১ নারদ পুরানোস্ত অষ্টাদশ মহাপুরাণীয় অনুক্রমণিকা ও সংগীত রসার্ণব—

জনমেজয় মিত্র : সংগ্রাহক, দিলীপকুমার মিত্র

দীপক চন্দ্র ৭, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র এভিনিউ কলকাতা-৩০

১ পৌরাণিকী : শারদীয় ২০০৪

দীপঙ্কর ঘোষ ৫০ জয়নারায়ণ সাঁতরা লেন, হাওড়া-১

১ পশ্চিমবঙ্গের মৃৎশিল্প—দীপঙ্কর ঘোষ

দেবপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩ লক্ষ্মীনারায়ণ মুখার্জী রোড কলকাতা-৬

১ কথা ও সুর—ধৃষ্টিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

২ বর্তিকা (মনীশ ঘটক জন্মশত বার্ষিক সংখ্যা) জুলাই-ডিসেম্বর ২০০১

৩ ঔপন্যাসিক তারাক্ষর—মুক্তি চৌধুরী

৪ নাটকের কথা (৪র্থ সং.)—অজিতকুমার ঘোষ

৫ আশালতা সিংহ রচনাবলী

২ মুচ্ছকটিক : বিচিত্র বর্ণালী—বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত

৩ নির্বাচিত গদ্য—কালীকৃষ্ণ গুহ

৪ শরৎ রচনাবলী (জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ) : ১ম, ২য়, ৩য় ৪র্থ, ৫ম

৫ রবিজীবনী : ১ম, ২য় খণ্ড—প্রশান্তকুমার পাল

৬ বিহারে বাংলা সাহিত্য—নন্দদুলাল রায়

৭ Rabindranath Tagore & Patrick Geddes—Arunendu Banerjee

৮ বাঙ্গালির নতুন আত্মপরিচয়—রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

৯ পার হয়ে যাই—সঞ্জয় ভট্টাচার্য

১০ Buddha & Buddhism—Edited by Biswanath Banerjee & Sukomal Chauduri

২২০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১২ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা

দেবজ্যোতি রায় ৫৩ বলাকা পো: বামনগাছি, উ: ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৭০৬

- ১ ভারত বিভাজন যোগেন্দ্রনাথ ও ড: আশ্বদকর—বিপদভঞ্জন বিশ্বাস
- ২ সুবচন নির্বাসনে নয়—হরিপদ সিকদার
- ৩ কেন উদ্ধাত্ত হতে হল—দেবজ্যোতি রায়

দেবাশিস ভট্টাচার্য সাউথ সাবার্বান স্কুল (মেন), ১৬ গোপাল ব্যানার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-২৫

- ১ সাউথ সাবার্বান স্কুল (ভবানীপুর) : ১৩০ বছর উপলক্ষে স্মরণিকা—

দেবাশিস মুখোপাধ্যায় জিরানিয়া, বোস পাড়া, মুখার্জী পাড়া, চন্দননগর .

- ১ সুধীর চক্রবর্তীর বই : নানা মনের চোখে—সংকলন ও সম্পাদনা দেবাশিস মুখোপাধ্যায়

দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ গোস্বামী বিরাডিজি, ডাক—নেতাজীগড়, হওড়া-৭১১১০৮

- ১ আবজ্ঞানার ঝুড়ি : নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্মা—সংকলন ও সম্পাদনা দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ গোস্বামী
- ২ আধুনিক ত্রিপুরা : প্রসঙ্গ রাধাকিশোর মাণিক্য—দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ গোস্বামী

নবগোপাল চক্রবর্তী গ্রাম-আমরাই, পো : আমরাই, দুর্গাপুর, বর্ধমান-৭১৩২০৩

- ১ ইতিকথা—নবগোপাল চক্রবর্তী

নলিনীরঞ্জন বেরা খনাকুল, হুগলী

- ১ নাকছাবি—নলিনীরঞ্জন বেরা

নারায়ণচন্দ্র কর প্রযত্নে : অমপূর্ণা প্রকাশনী টাঠারিবাড়, পূর্বমেদিনীপুর

- ১ মানত পূজায় দেবীলীলা—নারায়ণচন্দ্র কর

নির্মল দাশ প্রফুল্লকানন,

- ১ পশ্চিম দিনাজপুর জেলার উপভাষা—সুভাষচন্দ্র রায়চৌধুরী

নীরদরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ২ শ্রী অরবিন্দ রোড, নবগ্রাম, কোমগর, হুগলী

- ১ শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন : জীবন ও সাধনা—নীরদরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র বার্ষ সেন্টিনারি সেন্ট্রেন্সন কমিটি এফ. ডি. ২২, সেকটর III, সন্টলেস সিটি, কলকাতা-৯১

- ১ Portrait of a Patriot

পরমেশ্বরী ভট্টাচার্য ১৮৪, বি. বি. চ্যাটার্জী রোড, ফ্ল্যাট নং ১০২, কলকাতা-৪২

- ১ প্রেমিকগুরু—নিগমানন্দ পরমহংস

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি কলকাতা

- ১ শ্রদ্ধালেখমালা : সুকুমার সেন শতবর্ষ স্মারক—পবিত্র সরকার স.
- ২ পুরাতন বাংলা গদ্যগ্রন্থ সংকলন— অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, স.
- ৩ কুমুদরঞ্জন মল্লিক—শ্রাবণী পাল
- ৪ মনীষ ঘটক—দেবদ্যুতি বন্দ্যোপাধ্যায়
- ৫ সুকুমার সেন—অলোক রায়
- ৬ অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়—অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়
- ৭ ভেসে যাই, ভাসে স্মৃতি—সরোজকুমার রায়চৌধুরী

- ৮ বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়—কৃষ্ণ ধর
 - ৯ অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত—কুমার ভাটিয়া
 - ১০ সৈয়দ মুজতবা আলী—বিজনবিহারী পুরকায়স্থ
 - ১১ রাখারানী দেবী—রত্না মিত্র
 - ১২ নজরুল ইসলাম রচনা সমগ্র, ৫ম খণ্ড
 - ১৩ বুৎপত্তি-সিদ্ধার্থ : বাংলা কোষ—সুকুমার সেন
 - ১৪ নজরুল জীবনী—অরুণকুমার বসু
 - ১৫ সংবাদ-সাময়িক পত্রে উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ, ২য় খণ্ড—স্বপন বসু
- পারুল প্রকাশনী ৮/৩, চিত্তামণি দাস লেন, কলকাতা-৭০০০০৯
- ১ লোকমাতা সারদা—পুরঞ্জনপ্রসাদ চক্রবর্তী
 - ২ ত্রিপুরা সমগ্র—অম্বিকুমার আচার্য ও জ্যোতিষচন্দ্র দত্ত
 - ৩ আসাম ও ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত—হীরেন্দ্রকুমার শূর
 - ৪ জনািলিজমের সহজপাঠ—কৌশিক ভট্টাচার্য
 - ৫ নতুন তথ্যের আলোকে কলকাতা—হরিপদ ভৌমিক
 - ৬ উদ্ধৃতি অভিধান—দিলীপকুমার মিত্র
 - ৭ ত্রিপুরার-লৌকিক দেবদেবী—জগদীশ গণচৌধুরী
 - ৮ রাণি কাহিনী—পান্নালাল রায়
 - ৯ গুপ্তহত্যা ও প্রসাদ ষড়যন্ত্রের আলোকে অতীত ত্রিপুরা—পান্নালাল রায়
 - ১০ আমাদের পরিবেশ—দুর্বা সাহা, ১ম ভাগ
 - ১১ হাসিখুশি—যোগীন্দ্রনাথ সরকার ১ম
 - ১২ ছোটোদের সেরা গল্প—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
 - ১৩ ত্রিপুরার আদিবাসী জীবন ও সংস্কৃতি—সুরেন দেববর্মণ
 - ১৪ ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস—শীতলচন্দ্র চক্রবর্তী
 - ১৫ ত্রিপুরার জঙ্গলে—সেন্টু গাঙ্গুলী
 - ১৬ রেডিও সাংবাদিকতা—কৌশিক ভট্টাচার্য
 - ১৭ রবীন্দ্রনাথের ত্রিপুরা—পান্নালাল রায়
 - ১৮ অতীত ত্রিপুরায় সতীদাহ ও নরবলি—পান্নালাল রায়
 - ১৯ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাঙালী বুদ্ধিজীবী—অমলেন্দু দে
- প্যাপিরাস ২, গণেন্দ্র মিত্র লেন, কোলকাতা-৪
- ১ জাদুবাঁশি—শিবানিস দত্ত, সম্পাদনা
 - ২ স্বপ্নের মানুসেরা—রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী
 - ৩ পোড়মাটির মুখ—সুমন্ত মুখোপাধ্যায়
 - ৪ নির্যাস—মঞ্জুশ্রী দাশগুপ্ত
 - ৫ থিয়েটারের কথা—শেখর সমাদ্দার, সম্পাদনা
 - ৬ আউরা—কার্লোস ফুয়েন্তেস, অনুবাদ : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
 - ৭ আইজেনস্টাইন—অভিজিৎ রায়

- ৮ শ্রীঅরবিন্দ—সন্দীপ মুখোপাধ্যায়
- ৯ ভিক্তর য়াগো—চিন্ময় গুহ
- ১০ প্রফুল্লচন্দ্র—জগদীপ ঘোষ
- ১১ নিবিকল্প শক্তি—মৃণালকান্তি চন্দ
- ১২ সময়-সংস্কৃতির তত্ত্বতালশ—সৌরীন ভট্টাচার্য
- ১৩ কতনা পাকিস্তান—কমলেশ্বর, অনুবাদ : কালীপদ দাস
- ১৪ জলই পামাণ হয়ে আছে—শঙ্ক ঘোষ
- ১৫ আকন্দ—সুভাষ ঘোষাল
- ১৬ পলাশকন পেরিয়ে—সুভাষ ঘোষাল
- ১৭ ফ্রাঙ্ক ফুর্ট স্কুল ও মার্কসবাদ—সত্যজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণয়কৃষ্ণ গোস্বামী ১৩৫ হাজরা রোড, কলকাতা-২৬

- ১ ভারতীয় ঐতিহ্য—প্রণয়কৃষ্ণ গোস্বামী
- ২ সন্ধ্যা সাগর-কূলে—ওই
- ৩ ৭৫ বর্ষ পূর্তিতে শ্রীপ্রণয়কৃষ্ণ গোস্বামী, ৯ মাঘ ১৪০৮
- ৪ অনুরাগ গল্প সম্ভার—প্রাণকৃষ্ণ গোস্বামী

প্রত্যয় পাবলিশার্স ২৪/১ বি, ব্রীক রো, কোলকাতা-১৪

- ১ জাতীয় সংহতি ও ইসলাম : একটি সমীক্ষা—অরবিন্দ পোদ্দার
- ২ শরৎচন্দ্র : শ্রেয়সের সন্ধান—ওই
- ৩ রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব—ওই
- ৪ একালের বুদ্ধিজীবী : দর্পণে বৃহন্নলা—ওই
- ৫ রবীন্দ্র মানস—ওই
- ৬ বঙ্কিম ঐতিহ্য এবং ঐতিহ্যের শত্রুরা—ওই
- ৭ শস্যের ভিতরে রৌদ্র : অঘিষ্টের সন্ধানে সমাজমানস—ওই
- ৮ স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতার শত্রুরা—ওই
- ৯ রামমোহন : উত্তরপক্ষ—ওই
- ১০ সাংস্কৃতিক স্বৈরাচার এবং বিচ্ছিন্নতাবাদ ও বাম রাজনীতির অন্তর্জালি—ওই
- ১১ ভারতীয়তার উৎস সন্ধান/বৈদিক ঋষিরা কি হিন্দু ছিলেন—অরবিন্দ পোদ্দার
- ১২ বিদ্যাসাগর : শুধু সমকালের নয়, সর্বকালের—ওই
- ১৩ আত্মানুসন্ধান : জাতীয় সংহতি ও ইসলাম এবং অন্যান্য প্রবন্ধ—ওই
- ১৪ প্রসঙ্গ : ত্রিদিব চৌধুরী
- ১৫ দ্বিতীয় জন্ম—সত্যপ্রিয় ঘোষ
- ১৬ মানপত্র—ওই
- ১৭ বহু বাসনায়—ওই
- ১৮ ভলোডিয়া থেকে লেনিন—মুখ্য বাগচী
- ১৯ কাকডোরের কীর্তালি—কাশীনাথ মণ্ডল
- ২০ রম্য-অরম্য রচনা—সলিল বন্দ্যোপাধ্যায়

- ২১ দেখা— ওই
 ২২ নির্বাচিত অভিভাষণ—নীহাররঞ্জন রায়
 ২৩ দৃশ্য বদলের দিন—কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত
 ২৪ Social issues of Health—Gouri Pada Dutta
 ২৫ Colonial laws & The Road to Freedom, Vol. I—Prithwis Bagchi
 ২৬ ” Vol. II—Prithwis Bagchi
 ২৭ রবীন্দ্রশ্রুতি—রঞ্জনা মিত্র

প্রদীপ দত্ত ই. কে. টি. পি ফেজ II, ব্লক-এ/৯, ফ্লাট-৩, কলকাতা-১০৭

- ১ হিরোশিমা নাগাসাকি : যখন নরক নেমে এল—প্রদীপ দত্ত
 ২ বিদায় পরমাণু বিদ্যুৎ— ওই

প্রভাতকুমার দাস ডি ১/১, বেলগাছিয়া ভিলা, কলকাতা-৩৭

১	বহুরূপী	:	সংখ্যা ৬৭,	মে	১৯৮৭
২	”	:	” ৬৮,	২২ সেপ্টেম্বর	১৯৮৭
৩	”	:	” ৭১,	১ মে	১৯৮৯
৪	”	:	” ৭২,	২৯ সেপ্টেম্বর	১৯৮৯
৫	”	:	” ৭৫,	১ মে	১৯৯১
৬	”	:	” ৭৬,	৭ অক্টো	১৯৯১
৭	”	:	” ৮০,	অক্টোবর	১৯৯৩
৮	”	:	” ৮১,	মে	১৯৯৪
৯	”	:	” ৮৭,	মে	১৯৯৭
১০	”	:	” ৮৮,	অক্টোবর	১৯৯৭
১১	”	:	” ৮৯,	মে	১৯৯৮
১২	”	:	” ৯১,	মে	১৯৯৯
১৩	”	:	” ৯২,	অক্টোবর	১৯৯৯
১৪	”	:	” ৯৫	মে	২০০১

প্রভাস রায় বলাকা সমবায় আবাসন, বামনগাছি, উ: ২৪ পরগণা

- ১ জীবন অন্তহীন—প্রভাস রায়

ফার্মা কে. এল. এম. প্রাইভেট. লিমিটেড ২৫৭/বি, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কোলকাতা-১২

- ১ Madhyanta-Vibhanga—TH. Stchesbatsky
 ২ Modern Accountens Concept in Kantillya's Arthasastra—Anjan Kr. Bhattacharya
 ৩ India in British Parliament : 1865-1884—Sumonto Niyogi
 ৪ Sri Aurobindo's Treatment of Hindu myth—J. Feys
 ৫ Obscure Religious Cults—Shashibhusan Dasgupta
 ৬ Indian Renaissance & Education—B.R. Purkait

৭ *Pessimism & Contemporary Bengali literature*—Biplab Chakravarty

৮ *The life & Times of Sri Krsnacaitanya*—Debnarayan Acharya

বন্দিরাম চক্রবর্তী

১ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ শতবর্ষ স্মারক পুস্তক

বর্ণালি পাইন কোলকাতা

১ অগ্নিপঙ্ক : আত্মজীবনী—এ. পি. জে. আবদুল কালাম

২ সস্তর বছর—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

৩ বিচিত্রা : গল্প সংকলন—উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সম্পাদিত

৪ মুগসন্ধির গল্প—শিবনারায়ণ রায়, সম্পাদিত

৫ বর্ধমান সমগ্র (১ম)—গোপীকান্ত কোজুর সম্পাদিত

৬ বর্ধমান সমগ্র (২য়)—গোপীকান্ত কোজুর সম্পাদিত

৭ পর্ব—এস. এল. ভৈরাঙ্গা

৮ চারকন্যা—বুদ্ধদেব গুহ

৯ বরাক উপত্যাকার লৌকিক ক্রীড়া—সমরেন্দ্র ভট্টাচার্য

১০ মানুষের সংসার—রমাপদ চৌধুরী

১১ বৃষ্টি বিনিময়—হর্ষ দত্ত

১২ *The Bengali Book of English Verse*—T. D. Dunn

১৩ মায়ের ভাষা—তহমীনা খাতুন ও প্রবীর দে, সম্পাদিত

১৪ সবুজপত্র : গল্প সংকলন—বারিদবরণ ঘোষ, সম্পাদিত

১৫ তিমির বিদার—বাণী বসু

১৬ নয় এ মধুর খেলা : রবীন্দ্রনাথের আধুনিক কবিতা

১৭ দুই শতকের সেরা রম্য রচনা—বারিদবরণ ঘোষ, সম্পাদিত

১৮ উভয়ত সম্পূর্ণ—মতি নন্দী

১৯ নরনারী কথা—শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

২০ ঝাঁপি—শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

২১ আলোছায়া—সুচিত্রা ভট্টাচার্য

২২ রাজমোহনের সুখদুঃখ—বিমল কর

বারিন রায় ওয়াটার লু স্ট্রিট

১ দাদাভাই, ১ম খণ্ড—উৎপলা ঘোষ

২ দাদাভাই, ২য় খণ্ড—উৎপলা ঘোষ

৩ মিলিবে দেখা—দাদাভাই

বাসুদেব রায় বঙ্গবন্ধু কলেজ, রোয়াইল, ধামরাই, ঢাকা

১ মনসামঙ্গল কাব্যে দেব-দেবীর স্বরূপ—বাসুদেব রায়

বিজয়কুমার দাস হালদার পাড়া, চন্দননগর, হুগলী

১ জ্যোতির্গময়—বিজয়কুমার দাস

বিধান দত্ত ১৯ বি, নিমচাঁদ মৈত্র স্ট্রীট, কলকাতা ৩৫

১ তিষ্ঠ ক্ষণকাল—বিধান দত্ত

বিশাল ভদ্র ব্লক-৫, ফ্ল্যাট-৭২, পি-১৯, সারদান অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

১ কানাকড়ি : ২০০২-২০০৪

বিশ্বরূপ মুখোপাধ্যায় এ-১, প্রতীকী আবাসন, ১০৯, উন্টাডাঙ্গা মেন রোড, কলকাতা-৬৭

১ গণ আন্দোলন ও ভারতের সংবাদপত্র এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ—বিশ্বরূপ মুখোপাধ্যায়

২ অন্তর্মিত রাজমহিমা—বিশ্বরূপ মুখোপাধ্যায়

ভবানীপ্রসাদ পাল বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, ১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিট, কল-১২

১ মাসিক বসুমতী : গল্প সংকলন, ২য় খণ্ড

মঞ্জুলা মুখোপাধ্যায়

১ ছড়াকাটা—জীবনতারা হালদার

২ একাক্ষ অষ্টহাসি—সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংকলক

৩ আমি মা, সকলের মা—স্বামী প্রভানন্দ

মদনমোহন সাহা হোসিয়ারী মেসিনারী কনসার্ন, রবীন্দ্র সরণি, কোলকাতা-৬

১ গল্পে প্রাচীন মুদ্রার ইতিহাস—মদনমোহন সাহা

মনোতোষ ভট্টাচার্য ৭, এ. পি. সি. এভিনিউ, কোলকাতা-৩০

১ পৌরাণিকী : জানুয়ারি—মার্চ ২০০৫ বইমেলা সংখ্যা

মন্টু মিত্র মৌলানা আজাদ রোড, হৃদয়পুর, উঃ ২৪ পরগণা

১ হাজার বছর ধরে পথ হাঁটিতেছি—মন্টু মিত্র

২ অর্চিন : ৩য় বর্ষ, বৈশাখ-চৈত্র ১৪১০

মলয়া ধর কোলকাতা-৬

১ কতকথা—মলয়া ধর

মানস দত্ত এ/৫, পূর্ব কলকাতা কো-অপা., ১০২ মাণিকতলা মেইন রোড, কল-৫৪

১ মণ্ডলী ভোগের দত্ত বাড়ি—মানস দত্ত

২ বিচিত্রদর্শন—মিহিরকান্তি রায়

মালা দত্ত রায় কলকাতা

১	সুখী গৃহকোণ,	এপ্রিল	২০০৪
২	সাপ্তাহিক বর্তমান,	মে	২০০৪
৩	সাপ্তাহিক বর্তমান,	জুন	২০০৪
৪	দেশ	ডিসে	২০০১
৫	”	মে	২০০২
৬	”	৪ জুলাই	২০০২
৭	”	১৮ আগস্ট	২০০২
৮	”	৪ সেপ্টেম্বর	২০০২
৯	”	৪ নভেম্বর	২০০২
১০	”	১৮ নভেম্বর	২০০২

১১	দেশ	৪ ডিসেম্বর	২০০২	
১২	"	১৮ ডিসেম্বর	২০০২	
১৩	"	৪ জানুয়ারি	২০০৩	
১৪	"	১৮ জানুয়ারি	২০০৩	
১৫	"	৪ ফেব্রুয়ারি	২০০৩	(বইমেলা)
১৬	"	১৮ ফেব্রুয়ারি	২০০৩	
১৭	"	৪ মার্চ	২০০৩	
১৮	"	১৮ মার্চ	২০০৩	
১৯	"	৪ এপ্রিল	২০০৩	
২০	"	১৮ এপ্রিল	২০০৩	
২১	"	৪ মে	২০০৩	
২২	"	১৮ মে	২০০৩	
২৩	"	২ জুন	২০০৩	
২৪	"	১৭ জুন	২০০৩	
২৫	"	২ জুলাই	২০০৩	
২৬	"	১৭ জুলাই	২০০৩	
২৭	"	২ আগস্ট	২০০৩	
২৮	"	১৭ আগস্ট	২০০৩	
২৯	"	২ সেপ্টেম্বর	২০০৩	
৩০	"	১৭ সেপ্টেম্বর	২০০৩	
৩১	"	২ নভেম্বর	২০০৩	
৩২	"	১৭ নভেম্বর	২০০৩	
৩৩	"	২ ডিসেম্বর	২০০৩	
৩৪	"	১৭ ডিসেম্বর	২০০৩	
৩৫	"	২ জানুয়ারি	২০০৪	
৩৬	"	১৭ জানুয়ারি	২০০৪	
৩৭	"	১৭ ফেব্রুয়ারি	২০০৪	
৩৮	"	১৭ মার্চ	২০০৪	
৩৯	"	২ এপ্রিল	২০০৪	
৪০	"	১৭ এপ্রিল	২০০৪	
৪১	"	২ মে	২০০৪	
৪২	"	১৭ মে	২০০৪	
৪৩	"	২ ফেব্রু	২০০৪	
৪৪	"	২ জুন	২০০৪	
৪৫	"	১৭ জুন	২০০৪	

মিলন মুখোপাধ্যায় তারাশঙ্কর সরগি, কোলকাতা

১ কোলকাতা পুরস্কারী : মার্চ ২০০৪ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় জন্মশতবর্ষ পূর্তি সংখ্যা

২ এলো শুভ রজনী—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

মুহাম্মদ ইকবাল হোসাইন সহযোগী অধ্যাপক ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ

১ মুসলিম বিশ্বে সংবাদপত্রের ইতিবৃত্ত ও বিকাশধারা—মুহাম্মদ ইকবাল হোসাইন

মৃণালকান্তি চট্টোপাধ্যায় 'বাণীশ্রুতি', ২৮১, এস. বি. ঘাট, চুচুড়া, কলকাতা-৭১২১০১

১ গানের খেয়ায় পাড়ি দিই—মৃণালকান্তি চট্টোপাধ্যায়

মৃন্ময় সমীরণ নন্দী এস. এন. মজুমদার রোড, বসিরহাট, উঃ ২৪ পরগণা

১ ঘাসদার ফুটবল—উদয় সমীরণ নন্দী

মোহন মাহাতো ১৪৮ চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কোলকাতা

১ যদি প্রশ্ন কর—বিনয়কুমার দাস

মোঃ আতাউর রহমান বরেন্দ্র গবেষণা যাদুঘর

১ ময়মনসিংহের রাজপরিবার—আবদুর রশীদ

রঘুনাথ ভট্টাচার্য নবযুগ ডিগ্রী কলেজ, কুশুরা ধামরাই ঢাকা

১ সবুজপত্র গোষ্ঠীর সাহিত্য-ভাবনা—রঘুনাথ ভট্টাচার্য

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় (কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার) ৫৬ এ, বি. টি. রোড, কোলকাতা-৫০

১ পুস্তকসূচী : রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় [২০০৩-২০০৪ সালে সংগৃহীত পুস্তক সূচী]

২ পত্রিকাপঞ্জী : রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

রমলা দাশ প্রফুল্লকানন, কলকাতা

১ চর্মাগতিপরিক্রমা—নির্মল দাশ

রমাপ্রসাদ দত্ত ৬৭ বাগবাজার স্ট্রিট, কলকাতা-৩

১ দৈনন্দিনের মুশকিল আসান—সংকলন : বসুমিত্র গুপ্ত

রাজাগোপাল চট্টোপাধ্যায় ১৬ গড়পার রোড, কোলকাতা-৯

১ কলহো থেকে কামাখ্যা : বিবেকানন্দের অভ্যর্থনা—রাজাগোপাল চট্টোপাধ্যায়

রাজেন শইকিয়া নওগা, ছোয়ালি কলেজ

১ বিশ্বকোষ : ৬ষ্ঠ খণ্ড

রাধাগোবিন্দ ঘোষ ইংরেজ বাজার, পৌরসভা, মালদহ

১ ইংরেজ বাজার পৌরসভার ইতিবৃত্ত—রাধাগোবিন্দ ঘোষ, সম্পাদিত।

রাধিকামোহন সাহা রামকৃষ্ণ সেবক আশ্রম, ছোট জাগুলিয়া উঃ ২৪ পরগণা

১ আশপাখীর ডাক—দীপক মিত্র

রামরঞ্জন রায় ঘাটাল, মেদিনীপুর (পশ্চিম)

১ প্রেমেন্দ্র অনুধ্যান : প্রকৃত অঙ্গীকার সংকলন—রামরঞ্জন রায়, সম্পাদিত

২ প্রেমেন্দ্র মিত্রের বিচিত্র জগৎ—রামরঞ্জন রায়

৩ প্রেমেন্দ্র মিত্র : কবি ও ঔপন্যাসিক—রামরঞ্জন রায়

৪ ছোটো গল্পের রূপশিল্পী : প্রেমেন্দ্র মিত্র

২২৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১২ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা

রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী ২ ডা: দেওদার রহমান রোড (বৈশাখী) কলকাতা-৩৩

১ The Life of Pandit Isvarchandra Vidyasagar—Sricharan Chakravarti

২ সোনার কেম্বার সন্মানে—রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী

লক্ষ্মীকান্ত নাগ ৬৮/৭এ, দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রিট, কলকাতা-৬

১ সমাকৃতি : ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা ১৪১১

লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতিকেন্দ্র তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
কলকাতা-৬৮

১ বাংলা সাময়িকপত্রে আদিবাসী কথা—সংকলন ও সম্পাদনা দীপঙ্কর ঘোষ

শক্তিদাস রায় প্রধান গ্রন্থাগারিক আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা-১

১ The Life & Letters of Toru Dutt—Harihar Das

২ The Dutt Family Album—Govin Chander Dutt & others

৩ আজকাল : শারদীয় ১৪১০

৪ কলেজস্ট্রিট শারদীয় ১৪০৭

৫ গণশক্তি শারদীয় ১৪১০

৬ দেশহিতৈষী শারদীয় ১৪১০

৭ নবকল্লোল শারদীয় ১৪১০

৮ নন্দন শারদীয় ১৪১০

৯ সংবাদ প্রতিদিন শারদীয় ১৪১০

১০ বর্তমান শারদীয় ১৪১০

শক্তিপদ মিত্র ৬৮, সূর্য সেন নগর, বাকুইপুর, কোলকাতা-১৪৪

১ প্রসঙ্গ ধর্মনিরপেক্ষতা—শক্তিপদ মিত্র

শমিত কর জি ডি-৩০১, সেকটর-III, সন্টলেক সিটি, কলকাতা-১০৬

১ বিশ্বায়নের হাল-হকিকৎ—শমিত কর, সম্পাদিত

২ Globalisation : The Emerging Issues—Edited by Samit Kar

শান্তিপদ ভট্টাচার্য ২০/৯এ, রাজামনীন্দ্র রোড, কলকাতা-৩৭

১ দেশ : ২ জুন—১৭ আগস্ট, ২০০৪

২ ঐ : ২ সেপ্টেম্বর—১৭ ডিসেম্বর ২০০৪

৩ ঐ : ডিসেম্বর ২০০৩—ফেব্রুয়ারি ২০০৪

৪ ঐ : মার্চ ২০০৪—মে ২০০৪

শীলা চট্টোপাধ্যায় চন্দননগর, সুখসনাতন তলা

১ The Golden Barge of Poems & songs by Rabindranath Tagore—

Nandadulal Chatterjee, Tr,

গুরুা বন্দ্যোপাধ্যায় পালিত ৪০ই/৩, অনুপম হাউসিং কমপ্লেকস, ফেজ-১, ভি.আই.পি.

রোড, কলকাতা-৫২

১ দেবদাসী নৃত্যধারা—গুরুা বন্দ্যোপাধ্যায় পালিত

শুভাশিস চট্টোপাধ্যায় ৭, চণ্ডীবাড়ী স্ট্রিট, কলকাতা-৭

১ লগুনে স্বামী বিবেকানন্দ, ১ম—মহেন্দ্রনাথ দত্ত

- ২ লগুনে স্বামী বিবেকানন্দ, ২য়—মহেন্দ্রনাথ দত্ত
শ্রীহরকস্তুরী মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ৫ আলেকসজান্দ্রা কোর্ট, ৬০/১ চৌরঙ্গী রোড, পশ্চিমবঙ্গ
কলকাতা-২০
- ১ Vidyasagar : The Ocean Man of Compassion Rendered in English by Shyamal Banerjee ; based on Bengali title Karuna Sagar Vidyasagar by Indra Mitra.
- ২ Vidyasagar—His Continued Relevance
সঙ্ঘমিত্রা চৌধুরী ৫০এ, পূর্ণদাস রোড, কলকাতা-২৯
- ১ কলকাতা দেবীর নির্বাচিত রচনা-সংকলন—সঙ্ঘমিত্রা চৌধুরী, সংকলক
সঙ্ঘল চৌধুরী সারস্বত সমাজ, ৩৩৮, নেতাজী কলোনী, কলকাতা-৯০
- ১ অনন্তশ্রদ্ধাঞ্জলি : শ্রী অননন্তলাল ঠাকুরের অষ্টাশীতিবর্ষপূর্তিতে সারস্বত সমাজের
শ্রদ্ধার্থ, ১৪১১
- সঙ্ঘলকান্তি দত্ত রায় রুম নং-৭, ব্লক নং-বি, রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম, কলকাতা-২৯
- ১ ময়মনসিংহের ইতিবৃত্ত—সঙ্ঘলকান্তি দত্ত রায়
সঞ্জীব নাথ জোনপুর, কেডিয়া বাগান কাঁচড়াপাড়া, ২৪ পরগণা (উঃ), পিন-৭৪৩১৪৫
- ১ বাংলা লোকনাট্য : স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য—সঞ্জীব নাথ
সত্যজিৎ চৌধুরী বঙ্কিমভবন গবেষণা কেন্দ্র কাঁটালপাড়া, নৈহাটি
- ১ সুকুমার সেন : সঙ্গ-অনুষঙ্গ—সত্যজিৎ চৌধুরী
- ২ বঙ্গদর্শন, ৬-৭ : নীহাররঞ্জন রায় শততম জয়ন্তী
- সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রযত্নে : প্রাইমা পাবলিকেশনস, ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭
- ১ বৃত্তের পরিধিতে হাত—সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়
- ২ ভিন দেশে নিজের মুখ—ঐ
- সমীর রায়, সম্পাদক মহাজাতিসদন
- ১ স্মরণিকা : ছাত্র পরিষদ সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন ও পুনর্মিলন উৎসব, মহাজাতি
সদনে অনুষ্ঠিত ২০০৪-এর ২৭, ২৮ ও ২৯ আগস্ট সম্মেলন—সমীর রায়, সম্পাদক
- সম্পাদক, গল্পগুচ্ছ (পত্রিকা) ৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কোলকাতা-৯
- ১ .গল্পগুচ্ছ : শারদ সংখ্যা, অক্টো-ডিসেম্বর ১৪১১ (২০০৪)
- ২ গল্পগুচ্ছ : শীত সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ ১৪১০ (২০০৪)
- সরস্বতী মিশ্র দাওনা গাজী রোড বালী, হাওড়া
- ১ বাউল ফকির কথা—সুধীর চক্রবর্তী
- ২ উনিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি—স্বপন বসু ও ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী, সম্পাদক
- সর্বানী রায় ১১এ/১বি/১, ব্রজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলি লেন, কোলকাতা-৩৩
- ১ মানুষ, প্রকৃতি ও প্রাণীজগৎ : লোক সংস্কৃতির দর্পণে—সর্বানী রায়
- সাগরিকা শর্মা সি ১৬, এল.আই.ই. হাউসিং স্টেট, কলকাতা-৩৭
- ১ পূর্বাচলের পানে তাকাই—সাগরিকা শর্মা
- ২ দেহাসিনী মহারাষ্ট্র—ঐ

সাহিত্যলোক ৩২/৭, বিডন স্ট্রিট, কোলকাতা-৬

- ১ প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতা—অপূর্বকুমার রায়
- ২ কমলাকান্ত—অপূর্বকুমার রায় সম্পাদিত
- ৩ বন্দী কিশোর—খগেন্দ্রনাথ মিত্র
- ৪ পুতুলের দেশে—খগেন্দ্রনাথ মিত্র
- ৫ আগুনের পাহাড়—খগেন্দ্রনাথ মিত্র
- ৬ নীল জলের মুক্তা ডুবুরী—খগেন্দ্রনাথ মিত্র
- ৭ বাউল রাজা—রণজিৎকুমার সেন
- ৮ ছড়ায় অভিধান—অনিবার্ণ রায়
- ৯ হৃন্দ প্রবাহ—লায়েক অলিখান
- ১০ এবং রবীন্দ্রনাথ—পিনাকীরঞ্জন চক্রবর্তী
- ১১ বঙ্গভারতীর ঝাঁপি—জীবেন্দ্র সিংহ রায়
- ১২ বাঙালী মানসে বেদান্ত—ভবতোষ দত্ত
- ১৩ প্রাচীন ভারতে জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চা—রাম ঘোষ
- ১৪ সাগরিকা—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, নির্মলচন্দ্র চৌধুরী, সম্পাদিত
- ১৫ কথাসাহিত্য—অলোক রায়

সুজয় কুমার মণ্ডল লোক সংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

- ১ লোকদর্পণ পত্রিকা : ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০৩

সুজিতকুমার বিশ্বাস দুর্গাপুর

- ১ পূর্ব বাংলার নীলপুজার গান : শোলক—সুজিতকুমার বিশ্বাস

সুদর্শন সেনশর্মা ৫, অরুণাচল পূর্ব, সোদপুর, কোলকাতা-১১০

- ১ আতরানী সর্দার ও অন্যান্য গল্প—সুদর্শন সেনশর্মা
- ২ সুদর্শন সেনশর্মার ছোটগল্প—সুদর্শন সেনশর্মা
- ৩ চিত্রকরের ডানহাত—সুদর্শন সেনশর্মা

সুধীরকুমার দাস 'আশিস', ১৮৩, বালিয়া মেন রোড, কলকাতা-৮৪

- ১ স্মৃতিমালিকা : পরমবৈষ্ণব বসন্তকুমার দাসের জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধার্থ—সুধীরকুমার দাস, সম্পাদিত

সুনীল দাস

- ১ হিমালয়ের অলৌকিক—আনন্দ গিরি
- ২ ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের দোষ—অবন্তীকুমার নন্দ
- ৩ ফল্গু—অবনী ঘোষ
- ৪ আঁচলের ছায়া—সমীরণ গুহ
- ৫ উপহাসের কলকাতা—সুনীল দাস
- ৬ শারদীয়া আনন্দবাজার, ১৪১০
- ৭ শারদীয়া আনন্দবাজার, ১৪০৯
- ৮ শারদীয়া তত্ত্বমসি, ১৪০৯
- ৯ পূজাবার্ষিকী আনন্দলোক, ১৪০৯
- ১০ শারদীয়া পত্রিকা, ১৪১০

- ১১ শারদীয়া পত্রিকা, ১৪০৯
- ১২ Census of India 2001
- সুবন্ধু ভট্টাচার্য 'অভিনন্দন' ৩০ এম, হরেকৃষ্ণ শেঠ লেন, কোলকাতা-৫০
- ১ রবীন্দ্রনাথের অচলায়তন—সুবন্ধু ভট্টাচার্য
- সুবিমল মিশ্র ৭৯৯, আর. এন. টেগোর রোড, কলকাতা-৭৭
- ১ শিবনাথ শাস্ত্রীর কিশোর রচনাসম্ভার—সুবিমল মিশ্র, সঙ্কলন ও সম্পাদিত
- ২ রামব্রহ্ম সান্যালের কিশোর রচনা সংগ্রহ—
- সুব্রত সরকার সূচেতনা, নিবেদিতা পার্ক, ব্রহ্মপুত্র, কলকাতা-৯৬
- ১ চার শালিকের দিন—সুব্রত সরকার
- সুব্রতা দাশগুপ্ত এ৪/৫, কালিন্দী এস্টেট, কলকাতা-৮৯
- ১ সুকুমার কলা ও অন্যান্য প্রবন্ধ—প্রশান্তকুমার দাশগুপ্ত
- সুভাষ দাস মাতৃসদন, চাকলাপাড়া, প্রবাস নগর, শ্রীরামপুর, হুগলি-৭১২২৪৯
- ১ অন্যরূপের মানুষ—সুভাষ দাস
- সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী অমর অ্যাপার্টমেন্টস্, ৮৭ এন. এস. রোড, আসানসোল-৭১৩৩৩১
- ১ ভক্তি অর্ঘ্য—সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী
- সুষমা মিত্র টিকরহাট, লাকুড্ডি, বর্ধমান-৭১৩১০২
- ১ বারগার জলছবি—সুষমা মিত্র
- স্বামী জগদীশ্বরানন্দ ১০, গালিফ স্ট্রীট, সুইট নং-৬৩, ব্লক-৫, কলকাতা-৩
- ১ তন্ত্রবিজ্ঞান—শক্তিন্দ্র ও পূজাতন্ত্র প্রসঙ্গে—মহানামব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়
- ২ পরমার্থ প্রসঙ্গে—১০ম খণ্ড, মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ
- ৩ পরমার্থ প্রসঙ্গে—১০ম খণ্ড, মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ
- হারিসুল হক বাড়ি-১৩, এডিনিউ-১, ব্লক-এ, সেকটর-১১, মিরপুর ঢাকা-১২১৬, বাংলাদেশ
- ১ আমি অভিসারে যাবো—হারিসুল হক
- ২ মেতেছি বধির রাতে—হারিসুল হক
- ৩ হৃদয়ে বহে না—হারিসুল হক
- হেনা চৌধুরী
- ১ দেশনায়ক নেতাজী সুভাষ—হেনা চৌধুরী
- ২ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত : শতবর্ষের আলোকে—১৯০৩-২০০৪—হেনাচৌধুরী ও
গৌরগোপাল দাস সম্পাদক
- হেনা বসু কলকাতা
- ১ Castes in Bengal : Some Bengali Publications 1840-1940—
Compiled by Hena Basu
- Clinton B Seely
- ১ A poet Apart : A Literary Biography of the Bengali Poet Jihanananda Das (1899-1954)—Clinton B Seely
- Harinath Banerjee 62/1A/1, Prince Golam, Hossain Shah Road, Kolkata-32
- ১ Queen Elizabeth I : Her virginity & marriage baits—Harinath Banerjee
- Pratul Kr. Pandit 40/1, Tangra Road, Kolkata-15
- ১ Distance Education : Collection of articles

২৩২/ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১২ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা

Presidency College Alumni Association 86/1, College Street, Kolkata-73

1 Autumn Annual : Volume XXXIII : 2004-2005

Principal Kharagpur College Paschim Medinipur, Pin : 721305

1 Militant Nationalism in Midnapore Till 1947

[পরিশিষ্ট 'ক']

প্রয়াত চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থাগার থেকে প্রাপ্য

- ১ আরবি-বাংলা অভিধান
- ২ প্রাচীন বাংলা ও বাঙালি
- ৩ ভারতের ভাষা ও ভাষা সমস্যা
- ৪ বাংলা সাহিত্যের কথা
- ৫ ভারতের সংস্কৃতি
- ৬ কীর্ত্তণ
- ৭ বাঙালি হিন্দুর বর্ণভেদ
- ৮ ভারত শিল্পে মূর্তি
- ৯ ভারতের সংস্কৃতি
- ১০ বৈশেষিক দর্শন
- ১১ ধনুর্বেদ
- ১২ মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালি
- ১৩ প্রাচীন ভারতের সঙ্গীত চিন্তা
- ১৪ প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা
- ১৫ ভারত শিল্পের ষড়ঙ্গ
- ১৬ বঙ্গীয় নাট্যশালা
- ১৭ ভারতীয় সাধনার ঐক্য
- ১৮ বাংলার চাষী
- ১৯ বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ
- ২০ বাংলার রায় ও জমিদার
- ২১ বাংলার সাধনা
- ২২ উপনিষৎ
- ২৩ হিন্দু সঙ্গীত
- ২৪ ভারত দর্শনসার
- ২৫ যুক্তোত্তর বাংলার কৃষি শিল্প
- ২৬ সমতট-৪১
- ২৭ ঐতরেয়ালোচনম্
- ২৮ স্বাধেদ-সংহিতা-৪
- ২৯ গ্রন্থকণ—জুন ১৯৭৮
- ৩০ বেদ গ্রন্থমালা—৯

- ৩১ সমতট—৯৩—৯৪
- ৩২ মনুর বর্ণাশ্রম ধর্ম
- ৩৩ স্বামী বিবেকানন্দ
- ৩৪ The Early Italian Poets
- ৩৫ The Vision etc of Dante
- ৩৬ Metamorphosis of Ovid
- ৩৭ Herelies your motherland
- ৩৮ ডাক্তার উদ্ভৃতি : প্রথম পাঠ
- ৩৯ তদেব, প্রথম পাঠ
- ৪০ Aristophanes : Gibbert Murray
- ৪১ Speculations :
- ৪২ Aeschylus and Athens
- ৪৩ The Journal of Engene Delacsoix
- ৪৪ Racine : Theatre Complete
- ৪৫ The Ligacy of Greece
- ৪৬ Roussouey : Les Confessious
- ৪৭ John Donne : Comple Poetry and Selected Prose.
- ৪৮ Undertones of War
- ৪৯ Blackmail or War
- ৫০ Europe and the Czecho
- ৫১ Germany puts the clock back
- ৫২ Thomas Mahn : Budden b....ks.
- ৫৩ Atlas of Ancient and Classical
- ৫৪ The plays of Euripodes
- ৫৫ The Oxford Book of Greek Versc.
- ৫৬ The Works of W. Shakespeare-vol-I
- ৫৭ তদেব—Vol II
- ৫৮ তদেব—Vol III
- ৫৯ তদেব—Vol IV
- ৬০ তদেব—Vol V
- ৬১ Aristophanes com.....-1
- ৬২ তদেব—২
- ৬৩ ঋগ্বেদসংহিতা—৬
- ৬৪ কবিকঙ্কন চণ্ডী
- ৬৫ অথর্ববেদ (বেদগ্রন্থমালা, প্রথম খণ্ড)
- ৬৬ তদেব—২ খণ্ড
- ৬৭ A short life of Shakespeare
- ৬৮ বিষ্ণুদেব শ্রেষ্ঠ কবিতা
- ৬৯ সংসাহিত্য গ্রন্থাবলী—দ্বিতীয়
- ৭০ Man and Superman
- ৭১ প্রবাহিনী

- ৭২ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—আমার কবিতা
- ৭৩ সাহিত্যের ভবিষ্য
- ৭৪ কুহ ও কেকা
- ৭৫ Complete Wroks of Homer
- ৭৬ কবিকঙ্কণ চণ্ডী : [বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-তর .. : Accession No]
- ৭৭ ঋগ্বেদ সংহিতা—Part I
- ৭৮ তদেব—Part I
- ৭৯ তদেব—Part II
- ৮০ তদেব—Part V
- ৮১ তদেব—Part IV
- ৮২ তদেব—Part III
- ৮৩ পুরাণম July 1992
- ৮৪ তদেব July 1993
- ৮৫ তদেব Jan. 1992
- ৮৬ তদেব Jan. 1993
- ৮৭ পুনশ্চপারি
- ৮৮ কোরান শরীফ
- ৮৯ হেকটর বর্ষ
- ৯০ রামায়ণ
- ৯১ পদকঙ্কণতর—২
- ৯২ তদেব—৪
- ৯৩ তদেব—৫
- ৯৪ বিষ্ণু দে : একুশ বাইশ
- ৯৫ হে বিদেশী ফুল
- ৯৬ Against the Stream
- ৯৭ ভারতের কারুশিল্প

(পত্রপত্রিকা)

- ৯৮ সাহিত্যপত্র ১৩৫৫-৫৬
- ৯৯ তদেব, বসন্ত সংখ্যা ১৩৬০
- ১০০ তদেব, শারদীয় ১৩৫৫
- ১০১ তদেব, বসন্ত, ১৩৭৫
- ১০২ তদেব, শ্রাবণ ১৩৫৫
- ১০৩ ঞ্জস্তিকাল—১
- ১০৪ তদেব—২
- ১০৫ সাহিত্যচিন্তা
- ১০৬ Rules for Compiling Catalogues (British Museum)
- ১০৭ গ্রন্থাগার
- ১০৮ আধুনিক সাহিত্য
- ১০৯ Three Pleasurable Trips

- ১১০ মার্কসবাদী - ষষ্ঠ সংকলন
- ১১১ এক্ষণ, প্রথম বর্ষ, ২য় সংখ্যা
- ১১২ তদেব, তদেব ৫ম সংখ্যা
- ১১৩ তদেব, দাস্তে বিশেষ সংখ্যা
- ১১৪ তদেব, ১৩৮৭
- ১১৫ তদেব, ১৩৭৭
- ১১৬ তদেব, ১৩৭৫
- ১১৭ তদেব, ১৩৯৯
- ১১৮ তদেব, ১৩৯১
- ১১৯ তদেব, ১৪০০
- ১২০ সাহিত্য পত্র, বসন্ত, ১৩৭৫
- ১২১ সমতট—১০৩ সংখ্যা
- ১২২ তদেব—৯০ সংখ্যা
- ১২৩ তদেব—৯১ „
- ১২৪ তদেব—৮৬ „
- ১২৫ তদেব—৮৯ „
- ১২৬ তদেব—৯৭
- ১২৭ তদেব—৫৭-৫৮
- ১২৮ তদেব—১২৮
- ১২৯ উত্তরসূরী—১৩৮২
- ১৩০ তদেব—১৩৮৩
- ১৩১ পরিচয়—চৈত্র, ১৩৫১
- ১৩২ সীমান্ত ১৩৬১, ফাল্গুন

পরিশিষ্ট 'খ'

অধ্যাপক রমাকান্ত চক্রবর্তী প্রদত্ত গ্রন্থ এবং পত্রিকার তালিকা ১৪১১

রমাকান্ত চক্রবর্তী বিদ্যাসাগর আবাসন, ১০ নং রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রিট, কলকাতা-৬

- ১ ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি—কিশোর রায় গোস্বামী
- ২ ভক্তিকাব্য চয়নিকা—কিশোর রায় গোস্বামী
- ৩ প্রমাণ ধারা—কিশোর রায় গোস্বামী
- ৪ ভক্তিকুসুম পরাগ—কিশোর রায় গোস্বামী
- ৫ শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীজগন্নাথদেবের নীলাচল ও সুন্দরাচললীলা লহরী—

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞানযতি মহারাজ

- ১ কলকাতার চানচিহ্ন—ডঃ অতুল সুর
- ২ আষাঢ়ে বই—মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

- ৩ আব্দুমসি—রাজ্যেশ্বর মিত্র
- ৪ প্যারী কমিউন—অমলেন্দু সেনগুপ্ত
- ৫ স্রোতের বিপরীতে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী—রঞ্জনা দত্ত
- ৬ গোড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ভূমিকা—ডঃ সুখেন্দুসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়
- ৭ কালে কালে কলকাতা—কাজল মিত্র
- ৮ ধর্মীয় মৌলবাদ ও ধর্ম নিরপেক্ষতা—অমলেন্দু দে
- ৯ মুখর সময় : নানামুখ—অমলেন্দু সেনগুপ্ত
- ১০ Lord's Lyrical Lore—Nirmal Gupta
- ১১ A Modern Comedy—John Galsworthy (3)
- ১২ A Modern Comedy—John Galsworthy (2)
- ১৩ A Modern Comedy—John Galsworthy (1)
- ১৪ The Forsyte Saga—John Glasworthy 1+1 = 2 Copy
- ১৫ The Forsyte Saga—John Glasworthy 2 = 2 Copy
- ১৬ The Forsyte Saga—John Glasworthy 3 = 2 Copy
- ১৭ Short Novels and Storees—A.P. Chekhov
- ১৮ India and The West—Barbara Ward
- ১৯ বর্ধমান জেলার মেলা সমাজতাত্ত্বিক—গোপীকান্ত কোষ্ঠার
- ২০ পার্থিব—শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
- ২১ রামায়ণ—বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী
- ২২ কবিতার মুহূর্ত—শঙ্ক ঘোষ
- ২৩ কান্তা ও কাব্য—হরিহর মিশ্র
- ২৪ জাতির জনক গান্ধীজি—রঘুনাথ মাইতি
- ২৫ বিদ্যাসাগর এক আধুনিক মানুষ—শ্যামাপ্রসাদ বসু
- ২৬ বাংলাপ্রবাদে স্থানকাল পাত্র—বরুণকুমার চক্রবর্তী
- ২৭ শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী জীবনী—মন্টু চক্রবর্তী
- ২৮ ইতিহাসের হারানো গল্প—প্রণব রায়
- ২৯ ইসলাম মৌলবাদ ও মৌলবিবাদ—হোসেনুর রহমান
- ৩০ সম্পর্ক—সুহাস ঘোষ
- ৩১ আরো বারো—সত্যজিৎ রায়
- ৩২ লোকশ্রুতির মনঃ কুলাচার সমীক্ষা—গোরাচাঁদ কুন্ডু
- ৩৩ The Most Dangerous Man in America—Catherine Drinker Bowen
- ৩৪ Twelve Essential Upanishads—Vol-1. Bhauti Prajnan Yati Maharaj
- ৩৫ সমতট প্রকাশন—Vol 33 Number-3
- ৩৬ পরিচয়—৬৫ বর্ষ, ৬-৭ সংখ্যা
- ৩৭ তিস্তা তোরবা শারদ সংকলন—মহালয়া ১৯৯৯
- ৩৮ শ্যামাপ্রসাদের ডায়েরী ও মৃত্যু প্রসঙ্গ—উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

- ৩৯ মানুসী—প্রফুল্ল রায়
- ৪০ আধুনিক কবিতা ও সুধীন্দ্র-কবি মানস—রমেন্দ্রনাথ মল্লিক
- ৪১ বিভাব—Vol-14, No-2
- ৪২ বিভাব—Vol-14, No-3.
- ৪৩ *The First Circle*—Alexander Solzhenitsyn
- ৪৪ *Walden and Civil Disobedience*—Owen Thomas
- ৪৫ *Twilight in China*—K.P.S. Menon
- ৪৬ *Jawaharlal Nehru Memorial*—1973-79, Margaret Mead
- ৪৭ *Gramophone in India*—Santosh Kumar De
- ৪৮ এলিঅট ও বাংলা সাহিত্য—বার্ণিক রায়
- ৪৯ ফ্যানটাসটিক—দ্বাদশ বার্ষিকী ; ১৯৮৯
- ৫০ রবিবাসর—প্রফুল্লকুমার স্মৃতিগ্রন্থ ২১
- ৫১ রবিবাসর—প্রফুল্লকুমার স্মৃতিগ্রন্থ ২০
- ৫২ রবিবাসর—প্রফুল্লকুমার স্মৃতিগ্রন্থ ১৮
- ৫৩ সমতট—বর্ষ ২৪ সংখ্যা - ২
- ৫৪ সমতট—বর্ষ ২২ সংখ্যা - ৩
- ৫৫ সমতট—অক্টোঃ-ডিসেঃ ১৯৮৮
- ৫৬ সমতট—বর্ষ-২০ পূর্তি সংখ্যা
- ৫৭ সমতট—বর্ষ-২১ বর্ষপূর্তি সংখ্যা ১৯৯০
- ৫৮ সমতট—বর্ষ-২২ - ১ম সংখ্যা ১৯৯০
- ৫৯ কিশোর সমতট—ষষ্ঠ সংখ্যা মার্চ-১৯৯৩
- ৬০ আধুনিক সাহিত্য এবং—বিংশতি বর্ষ ২য় সংখ্যা ১৯৯১
- ৬১ বর্তমান—শারদ সংখ্যা ১৪০৫ দ্বাদশ
- ৬২ বর্তমান—ত্রয়োদশ শারদ সংখ্যা ১৪০৬
- ৬৩ বর্তমান—শারদ সংখ্যা ১৪০৭
- ৬৪ দেশ—শারদীয় সংখ্যা ১৪০৭
- ৬৫ আনন্দবাজার—শারদীয়া ১৪০৬
- ৬৬ আনন্দবাজার—শারদীয়া ১৪০৭
- ৬৭ ঘরের মধ্যে ঘর—শংকর
- ৬৮ কাগজে রক্তের দাগ—সৈয়দ মুস্তাফা সিবাজ
- ৬৯ সাধুসন্তের দেশে—নিগূঢ়ানন্দ
- ৭০ মৃত্যু ও পরলোক—নিগূঢ়ানন্দ
- ৭১ ভরিয়া লইতে কুড়—জয়ন্তী ভট্টাচার্য
- ৭২ রক্ত করবী—গ্রীষ্ম সংখ্যা ১৩৯৯
- ৭৩ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি—অক্ষয়কুমার সেন
- ৭৪ শারদীয়া পত্রিকা—শারদীয়া ১৪০৬

২৩৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১২ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা

- ৭৫ আজকাল—শারদীয়-১৪০৫
- ৭৬ আজকাল—শারদীয়-১৪০৬
- ৭৭ রাজনৈতিক চেতনা ও বাংলা উপন্যাস—রমেন্দ্র বর্মণ
- ৭৮ ভারতীয় নবজাগরণে রামমোহন ও শরৎচন্দ্র—প্রভাস ঘোষ ও মানিক মুখার্জী
- ৭৯ ইতিহাসের মুক্তি—অতুলচন্দ্র গুপ্ত
- ৮০ কালকূট—শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
- ৮১ প্রভাত গ্রন্থাবলী ৩য় খণ্ড—প্রভাত মুখোপাধ্যায়
- ৮২ অমৃতলোক ক্রোড়পত্র—২২বছর ৩য় সং ১৯৮৮
- ৮৩ মূল্যায়ন—বর্ষ-২৭ শারদীয় ১৩৯৮
- ৮৪ মূল্যায়ন—বর্ষ-প্রথম সং ২য় ৯৭-৯৮
- ৮৫ কোরক সাহিত্য পত্রিকা—বনফুল সং May—Aug-99
- ৮৬ কোরক সাহিত্য পত্রিকা—প্রাক শারদ ১৪০০
- ৮৭ পরিচয়—৬৯ বর্ষ মার্চ ২০০০
- ৮৮ পরিচয়—৬৪ বর্ষ মে-জুলাই ৯-১২ সং ১৯৯৫
- ৮৯ অনুষ্ঠাপ বিশেষ সংখ্যা—Vol 25, No-4 1991
- ৯০ কলাবতী—পুস্তক মেলা কলকাতা ২০০৩
- ৯১ আধুনিক মানসিকতা ও বিদ্যাসাগর—সন্তোষকুমার অধিকারী
- ৯২ লোকসংস্কৃতি গবেষণা—১৩বর্ষ সং-২ শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪০৭
- ৯৩ কিরাত ভূমি—বর্ষা সংখ্যা ১৪০৮
- ৯৪ পরিচয়—৬৩বর্ষ ডিসেম্বর ১৯৯৩ ৪-৫ সংখ্যা
- ৯৫ Studies History and Culture—Vol-4, Number 1, March 1996
- ৯৬ চতুরঙ্গ—বর্ষ-৬০, সংখ্যা-২, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪০৭
- ৯৭ পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ (স্মরণিকা)—ষোড়শ বার্ষিক সম্মেলন ২৪-২৬, জানু ২০০০
- ৯৮ শারদীয়া সঙ্কসাধী—৫৯বর্ষ, সংখ্যা-৬, আশ্বিন ১৪০৪
- ৯৯ তদেব,—৬২বর্ষ, সংখ্যা-৬, আশ্বিন ১৪০৭
- ১০০ তদেব,—৬৩বর্ষ, সংখ্যা-৬, আশ্বিন ১৪০৮
- ১০১ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—৮০বর্ষ সংখ্যা ১,৩, ১৩৮০
- ১০২ তদেব,—৮৩ বর্ষ সংখ্যা ১-২ ১৩৮৩
- ১০৩ তদেব,—৮৫ বর্ষ সংখ্যা ১-২ ১৩৮৫
- ১০৪ তদেব,—৮৬ বর্ষ সংখ্যা ২-৩, ১৩৮৬
১০৫. তদেব,—৮৭ বর্ষ সংখ্যা ২,৩, ১৩৮৭
- ১০৬ তদেব,—৮৮ বর্ষ সংখ্যা ৩,৪, ১৩৮৮
- ১০৭ তদেব,—৮৯ বর্ষ সংখ্যা ১-২ ১৩৮৯
- ১০৮ তদেব,—৯০ বর্ষ সংখ্যা ১,৩,৪, ১৩৯০
- ১০৯ তদেব,—৯৩ বর্ষ সংখ্যা ১, ২-৪,
- ১১০ রামায়ণ : খোলা চোখে—হরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

- ১১১ পরমযোগিনী আনন্দময়ী মা ১ম পর্ব—গঙ্গেশ চক্রবর্তী
- ১১২ উপন্যাস সমগ্র (৬)—রমাপদ চৌধুরী
- ১১৩ পরশপাখর—প্রতিভা বসু
- ১১৪ সেই পাখী—কুমারশঙ্কর সেনগুপ্ত
- ১১৫ সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠগল্প—সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
- ১১৬ সংস্কৃতির বিবর্তন—অন্নদাশঙ্কর রায়
- ১১৭ টেনিদা সমগ্র—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
- ১১৮ মৌলবাদের উৎস সন্ধানে—ভবানীপ্রসাদ সাহ
- ১১৯ *Twelve Essential Upanishads Vol 2.*—Bhakti Prajnan Yati Maharaj
- ১২০ *Prize Storees 1990*—Henry Awards
- ১২১ বেদ-বেদান্ত পূর্ব ঋগু ব্রহ্মসূত্র—মহানামব্রত ব্রহ্মচারী
- ১২২ ভারতের সাধক—শঙ্করনাথ রায়
- ১২৩ রবীন্দ্র রম্যকথা—আদিত্য গুহদেদার
- ১২৪ অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভে বাঙ্গলাও বাঙ্গালী—শ্যামাপ্রসাদ বসু
- ১২৫ বালিকা বধু—বিমল কর
- ১২৬ *Without Precedent*—Joan Hoff Wilson
- ১২৭ *Man and Animals*—Yuri Dmitriyev
- ১২৮ ভারত সংস্কৃতিতে ভগবান কৃষ্ণ—কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
- ১২৯ কুন্তলীন গল্প শতক—বারিদবরণ ঘোষ
- ১৩০ পোড়ামাটির পুতুল—বীরেন্দ্র দত্ত
- ১৩১ সেতুবন্ধন—অন্নদাশঙ্কর রায়
- ১৩২ অন্তর্ঘাত—বীরেন্দ্র দত্ত
- ১৩৩ আবহমান ভারত—রঞ্জিত সেন
- ১৩৪ হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক ভাল করার উপায়—ডঃ নজরুল ইসলাম
- ১৩৫ ভাবিত পুরুষ অ-ভাবিত নারী—রঞ্জিত সেন
- ১৩৬ খুঁজে বেড়াই—স্বপনকুমার রায়
- ১৩৭ ভ্রমণ সঙ্গী (সমগ্র ভারত)—এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী
- ১৩৮ সমকালীন চিন্তা—আবুল ফজল
- ১৩৯ সিদ্ধ থেকে গঙ্গারিডি—সরোজ দত্ত
- ১৪০ আশপাখীর ডাক—দীপক মিত্র
- ১৪১ মহাজন সংবাদ—গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়
- ১৪২ *Origin and Development of Jatra*—Sushanta Sarkar
- ১৪৩ ভ্রমণ কাহিনী সমগ্র—অবধুত
- ১৪৪ *A Comparative Approach to American History*—C.Vann Woodward
- ১৪৫ মহাজীবন কথা—দয়াময়ী মজুমদার
- ১৪৬ বেদ-বেদান্ত পূর্ব ঋগু ব্রহ্মসূত্র—মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

১৪৭. সংযোগের সন্ধানে লোকসংস্কৃতি—ক্ষেত্রশুপ্ত
১৪৮. পাগলী তোমার সঙ্গে—জয় গোস্বামী
১৪৯. আমার জীবনযাত্রা—রাহুল সাংকৃত্যায়ন
১৫০. ত্রিপুরার জলবায়ু ও প্রকৃতি—বিশ্বেন্দু ভট্টাচার্য
১৫১. সমাজ সংস্কৃতি প্রগতি—রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
১৫২. রবীন্দ্রনাথ ও রোটেনস্টাইন—অশ্বশিকদার
১৫৩. কঠিন প্রবাসে—বীরেন্দ্র দত্ত
১৫৪. মহাবিদ্রোহ বিদ্রোহ ও বাংলা উপন্যাস—রমেন্দ্র বর্মণ
১৫৫. বেদ-বেদান্ত উত্তর খণ্ড—মহানামব্রত ব্রহ্মচারী
১৫৬. *Journal of The Asiatic Society*—Vol XXVII No-3 1985
১৫৭. “ “ “ “ —Vol XXVIII No-3 1986
১৫৮. “ “ “ “ —Vol X No-1-4 1968
১৫৯. “ “ “ “ —Vol XXIII No-3-4 1981
১৬০. “ “ “ “ —Vol XXV No-1-4 1983
১৬১. “ “ “ “ —Vol XXVII No-4 1985
১৬২. “ “ “ “ —Vol XXVII No-1 1985
১৬৩. “ “ “ “ —Vol XXI No-1-2 1979
১৬৪. “ “ “ “ —Vol VI No-3-4 1964
১৬৫. “ “ “ “ —Vol XXXVII No-4 1995
১৬৬. “ “ “ “ —Vol XXVII No-1 1985
১৬৭. “ “ “ “ —Vol XXXI No-1-2 1989
১৬৮. “ “ “ “ —Vol XXVI No-1-4 1984
১৬৯. “ “ “ “ —Vol XXV No-1-4 1983
১৭০. “ “ “ “ —Vol XXVI No-2 1985
১৭১. “ “ “ “ —Vol XXXVII No-2 1995
১৭২. “ “ “ “ —Vol XXXVI No-1 1994
১৭৩. “ “ “ “ —Vol XXVIII No-1 1986
১৭৪. “ “ “ “ —Vol XXVIII No-4 1986
১৭৫. “ “ “ “ —Vol XXVIII No-2 1986
১৭৬. “ “ “ “ —Vol XXVIII No-3 1986
১৭৭. “ “ “ “ —Vol XXVI No-1-4 1984
১৭৮. “ “ “ “ —Vol IV No-2 1969
১৭৯. “ “ “ “ —Vol XXXVII No-3 1995
১৮০. “ “ “ “ —Vol XXXV No-4 1993
১৮১. “ “ “ “ —Vol XXXVI No-3 1994
১৮২. “ “ “ “ —Vol VIII No-1 1966

১৮৩. *Journal of The Asiatic Society* —Vol VIII No-4 1966
- ১৮৪ " " " " —Vol XXV No-1-4 1983
- ১৮৫ " " " " —Vol XV No-1-4 1973
- ১৮৬ " " " " —Vol XXVI No-1-4 1984
- ১৮৭ ইতিহাস নবপর্যায়—২য় খণ্ড মাঘ-চৈত্র ১৩৭৪
- ১৮৮ আনন্দলোক—৯ই মে ১৯৯২
- ১৮৯ *Homage to Ananda Coomaraswamy*—Kalyan Kumar Ganguly
- ১৯০ *30 Short Stories 1917-1967*—Maxim Gorky
- ১৯১ সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ—Vol L1 No-9 1968
- ১৯২ " " " —Vol L No-12 1968
- ১৯৩ " " " —Vol LV No-7 1972
- ১৯৪ " " " —Vol LXIV No-6-12 1982
- ১৯৫ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কালপঞ্জী—প্রবীরকুমার লাহা
- ১৯৬ *International Relations Power and Justice*—James H. Wolfe
- ১৯৭ ঝালাপালা ছোটদের বার্ষিকী—১৪০৯
- ১৯৮ *Calcutta Book Fair*—1990
- ১৯৯ মুসলিম আদর্শ ও কর্মের রূপান্তর—সৈয়দ আবদুল হালিম
- ২০০ দেবতার মানবায়ন—নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী
- ২০১ বাঙ্গলা কীর্তনের ইতিহাস—হিতেশরঞ্জন সান্যাল
- ২০২ মৃগয়া—ভগীরথ মিশ্র
- ২০৩ ভারতের আর্থ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা—ভাস্কর চট্টোপাধ্যায়
- ২০৪ মোম্বা নাসীরুদ্দীনের গল্প—সত্যজিৎ রায়
- ২০৫ দুই ভারতবর্ষ—অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
- ২০৬ নদী বিজ্ঞানের কথা—শিবরাম বেড়া
- ২০৭ শ্রীঅমিয় নিমাই চরিত—শিশিরকুমার ঘোষ
- ২০৮ হারানো দিন—সুহাস বন্দ্যোপাধ্যায়
- ২০৯ *The Twin in the Twost*—Ranjit Sen
- ২১০ *Out of Our Past*—Carl N. Degler
- ২১১ *First Person America*—Ann Banks
- ২১২ ইতিহাস ও সাম্প্রদায়িকতা—গৌতম নিয়োগী
- ২১৩ আধুনিকতা পর্ব থেকে পর্বান্তর—তপোধীর ভট্টাচার্য
- ২১৪ রবীন্দ্রনাথ শিশু সাহিত্য—মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
- ২১৫ বাংলার পুরনারী—দীনেশচন্দ্র সেন
- ২১৬ দেশ বিদেশের ভৌতিক গল্প—সুধাংশুকুমার গুপ্ত
- ২১৭ বাংলার লোকসাহিত্যে রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গ—গৌরী ভট্টাচার্য
- ২১৮ ভারতের সাধক—শঙ্করনাথ রায়

- ২১৯ *Society and Change*—Vol. XII No-1 1998
 ২২০ " " —Vol. X No-3 1995
 ২২১ " " —Vol. X No-1-2 1995
 ২২২ " " —Vol. I No-3 1980
 ২২৩ " " —Vol. 3 No-2 1983
 ২২৪ " " —Vol. VII No-2-3
 ২২৫ " " —Vol. VIII No-1
 ২২৬ *Journal of The Asiatic Society*—Vol-XLIY No 1
 ২২৭ " " " —Vol-XLIY No 2 Copy 3
 ২২৮ " " " —Vol-XLIY No 3
 ২২৯ " " " —Vol-XLIY No 4
 ২৩০ " " " —Vol-XXXV No 3
 ২৩১ " " " —Vol-XLIV No 3
 ২৩২ " " " —Vol-XLIV No 4
 ২৩৩ " " " —Vol-XLV No 1
 ২৩৪ " " " —Vol-XLV No 2
 ২৩৫ " " " —Vol-XLIV No 3
 ২৩৬ " " " —Vol-XLIII No 1
 ২৩৭ " " " —Vol-XLIII No 2
 ২৩৮ " " " —Vol-XLIII No 3 2 Copy
 ২৩৯ " " " —Vol-XLIII No 4
 ২৪০ " " " —Vol-XLIII No 4
 ২৪১ *সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ*—Vol. LXXI No- 1-12 1988-89
 ২৪২ " " " —Vol. LXIX No- 1-12 1986-87
 ২৪৩ " " " —Vol. LXX No- 1-12 1987-88
 ২৪৪ " " " —Vol. LXXIII No- 1-12 1990-91
 ২৪৫ " " " —Vol. LXVI No- 1-12.1983-84
 ২৪৬ *লোক সংস্কৃতি গবেষণা*—Vol. 12 No. 3 1999
 ২৪৭ " " " —Vol. 11 No. 1 1998
 ২৪৮ " " " —Vol. 10 No. 1+2 1997
 ২৪৯ " " " —Vol. 9 No. 2 1996
 ২৫০ " " " —Vol. 5 No. 2 1994
 ২৫১ " " " —Vol. 4 No. 4 1993
 ২৫২ " " " —Vol. 3 No. 2 1992
 ২৫৩ *Society and Change*—Vol XI No. 2
 ২৫৪ " " " —Vol VII No. 1

- ২৫৫ *Society and Change* —Vol III No. 3
 ২৫৬ ” ” ” —Vol II No. 3
 ২৫৭ ” ” ” —Vol I No. 2
 ২৫৮ ” ” ” —Vol V No. 4
 ২৫৯ ” ” ” —Vol 2 No. 1
 ২৬০ *State and Society*—Vol-5 No 1 1984
 ২৬১ ঐতিহাসিক—প্রথম সংখ্যা ১৩৮৩
 ২৬২ অবভাস—১ম বর্ষ ২য় সং ২০০১
 ২৬৩ স্নিগ্ধজন—১ম বর্ষ ৩য় সং ১৪০৭
 ২৬৪ আঙ্গু অন্বেষণ—বার্ষিক সংকলন ২০০১
 ২৬৫ নড়াইল—শান্তিপদ ভট্টাচার্য
 ২৬৬ শারদীয়া সংশ্লুক সাহিত্যপত্রিকা—১৩৯৩
 ২৬৭ *Statistical Hand Book*
 —1991, 1996, 1998 One Book
 ২৬৮ *South India Tourist Guide*—T.G.S. Balaram Iyer
 ২৬৯ *Russian Poets 1917-1967*
 ২৭০ *International Affairs 1917. 1967*
 ২৭১ *Society and Change*—Octo-Dec. 1979 Vol-I No-I
 ২৭২ লোকসংস্কৃতি গবেষণা—৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা ১৩৮৯
 ২৭৩ বাকুড়া লোকসংস্কৃতি—১৮ বর্ষ ১ম সংখ্যা ১৯৯৮
 ২৭৪ চতুষ্কলন—১২ বর্ষ বৈশাখ ১৩৭৯
 ২৭৫ পরিচয়—কার্তিক-পৌষ ১৪০৫
 ২৭৬ কোরক সাহিত্য পত্রিকা—May-Aug. 2002
 ২৭৭ ” ” ” বইমেলা—Janu.-April 2004
 ২৭৮ ” ” ” শারদীয়—১৩৯৮
 ২৭৯ বঙ্গদর্শন—November-2001
 ২৮০ ” —Feb - 2001
 ২৮১ নান্দনিক সময়—নবম বর্ষ-২০০১
 ২৮২ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা—৮৮বর্ষ ২য় সংখ্যা ২ কপি
 ২৮৩ ” ” ” —৮৪ বর্ষ ১-২, ৩-৪ সংখ্যা ১৩৮৪
 ২৮৪ ” ” ” —৯২ বর্ষ ১ম-২য়, ৩য়-৪র্থ সংখ্যা ১৩৯২
 ২৮৫ ” ” ” —৯০ বর্ষ ১ম, ৩য় সংখ্যা ১৩৯০
 ২৮৬ ” ” ” —৮২ বর্ষ ১ম-২য়, ৩য়-৪র্থ সংখ্যা ১৩৮২
 ২৮৭ ” ” ” —৮০ বর্ষ ২য়, ৪র্থ সংখ্যা ১৩৮০
 ২৮৮ ” ” ” —৮৭ বর্ষ ২য় সংখ্যা ১৩৮৭
 ২৮৯ ” ” ” —৭৯ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা ১৩৭৯

- ২৯০ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা — ৯৩ বর্ষ ১ম, সংখ্যা ১৩৯৩
২৯১ ” ” ” — ৮৯ বর্ষ ৩য়-৪র্থ সংখ্যা ১৩৮৯
২৯২ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা — ১০৫ বর্ষ ১-৪ সংখ্যা ১৪০৫
২৯৩ গানের বইয়ে রবীন্দ্রনাথের গান—সর্বানন্দ চৌধুরী
২৯৪ নির্বাচিত প্রবন্ধ সংকলন—জানকীবল্লভ পট্টনায়ক
২৯৫ Rabindranath The Great Internationalist—Samirsekhar Sarkar
২৯৬ ব্রাহ্মনা ভাবধারা ও আধুনিক হিন্দুধর্ম—অশোক রুদ্র
২৯৭ সমাজ বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ভগবদ্গীতা—জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়
২৯৮ সমাবেশ—অমর মিত্র
২৯৯ জীবন অন্তহীন—প্রভাষ রায়
৩০০ বিষয় নারী—অনুরাধা কুন্ডা
৩০১ ভারতের সাধক ১ম খণ্ড—শঙ্করনাথ রায়
৩০২ রেজারেকশান—লিও টলষ্টয়
৩০৩ চৈতন্যচর্চার পাঁচশো বছর—দেবাশিষ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩০৪ বহিঃপতঙ্গ—শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
৩০৫ নীলবিদ্রোহের চরিত্র ও বাঙালী বুদ্ধিজীবী—তপোবিজয় ঘোষ
৩০৬ A Tribute to ma Indira Devi—Mihir Kumar Roy
৩০৭ মহাপৃথিবীর মানুষ—সমীর রক্ষিত
৩০৮ বাংলার খাবার—প্রণব রায়
৩০৯ পার্বত্য চট্টগ্রামের কৌমসমাজ—স্বপ্না ভট্টাচার্য্য
৩১০ সাধুসন্তের মহাসংগমে ১ম—শঙ্করনাথ রায়
৩১১ সুভাষচন্দ্র বসু ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস—শ্যামাপ্রসাদ বসু
৩১২ The Second International 1889-1914
৩১৩ ভারত ইতিহাসের ধারাও সংঘ পরিবার—শ্যামাপ্রসাদ বসু
৩১৪ সুবর্ণরেখার আলপনা—আবুল আহসান চৌধুরী
৩১৫ বাঙালির সাহিত্য—ভবতোষ দত্ত
৩১৬ শ্রীশ্রীলোকনাথ মাহাত্ম্য—কেদারেশ্বর সেনগুপ্ত
৩১৭ Once A Blue Goe—Remesh Menon

নতুন অধ্যায়ের যাত্রা শুরু
সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ
(১৯৫৫—২০০৫)



১৯৫৫ থেকে ২০০৫, দীর্ঘ ৫০ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ দেশবাসীর সেবায় নিয়োজিত।

প্রায় ৫০ লক্ষ বিদ্যুৎ গ্রাহক, অগণিত শুভানুধ্যায়ী ও জনগণের শুভেচ্ছা পাথেয় করে সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে উন্নততর বিদ্যুৎ পরিষেবাই আমাদের আগামী দিনের অঙ্গীকার।

আলোকোজ্জ্বল পশ্চিমবঙ্গের স্বপ্ন সফল করতে আমরা আপনাদের সহযোগিতা চাই।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ

বই কিনুন বই পড়ুন বই উপহার দিন

- অধ্যাপক সুকুমারী ভট্টাচার্য সম্মাননা গ্রন্থ ভারত ও ভারতব্দু : অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ ৬০০.০০
- India and Indology : Past Present and Future ● ইনফান হাবিব : প্রাক ইতিহাস ৫০.০০ ; সিদ্ধু সভ্যতা ৫০.০০ ; বৈদিক সভ্যতা ৫০.০০ ● হীরেন মুখার্জি : স্তালিন উত্তরাধিকার হাতির দাঁতে খুঁত, তবু হাতির দাঁত ৬৬.০০ ● সুকোমল সেন : ভারতের সভ্যতা ও সমাজ বিকাশে ধর্ম শ্রেণী ও জাতিভেদ ১২০.০০ ● জয়সুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় : বিকল্প নবজাগরণ ৪৫.০০ ● কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায় : ধর্ম : সংস্কার ও কুসংস্কার ৭০.০০ ● জলধর মল্লিক : পুরোনো কলকাতার কথা [১২০ টি ছবিসহ] ১০০.০০ ● বিমলচন্দ্র ঘোষ : নির্বাচিত কবিতা সংকলন ১৫০.০০ ● সম্পাদনা : কনক মুখার্জি/কৃষ্ণ ধর

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রা. লিমিটেড

১২ বক্সিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩ দূরভাষ - ২২৪১-৩৩৭৬

ফোন নং ২৪৮১ ২৪৪৮

২৪২১ ৯৫১৩

২৪৮১ ৪৯৩৩

নিউ কল্লতরু এজেন্সী

সমস্ত রাজ্য লটারির মুখ্য পরিবেশক

১৪৮।১৩ এন. এস. সি. বোস রোড, কলকাতা ৭০০০৪০

প্রকাশিত হয়েছে

দুস্ত্রাপ্য গ্রন্থমালা : ১

উনিশ শতকে স্ত্রীশিক্ষা

সম্পাদনা : স্বপন বসু



বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

কলকাতা - ৭০০ ০০৬

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৬



সম্পাদকের প্রতিবেদন : ১৪১১ বঙ্গাব্দ

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর ১১১তম বার্ষিক অধিবেশনে আপনাদের সাদর অভ্যর্থনা করি। ইতিমধ্যে দু'টি মহাপ্রলয় ঘটে গেছে। একটি অভাবনীয় জলকম্প 'সুনামি'। অপরটি পাকিস্তানে ও কাশ্মীর উপত্যকায় ভয়াবহ ভূমিকম্প। এই দুই মহাপ্রলয়ে দেশে দেশে সংখ্যাগত মানুষ প্রাণত্যাগ করেছেন। তাঁদের সকলের জন্য গভীর দুঃখ অনুভব করি। প্রকৃতি কখন কখন অত্যন্ত নির্দয় হয়ে মানুষের সর্বনাশ করেন। এই অবস্থায় বিজ্ঞান বা প্রযুক্তি কোনও কাজে আসে না। পড়ে থাকে বিরাট ধ্বংসস্তূপ। কিন্তু আমরা সব ভুলে যাই।

বহু খ্যাতনামা বাঙালি প্রয়াত হয়েছেন। প্রয়াত, সাহিত্যিক তারাশ্রব ব্রহ্মচারী, কনক বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ সান্যাল, শঙ্কু মহারাজ, উপাচার্য নিত্যানন্দ সাহা, অধ্যাপক মদনমোহন গোস্বামী, সঙ্গীত শিল্পী ভি. বালসারা, যাত্রা শিল্পী বীণা দাশগুপ্ত।

১৪১২-তে প্রয়াত হয়েছেন আমাদের বিশিষ্ট সদস্য পণ্ডিত শ্রীমোহন তর্কবেদান্ততীর্থ গণগান শিল্পী কালী দাশগুপ্ত, এবং আমাদের বিশিষ্ট সদস্য এবং প্রখ্যাত শিল্পী চিন্তামণি কর এবং প্রখ্যাত অধ্যাপক পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি ড. অজিত কুমার ঘোষ এবং বিশিষ্ট কবি ভাস্কর চক্রবর্তী।

আমরা তাঁদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করি।

১৪১১-তে কার্যনির্বাহক সমিতির অধিবেশন হয়েছে সাত বার। সমস্ত অধিবেশনে সদস্যদের উপস্থিতি সন্তোষজনক ছিল। এই সব অধিবেশনে, পরিষৎ-এর উন্নয়ন এবং আর্থিক ও প্রশাসনিক শৃঙ্খলা রক্ষা, এই দুইটি বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে। নানাবিধ অসুবিধা ও অভাব সত্ত্বেও উন্নয়নের কাজ ফেলে রাখলে চলবে না,—এই হ'ল মৌল সিদ্ধান্ত। উপসমিতি সমূহে বহু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু, আমার মনে হয়েছে যে, সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য যে লোকবল প্রয়োজনীয়, তা আমাদের নেই। যাঁরা কাজ কবেন, তাঁরা চাকরিও করেন। বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে ভবন সংরক্ষণ, চিত্রশালার উন্নয়ন, এবং প্রকাশনায় শৃঙ্খলা স্থাপন।

সমিতির প্রসঙ্গে একটি বিশেষ কারণে গঠিত অনুসন্ধান-সমিতির কথা বলতেই হয়। গত বছরেই আপনাদের জানিয়েছিলাম যে, সুপ্রাচীন, এবং হাতে লেখা “স্কুল সোসাইটি রিপোর্ট”-পাওয়া যাচ্ছে না। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অনুসন্ধান করার জন্য, খ্যাতনামা প্রাক্তন আরাঙ্কাধ্যক্ষ, এবং কার্যনির্বাহক সমিতির বিশিষ্ট সভ্য, ড. অমিয়কুমার সামন্তের নেতৃত্বে একটি “অনুসন্ধান সমিতি” গঠিত হয়েছিল। এই সমিতির অধিবেশন বার বার অনুষ্ঠিত হলেও “স্কুল সোসাইটি রিপোর্ট”-রহস্য অদ্যাবধি এক গভীর দুর্নির্দেশ্যে রহস্য। বস্তুটি যে কোথায় আছে, তা কেউ জানে না। নির্বিকল্প ঈশ্বরের মতোই তিনি অদৃশ্য।

আয়-ব্যয়ের বিবরণ ও ‘বাজেট’ পেশ করা হয়েছে। এতে এই দেখি যে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর সাংস্কৃতিক গুরুত্ব সর্বজন স্বীকৃত হলেও, ব্যয়ের তুলনায় আয় তুচ্ছ। পরিষৎ ২০০৪-২০০৫-এ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চ শিক্ষা বিভাগ থেকে মাত্র নয় লক্ষ টাকা অনুদান পেয়েছেন। এই জন্য আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়েও বলি : এ টাকায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর মতো প্রতিষ্ঠান চলে? এ-প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই নেতিবাচক। এই অর্থেই অধিকাংশ কর্মচারীদের মাসিক বেতন দিতে হয়, ভবন-সংরক্ষণের কাজ হয়, গ্রন্থাগারের জন্য বইপত্র কেনা হয়, আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হ'।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে এই সভায় আমাদের আবেদন : অন্তত বাৎসরিক হিসাবে ১৫ লক্ষ টাকা দিন; নইলে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বন্ধ হয়ে যাবে। আরও কর্মী চাই, আরও জায়গা চাই, চাই আধুনিক ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি, কলাকৌশল। আমাদের “বারমাস্য”-র অবসান আর কবে হবে? শ্রী মুণাল সেনের সাংসদ তহবিল থেকে প্রতিশ্রুত ৫৫ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা, এখন স্বপ্ন মাত্র। পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিষৎ-কে একখণ্ড জমি দানের যে সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা অদ্যাবধি লালফিতের দুরবগাহ রহস্যে নিমজ্জিত। লালফিতের সহায় বচনামৃত ছাড়া এ পর্যন্ত আমরা আর কিছু পাইনি। বচনামৃত, অর্থাৎ, হবে, এবং হবে। কবে হবে, - তা বহু চেষ্টাতেও জানা যায়নি। এসব বিষয়ের নিষ্পত্তির জন্য যেভাবে লেগে থাকা দরকার, তার জন্য সময় পাই কখন?

এ সভায় আমাদের আবেদন,— পশ্চিমবঙ্গ সরকার আমাদের এই বিষয়গুলি একটু দেখুন, এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন।

এরই মধ্যে একটি সুসংবাদ, কলকাতা পৌর নিগম পরিষৎকে করমুক্ত করেছেন। এই জন্য কলকাতা পৌরনিগমকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।

প্রসঙ্গত নিবেদন এই যে, ভারতের বহু সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান অপ্রতিহত প্রচেষ্টায় ভারত সরকারের স্বীকৃতি লাভ করেছেন। এইরূপ স্বীকৃতি অর্জনের জন্য আমাদের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে; সমস্ত বিষয়ে সংযম ও শৃঙ্খলা স্থাপন করতে হবে; অশেষ পরিশ্রম করতে হবে। পরিকল্পনা করার জন্য একটি ছোট পরিকল্পনা-সমিতি বা Planning Board গঠন প্রয়োজনীয়। আমার বিশ্বাস, পরবর্তী কার্যনির্বাহক সমিতিতে এইরূপ Planning Board গঠন করার অনুমতি আপনারা দেবেন।

প্রসঙ্গত স্মরণীয়, দু'দশকেরও বেশি সময় ধরে পরিষৎ-এর “রেজিস্ট্রেশন”-এর নবীকরণ হয়নি। এই গুরুত্বপূর্ণ কর্মটি যাতে সুনিপ্পন্ন হয়, তার জন্য আমাদের মাননীয় কোষাধ্যক্ষ ড. অশোক রায়চৌধুরী মহাশয় খুব পরিশ্রম কবছেন। কাজ অনেকটাই এগিয়েছে।

এখন প্রসঙ্গ পুস্তক প্রকাশনা। ১৪১১তে বই বিক্রি করে পাওয়া গেছে ১,৩১,৯৫৮.৬০। ‘সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা’র বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণ ১০,৭৪৪.০০। পুনঃপ্রকাশিত হয়েছে ‘সাহিত্য সাধক চরিতমালা’-র এই সব বই, যথা :

‘ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়’
 ‘রামরাম বসু’
 ‘গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য’
 ‘গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ’
 ‘রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ’
 ‘উইলিয়াম কেরী’
 ‘গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার’
 ‘রাজনারায়ণ বসু’
 ‘রাধাকান্ত দেব’
 ‘মধুসূদন দত্ত’
 ‘কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার’
 ‘শ্যামাচরণ শর্মা’
 ‘নীলমণি বসাক’।

‘সাহিত্য সাধক চরিতমালা’-র নতুন বই :

‘গোপাল হালদার’ [অমিয় ধর রচিত]
 ‘অদ্বৈত মল্লবর্মণ’ [অচিন্ত্য বিশ্বাস রচিত]
 ‘ক্ষিতিমোহন সেন’ [ঝরা বসু রচিত]
 ‘গিরিবালা দেবী এবং জ্যোতির্ময়ী দেবী’ [মঞ্জুশ্রী সিংহ রচিত]
 ‘উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী’ [মানসী দাশগুপ্ত রচিত]
 ‘চিন্তাহরণ চক্রবর্তী’ [ভবতোষ দত্ত রচিত]

পুনর্মুদ্রিত হয়েছে :

‘সীতার বনবাস’

‘বাংলা সাময়িক পত্র, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড’

‘Unpublished Notes of Some Wanderings With Swami Vivekananda’ [ভগিনী নিবেদিতা রচিত]

‘স্মারকগ্রন্থ’

‘রৈবতক কাব্য’

‘পলাশীর যুদ্ধ’

‘রাজসিংহ’

‘পদ্মিনী উপাখ্যান’

‘সেকাল আর একাল’

প্রকাশিত হয়েছে ‘সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা’-র চারটি সুসম্পাদিত এবং সুমুদ্রিত সংখ্যা। প্রকাশনার ক্ষেত্রে প্রকাশনার অধ্যক্ষ ড. প্রভাতকুমার দাস প্রশংসনীয় উদ্যমের প্রমাণ রেখেছেন।

এই তথ্যও উল্লেখ্য যে, প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের ও পত্রিকার যথোচিত সংরক্ষণের জন্য যে স্থান প্রয়োজন, তা এখন নেই। প্রকাশিত গ্রন্থের সঞ্চয় পর্বতপ্রমাণ। ঊনবিংশ শতাব্দে রচিত গ্রন্থাবলির চাহিদা কমে যাচ্ছে। ফলত প্রকাশিত গ্রন্থাদির সংখ্যাবৃদ্ধি। স্থানভাবে তাদের তারুণ্যেই বার্ষিক এবং কীটনাশক রাসায়নিক পদার্থের নিয়মিত বিকিরণেও গ্রন্থভূক্ কীটের বংশবিস্তার ও দুর্নিবার হয়ে উঠেছে। বড় বই ছাপানোর সামর্থ্য পরিষদের এখন নেই। ‘পদকল্পতরু’ এবং ‘চণ্ডীদাসের পদাবলী’ বিক্রয় করা দুঃসাধ্য। অধুনা ‘সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা’-প্রকাশের ব্যয়ভার কমানোর জন্য বিজ্ঞাপন গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমাদের একটি বাস্তব বিপণন-নীতি স্থির করা প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে।

নীতির প্রসঙ্গে এ কথাও আসে যে, আমাদের নিয়মাবলীর যথোচিত পরিবর্তন সাধন করাও অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। নিয়মাবলী অপরিবর্তিত হয়ে থাকলে কাজ করার অসুবিধা হয়; বিশেষভাবে নির্বাচনের প্রক্রিয়ার মধ্যযুগীয় রূপ আধুনিক গণতন্ত্রের বিরোধী হয়ে দাঁড়ায়। নিয়মাবলীর সংশোধনের জন্য পূর্বে কয়েকটি সভার অনুষ্ঠান হয়েছিল। এখন এই বিষয়টির গুরুত্ব বুঝে কাজ শুরু করা দরকার। পরিষৎ-ভবন ঘোষিত “Heritage Building”, আমাদের নিয়মাবলীও কী “Heritage” রূপে বিবেচিত হবে?

গ্রন্থাগার সম্বন্ধে গ্রন্থাগারিক ড. অরুণা চট্টোপাধ্যায় আমাকে বহু তথ্য দিয়েছেন। এজন্য তাঁকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। ১৪১১ বঙ্গাব্দে গ্রন্থাগার ২৭১ দিন খোলা ছিল। পাঠকক্ষে পাঠকের সংখ্যা ছিল ৭১৩৫। সঙ্গদয় ব্যক্তিগণ পরিষৎকে ৫৯৫টি বই ও ৩৯৮টি পত্রিকা দান করেছেন। সাধারণ সদস্য হয়েছেন ২৩৭ জন ব্যক্তি; “আজীবন-সদস্য”-এর সংখ্যা ৪৫। ১৪১০-এ আজীবন সদস্য ৬২৫ জন, সাধারণ সদস্য ৩৩৪ জন, বিশিষ্ট সদস্য - ৮ এবং মফস্বল সদস্য ৫ জন, মোট ৯৮৩। উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত গ্রন্থের মূল্য ৪০, ৮৩৬। যে সকল ব্যক্তি এবং প্রকাশনা-সংস্থা সাহিত্য পরিষৎকে পুস্তক দান করেছেন, তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

প্রসঙ্গত বলি যে, যে ঘরে পুস্তকাদি রক্ষিত হয়ে আছে, এক তলায় সে ঘরে বায়ু অত্যন্ত

আর্দ্র, এবং ফলত রক্ষিত পুস্তকাদির বার্ষিক্য দৃশ্যমান। ঘরটিকে বাতানুকূল যন্ত্রের দ্বারা সুনির্মল না করা হলে সর্বনাশ দুর্নিবার। কিন্তু সেই যন্ত্র ক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ নেই। যে লোকজ্যেষ্ঠ মহাশয়াগণ এই বিশাল গ্রন্থাগার গড়েছিলেন, — তাঁদের সত্তা অনুভব করি, কিন্তু তাঁদের কাজকে অর্থাভাবে সুরক্ষিত করে রাখতে পারি না।

১৪১১-তে ১৫০০ বাংলা ও ইংরেজি গ্রন্থের পঞ্জীকরণ হয়েছে; ৬০০০ “কার্ড ফাইলিং” হয়েছে, এবং ২০০০ বই ও পত্র-পত্রিকার ‘লেবেলিং’ করা হয়েছে। কিন্তু “Stock Verification” করতে হলে যে টাকা লাগে, তা আমাদের নেই। পাঠকক্ষের হিসাব এইরূপ, যথা:

বিষয়	লেনদেন	পাঠকক্ষ
দর্শন	৫	৪২
ধর্ম	১৮	৩৭৫
সমাজ	৮	১৮৫
শিক্ষা	৪	৫৫
ভাষা	৫	১৫৪
বিজ্ঞান	১	৪৮
ফলিত বিজ্ঞান	২	৪৭
শিল্পকলা	৪	৪৩
সঙ্গীত	১০	১৩৬
সাহিত্য	৪৬৩	৫৫২০
ভূগোল	৬	১০৮
বিষয়	লেনদেন	পাঠকক্ষ
জীবনী	৮২	৮৮৬
ইতিহাস	২৪	৫৪৩
সহায়ক গ্রন্থ	০০	৩৪০
পত্র পত্রিকা	০০	৬৩০৮
হিন্দী, সংস্কৃত, ইংরাজি	১৫	৫৬৮
	৬৫৭	১৫,৩৫৮

‘ফিউমিগেশন চেম্বার’-এ ১৬০-টি বই ও পত্রপত্রিকা কীটমুক্ত করা হয়েছে। পাঁচজন পাঠক ২০-টি পুথি দেখেছেন। বেশ কয়েকজন বিদেশী ব্যক্তি গ্রন্থাগারে এসে বইপত্র পড়েছেন; বাংলাদেশের, জাপানের ও ডেনমার্কের গবেষকগণ পরিষৎ-এর সদস্য হয়েছেন। ভারতের

বিভিন্ন প্রদেশের গবেষকগণও পরিষৎ-এর সদস্য হয়েছেন। নানান অনুপপত্তি সত্ত্বেও যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর গুরুত্ব ক্রমবর্ধমান, এই সব তথ্যই তার প্রমাণ।

আমাদের পুঁথি-সংরক্ষণের ব্যবস্থা তুলনামূলক বিচারে ভালই বলা যায়। পুঁথিবরে বাতানুকূল যন্ত্র আছে। প্রয়াত অধ্যাপক বিজিতকুমার দত্ত পুঁথির যে বিবরণাত্মক তালিকা প্রস্তুত করেন, তা প্রকাশ্য। সম্প্রতি কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য শ্রী অমিতাভ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে, অধ্যাপক পঞ্চানন চক্রবর্তী সংগৃহীত ৫০টি মূল্যবান পুঁথি পরিষৎ পেয়েছেন। ড. স্বপন বসু, ড. সুবিমল মিশ্র এবং শ্রী নির্মাল্য কোলে চন্দননগরের শ্রীমতী ক্ষান্তিলতা দেবীর গৃহ থেকে কথকতা-বিষয়ক দু'টি অত্যন্ত মূল্যবান পুঁথি এনে পরিষৎকে দিয়েছেন। এজন্য আমরা শ্রী অমিতাভ মুখোপাধ্যায়কে, শ্রীমতী ক্ষান্তিলতা দেবীকে, ড. স্বপন বসুকে, ড. সুবিমল মিশ্রকে এবং শ্রী নির্মাল্য কোলেকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিচ্ছি। পুঁথি সংরক্ষণ বিষয়ে 'জাতীয় পুঁথি মিশন' (NMM)-এর কর্মীগণ আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন। এছাড়া মৃন্ময় দাস ঘোষ তাঁর মায়ের স্মৃতি রক্ষার্থে শোভাবতী দাস ঘোষ স্মৃতি তহবিলে এককালীন (৮০০০০) আশি হাজার টাকা ও স্বামী জগদীশ্বরানন্দ মহারাজ গোপীনাথ কবিরাজ স্মৃতি তহবিলে (২৮০০০) আঠাশ হাজার টাকা দান করেছেন। আমি তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।

আমাদের সংগ্রহালয় শতবর্ষে পদার্পণ করল। এর সূচনা হয়েছিল বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষিতে, ১৩১৩ বঙ্গাব্দে, ফাল্গুন মাসে। সংগ্রহালয়ের সংস্কারের জন্য ভারত সরকার পরিষৎকে ১২ লক্ষ টাকা দিয়েছেন। যে পরিদর্শকগণ ভারত সরকারের প্রতিনিধিরূপে আমাদের সংগ্রহালয় দেখেছেন, তাঁরা আমাদের সংগ্রহের অসাধারণ ঐশ্বর্য দর্শন করে ভূয়সী প্রশংসা করেন। ভারত সরকারের অনুদানের এই সর্ত যে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎকেও চার লক্ষ টাকা ব্যয় করতে হবে। আমরা ভেবেছি যে, কলকাতার যাদুঘরের সহযোগিতায় আমাদের সংগ্রহালয়ের সংস্কার করা হবে। চিত্রশালার অধ্যক্ষ শ্রী ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী, এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ববিভাগের আধিকারিক ড. গৌতম সেনগুপ্ত এ বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছেন। টাকা খরচের হিসাবপত্র যাতে ঠিক থাকে, তার জন্য যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

পরিষৎ-এর টাকায় অনেক চেয়ার ও টেবল সারানো হয়েছে, এবং এই সভাঘরের কিছুটা সংস্কার সাধন করে একটি শব্দযন্ত্র কেনা হয়েছে। কিন্তু, চিত্রাদির সংস্কারের কাজ অসম্পূর্ণ। সে কাজ যাতে নিষ্পন্ন হয়, তার জন্য ব্যবস্থা করা হবে। চিত্রসংস্কার করতে হলে বহু অর্থ ব্যয় করতে হয়। আনুমানিক ব্যয় দশ লক্ষ টাকার কম নয়।

শ্রী প্রাণকৃষ্ণ মজি ১৪১১-এর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের অনুপুঙ্খ বিবরণ লিখে দিয়েছেন। তা এইরূপ, যথা:

১. ২৫.০৪.২০০৪ : মায়া চট্টোপাধ্যায় - স্মারক বক্তৃতা।

বক্তা, রমাকান্ত চক্রবর্তী।

বিষয়, “অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায়ের ইতিহাস-চিন্তা”।

সভাপতি, ড. অশোক ভট্টাচার্য।

শ্রোতাসংখ্যা—৪৬।

২. ২৭.০৬.২০০৪ : প্যারীমোহন সেনগুপ্ত - স্মারক বক্তৃতা।
বক্তা, অধ্যাপক অরুণ বসু।
বিষয়, “হাসির গানের সেকাল-একাল”।
সভাপতি, অধ্যাপক পবিত্র সরকার।
শ্রোতাসংখ্যা—১০২।
৩. ২৪.০৭.২০০৪ : প্রতিষ্ঠা-দিবস উদ্‌যাপন।
বিশিষ্ট অতিথি, সাংসদ মহম্মদ সেলিম।
বক্তা, অধ্যাপক বরুণ দে।
বিষয়, “নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে ইতিহাস চর্চা”।
সভাপতি, অধ্যাপক পবিত্র সরকার।
শ্রোতাসংখ্যা—১৮৩।
এই অনুষ্ঠানে অর্চনা চৌধুরী-স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছেন
অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত।
ইলা চন্দ্র স্মৃতি-পুরস্কার পেয়েছেন সাহিত্যিক আনসার-উদ্-দীন।
রাখালদাস স্মৃতি-পুরস্কার পেয়েছেন অধ্যাপক সূরজ ভান।
৪. ০৪.০৯.২০০৪ : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রয়াত অধ্যাপক নিমাইসান বসু এবং
সাংবাদিক নিখিল সরকারের প্রয়াণে তাঁদের স্মৃতির প্রতি
শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। ৩৪ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।
৫. ২৬.০৯.২০০৪ . বক্তা, অধ্যাপক পরমেশ আচার্য এবং শ্রী বিমান বসু।
বিষয়, ‘ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শিক্ষা-চিন্তা’।
এই উপলক্ষে বিদ্যাসাগরের গ্রন্থাবলী ও বিদ্যাসাগর বিষয়ক
পত্র-পত্রিকার প্রদর্শনী হয়েছিল।
সভাপতি, অধ্যাপক পবিত্র সরকার।
শ্রোতাসংখ্যা—১১৭।
৬. ০৯.০১.২০০৫ : বার্ষিক সাধারণ সভা।
সভাপতি, অধ্যাপক পবিত্র সরকার।
শ্রোতাসংখ্যা—৩১।
৭. ২৩.১২.২০০৪ : শোভাবতী দাসঘোষ স্মারক - বক্তৃতা।
বক্তা, ড. অরবিন্দ গোস্বামী।
বিষয়, ‘যুক্তিবাদী ঐতিহ্য এবং বঙ্কিমচন্দ্র’।
সভাপতি, অধ্যাপক পবিত্র সরকার।
শ্রোতাসংখ্যা—৫৯।
৮. ২৯.১২.২০০৪ : বক্তা, অধ্যাপক ক্রিন্টন বি. সিলি।
বিষয়, ‘অনুবাদে জীবনানন্দ’।
সভাপতি, অধ্যাপক পবিত্র সরকার।
শ্রোতাসংখ্যা—৬২।

৯. ৩০.০১.২০০৫ : নির্মলকুমার বসু - স্মারক বক্তৃতা।
বক্তা, অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন।
বিষয়, 'উনিশ শতকের মুদ্রণ ও প্রকাশন'।
শ্রোতাসংখ্যা—৭৩।
১০. ২০.০৩.২০০৫ : প্রিয়দাসুন্দরী স্মারক বক্তৃতা।
বক্তা, শ্রী চণ্ডী লাহিড়ী।
বিষয়, 'ব্যঙ্গ পত্রিকার সেকাল একাল'।
সভাপতি, অধ্যাপক পবিত্র সরকার।
শ্রোতাসংখ্যা—৮১।

১৪১১-তে দশটি সভা হয়েছে। যারা এই সব সভায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের সার্বিক সংখ্যা ৭৮৮। এই সংখ্যাটা খুব বেশি না হলেও নিতান্ত কম নয়। সাহিত্য পরিষৎ-এর আকর্ষণ যে ক্রমবর্ধমান, এসব তার প্রমাণ।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর সম্পাদকের কাজ বিশেষভাবে দুরূহ। সভাপতি অধ্যাপক পবিত্র সরকার, কোষাধ্যক্ষ ড. অশোক রায়চৌধুরী, সহ-সম্পাদক শ্রী অলোক দাস এবং শ্রীমতী মঞ্জুলা মুখোপাধ্যায়। এঁদের অকুণ্ঠিত সহযোগিতা না পেলে আমার পক্ষে সম্পাদকের কাজ করা সম্ভব হ'ত না। বিস্ময়কর ব্যাপার হ'ল এই যে, কোনও বিষয়ে আমাদের মধ্যে মতের, বা বিচারের পার্থক্য একবারও হয়নি। আমরা সবাই সাহিত্য পরিষৎ-এর উন্নয়ন চেয়েছি। কার্যনির্বাহক সমিতির অন্যান্য সদস্যগণ আমাকে নানান বিষয়ে সুপরামর্শ দিয়েছেন, উৎসাহ দিয়েছেন। আমি সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই।

ধন্যবাদ জানাই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর কর্মীদের, যাদের বৈষয়িক অবস্থার উন্নতির জন্য আমি কিছুই করতে পারিনি। তাঁরা সর্বদা আমার সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন।

ধন্যবাদ জানাই সাহিত্য পরিষৎ-এর পাঠক সমাজের সমস্ত সক্রিয় সদস্যদের। তাঁরা খুলো ঘেটেছেন, কাঁধে মাল বয়ে এনেছেন, আমার পক্ষে যা করা আদৌ সম্ভব ছিল না, তাই করেছেন অক্লান্ত শ্রমের নিদর্শন স্থাপন করে। সাহিত্য পরিষৎ-এর স্বার্থে সমস্ত সংকর্মানুষ্ঠানে পাঠক সমাজকে উদ্বোধিত করেছেন ড. নির্মল নাগ, অধ্যাপক স্বপন বসু এবং শ্রী ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী। তাঁদের হার্দিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।

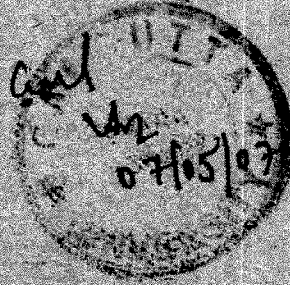
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকবে। এই বিশ্বাস রেখে, আপনাদের সশ্রদ্ধ অভিবাাদন জানিয়ে, আমার প্রতিবেদন শেষ করি।

তারিখ : ৩০-১০-০৫

রমাকান্ত চক্রবর্তী
সম্পাদক

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

১১২ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা • মার্চ - মে ১৯৯২



P-44

পত্রিকাধ্যক্ষ
প্রভাতকুমার দাস



বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪০/১ আচার্য প্রহ্লাদলাল সেনা

কলকাতা ৭০০ ০৩৩

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

১১২ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা • মাঘ-চৈত্র ১৪১২

পত্রিকাধ্যক্ষ
প্রভাতকুমার দাস



বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা ৭০০ ০০৬

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

১১২ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা মাঘ-চৈত্র ১৪১২

Sahitya-Parisat-Patrika

Vol. 112, No. 4 Magh - Chaitra 1412

(Published on Ashar 1413, June 2006)

প্রকাশ : আষাঢ় ১৪১৩

প্রকাশক :

শ্রীরমাকান্ত চক্রবর্তী

সম্পাদক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা ৭০০ ০০৬

বর্ণবিন্যাস ও মুদ্রণ :

শ্যামল সাউ, দি.সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস

২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৬

দাম : ১০০.০০ টাকা



সা হি ত্য - প রি ষ ৎ - প ত্রি ক়া

১১২ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা • মাঘ - চৈত্র ১৪১২

সূ চি প ত্র

পত্রিকা প্রসঙ্গ • প্রভাতকুমার দাস

লেখক-পরিচিতি •

পত্রাবলি • কামিনী রায় যতীন্দ্রমোহন বাগচী কুমুদরঞ্জন মল্লিক

রাধারানীদেবী নন্দগোপাল সেনগুপ্ত ১

পত্রপ্রাপক পত্রলেখক ও পত্র পরিচিতি • অশোককুমার রায় ১৭

বেদোক্ত জাতিগোষ্ঠী • বিবেকানন্দ দাশ ২০

সাঁওতালদের ঠাকুর-দেবতা ও ধর্মাচার • অনিমেষকান্তি পাল ২৬

লেখা থেকে কথায় রূপান্তর এবং বাংলা অ • মীনা দাঁ ৭৫

ব্রেল, বাংলা ও কম্পিউটার • বিদ্যুৎবরণ চৌধুরী ৮৫

বাংলা প্রবাদে শস্য-শত্রু এবং শস্য রক্ষা • মনাজ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৫

রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা : ঐতিহাসিক অনুসন্ধান • মহিবুল ইসলাম ১৩৩

নাট্যাচার্য রাধামাধব কর • জগন্নাথ ঘোষ ১৪৯

রোকেয়া একশো পঁচিশ ফিরে দেখা • সেরিনা জাহান ১৬৫

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর : প্রযুক্তিশিল্প সাধক • অরুণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭৪

পুলিনবিহারী সেন • পার্থ বসু ১৯৪

বাংলা ভাষায় চলচ্চিত্রচর্চা : রূপরেখা ও বিবর্তন • সোমেন ঘোষ ২০০

উপকূলবর্তী পূর্বমেদিনীপুর জেলার বিলুপ্ত প্রায়

কিছু আঞ্চলিক শব্দ • অসীমকুমার মামা ২১৯

বিস্মৃত বৈভরের কথা : বাংলা শিল্প ও সংস্কৃতিতে

কামতাপুরের অবদান • মলয়শঙ্কর ভট্টাচার্য ২৩৩

সুন্দরবনে প্রাপ্ত শশাঙ্কের স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা • সাগর চট্টোপাধ্যায় ২৪৭

মঙ্গলকোটের যক্ষমূর্তি • রঙ্গনকান্তি জ্ঞান ২৫০

পরিষৎ-সংবাদ • প্র ২৫২

চিত্র সূচি

বিস্মৃত বৈভবের কথা : বাংলা শিল্প সংস্কৃতিতে কামতাপুরের অবদান

- চিত্র : ১ গোসানীমারীর দুর্গপ্রাকার ;
চিত্র : ২ দুর্গ প্রাকারের নিকট দৃশ্য ;
চিত্র : ৩ দুর্গপ্রাকারের ভিতর দিক ও প্রাচীন দীঘি ;
চিত্র : ৪ রাজপাট ইতস্তত বিক্ষিপ্ত প্রত্নবস্তু ;
চিত্র : ৫ চলমান মানুষের মূর্তি । হাতে নৈবেদ্য ;
চিত্র : ৬ অস্ত্রের আঘাতে ধ্বংস হওয়া প্রস্তর মূর্তি ;
চিত্র : ৭ নারীমূর্তির পোষাকে পরিধেয় এবং তার পরিপাটি কুঁচি লক্ষণীয় ;
চিত্র : ৮ নলরাজ্যার গড়ের খিলান ;
চিত্র : ৯ নলরাজ্যার গড়ের ইমারতের ধ্বংসাবশেষ ;
চিত্র : ১০ কামতাদেবী মন্দির (গোসানীমারী, ১৬৬৫) নিরাপত্তার জন্য প্রাকারে দুর্গের আদল, মীর জুমলার কোচবিহার আক্রমণের (১৬৬১) কিছুকাল পরে এই দুর্গের নির্মাণে প্রতিনারায়ণ ক্ষমতা পুনর্দখল করেন।
চিত্র : ১১ দেওয়ালে ব্যবহৃত মোটিফ। নলরাজ্যার গড়
চিত্র : ১২ কামতাপুর-দুর্গ (পরিসীমা ৩০ কিমির বেশি) X চিহ্নিত স্থানে ১৯৮৮-তে প্রত্নাবশেষ পাওয়া গেছে।

সুন্দরবনের প্রাপ্ত শশাঙ্কের স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা

- চিত্র : ১ শশাঙ্কের স্বর্ণমুদ্রা (সোজা দিক)
চিত্র : ২ শশাঙ্কের স্বর্ণমুদ্রা (উলটো দিক)
চিত্র : ৩ শশাঙ্কের রৌপ্যমুদ্রা (debased) (সোজা দিক)
চিত্র : ৪ শশাঙ্কের রৌপ্যমুদ্রা (debased) (উলটো দিক)
চিত্র : ৫- 'Sankh Shell' শ্রেণিভুক্ত শশাঙ্ক-পরবর্তী আমলের স্বর্ণমুদ্রা (সোজা দিক)
চিত্র : ৬ 'Sankh Shell' শ্রেণিভুক্ত শশাঙ্ক-পরবর্তী আমলের স্বর্ণমুদ্রা (উলটো দিক)

সবকটি আলোকচিত্র লেখক কর্তৃক গৃহীত

মঙ্গলকোটের যক্ষমূর্তি

দুটি চিত্রই যক্ষমূর্তির

পত্রিকা প্রসঙ্গ

১৪১২ বঙ্গাব্দের শেষ সংখ্যাটি পূর্ব ঘোষণা মতো যথা সময়ে প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি—মাস তিনেক বিলম্বিত হল। এ জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি। এখন নতুন বছরের প্রথম সংখ্যাটি যাতে দ্রুত পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পারি, তার জন্য যথেষ্ট তৎপরতার সঙ্গে কাজ শুরু করা হয়েছে। আশা, হয়ত আগামী আবেগেই সেই বর্ষ শুরুর সংখ্যাটি আপনাদের সামনে উপস্থিত করতে পারবই। এখন পঞ্জিকার সীমা অতিক্রম করে পুরোনো বছর পেরিয়ে এসেও আপনাদের সকলকেই, বিশেষ করে পত্রিকার সুধী লেখক ও পাঠক বর্গকে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাই।



বর্তমান সংখ্যাটি শুরু হয়েছে, কাব্য ও সাহিত্য জগতের পাঁচজন স্বনামধন্য ব্যক্তির মোট ছ'টি চিঠি দিয়ে। এঁদের মধ্যে কামিনী রায়, বয়সের দিক থেকে জ্যেষ্ঠা—ঊনবিংশ শতকের শেষাংশে যে-কজন মহিলা কবি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তিনি তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য-সাধক-চরিতমালায় তাঁর যে জীবনী রচনা করেছিলেন তাতে মন্থনাথ ঘোষকে লেখা দুটি চিঠি স্থান পেয়েছে—কিন্তু আলোচ্য চিঠিটি এই প্রথম প্রকাশিত হচ্ছে। পরবর্তী তিনটি চিঠির মধ্যে প্রথম দুটি লিখেছিলেন যতীন্দ্রমোহন বাগচী, একটি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের লেখা—এরা দুজনেই রবীন্দ্র-সমসাময়িক কবি জগতে সমাদৃত হয়েছিলেন। শেষ দুটি পত্রের লেখক রাধারানী দেবী এবং নন্দগোপাল সেনগুপ্তের পরিচয়ও রবীন্দ্র পরবর্তীকালের লেখক তালিকায় স্মরণীয় হয়ে আছে। চিঠিগুলির সাহিত্যমূল্য গৌণ হলেও এগুলির মধ্যে পত্রপ্রাপকের কাজের পরিচয় যে তাঁর গুণগ্রাহীদের অন্তরঙ্গ স্বীকৃতিতে উল্লিখিত হয়েছিল তার মূল্য কম নয়। ধনাত্মক পরিবারে জন্মগ্রহণ করে, গণিতের উজ্জ্বল ছাত্র মন্থনাথ, কর্মজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েও, গবেষণা ও সাহিত্যসেবায় নিজেকে নিযুক্ত রেখেছিলেন ‘বিস্মৃতকীর্তি বাঙ্গালীদের কীর্তিকাহিনী সংগ্রহ ও প্রচার করা’র লক্ষ্যে। জীবনীকার হিসেবে জীবিতাবস্থাতেই তাঁর খ্যাতি সর্বজন বিদিত হয়েছিল—তার পাশাপাশি কীর্তিমান বাঙালি লেখকদের প্রতিকৃতি সংরক্ষণের কাজটিকে তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি না সংগ্রহ করলে হয়তো ঊনবিংশ শতকের অনেক খ্যাতিনামা লেখকের চিত্র পরবর্তীকালের গবেষকরা ব্যবহার করার সুযোগই পেতেন না। তাঁর জন্মশতবর্ষে সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার জীবনীকার ড. অলোক রায় বাইশ বছর আগে লিখেছিলেন : ‘ঊনিশ ও বিশ শতকের বহু ব্যক্তির জীবনকথা জানিতে হইলে মন্থনাথের রচনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু বর্তমানে তাঁহার অধিকাংশ গ্রন্থ সহজপ্রাপ্য নয়; মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত অধিকাংশ রচনা কোনদিনই গ্রন্থবদ্ধ না হওয়ায় একালে বিস্মৃত। ফলে মন্থনাথ ঘোষও কিছু পরিমাণে বিস্মৃত লেখক হইয়া উঠিয়াছেন।’ ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে

চিঠিগুলি পত্রপরিচিতি সহ প্রকাশ করতে দিয়েছেন শ্রীঅশোককুমার রায়, এই সহযোগিতার জন্য তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য গত বছরের শেষের দিকে দুই মলাটের মধ্যে কবি বিহারীলাল ও কবি ঈশ্বরচন্দ্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে একটি ছোটো প্রকাশনের উদ্যোগে।

বিস্মৃতির অপবাদ লাঘব করার অভিপ্রায়ে আরো কয়েকজন কৃতী মানুষকে এবারে স্মরণ করা হয়েছে, উপলক্ষ্য বর্তমান তরুণ প্রজন্মের কাছে তাঁদের পরিচয়টি মর্যাদার সঙ্গে তুলে ধরা। এই পর্যায়ে নাট্যাচার্য রাধামাধব করকে নিয়ে লিখেছেন জগন্নাথ ঘোষ—অতীত কালের কৃতী নাট্যব্যক্তিত্বদের বিষয়ে তিনি অনেক দিন থেকেই মনোযোগী। তাঁর জীবন ও কর্মের উপর নতুন করে আলোকপাত করে—মুসলমান নারীমুক্তির আন্দোলনে কী অসাধারণ কাজে ব্রতী হয়েছিলেন রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন—সে বিষয়ে একশো পঁচিশতম জন্মবর্ষ পেরিয়ে তাঁকে ফিরে দেখার সুত্রে এই বঙ্গের লেখাপড়া জানা মানুষদের করণীয় সম্পর্কে নতুন করে মরমী প্রশ্ন তুলেছেন সেরিনা জাহান। পরবর্তী দুই ব্যক্তিত্বের প্রথম জন রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশতবর্ষের পরে প্রায় আঠারো বছর পেরিয়ে এসেছি, রথীন্দ্রনাথের বহু গুণাঙ্ঘিত এই কৃতী পুত্রের প্রযুক্তি শিল্পসাধক পরিচয়টিকে সময়োপযোগী তথ্য সমৃদ্ধ সূচাক্রম বিশ্লেষণে তুলে ধরেছেন তাঁর জীবনীকার প্রখ্যাত প্রযুক্তিবিদ অরুণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। দ্বিতীয় জন তরুণ বয়সে রথীন্দ্রনাথের স্নেহপ্রশ্রয় ধন্য পুলিনবিহারী সেন—নিজের জীবন সর্বার্থে নিয়োজিত করেছিলেন রথীন্দ্রচাচার্য, জন্মশতবর্ষের প্রাক্কালে,—প্রয়াণের বাইশ বছর পরে তাঁকে স্মরণ করেছেন প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যাধন্য পার্থ বসু। রথীন্দ্রনাথের কাজের বাইরে তিনি একদা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন, একথা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করছি।

একেবারে শেষ পর্যায়ে তিনটি রচনাই শিল্প সংস্কৃতি সম্পর্কিত, প্রথমটি বিস্মৃত বৈভবের কথায় কামতাপুরের অবদান শ্রমসাধ্য গবেষণায় তুলে ধরেছেন মলয়শঙ্কর ভট্টাচার্য। আর দুটির একটি সুন্দরবনে প্রাপ্ত শশাঙ্কের স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা বিষয়ে, লিখেছেন তরুণ গবেষক সাগর চট্টোপাধ্যায়, আর অন্যতরটির রচয়িতা রঙ্গনকান্তি জানা, তাঁর বিশেষজ্ঞের সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ রচিত হয়েছে মঙ্গলকোটের যক্ষমূর্তি অবলম্বন করে। অসীমকুমার মামা উপকূলবর্তী পূর্বমেদিনীপুর জেলার বিলুপ্ত প্রায় আঞ্চলিক শব্দ উদ্ধারের কাজ করছেন অনেকদিন থেকে, তারও কিছু নমুনা তিনি উপস্থাপন করেছেন তাঁর নিবন্ধে। কৃষিজীবী গ্রামীণ জনজীবনে শস্যরক্ষা দীর্ঘকাল ধরেই একটা বড়ো সমস্যা,—বাংলার প্রবাদে বর্ণিত ফসলের শত্রু ও তার নিধন ব্যবস্থার পরামর্শ ও ইঙ্গিতের কথাগুলি নতুন কালের প্রেক্ষিতে বৈজ্ঞানিক কার্যকারণের মধ্যে বুঝতে চেয়েছেন মনোজ্ঞলি বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলার চলচ্চিত্র নিয়ে পত্রপত্রিকায় অনেকদিন থেকেই প্রবন্ধ লিখেছেন সোমেন ঘোষ—এবার তিনি প্রধানত বাংলা ভাষার চলচ্চিত্রচর্চার একটা রূপরেখা ও বিবর্তনের পরিচয়টি তুলে ধরেছেন। কম্পিউটার নির্ভর ভাষাচর্চার দুটি দিক নিয়ে গবেষণামূলক দুটি নিবন্ধ লিখেছেন মীনা দাঁ ও বিদ্যুৎবরণ চৌধুরী—তাঁদের মূল্যবান দুটি অনুধ্যানের শিরোনাম যথাক্রমে ‘লেখা থেকে কথায় রূপান্তর এবং বাংলা অ’ এবং ‘ব্রেল, বাংলা ও কম্পিউটার’। শেষোক্ত রচনাটির ডেভর দিয়ে লেখক নিজের গবেষণালব্ধ যে কম্পিউটার সফটওয়্যার তৈরি করেছেন দৃষ্টিহীনদের জন্য তারই সম্ভাবনা ও বিস্তারের কথা বলেছেন। এবারে পৃথকভাবে কোনো পত্রিকার সৃষ্টি সংকলনের পরিবর্তে একটি ঐতিহাসিক অনুসন্ধান মূলক নিবন্ধ প্রকাশিত হল রঙ্গ পুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা অবলম্বন করে—লিখেছেন বাংলাদেশের তরুণ গবেষক মহিষুল ইসলাম। পূর্বোক্ত পত্রাবলির পরেই দুটি নিবন্ধের শিরোনাম : ‘বেদোক্ত জাতিগোষ্ঠী’ এবং ‘সাঁওতালদের ঠাকুর-দেবতা ও ধর্মাচার’ লিখেছেন যথাক্রমে বিবেকানন্দ দাশ এবং অনিমেষকান্তি

পাল ॥ সবমিলিয়ে বিষয় বৈচিত্র্যে ও গুণমানে সমৃদ্ধ প্রবন্ধগুলির সম্মিলে এই সংখ্যা নিশ্চয় পত্রিকার প্রতি আগ্রহীল পাঠকদের সন্তুষ্ট করবে।



এবারের প্রয়াণলেখতে যে চারজনের উল্লেখ করতে হবে, তাঁদের মধ্যে প্রবীণতম গৌরাঙ্গ-গোপাল সেনগুপ্ত তিরানব্বই বছর বয়সে প্রয়াত হয়েছেন ৩ মার্চ ২০০৬। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের ২০ অক্টোবর তিনি বীরভূমের এক সম্ভ্রান্ত সংস্কৃতিবান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ছাত্র হিসেবে কৃতী গৌরাঙ্গগোপাল পারিবারিক প্রয়োজনে চাকরিতে যোগ দেন, এক সময় তিনি রেলের জনসংযোগ দপ্তরে গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করেছেন। দীর্ঘদিন ধরে তিনি ইংরেজি ও বাংলায় বহু প্রবন্ধ লিখেছেন অমৃতবাজার পত্রিকা, অমৃত, দেশ, যুগান্তর, আনন্দবাজার পত্রিকা, কথা সাহিত্য, এবং অনুজ আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত সম্পাদিত সমকালীন পত্রিকায়। তাঁর অনুজদের বইয়ের সংখ্যা প্রায় নটি : ছোটদের টয়লার্স অব দি সি, ছোটদের লাস্ট অব দি মোহিক্যানস, ছোটদের চিলড্রেন অব দি নিউ ফরেস্ট, মির্জা গালিবের জীবনী ইত্যাদি। ইংরেজিতে সম্পাদনা করেছেন এ বায়োগ্রাফিক্যাল স্কেচ অব ডেভিড হেয়ার। তাঁর লেখা গবেষণাগ্রন্থ : প্রাচীন ভারতের পথ পরিচয়; বিদেশীয় ভারত বিদ্যাপথিক; চীন-ভারত ও ভারত-চীন পরিব্রাজকবৃন্দ; সাংবাদিক-কেশরী হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়; স্বদেশীয় ভারত-বিদ্যা সাধক এবং ইণ্ডোলজি এণ্ড ইটস এমিনেন্ট ওয়েস্টার্ন সাবার্ভাস। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও হিন্দু পেট্রিয়ার্টি পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অকাদেমির উদ্যোগে। বহুখ্যাত বিদ্বৎ প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে এশিয়াটিক সোসাইটি এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সুদীর্ঘকালের। শেষোক্ত প্রতিষ্ঠান সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার অন্তর্ভুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি ও দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের জীবনী লিখেছেন। কিছুদিন সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা সম্পাদনার কাজও করেছেন। তিরানব্বই বছর বয়সেও শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও, বাঙালির সাংবাদিকতার (১৮২০ থেকে ১৯৪৭) বিষয়ে একটি প্রারম্ভিক কাজ নতুন উদ্যমে দ্রুত সম্পন্ন করতে চেয়েছিলেন। জ্ঞানার্বেষণের ক্ষেত্রে নিরন্তর উন্মুখ তাঁর প্রয়াণে সারস্বত সমাজের বিশাল ক্ষতি হল। গত ১৬ এপ্রিল বাংলা আকাদেমির জীবনানন্দ সভাঘরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পাঠক সমাজ তাকে স্মরণ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন।

২০০৬-এর ১৩ এপ্রিল বাংলা গ্রন্থ প্রকাশন জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ভারবি-র কর্ণধার সদা-কর্মমুখর গোপীমোহন সিংহ রায় চলে গেলেন বিরামি বছর বয়সে। ১৯২৪-এর ১৭ অক্টোবরে জন্মে ছিলেন— তাদের পৈতৃক নিবাস বর্ধমানের কেলা গ্রাম। তাঁর প্রকাশন কর্মের সহযোগী প্রাণাধিক পুত্র গোরা সিংহরায়ের অসময়োচিত প্রয়াণে ব্যথিত ছিলেন। মূলত অন্যের বই সুদৃশ্য-শোভন রুচিতে প্রকাশের কাজের পাশাপাশি নিজের লেখা রবীন্দ্র সাহিত্যে নরনারী নামে ছয় খণ্ডের একে বৃহৎ গবেষণা গ্রন্থমালা প্রকাশ করেছিলেন। সপ্তম খণ্ডটিও প্রায় শেষ করেছেন— এই গ্রন্থমালার সংক্ষিপ্ত সংস্করণ ইংরেজিতে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে গত বইমেলায় সেলেক্টেড ক্যারেকটারস অব টেগোর নামে। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ভারবি—বিরাম মুখোপাধ্যায়ের সহযোগে, কাব্যগ্রন্থ ও প্রবন্ধ গ্রন্থ প্রকাশই ছিল তখনকার মুখ্য উদ্দেশ্য। বাংলা কবিতাকে জনপ্রিয় করে তুলতে একসময় শ্রেষ্ঠ কবিতা প্রকাশে তিনি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সহায়তায় খুব বড়ো এবং ধারাবাহিক প্রকল্প রূপায়ণ করেছিলেন। তাঁর প্রকাশনায় জীবনানন্দ দাশেব শ্রেষ্ঠ কবিতা ও কাব্যসমগ্র প্রকাশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রাচীন বাংলা ও ভারতীয় সাহিত্যের

পুনরুদ্ধারের কাজকে তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন—ব্যবসায়িক প্রকাশনার বাহিরে নতুন ধারার গ্রন্থ প্রকাশে তিনি যে একনিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছিলেন—তা সহজে পূর্ণ হওয়ার নয়।

মাত্র এক মাসের ব্যবধানে প্রকাশন জগতের আর একজন বহুপরিচিত শ্রদ্ধেয় মানুষ প্রসূন বসুকে আমাদের হারাতে হল। কিছুদিন গন্ডুরাডার ক্যাসারে আক্রান্ত হয়ে তাঁর শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক হয়ে উঠেছিল—১৪ মে ২০০৬-প্রিয়-পরিজন আত্মীয়-স্বজনকে বিচলিত ও অপ্রস্তুত করে তিনি চলে গেলেন। ২৫ ডিসেম্বর ১৯৩১-এ জন্ম, সিটি কলেজের স্নাতক। বাংলা প্রকাশন জগতে বহু পরিচিতি লাভ করেছিলেন স্বপ্রতিষ্ঠিত নবপত্র প্রকাশনের জন্য, প্রকাশকদের সংগঠনে নেতৃত্ব দিয়েছেন নানাপর্বে। সেই সূত্রে ফ্রান্সফোর্টে অনুষ্ঠিত বিশ্ব বইমেলায় যোগ দিয়েছেন ১৯৮৬ তে। অল্প বয়সে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সমরেশ বসুর সঙ্গে জেল খেটেছেন, অবিভক্ত সি পি আই-এর সদস্য ছিলেন। সমসাময়িক কালের প্রায় সব প্রতিষ্ঠিত ও খ্যাতকীর্তি সাহিত্যিকদের সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক ছিল। বেশ কয়েকটি পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন—আগামী (১৯৫২-১৯৭২), উত্তরকাল (১৯৬০), সীমান্ত (১৯৬৫) এবং আমৃত্যু কলেজ স্ট্রিট (১৯৮২)। দীর্ঘ বারো বছর ব্যাপী কিশোরদের জন্য আগামী সম্পাদনায় তিনি দীর্ঘস্থায়ী কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। মিহির সেনের সঙ্গে নতুন কথা নামে ছোটোদের জন্য একটি ক্ষণস্থায়ী প্রগতিশীল সাহিত্যপত্র সম্পাদনা করেছিলেন। তাঁর নিজের লেখা গ্রন্থ সংখ্যার মধ্যে কিশোরদের জন্য লিখেছিলেন টনির স্বপ্ন; পিনুর জন্যে; লাম্বু মহারাজ; বন্য শিকারী; ছোটোগল্পের এবং উপন্যাসের গ্রন্থ একটি করে যথাক্রমে অন্যদিক এবং একটু ভালোবাসা; অষ্টনারী নামে একটি অন্য ধরনের আখ্যান গ্রন্থও লিখেছিলেন। একেবারে শেষ বয়সে লিখেছিলেন দুটি আত্মকথা মূলক গ্রন্থ কৃতীজনের সান্নিধ্য এবং ঋণ্ডিত জীবন। খারাপ লাগছে তাঁর সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল, আসা-যাওয়ার পথে কিংবা বই কেনার জন্য তাঁর প্রকাশনায় পৌঁছে যে উষ্ণ অভ্যর্থনা পেয়েছি, সে কথা মনে পড়ছে।

দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে ঊনআশি বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন কুমারপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় গত ১৬ মে ২০০৬-এ। ধূজটিপ্রসাদের পুত্র ১৯২৭-এর ২৫ ফেব্রুয়ারি ইলাহাবাদে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। সুরসিক, মজলিশি, ইংরেজি, বাংলা, উর্দু ও হিন্দি ভাষায় বিশেষ পণ্ডিত এই মানুষটি বাংলা ভাষায় যে কটি বই লিখেছেন তার মধ্যে কুদরত রঙ্গি বিরঙ্গী অন্যতম, এছাড়াও মল্লিস; দিশি গান বিলিতি খেলা; খেলাল নামে তিনটি বই পাঠক মহলে জনপ্রিয় হয়েছে। সংগীত, ক্রিকেট আর ফটোগ্রাফির শখ ছিল, কোল ইন্ডিয়ার উচ্চপদে কাজ করেও সংগীতের রসগ্রাহী হিসেবে তিনি শুণী মহলে সমাদৃত ছিলেন। নিঃসন্তান এই মানুষটির প্রয়াণে, ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতচর্চার ক্ষেত্রে অনেকদিন একজন প্রকৃত জ্ঞানীর অভাব পরিলক্ষিত হবে।

একেবারে শেষ পর্যায়ে যান্ত্রিক বিভ্রাটের জন্য কয়েকটি রচনা দ্রুত পুনঃ বিন্যস্ত করতে হয়েছে—এজন্য কিছু মুদ্রণ প্রমাদ থেকে যাওয়া সম্ভব—সংশ্লিষ্ট শুণী লেখক ও পাঠকদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। পরিষদের সদস্যবৃন্দে এমন অনেকেই আছেন এই কাজটির নেপথ্য প্রেরণায় সজাগ থেকেছেন—তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

লেখক পরিচিতি

অনিমেয়কান্তি পাল (১৯৩৪-) মেদিনীপুর কলেজের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন প্রধান। প্রকাশিত গ্রন্থ: *লোকসংস্কৃতি; ভাষা বিজ্ঞান ও বাংলা; পরব পার্বণ ও ব্রতের কথা; সাঁওতালী ভাষার সহজ পাঠ; রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও লোকসাহিত্য সম্পাদনা করেছেন।* বর্তমানে 'ভারতের লোহা ও অসুর জনজাতি' শীর্ষক একটি দীর্ঘ নিবন্ধ রচনার কাজে ব্যস্ত আছেন।

অরুণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৫৩-) রিশিট পরিবেশবিদ, স্থপতি। নিয়মিত ছবি আঁকেন। প্রকাশিত গ্রন্থ: *শান্তিনিকেতনের স্থাপত্য পরিবেশ; রবীন্দ্রনাথের পরিবেশ ভাবনা।* সম্পাদনা করেছেন: *পরিবেশ বাজব গ্রামীণ প্রযুক্তি।* পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি থেকে প্রকাশিত হয়েছে *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।*

অশোককুমার রায় (১৯৪০-) গ্রন্থপঞ্জি এবং পত্রপত্রিকার সৃষ্টি সংকলন করছেন দীর্ঘদিন থেকে। নিজের বাড়িতে মন্থনাথ ঘোষ ইনস্টিটিউট অব নাইনটিছ এণ্ড টুয়েন্টিয়েথ সেক্সুরি স্টাডিজ প্রতিষ্ঠা করেছেন।

অসীমকুমার মান্না (১৯৫৭-) পূর্ব মেদিনীপুরের খেজুরি কলেজের অধ্যক্ষ। 'মাছের আচরণ এবং তার উৎসেচকের উপর কীটনাশকের প্রভাব' বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি এইচ ডি। প্রকাশিত গ্রন্থ: *বাংলার সাপ; তুফানগাজীর লোকশ্রুতি ও বিশ্বাস; কুসংস্কার : প্রসঙ্গ মাছ; পশ্চিমবঙ্গের পাখি; দক্ষিণবঙ্গের লোকশ্রীড়া পরিবেশ চেতনা; লোক চিকিৎসায় মাছ প্রভৃতি।*

জগন্নাথ ঘোষ (১৯৩৮-) গোবরডাঙ্গা হিন্দু কলেজে বাংলা বিভাগের অবসর প্রাপ্ত রিডার। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে গিরিশ যুগের বিস্মৃত কয়েকজন নাট্যকার বিষয়ে গবেষণা করে পি এইচ ডি। প্রকাশিত গ্রন্থ: *মঞ্চপাখি শিশিরকুমার; শব্দ মিত্রের নাট্যচর্চা।* শিল্পীপত্রিকা তাঁকে সম্মান জানানোর আয়োজন করেছে।

পার্থ বসু (১৯৩৭-) *আনন্দবাজার পত্রিকা*র সঙ্গে কর্মসূত্রে যুক্ত ছিলেন এখন অবসর নিয়েছেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখ্য: *উৎসবের দিন: গায়ক রবীন্দ্রনাথ; বিচিত্ররূপিণী।* সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি থেকে প্রকাশিত হয়েছে *সত্যজিৎ রায়।*

বিদ্যুৎবরণ চৌধুরী (১৯৫০-) তাঁর সম্পাদনায় ডিজিটাল ডকুমেন্টস-এর বিষয়ে একটি গ্রন্থ ত্রিভুজ প্রকাশ করবেন বিদেশের সিস্টার ভারলাগ। রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখার বিশ্লেষণ নিয়ে একটি নতুন নিবন্ধ প্রস্তুত করছেন।

বিবেকানন্দ দাশ (১৯৪৭-) বর্ধমানের খাত্তীগ্রাম উচ্চবিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার শিক্ষক। প্রকাশিত গ্রন্থ: *গঙ্গারিদি: দেশ ও জাতি (দেশ শব্দ); কালনা মহকুমার প্রত্নতত্ত্ব ও ধর্মীয় সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত।* ত্রিভুজচেতনা চরিতামৃত ও সহজতত্ত্বের বিবর্তন এবং পাঠ-উপপাঠের সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ে দুটি পৃথক গ্রন্থ বচনায় ব্যস্ত। অধুনা লুপ্ত সপ্তাঙ্গ ও নৈরঞ্জনা পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন।

মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৭৩-) বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রভাষক। লোক সংস্কৃতি বিষয়ে পঠন পাঠনের পাশাপাশি অসংখ্য গবেষণা প্রবন্ধ লিখেছেন, অংশ গ্রহণ করেছেন বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আলোচনা সভায়। কৃষি সংস্কৃতি বা ফার্মলোর তাঁর অন্যতম পছন্দের বিষয়।

মলয়শঙ্কর ভট্টাচার্য্য (১৯৫৬-) পুরাতত্ত্বে স্নাতকোত্তর, প্রাক্তন প্রদশালাধ্যক্ষ মালদহ মিউজিয়াম। বর্তমানে সরকারি অর্থদপ্তরের আধিকারিক। সমাজ-ইতিহাস-অর্থনীতি বিষয়ে লেখালেখি করেন। 'ন্যাশান্যাল মুভমেন্ট এণ্ড ফ্রিডম স্ট্রাগল ইন সাম সিলেক্টেড এরিয়াজ অব বেঙ্গল ১৮৫৭-১৯৪৭'— তাঁর পি এইচ ডি গবেষণার বিষয়। প্রকাশিত গ্রন্থ: *আর্ট অব বেঙ্গল; নর্থ ইস্ট ইণ্ডিয়া এণ্ড হার নেবার; ভারতে শিশুশ্রম*। রজনীকান্ত চক্রবর্তী রচিত *গৌড়ের ইতিহাস* সম্পাদনা করেছেন। *দি হিস্টোরিক্যাল রিভিউ*, *শারদপত্র* দুটি সাময়িকীর সম্পাদক।

মহিবুল ইসলাম (১৯৬৬-) সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ। রঙপুর পৌর নগরীর ইতিহাস ও ঐতিহ্য বিষয় পি এইচ ডি। শীঘ্রই প্রকাশিত হবে: *ইতিহাস ঐতিহ্য রঙপুর; শিক্ষা সংস্কৃতি ও রাজনীতিতে বিশিষ্ট মুসলিম মহীয়সীগণ*।

মীনা দাঁ (১৯৫৮-) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্ব বিভাগের রিডার। ভাষাতত্ত্বে স্নাতকোত্তর ও পি এইচ ডি ডেকান কলেজ, পুনে। প্রকাশিত গ্রন্থ *দি ফোনেমিক এণ্ড মর্ফেমিক ফ্রিকোয়েন্সিস এ্যাজ দ্য বেঙ্গলি ল্যাক্সোয়েজ; সাম ইস্যুজ মেট্রিক্যাল ফোনোলজি অব বাংলা : দি ইনডিজিনিয়াস রিসার্চ ট্রাডিশন*। তাঁর গবেষণার ক্ষেত্র স্মৃতিতত্ত্ব, স্মৃতিবিজ্ঞান, ভাষাশিক্ষা, মনোভাষা বিজ্ঞান। বাংলা ভাষাতত্ত্বের পরিভাষা অভিধান সংকলনের কাজ করছেন বর্তমানে।

রঙ্গনকান্তি জানা (১৯৬১-) অধীক্ষক, সংগ্রহশালা ও চিত্রবীথি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়। *প্রাচীন বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস* (কুশান যুগ)—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশিত হবে : *নিম্ন পশ্চিমবঙ্গের জলযান ইতিহাস ও বর্তমান*। আবদুল আলিমের *মৃগাবতী পুথি* সম্পাদনা করছেন।

সাগর চট্টোপাধ্যায় (১৯৬২-) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের কর্মী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। ১৯৮৯ ও ২০০৩ বর্ষে দি স্টেটসম্যান এন্ডয়ার্ডস ফর রুরাল রিপোর্টিং-এর জন্য পুরস্কৃত হয়েছেন। সাহিত্য, সাংবাদিকতা, সমাজ-অর্থনীতি বিষয়ে, পত্র পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থ: *দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার পুরাকীর্তি*।

সোমেন ঘোষ (১৯৪৪-) পশ্চিমবঙ্গ সরকারে বিধি বিভাগে গবেষণা আধিকারিক পদে কর্মরত থেকে সম্প্রতি অবসর নিয়েছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দু-বার চারুচিত্র পুরস্কার ছাড়া, ইন্দিরা রিসার্চ সেন্টার ফর ন্যাশান্যাল ইন্সটিগ্রেশন, বিশ্বভারতী থেকে রবীন্দ্রনাথের জাতীয় সংহতি বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে পুরস্কৃত হয়েছেন। *বাংলা সিনেমার পালাবদল* গ্রন্থের জন্য ১৯৯০-এ বি এক জে এ পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁর আরো দুটি বইয়ের নাম *চলচ্চিত্রের ঘর বাহির; প্রসঙ্গ ভারতীয় চলচ্চিত্র*।

গত সংখ্যার সংযোজন :

স্বপন সোম (১৯৫৬-) সরকারি কর্মী। পশ্চিমবঙ্গ সংগীত আকাদেমির সদস্য। দেশ পত্রিকায় এক সময় সংগীত সমালোচনা করেছেন ধারাবাহিকভাবে। তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে *গানের ভিতর দিয়ে; বেঁধেছি আমার স্মরণবীণ*।

পত্রাবলি

(মন্মথনাথ ঘোষকে লিখিত)

কামিনী রায় যতীন্দ্রমোহন বাগচী কুমুদরঞ্জন মল্লিক
রাধারাণী দেবী নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

পত্র : এক

কামিনী রায়ের পত্র

৪২এ হাজরা রোড
বালীগঞ্জ, কলিকাতা
১লা মার্চ, ১৯৩০

মান্যবরেষু,

আপনার পত্রখানি পাইয়া সুখী হইলাম। ছবিখানি^১ খোলা না রাখিয়া বন্ধ রাখিলে উহার সম্বন্ধে কোন ভয় নাই। আপনি উহা যত্নেই রাখিবেন জানি।

লেখাটা^২ ঠিক সাড়ে চৌদ্দ বৎসর পূর্বের। যে রূপ আছে অবিকল সেইরূপ রাখিলে সকলের ভাল লাগিবে কিনা বলিতে পারি না। আপনি নিজে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। ছাপাইতে দিতে আমার কোন আপত্তি নাই। তবে আপনাকে কষ্ট করিয়া একটু ভূমিকা করিতে হইবে।^৩

রঙ্গলাল^৪ আমি একবার তাড়াতাড়ি পড়িয়াছিলাম। মন্তব্য লিখিতে হইলে আর একবার সাবধানে পাঠ করা উচিত। আজকাল আমার স্মরণশক্তি বড়ই দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। অতি শীঘ্রই স্মৃত ও পঠিত বিষয় ভুলিয়া যাই।

আপনার গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে নিঃসংশয়ে একথা বলিতে পারি যে আপনি গত শতাব্দীর যে কৃত্তী বঙ্গসন্তান দিগের জীবনবৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা দ্বারা বঙ্গসাহিত্য ও ইতিহাস উভয়ই সমৃদ্ধিলাভ করিতেছে। এবিষয়ে আপনার ধৈর্য্য, অধ্যবসায় ও দক্ষতাকে সাধুবাদ না করিয়া পারি না।

তত্ত্ববোধিনীতে দীপধূপের সমালোচনা^৫ পড়িয়াছি। সংবাদপত্র ও মাসিক পত্রিকায় বইখানি যেরূপ প্রশংসা পাইয়াছে তাহার অনুরূপ আদর পাঠক সাধারণের কাছে পায় নাই। বিক্রয়ের সংখ্যা দেখিয়া তাহাই মনে হয়। ৭০।৭৫ খানাই উপহারে গিয়াছে, বিক্রয় হইয়াছে ৪৫ খানা।

আমার নবপ্রকাশিত 'জীবনপথে'^৬ একথণ্ড আপনাকে পাঠাইতে গিয়া পাঠাই নাই। ভাবিলাম আপনি যে দিন এদিকে আসিবেন সেইদিন দিব। ছবি ফিরাইতে দেবী আছে সুতরাং বইখানা আমি দুই একদিনের মধ্যেই ডাকে পাঠাইব।

আমায় নমস্কার জানিবেন।

বিনীতা

শ্রীকামিনী রায়

৪২ - ১ স্বপ্নের কোণ

কালীন্দ্র, স্বপ্নের কোণ

১৯৮০, ১৯৮০

স্বপ্নের কোণ

অসম্ভব, স্বপ্নের কোণ

স্বপ্নের কোণ । স্বপ্নের কোণ
স্বপ্নের কোণ । স্বপ্নের কোণ
স্বপ্নের কোণ । স্বপ্নের কোণ
স্বপ্নের কোণ । স্বপ্নের কোণ
স্বপ্নের কোণ । স্বপ্নের কোণ

স্বপ্নের কোণ । স্বপ্নের কোণ
স্বপ্নের কোণ । স্বপ্নের কোণ
স্বপ্নের কোণ । স্বপ্নের কোণ
স্বপ্নের কোণ । স্বপ্নের কোণ
স্বপ্নের কোণ । স্বপ্নের কোণ
স্বপ্নের কোণ । স্বপ্নের কোণ

স্বপ্নের কোণ

স্বপ্নের কোণ । স্বপ্নের কোণ

স্বপ্নের কোণ । স্বপ্নের কোণ
স্বপ্নের কোণ । স্বপ্নের কোণ
স্বপ্নের কোণ । স্বপ্নের কোণ
স্বপ্নের কোণ । স্বপ্নের কোণ
স্বপ্নের কোণ । স্বপ্নের কোণ
স্বপ্নের কোণ । স্বপ্নের কোণ

স্বপ্নের কোণ । স্বপ্নের কোণ

1. विश्वविद्यालय : विश्वविद्यालय एक विशाल विद्यालय है जिसमें अनेक विभाग होते हैं।
 2. विभाग : विश्वविद्यालय के अन्तर्गत अनेक विभाग होते हैं।
 3. विभागाध्यक्ष : विश्वविद्यालय के विभागों के अध्यक्ष को विभागाध्यक्ष कहते हैं।
 4. विभागाध्यक्ष : विश्वविद्यालय के विभागों के अध्यक्ष को विभागाध्यक्ष कहते हैं।
 5. विभागाध्यक्ष : विश्वविद्यालय के विभागों के अध्यक्ष को विभागाध्यक्ष कहते हैं।

[illegible][illegible]

divine reason and love

Signature

পত্র : দুই

যতীন্দ্রমোহন বাগচীর পত্র

PURBACHAL PUBLISHING HOUSE

IN REPLY PLEASE QUOTE

Ref No .

Reg Office .

5 MALLICK LANE, BHOWANIPUR

Dated 7.2. 1947

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ

বন্ধুবরেষু,

প্রিয় মন্মথবাবু, এদিকে বর্ষদিন দেখা সাক্ষাৎ নাই, পত্র ব্যবহারও নাই। আশাকরি, আপনি সপরিবারে ভালই আছেন।

আমি নানা রোগে (হাঁপ ও হানিয়া) একপ্রকার শয্যাগত অবস্থায় জীবন্ত হইয়া নামে মাত্র বাঁচিয়া আছি। উঠিতে হাঁটিতে পারি না, দুর্বলতাও অত্যধিক। হয়তো এই রোগশয্যাই শেষ শয্যা হইবে।

কাল সন্ধ্যায় ডঃ শ্রীমান সুনীতি চাটুর্ঘ্যের কাছে শুনিলাম, বঙ্কিমবাবুর যৌবনের চিত্রখানি আপনার বঙ্কিম জীবনীতে বাহির হইয়াছিল এবং ঐ 'ব্লক' বোধ করি, আপনার কাছেই আছে। এ ছবিটির আমার একবার বিশেষ দরকার হইয়াছে। যদি থাকে, একবার দয়া করিয়া মৎ সম্পাদিত 'পূর্বাচল' পত্রিকায় (এ পত্রিকা এই মাস হইতেই বাহির হইবে) ব্যবহার করিতে দিবেন কি : অবশ্য আপনার সৌজন্য স্বীকৃত হইবে। বহুদিনের বাক্যবতার দাবী লইয়া এ অনুরোধ, আশাকরি আপনি উপেক্ষা বা অস্বীকার করিবেন না।

আমার প্রীতি আলিঙ্গন জানাইতেছি। ইতি আপনার

প্রীতিবদ্ধ

যতীন্দ্রমোহন বাগচী

পুং কাগজ বাহির হইবা মাত্র আপনাকে পাঠানো হইবে।

শ্রীঃ

পত্র : তিন

যতীন্দ্রমোহন বাগচীর পত্র

PURBACHAL PUBLISHING HOUSE

IN REPLY PLEASE QUOTE

Ref No .

Reg. Office :

5 MALLICK LANE, BHOWANIPUR
CALCUTTA - 25

Dated [9.] 2. 1947

বন্ধুবরেষু,

ভাই মন্মথবাবু, সঙ্গে সঙ্গে আপনার ব্লকখানি পাঠাইবার তৎপরতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া ভাবিয়াছি আপনি পূর্বকথা ও আমার প্রতি আপনার ভালবাসা ভোলেন নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে কিন্তু ব্লকখানি নষ্ট হইয়া যাওয়ায় কাজে লাগিল না। অশেষ ধন্যবাদসহ তাহা এই সঙ্গে ফেরত পাঠাইলাম।

আমি অতিশয় পীড়িত, শয্যাভ্যাগ করিতে পারি না। একবার দেখা করিবার বিশেষ ইচ্ছা
সত্ত্বেও দেখা বুঝি হয় না। কারণ আপনারও এতদূর আসায় অনেক অসুবিধা।

একটা ছোটখাট সাহিত্য সংক্রান্ত interesting জীবনী, যদি আপনার ব্লক থাকে, পাঠাইলে
উপকৃত হইতাম। আছে কি?

আমার প্রীতি আলিঙ্গন গ্রহণ করিবেন। ইতি আপনার [অস্পষ্ট]

যতীন্দ্রমোহন বাগচী

পত্র : চার

কুমুদরঞ্জন মল্লিকের পত্র

শ্রীহরি শরণং

মাথকন পোস্ট,
বর্ধমান

প্রিয়বরেষু,

আপনার পত্র খানি পাইয়া যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম বলিতে পারিনে। আপনার
লেখা আমি অতিমাত্র আগ্রহের সহিত পড়ি এবং বিপুল আনন্দ পাই। এত পরিশ্রম করিয়া লিখিবার
শক্তি এমন সুন্দর সুবিন্যস্ত করিয়া বলিবার ভঙ্গী আজকালকার লেখকদের মধ্যে বিরল।

আমি আমার কবিতা পুস্তক 'নূপুর' প্রকাশিত হইলেই পাঠাইব। 'বনমল্লিকা' এতদিন
পাঠাইতে পারি নাই, আমারি দুর্ভাগ্যবশতঃ। আমি আপনার ঠিকানাটি হারাইয়া ফেলিয়া ছিলাম।
অন্য পত্র পাইয়া বড়ই আনন্দলাভ করিলাম। বইখানি অদ্য রেজিস্টারী করিয়া পাঠাইলাম।

'Memoirs of Kaliprossunno' খুবই আনন্দের সহিত পড়িব এবং মালঞ্চ ইহার
সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ সম্ভব দিব। আপনি যথাসাধ্য ইংরাজী-বাঙ্গলা সমান ভাবে লিখিয়া যাইতেছেন।
আপনার Girish Chandra Ghosh^৪ অতি উপাদেয় গ্রন্থ। আমি কয়দিন পড়িয়াছিলাম এখনো
সারিতে পারি নাই। 'নূপুর' খানা ছাপা শেষ হয়েছে, ইহা কেবল 'গাথার' সমষ্টি যা ভারতবর্ষ,
মানসী প্রভৃতিতে প্রকাশিত হয়েছিল। 'দ্বারাবতী'^৫ বলে আর একখানা বই শেষ ছাপা হয়েছে,
সেটাও শীঘ্র পাঠাবো। মালঞ্চ পল্লী মধু^৬ আপনার কেমন লাগছে। ওটার শেষটা ভালই হবে।

আপনি এখন কি সে [হাত] দিয়েছেন জানতে চাই, মহেন্দ্রলাল ধরন।^৭ লেখার মত চরিত্র
বটে। আপনার ছেলেমেয়েগুলির কে কেমন আছে লিখিবেন। আপনি আমার প্রগাঢ় ভালবাসা
গ্রহণ করবেন। ইতি

স্নেহের

শ্রী কুমুদরঞ্জন

21-22-23.

Signature of RFR

02525-5

विषयः

1. 1947-48
 2. 1948-49
 3. 1949-50
 4. 1950-51
 5. 1951-52
 6. 1952-53
 7. 1953-54
 8. 1954-55
 9. 1955-56
 10. 1956-57
 11. 1957-58
 12. 1958-59
 13. 1959-60
 14. 1960-61
 15. 1961-62
 16. 1962-63
 17. 1963-64
 18. 1964-65
 19. 1965-66
 20. 1966-67
 21. 1967-68
 22. 1968-69
 23. 1969-70
 24. 1970-71
 25. 1971-72
 26. 1972-73
 27. 1973-74
 28. 1974-75
 29. 1975-76
 30. 1976-77
 31. 1977-78
 32. 1978-79
 33. 1979-80
 34. 1980-81
 35. 1981-82
 36. 1982-83
 37. 1983-84
 38. 1984-85
 39. 1985-86
 40. 1986-87
 41. 1987-88
 42. 1988-89
 43. 1989-90
 44. 1990-91
 45. 1991-92
 46. 1992-93
 47. 1993-94
 48. 1994-95
 49. 1995-96
 50. 1996-97
 51. 1997-98
 52. 1998-99
 53. 1999-00
 54. 2000-01
 55. 2001-02
 56. 2002-03
 57. 2003-04
 58. 2004-05
 59. 2005-06
 60. 2006-07
 61. 2007-08
 62. 2008-09
 63. 2009-10
 64. 2010-11
 65. 2011-12
 66. 2012-13
 67. 2013-14
 68. 2014-15
 69. 2015-16
 70. 2016-17
 71. 2017-18
 72. 2018-19
 73. 2019-20
 74. 2020-21
 75. 2021-22
 76. 2022-23
 77. 2023-24
 78. 2024-25
 79. 2025-26
 80. 2026-27
 81. 2027-28
 82. 2028-29
 83. 2029-30
 84. 2030-31
 85. 2031-32
 86. 2032-33
 87. 2033-34
 88. 2034-35
 89. 2035-36
 90. 2036-37
 91. 2037-38
 92. 2038-39
 93. 2039-40
 94. 2040-41
 95. 2041-42
 96. 2042-43
 97. 2043-44
 98. 2044-45
 99. 2045-46
 100. 2046-47
 101. 2047-48
 102. 2048-49
 103. 2049-50
 104. 2050-51
 105. 2051-52
 106. 2052-53
 107. 2053-54
 108. 2054-55
 109. 2055-56
 110. 2056-57
 111. 2057-58
 112. 2058-59
 113. 2059-60
 114. 2060-61
 115. 2061-62
 116. 2062-63
 117. 2063-64
 118. 2064-65
 119. 2065-66
 120. 2066-67
 121. 2067-68
 122. 2068-69
 123. 2069-70
 124. 2070-71
 125. 2071-72
 126. 2072-73
 127. 2073-74
 128. 2074-75
 129. 2075-76
 130. 2076-77
 131. 2077-78
 132. 2078-79
 133. 2079-80
 134. 2080-81
 135. 2081-82
 136. 2082-83
 137. 2083-84
 138. 2084-85
 139. 2085-86
 140. 2086-87
 141. 2087-88
 142. 2088-89
 143. 2089-90
 144. 2090-91
 145. 2091-92
 146. 2092-93
 147. 2093-94
 148. 2094-95
 149. 2095-96
 150. 2096-97
 151. 2097-98
 152. 2098-99
 153. 2099-00
 154. 2100-01
 155. 2101-02
 156. 2102-03
 157. 2103-04
 158. 2104-05
 159. 2105-06
 160. 2106-07
 161. 2107-08
 162. 2108-09
 163. 2109-10
 164. 2110-11
 165. 2111-12
 166. 2112-13
 167. 2113-14
 168. 2114-15
 169. 2115-16
 170. 2116-17
 171. 2117-18
 172. 2118-19
 173. 2119-20
 174. 2120-21
 175. 2121-22
 176. 2122-23
 177. 2123-24
 178. 2124-25
 179. 2125-26
 180. 2126-27
 181. 2127-28
 182. 2128-29
 183. 2129-30
 184. 2130-31
 185. 2131-32
 186. 2132-33
 187. 2133-34
 188. 2134-35
 189. 2135-36
 190. 2136-37
 191. 2137-38
 192. 2138-39
 193. 2139-40
 194. 2140-41
 195. 2141-42
 196. 2142-43
 197. 2143-44
 198. 2144-45
 199. 2145-46
 200. 2146-47
 201. 2147-48
 202. 2148-49
 203. 2149-50
 204. 2150-51
 205. 2151-52
 206. 2152-53
 207. 2153-54
 208. 2154-55
 209. 2155-56
 210. 2156-57
 211. 2157-58
 212. 2158-59
 213. 2159-60
 214. 2160-61
 215. 2161-62
 216. 2162-63
 217. 2163-64
 218. 2164-65
 219. 2165-66
 220. 2166-67
 221. 2167-68
 222. 2168-69
 223. 2169-70
 224. 2170-71
 225. 2171-72
 226. 2172-73
 227. 2173-74
 228. 2174-75
 229. 2175-76
 230. 2176-77
 231. 2177-78
 232. 2178-79
 233. 2179-80
 234. 2180-81
 235. 2181-82
 236. 2182-83
 237. 2183-84
 238. 2184-85
 239. 2185-86
 240. 2186-87
 241. 2187-88
 242. 2188-89
 243. 2189-90
 244. 2190-91
 245. 2191-92
 246. 2192-93
 247. 2193-94

1. The first part of the paper is devoted to a discussion of the general principles of the theory of the structure of the atom. It is shown that the structure of the atom is determined by the laws of quantum mechanics, and that the laws of quantum mechanics are based on the principle of the uncertainty of the position and momentum of the particles.

Memories of Kalifornian

၃၀ ဘဏ္ဍာ. မိမိ မိမိ
 မိမိ မိမိ မိမိ မိမိ

১৯৪১। ১। ২। ৩। ৪। ৫। ৬। ৭। ৮। ৯। ১০।
 ১১। ১২। ১৩। ১৪। ১৫। ১৬। ১৭। ১৮। ১৯। ২০।
 ২১। ২২। ২৩। ২৪। ২৫। ২৬। ২৭। ২৮। ২৯। ৩০।
 ৩১। ৩২। ৩৩। ৩৪। ৩৫। ৩৬। ৩৭। ৩৮। ৩৯। ৪০।
 ৪১। ৪২। ৪৩। ৪৪। ৪৫। ৪৬। ৪৭। ৪৮। ৪৯। ৫০।
 ৫১। ৫২। ৫৩। ৫৪। ৫৫। ৫৬। ৫৭। ৫৮। ৫৯। ৬০।
 ৬১। ৬২। ৬৩। ৬৪। ৬৫। ৬৬। ৬৭। ৬৮। ৬৯। ৭০।
 ৭১। ৭২। ৭৩। ৭৪। ৭৫। ৭৬। ৭৭। ৭৮। ৭৯। ৮০।
 ৮১। ৮২। ৮৩। ৮৪। ৮৫। ৮৬। ৮৭। ৮৮। ৮৯। ৯০।
 ৯১। ৯২। ৯৩। ৯৪। ৯৫। ৯৬। ৯৭। ৯৮। ৯৯। ১০০।

১। ২। ৩। ৪। ৫। ৬। ৭। ৮। ৯। ১০।
 ১১। ১২। ১৩। ১৪। ১৫। ১৬। ১৭। ১৮। ১৯। ২০।
 ২১। ২২। ২৩। ২৪। ২৫। ২৬। ২৭। ২৮। ২৯। ৩০।
 ৩১। ৩২। ৩৩। ৩৪। ৩৫। ৩৬। ৩৭। ৩৮। ৩৯। ৪০।
 ৪১। ৪২। ৪৩। ৪৪। ৪৫। ৪৬। ৪৭। ৪৮। ৪৯। ৫০।
 ৫১। ৫২। ৫৩। ৫৪। ৫৫। ৫৬। ৫৭। ৫৮। ৫৯। ৬০।
 ৬১। ৬২। ৬৩। ৬৪। ৬৫। ৬৬। ৬৭। ৬৮। ৬৯। ৭০।
 ৭১। ৭২। ৭৩। ৭৪। ৭৫। ৭৬। ৭৭। ৭৮। ৭৯। ৮০।
 ৮১। ৮২। ৮৩। ৮৪। ৮৫। ৮৬। ৮৭। ৮৮। ৮৯। ৯০।
 ৯১। ৯২। ৯৩। ৯৪। ৯৫। ৯৬। ৯৭। ৯৮। ৯৯। ১০০।

১৯৪০

১৯৪০

৭২/২ হিন্দুস্থান পার্ক
বালীগঞ্জ কলিকাতা
১১/৯/৩৬

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

আমি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের—অর্থাৎ ১২৭০ সাল হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত—মহিলাদের বাংলাসাহিত্যে দান সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ রচনা করিয়াছি। স্বর্গীয়া স্বর্গকুমারীদেবীর পূর্বকর্তন কালের এবং তাঁহার সমসাময়িক লেখিকাদের চিত্র সংগ্রহ সম্বন্ধে আপনার সাহায্য প্রার্থনা করি।

আমি একটি তালিকা আপনার নিকট পাঠাইতেছি, এই তালিকা অন্তর্ভুক্ত কিংবা তালিকার বাহিরেই অন্য কোনও—সেইজন্যে—লেখিকার দৃষ্টি যদি আপনার নিকট থাকে, অনুগ্রহ পূর্বক ব্লক লেখকীর জন্য আনন্দবাদার পত্রিকায় এই প্রতিনির্দেশ নিকট দিউন। ব্লক প্রাপ্ত হইলে, দৃষ্টি আপনার নিকট পৌঁছে দিয়া আশিষ্ট। এই সকল দুঃস্বপ্নাদি সম্বন্ধে না নষ্ট হইয়া হইয়া—(সম্বন্ধে) হইয়া বিশেষ সতর্কতা ও যত্ন লইবেন, কৃত্য্য দিগাহন।

শ্রদ্ধাঞ্জলি, আপনি নিম্নলিখিত আত্মাঙ্ক প্রাপ্তি
সাহায্য করিয়া কৃতজ্ঞতা পান। আত্মাঙ্ক করিবেন।

—আপনি বাংলাদের উদ্দেশ্যে প্রায়শঃ প্রদান করুন। নীচে

বিশীল —
শ্রীমতীস্বামী দেবী

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

পত্র : পাঁচ

রাধারানী দেবীর পত্র

৭২/২ হিন্দুস্থান পার্ক
বালীগঞ্জ, কলিকাতা
১১/৯/৩৬

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আমি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের—অর্থাৎ ১২৭০ সাল হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত—মহিলাদের বাংলাসাহিত্যে দান সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ রচনা করিয়াছি। স্বর্গীয়া স্বর্গকুমারীদেবীর পূর্বকর্তন কালের এবং তাঁহার সমসাময়িক লেখিকাদের চিত্র সংগ্রহ সম্বন্ধে আপনার সাহায্য প্রার্থনা করি।

আমি একটি তালিকা আপনার নিকট পাঠাইতেছি, এই তালিকা অন্তর্ভুক্ত কিংবা তালিকার

বাহিরের অন্যকোনও—সেকালের লেখিকার ছবি যদি আপনার নিকট থাকে, অনুগ্রহ পূর্বক ব্রুক তৈয়ারির জন্য আনন্দবাজার প্রত্নিকার এই প্রতিনিধির নিকট দিবেন। ব্রুক প্রস্তুত হইলে, ছবি আপনার নিকট ফেরৎ দিয়া আসিবেন। ঐ সকল দুষ্প্রাপ্য চিত্র যাহাতে না নষ্ট হয় ও না হারায়, সে সম্বন্ধে ইঁহারা বিশেষ সতর্কতা ও যত্ন লইবেন, কথা দিয়াছেন।

আশাকরি, আপনি নিশ্চয়ই আমাকে এবিষয়ে সাহায্য করিয়া কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিবেন।

আপনি আমাদের উভয়ের প্রণাম গ্রহণ করুন। ইতি

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ

কবিতা

শ্রীরাধারানী দেবী

পত্র : ছয়

নন্দগোপাল সেনগুপ্তের পত্র

31, Harish Chatterjee Street,

Kalighat, Calcutta

6. 9. 39

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচয় নেই, কিন্তু বহুদিন থেকেই আপনার অনুরাগী পাঠক।

আপনার কবি হেমচন্দ্র ১/২, রঙ্গলাল, বিহারীলাল, কালীপ্রসন্ন সিংহ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়,

গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ভোলানাথ চন্দ্র প্রমুখ কবি, সাহিত্যিক এবং মনীষীর জীবনী ও কাব্যাবলীর আলোচনা

আগ্রহ সহকারেই পড়ে এসেছি। এতখানি অনুসন্ধিৎসা, শ্রম, সত্যানিষ্ঠা এবং রক্ষণশীল শ্রদ্ধা আজকের

দিনে খুব সুলভ নয় বলেই, বার বার আপনাকে অন্তরের সঙ্গে সাধুবাদ জানিয়েছি।

আমাদের দেশ অব্যতন্ত্র বলে নিন্দিত। দেশের সংস্কৃতি, সাহিত্য, শিক্ষা এবং জাতীয় জীবনকে

যৌরা স্থাপন করেছেন, গড়ে তুলেছেন, নানাদিক থেকে পুষ্ট এবং সমৃদ্ধ করে গেছেন, আমরা তাঁদের

সাধনার ফল ভোগ করেছি, করছি, কিন্তু তাঁদের আমরা মনে করে রাখবার প্রয়োজন বোধ করি না।

এ জন্য জনসাধারণ যতটা দায়ী, তার চেয়ে অনেক বেশী সাহিত্যিকমণ্ডলী—তাঁরা পুরাতনকে

বাতিল করতেই আগ্রহশীল। তাই অক্ষয়কুমার দত্ত, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, তারাশঙ্কর তর্করত্ন,

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, নবীনচন্দ্র সেন, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, অক্ষয়চন্দ্র সরকার,

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কবি, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক (অল্প কয়েকটি

নামই করলাম)—এবং কৃষ্ণদাস পাল, হরিশ মুখোপাধ্যায়, শঙ্কুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মহেন্দ্রলাল সরকার,

কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কালীপ্রসন্ন কাব্য বিহারদ, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, রামগোপাল

ঘোষ প্রমুখ সাংবাদিক, বৈজ্ঞানিক, নেতা এবং শিক্ষাব্রতী কে ছিলেন, কি করেছিলেন, দেশের লোক

আজ তা প্রায় জানেই না। আর কিছুদিন পরে এদের কথাই হয়ত লোকে নির্বিবাদে ভুলে যাবে। এই

দেশব্যাপী অজ্ঞতার মুখে আপনি এককভাবে যে রকম লেখা নিয়ে অষ্টাদশ, ঊনবিংশ এবং বিংশ

31, Harish Chatterjee
Street
Kashikh, Calcutta
6.9.39.

अक्षयप्रभ-
॥

[illegible][illegible]

[illegible]

۵

දිනේෂ්වර මො: - අක්ෂර. (සාහසික) මගින්. එය
 මගින් / (එදා) මගින්. එදා මගින්. අක්ෂර.
 මගින්. 3. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 82

[illegible]

শতাব্দীর প্রথম পর্বের বাঙালী মনীষীদেরকে দেশের সাম্নে উপস্থিত করেছেন, করছেন, তার মূল্য সম্যক বুঝবার লোকই আজ দুর্লভ। কিন্তু আপনার এই সত্যকার দেশাত্মবোধ এবং দেশীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে শ্রদ্ধা কোন দিন ব্যর্থ হবে না, একদিন এর মূল্য দেশকে দিতেই হবে। দুর্ভাগ্যবশতঃ এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে আমরা কিছুই আশা করতে পারি না। এদেশের প্রকাশকরাও সুলভ উপন্যাস প্রচারেই মনোযোগী—তাই English Men of Letters, English Heroes, Makers of English thought জাতের এক একটা series এ দেশে আশা করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। অথচ এই শ্রেণীর জিনিষ শুধু দরকারই নয় অপরিহার্য এবং এ একজনের কাজও নয়—একটা সুনিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানের ধারাবাহিক কার্যপদ্ধতি ভিন্ন এত বড় একটা কাজ হতে পারে না। কিন্তু করবে কে? বিশ্ববিদ্যালয়, সাহিত্য পরিষৎ, বিশ্বভারতী.....সব দরজাতে ঘা দিয়েই দেখেছি, সাড়া নেই।

তবু আপনার এই অদম্য নিষ্ঠা ও সাধকোচিত অভিনিবেশ দেখে আশা হয়।

এইখানে আপনার কাছে আর একটা নিবেদন করতে চাই। কালীপ্রসাদ ঘোষ থেকে সুরু করে একেবারে সরোজিনী নাইডু পর্যন্ত বহু বাঙালী স্ত্রীপুরুষ একদা ইংরেজীতে কবিতা লিখেছিলেন— তাঁদের রচনা কালক্রমে দুর্লভ হয়েছে—ডান সাহেবের সঙ্কলনও বহুদিন out of print।^১ এঁদের রচনাবলীর খবর রাখেন আপনি। আপনি ইচ্ছা করলেই বাঙালীর ইংরাজী কবিতার একটি সঙ্কলন প্রকাশ করতে পারেন। একদা বিচিত্রায় আপনি এঁদের সম্বন্ধে একটি সচিত্র প্রবন্ধ লিখেছিলেন।^২ তাই এ বিষয়ে আপনাকে অনুরোধ করছি। এই সঙ্গে রাজা রামমোহন থেকে একেবারে আধুনিক কাল পর্যন্ত যে সমস্ত বাঙালী সংস্কারক, নেতা, প্রচারক ও পণ্ডিত ইংরেজিতে রই পত্তর লিখেছেন, তাঁদের রচনাবলী থেকেও অনুরূপ প্রণালীর একখানি গদ্য সংকলন বার করা যেতে পারে এবং সে কাজও আপনার দ্বারাই সম্ভব। এই দুটি বইয়ের সত্যি অভাব আছে—আপনি যদি এই ধরনের দু'খানি সঙ্কলন গ্রন্থ, ভূমিকা ও টীকা টিপ্পনী সমেত সম্পাদনা করেন, তাহলে আমি নেটেশান, তারাপুরওয়াল, নিদান পক্ষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তা প্রকাশের জন্যে কিছুটা চেষ্টাও করতে পারি। তবে আপনি আপনার রইগুলি সব নিজেই প্রকাশ করে থাকেন—কাজেই এ দুটি বই আপনার নিজেরও প্রকাশ করায় হয়ত অসুবিধা হবে না। এখনো সংগৃহীত, রক্ষিত এবং প্রচারিত না হলে, আপনাদের পর এরা দেশ থেকে সম্পূর্ণ রূপেই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তার চেয়ে বড় শোচনীয় ব্যাপার আর কিছুই হতে পারে না বলেই আপনার ন্যায় এই জিনিষের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাণ্ডারীর কাছে এ সম্বন্ধে আবেদন জানালাম। ধৃষ্টতা হলে মার্জনা করবেন।

আপনার বইগুলো অধিকাংশই আমার সংগ্রহের মধ্যে আছে। যদি এঁদের প্রচার ব্যাপারে সহায়ক হবে মনে করেন, তাহলে যুগান্তরে সমালোচনার জন্যও কিছু কিছু পাঠাতে পারেন—আমি সম্পাদকীয় বিভাগে আছি এবং পুস্তক পরিচয় আমিই লিখি।

ব্যক্তিগত ভাবে আমার পরিচয় দেবার কিছুই নেই। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটিকা ও প্রবন্ধের বই খান দশেক লিখেছি এবং তার অধিকাংশই সুধী সমাজে আদৃত হয়েছে—এই পর্য্যন্ত। একদা বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ছিলাম, এখন সাংবাদিক। সৌভাগ্যবশতঃ অনেকেরই স্নেহ লাভ করেছি—আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়নি, এ আমারই সময়াভাবের দোষে হয়েছে। তথাপি ছোটখাটো ভাবে হলেও এক গোষ্ঠী ভুস্ত হিসাবে আপনার কাছে আমি একটু আত্মীয়তার দাবী করতে পারি বৈকি। সেইজন্যেই এত দীর্ঘ চিঠি লিখে ফেললাম। আশাকরি কিছু মনে করবেন না।

আপনার পিতৃদেবের কৃত বাংলা কবিতার ইংরাজি অনুবাদ নিয়ে একখানা বই আছে শুনেছি। ঐ বইটি একবার যদি দেখতে পাঠান তাহলে বাধিত হবো। যুগান্তর সম্পাদকীয় বিভাগে আমার নামে বা ওপরের ঠিকানায় পাঠালেই আমি পাবো। বইটির আমি একটি অনুকূল সমালোচনাও যুগান্তরে করে দোব। আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও শ্রদ্ধা নমস্কার নেবেন। ইতি

ভবদীয়

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

পত্রপ্রাপক, পত্রলেখক ও পত্রপরিচিতি

মন্মথনাথ ঘোষ (১৮৮৪-১৯৫৯) কলকাতার সিমুলিয়ার ঘোষ পরিবারে জন্ম। পিতামহ গির্বিচন্দ্র ঘোষ হিন্দু পেট্রিয়ট ও বেঙ্গলী পত্রিকার প্রবর্তক ও প্রধান সম্পাদক। পিতা অতুলচন্দ্র বিচারবিভাগে কাজ করলেও আত্মীবন সাহিত্যচর্চা করেছেন—দেশি বিদেশি একাধিক ভাষা জ্ঞানতেন। মন্মথনাথের মাতা সুরবালা সাহিত্যচর্চা করতেন, তাঁর কাব্যগ্রন্থের নাম মধুরা। খুব অল্প বয়স থেকেই মন্মথনাথ সাহিত্যচর্চায় মনোযোগী হন, তাঁর প্রথম রচনা প্রকাশিত হয় সাহিত্য পত্রিকায়। পরবর্তীকালে আৰ্য্যাবর্ত, যমুনা, মনসী ও মর্শ্বাবীণী; মাসিকবসুমতী, পঞ্চপুষ্প, ভারতবর্ষ; ইত্যাদি পত্রিকায় তিনি লিখেছেন। গল্প ও কবিতা ছাড়াও প্রবন্ধ ও জীবনী-বচনার তিনি বিশেষ খ্যাতি অধিকারী হন। বহুক্ষেমে রচিত তাঁর গ্রন্থগুলির মধ্যে দ্য লাইফ অফ গিরিশচন্দ্র ঘোষ দ্য ফাউন্ডার এণ্ড ফার্স্ট এডিটর অফ দ্য হিন্দু পেট্রিয়ট এণ্ড বেঙ্গলি, মহাত্মা কালী প্রসন্ন সিংহ, রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র, নিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, মনীষী ভোলানাথ চন্দ্র কন্দলীর, কিশোরীচাঁদ মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রঙ্গলাল, স্বর্ণশ্রুতি, মনীষী রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বিশেষভাবে উল্লেখ্য। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন।

কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম অনার্স গ্রাজুয়েট (সংস্কৃত/ ১৮৮৬)। বেথুন স্কুলে শিক্ষয়িত্রী বরণে যুক্ত ছিলেন। পনেরো বছর বয়সে লেখা আলো ও ছায়া তাঁর প্রথম কাব্য গ্রন্থ। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন। ১৮৮৯ সালে আলো ও ছায়া সেই ভূমিকা সহ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কবি খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। অমিয়াক্ষর ছন্দে রচিত মহাশ্বেতা ও পুণ্ডরীক তাঁর দুটি প্রসিদ্ধ দীর্ঘ কবিতা। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ : পৌরাণিকী, দীপ ও ধূপ, জীবন পথে, নির্মাণ, মালা ও নির্মাণ, অশোক সঙ্গীত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর সহ-সভাপতি (১৯৩২-৩৩) পদে কাজ করেছেন। এবং নারী শ্রমিক তদন্ত কমিশনের অন্যতম সদস্য (১৯২২-২৩) ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সাহিত্যসেবার স্বীকৃতি স্বরূপ জগন্নারায়ণী স্বর্ণ পদক প্রদান করেন।

যতীন্দ্রমোহন বাগচী (১৮৭৮-১৯৪৮) ববীন্দ্র-পরবর্তীযুগের বিশিষ্ট কবি। খুব অল্প বয়স থেকে কাব্যচর্চায় আগ্রহী হন। পবিত্র বয়সে কিছুদিন মনসী ও যমুনা পত্রিকার সম্পাদনা করেছিলেন। পূর্বাচল মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী হন। তাঁর লেখা কাব্যগ্রন্থ : লেখা, রেখা, অপরাধিতা, মহাভারতী, কাব্যমালঞ্চ, নাগকেশর, বন্ধুর দান, জাগরণী, নীহারিকা, পাঞ্চজন্য, পথের সাথী প্রভৃতি।

কুমুদরঞ্জন মল্লিক (১৮৮৩-১৯৭০) বর্ধমান জেলার অজয় ও কুনার নদীর সঙ্গমে অবস্থিত কোগ্রামে জন্ম। রবীন্দ্রানুসারী কবি সমাজের অন্যতম। বি. এ. পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র সুবর্ণপদক

পেয়েছিলেন। ম্যাথুরন নবীনচন্দ্র ইনস্টিটিউশনে দীর্ঘকাল প্রধান শিক্ষক পদে কাজ করেছেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থ : উজ্জলনী; একতারা; বনতুলসী; রজনীগন্ধা; একসময় অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। ‘সাহিত্যতীর্থ’ নামে কবি সাহিত্যিকদের প্রতিষ্ঠানে তিনি তীর্থপতি ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জগন্নারীণী স্বর্ণপদক লাভ করেন।

রাধারানী দেবী (১৯০৩-১৯৮৯) কবি-ঔপন্যাসিক-প্রাবন্ধিক। বুকের বীণা; আঙ্গিনার ফুল; পুরবাসিনী ও বিচিত্রা রূপিনী; নীতি ও গল্প, গল্পের আদ্যনা, শরৎচন্দ্র: মানুষ ও শিল্প তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। প্রথম জীবনে অপরাধিতা দেবী ছদ্মনামে যে সব লেখা লেখেন তাই অপরাধিতা বচনাবলী নামে ১৯৮৫ সালে একত্র করে প্রকাশিত হলে ১৯৮৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেন। শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য রাধারানী শরৎচন্দ্রের অসমাপ্ত শেষের পরিচয় সম্পূর্ণ করেন। তিনি রবীন্দ্রনাথকে পদ্যে চিঠি দিতেন, উত্তর পেতেন পদ্যে। প্রহাসিনী গ্রন্থে সেসব কবিতা পরে বেবিয়েছে। “রবীন্দ্রনাথের অন্তঃপুর” তাঁর এক উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ।

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত (১৯১০-১৯৮৮) কলকাতার কালীঘাট স্থলে ১৯৩৩-১৯৩৫ বাংলাভাষা-সাহিত্যের শিক্ষক; বিশ্বভারতীতে অধ্যাপনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সচিব ১৯৩৬-১৯৩৮ পর্যন্ত। সহযোগী সম্পাদক যুগান্তর পত্রিকা (১৯৩৮-১৯৭৫)। গণতান্ত্রিক লেখক ও শিল্পী সংঘের বাজ্য কমিটির প্রথম সভাপতি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিরিশচন্দ্র ঘোষ স্মৃতি বঙ্কতা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে নবীনচন্দ্র সেন স্মৃতি বঙ্কতা দিয়েছেন। কাছে মানুষ রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রচর্চা ভূমিকা; সাহিত্য-সংস্কৃতি সময়; সময়-অসময়ের লেখা; বস্তুবাদের ভারত জিজ্ঞাসা; বিশ্বসাহিত্যের ভূমিকা; এ যুগের মন ও মনীষা; স্ববর্ণীমদের সামিধে; এ বুক অব বেকলি ভার্স: টেনথ টু টুয়েন্টিথ সেঞ্চুরি (সম্পাদিত) তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। তাঁর অন্যান্য বহু পঠিত গ্রন্থ হল সেতু; পড়ন্ত বেলায় পাখি; অদৃশ্য সংকেত; প্রেম ও পাদুকা; কাঁটাতার; ধোঁয়া; ছন্দপতন; বনটিয়া; ঝিলিমিলি; হারানবাবুর ওভার কোট; ঐতিহাসিক ঘোড়া; পায়ে চলাব পক্ষ; যৌবন জলন্তরঙ্গ; সমাজ ও যৌন সমস্যা; সমাজ সমীক্ষা : অপরাধ ও অনাচার ও সমাজ ও যৌন বিজ্ঞান।

পত্র পরিচিতি

পত্র : এক

- ১ কবি বামাসুন্দরী দেবী কবি কামিনী রায়ের মাতৃদেবী ও টমকাকার কুটির, ঝাঁসীর রাণী, দেওয়ান গঙ্গা, গোবিন্দ সিংহ প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থের প্রণেতা, চণ্ডীচরণ সেনের সহধর্মিণী, ব্রাহ্ম মহিলা সমিতির অন্যতম সংগঠক।
- ২ কামিনী রায় লিখিত বামাসুন্দরী দেবীর জীবন কথা শ্রদ্ধাবাসরে পঠিত রচনা—সেপ্টেম্বর, ১৯২৯।
- ৩ মম্বথনাথের আগ্রহে বামাসুন্দরী বস্তুকথাটি মম্বথনাথ লিখিত ভূমিকা সহ বিচিত্রা পত্রিকায় ১৩৩৭ ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।
- ৪ মম্বথনাথ লিখিত বঙ্গশাল জীবনী (১০ + ৫০০ পৃষ্ঠা)। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স, কলিকাতা (১৩৩৬ বঙ্গাব্দ)।
- ৫ কামিনী রায় রচিত দীপধূপকাব্যের মম্বথনাথ কৃত বিস্তৃত সমালোচনাটি ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয় (১৩৩৬ বঙ্গাব্দ)।
- ৬ জীবন পথে ১৯৩০-এ প্রকাশিত, তাঁর সনেটগুচ্ছের সংকলন।

পত্র : দুই

- ১ পূর্বাচল পত্রিকাটি প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা থেকে দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা (মাঘ ১৩৫৩ থেকে মাঘ ১৩৫৪) সম্পাদনা করেছিলেন যতীন্দ্রমোহন বাগচী।

পত্র : চার

- ১ নৃপূর কাব্য গ্রন্থটি ১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা থেকে মেসার্স চক্রবর্তী চ্যাটার্জি অ্যান্ড কোং লিমিটেড কর্তৃক ১৩২৭ সালে প্রকাশিত হয়।
- ২ বনমঙ্গিকা কাব্যগ্রন্থটি কলকাতা থেকে মেসার্স চক্রবর্তী চ্যাটার্জি অ্যান্ড কোং লিমিটেড কর্তৃক ১৩২৫ সালে প্রকাশিত হয়।
- ৩ *Memoirs of Kaliprossunno Singh* by Manmathanath Ghosh. Publisher Barendra Library: Calcutta, -1920.
- ৪ *The Life of Girish Chandra Ghose, the founder and the first editor of the Hindoo Patriot and the Bengalee by one who knew him.* Edited by his grandson Manmathanath Ghosh. Published by R. Cambray & Company. Calcutta. 1911.
- ৫ ঘারাবতী কাব্যগ্রন্থটি ৪/২, ওয়েলিংটন স্কোয়ারস্থ ওয়েলিংটন লাইব্রেরী কর্তৃক ১৩২৬ সালে প্রকাশিত হয়।
- ৬ মালম্ভ পত্রিকায় প্রকাশিত ধারাবাহিক নাটক।
- ৭ মহেন্দ্রলাল সরকার (১৮৩৩-১৯০৪) চিকিৎসা বিজ্ঞান ছাড়া প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে পার্শিত্য ছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট, কলকাতার শেরীফ, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। বৈদ্যনাথ রায়কুমারী কুষ্ঠাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা। চা-শ্রমিকদের অপমানজনক 'কুলী' শব্দ ব্যবহার করার বিরুদ্ধে মত দিয়েছিলেন।

পত্র : ছয়

- ১ *The Bengali Book of English Verse—Selected and arranged by Theodore Douglas Dunn with a foreword by Rabindranath Tagore* (1918) :
- ২ ১৩৬৬ বঙ্গাব্দে *বিচিত্রায়* অগ্রহাষণ ও পৌষ সংখ্যায় তিনি দুটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, শিরোনাম : 'বঙ্গ-ইংলণ্ডীয় কাব্য-সাহিত্যে দেশাত্মবোধের বাণী'।
- ৩ *Deathless Ditties from Chandidas and other Bengali Poets—By Atul Chandra Ghosh.* M.C. Sarkar & Sons. Calcutta (1921)

অশোককুমার রায়

বেদোক্ত জাতিগোষ্ঠী

বিবেকানন্দ দাশ

ঋগ্বেদ-সংহিতায় মূলত দাস বা দস্যুদের সঙ্গে সংঘাত ও সংগ্রামের কথা উল্লিখিত হয়েছে।

ঋগ্বেদ-সংহিতার ২।১৩।৮, ৯ সংখ্যক ঋকে দস্যুদের নাশের কথা বলা হয়েছে। ৪।১৬।৯ থেকে ১৪ এবং ১৭ থেকে ২০ সংখ্যক ঋকে দস্যুদের সঙ্গে যুদ্ধের উল্লেখ আছে। মাত্র এই কয়েকটি ঋকেই নয়, ঋগ্বেদ-সংহিতার বহুসংখ্যক ঋকেই দাস, দস্যু বা অসুরদের সঙ্গে সংগ্রামের কথা বিবৃত হয়েছে।

আর্যরা দাস বা দস্যুদের ধনসম্পদ ও বাসভূমি অধিকার করে নিচ্ছে, তাদের নগরসমূহ ধ্বংস করছে, তাই এই সংঘাত। ঋগ্বেদ-সংহিতার ১।৬৩।২ সংখ্যক ঋকে বলা হয়েছে—“হে বহুলোকের আশ্রিত ইন্দ্র! তুমি তা দিয়ে অনেক নগর ধ্বংস কর।”^১

এখানে এই যে দাস বা দস্যুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, তাদের সম্বন্ধে বহুমতস্তে তাঁর বিবিধ প্রবন্ধ নামক গ্রন্থে বলেছেন—“দস্যু শব্দের এখন প্রচলিত অর্থ ডাকাত, দাসের প্রচলিত অর্থ—চাকর। কিন্তু এ অর্থে দস্যু বা দাস শব্দ ঋগ্বেদে ব্যবহৃত নহে।”^২ অবশ্য নবীন শ্রোতাদের সুস্তে কোথাও কোথাও দস্যু বা দাস শব্দের অর্থান্তর ঘটেছে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ডাকাত বা পরিচারক অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। দস্যু শব্দের অর্থ মহাসাহসিক।^৩ আর দাস শব্দটি দস্যু শব্দ থেকে উদ্ভূত।

দাস এবং দস্যু যে সমার্থক তার প্রমাণ রয়েছে ১০।১২।৮ সংখ্যক ঋকে। সেখানে বলা হয়েছে :

অকর্মা দস্যুরভি নো অমন্তরণ্য ব্রতো অমানুষঃ।

তং তস্যামিত্রহৃদধর্দাসস্য দণ্ডয়।।^৪

অর্থাৎ আমাদের চতুর্দিকে দস্যু জাতি আছে, তারা যজ্ঞকর্ম করে না, তারা কিছু মানে না, তাদের ক্রিয়া স্বতন্ত্র, তারা মনুষ্যের মধ্যেই নয়। হে শত্রু সংহারকারী! তাদের নিধন কর। সে দাসজাতিকে হিংসা কর।

এই দাস বা দস্যুজাতি অসুর এবং দানব নামেও অভিহিত হয়েছে। সেক্ষেত্রে ‘অসুর’ শব্দটি বীর, এবং ‘দানব’ শব্দটি দানশীল বা দাতা অর্থে ব্যবহৃত। ঋগ্বেদ-সংহিতার ১।২৪।১৪ সংখ্যক ঋকে বরুণকে ‘অসুর’ বলে, এবং ১।১৫।২ সংখ্যক ঋকে মেধাতিথি মরুদগণকে সুদানব অর্থাৎ ‘দানশীল’ বলে সম্বোধন করা হয়েছে। যেমন—“সুদানবঃ শোভন দানযুক্তা মরুদগণাঃ সহসা বলবতা যুক্তাযোগ্যে নেদ্রেণ সহবত্রং শত্রুং হত, নাশ্যতে” —সায়ন।^৫ এছাড়াও বীর অর্থে অসুর শব্দটির, এবং দানশীল অর্থে সুদানব শব্দটির বহুল ব্যবহার ঋগ্বেদ-সংহিতায় দেখা যায়।

আর্যরা দাস জাতির সঙ্গে সংগ্রামের শেষ পর্যায়ে দাসদের বশ করার উপর বিশেষ জোর দিয়েছিল। ৭।১৯।৮ সংখ্যক ঋকে দাস জাতীয় রাজা তুর্বশ এবং যদু (যাদব)-কে বশীভূত করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। আর তা নিজেদের স্বার্থেই। কারণ, দাসরা নগর তৈরি করতে জানত, বস্ত্রবয়ন জানত, কৃষিকাজ জানত, নৌবাণিজ্য করত। কিন্তু “বৈদিক আর্যভাষীদের বাস্তব সভ্যতা ছিল একান্তভাবে প্রাথমিক স্তরের।”^৬ তারা দাস জাতির মতো উন্নত সভ্যতার অধিকারী ছিল না। তারা ছিল যাযাবর, এবং বর্বর। তাদের সঙ্গে রমণীও খুব কমই ছিল। সুতরাং এক সার্বিক প্রয়োজনেই দাসদের বশীভূত করেছিল।^৭

ঋগ্বেদ-সংহিতার ১।১০০।১৮ সংখ্যক ঋক্ থেকে জানা যায়, বহিরাগত আর্যরা ছিল শ্বেতবর্ণের। ৭।৩৩।১ সংখ্যক ঋকেও শ্বেতবর্ণের ঋষিদের কথা উল্লিখিত হয়েছে। অন্যদিকে, দাসদের আর্যরা ‘কৃষ্ণযোগী দাস’ নামে অভিহিত করেছে। আর তা থেকে অনুমান করা যায়, দাসরা কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট ছিল। তাদের সম্বন্ধে ১০।২২।৮ সংখ্যক ঋকে বলা হয়েছে—আমাদের চতুর্দিকে দস্যু জাতি আছে, তারা যজ্ঞকর্ম করে না, তারা কিছু মানে না, তাদের ক্রিয়া স্বতন্ত্র, তারা মনুষ্যের মধ্যেই নয়। হে শক্র-সংহারকারী! তাদের নিধন কর। সে দাস জাতিকে হিংসা কর।^৮ অবশ্য এখানে যে ‘অমানুষ’ আখ্যায় অভিহিত করা হয়েছে, তা সম্পূর্ণভাবে বিদ্বেষ প্রসূত, এবং বিজেতৃসুলভ মনোবৃত্তির পরিচায়ক। তাছাড়া, অন্যত্রও তাদের ‘ব্রতরহিত দস্য’ বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে আর্যদের বিজেতৃসুলভ মনোবৃত্তির পরিচয়কে বাদ রেখে বলা যায়, দাসরা ছিল স্বতন্ত্র এক গোষ্ঠী। তারা যজ্ঞরহিত, ব্রতরহিত ছিল।

ঋগ্বেদ-সংহিতার ৭।৮৩।৭ সংখ্যক ঋকে দশজন যজ্ঞরহিত রাজার সঙ্গে রাজা সুদাসের যুদ্ধের উল্লেখ আছে। কিন্তু দাসরা ব্রতরহিত বা যজ্ঞরহিত হলেও তাদের ক্রিয়া ছিল স্বতন্ত্র, অর্থাৎ তাদের ধর্মচর্চা ছিল স্বতন্ত্র। তাই ১০।৪৯।৩ সংখ্যক ঋকে বলা হয়েছে—আমি দস্য জাতিকে ‘আর্য’ এ নাম হতে বঞ্চিত রেখেছি।^৯ আর এই দাস জাতিকে ড. অতুল সুর দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর লোক বলে সনাক্ত করেছেন, এবং অসুরদের আর্যভাষাভাষী আলপীয় গোষ্ঠীর।^{১০} কিন্তু ঋগ্বেদ-সংহিতায় দাসদের ‘অসুর’ বলা হয়েছে। তাছাড়া, অসুর শব্দটি ঋগ্বেদ-সংহিতায় মূলত বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, ঋগ্বেদ-সংহিতার ১।২৪।১৪ সংখ্যক ঋকে বরুণকে বীর অর্থে ‘অসুর’ বলে সম্বোধন করা হয়েছে। সুতরাং অসুরকে কোনো স্বতন্ত্র গোষ্ঠী বলে ধরা যায় না। ড. নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন : “দ্রবিড়ভাষাভাষী লোকেরাই ভারতবর্ষের নগর সভ্যতার সৃষ্টিকর্তা।”^{১১} আর তাই যদি হয়, তবে বেদোক্ত নগর সভ্যতার অধিকারী দাস জাতিকে দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর লোক বলে অভিহিত করা যায়।

ঋগ্বেদ-সংহিতার ১০।৮৪।১ সংখ্যক ঋকে দাস জাতি এবং আর্য জাতি—উভয় জাতির সঙ্গেই যুদ্ধ করার কথা বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রশ্ন থাকে, বৈদিক আর্যদের কি দাস জাতি ছাড়া অন্য কোন আর্য-গোষ্ঠীর সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হতে হয়েছিল?

এক্ষেত্রে বলা যায়, ঋক্টি অপেক্ষাকৃত অর্বাচীনকালের, যখন আর্যরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল হিসাবে বিভিন্ন অংশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য গঠন করেছে এবং একে অন্যকে আক্রমণ করেছে। ড. কিরণচন্দ্র চৌধুরী বলেছেন—“ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহাদি লাগিয়াই থাকিত। ফলে দুর্বল রাজ্যগুলি অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী রাজ্যগুলি কর্তৃক অধিকৃত হইতে থাকে।”^{১২} তাই দাসজাতির সাথে নিজেদের গোষ্ঠীভুক্ত আর্যরাও শত্রুরূপে চিহ্নিত হয়েছে। যেমন, ঋগ্বেদ

সংহিতার ৪।৩১।১৮ সংখ্যক ঋকে আর্য অর্প ও চিত্ররথকে বধ করার কথা বলা হয়েছে।

ঋগ্বেদ-সংহিতার কয়েকটি ঋকেই শক্তিকদের উল্লেখ থাকলেও মাত্র ২।৩০।৮ সংখ্যক ঋকেই শক্তিকদের সঙ্গে সংগ্রামের কথা আছে। সেখানে বলা হয়েছে, ইন্দ্র স্পর্ধাবান শক্তিকদের প্রধানকে হত্যা করেছিলেন।^{১৩}

আর্যদের ভারতে প্রবেশের পূর্বে শক্তিকরাই ছিল সুরা প্রস্তুতকারক। তবে এদের সুরা প্রস্তুতের পদ্ধতি আর্যদের সুরা প্রস্তুতের পদ্ধতি থেকে ভিন্ন ছিল। ঋগ্বেদ-সংহিতার ৯।৬৭ সূক্তের টীকায় আর্যদের সোমরস প্রস্তুত করার পদ্ধতি সম্বন্ধে বলা হয়েছে—“সোমরস প্রস্তুত করবার সমস্ত পদ্ধতিই এ সূক্ত হতে উপলব্ধি হয়, প্রথমে সোম লতারূপে থাকে, তার দুটি করে পত্র বক্রভাবে অবস্থিত থাকে, (২ ঋক)। প্রস্তর দ্বারা সে লতা নিস্পীড়িত হল (৭ ঋক)। পরে রমণীগণ অঙ্গুলি দ্বারা তা চটকিয়ে রস বার করে (৮ ঋক)। পরে সে রস জলের সঙ্গে মিশ্রিত করে মোষলোম নির্মিত ছাকনি দ্বারা ছাঁকা হয় (৯ ঋক)। সে ছাঁকনি কলসের মুখে স্থাপিত হয়, অঙ্গুলি দ্বারা উপরের রস সঞ্চালিত করা হয় সুতরাং ছাঁকা শোধিত রস কলসের ভিতরে পড়ে, (১০, ১১, ১২ ঋক)। সে শোধিত ছাঁকা রস ক্ষীর বা দধির সঙ্গে মিশিয়ে পান করা হয় (১৩ ঋক)।”^{১৪}

অন্যদিকে, শুণ্ড থেকে শক্তিক। শক্তিকরা শুণ্ডের (চোলাই-এর বক্যব্দের)^{১৫} সাহায্যে সুরা প্রস্তুত করত। মনে হয়, ব্যবসাগত ক্ষতির জন্য আর্যদের সঙ্গে তাদের সংঘাতের সৃষ্টি হয়েছিল। ঋগ্বেদ-সংহিতায় পণিদের কথা যতবারই উল্লিখিত হয়েছে, ততবারই ‘গাভী অপহরণকারী’ রূপেই উল্লেখিত হয়েছে। আর গাভী অপহরণের সুত্রেই আর্যদের সঙ্গে তাদের বিরোধ।

ঋগ্বেদ-সংহিতার ১।৬২।২ সংখ্যক ঋকে পণির সঙ্গে ‘অসুর’ শব্দটি যুক্ত হয়েছে, তা জাতি রূপে নয়, বিশেষরূপে, বলবান অর্থেই। অন্যত্র যে ‘দসু’ শব্দটি যুক্ত হয়েছে, তা অপহরণকারীরূপে। ঋগ্বেদ-সংহিতায় চৌর্যবৃত্তি ছাড়া তাদের অন্য কোনো কর্ম-ঐতিহ্য উল্লিখিত হয় নি।

ঋগ্বেদ-সংহিতায় আর্যদের সঙ্গে রাক্ষসদের সংঘর্ষ বা সংগ্রামের কথা উল্লিখিত হয়েছে। তারা নগর সভ্যতার অংশভাগী ছিল বলেই তারাও দাসেদের মতো সংগ্রাম করে গেছে। ঋগ্বেদ-সংহিতার ৭।১০৪।২২ সংখ্যক ঋকে বলা হয়েছে।

উলুকযাতুং শুশলুকযাতুং জহি স্বযাতুমতু কোক্যাতুম।

অভীদু শক্ঃ পরশুর্যথা বলং পাত্রেব ভিন্দাস্তসত প্রতি রক্ষসঃ॥

(হে ইন্দ্র! যারা উলুকরূপে হিংসা করে, তাদের বিনাশ কর, যারা ক্ষুদ্র উলুকরূপে হিংসা করে, তাদের বিনাশ কর, যারা কুকুররূপে, যারা চক্রবাক রূপে, যারা শ্যেনপক্ষীরূপে, যারা গৃধ্ররূপে বিনাশ করে, পাষাণের ন্যায় বজ্রের দ্বারা সে রাক্ষসকে মেরে ফেল।) এখানে রাক্ষসদের এই যে বহুবির আত্মপ্রকাশের কথা আছে, তা থেকে স্বভাবতই মনে হতে পারে, রাক্ষসেরা মানুষ নয়, বিশেষ অলৌকিক জীব। এক্ষেত্রে বলা যায়, ঋকটি অপেক্ষাকৃত অর্বাচীনকালের, এবং নিছক কল্পনাশ্রয়ী। আর এমন কল্পনাশ্রয়ী চিন্তাই পৌরাণিক চিন্তার বীজস্বরূপ। তারা কল্পনাশ্রয়ী হতে হতে যে বিকৃত অর্থবোধক কাল্পনিক জীব হয়ে উঠেছে, তার প্রমাণ রয়েছে ঋগ্বেদ-সংহিতার ১০।৯৯।৬ সংখ্যক ঋকে, সেখানে রাক্ষসদের বলা হয়েছে ‘মস্তকত্রয় বিশিষ্ট ষট্চক্ষু

শক্র', বা ১০।৮৭/১০ সংখ্যক ঋকে যেখানে তিন মন্তক তো আছেই, তার সাথে আবার তিনটি চরণ যুক্ত হয়েছে। রাক্ষসেরা যে কৃষ্ণত্বক বিশিষ্ট ছিল, তা ৯।৪১।১ সংখ্যক ঋকে বলা হয়েছে। যেখানে ঋগ্বেদ-সংহিতায় বলা হচ্ছে—“আপন শ্বেতবর্ণ মিত্রদের সাথে ক্ষেত্র ভাগ করে নিলেন”^{১৬}, সেখানে অনুমান করা যায়; আর্যরা ছিল বর্ণাভিমানী। আর ভারতের প্রাক-দ্রাবিড় গোষ্ঠীসমূহ ছিল ঘোর কৃষ্ণবর্ণের। সুতরাং প্রাক-দ্রাবিড় তথা অস্ট্রিকগোষ্ঠীভূক্ত রাক্ষসেরা যে শ্বেতবর্ণাভিমানী আর্যদের চোখে ‘অত্যন্ত কুৎসিত’ রূপে ধরা পড়বে, সেটাই স্বাভাবিক। ঋগ্বেদ-সংহিতার ১।১২৯।১০ সংখ্যক ঋকে রাক্ষসদের ‘অত্যন্ত কুৎসিত শক্র’ এবং ৯।৪১।১ সংখ্যক ঋকে ‘কৃষ্ণত্বক-বিশিষ্ট’ বলা হয়েছে।

ঋগ্বেদ-সংহিতার ১০।৬১।৯ ঋক্ থেকে জানা যায়, রাক্ষসেরা বিকল্প থাকত। ১০।৮৭।৭ এবং ১৯ সংখ্যক ঋকে রাক্ষসদের ‘আমমাংসভোজী’ বলা হয়েছে। এর অর্থ অগ্নিপাক বর্জিত (অসিদ্ধ, অপক)।^{১৭} আর পৌরাণিক চিন্তায় তারাই ‘নরমাংস ভোজী’ বা ‘ঋষিদের ভক্ষক’ হয়ে যায়।

ঋগ্বেদ-সংহিতার ৪।৪।১৫ সংখ্যক ঋকে রাক্ষসদের ‘স্বতিবিহীন’ বলা হয়েছে। ১।৩৬।২০ সংখ্যক ঋকে ‘বিশ্বভক্ষক’ বলা হয়েছে। আর এই ‘বিশ্বভক্ষক’ কথাটির অর্থ ‘খাদ্যাখাদ্য বিচার শূন্য’ করা যেতে পারে। আর এসব স্বভাব লক্ষণ কাল্পনিক জীবের নয়, প্রাক-দ্রাবিড় অর্থাৎ অস্ট্রিক গোষ্ঠীরই স্বভাব লক্ষণ। তাছাড়া, ৭।১০৪।২০ সংখ্যক ঋকে বলা হয়েছে “এরা কুকুরের দ্বারা হিংসা করে আসে”,—এ কথার অর্থ ‘কুকুর লেলিয়ে দিয়ে আসে’ বা শিকার করে ধরা যায়। আর এমন চিত্র অস্ট্রিক গোষ্ঠীসমূহের মধ্যে লক্ষ করা যায়।

অস্ট্রিক গোষ্ঠীসমূহের আর একটি স্পষ্ট চিত্র ধরা পড়ে, যেখানে ১০।৮৭।১৩ সংখ্যক ঋকে বলা হয়—“হে অগ্নি! দেখ, স্ত্রী-পুরুষে পরস্পর গালি দিচ্ছে, দেখ চীৎকার করতে করতে কাটু কথা বলছে, অতএব মনে ক্রোধোদয় হলে যে বান ক্ষেপণ করা হয় তা দিয়ে রাক্ষসদের হৃদয় বিদ্ধ কর কারণ ঐ সকল কাটু কথা রাক্ষসদের প্রবর্তনাতে ঘটে।”^{১৮}

ঋগ্বেদ-সংহিতার ১০।৮৭।২ সংখ্যক ঋকে রাক্ষসদের ‘মৃঢ়দেবতা’ অর্থাৎ টীকায় ‘অপদেবতা’^{১৯} বলা হয়েছে। যদি দেবপূজক আর্যরা নিজেদের ‘দেব’ নামে অভিহিত করতে পারে, তবে আর্যরা অপদেবতাসমূহের পূজক রাক্ষসদের ‘মৃঢ়দেবতা’ অর্থাৎ ‘অপদেবতা’ নামে অভিহিত করতেই পারে। আর ভারতের অস্ট্রিক গোষ্ঠীরা যে অপদেবতাসমূহের পূজক, সে সম্বন্ধে সকলেই অবগত। সুতরাং রাক্ষসেরা যে অস্ট্রিক গোষ্ঠীভূক্ত, তা স্বীকার করার ক্ষেত্রে বিতর্কের অবকাশ থাকে না।

ঋগ্বেদ-সংহিতায় দাস-জাতির বশ্যতা স্বীকারের কথা থাকলেও রাক্ষসদের বশ্যতা স্বীকারের কথা নেই। ঋগ্বেদ-সংহিতার ৭।১০৪।২২ সংখ্যক ঋকে যেখানে রাক্ষসদের বহুরূপে আহ্বানপ্রকাশের কথা আছে, সেখানে তার একটি অন্তর্নিহিত তাৎপর্য থাকতে পারে। সেই তাৎপর্য থেকে বলা যায়, রাক্ষসেরা আর্যদের এমন অতর্কিতে আক্রমণ করত যে তারা বুঝে উঠতে পারতনা। সুতরাং যাদের আক্রমণ থেকে নিজেদের বা যজ্ঞীয় হবি রক্ষা করতে হয় (রক্ষ + অস)—এই অর্থে আর্যরা তাদের নাম দিয়েছিল রাক্ষস। আর তার প্রমাণ রয়েছে ৩।৩০।১৭ সংখ্যক ঋকে, যেখানে রাক্ষসদের বলা হয়েছে ‘গমনশীল ও যজ্ঞবিদ্বেষী’, বা অন্য ঋকে বলা হয়েছে ‘আমাদের ভক্ষক’। আর এ কথার অর্থ ঋষিদের হত্যাকারী।

ঋগ্বেদ-সংহিতায় নিষাদ শব্দের উল্লেখ নেই। নিষাদ শব্দের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে যজুর্বেদ-সংহিতায়। সেখানে ১৬শ অধ্যায়ের ২৭-তম মন্ত্রে নিষাদের সাথে ‘শ্বনিভ্যো মৃগয়ভ্যশ্চ’ কথাটির উল্লেখ আছে, যার অর্থ করা হয়েছে ‘কুকুরের গলায় রজ্জু ধারক ও ব্যাধ’^{২০}। ষোড়শ অধ্যায়ের ২৮-তম মন্ত্রে কুকুর পালক অর্থে ‘শ্বপতি’, এবং ৩০শ অধ্যায়ের ৭-তম মন্ত্রে কুকুরের কর্তা অর্থে ‘শ্বনিম্’, ব্যাধ অর্থে ‘মৃগয়ুম্’ শব্দেরও উল্লেখ আছে।

ঋগ্বেদ-সংহিতার উপমা প্রয়োগের ক্ষেত্রে ১।৯২।১০ সংখ্যক ঋকে এবং ৪।২০।৩ সংখ্যক ঋকে ‘শ্বগ্নীব’ শব্দের ব্যবহার আছে। আর এই শব্দটিকে অনুবাদক ব্যাধ অর্থে অনুবাদ করেছেন।^{২১} হয়তো ‘শ্বগ্নীব’ শব্দ থেকে স্বগ্নিক (স্বগ্ন + ইক, ইন্ অস্ত্যর্থ), স্বগ্নী বা স্বগমিন্ শব্দ আসতে পারে, যার অর্থ “শিকারী, যে ব্যক্তি কুকুর লইয়া শিকার করে”^{২২}। যখন ব্যাধ অর্থবোধক স্বপক্ (স্বপচ্), স্বপাক শব্দের সাথে কুকুর (শ্বন্ = কুকুর) জড়িত আছে, তখন শ্বগ্নীব, শ্বপতি, ‘শ্বনিম্’ বা যে ব্যাধ গোষ্ঠীভুক্ত তা মনে নেওয়া যায়। রাক্ষসেরাও কুকুর লেলিয়ে দেয়।

অন্যদিকে, নিষাদ শব্দের অর্থ ব্যাধ। বাস্মীকির প্রথম শ্লোকেও পক্ষীশিকারী অর্থাৎ ব্যাধরূপে নিষাদকে পাওয়া যাচ্ছে। নি + ✓ সদ্ + অ (তৃ) করে আসছে নিষাদ। নি + সদ্-এর অর্থ, নিবিস্তরূপে থাকা। এ থেকে আমরা অনুমান করতে পারি, শিকারার্থে নিবিস্তরূপে থাকা অর্থে নিষাদ শব্দটি এসেছে। বাস্মীকির প্রথম শ্লোকে নিষাদের পক্ষীহননের কথা আছে। আর ঋগ্বেদ-সংহিতার ৬।৪৮।১৭ সংখ্যক ঋকে উপমাসূত্রে ব্যাধগণ কর্তৃক পক্ষিগণের বধনার্থে জাল বিস্তারের কথা এসেছে। আর যখন ঋগ্বেদ-সংহিতায় ব্যাধরূপে ‘শ্বগ্নীব’দের পাওয়া যাচ্ছে, তখন হয়তো এদেরই এক একটা গোষ্ঠী যজুর্বেদ-সংহিতার যুগে ‘মৃগয়ুম্’, ‘শ্বপতি’ বা ‘শ্বনিম্’ এবং নিষাদ নামে পরিচিত হয়েছে।

ড. নীহাররঞ্জন রায় অস্ট্রিক ভাষীদের সম্বন্ধে বলেছেন—“ইহাদের সবারই জীবিকা ছিল কৃষিকার্য, একথা বলা যায় না। কতকগুলি শাখা অরণ্যচারীও ছিল।”^{২৩} আর তার উদাহরণ ব্যাধ অর্থবোধক শ্বগ্নীবরা।

ঋগ্বেদ-সংহিতায় যেখানে রাক্ষসদের পুরী ধ্বংসের এবং সংগ্রামের কথা আছে^{২৪}, এবং যেখানে দাস জাতির বশ্যতা স্বীকারের কথা থাকলেও রাক্ষসদের বশ্যতা স্বীকারের কথা নেই, এবং যেখানে তাদের অতর্কিত আক্রমণের ইঙ্গিত আছে, সেখানে অনুমান করা যায়, রাক্ষসেরা পরাজিত হয়ে অরণ্যে আশ্রয় নিয়েছিল, এবং ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, এবং আর্যদের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হয়েছিল। ঋগ্বেদ-সংহিতায় পিশাচ নামে আর একটি জাতির উল্লেখ আছে। ১।১৩৩।৫ সংখ্যক ঋকে তাদের ‘ঈষৎ রক্তবর্ণ’ বলা হয়েছে। পৌরাণিক চিন্তায় পিশাচ ‘মাংসাশী প্রেতযোনি বা ভূতবিশেষ’ হয়ে গেলেও অনুমিত হয়, এরা ছিল স্বতন্ত্র এক প্রাক-দ্রাবিড় গোষ্ঠী।

আমরা জানি, ‘পিশাচ’ শব্দের মূলে আছে ‘মাংসাশী’ এবং পিশিত শব্দের অর্থ ‘কাঁচা মাংস’। এ থেকে আমরা অনুমান করতে পারি, আর্যরা এমন এক গোষ্ঠীকে দেখেছিল, যারা ছিল কাঁচা মাংস ভক্ষণকারী, এবং সেই সূত্রে তাদের নাম দিয়েছিল—পিশাচ। এরা প্রেত বা ভূতবিশেষ ছিল না। তাই পরবর্তীকালে সাহিত্যদর্পণে এরা এক পার্বত্য উপজাতিরূপে চিহ্নিত, এবং বায়ুপুরাণে (বায়ু ৬৯) এদের বলা হয়েছে লম্বকেশ এবং শ্বশ্রল।^{২৫}

ত থ্য প জ্ঞি

- ১ ঋগ্বেদ-সংহিতা (১ম খণ্ড), হরফ প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ ১৯৭৬, পৃ. ৮৩
- ২ বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য গ্রন্থাবলী (২য় ভাগ), বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির, পৃ. ১৯৭
- ৩ ছাত্রবোধ অভিধান, সঙ্ক: আশুতোষ দেব, ১৩৬৪, পৃ. ৬৪৩
- ৪ ঋগ্বেদ-সংহিতা (২য় খণ্ড), হরফ প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ ১৯৭৬, পৃ. ৪৬৭
- ৫ ঋগ্বেদ-সংহিতা (২য় খণ্ড), সম্পাঃ মর্ত্তিলাল দাশ, শিশু সাহিত্য কুটীর, ধুলনা, ১ম সং ১৩৪৯, পৃ. ৬২
- ৬ বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, পঃ বঃ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, ১ম সং ১৩৫৫, পৃ. ৭৩
- ৭ যুদ্ধের শেষ সেনাপতি, ভ্রমর, শারদীয়া প্রসাদ ১৯৮২, পৃ. ৭১১-১৩
- ৮ ঋগ্বেদ-সংহিতা (২য় খণ্ড), হরফ প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ ১৯৭৬, পৃ. ৪৬৮
- ৯ তদেব, পৃ. ৫০৭
- ১০ বাউলা ও বাউলী, ডঃ অতুল সুর, সাহিত্যলোক, ১ম মুদ্রণ ১৩৮৭, পৃ. ১১-১২
- ১১ বাউলীর ইতিহাস (আদিপর্ব), ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, পঃ বঃ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, ৩য় সং ১৯৮০, পৃ. ৭০
- ১২ স্বদেশ কথা, ডঃ কিরণচন্দ্র চৌধুরী, দি সেন্ট্রাল বুক এজেন্সী, ১৯৭৫, পৃ. ২৩
- ১৩ ঋগ্বেদ-সংহিতা (১ম খণ্ড), হরফ প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ ১৯৭৬, পৃ. ২৯৩
- ১৪ ঋগ্বেদ-সংহিতা (২য় খণ্ড), হরফ প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ ১৯৭৬, পৃ. ৩৭৫
- ১৫ চর্যাগীতি পদাবলী, ড. সুকুমার সেন, ইস্টার্ন পাবলিশার্স ১৯৬৬, পৃ. ৩২
- ১৬ ঋগ্বেদ-সংহিতা (১ম খণ্ড), হরফ প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ ১৯৭৬, পৃ. ১২৬
- ১৭ ছাত্রবোধ অভিধান, সঙ্ক: আশুতোষ দেব, ১৩৬৪, পৃ. ২৩১
- ১৮ ঋগ্বেদ-সংহিতা (২য় খণ্ড), হরফ প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ ১৯৭৬, পৃ. ৫৬৪
- ১৯ তদেব, পৃ. ৫৬৩
- ২০ যজুর্বেদ-সংহিতা, অনু: ও সম্পা: শ্রী বিজ্ঞনবিহারী গোস্বামী, হরফ ১৯৭৭, পৃ. ১২১
- ২১ ঋগ্বেদ-সংহিতা (১ম খণ্ড), হরফ প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ ১৯৭৬, পৃ. ১১৫, ৪১৩
- ২২ ছাত্রবোধ অভিধান, সঙ্ক: আশুতোষ দেব, ১৩৬৪, পৃ. ১১৩৭
- ২৩ ঋগ্বেদ-সংহিতা (২য় খণ্ড), হরফ প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ ১৯৭৬, পৃ. ৪০৭
- ২৪ তিন হাজার বছরের লোকায়ত জীবন, শ্রীসুবোশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এ. মুখার্জী, ১ম সং ১৩৮৩, পৃ. ৩২, ৪৭

সাঁওতালদের ঠাকুর-দেবতা ও ধর্মাচার

অনিমেষকান্তি পাল

এক. ঠাকুর দেবতা ও পূজা পার্বণ

দেবতা

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. মিহির চৌধুরী কামিল্যা— ‘সাঁওতালী লোক সংস্কৃতি : লৌকিক দেবদেবী’ প্রবন্ধে সাঁওতালদের ঠাকুর দেবতা ও ধর্মাচার সম্বন্ধে সংক্ষেপে খুব স্পষ্ট করে আমাদের জানিয়েছেন যে, “সাঁওতালদের উপাসিত দেব দেবীরা হলেন— ১। জাহের বুড়ী (ঠাকর্যান), ২। জাহের হাড়াম (ঠাকুর বা গরাম), ৩। মারাং বুরু, ৪। মড়েক— পাঁচজন পুরুষ দেবতা, প্রত্যেকের পৃথক নাম নেই, ৫। তুরুইক— ছয় জন স্ত্রীদেবী, এদেরও পৃথক নাম জানা যায় না, ৬। সীমা সাড়ে (গোটি সীমা বা বাঘুৎ)।” এরপর পূজার কথায় এসে লেখক বলেছেন— “পূজার সময় জাহের থানটি চেঁছে ছুলে পরিষ্কার করে.... উক্ত দেব দেবীদের ছটি পূজাবেদী বা ‘খঁড়’ তৈরি হয় আলোচালের গুঁড়ি দিয়ে গোল বা বৃত্তাকারে। সর্ব উত্তরে জাহের বুড়ির খঁড়; তার দক্ষিণে জাহের হাড়াম ও তার দক্ষিণে মারাং বুরুর খঁড়। মারাং বুরুর দক্ষিণে একটি খঁড়ে লাগেয়া পাঁচটি ছোটো ছোটো বেদিতে থাকেন পাঁচ পুরুষ দেবতা, তারপর ছয় স্ত্রীদেবী এই খঁড়ে। আরো দুটি বৃত্তাকার স্থান তৈরি হয় কিন্তু সে দুটিতে কে কে থাকেন, কোনোরকমেই তা জানা যায়নি।”^১

পরব

লেখক আমাদের আরো জানিয়েছেন যে:

১। ‘মাঘসিম’— ‘সাঁওতালদের বছর গণনা হয় পয়লা মাঘ থেকে। তাই বছরের প্রারম্ভিক দেবার্চনার নাম ‘মাঘসিম’।

২। ‘বাহা বা ‘শালুই’ দোল পূর্ণিমার আগের কৃষ্ণ প্রতিপদ থেকে পূর্ণিমার রাত্রি পর্যন্ত যে কোনো একদিন বাহা বা শালুই পূজা।

৩। মা-মঁড়ে— শালুই পূজারই....বৃহত্তম সংস্করণ। বুদ্ধ পূর্ণিমা বা বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে নির্দিষ্ট এক থেকে চার দিন।

৪। ‘এরঃ সিম’ — প্রথম বর্ষার জ্যৈষ্ঠ মাসে জমিতে প্রথম হাল দেওয়া ও বীজ বোনার প্রারম্ভে এই পূজা।

৫। ‘আষাঢ়িয়া সিম’ — আষাঢ় মাসে প্রথম কাদায় রোয়ার আগের পূজা।

৬। ‘জাম তাড়’ বা ‘জাঁতাল’ — অত্ৰানে প্রথম শোল ধান কটার আগের পূজা। (ধনধান্য পত্রিকা, পৃ ৩১-৩৩, ফেব্রুয়ারি ১৯৯২, সাঁওতালী লোকসংস্কৃতি : লৌকিক দেবদেবী, ড. মিহির চৌধুরী কামিল্যা। এই প্রবন্ধটি আমাকে সংগ্রহ করে দেন আমার বন্ধু দিব্যাংশু মিশ্র; এইখানে তাঁর কাছে ঋণ স্বীকার করলুম এবং তাঁকে ধন্যবাদ জানালুম।)

নায়কে মঙ্গল চন্দ্র সরেনের বিবরণ

ছয় রকমের ঠাকুর দেবতা আর ছয়টি প্রধান পূজার্তনার এই সংক্ষিপ্ত বিবরণী থেকে সাঁওতালদের ঠাকুর দেবতা এবং তাদের পূজার্তনার সম্বন্ধে আমরা এখানে একটা মোটামুটি স্পষ্ট ধারণা পেয়ে যাচ্ছি। যেহেতু ড. মিহির চৌধুরী কামিল্যা নিজে সাঁওতাল নন তাই তাঁর সংক্ষিপ্ত কিন্তু সুস্পষ্ট বক্তব্যটি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। তাই আমরা দুজন খাঁটি সাঁওতাল সমাজ বিজ্ঞানীর সাক্ষ্য নিতে পারি। নায়কে মঙ্গলচন্দ্র তুডকু লুমাম সরেনের সাঁওতাল জাতির ধর্ম ও সংস্কৃতি বইটি বাংলায় লেখা। মঙ্গলচন্দ্র, বিধানচন্দ্র রায়ের অর্মিলে ঝাড়গ্রামের বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ছিলেন। তিনি নায়কে অর্থাৎ সাঁওতালদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্যের কাজও করতেন। কাজেই তাঁর বইটির গুরুত্ব কোনো অংশেই কম নয়। এই নাতিবৃহৎ বইটি তথ্যে ঠাসা। কিন্তু প্রাচীন পুরাণ ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর অনেক ধারণাই এখন বিতর্কের বিষয়। তাঁর বইয়ে অবশ্য সাঁওতাল দেবলোকের সুশৃঙ্খল তালিকা করা নেই। সে যাই হোক, তিনি বলেছেন: “আমাদের ঠাকুর-ঠাকরণ। যাহাদিগকে চাঁদো বঁগা বলি, তাঁহারা স্বর্গে বাস করিতেন। স্বর্গে তাহাদের সহিত দেবগণও থাকিতেন। দেবগণের মধ্যে লিটা আমাদের পরিচিত। তিনি আমাদের গুরু। লিটার পরিবারে তাহার দিদি জাহের বুড়ি ও ছোটোভাই ধরম লইয়া তাঁহারা তিনজন। লিটা ঠাকুরের কোটালের কাজ করিতেন। জাহের বুড়ি বিন্নর কাজ করিতেন ও ধরম ঠাকুরের খাবার দিতেন। ইহা ছাড়া অন্যান্য দেবতাগণের সহিত আমাদের পরিচয় নাই।” (পৃ. ৯০)।^২

বাস্তবিক এই বিবরণটি একটি পুরাণ কথা বা myth। এর সঙ্গে পূজার্তনার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নেই।

ধীরেন বাসকের বিবরণী

এরপর বলতে হয় যে ধীরেন্দ্রনাথ বাসকে লিখিত হড় সমাজের বঙ্গা বুরুকো (১ম সংস্করণ— নভেম্বর ২০০৩ লেখক কর্তৃক প্রকাশিত) আলোচ্য প্রসঙ্গে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ আকর গ্রন্থ। এতে আলোচিত হয়েছে— ১। সিঞ বঙ্গা, ২। জয়সিম্ বঙ্গা, ৩। জাহের বঙ্গাকো, ৪। মারাণ্ড বুরু, ৫। জাহের এরা, ৬। মঁড়েকো তুরুইকো, ৭। গঁসায় এরা, ৮। পারগানা বঙ্গা, ৯। মাজ্জি বঙ্গা, ১০। অড়াঃ বঙ্গা, ১১। আবগে বঙ্গা, ১২। কিসাঁড় বঙ্গা, ১৩। নঁহিহার বঙ্গা, ১৪। সিমা বঙ্গা, ১৫। রঙ্গোরজি বঙ্গা, ১৬। বাঘুত বঙ্গা, ১৭। সুং বঙ্গা, ১৮। বুরু বঙ্গা, ১৯। কারাম বঙ্গা। সংখ্যায় উনিশটি দেখা গেলেও বঙ্গার সংখ্যা উনিশের থেকে অনেক বেশি। কারণ ৩ সংখ্যক— জাহের বঙ্গাকো — শব্দযুগল বহুবচন বোধক। তাছাড়া, মঁড়েকো-তুরুইকোও স্পষ্টত সংখ্যাবাচক (মঁড়ে মানে পাঁচ মানে পাঁচ পুরুষ দেবতা আর তুরুই মানে ছয়, মানে- ছয় স্ত্রীদেবতা)। কাজেই সংখ্যার হিসেবে দেব সংখ্যের চিত্রটি অস্পষ্টই থেকে যাবে মনে হয়।^৩

হড়কোরেন মারে হাপড়ামকোরোয়াকাথা

হড়কোরেন মারে হাপড়ামকোরোয়াকাথা সাঁওতালি ভাষায় লেখা। পাদ্রী ফ্লেফ্‌স্কডের সম্পাদনায় এই বই প্রথমে রোমান হরফে ছাপা হয়েছিল ১৮৮৭ সালে। প্রথমেই লেখা আছে কলেয়ান হাড়ামে লঁহি আকাৎলেকা— মানে কলেয়ান হাড়াম বলেছেন। এই বইয়ের ২০৩ পৃষ্ঠায় ‘ধরম আর সেওয়া’ অধ্যায়ে প্রথমে পাওয়া যাচ্ছে সিঞ বোংগা আর ঠাকুরের নাম। ঐন্দা চান্দো, সিঞ চান্দো আর সিঞ ইপিলেরও উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে।

‘বংগাকো’ শীর্ষক আলোচনায় একটি ছোটো বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে। এটি প্রথমে সাঁওতালিতেই উদ্ধৃত করা যাক। পরে সংক্ষেপে বুঝিয়ে বলা যাবে। (পৃ. ২০৫)। “বংগাকো মতোরে দ সিঞ বংগাগে মারাং বোংগা তালে। উনি তায়োম জুম্ সিঞ বংগা, উনি তায়োম মারাং বুরু (আসল এতুম দ রাম সালগি), উনি তায়োম মঁড়েকো (তুরুইকো অড়হেঁ দলে অড়হেঁকোয়া, বোংগা দ আর বালে বোংগা ওয়াকোন্না), ওনকো তায়োম্ গসাঁয় এরা; উনি তায়োম পারগানা হাডাম, উনি তায়োম মাঞ্জি হাডাম বোংগা, উনি তায়োম অড়াঃ বোংগা আর উনি তায়োম আবগে বোংগা। ওনকো ছাড়া ওঝাকোরেন জুদা বোংগা মেনাঃকোওয়া। কিসাঁড়ঃক সানামকো হড় কিসাঁড় বোংগাকো মানাওকোওয়া। সিমাবোংগা (সুংবোংগা, ডাডি বোংগা, হুরংখুনটুং বোংগা) বির বোংগা, বুরুবোংগা, এমানতেন কো মেনাঃক কোওয়া।” (পৃ. ২০৬)।^৪

এখানে সার কথা হচ্ছে দেবতাদের মধ্যে সিঞ বংগাই ‘মারাং’ মনে প্রধান। তারপর জুমসিঞ বংগা, তারপর মারাং বুরু (যার আসল নাম রাম সালগি), তারপর মঁড়েকো-তুরুইকো, তারপর গসাঁয় এরা, তারপর পারগানা হাডাম, মাঞ্জি হাডাম, অড়াঃবংগা, আবগে বংগা। এর পরে আলাদা করেই বলা হয়েছে যে ওঝাদেরও নানা বংগা আছে। তাছাড়া কিসাঁড় বোংগা, সিমাবোংগা এবং আরও অন্য সব বোংগাকে মানা হয়ে থাকে। এর মধ্যে আছে বির বোংগা মানে বনের বোংগা আর বুরু বোংগা মানে পাহাড়ের বোংগা ইত্যাদিও।

বোংগা বলে অবশ্য দেবতা এবং অপ বা উপদেবতাকেও বোঝানো হচ্ছে। তবে এখানে তো একটা পার্থক্য করাই উচিত। ডীন বোংগার কথাও তো সাঁওতাল সমাজের সাধারণ মানুষের মুখে শোনা যায়। দেবতার মানুষের মঙ্গল করেন বলেই তো তাঁরা দেবতা। অন্যদিকে অনেক শক্তির কথা সাঁওতাল সমাজে শোনা যায় যারা কেবল মানুষের ক্ষতিই করে। তাদের তো অপদেবতাই বলতে হবে। লোকে তাদের ভক্তি করে না, ভয় করে। তাদের সম্ভষ্ঠ রাখে বা সম্ভষ্ঠা রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের নিয়ে আনন্দ করে না। দেবতাকে নিয়ে মানুষ আনন্দ করে, তাঁর প্রসাদ এবং আশীর্বাদ মাথায় করে গ্রহণ করে। সাঁওতাল সমাজেও যে এই দুই শ্রেণির বোংগার মধ্যে পার্থক্য করা হয় সেটা বোঝা যায় পার্বণের দিনে পূজা বেদি নির্মাণের ব্যাপার থেকে। সেখানে কিন্তু অপ্রধান বোংগাদের জন্য জায়গা রাখা হয় না।

রামদাস টুড়ুর বিবরণ

এরপর বলতে হবে রামদাস টুড়ু রুসিকার কথা। তিনি সাঁওতাল ভাষায় একটি বই লিখেছিলেন যার নাম ‘খেরওয়াল বংশা ধরম পুঁথি’। রামদাস এবং তাঁর বইটি সম্বন্ধে অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন— “এ সম্পর্কে সবচেয়ে লক্ষণীয় হইতেছে সিংহভূম (চাইবাসা) জেলার ঘাটশিলার অন্তর্গত কাড়ুয়াকাটা গ্রামের অধিবাসী রামদাস মাঝি টুড়ু মহাশয়ের সংকলিত বই ‘খেরওয়াল বংশা ধরমপুঁথি’— বহু বৎসর পূর্বে ৬৮ পৃষ্ঠার বড়ো আকারের এই বইখানি, সাঁওতালি ভাষায় বাঙ্গালা অক্ষরে ছাপাইয়া তিনি প্রকাশিত করেন। ইহাতে নিজ হইতে তিনি সাঁওতাল পুরাণের সৃষ্টি ও অন্য বিষয় সংক্রান্ত কতকগুলি পুরাতন ও স্বরচিত গান সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, কাঠে খোদাই ছবি কতকগুলিও দিয়াছেন, তাহা হইতে দেবতা সম্বন্ধে সাঁওতালদের দৃষ্টিভঙ্গী আধুনিক কালে কী দাঁড়াইয়াছে তাহা দেখা যায়। এই বই এখন প্রায় অপ্রাপ্য-কিন্তু ইহা নিজ সংস্কৃতির প্রতি

বর্ণস্ত্রানযুক্ত কোলের শ্রদ্ধার প্রথম নিদর্শন।” (বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ, ১৩৫৩ (১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ)।

দেবদেবী

রামদাসের বইয়ের ৩৬ সংখ্যক অধ্যায়ে দেবদেবীদের সম্বন্ধে এই বিবরণটি পাওয়া যাচ্ছে— “পিলচু বুড়া ও পিলচু বুড়ি যখন তাদের সম্ভানদের জাহের দেবদেবী ও ঘরের দেবদেবীদের নাম বলে বলে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল, সেই সময়ের আখ্যান।— পিলচু বুড়া ও পিলচু বুড়ি বলল, শোনহে খেরওয়াল বংশের লোকেরা, সবাই জেনে রাখ, এখন একে একে তোমাদের সব দেবদেবীদের নাম বলে দিচ্ছি, তোমরা সিন্দুর, শাড়ি, রেশম কাপড়, সোনার ছাতা নাও, বাঁচি লাঠি (১ বাঁচি লাঠি হল দেবদেবীর উদ্দেশ্যে মস্ত্রপূত লাঠি) হেলান দিয়ে রাখ। আর হাত পাতে। তারপর পিলচু বুড়া ও পিলচু বুড়ি ছেলেমেয়েদের প্রশ্ন করল, হাত পেতেছো? : পেতেছি। বাঁচি লাঠিটাকে হেলান দিয়ে রেখেছো? : রেখেছি। : শোন তবে দেবদেবীদের নাম। — দিনের ধর্ম দেবতা হলেন সূর্য পঞ্চম, ষষ্ঠকবা মাংরাংবুরু হলেন বড় পাহাড়ের মতো। জাহের (এরা) মা, মঁড়েকো-তুরুইক হল গোসাই, পাঠ পাউড়ী ঠাকুর/ গাঁ ঘরের দেবতা। গ্রামের শেষ প্রান্তে শাল গাছে জাহের থানের (দেবস্থান) দেবতা।

পিলচু বুড়া ও পিলচু বুড়ি যখন তাদের সম্ভানদের নিজ ঘরের দেবদেবী ও ভায়াদের দেবদেবীদের নাম বলে দিল, এটা সেই সময়ের আখ্যান। — ১। সিংচান্দো সিং বঙ্গা ধরম, ২। মাংরাং বুরু বড় পাহাড় (এর মতো বড়), ... (১) লক্ষ্মী সাহারী লাক্ষা পাঠ (এইগুলি গোয়ালঘর, ঘরের দেবতা ও মাঠের দেবতার নাম) (২) পাঠ পাউড়ি ধন্য পাঠ, (৩) ধন্যয়ারি পাঠ, (৪) ধন্য কেশরী পাঠ, (৫) ধন্য কুওয়ারী পাঠ, (৬) ধন্য সাঁহড়ে পাঠ, (৭) লক্ষ্মী সাহারী পাঠ, (৮) ধন্য পাঠ, (৯) ধন্য পাউড়ী পাঠ, (১০) ধন্য সঁহড়ী পাঠ, (১১) ধন্য ওয়ারী পাঠ, (১২) ধন্য কুলিয়ান পাঠ, (১৩) সিংবঙ্গা বারাং বারাং, (১৪) বসুমতী, (১৫) বসুমতা, (১৬) দেশাওলি দেশাওলিঃ, (১৭) অন্যাসী পাঠ, (১৮) টেঁডাসী পাঠ, (১৯) টেনড্রাসী পাঠ, (২০) চাম্পাবাহা দেবী পাঠ, (২১) লক্ষ্মী সাঁয়ারী পাঠ, (২২) গাড্রাসিনী পাঠ, (২৩) লুক্ষ্মী সাহারী পাঠ, (২৪) ব্রোট পাউড়ি পাঠ, (২৫) ধন্য পাঠ, (২৬) ধন্য সাহারী পাঠ, (২৭) ধন্য সঁহড়ি পাঠ।

এই সব নাম শোনার পর পিলচু বুড়া ও পিলচু বুড়ির ছেলে মেয়েরা বলল, বাবা, আমরা সব দেবতাকেই গ্রহণ করলাম। এখন থেকে এইসব দেবতাদের বাবা আমরা বংশানুক্রমে সেবা করব।” (পৃ: ১১৯-১২২ : খেরওয়াল বংশা ধরমপুথি, বঙ্গানুবাদ সুকুমার সিকদার ও সারদা প্রসাদ কিস্কু, খে, ব); নির্মল বুক এজেন্সি, ৮৯ মহাশ্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭; ২য় সংস্করণ মে ২০০৫) দেবদেবীদের তালিকায় নেই এমন চার দেবতার ছবি আছে ১২০ ও ১২১ পৃষ্ঠায়। এদের নাম (১) জোম সিং বঙ্গা (ছবি দেখতে ব্রহ্মার মতো কিন্তু তিনটি মুখ), (২) আবগে বঙ্গা (ছবি দেখতে গণেশের মতো কিন্তু পায়ের নিচে দাঁড়ি পাল্লা), (৩) অড়াঃ বঙ্গা (ছবিটি দেখতে লক্ষ্মী দেবীর মতো, (৪) গড়া আবগে বঙ্গা (ছবি দেখতে কালিমূর্তির মতো কিন্তু পুরুষ দেবতাই মনে হয়)।^৫

অপদেবতা

মাঝি রামদাস দেবতাদের যেমন একটি তালিকা দিয়েছেন তেমনি অপদেবতাদেরও একটি স্পষ্ট

তালিকা তৈরি করে দিয়েছেন তাঁর বইয়ের ১২৫ পৃষ্ঠায়। তালিকাটি আছে ৪০ সংখ্যক অধ্যায়ের শেষে। অধ্যায়টির নাম শালোরায় পালোরায় (মানুষকে) নামক অপদেবতার আখ্যান।— “তারা দুই বোনকে তখন বলল, শালো ও পালো আমাদের সকলের নাম শুনে রাখ— ভাট্টা : (১) কালচুণ্ডী কুদরা, (২) বিণ্ডুই চুণ্ডী কুদরা, (৩) কালসিনী কুদরা, (৪) নাশন চুণ্ডী কুদরা, (৫) খেলায়সিনী কুদরা, (৬) মশানচুণ্ডী কুদরা, (৭) শ্মশানচুণ্ডী কুদরা, (৮) যোগিনী চুণ্ডী নাশম কুদরা, (৯) শুকাম চুণ্ডী নাশন কুদরা, (১০) বসন্ত কুণ্ডারী মশান চুণ্ডী কুদরা, (১১) শঙ্কর কুণ্ডারী শুকুমচুণ্ডী কুদরা (১২) ধন্যায় পাঠধন কুদরা।” (পৃ. ১২৫)

৪১ সংখ্যক অধ্যায়ের শেষে অপদেবতাদের কাজের বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে : “তারপর শালো ও পালো তাদের জিজ্ঞাসা করল, তোমরা কে কি কাজ কর? উত্তরে অপদেবতারা বলল, আমাদের বাবা ঈশ্বর ভগবান অগ্নি সাক্ষী করে বরদান করেছে, আমরা শক্তিশালী আশুন ও শক্তিশালী দেবতাদের বর পেয়েছি। এই পৃথিবীতে যাদের পরমায়ু শেষ হয়ে গেছে, তাদের আমরা বাবা ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যাই।

কিন্তু যে মানুষের এই পৃথিবীতে থাকার সময় এখনও শেষ হয়নি, তাকে যদি কেউ লোক পাঠিয়ে নিয়ে যেতে চায় তাহলে তার পাপ হবে। বাবা ঈশ্বর তার উপর ক্রুদ্ধ হবে। বাবা ঈশ্বর সেই সব লোকদের আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেয়। তাদের বড় বড় রোগ যন্ত্রণা দিয়ে আমরা তার শক্তির ব্যবস্থা করি। তার সব আত্মীয়দেরও বড় বড় রোগ যন্ত্রণা দিয়ে শাস্তি দেওয়া হয়। আর যে সব মানুষ বাবা ঈশ্বরের নির্দিষ্ট দশটা নিয়ম পালন করে না তাদেরকেও বড় বড় রোগভোগ দিয়ে শাস্তি দেয়া হয়। আর যে সব লোক বাবা ঈশ্বরের দশটা নিয়মের কিছু কিছু পালন করে অল্পদিন পরে ছেড়ে দেয় তাকে বাবা ঈশ্বর অল্পস্বল্প রোগ বিঘ্ন দেয়। আর সে সব লোকেরা বাবা ঈশ্বরের দশটা নিয়মের কিছু পালন করে না, তাদেরই সব চেয়ে বেশি শাস্তি দেওয়া হয়। বাবা ঈশ্বর আমাদের পৃথিবীতে এই কাজের জন্য পাঠিয়েছে। আমরা হলাম যমদূত।” (পৃ. ১২৮; প্রাপ্ত)।

অপদেবতারা ঠিক কী কাজ করে— এখানে তার একটি চিত্তাকর্ষক ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে। ব্যাখ্যাটি অভিনব বটে, কিন্তু বর্তমান যুগোপযোগী বলা যায় না। তবে ঈশ্বরের দশটা নিয়ম কী কী সেটা অবশ্যই জানা চাই। মাঝি রামদাস তাঁর বইয়ের ১৮৮ সংখ্যক অধ্যায়ে খুব স্পষ্ট ভাষায় সে সব কথা শুনি দিয়েছেন। বাস্তবিক কথাগুলির মধ্যে শাস্ত সত্যের বলক মানুষের চিত্তকে জ্যোতির্ময় করে তোলার ক্ষমতা রাখে।

খেরওয়াল বংশ

“খেরওয়াল বংশধরেরা— কারাম গাছের উপর জন্মানো মানুষ ক্ষত্রিয় কিন্তু,—রাপাজ, পিলচু বুড়ো, পিলচু বুড়ির সন্তানরা।

১। খেরওয়াল বংশধরেরা হল— পিলচু বুড়া, পিলচু বুড়ির সন্তানরা।

২। প্রার্থনা— বাবা ঈশ্বরের কাছে বর চাওয়া।

৩। ধর্মীয় আচার — ভাল কাজ করা, ভাল কথা বলা, ভাল ব্যবহার করা।

৪। পরিত্রাণ— অপরাধ থেকে মুক্তি (ক্ষমা) পাওয়া।

৫। সাধনা — ভাল কাজ, ভাল কথায় দৃঢ়ভাবে মনোযোগ দেওয়া। এটা ধর্ম ও অধর্ম বিষয়ে জেনে নেওয়া—

নমস্কার, নমস্কার, ধর্মান্বিতার শুরুবা বা। আমরা নত মন্তকে জেনে নিচ্ছি, কোনটা ধর্ম কোনটা অধর্ম।

ভালো কাজ

(ক) শক্তি শক্তি, ঈশ্বরের শাস্ত শক্তি, ঈশ্বরের নিকট গুরুর নিকট নতশির হয়ে, বিশ্বাস রেখে এই শক্তি, শাস্ত শক্তির তত্ত্ব শিখ্যে জেনে থাকে।

(খ) জন্মদাতা বাবা ও মা, গুরু জনেরা তোমার মত লোককে কোনটি ভাল কাজ, কোনটি ভাল কথা, তা বলে দেবে। তোমাকে ভাল কাজ করতে বলবে। তাদের উপদেশ তুমি পালন করলে, সেই মত কাজ করলে ওটাই হবে তোমার ধর্ম।

(গ) জন্মদাতা বাবা ও মা এবং গুরুজনেরা, তোমার মত লোককে কোনটি খারাপ কথা, কোনটি মন্দ কাজ তা বলে দেবে। সেই কাজ করতে নিষেধ করবে। তুমি সেই উপদেশ পালন না করে সেই সব কাজ করলে সেটাই হবে অধর্ম।

(ঘ) নমস্কার নমস্কার ধর্মান্বিতার, আমাদের বলে দাও গুরু বাবা, কি ধরনের কাজগুলি ভালো কাজ আর কোনগুলি মন্দ কাজ বলে গণ্য।

(ঙ) ভালো কাজ হল তোমাদের পিতামাতাকে সর্বদা সুখে শান্তিতে রাখা। আর সবসময় গুরুজনদের নতশিরে প্রণাম করবে। আর বাবা ঈশ্বর ভগবানের নিকট সর্বদা বিনয়ের সঙ্গে শক্তি ও বর প্রার্থনা করবে। লেখাপড়া শিখবে আর ধান চাল উৎপাদনে মন দেবে। সত্য কথা বলতে কভু যেন ভুল না করো। আর কানা-খোঁড়া-অন্ধ-অসহায় মানুষদের সর্বদা মুষ্টি ভিক্ষা দেবে। এই কয়টি ভাল কাজ শুরুবা বা ও তাঁর শিষ্যরা সর্বদা পালন করে। এই ধর্মীয় কাজ করে স্বর্গে মর্ত্যে সুখভোগ করা যায়।” (পৃ. ১৯১-৯২; প্রাগুক্ত)।

মন্দ কাজ

এরপর মাঝি রামদাস টুড় দশটি মন্দ কাজের একটি তালিকা দিয়েছেন। মনে হয়, এই হল বাবা ঈশ্বরের দেওয়া অবশ্য পালনীয় দশটি নিয়ম যা লঙ্ঘন করলে গুরুতর শাস্তির ভয় দেখিয়েছে অপদেবতারা। অবশ্য আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে মনে হয় এগুলি সামাজিক বাধ্য-বাধকতাকেই তুলে ধরেছে। তাই বাবা ঈশ্বরের এই দশ বিধান, অন্যান্য ধর্মের সদাচরণের বিধানগুলি থেকে কোনো অংশেই হীন নয়। “মন্দ কাজ—(১) অন্য লোকের ধন চুরি করা—এটা একটা মন্দ কাজ। (২) কোন লোকের কাছে মিথ্যা বলে খাওয়া—একটা মন্দ কাজ। (৩) লোকের কথা অন্যের কাছে লাগিয়ে দেওয়া—এটা একটা মন্দ কাজ, (৪) লোকের ধন সম্পত্তি দেখে হিংসা করা—এটা একটা মন্দ কাজ। (৫) কোনো লোককে দেখে হিংসা করা—এটা একটা মন্দ কাজ। (৬) পরস্পরকে ফুসলিয়ে নেওয়া—এটা একটা মন্দ কাজ। (৭) কোন লোককে ঘৃণা করা—এটা একটা মন্দ কাজ। (৮) কোন লোকের সংসার ভেঙে দেওয়া—এটা একটা মন্দ কাজ। (৯) কোনো লোকের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া এটা একটা মন্দ কাজ। (১০) কোন লোককে হত্যা করা—এটা একটা মন্দ কাজ। এই দশটি কাজকে শুরুবা বা ও তার শিষ্যরা মন্দ কাজ বলে। এগুলির জন্যে স্বর্গে ও মর্ত্যে শাস্তি ভোগ করতে হয়।

ভালো কথা

নমঃ নমঃ ধর্মান্বিতার গুরুবাবা, কোনগুলিকে ভালো কথা বলে।

(১) ভালো কথা, ভালোভাবে হচ্ছে সম্পর্ক খুঁজে বের করে সেই সম্পর্ক অনুযায়ী তার সঙ্গে কথা বলা। এই গুলি হল উপভোগ্য কথা। তাতে বাবা ঈশ্বর খুশি হন। (২) মন্দ কথা কটু কথা হচ্ছে— বাবা মা, ভাই-বোনদের, পুত্র পুত্রবধূদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার ও ভালো কথা না বলা, তাদের সঙ্গে মিলে মিশে না থাকা। গাভী দিয়ে জমি চাষ করানো ঠিক না। আর কোন মহিলার সতীত্ব নষ্ট করা ঠিক না। নারীর সতীত্ব নষ্ট করলে অনেক শাস্তি পেতে হয়। কোনো নারীর সতীত্ব নষ্ট করলে তাকে বিয়ে করতে হবে।

পুন্না কালে এই ধর্ম ছিল বলে সকলেই সুখে শান্তিতে ভালোভাবে ছিল। সেকালে এই ধরনের খারাপ কাজ করলে বা এই সব মন্দ মনোভাব পুষে রাখলে তাদের গ্রামের ভিতর ঢুকতে দেওয়া হত না।

(ক) ধরণীর মতো সহনশীল কে ? — মাতা

(খ) স্বর্গের চেয়েও মহান কে ? — পিতা।

(গ) বাতাসের চেয়েও দ্রুতগামী কি ? — মন।

(ঘ) ঘাসের চেয়েও সংখ্যায় কি বেশি ? — দুঃখ ও চিন্তা ভাবনা।” (পৃ. ২৯২-২৯৩; প্রাণ্ডান্ত)।

এখন প্রশ্ন হল যে সদাচরণের জন্য এই যে সব উপদেশ সাঁওতালদের ধর্ম চিন্তায় স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে, সাঁওতাল জাতির উপর তার কি কোনো বিশেষ প্রভাব স্পষ্টভাবে দেখা যায়? বলা যাক সাঁওতালদের কয়েকটি গুণের কথা।—

সাঁওতালদের গুণ

১। কোনো নিরক্ষর গ্রামীণ সাঁওতাল চুরি করে কোনো জেলে কয়েদ আছেন এরকম ঘটনা খুবই কম, নেই বললেই হয়।

২। যে সাঁওতালরা লেখা পড়া শেখেন নি, কায়িক শ্রমের দ্বারা জীবিকা অর্জন করেন এবং দূরে — বন পাহাড়ের কোলে বাস করেন— এমন সাঁওতালরা সচরাচর মিথ্যে কথা বলেন না, কাছে ফাঁকি দেন না; কোনো সাঁওতাল শ্রমিক দিন মজুরি করলে কাজ পুরো না করে কখনো পয়সা চান না।

৩। সব গ্রামীণ সাঁওতালের ঘরদোর ছিমছাম, পরিচ্ছন্ন এবং সুকৃতির পরিচয় বাহী।

৪। সব গ্রামীণ সাঁওতাল নৃত্যগীত প্রিয়, প্রায় সবাই গান গাইতে পারেন।

৫। স্ত্রীকে নির্যাতন করা, স্ত্রীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার ঘটনা সাঁওতাল সমাজে খুবই কম। এক ডাইনি সংস্কার বাদ দিলে সাঁওতাল সমাজে নারী নির্যাতনের ঘটনা নেই বললেই হয়।

৬। যুবক যুবতীরা প্রাপ্ত বয়স্ক হলে নিজেরা প্রেম করে বিয়ে করতে পারেন, সমাজ তাতে সানন্দে সম্মতি দেন।

৭। সাঁওতাল দম্পতি স্বেচ্ছায় স্বাভাবিক ভাবে জন্ম নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন বহু প্রাচীন কাল থেকে।

৮। প্রতি সাঁওতাল জনপদে ‘মঁড়ে হড়’ মানে, পাঁচজন, মানে পঞ্চায়েত সব সামাজিক ব্যাপারে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত নেন।

৯। সাঁওতালরা সাধারণভাবে সব গাছপালা, পশু-পাখি, বন-পাহাড়কে খুবই ভালবাসেন।

১০। সাঁওতাল ভিক্ষুক প্রায় দেখাই যায় না।

এই সব গুণ যদি সুসভ্যতার পরিচায়ক না হয় তবে কাকে বলা হবে সুসভ্য? অপরিমীম দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা ও সামাজিক পশ্চাদদতার মধ্যেও হড় জাতি হাজার হাজার বছর ধরে এইসব গুণ আঁকড়ে ধরে রেখেছেন কী ভাবে? অবশ্যই তাঁদের ধর্ম-চেতনা এবং ঐতিহ্যগত সামাজিক অনুশাসনের জোরে। সামাজিক সুশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্যে সামাজিক ক্ষেত্রে অভিভাবকত্বের জন্যে প্রতিটি সাঁওতাল গ্রামেই আছেন মঁড়ে হড় অর্থাৎ পাঁচজন বা পঞ্চায়েত। প্রতিষ্ঠান হিসাবে মঁড়ে হড়ের পাহারাদারি এবং অভিভাবকত্ব রীতিমতো কঠোর। যে জাতির কোনো লিখিত শাস্ত্র ছিল না, বলতে কি, লেখা পড়ার সঙ্গে কোনো যোগই ছিল না, তারা হাজার হাজার বছর ধরে নিজেদের সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন কীভাবে? নিজেদের ভাষা এবং সংস্কৃতির সঙ্গে নিরক্ষর গ্রামীণ সাঁওতালদের যে নিবিড় যোগ তা বজায় আছে কী করে?—

মাঝি রামদাস টুডু রেক্সার বই থেকে যে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে তাতেই এই সব প্রশ্নের স্পষ্ট এবং পরিষ্কার জবাব আছে।*

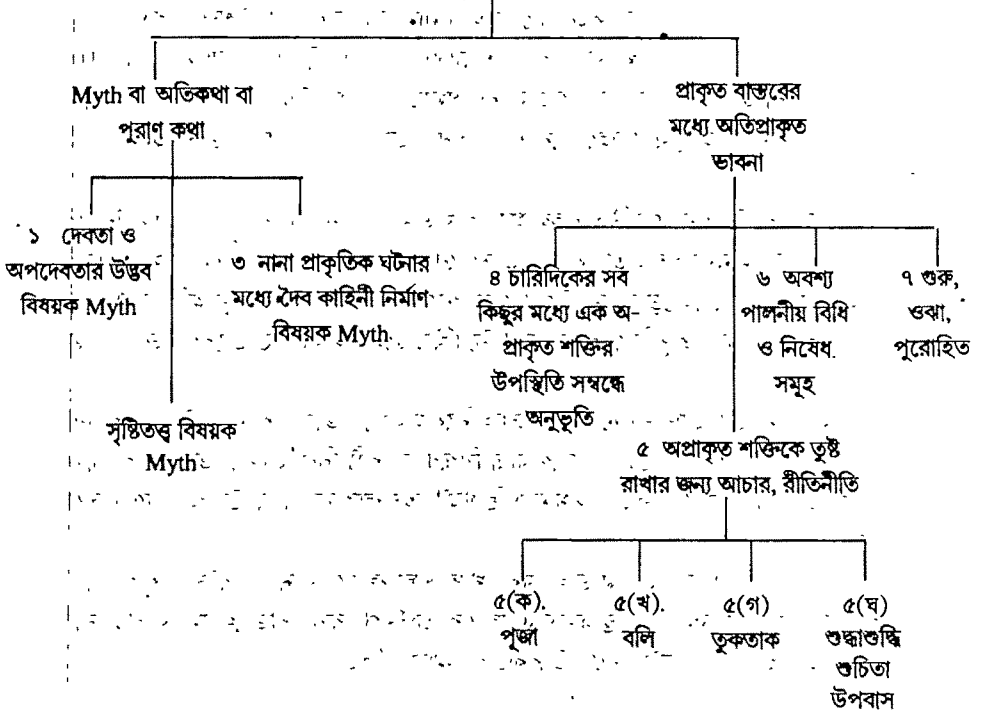
দুই : ধর্মচার

ধর্ম ভাবনা

ধর্ম এবং ঠাকুর দেবতা ছাড়াও একটা আচারের ব্যাপার আছে যার সঙ্গে ঠাকুর দেবতা এবং ধর্মবোধও নানা ভাবে জড়িয়ে থাকে। বিষয়টি এইভাবে রেখা চিত্রের মধ্যে ধরা যেতে পারে—^৭

রেখাচিত্র-১

অতি প্রাকৃত ভাবনা চিন্তা



অতি প্রাকৃত ভাবনা চিন্তার উদ্ভব কিন্তু বর্তমানকালে নয়। দু-পাঁচ হাজার বছরের ব্যাপার নয়। খুবই প্রাচীন কালের ব্যাপার। হয়তো তিরিশ কিংবা পঞ্চাশ হাজার বছর আগেকার ব্যাপার। মানুষের সভ্যতার একেবারে শৈশব কালের কথা। শারীরিক দিক থেকে মানুষ অন্য অতিকায় প্রাণীদের থেকে অনেক দুর্বল। তাছাড়া শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, দাবানল, প্লাবন, ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত ইত্যাদির মোকাবেলা করার সামর্থ্যও তার নেই। তারপর আছে বাসস্থানের নিরাপত্তা এবং খাদ্য সংগ্রহের অনিশ্চয়তা। জীবন তখন হয় মহাভোজ কিংবা উপবাস—‘Life was either a feast or a fast’। আঁধার ঘরে একটি কালো সাপ, স্পষ্ট করে কিছু দেখতে পাচ্ছি না তাই আঁধার ঘরের সব জায়গাতেই সেই কালো সাপটি বসে আছে— ঘরে নিচ্ছি। ঘরে যদি আলো না থাকে তাহলে তো কিছুই দেখার উপায় নেই।

খেরওয়াল বংশা ধরমপুথির বঙ্গানুবাদের ভূমিকা

মাঝিরামদাস টুডু রেস্কার খেরওয়াল বংশ ধরম পুথি’তে খণ্ড বিচ্ছিন্ন ভাবে হলেও, রেখাচিত্রের সাতটি বিষয়ই কিছু না কিছু বর্ণিত হয়েছে। তবে অনুবাদকেরা বলেছেন যে ওই বই— ‘সাঁওতাল ধর্ম ও সংস্কৃতির আদি গ্রন্থ’। কাজেই তাতে আধুনিক সাংস্কৃতিক নৃ-বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী বিবরণ সাজানো থাকবে— এটা আশা করা যায় না। কাজেই এই বইয়ের দুই অনুবাদকের ভূমিকাটিতে যে প্রাসঙ্গিক বিশ্লেষণ আছে সেটি পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে।—

দেব দেবী

“দেব দেবী : সাঁওতালি ধর্মার্চনায়, পূজা পাঠের অন্য নাম বোঙ্গাবুরু। ‘বুরু’ শব্দ দেবতা অর্থেও ব্যবহার করা হয়। আক্ষরিক অর্থে বোঙ্গা অর্থ দেবতা ও বুরুর অর্থ উঁচু পর্বত বা পাহাড়। পৃথিবী বা ভূমি অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আসলে সাঁওতাল বিশ্বাসমতে দেবতার উঁচু পাহাড়ের উপর অবস্থান করে। সেখানে সাধারণ মানুষেরা সহজে যেতে পারে না। এর দ্বারা দেবতাদের উচ্চমহিমা কীর্তিত হয়।

বোঙ্গা শব্দটির অন্য একটি অর্থ হল মাস বা ঋতু বা ঋতু পরিবর্তন। বোঙ্গা তাই ঐশ্বরিক শক্তির সাথে যুক্ত, মানুষকে ক্ষমতা যোগায় ও সামনে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। সাঁওতালরা জাহের এরা, মারাংবুরু, মোড়েকো-তুরুইকো এবং ধরমের পূজা করে। এ ছাড়া হরিওং, ঠাকুরং, সিংবোঙ্গা, মহাদেও, লিটা প্রভৃতি দেবতার কথা উল্লেখিত হলেও সাধারণত তাদের পূজা করা হয় না।

সিং বোঙ্গা হল প্রধান শক্তি, সে আলোক নিয়ে মানুষকে জাগ্রত করে, উদ্দীপ্ত করে, বর্ষা আনে। তার উদ্দেশ্যে গাওঁয়া হয়— ‘ওহে বাবা সিংবোঙ্গা, বৃষ্টি নিয়ে এসো/ ওহে মারাং দেব মুখল ধারে ঢালো।’ সূর্যের দেবতাও সমান শক্তিশালী, অন্ধকার দূর করে উজ্জ্বল আলো নিয়ে আসে সে।

জাহের এরা বা বুড়ি হল মাতৃকা দেবী, খাদ্য শস্য ফলানোর নানা কৌশল তার হাতে। ‘জা’ অর্থ বীজ বা অঙ্কুরোদগমের সুপ্ত ক্ষমতা এবং ‘এর’ অর্থ বপন করা। বীজ থেকে চারা গজানোর ক্ষমতা সম্পন্ন এই মাতৃকা দেবীর মধ্যে উর্বরতার ক্ষমতা কল্পিত।

মারাংবুরু হল সবচেয়ে বড়, উচ্চতর (পর্বত) — অর্থাৎ সর্বপ্রধান দেবতা। সে জ্ঞানের দেবতা। জল, আশ্রয়, কৃষিকাজের দেবতা বলে পরিচিত। মহাদেও মারাংবুরুর একটি রূপ বলেই গণ্য। তাই তার আলাদা পূজা নাই।

মোড়েকো-তুরুইকো শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল পাঁচজন পুরুষ ও ছয়জন নারী। সম্ভবত গিলিচু বুড়া বুড়ীদের সম্মানের। এখন এই শব্দদ্বয় দ্বারা গ্রাম্য পরিষদ বা পঞ্চায়েত বোঝায়। এরাই প্রথমে সাঁওতালদের গ্রাম পত্তন ও সামাজিক বিন্যাস করেছে বলে পরবর্তীকালে দেবতা রূপে গণ্য হয়েছে।

ধরম হল পার্শ্বিক শৃঙ্খলা, সত্যতা ও পবিত্রতার দেবতা। এর পূজা বাড়িতেই হয়। জমসিম বিস্তি অনুসারে ধরম হল জাহের এরা ও লিটার ছোট ভাই। অন্যান্য সব দেবতার পূজাতেই ধরম দেবতার প্রসঙ্গ থাকে।

সাধারণত, বিবাহ ও মৃতের আত্মার সদগতির সময় ঠাকুর ও হরিওং — এর প্রসঙ্গ আসে। কেউ কেউ ঠাকুর ও ঠাকুরাণকে বায়ুমণ্ডলের দেবদেবী বলে থাকেন। (পৃ: ৩২-৩৩ : প্রাগুক্ত)।

উৎসব পরব

দুই অনুবাদকের ভূমিকার আর একটি প্রাসঙ্গিক অংশ হচ্ছে উৎসব-পরব। একটি দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিতে হবে কারণ তালিকাটি ছোটো নয়। এবং নিতে হবে রেখাচিত্র-২ এর সাহায্য।

পূজাপার্বণ

রেখাচিত্র -২

সাঁওতালি সমাজের প্রধান প্রধান কয়েকটি পরব

১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.	১০.	১১.	১২.
বাহা	এরঃ সীম	হারিয়াড়	দাঁশায়	সহরায়	সাকরাত	মাঘসীম	লাগড়ে	মাঃ	মড়ে ও	শিকারোৎসব	সেঁদরা বা
									বাহা		
		আষাঢ়িয়া	জান ষাড								

রেখাচিত্র দুই থেকে বোঝা যাচ্ছে যে সাঁওতালি সমাজের প্রধান প্রধান পরব হচ্ছে আসলে বারোটি—

১। বাহা, ২। এরঃ সীম, ৩। আষাঢ়িয়া, ৪। হারিয়াড়, ৫। জান ষাড, ৬। দাঁশায়, ৭। সহরায়, ৮। সাকরাত, ৯। মাঘসীম, ১০। লাগড়ে, ১১। মাঃ মড়ে ও বাহা এবং ১২। সেঁদরা বা শিকারোৎসব।

বাহা : সাঁওতালদের প্রধান পূজা উৎসব হল বাহা পরব। শাল ও মছয়া গাছ যখন ফুলে ফুলে সেজে ওঠে, গাছে গাছে কোকিল ডাকে, সেই বসন্তকাল হল বাহা পরবের সময়। পরবের একদিন আগে জাহের থান ও মাঝি থান নানাভাবে সাজানো হয়। বাহা শব্দের অর্থ হল ফুল কিংবা কুমারী কন্যা। নতুন সবুজ পত্র পল্লবে সেজে ওঠা ধরণী হল পবিত্র কুমারী কন্যার প্রতীক। পরব শুরু পূজায় দেবতাকে শাল ও মছয়া ফুল উৎসর্গ করা হয়। সঙ্গে থাকে উদ্দীপনাময় গান ও নারী

পুরুষের সম্মিলিত নাচ। আলাদা সারিতে দাঁড়িয়ে পুরুষরা তাদের অঙ্গ দোলায় এবং মাঝে মাঝে লাফিয়ে ওঠে। এই ধরনের উল্লম্বন যুক্ত নাচের নাম বাহা দনা ও জাতুর দনা।

বিকেলে পূজা হয়ে গেলে গ্রামের নায়কেকে সাথে করে সবাই দল বেঁধে গ্রামে ফিরে আসে। মহিলারা নায়কেকে ঘিরে গোল হয়ে নাচতে থাকে। নায়কে মাথায় শাল ফুলের ডালা ধরে রাখে। তার সাথে একজন যুবক মাটির কলসিতে এক কলসি জল ভরে মাথায় নিয়ে চলতে থাকে। এক একটি বাড়ির উপর দিয়ে পরিক্রমার সময় গৃহস্থ নারীরা ঐ নায়কে ও যুবকটির পা ধুইয়ে দেন। এরাও প্রত্যেক গৃহস্থকে বুড়ি থেকে পবিত্র ফুল প্রদান করে। এভাবে সবাই নায়কের বাড়িতে পৌঁছালে সেদিনের মতো উৎসব শেষ হয় এবং যে যার বাড়িতে ফেরত যায়। পরদিনের উৎসবের নাম বাহা বাস্কে (অর্থাৎ একরাতেই বাসি)। এইদিন গ্রামবাসীরা একে অপরের গায়ে জল ছিটিয়ে দেয়।” (পৃ. ৪০৪১)।

“এরঃ সীম—উপযুক্ত বৃষ্টিপাত, শস্য বীজের যথাযথ অঙ্কুরোদগম, সতেজ চারার কামনায় বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে তাই ধান চাষ শুরু করার আগে এরঃ সীম উৎসব পালন করা হয়। তবে এই পূজায় নাচ গানের প্রচলন নেই।” (পৃ. ৪১)।

“আষাঢ়িয়া—আষাঢ়িয়া হল ধানের চারা চষা জমিতে লাগানোর সাথে সম্পর্কিত উৎসব। সাধারণত আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে আষাঢ়িয়া পূজা অনুষ্ঠিত হয়। ভালো ফসল, ধানগাছের সুস্বাস্থ্য কামনায় সাঁওতালরা এই সময় গ্রাম দেবতাদের আরাধনা করে। এ সময়ও কোন নাচের আয়োজন হয় না।” (পৃ. ৪১)।

“হারিয়াড়—মাঠে বোনা ফসল যেন উপযুক্ত বর্ষণের জল পায়, পোকা মাকড়ের কোন উপদ্রব যেন না হয়, সেজন্য দেবতার কৃপা প্রার্থনা করে ভাদ্র মাসে দেবতাদের পূজা করা হয়। এই উৎসব সম্পূর্ণ কৃষিজীবনের সাথে সম্পর্কিত।” (পৃ. ৪৯)।

“জান খাড়—সাধারণত যখন কোন গ্রাম পণ্ডন করা হয় তখন এই পূজা করা হয়। গ্রামের যেখানে প্রথম দেবস্থান তৈরি করা হয় তখন জাহের থানে জানখাড় এর পূজা হয়। এর পরবর্তীকালে মাঃ মোড়ে বলে এই পূজা চলতে থাকে। (পৃ. ৪১)।

“দাঁশায়—পূজা পাঠ বিশেষ থাকে না। কিন্তু দ্বাদশ গুরুর নামে আখড়াতে সিঁদুরের ফাঁটা দেয়া হয়। তারপর শুরু হয় নাচের অনুষ্ঠান। এর নাচ কেবল গ্রামের সীমাতেই আবদ্ধ থাকে না। তা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে চলতে থাকে। হিন্দুদের দশহরা দুর্গাপূজার সময় চারদিন ধরে এই উৎসব চলতে থাকে। এর সাথে দুর্গা পূজার কিছু সম্বন্ধ থাকতে পারে। সাঁওতালী পুরাণ অনুসারে বর্তমান দেবী দুর্গার নাম প্রথমে দুর্গা ছিল না। সে হুদুর দুর্গা নামের এক আদিবাসী প্রধান নেতাকে হত্যা করে দুর্গা নাম ধারণ করে। সাঁওতালী গানে দেবী ও দুর্গার যুদ্ধের বিবরণ পাওয়া যায়। সেই উপজাতি প্রধান হুদুড় দুর্গা এতটা বলশালী ছিল যে সে পদাঘাতে বিশাল পাহাড় চূর্ণ করে ফেলতে পারত। এই নেতার মৃত্যুর পরেই সাঁওতালরা উপযুক্ত নেতার অভাবে দ্বাদশ গুরুর স্মরণ নেয়।” (পৃ. ৪১)।

“সহরায়—শরৎ কালের নাম হল সহরায় বঙ্গা। শরৎ ঋতুর উৎসব এই পরবের নাম সহরায়। এই উৎসব শুধু মানুষের জন্যই নয়, গৃহপালিত গরু মহিষও এই উৎসবের শরিক। এ সময় তাই সাঁওতালরা গৃহপালিত পশুর দেবতা ‘গোয়ালের’ ও পূজা করে। জাহের থানে এ ছাড়াও গরু মহিষের স্বাস্থ্য কামনায় গট সীম পূজা অনুষ্ঠিত হয়। নিজেদের সংসারের সুখ সমৃদ্ধি ও

মঙ্গল কামনায় সমস্ত গৃহ দেবতার পূজাও হয়। সমাজের সর্ব প্রধান উৎসব হল সহরায়। পূজার সাথে গান ও নাচের উৎসবে সমস্ত মানুষ মেতে ওঠে।” (পৃ. ৪২)

“সাকরাত—সাঁওতালী বছরের শেষদিন হল পৌষ সংক্রান্তি। এদিন তাই সমস্ত অশুভ শক্তির প্রতীক হিসাবে তারা একটি ‘বেঝা’ তীর বিদ্ধ করে তার বিনাশ কল্পনা করে।” (পৃ. ৪৩)

“উৎসবের দিন বিকেলে নায়েকে বা জোগমাঝি একটি কদলীকাণ্ড গ্রামের বাইরে গিয়ে পুতে রাখে। এরই নাম ‘বেঝা’।” (পৃ. ৪৩)

“সবার আগে অবশ্য নায়েকে গ্রাম দেবতার পূজা সেরে প্রথম তীরটি ছোঁড়েন। যার তীর ‘বেঝা’র গায়ে লাগবে সবাই মিলে হৈ ছমোড়ের মধ্যে তাকে কাঁধে তুলে মাঝির বাড়িতে এসে উপস্থিত হয় এবং সেখানে লীগড়ে নাচের আয়োজন করা হয়।” (পৃ. ৪৩)

“মাঘ সীম—সাঁওতালী বার্ষিক উৎসবের খারার শেষ উৎসব হল মাঘসীম।... জাহের থান এ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজাপাঠ শেষ হয়ে গেলে গ্রামের বয়স্করা তরুণদের গাছের ডালপালা ও ছোট ছোট শুশুম সংগ্রহ করে আনতে বলে। এই সব দিয়ে তারা ছোট ছোট গাড়ির নকল তৈরি করে এবং ছোটরা এগুলি টানে। সাঁওতালী ভাষায় এর নাম ‘সগড় গাড়ি’ অর্থাৎ বোঝাই গাড়ি। এই গাড়ি নিয়ে সবাই মিলে মাঝির বাড়িতে পৌছালে তাদের যাত্রা সেখানে শেষ হয়। সেখানে গাড়ি থেকে গাছের ডালপালাগুলি খুলে মাঝির ঘরের চালায় তুলে রাখে। এর পর তারা জল ও ছোট ছোট নুড়ি পাথর ছোঁড়ে। এই জল ও নুড়ি আসলে বৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টির প্রতীক।

জঙ্গল থেকে কাঠকুটা, কন্দমূল, পাতা ফলফুল সংগ্রহের জন্য গভীর জঙ্গলে প্রবেশকালে যাতে কারো কোন ক্ষতি না হয়, সে সব কথা ভেবেই বিপদ থেকে রক্ষা পেতে এই পূজানুষ্ঠান।” (পৃ. ৪৩)।

“লীগড়ে—লীগড়ে শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল— লীগা - ক্রান্ত ও এড়ে - ভুলে যাওয়া। অর্থাৎ ক্রান্তি দূর করা বা ভুলে যাওয়ার জন্যে যে নাচ। গ্রামের প্রধান পঞ্চমোড়ল অর্থাৎ মাঝি, জোগমাঝি, পারাণিক, গোড়েৎ, সহ-পারাণিক মিলে দুটি কিশোরী কন্যাকে ডেকে তাদের ঐ আখড়ার স্থান পরিষ্কার করে একটি পূজার স্থান (বেদী) তৈরি করতে বলে। কিশোরীরা গোবর জল দিয়ে নিকিয়ে ঐ স্থান পরিষ্কার করে। তারপর সবাই মিলে স্তব ও মন্ত্রপাঠের পর তারা উৎসব নৃত্য শুরু করে। তাদের বিশ্বাস যে এই নাচের আঁহানে কৃষিকাজের জন্য উপযুক্ত বারিপাত হবে।” (পৃ. ৪৪)।

“মাঃ মড়ে ও বাহা—সম্ভবত এক জায়গা থেকেই এই দুটি পরব শুরু হয়েছে। ‘বাহা’ অর্থ হল আরম্ভ আর ‘মাঃ মড়ে’ হল সমাপ্তির উৎসব। বাহা পরবে দেবতাকে খুশি করতে পুষ্প অর্পণ করা হয়। কৃষিকর্ম শুরু করার আগে, অর্থাৎ হালচাষ কিংবা জমিতে বীজ বোনার আগে ভাল ফসলের আশায় সমবেত ভাবে দেবতার কৃপা লাভের জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনা করা হয় এই উৎসবে।

আর ফসল তোলা শেষ হলে পালিত হয় ‘মাঃ মড়ে’ উৎসব। এই দুটি উৎসবেই একই ধরনের গান গাওয়া হয়, একই ধরনের নাচ হয়, মাদলেরও একই বাজনা চলে। বাহাপরব হল বসন্তকালের উৎসব। কিন্তু মাঃ মড়ে পরবের সময় দেশের সর্বত্র এক নয়। স্থান বিশেষে তা জ্ঞানুয়ারি থেকে জুন মাসের মধ্যে পালিত হয়। পশ্চিমবঙ্গে এর সময় সাধারণত গ্রীষ্মকাল” (পৃ. ৪৪)।

ল' বীর বাঁহিসি ও 'সেঁদরা'

“শিকারোৎসব (সেঁদরা)—সাঁওতাল সমাজের বিশ্লেষণ অনুসারে তাদের শিকার যাত্রার দুটি ভিন্ন দিক আছে। একটি হল জীবজন্তু শিকার করে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার ও হিংস্র জন্তুকে হত্যা করে ও তাড়িয়ে দিয়ে অরণ্য আবাস নিরাপদ করে তোলা। একে বলে ‘ল বীর সেঁদরা’। আর সামাজিক অনুশীলন মতে এটি সর্বোচ্চ বিচার সভা হিসাবেও কাজ করে। এর নাম ‘ল বীর বাঁহিসি’। এখন অযোধ্যা পাহাড়ের শিকার উৎসব তাঁদের বিচার ব্যবস্থার সর্বোচ্চ আদালত বলে মানা হয়। এই বিচারের পরে কোন আপীল চলে না।

শিকার উৎসবের প্রধান আয়োজক বা আহ্বায়ক হলেন শিকার যাত্রার পরিচালক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ের সর্বোচ্চ কর্তা ‘দিহরি’। যে গ্রামের জঙ্গলে শিকার উৎসব হবে, সেই গ্রামের প্রধানই দিহরির ভূমিকা পালন করেন। সাঁওতালী অভিধান অনুসারে শিকারের নিয়ন্ত্রক ও সর্বোচ্চ আদালতের সভাপতির নাম দিহরি। শিকার পর্ব নির্বিঘ্নে সমাপনের জন্য দিহরি শিকারের অধিষ্ঠিত দেবতা ও স্থানীয় দেবতাদের উদ্দেশ্যে পূজা উৎসর্গ করেন। আর শিকার শেষে যে বিচার সভা বসে তার সভাপতিত্ব করাও তাঁর দায়িত্ব।

আগে শিকার যাত্রার আগে থেকেই দিহরি একখানি শালগাছের শাখা আশেপাশের গ্রামগুলির মোড়লদের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে শিকারের দিন, শিকারীদের মিলিত হবার স্থান (দুপুড়ুপ টাণ্ডি) এবং শিকার শেষে সবার মিলনের স্থান (গিপিতিচ বা সুতান টাণ্ডি) ঘোষণা করে দিতেন। শাল শাখা পাঠানো হতে বলে এর নাম ‘শালগিরা’। সাঁওতাল বিদ্রোহের (১৮৫৫) আগে পর্যন্ত এটি অতি ঐতিহ্যপূর্ণ ও পবিত্র সামাজিক আমন্ত্রণ বলে গণ্য করা হত।

এই নিমন্ত্রণের পরেই গ্রামে সভা করে দিহরিকে সম্মতি জানানো হত। গ্রামে কোন অশৌচ বা মহামারী না থাকলে অসম্মতির কোন কারণ ছিল না বলে সবাই তীর ধনুক, টাঙ্গি-বল্লম, বাঁশী, ধামসা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুতিতে বসে যেত। মেয়েরা ব্যস্ত হত শুকনো খাদ্য হিসাবে মছয়ার পিঠা, চিড়া, চাল তৈরি করতে। যাত্রার আগের দিন খুব ভোরে গ্রামের দুই তিনটি অবিবাহিত যুবক গ্রামের প্রান্তে যাত্রাপথে গিয়ে বাজনা বাজিয়ে সকলকে যাত্রার জন্য একত্রিত করতে থাকে। পুরুষেরা যাত্রার আগে স্ত্রীর হাতের লোহার বালা খুলে রেখে অস্ত্র-শস্ত্র ও চাল চিড়ে নিয়ে গম্বু্যের পথে যাত্রা শুরু করে। শিকারী ফিরে না আসা পর্যন্ত স্ত্রী হাতের শাঁখা ও কপালে সিঁদুর পরেন না। স্ত্রী স্বামীকে ফিরে আসার পথে ‘মারাড বাহা’ ফুল আনতে অনুরোধ করে।

বিভিন্ন গ্রাম থেকে শিকারীর ‘দুপুড়ুপ’-এ সবাই পৌঁছে গেলে দিহরির পক্ষ থেকে সবাইকে বরণ করে নেয়া হয়। তাদের যাত্রা পথের বিবরণের সাথে অশুভ কোন ঘটনা ঘটে থাকলে দিহরি আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার দ্বারা সেই অশুভ লক্ষণ খণ্ডন করেন। এখানে সবার সাথে করে নিয়ে আসা খাদ্য ভাগ করে খাওয়া হয়। তারপর সবাই শিকারের জন্য অরণ্যে প্রবেশ করে।

শিকার শেষে পূর্ব নির্ধারিত ‘গিপিতিচ’-এ সবাই পৌঁছে গেলে সেখানে শিকারের মাংস ভাগ করা হয়। রান্না বাত্মা শুরু হয়। একদিকে বসে বিচার সভা, অন্যদিকে বসে নাচ গানের আসর। বিচার সভায় গ্রামের মাঝি বা পারগাণার বিচারে কেউ সন্তুষ্ট না হলে বা সেখানে কোন কিছু ফয়সালা না হলে এখানে তার আপীল ও পুনর্বিচার হয় দিশম মাঝি, দিহরি ও বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা গণ্যমান্য লোকদের উপস্থিতিতে। আবার শিকারের সময়, ভিন্ন গ্রামের লোকদের সাথে কোনরূপ বিবাদ বিসম্বাদ হলেও তার বিচার এই সেঁদরায় সম্পন্ন হয়।

শিকারে অংশগ্রহণ কারী তরুণ যুবকেরাই সাধারণ নাচ গানে অংশ নেয়। শিকার-সাহস, বীর্য ও পৌরুষের মর্যাদামণ্ডিত উৎসব। কাজেই তরুণ সমাজের সাহসিকতার সাথে তাদের শিল্পকুশলতাও এখানে প্রকাশ পায়। বিভিন্ন অঞ্চলের লোকের মধ্যে এভাবে একটি ভাব সমন্বয় গড়ে ওঠে।

রাতভর গান বাজনা ও বিচার সভা চলার শেষে ভোরের আলো ফুটলে সবাই যার যার গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। শিকারী পৌছালে তাদের পা ধুইয়ে তেল মেখে বরণ করে নেওয়া হয়। স্বামী তার স্ত্রীর হাতে লোহার বালা পরিয়ে দেন। স্ত্রীর জন্যে আনা ‘মারাড় বাহ’ তার আঁচলে দিয়ে নতুন করে জীবন শুরু করেন তারা” (পৃ. ৪৫-৪৬)।

ধর্ম ও ঠাকুর দেবতা সম্বন্ধীয় আলোচনায় সৃষ্টিতত্ত্ব ও অন্যান্য বিষয়ক মিথস্ক্রিয়ার একটি বিশেষ জায়গা আছে। এই বিষয়ে অনুবাদকল্প— সুকুমার সিকদার এবং সারদা প্রসাদ কিস্কু (খে, বা,) লিখিত ভূমিকা থেকে সামান্য উদ্ধৃতি এখানে প্রাসঙ্গিক হবে বলেই মনে হয়। খেরওয়াল ধর্ম প্রসঙ্গে অনুবাদকল্প বলেছেন— “খেরওয়াল বংশা ধর্ম পৃথিবীর মধ্যে আদিতে এমন একটি পৃথিবীর কথা জানা যায় যেখানে লোকেরা সত্যবাদী, পিতামাতার অনুগত ও সৎ ছিল। সেই পৃথিবী কি ভাবে সৃষ্টি হয়েছিল, এই গ্রন্থ সে বিষয়ে নীরব। কিন্তু সেখানে যখন কলিযুগ এসেগেল, পাপ প্রবেশ করল, বাবা ঈশ্বর প্রথমে আকাল দিয়ে লোকদের সংশোধন করতে চাইলেন। তাতেও যখন কাজ হল না, তখন সাংঘাতিক জলপ্লাবনের দ্বারা পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণী ধ্বংস করে দিলেন। শুধু তাতেই খুশি না হয়ে স্বর্গ থেকে এক মন্ত হাতি নামিয়ে দিলেন স্বর্গের তোড়ে-সুতম দিয়ে। সেই হাতি পা নাড়িয়ে পৃথিবী একেবারে ধসিয়ে দিল।

কিন্তু এভাবে সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে গেলে ঈশ্বরের লীলা বন্ধ হয়ে যায়। তাই স্বর্গের দেবতাদের নিয়ে বাবা ঈশ্বর বারো বছর ধরে চিন্তা ভাবনা করলেন। ত্রিশ বছর ধরে প্রার্থনা ও পূজা পাঠ চলল। ঈশ্বর তখন মেঘের মাঝে হাঁস জীবন সৃষ্টি করে বেনাঘাসের শিকড় দিয়ে দুটি হাঁস— হাঁসলী পাখির প্রতিক্রম সৃষ্টি করে দিলেন। বেনাঘাসগুলি সেই প্লাবনেও অবিকৃত ছিল। ঈশ্বরের আশীর্বাদে সেখানে একটি কারাম গাছও জন্মাল। সেই কারাম গাছের ডালে ঐ পাখিরা বাসা বানিয়ে সেই বাসায় দুটি ডিম পাড়ল। কিন্তু চতুর্দিক জলে প্লাবিত বলে ডিম নিয়ে হাঁস দুটি খুব চিন্তায় পড়ল। তারা কাঁদতে শুরু করল। তাদের কান্না শুনে সদয় হয়ে স্থলভাগ সৃষ্টি করার জন্য কচ্ছপকে আহ্বান করা হল। সেই কচ্ছপের চার পা সোনার শিকলে বেঁধে পিঠে কাল নাগিনী সাপের বেড়ি দিয়ে একথানা সোনার থালা উপুড় করে দেওয়া হল। কেঁচো সেই প্রবল প্লাবনের গভীরে জলে ডুব দিয়ে মাটি তুলে তুলে থালার উপর রেখে ভূভাগ গড়ে দিল। ততদিনে ঐ হাঁসদের ডিম দুটি থেকে দুইজন মানব শিশু জন্মেছে। নামকরণের দিনে মারাবুংক এদের নাম রাখল পিলচু বুড়া ও পিলচু বুড়ি।

এই হল সংক্ষেপে এই গ্রন্থে বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্ব। নৃতাত্ত্বিক শরৎচন্দ্র রায় তাঁর *The Mundas and their Country* গ্রন্থে ছোট নাগপুর অঞ্চলের মুণ্ডা সমাজে প্রচলিত আদি মানবের আবির্ভাব সম্পর্কে যে কাহিনী বলেছেন, তা আসলে অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতায় প্রাপ্ত সৃষ্টিতত্ত্বেরই প্রতিফলন বলা যায়। আদি মহা সমুদ্র মধ্যে আজবগড় নামে প্রথম যে ভূভাগ সৃষ্টি হল প্রধান দেবতা সিংবোঙ্গা সেখানেই প্রথম মানব মানবী সৃষ্টি করলেন। Col. Tickell আর একটি উপকথা সংগ্রহ করেছিলেন। তাতে দেখা যাচ্ছে আদি দেব দেবী ‘ওত বোঁড়া’ ও ‘সিং বোঙ্গা’ দুটি বালক বালিকা সৃষ্টি কারতাদের

একটি শুহায় রেখে দিল। তারা বড় হয়ে উঠলেও তাদের মধ্যে কোন যৌন চেতনা জাগ্রত না হওয়ায় নতুন মানব মানবী সৃষ্টি হওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠল। তখন সিং বোঙ্গা তাদের ভাতের হাঁড়িয়া তৈরি করা-শেখালে হাঁড়িয়া পানের মস্ততায় তাদের কাম ভাব জেগে উঠল। সাময়িকভাবে তারা নিজেদের সম্পর্ক ভুলে গেল। তাদের মিলনে বারোজন পুত্র ও বারোজন কন্যা জন্মাল। মতান্তরে সাতপুত্র ও সাত কন্যা।” (পৃ. ১৯-২০: প্রাগুক্ত)।^৮

তিন : সুনীতিকুমারের আলোচনা

মিথ ও ফোকলোর

অনুবাদক দ্বয়ের ভূমিকার প্রথমই বলা হয়েছে— “১৯৫১ সালে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের আগ্রহে তাঁর ভূমিকা সহ বৃহৎ কলেবরে গ্রন্থের বর্তমান সংস্করণটি প্রকাশিত হয়।” (পৃ. ৯) অথচ আশ্চর্যের বিষয়, এই ভূমিকাটিকে অনুবাদক দ্বয় তাঁদের দ্বারা অনুদিত ও সম্পাদিত বইয়ে জায়গা দেন নি এবং কেন তারা অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকাটিকে বর্জন করলেন তারও কোনো কৈফিয়ৎ দেননি। কিন্তু অন্যত্র এই প্রসঙ্গে সুনীতিকুমারের একটি আলোচনা পাওয়া যাচ্ছে। বর্তমান প্রসঙ্গে এই আলোচনাটির বিশেষ মূল্য আছে তাই এখানে তার অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করা হল— “বড়িং সাহেবের সাঁওতাল গল্পের সংগ্রহের কতক অংশের ইংরেজি অনুবাদ ১৯০৯ সালে সিভিলিয়ান Cecil Henry Bompas কর্তৃক Folklore of the Santals নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। Rev Dr. Campell ক্যাম্পবেল নামে আর একজন মিশনারি ১৮৯১ সালে কতকগুলি সাঁওতালি কাহিনী প্রকাশ করেন। এই সব সংগ্রহের সব গল্পগুলিই কিছু লক্ষণীয় নহে। কতকগুলি গল্প ভারতের সাধারণ সম্পত্তি—জাতক, হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্রের মতো পশুপক্ষীকে অবস্থান করিয়া নীতিকথা; কতকগুলি আবার সাধারণ রূপকথা যাহা বাংলা, হিন্দি প্রভৃতি আর্য ভাষাতেও পাওয়া যায়। কতকগুলি গল্প বিশেষভাবে সাঁওতালদের জীবন লইয়া। এই সমস্ত গল্পের মধ্যে সবচেয়ে লক্ষণীয় এবং চিত্তগ্রাহী হইতেছে বোঙ্গাদের লইয়া কতকগুলি গল্প, যেগুলি সাঁওতাল সংস্কৃতির বিশেষ পরিচায়ক। এই ধরনের গল্প বেশি সংখ্যায় মিলে— একদিকে মানব তরুণ বা তরুণী, অন্যদিকে ‘বোঙ্গা কুড়ি’ বা ‘বোঙ্গা কোড়া’— দেব কন্যা বা দেব কুমার— এবং ইহাদের মধ্যে ভালোবাসার কথা লইয়া গল্প। এইরূপ গল্পের কাঠামো বা মূল কথাবস্তু মাত্র দুই-চারি প্রকারের পাওয়া যায়। একটি সাধারণ কথাবস্তু হইতেছে এই ধরনের— সখীদের সঙ্গে সাঁওতাল কন্যা বনে গিয়াছে শাকপাতা তুলিতে; সেখানে এক তরুণ বোঙ্গার সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ, এই বোঙ্গা কোড়া বাস করে পাহাড়ের শুহায়, কন্যা তাহার পত্নীরূপে সেখানে গিয়া তাহার সঙ্গে পরম সুখে বাস করিতে থাকে; কিন্তু তাহার আত্মীয়-বন্ধুদের কাছে এই বোঙ্গা সঙ্গ প্রীতিকর না লাগায় তাহাদের চেষ্টা হয় যাহাতে বোঙ্গাকে মারিয়া ফেলিয়া বা তাহাকে ঠকাইয়া, কন্যাটিকে আবার ঘরে ফিরাইয়া আনিতে পারে; কখনো কখনো তাহারা কৃতকার্যও হয়। কিন্তু বোঙ্গা তাহার মানবী স্বীকে ছাড়িবে না— কন্যা বাপের বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া পীড়িত হয় এবং প্রাণ ত্যাগ করে এবং এইরূপে বোঙ্গা লোকে গিয়া তাহার বোঙ্গা পতির সহিত মিলিত হয়। আবার এই ধরনের গল্পও কতকগুলি পাওয়া যায়— তরুণ সাঁওতাল রাখাল, পাহাড়ের কোলে বনে গোরু মহিষ চরাইতেছে; জ্যেষ্ঠতার রাত্রি বনের মধ্যে সে বাঁশি বাজাইতেছে; বোঙ্গা কন্যা তাহাকে দেখিয়া, তাহার প্রেমে পড়িয়া সুন্দরী মানব কন্যার রূপে আসিয়া

তাহাকে দেখা দেয়। ইহা যেন প্রাচীন বৈদিক উবর্শী-পুরুষবা, গ্রিক পুরাণ কথার দেবী Aphrodite আফ্রোদিতে ও রাখাল রাজপুত্র Ankhises আঙ্খিসেস এবং টিউটনিক জাতির Volkyrie বা রণদেবী Alvit আলভিট ও তরুণ কারুশিল্পী Weland ওয়েলান্ড এর কাহিনীর অনুরূপ সুন্দর ও কাব্যময় কাহিনী।

সাঁওতালি উপাখ্যানের বোঙ্গা কন্যা একটি পাহাড়িয়া নদীর উৎসের মধ্যে বাস করে; সাঁওতালি কথাকার উৎসটির ছোটো একটু খানি বর্ণনাময় চিত্র দিয়াছেন— ‘বোঙ্গা কন্যার বাসস্থান উৎসমুখের তীরে গাছে প্রচুর লাল রঙের সুগন্ধী আকড় ফুল ফুটিয়া আছে।’ রাখাল তরুণ জলে নামে, গাছ হইতে কন্যার জন্য ফুল তুলিবার উদ্দেশ্যে; জলে নামার সঙ্গে-সঙ্গেই রাখাল বোঙ্গা কন্যার শক্তির মধ্যে আসিয়া পড়ে— কন্যা যেন কোনো জাদু মন্ত্রে তাহার প্রেমিককে সম্মোহিত করিয়া জলের ভিতর লইয়া যায় ও নিজদের বোঙ্গালোকে আনিয়া উপস্থিত করে। সেখানে বোঙ্গাদের বসিবার আসন হইতেছে কুণ্ডলী পাকানো বড়ো বড়ো সাপ এবং থাবা পাতিয়া বসা বাঘ আর চিতা হইতেছে বোঙ্গাদের শিকারের কুকুর। বোঙ্গারা মাঝে মাঝে এইসব কুকুর লইয়া বনে শিকার করিতে যায়, তাহাদের শিকারের পশু হইতেছে বনের ভিতরের কাঠুরিয়া মানুষ। কুচিং সাঁওতাল তরুণ বোঙ্গালোক হইতে মানব-লোকে ফিরিয়া আসে এবং সাধারণ মানুষের মতো আর পাঁচজনের সঙ্গে বাস করে, বিবাহও করে কিন্তু তাহার বোঙ্গাত্মীর সহিত মাঝে মাঝে সে বনের ভিতরে অথবা পাহাড়িয়া নদী বা পুষ্করগীর তলে গিয়া মিলিত হয়। তাহার বোঙ্গা ত্মীর অলৌকিক জ্ঞান ও শক্তির প্রভাবে সেও ভবিষ্যদ বাণী করিতে সমর্থ হয় এবং সে জন সমাজে সম্মানিত “জ্ঞানগুরু” বা ভবিষ্যদবক্তা হইয়া দাঁড়ায় ও সকলের সম্মানের পাত্র হয়, অর্থ শালী হয়। প্রাচীন রোমের পুরাণ কথায় উৎস বাসিনী দেবী Egeria এগেরিয়ার উপাখ্যান আছে, ইনি রোমের রাজা Numa নুমার পত্নী হন এবং ইহারই প্রসাদে নুমা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেন— এই সাঁওতালি উপাখ্যানও এই ধরনের।

তুলনামূলক বোঙ্গা চর্চা

বোঙ্গাদের কখনো কখনো দুই প্রকৃতির ছেলে ছোকরার ভাবে দেখা হয়— ইহারা নানা ভাবে মানুষকে বিপদে ফেলিয়া বা অপদহ করিয়া আনন্দ পায়; কিন্তু মানুষও কখনো কখনো ইহাদিগকে নিজ বুদ্ধি বলে কায়দায় আনিতে পারে। মধ্যযুগের উত্তর ইউরোপে বামন দেবযোনির সম্বন্ধে যে সমস্ত গল্প আছে, এই সাঁওতালি গল্পগুলি তদনুরূপ। বোঙ্গাদের এই প্রকারের চরিত্রের কল্পনার পিছনে হয়তো সাঁওতালদের পূর্বপুরুষ প্রাচীন Austric বা দক্ষিণ জাতির আগমনের পূর্বে ভারতে যে বামনাকার Negroid নিগ্রোবর্গ জাতি বাস করিত তাহাদের স্মৃতি বিদ্যমান আছে। ভারতে বৈদিক যুগে আর্যগণ বনের অধিষ্ঠাত্রী অরণ্যানী দেবীকে দেখিয়াছিলেন; এখনও সুন্দর বন অঞ্চলের বঙ্গালি হিন্দু ও মুসলমান কাঠুরিয়া ও কৃষক ‘বনবিবির’ কল্পনা করে। বৈদিক আর্যের কল্পনায়, বন, পর্বত, হ্রদ সমস্ত ছিল দেবতাদের অধুষিত, অঙ্গরা ও গন্ধর্বদের বিচরণভূমি। প্রাচীন গ্রীকেরা Dryad বা বৃক্ষদেবী, Naiad অর্থাৎ অঙ্গরা বা জলদেবী এবং Nereid বা সাগর দেবীর অধিষ্ঠান সর্বত্র দেখিত, তাহাদের চোখে বনের মধ্যে Pan পান দেব এবং Dionusos দিওনুসস ও তাহার গণ, Satyr “সাতির” নামে আরণ্য অর্ধ-পশু-অর্ধ-মানব দেবযোনি ও Bacchanate দিব্যোন্মাদযুক্ত রমণীবৃন্দ বিচরণ করিত। কোল জাতীয় লোকেরা তেমনি বনে, পাহাড়ে, নদীতে, জলাশয়ে,

বোঙ্গা-কোড়া ও বোঙ্গা কুড়িদের দেখিত, এখনও দেখিয়া থাকে। তাহাদের ছোটো ছোটো গ্রাম ঘিরিয়া মধ্য ও পূর্ব ভারতের অনাদি কালের অরণ্যে এখনও এইসব দেবযোনির বাস তাহারা দেখে। মুণ্ডা দেবলোকের এই সমস্ত দেবতার খবর শরৎচন্দ্র রায় মহাশয় দিয়াছেন, — “বুরুবোঙ্গা” ইনি পাহাড়ের অধিষ্ঠাতা বোঙ্গা ইহার এক সাধাবণ নাম মারাঙ বুরু’ — অর্থাৎ মহাগিরি’ — আজকাল কোনো কোনো অঞ্চলে সাঁওতালেরা ‘মারাঙ বুরুকে’ শিবের সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করে); ইকির বোঙ্গা — গভীর জঙ্গলের মধ্যে ইহার বাস; ‘নাগা বোঙ্গা’ — টিলা ভূমি ও পাহাড়ের খাদ ইহার বিচরণ স্থান; দোসৌলি বোঙ্গা-ছায়াশীতল তরুবহুল সুন্দর বনভূমি ইহার বাসস্থান; চন্দর ইকির বোঙ্গা ইহার নিবাস স্ফটিকোজ্জ্বল জলময় ঝরণার তীরে এবং চান্দিবোঙ্গা — ইহার বেদি হইত কুঞ্জ বনে, খোলা মাঠে ও পাহাড়ের মাথায়।

কোল ভাষা ও সংস্কৃতির চর্চার প্রয়োজনীয়তা

সমস্ত বিষয়ের বৈজ্ঞানিক আলোচনায় উপযোগী করিয়া, কোল ভাষা ও সংস্কৃতির চর্চাকে একটি discipline অর্থাৎ বিশেষ ধরনের মানসিক কসরৎ বা ব্যায়াম অথবা শ্রমসাপেক্ষ শিক্ষা রূপে ধরা যায়। নূতন মানবিকতার বা মানবপ্রীতির দৃষ্টি লইয়া আমাদের দেশের Aborigines অর্থাৎ আদিবাসী বা ভূমিপুত্রদের জীবনের প্রতি অবলোকন করা আরম্ভ হইয়াছে—নূতন বিদ্যার আলোচনার ইহা এই যুগের একটি লক্ষণীয় সুফল। স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র রায়, Verrier Elwin (ভেরিয়ার এলউইন, শ্যামরাও হিবলে, W.G.Archer — আর্চর, ইহারা এই কাজে পথপ্রদর্শক বা পথিকৃৎ। ভারতের আদিম জনগণের সাংস্কৃতিক জীবনের কোনো অংশ এই অবলোকন এবং আলোচনা হইতে বাদ দিলে চলিবে না। ইহাদের দৃষ্টিভঙ্গি—ইহাদের ভাষায় মাধ্যমেই প্রধান বা মুখ্য প্রকাশ লাভ করে। কোল জাতিরও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষণীয় ইহাদের ভাষায়—মানুষের চিন্তার ধারা এক সম্পূর্ণ নূতন খাতে ইহাতে প্রবাহিত হইতে দেখা যায়— কোল ভাষার গতি-ধারা, আর্থ বা দ্রাবিড় ভাষার ধারা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ভারতের একটি আদিম বা প্রাচীন জাতির মনোভাবের পরিচয় ইহাতে পাওয়া যাইবে। কোল-ভাষার কতকগুলি রীতি মৈথিলি, বাঙ্গালা প্রভৃতি আধুনিক আর্থ ভাষাতেও সংক্রামিত হইয়াছে; তাহার বিচার করিতে গেলে, কোল জগতের খবর লওয়া অপরিহার্য।” (বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৫৩, ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ)।

সুনীতিকুমারের অর্ধশতাব্দী প্রাচীন একটি রচনা থেকে এই দীর্ঘ উদ্ধৃতি দেওয়ার কৈফিয়ৎ হিসেবে বলতেই হয় যে রেখাচিত্রে প্রদর্শিত অতি প্রাকৃত ভাবনা চিন্তা—সম্বন্ধে তথ্য এবং তত্ত্বের এই রকম অতি প্রাঞ্জল উপস্থাপনা অদ্যাবধি দুর্লভ এবং বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। তদুপরি সুনীতিকুমার বলেছেন— “সমস্ত বিষয়ের বৈজ্ঞানিক আলোচনার উপযোগী করিয়া, কোল ভাষা ও সংস্কৃতির চর্চাকে একটি discipline অথবা শ্রমসাপেক্ষ শিক্ষা রূপে ধরা যায়।” দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতেই হয় যে সুনীতিকুমারের এই আশা এখনো অপূর্ণ রয়েছে। ঝাড়খণ্ড রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সাঁওতালি ভাষা সাংবিধানিক স্বীকৃতি লাভ করেছে, কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার সাঁওতালি সাহিত্য আকাদেমি স্থাপন করেছেন, তথাপি সুনীতিকুমার নির্দেশিত discipline টি গড়ে তোলার কোনো উদ্যোগই এখনো পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। বর্তমানে আলোচনাটি সমাপ্ত করার আগে আর একবার এই প্রসঙ্গটি উত্থাপন করতে হবে।

চার : নায়কে মঙ্গলচন্দ্র সরেন

সাঁওতাল জাতির ধর্ম ও সংস্কৃতি

এখন দেখা দরকার নায়কে মঙ্গলচন্দ্র তুড়কু লুমাম সরেনের বাংলায় লেখা *সাঁওতাল জাতির ধর্ম ও সংস্কৃতি* নামক বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য বইটি। এই বইটি আমাকে সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন আমার বন্ধু দিব্যাংগু মিশ্র। বইটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ৭ই আষাঢ়, ১৩৮৯ (ইং ২৩শে জুন, ১৯৮২)। *যুগান্তর* পত্রিকায় ১৯৮২ সালের ৩১ মে তারিখে মহাশ্বেতা দেবী লিখেছিলেন: “সাঁওতাল সমাজের সবার শ্রদ্ধেয় মঙ্গল চন্দ্র সরেন ১৯৫২-১৯৬৯ পর্যন্ত বিনপুর থেকে নির্বাচিত বিধান সভা সদস্য ছিলেন। কিন্তু তাতে মঙ্গল সরেন বিষয়ে কিছুই বলা হয় না। ইনি বহু শাস্ত্রজ্ঞ, সংস্কৃতে সুপণ্ডিত। সাঁওতাল জাতি বিষয়ে একটি চলন্ত বিশ্বকোষ বিশেষ। অশীতিপর এই বৃদ্ধ আজও ধূয়া পাহাড়ি গ্রামে নিজ আবাসে কায়িক শ্রমে এবং জ্ঞান চর্চায় মগ্ন থাকেন। মঙ্গল সরেনকে দেখা এক বিরল অভিজ্ঞতা” — মঙ্গলচন্দ্র সরেন নিজেই নায়কে বলতে ভালোবাসতেন। নায়কে আসলে সাঁওতাল সমাজের পুরোহিত। পৌরোহিত্য তাঁর পেশা ছিল না, বলা যায় যেন নেশা ছিল। সাঁওতাল সমাজের সব ক্রিয়া কর্মে, পূজার্নায় তিনি সানন্দে গিয়ে নায়কের দায়িত্ব পালন করতেন। তাঁর বই থেকে ধর্মের আচার-বিচার, ঠাকুর-দেবতা, বলি এবং পূজা পদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁর উক্তি শুলিকে উদ্ধৃত করা হবে। এই সব বিষয়ে তাঁর বিবরণ নির্ভরযোগ্য বলে ধরা যেতে পারে।^{১০}

সারি ধরম

নায়কে মঙ্গলচন্দ্র প্রথমেই বলেছেন— “আমাদের পূর্বপুরুষগণ বলেন, আমাদের ধর্মের নাম সারি ধরম। বাংলাতে সারি শব্দের অর্থ সত্য।” (পৃ. ১)। তারপর মঙ্গলচন্দ্র ব্যাখ্যা করে বলেছেন— “কারণ সাঁওতাল জাতি শালবৃক্ষকে শালবৃক্ষ বলেন না। তাঁহারা ইহাকে সারি সারজম বৃক্ষ বলেন। এই সারি সারজম বৃক্ষই আমাদের নিকট শ্রীভগবানের প্রতীক।” (পৃ. ৩)। সাঁওতালদের সত্যবাদিতার কারণ কী? মঙ্গলচন্দ্রের উত্তর— “এই শালবৃক্ষরূপী ভগবানকে মানি বলিয়াই আমরা মিথ্যা কথা উচ্চারণ করিতে পারি না।” (পৃ. ৩)। তারপর লেখক বলেছেন— “কিন্তু আমরা গ্রাম পশ্চিম করার আগে শালবৃক্ষের তলাতে ঘট স্থাপন করিয়া ও একটি সাদা মোরগ বাঁধিয়া রাখি রাত্রিতে। পরদিন সকালে যদি দেখা যায় যে, ঘটের জল কমিয়া গিয়াছে বা মোরগটি শৃগালে বা অন্য প্রাণীতে খাইয়া ফেলিয়াছে তাহা হইলে সেখানে বসবাস করিবে না। যদি ঘটের জল পূর্ণ থাকে সেখানে করিবে।” (পৃ. ৪)।

তিন দেবতা

এরপর মঙ্গল চন্দ্র বলেছেন দেবতা ও তাদের পূজা বিধানের কথা— “আমরা জাহের স্থানে শ্রীভগবানের যে তিনটি রূপে আমাদের জাতীয় অধিষ্ঠাত্রী দেবতা রূপে প্রকাশিত হইয়াছেন সেই তিনটি দেবতার পূজা দিয়া থাকি। সেই তিনজন অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম— মারাং বুরু, জাহের এরা আর ধরম।” (পৃ. ৪)।

বাহা পরব

জাহের থানের প্রধান অনুষ্ঠানটি সম্বন্ধে মঙ্গলচন্দ্র বলেছেন — “আমাদের জাহের স্থানের বড় পূজা বাহা। বাহা পূজা দোল-পূর্ণিমার তিন দিনের দিন ধার্য আছে। পূজা আমাদের গ্রামের নায়কে করেন। পূজার আগের দিন জাহের স্থানকে পরিষ্কার করা হয়। পূর্বে জাহের স্থানে দুইটি শালগাছ পাশাপাশি থাকিত। উহার নিচে শালখুঁটি দিয়া একটি ছোট একচালা ঘর তৈয়ারি করিয়া উহার নীচে পূজা করা হইত। বর্তমানে শাল গাছের অভাবে ঐ চালাঘরের নীচে দুইটি শাল খুঁটি পাশাপাশি গাড়িয়া রাখা হয়। নায়কে পূজার আগের দিন হবিষ্যাম খাইয়া ব্রত করেন। সেই হবিষ্যাম তাঁহার সম্বা বিবাহিত স্ত্রী রান্না করেন নতুন হাঁড়িতে নতুন কলসীর জল দিয়া এবং স্বামী স্ত্রী দু’জনেই ব্রত করেন। রাত্রে নতুন চটাইয়ের নীচে কুশ ও জাম ডাল রাখিয়া দিতে হয়। কোন বিধবার স্পর্শ খাওয়া নিষেধ। নিজের বিছানা ছাড়া অন্য বিছানায় বসা উঠা নিষেধ। বাইরে গেলে হাত পা ধুইয়া বিছানায় বসিতে বা ঘুমাইতে পারিবে। দেবতাগণের জন্য বিভিন্ন ধরনের ব্যবহার্য জিনিস নায়কের বাড়িতে চিরকাল রক্ষিত থাকে। যথা মারাং বুরুর টাঙ্গি, জাহের এরার ডালা ঝাঁটা, দুইটি পিতলের বালা, গলায় পরার জন্য পিতলের শিকল। ধনুকের দুই মাথায় দুইটি খাঁটি, দুইটি তীর ধনুক ধরমের জন্য। পূজার দিন জাহের স্থানের সেই ঘরের নীচে সেই শালগাছ দুইটিতে বা শাল খুঁটিতে তিন খেই সূতা ঘুরাইয়া রাখা হয়। উহা শ্রী ভগবান স্বর্গেও পুরুষ প্রকৃতি মর্ত্যে ও পুরুষ প্রকৃতি ও পাতালেও পুরুষ প্রকৃতি রূপে বিদ্যমান। এবং এই খুঁটি বা শালগাছ উহার কাছে আতপ চালের গুঁড়ি দিয়া গোলাকার আকৃতি পাশাপাশি দুইটি খঁড় তৈয়ারি করিয়া তাহার মধ্যস্থলে আতপ চাল তাহাতে মিখি, সিঁদুর, শালফুল, মছলাফুল ও দুধ ঢালার পর বামদিকের খঁড়ে জাহের এরার নামে একটি লাল কাটোল চরাইয়া উহাকে জবাই করা হয়। তারপর ডানপাশের খঁড়ে একটি সাদা মোরগ মারাং বুরুর নামে বলি দেওয়া হয়। বলির আগে মুরগি দুইটিকেই জল ছিটা দিয়া তাহাদের কপালে গায়ে পায়ে মিখি ও সিঁদুর দিতে হয়। (পৃ. ৬)।

এর পর মঙ্গলচন্দ্র বলেছেন বাহা পরবের সমাপ্তি অনুষ্ঠানের কথা—“বাহা পূজাতে নায়কে এবং নায়কের স্ত্রী দুই জনেই ব্রত করেন ও জাহের স্থানে যান। পূজার প্রসাদ দুইজনেই জাহের স্থানে ভোগ করেন। আমরা গ্রামবাসী স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই বাহা পূজাতে জাহের যাই। শ্রীভগবানের নামে নাচ গান করি। পূজার শেষে নায়কেকে নাচগানের মধ্য দিয়া বাড়িতে ফিরাইয়া আনা হয়। গ্রামের মধ্যে পৌঁছাইলে প্রত্যেক বাড়ির মেয়েরা নায়কের পা-ধোয়। নায়কে প্রত্যেকের মাথায় শান্তিবারি বর্ষণ করেন। মেয়েরাও নায়কের মাথায় শান্তিবারি বর্ষণ করেন। নায়কে প্রত্যেককে শালফুল দেয়। প্রশাম প্রতি প্রশাম করেন প্রত্যেক প্রত্যেককে। নায়কেই যে পা ধোয় তাহা নহে : নায়কে মঙ্গল ঘট বহিয়া আনেন ও অন্যান্য যাহারা দেবতা গণের ব্যবহার্য জিনিস আনেন তাহাদেরও পা ধোয়া হয়।” (পৃ. ৭)

বিয়ে ও গায়ে হলুদ

এরপর মঙ্গলচন্দ্র বলেছেন বিয়ে ও গায়ে হলুদের কথা—“আমাদের মধ্যে কাহারও ছেলে বা মেয়ের বিবাহ কালীন গাত্র হরিদ্রার দিন নায়কে মারাংবুরু জাহের এরা ও ধরমের নামে তেল হলুদ পূজা করেন। পূজার সময় মারাং বুরুর নামে পূজার হলুদের কিছু অংশ ও আরও কিছু হলুদ বরকে

মাখান হয়। সেইরূপ কন্যার বাড়িতেও জাহের এরার পূজার অবশিষ্টাংশ আরও কিছু হলুদ সহ মিশাইয়া কন্যাকে মাখাইবার জন্য ও লইয়া আসা হয়।” (পৃ. ৮)

শিশু জন্ম ও ছাঁটিয়ার

শিশুর জন্মের পর যে সব ক্রিয়াকর্ম করা হয় তার বর্ণনা— “কাহারও ছেলে বা মেয়ে হইলে পাঁচদিন পোয়াতি ন্নান করার পর নয়দিনে চুল নামাবার পর ছেলে বা মেয়েকে ছাঁটিয়ার করি। সেই অনুষ্ঠানে নূতন হাঁড়িতে দুইটি হাঁড়িয়া রাখা হয়। হাঁড়িয়া পাকিলে আমরা ছেলে বা মেয়েকে ছাঁটিয়ার করি। ছাঁটিয়ারের দিন সকালে নায়কেকে বলিয়া রাখি যেন তিনি কাপড় চোপড় পরিষ্কার করিয়া শুদ্ধ শান্তি হিসাবে থাকেন। তারপর কটালকে বলা হয় যাহাতে গ্রামের প্রত্যেক বাড়িতে ডাকিয়া দেয় যেন প্রত্যেক বাড়ির স্ত্রী-পুরুষ ছাঁটিয়ার উপলক্ষে পূর্বোক্ত গৃহস্থের বাড়িতে সমবেত হয়। সন্ধ্যার সময় গ্রামের সকলে সমবেত হইলে সেই নূতন হাঁড়ির হাঁড়িয়া পাঁচজনের সামনে বাহির করা হয়। তখন পঞ্চজনার নিযুক্ত লোক সেই হাঁড়িয়া দুইটিতে জ্বল দেয়।

নায়কে হাত-পা ধুইয়া উঠানে পূজা করিতে বসে। প্রথমে ধর্মের নামে জ্বল পূজা করে। গ্রামের প্রবীণেরা সেই সময় ধর্মের কাছে প্রার্থনা করে। ‘হে ধর্ম তুমি চার যুগ সত্য। এই ছেলেটির ছাঁটিয়ার উপলক্ষে তোমাকে পরিষ্কার জ্বল দিতেছি। তুমি ছেলেটিকে বিপদ আপদ হইতে রক্ষা করিয়া বড় কর। এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ইহার সাথে থাকিয়া ইহার মঙ্গল কর।

তারপর মারাং বুরুর নামে হাঁড়িয়া পূজা করা হয়। তখনও গ্রামের প্রবীণেরা মারাং বুরুর কাছে প্রার্থনা জানায় যেন— ছেলেটির সাথে সব সময় বিপদ আপদ হইতে ছেলেটিকে রক্ষা করিয়া বাড়াইয়া তুলে। ইহার পর পুরুখুলের নামে হাঁড়িয়া পূজা করা হয়। ইনি আমাদের পূর্বপুরুষ। তাঁহার কাছেও ছেলেটির কল্যাণ কামনা করিয়া প্রার্থনা করা হয়। (পৃ. ১০)।

জাহের এরার ছয় নাম

জাহের এরার ছয়টি নাম সম্বন্ধে মঙ্গলচন্দ্র জানিয়েছেন যে— “এই শরীরে আমাদের জীবন ছয়টি কপাটে আবদ্ধ আছে। প্রত্যেক কপাটের নিকট জাহের এরা এক এক নামে উহা বন্ধ করেন ও খুলেন। জাহের এবার ঐ ছয়টি নাম জানিলে এবং ইহাদিকে স্তবে সম্বলিত করিতে পারিলেই আত্মদর্শন হয়।” (পৃ. ১১)। এরপর লেখক বলেছেন— “দেহের অভ্যন্তরে জাহের এরার ছয়টি রূপ যাহারা ছয়টি কপাটের অধিকারী। ঐ ছয়টি নাম— ছিতা, কাপুরা, দানগী, পুঁড়গী, হিশি, ডুমনি। ইহারাি কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্ঘ্যের মূলাধার।” (পৃ. ১২) মনে হয় তুরুইক বলে যে ছয় নারী দেবতার পূজা দেওয়া হয় এগুলি তাদের নাম।

এরঃ সিম ও মাহা মড়ে

বিভিন্ন পূজা পরবের বিবরণ দিতে গিয়ে বলা হয়েছে— “আমরা বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে ধান্য বপন করি। এই সময় বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমার দিন এরঃ সিম নামে জাহের স্থানে শ্রীভগবানের উপাসনা করি। আবার গ্রামে কলেরা বসন্ত হইলেও আমরা মানসিক বা মানত করি। তাহা হইলে ঐ এরঃ শিমের সাথে মাহা মড়ে নামক সার্বজনীন মাহা মড়ে উৎসব ও পূজা করি। এরঃ শিম পূজার সময় আমরা মারাং বুরু, জাহের এরা ও ধরমের কাছে প্রার্থনা জানাই যে আমরা ধান্য বুনিতৈছি; যাহাতে ধান্য ভাল জন্মে ও সুবৃষ্টি হয়।” আবার প্রার্থনা জানাই— “আমরা অসুখের সময় আমাদের

কল্যাণের জন্য তোমাদের কাছে মানত করিয়াছিলাম তাহা পরিশোধ করিতেছি”। আবার প্রার্থনা করি—“তোমরা আমাদের কল্যাণ কর” ইত্যাদি। (পৃ. ১৭)।

আবগে পূজা

এরপর বলা হয়েছে ‘আবগে পূজা’ সম্বন্ধে— “বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমার দিন ‘আবগে নামক বংশের দেবতার উপাসনা করি। এই ‘আবগে’ বিভিন্ন বংশের লোকেরা নিজ নিজ জমিতে যেখানে উই চিপি থাকে সেখানে পূজা করে। এই পূজার দেবতা যুদ্ধের দেবতা। তিনি শস্যের শ্রীবৃদ্ধি করেন ও রোগব্যাদি দূর করেন।

এই পূজাতে মেয়েরা পূজার স্থলে যায় না বা প্রসাদ পায় না। এই পূজা বড় অংশের যিনি বড়, তিনিই পূজায় বসিতে পারেন। পূজাতে শিং ওয়ালা ভেড়া ও খাঁটি লাল রং-এর মোরগ বলি দেওয়া হয়। যিনি পূজায় বসেন তিনি আগের দিন হইতে ব্রত করেন ও হবিষ্যাম খান। বাইরে ঘোরাঘুরি করেন না। বলি ঠিক সূর্যোদয়ের সময় দেওয়া হয়। (পৃ. ১৮)।

লাঁগড়ে

আখড়ায় লাঁগড়ে নাচের কথায় বলা হয়েছে— “এরঃ সিম পূজার পর আখড় মাস পড়ে। তখন ধান্য রোপণ উপলক্ষে আবার জাহের স্থানে পূজা দেওয়া হয়। পূজার সময় গ্রাম বাসীগণ সমবেতভাবে প্রার্থনা জানায় যাহাতে সুবৃষ্টি হয়। এবং প্রত্যেক দিন সন্ধ্যার সময় স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে গ্রামের ধরম আখড়াতে লাঁগড়ে নাচ করে। এই নাচে স্ত্রী ভগবানের লীলার গান হয় এবং প্রত্যেক গ্রামেই অনুষ্ঠিত হয়। গান সাধারণত বাংলায় ও বাংলা মিশ্রিত সাঁওতালি ভাষায় করা হয়। প্রথমে আখড়া ছঁচ গোবর দ্বারা পেন দেওয়া হয়। তারপর আখড়া বন্দনা করা হয়। তারপর ছিতা, কাপুড়া, দানগী, পুঁড়গী, হিসি ও ডুমনি এই ছয়টি দেবীকে আহ্বান করা হয়।” (পৃ. ১৮)

ইরিয়াড় সিম

ইরিয়াড় সিম পূজা সম্বন্ধে বলা হয়েছে— “যাহাতে ধানগাছে রোগ না লাগে বা পোকের উপদ্রব না হয় এ জন্য শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমায় ইড়িয়াড় শিম’ বা হালি পূজা জাহের স্থানে অনুষ্ঠিত হয়। এবং রাখী পূর্ণিমার দিন আখড়াতে করম পূজা আরম্ভ হয়। করম পূজায় সাধারণত দুইটি করম গাছের ডাল কিশোর বালককে দিয়া পোঁতা হয়। উহাতে তিনখৈই সূতা ঘুরাইয়া দেওয়া হয়। করম পূজাতে শালুক ফুল, তেলাং জাং অর্থাৎ ধানফুল ও চাঁপাফুল লাগে। করম পূজার শুরু কার্মু ধার্মু অতীতে দুঃখ-কষ্ট মোচন করার জন্য এই পূজা প্রবর্তন করিয়াছিল। এই রকম পূজা সান্ত্বিক পূজা। উহাতে দুধ, ধূনা, ঘৃত ও গুড় ইত্যাদি লাগে। আসলে করম পূজা মর্ত্যে লক্ষ্মীর পূজা। এরপর ভাদ্রমাসের একাদশীর দিনেও করম পূজা হয়। আমরা রাখী পূর্ণিমাকে ‘গমা পূর্ণিমা’ ও উত্থান একাদশীকে ‘আদাগাছি’ বলি।” (পৃ. ২০)।

আউস ধান কাটা

এরপর বলা হয়েছে আউস ধান কাটার অনুষ্ঠানের কথা— “ভাদ্র মাসে সাধারণত আউস ধান পাকে। আউস ধান্য বলিতে আমরা চালিধান বলি। উহা ভাদ্রমাসে পাকে। এই ধান পাকিলে নায়কে

জমি হইতে তিন মুঠা কাটিয়া আনে। কাটিবার আগে জমিতে তিন টিকা ধূলা ও সিঁদুর নামাইয়া দিয়া মারাং কুরু ও ধরমের নামমে তেল সিঁদুর নামাইয়া ধান গাছে সিঁদুর দিয়া কাটিয়া মাথায় করিয়া বহিয়া আনে। উহা জাহের স্থানে মারাং বুরু, জাহের এরা ও ধরমের নামে উৎসর্গ করে। পরে অবশিষ্ট ধান ঋড় হইতে বাহির করিয়া নুতন খলাতে (মাটি পাত্রে) ভাজিয়া চিড়া তৈয়ারি করে। তারপর সেই চিড়া মারাং বুরু ও পিতৃপুরুষের নামে ভোগদেয়। চালি ধান পাকিলে গ্রামের কেহ ইচ্ছামত কাটিতে পারিব না, যতক্ষণ না নায়কে পূজা করে।” (পৃ. ২০)

ধানবোনা

ধান কাটার মতো, ধান বোনারও রীতি নিয়ম আছে। সে সম্বন্ধে বলা হয়েছে — “ধান বোনার জন্য একটি ছোট বাঁশের ঠেকা (ঝুড়ি) যাহাকে আমরা টুমকি বলি উহা ব্যবহার করা হয়। বোনার সময় সেই টুমকির গায়ে পাঁচ জায়গায় মেথি গুঁড়া তারপর আতপ চালের গুঁড়ি ও পরে সিঁদুর দিতে হয়। ঐ টুমকিতে ধান লইয়া গিয়া পূর্বমুখে জোরপায়ে দাঁড়াইয়া ঐ টুমকি সহ ধান পূর্ব, উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে গোড় (প্রণাম) করিয়া আবার পূর্বমুখে ঘুরিয়া ঈশান কোন হইতে ধান্য বুনিতে আরম্ভ করিবে। ধান মাটি চাপা দিবার সময়ও ঈশান কোণ হইতে লাঙ্গল আরম্ভ করা হইবে। ধান্য প্রথম বোনার দিন আমরা তিতা ভাত অর্থাৎ নিমপাতা ভাজিয়া গুঁড়া করিয়া উহা আতপ চালের সহিত ভাত করিয়া মারাং বুরু ও পূর্বপুরুষদের নামে উৎসর্গ করিয়া আমরা ভোজন করি। গ্রামের দুই তিন ঘরে সেই তিতা অন্ন প্রসাদ স্বরূপ বলি করা হইবে। সেইদিন সাধারণত মাছ, মাংস রান্না করিবে না বা খাইবে না।” (পৃ. ২১)

দাঁসায়

দাঁসায় পরবের কথায় বলা হয়েছে— “দুর্গা সপ্তমীর দিন হইতে শিষ্যগণ সহ প্রাচীন তান্ত্রিক গুরুগণ যাহারা দেবতা রূপে বিদ্যমান তাহাদের উদ্দেশ্য করিয়া প্রত্যেক গ্রামে দাঁসায় নাচ করেন। প্রত্যেক গৃহস্থ তাঁহাদিগকে কুলায় করিয়া ধান্য ও কিছু চাউল দিবে। সেজন্য তাহারা একটি খুব বড় বাঁশের ঠেকা (ঝুড়ি) ও একটি ঘটি সঙ্গে লইয়া যাইবে। ঐ ঠেকাতে তেল সিঁদুর লাগান থাকিবে। এবং প্রত্যেকটি ভূয়াঃ এ তেল সিঁদুর লাগান থাকিবে। ঐ ঠেকাকে দাঁসায় ঠেকা বলে ও ঐ ঘটিটিকে লাগা লটা বলে। প্রত্যেক বাড়িতে নাচ করার সময় যদি দেখে সেখানে তুলসি মঞ্চ আছে তাহা হইলে সেখানে গুরুগণের উদ্দেশ্যে তিন টিকা সিঁদুর ঐ মঞ্চে লাগাইয়া গোড় (প্রণাম) করিবে।

এই দাঁসায় নাচে সাঁওতাল জাতির পুরুষেরা স্ত্রীলোকের মত সজ্জিত হয়। পরণের ধরন-সামনেও পিছনে দুই দিকেই কোচা থাকিবে। মনে হয়, উহা সেকালের যুদ্ধের সাজ। কিন্তু মাথায় ময়ূরের পালক। কাঁধে গলায় ও হাতে স্ত্রীলোকের গহনা পরিয়া পায়ে নুপুর ও কোমরে উরমাল বা ঘাগরা বাঁধে। যন্ত্র ভূয়াং, যাহা লাউয়ের খোলার খোল দিয়া তৈয়ারি।” (পৃ. ২০-১৯)।

গট শিম

এরপর কার্তিক মাসে গট শিম পূজা— “গরু মহিষের কল্যাণের জন্য জাহের স্থানে গটশিম পূজা করা হয় এবং অমাবস্যার দিন রাতে প্রত্যেক বংশের লোক গরুমহিষের কল্যাণের জন্য গোয়াল ঘরে শূয়র, কাল মুরগি ও একটি সাদা মোরগ বলি দেয়। এই পূজাতে দুইটি ঘূতের পলিতা জ্বালা

হয় ও ঘূতের পিষ্টক উৎসর্গ করা হয়। এবং পূজার খঁড়ে (বেদীতে) পবিত্র ভাবে রাখা হাঁড়িয়া পূজা দেওয়া হয়।

হাঁড়িয়া

এই হাঁড়িয়া রাখার কঠোর নিয়ম আছে। যিনি পূজা করেন তাহার স্ত্রী ব্রত করিয়া কাপড় কাচিয়া ঘর-দুয়ার ছঁচ-ছড়া (গোবর লেপন ও গোবর জল দিয়া পরিস্কার করা) দিয়া নানাদি সারিয়া কাচা কাপড় পরিয়া উদুখলে আতপ চাউল কুটিয়া ছঁচ ছড়া দেওয়া চুম্বিতে একটি ঘটের মত নিখুঁত হাঁড়িতে হাঁড়িয়ার জন্য ভাত রান্না করিয়া তাহা নূতন চাটাইয়ে বা নূতন কুলাতে ঠাণ্ডা করিয়া উহাতে বাধর মাখাইবে। তাহার পর নূতন বেটনায় (খড়ের তৈয়ারি বিনুনি) রাখিয়া ঘরের এককোণে পবিত্র স্থানে রাখিবে, যেন কোন প্রকারে উহা অপবিত্র না হয়। এই হাঁড়িয়া শুকর, মুরগি বলির সময় খঁড়ে (বেদীতে) ঢালিয়া দিয়া বলি দিতে হয়। পূজার সময় পাশাপাশি দুইটি খঁড় করিতে হয়। দুইটি খঁড়েই হাঁড়িয়া ঢালিয়া দেওয়া হইবে। পূজার সময় দুইটি ঘূতে ভিজান পলিতা জ্বালা হইবে ও তিনটি ঘূতের পিঠা কিংবা পাঁচটি পিঠা লাইন করিয়া সাজাইয়া রাখা হইবে বামপার্শ্বের খঁড়ে শুকর বা কাল মুরগি ও ডাইনের খঁড়ে সাদা মোরগ বলি দেওয়া হইবে। দেবতা মারাং বুরু ও জাহের এরা। অবশ্য জাহের এরার নাম অনুচ্চারিত। পূজাতে মেয়ে জামাই, ভগ্নী, ভগ্নীপতি ও ভাগ্না-ভাগ্নী প্রভৃতিকে নিমন্ত্রণ করিতে হয়। অবশ্য এই পূজার সময় আমাদের পিতৃ পুরুষদের নামেও মোরগ, মুরগি, ভেড়া, ছাগল প্রভৃতি পূজা দেওয়া হয়। পূজার শেষে শুকর মুরগি যেগুলি দেবতাদের নামে পূজা দেওয়া হইবে তাহাদের পুনর্জন্মের জন্য কানের ডগা, জিভের ডগা, জলনালি, চোয়ালের ডগা বা চৌঁটের ডগা ও বন খুরের একটু একটু অংশ পূজাস্থলে পুতিয়া দেওয়া হইবে। শুকর ও কাল মুরগির মাংস সকলেই খায়। কিন্তু সাদা মোরগের মাংস মেয়েদিগকে দেওয়া হইবে না। সেদিন নূতন হাঁড়িতে ভাত রান্না ও নূতন খলাতে (মাটির পাত্র) মাংস রান্না করিয়া মারাং বুরু ও পিতৃপুরুষের নামে ভোগ বা প্রসাদ দেওয়া হইবে। রাত্রে পূজা হয়। দেবতাদের নামে বলি দেওয়া শুকর বা মুরগির মাংস রাত্রই খাইয়া ফেলিতে হইবে। পরদিন পর্যন্ত রাখা চলিবে না। তবে পিতৃপুরুষদের নামে উৎসর্গীকৃত ছাগল বা মোরগের মাংস পরদিন নাগাদ খাওয়া চলিবে।” (পৃ. ২৫-২৬)।

যাঁথাল

আমন ধান কাটার সময়কার পূজা সম্বন্ধে বলা হয়েছে— “এদিকে গ্রামবাসীগণ সকলে মিলিয়া আমন ধান কাটার জন্য যাঁথালেও (পূজাস্থানে) শুয়র, কালমুরগি, সাদা মোরগ ও একটি লাল মোরগ বলি দেয়। কারণ আমাদের নিয়ম আছে, আউশ ধান পাকিলে যেমন উহা জাহের স্থানে উৎসর্গ করা হয়, তেমনি আমন ধান পাকিলেও উহা কাটার জন্য যাঁথালে উৎসর্গ পূজা দিবার রীতি আছে।” (পৃ. ২৭)।

শহরায়

কার্তিক মাসকে শহরায় চাঁদো বলা হয়। অমাবস্যাতে যে পূজা হয় তাকেই শহরায় পূজা বলা হয়।

শহরায় মেয়েদের অতি আনন্দের দিন। তাদের আশা এবং হতাশার কথা নিয়ে অনেক শহরায় গান পাওয়া যায়।

করম পূজা

রাস পূর্ণিমার দিন করম পূজা হয়। এই সম্বন্ধে বলা হয়েছে—“এই দিনের করম পূজাতে বলি দেওয়া হয়। আগেই লিখিয়াছি করম পূজা উপলক্ষে মর্ত্যে লক্ষ্মী ও সরস্বতী দুই জনেরই পূজা হয়। লক্ষ্মীর প্রতীক ভেলাং জাং ফুল ও সরস্বতীর প্রতীক শালুক ফুল। তাঁহাদের নামে দুধ ও মিষ্টি এবং দুর্গার নামে বলি দেওয়া হয়। করমপূজাও যজ্ঞ বিশেষ। এখানেও ঘৃত, গুড় ধূনা প্রভৃতি আহুতি দেওয়া হয়। করম পূজার সময় যাহারা গুরু তাঁহারা নিমজ্জিত হন। তাঁহারা পূজার নিয়মকানুন পূজারীদের বলিয়া দেন। করম ঠাকুর জাগ্রত দেবতা।” (পৃ. ৩১)।

এই পূজার অনুষ্ঠান সম্বন্ধে বলা হয়েছে—“করম পূজার দিন সমস্ত রাত্রি জাগিয়া যাহারা ব্রত করেন তাহারা নূতন খালের উপর ঘূতের প্রদীপ জ্বালিয়া দুই হাতে করম ঠাকুরের নামে উৎসর্গ করার মত ধরিয়া রাখেন। প্রাণ প্রতিষ্ঠা, ঘট আনয়ন সমস্তই কিশোরী বাজিকাদের দিয়া করানো হয়। সমস্ত রাত্রি করম কথা হয়। মাটি মিশ্রিত ধানের গোলায় হাতি, ঘোড়া, মহিষ, গরু, ছাগল, ভেড়া, মাছ, কুমীর, কচ্ছপ ও গাছ ইত্যাদি তৈয়ারি করিয়া তাহাদিগের উদ্দেশ্যে যে গান আছে সেই গান গাওয়ার সময় তাহাদের তেল, সিঁদুর ও হলুদ প্রভৃতি দেওয়া হয়। করম কথাতে বহু মূল্যবান উপদেশ আছে। করম ঠাকুরের কাছে হলুদ মাখানো কাপড় দিতে হয় এবং চাঁপাফুল ও কুশ ঘাস অবশ্যই প্রয়োজনীয়।”

আবার রাস পূর্ণিমাতেই ‘আবগে’ ঠাকুরের নামে পূজা করার নিয়ম আছে। আর যাহারা আগেকার অমাবস্যার দিন শহরায় করিতে পারে নাই তাহারা এই পূর্ণিমার দিন শহরায় পূজা করিতে পারে।” (পৃ. ৩১-৩২)

সাঁকরাং

অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—“অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে ধান্য-তোলা ও ঠাকুর আনয়ন ছাড়া অন্য কোন পূজার আয়োজন হয় না। তবে যাহারা রাস পূর্ণিমায় করম পূজা বা আবগে পূজা করিতে পারে না তাহারা অগ্রহায়ণ মাসের বা পৌষ মাসের পূর্ণিমাতে করম পূজা বা আবগে পূজা করিয়া থাকে।” (পৃ. ৩২)।

এরপর বলা হয়েছে পৌষ সংক্রান্তির কথা। ‘পৌষপার্বণ বা পৌষ সংক্রান্তিকে আমরা বলি ‘সাঁকরাং’—সাঁওতাল জাতির বড় আনন্দের দিন। এই সময় যে যেখানেই থাকি না কেন বাড়ি ফিরিবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে। পৌষ পার্বণের আগের দিন ঘরে ঘরে গুরি কুটার (ঠেকির সাহায্যে চালের গুঁড়া প্রস্তুত) ধুম পড়িয়া যায়। এক সপ্তাহের শাবারের মত চাউল, মুড়ি, চিড়া সংগ্রহ করি। কাঠও সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হয়। কারণ মাঘ পূজা না করিয়া কাঠ সংগ্রহ করিতে নাই। সেদিন সাঁওতাল পল্লীতে কত যে শূয়র ও মুরগি খাওয়া হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। গুড়ি কুটার দিন সন্ধ্যা হইতে মাংস ও পিঠা হয়। সেদিন রাত্রে যত ইচ্ছা মাংস ও পিঠা খাওয়া হয়। তাহার সহিত হাঁড়িয়াও আমরা পান করিয়া থাকি। সেই খাওয়া ভোর পর্যন্ত চলে।

পৌষ সংক্রান্তির ভোরের সময় একটি মুরগি ঘরের চৌকাঠে আছড়াইয়া মারিয়া উহার

রক্ত চৌকাঠে লাগাইয়া দেয়। তাহার পর সূর্য উঠিলে ঘর দুয়ার 'ছঁচ ছড়া (গোবর জল) দিয়া পরিষ্কার করার পর স্নানাদি সারে। সেদিন কেহ একা একা স্নান করে না। গ্রামের সকল পুরুষেরা পুরুষের দলে ও মেয়েরা মেয়েদের দলে স্নান করিতে যায়। পুরুষেরা সেদিন স্নানের ঘাটে মোড়লকে তেল মাখানর পর স্নান করিতে নামে। পরে গ্রামবাসীগণ সকলে স্নান করে। তারপর নূতন জামা কাপড় পরিয়া মোড়লকে কাঁধে করিয়া বাড়িতে লইয়া আসে। মেয়েরাও মোড়লানিকে তেল হলুদ মাখায় ও সকলে স্নান সারিয়া নূতন জামা কাপড় পরিয়া বাড়িতে আসে। বাড়িতে আসিয়া নূতন কলসি দিয়া জল আনে ও বাড়িতে নূতন খলাতে (বড় মাটির পাত্র) শুড় পিঠা তৈয়ারি করে। চিড়া, শুড় দিয়া ভিজাইয়া বাড়িতে বাড়িতে ঐ পিঠা ও চিড়া ঘরের ভিতরে মারাংবুরু ও তিন পুরুষের পিতৃপুরুষের নামে ভোগ দেয় (উৎসর্গ করে)। ঐ সময় একটি নূতন হাঁড়ির হাঁড়িয়াও পূজা করা হয়। তারপর সকলে শুড়, মুড়ি, চিড়া ও পিঠা খায়। পৌষ সংক্রান্তির দিন প্রচুর মাংস খাওয়া সত্ত্বেও মাছ খাইবার রীতি আছে। সকলের বাড়িতে মাছও রান্না হয়। তারপর নূতন হাঁড়ির ভাত সেই সকালবেলায় তৈয়ারি মুরগি মাংসের ও মাছের ঝোল সহযোগে সকলে খায়। তারপর প্রত্যেকে প্রত্যেকের বাড়িতে নিমজ্জিত হয় ও সকলের বাড়িতেই পান ভোজন চলে।

বেঝা বেঝা

স্নানের ঘাটে মেয়ে পুরুষ সকলে প্রেমের গান গায়। ঐ সময় মনে হইবে পৃথিবীতে দুঃখ বলিয়া কিছু নাই। বৈকাল বেলা গ্রামের জগমাঝি কল্যাণ গাছ না হয় জাড়া গাছের (রেড়ির গাছের) বেঝা গাড়ে (চাঁদমারির লক্ষ্যবস্ত্র মাটিতে পুঁতে)। গ্রামবাসী তীরন্দাজগণ তীর ছোঁড়ার প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। জগমাঝি নানা কৌশল জানে। সে বেঝা গাড়ার সময় তেল সিঁদুর নামায় ও হাঁড়িয়াও পূজা করে। প্রতিযোগিতার কালে তীরন্দাজগণ যাহাতে লক্ষ্যবস্ত্রতে তীর বিদ্ধ না করিতে পারে তাহারও ব্যবস্থা করিয়া রাখে। সেই জন্য ২/৩ বার তীর ছোঁড়ার পর যদি দেখে যে—তীর বিদ্ধ হইতেছে না তখন জগমাঝির কৌশলটি কাটিয়া দিবার ব্যবস্থা করে। বেঝা বিধিবার সময় গ্রামবাসী সকলেই উহা দেখিতে বাহির হয় এবং বনের গানে মাতোয়ারা হইয়া শিকারের বা যুদ্ধের মহড়া দেয়।

বনের গান বা বির সেরেও এমন প্রাণ মাতান প্রাণ জাগান গান যে মনে হয় এই রকম গান আর কোন জাতির নাই। গানগুলি বীর রস ও করুণ রসে ভরা। যদি স্বামী হারা ও পুত্রকন্যাহারা হতভাগ্য বা হতভাগিনী কেউ থাকে তাহাদের চক্ষু দিয়া জল ঝর-ঝর করিয়া পড়িবে। প্রেমের গানেরও সীমা নাই।” (পৃ. ৩২-৩৪)

তীরন্দাজির অনুষ্ঠান সমাপ্তির কথায় বলা হয়েছে—“আমাদের মেয়েরা আগে কোচা করিয়া কাপড় পড়িত। আবার বাড়ির কেহ শিকারে গেলে বাড়ির লোকেরা কাপড় কাচিত না। মাথায় চিরুনি দিত না। শিকার হইতে ফিরিয়া আসিলে তাহার পা ধোয়াইবে। কাপড় কাচিবে, মাথায় চিরুনি দিবে ও সিঁদুর পরিবে। অপরদিকে বেঝা (চাঁদমারি) বিদ্ধ হইলে যে বিদ্ধ করিবে তাহাকে গ্রামবাসীগণ কাঁধে করিয়া মোড়লের বাড়িতে লইয়া আসিবে। মেয়ে পুরুষ সকলে নাচ গান করিতে করিতে মোড়লের বাড়ি আসিবে। যে তীর লাগাইয়াছে মোড়লানি তাহার পা ধোয়াইয়া দিবে। বেঝা ঘরের মধ্যে রাখা হইবে। সেদিন মোড়ল সকলকে হাঁড়িয়া ও কিছু মুড়ি দিবে। সকলে উহা একমুঠা করিয়া ভাগ করিয়া খাইবে।” (পৃ. ৩৬)।

আখান দিন

তারপর আসছে পৌষ সংক্রান্তির পরের দিনের কথা। “পৌষ সংক্রান্তির পরের দিন মাঘ মাস পড়িবে। সেইদিন চাষী ক্ষেতে প্রথম হল চালনা করিবে। যাহারা বাড়ি তৈয়ারি করিবে তাহারা নূতন বাড়ির বুনিয়াদে কোদালের প্রথম চোট দিবে। গোষ্ঠের গরু গুলিকে বংশের চিহ্ন স্বরূপ লোহার দণ্ড গরম করিয়া দাগ দিবে। আমাদের সাঁওতাল জাতির প্রত্যেক বংশের বিভিন্ন চিহ্ন আছে। সেই চিহ্ন অনুযায়ী গরুর পাছাতে (পশ্চাৎ অংশে) দাগ দিবে। এই চিহ্নগুলি বিভিন্ন ধরনের। কতকগুলি গোলাকার বৃত্তের মত, কতকগুলি নারায়ণের যষ্টির মত, কতকগুলি সমান্তরাল ও কতকগুলি স্বস্তিকের মত। কিন্তু ডগাটা বাঁকান নহে। কতকগুলি পাটকাটা ঢেরার মত এইরকম নানা ধরনের। (ছবি দেখুন)।”

গোষ্ঠ	চিহ্ন	বিবরণ
কিশ্কু	—	লাঠি
হাঁসদা	○	হাঁসদালি
মদরমদ	≡	লম্বা মই
সরেন	○	গোল হাঁসদালি
হেমরম	+	আঁকশি
মাশিড	→	তীর
বাস্ক	↘	লাঙ্গল
টুডু	⊕	বৃত্তের মধ্যে ঢেরা
বেসরা	f	ঢেরা

মাঘ মাসের প্রথম দিনটিকে ‘আখান দিন’ বলি। সেইদিন তান্ত্রিক গুরুগণ তাঁহাদের নিজ নিজ আখড়ায় তাহাদের দেবগুরুগণের উদ্দেশ্যে পূজা দেন। বিশেষত তাঁহারা যে সমস্ত জড়িবাটের ঔষধ জানেন তাহা দিয়া প্রায়ই রোগির চিকিৎসা করেন। যাঁহারা ভাল হন তাঁহারা দেবতাগণের মানসিক (ব্রতের ঋণ) সেইদিন শোধ করেন।” (পৃ. ৩৭)।

মাঘ মাসের জন্য নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানের কথা সম্বন্ধে বলা হয়েছে— “গ্রামবাসীগণ সেই জাহের স্থানে বনের কাষ্ঠ ও পাতা আহরণ করিতে এবং আগামি দিনে সারা বৎসর ধরিয়া নানা কার্যে বনে যাইবে। তান্ত্রিক গুরুগণ বনে বাঘ, সাপ, কাঁটা বা অন্যান্য রকমের যাবতীয় সম্ভাব্য বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য শ্রীভগবান, মারাংবুরু, জাহের এরা ও শিঞ বঁগার নামের ভিতর দিয়া পূজা

দেন। ইহা ভিন্ন জাহের স্থানের প্রত্যেক পূজাতেই শ্রীভগবানের পূজার সাথে প্রত্যেক গ্রামের চতুর্দিকে অবস্থানকারী দেবতাগণেরও পূজা দেওয়া হয়। এই সকল দেবতার নাম নায়কে ব্যতীত অন্য কেহ জানে না। ইহারাই হুঙ্গুং খুনটুং দেবতা। ইহারও গ্রামের শান্তি রক্ষার দেবতা। আবার ইহারাই অসংস্কৃষ্ট হইলে গ্রামের ক্ষতিও করেন। ইহা ব্যতীত প্রত্যেক পূজাতে দেশের চতুর্দিকে অবস্থানকারী দেবতাদেরও পূজা দেওয়া হয়। ইহারাই সময় সময় মানুষের বেশে বিচরণ করেন।” (পৃ. ৩৮)।

মাঘী পূজা

মাঘী পূজার দিনের একটি ছোট অনুষ্ঠানের কথাও আছে— “গ্রামের কোটাল মাঘী পূজার দিন কিশোর বালকদের লইয়া বন হইতে কচি শালগাছ, পশারি ঝাটি ও বনের কুশ সংগ্রহ করিয়া উহা গাড়ির মত টানিয়া আনে এবং গ্রামের বিশিষ্ট লোকের ঘর ছাইয়া দেয়। তাহার পর নায়কে জাহের স্থান হইতে আসিয়া নিজের ঘরের চালে জল ঢালিয়া দিয়া ঘরে প্রবেশ করে। মাঘ মাসে মাঘী পূজার দিন প্রয়োজন হইলে কোটাল ও জগমাঝি পরিবর্তন করা হয়।” (পৃ. ৩৮)। মোটামুটি ভাবে এই হচ্ছে মঙ্গলচন্দ্র সরনের সাঁওতালদের পরব, পূজার্চনা, আচার পালন এবং দেবলোক সম্পর্কে বিবরণ। এই বিবরণে ওঝা বা জ্ঞানগুরু বা জ্ঞানসখাদের সম্বন্ধে তান্ত্রিক গুরু বিশেষণটি প্রযুক্ত হয়েছে। আর অপদেবতা, উপদেবতাদের নাম বড়ো একটা উল্লেখ করা হয়নি কিন্তু তাদের ক্ষতিকর ভূমিকার কথা বলা হয়েছে এবং বলির বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

পাঁচ : পারলৌকিক আচার অনুষ্ঠান

মৃত্যু ঘটলে

মঙ্গলচন্দ্র জন্মের সঙ্গে সম্পর্কিত আচার অনুষ্ঠানগুলি সম্পর্কে যেমন আলোচনা করেছেন তেমনি মৃত্যুর সঙ্গে সম্পর্কিত আচার অনুষ্ঠানগুলি সম্বন্ধে সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। এগুলি উদ্ধৃতিযোগ্য হলেও প্রবন্ধের কলেবর বেড়ে যাবে বলে এখানে সেগুলি খুবই সংক্ষেপে তুলে ধরা হবে। (১) কোনো বাড়িতে কেউ মারা গেলে কোটাল সব বাড়িতে সে খবর দিয়ে সকলকে মৃতের বাড়িতে জড়ো হতে বলবে। (২) তারপর সবাই বাড়ির লোকের সঙ্গে সংকার নিয়ে পরামর্শ করবে। যক্ষ্মা রোগে মৃত্যু হলে মৃতদেহ দূরে কোথাও ফেলে দেওয়া হয়। অন্য অসুখে মরলে দাফ করা হয়। তখন কাঠ যোগাড় করতে হয়। তবে খুব গরিব লোক কাঠ যোগাড় করতে না পারলে মৃতদেহ মাটিতে পুতে দেওয়া হয়। (৩) মেয়েরা বাটা হলুদ নিয়ে মৃতের বাড়িতে আসবেন। প্রথমে বাড়ির মেয়েরা হলুদ মাখাবেন তারপর বংশের মেয়েরা। অন্য মেয়েদের আনা হলুদ বাড়ির মেয়েরাই মাখাবে। অন্য মেয়েরা মড়াকে ছোঁবে না। (৪) হলুদ মাখানোর পর বাড়ির মেয়েরা স্ত্রী থাকলে স্ত্রী, মৃতের হাত পা মুখ খুইয়ে কঁপালে সিঁদুর পরাবে এবং সাদা থান দিয়ে মৃতদেহ মুড়ে দেবে। (৫) আত্মীয় স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী খাট সহ মৃতদেহ বাইরে আনবে। হলুদ মাখানোর সময় প্রত্যেক মেয়েই মড়ার কাপড়ে পরসা বেঁধে দেবে। (৬) শ্মশান যাত্রার সময় সঙ্গে নিতে হবে আশুতনু নেবানোর জন্য কপসি, ঘর চালা থেকে কিছু খড়, একটি বাটি, এককুলা খই এবং বুঁদিতে করে আশুতনু। (৭) গ্রামের শেষে একটি জায়গায় (সাঁওতালিতে বলে দবাটি) পৌঁছে খাট সহ মৃতদেহ তিনবার ঘুরিয়ে কয়েক মিনিটের জন্য নামিয়ে রাখা হবে। (৮) তারপর সোজা শ্মশানে গিয়ে চিতার চতুর্দিকে আবার তিনবার ঘুরিয়ে খাটটি মাটিতে রাখা হবে।

সংকার

(৯) মৃতদেহ চক্রাকারে তিনবার ঘোরালে সেখানে দেবতার আসনে এই বিশ্বাসে এবং অশরীরী আত্মাটি তাদের সঙ্গলাভে তৃপ্ত হয় এবং এই সেই সুযোগে দেহটি পুতে ফেলা কিংবা দাহ করা হয়। (১০) দাহের জন্য প্রত্যেক বাড়ি থেকেই কাঠ দিতে হয়। চিতা উত্তর-দক্ষিণ মুখে সাজিয়ে মৃতের মাথা দক্ষিণ মুখে রাখা হয়। মৃতের পুত্র তার পা ধুইয়ে দেবে। গ্রামের লোকেরা কোমরের দড়ি এবং কাপড়ে বান্ধা পয়সাগুলো খুলে নেবে। পুত্র মুখাঙ্গি করবে। চিতায় আগুন দেওয়ার আগে একটি মুরগি চিতার খুঁটিতে জীবন্ত বুলিয়ে দেওয়া হয়। চিতার সঙ্গে মুরগিটিও পুড়ে ছাই হবে। (১১) শবযাত্রী মেয়েরা গ্রামের বাইরে যায় না। মৃতের স্ত্রী তার লোহার খাড়ু মৃতের খাটের সঙ্গে বেঁধে দেয়। শবযাত্রী মেয়েরা একসঙ্গে পুকুরে চান করে গ্রামের প্রান্তে খলাতে আগুন নিয়ে তাতে খৈল ও কার্পাস বীজ ফেলে দেয়। তা থেকে ধোঁয়া উঠলে সেই ধোঁয়া শরীরে লাগিয়ে যে যার বাড়িতে ফিরে যায়। (১২) পুরুষেরা মড়া পুড়িয়ে কপালের হাড়টি (সাঁওতালিতে বলে জ্ঞাং বাহা, মানে হাড়ের ফুল) সংগ্রহ করে একটি ভাঁড়ে সেটি যত্ন করে রাখে। ভাঁড়ের মুখে একটি খলা দিয়ে আটকে দেয়। খলার মাঝখানে ফুটো থাকে। হলুদ দিয়ে খলার চাকতিটি ভাঁড়ের সঙ্গে খুব ভালো করে এঁটে দিতে হয়। তারপর সুবিধামতো একটি গাছের গোড়ায় শিকড়ের ফাঁকে গর্ত করে, ভাঁড়টি পুতে দেওয়া হয়।

সংকারের পরের অনুষ্ঠান

(১৩) শব-যাত্রীরা এক সঙ্গে স্নান করে গ্রাম প্রান্তে (দবাটিতে) খৈল ও কার্পাস বীজের ধোঁয়া গায়ে লাগিয়ে যে যার বাড়ি যায়। ভিজ্ঞে কাপড় ছেঁড়ে শুকনো কাপড় পরে আবার মৃতের বাড়িতে ফিরে আসে। (১৪) পুকুর থেকে চুনো মাছ ধরে আনা হয়। একটি মুরগি মারা হয়। তারপর মুরগির মাংস একসঙ্গে 'আমা' (মানে আলুনি) রান্না করা হয় এবং হাঁড়িতে ভাত রান্না করা হয়। একটি খালি পাতায় ভাত এবং একখলা মাছ মাংস রান্না করা তরকারি একটি কুলোতে সাজিয়ে দবাটিতে নিয়ে যায় মৃতের পুত্র বা ভাই। সেখানে ঘরের চালের খড় ও চারটি কাঠি দিয়ে একটি ছোটো ঘর তৈরি করা হয়। সেই ঘরের নীচে পাতার উপর ভাত তরকারি মাছ মাংস মৃত ব্যক্তির নামে উৎসর্গ করা হয়। তারপর সেসব আবার কুলায় উঠিয়ে বাড়িতে এনে গোয়ালের এক জায়গায় বা এক কোণে টাঙ্গিয়ে রাখতে হয়। (১৫) দবাটি থেকে ফেরবার সময় গ্রামের একজন আগে আগে ঘটি থেকে একটু একটু জল ঢালতে ঢালতে যাবে। এবং মুরগির ডানার ডগাটি পালক সমেত দড়িতে বেঁধে আগে আগে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। এই অনুষ্ঠানটিকে বলা হয় 'উমুল শীর' মানে মৃত ব্যক্তির ছায়াকে ঘরে আনা হল। মৃত ব্যক্তির অশরীরী আত্মার খাদ্য বস্তুর প্রতি আকর্ষণ থেকে যায় এই বিশ্বাসে মাছ মাংস ভাত তরকারি দেখিয়ে তাকে ঘরে ফেরানো হল।

(১৬) গ্রামের পাঁচজন মৃতের আপনজনকে ঘরের ছাঁচার নিচে বসাবে। জামাই সম্পর্কীয় কেউ তাদের মাথায় কপালের কাছে মুরগির ডানার ডগা দিয়ে তেল-বুলিয়ে দেবে। তারপর করমের পাতায় এক মুঠো ভাত ও সেই আলুনি মাছ মাংস তরকারি তাদের খেত দেবে। গ্রামবাসীরা তাদের সান্থনা দিয়ে বলবে দুঃখে পড়ে-তোমরা খাওয়া ছেড়ো না। ভাত তরকারি তিনবার মুখের কাছে নিয়েও ফেলে দেবে, খাবে না। তারপর সেসব উঠিয়ে নিয়ে ফেলে দেবে। তারপর শাল পাতায় (তিনটি) আবার ভাত ইত্যাদি দেওয়া হবে এবং গ্রামের পাঁচজন আবার তাদের সান্থনা দিয়ে

খাওয়া দাওয়া করতে বলবে। তখন আপজনেরা সেই ভাত তরকারি ইত্যাদি খাবে। ওদের খাওয়া শেষ হলে পাঁচজন নিজেদের বাড়িতে চলে যাবে। কাঠুরেকে পয়সা দেওয়া হবে। সে তা দিয়ে যেমন ইচ্ছে পান ভোজন করবে। কিন্তু নায়কে বা গৃহ দেবতার পূজারীরা অশৌচের বাড়ির পয়সা কড়ি ও শাদ্যবস্তু নেবে না।

তেল নাহান

(১৭) এরপর আদ্য শ্রাদ্ধের দিন ধার্য করা হয়। আদ্য শ্রাদ্ধের দিন গ্রামবাসী ও আত্মীয়স্বজন এসে গেলে গ্রামের একজনকে নাপিত ধরা হয়। সবাই নাপিত হয় না। যাদের অশৌচ জিনিস নিতে বাধা নেই তারাই নাপিতের কাজ করে। সে সকলের চুলদাড়ি কামায়। মৃতের পুত্র বা ভাই যে শ্রাদ্ধ করবে সে সকাল থেকেই উপোস করে থাকে। তার চুল দাড়ি ঘরে কামানো হয় না। দুটি দনাতে (মানে পাতা দিয়ে তৈরি বাটি) তেল ও দুটি দনাতে খৈল, তিনটি শালপাতা ও তিনটি দাঁতন নিয়ে পুকুরের ঘাটে যাওয়া হয়।

(১৮) যে শ্রাদ্ধ করবে নাপিত তার মাথা মুড়িয়ে দিলে সে জলের ধারে শালপাতা তিনটি বিছিয়ে এক একটিতে একটি করে দাঁতন এবং খৈল মাটি মিশিয়ে রাখবে; তারপর ডানদিকের পাতার উপর খৈল মাটি রেখে মারাং বুরুর উদ্দেশ্যে নিবেদন করবে। ডাইনের দাঁতনটিও তার সঙ্গে থাকবে। এক দনা তেল এবং একদনা খৈল মাটি গ্রামবাসীদের জন্য নেওয়া হয়, অপর গুলি মৃতব্যক্তির আত্মীয় স্বজন ও দেবতাদের জন্য।

(১৯) গ্রামবাসীরা মারাংবুরুকে প্রার্থনা জানাবে— আজ অমুককে তেল নাহান করছি তুমিও তার সঙ্গে স্নান কর; ডাইনের দাঁতনটি ধরে বলবে—মারাং বুরু তুমিও এর সঙ্গে মুখ ধোও। তারপর পুরু ধুলের উদ্দেশ্যেও খৈল, মাটি, দাঁতন উৎসর্গ করে তাকেও স্নান করতে ও মুখ ধুতে বলা হবে। তারপর তৃতীয় পাতার খৈলমাটি ও দাঁতন মৃতলোকটিকে উৎসর্গ করে বলা হবে— অনেকদিন স্নান করোনি, মুখ ধোও নি আজ তোমাকে তেল নাহান করছি, তুমি মুখ ধোও, স্নান করো।

(২০) মারাং বুরু, পুরুধূল ও মৃত ব্যক্তির নামে খৈল, মাটি, দাঁতন উৎসর্গ করার পর যে শ্রাদ্ধ করবে সে খৈলমাটি মেখে স্নান করবে এবং নাপিতের হাত ধরে জল থেকে উঠবে। তার সঙ্গে অন্য সকলেও স্নান করে একসঙ্গে ঘরে ফিরবে। পুরুষদের পরে মেয়েরাও একসঙ্গে স্নান করে নেবে। মেয়েদের দলের সঙ্গে পুরুষদের রাস্তার মধ্যে দেখা হওয়া চাই।

ঝুপার নামানো

(২১) এর পর ‘রুম ডাকাও’ বা ‘ঝুপার’ নামাতে হবে। একজন ওঝা এবং তিনজন ঝুপার নামাবার লোকের দরকার হবে। মারাং বুরুর নামে একজন ও মৃতব্যক্তির নামে একজনকে ‘ঝুপার নামানো’ হয়। যাদের ‘ছুত চলন’ এমন লোক মৃত ব্যক্তির ঝুপার নামাবে, যেকেউ নয়।

(২২) যারা ঝুপার হবে তারা পূর্বমুখে বীরাসনে বসবে। তাদের সামনে কুলো রাখা হবে। শ্রাদ্ধকারী ডানদিকের থেকে শুরু করে, তিন মুঠো করে আতপ চাল প্রত্যেকের কুলোতে দেবে। ডাইনের লোকটিকে মারাং বুরুর নামে, মাঝের লোকটি পুরুধুলের নামে এবং বাঁয়ের লোকটিকে মৃতব্যক্তির নামে ঝুপার হতে বলতে হবে।

(২৩) তারপর তিনজনের প্রত্যেকে তাদের সামনে রাখা কুলায় যে আতপ চাল আছে ডান হাতের তালু দিয়ে সেগুলো রগড়াবে এবং ঐ রকম করতে করতে তাদের সারা শরীর রিন্ রিন্ করতে থাকবে। সেই সময় গ্রামবাসীরা বলে উঠবে—হে মারাং বুরু, হে পুরুশুল, হে মৃতলোক আজ তোমাদের তেল নাহান উপলক্ষে ডাকছি, তোমরা এসে আমাদের কাছে কুশলাদি বলে দাও। আতপ চাল রগড়াতে রগড়াতে এক সময় তিনটি লোকই অজ্ঞান হয়ে যাবে এবং ‘ই স্বাহা’ এই মন্ত্র উচ্চারণ করবে। তখন শ্রাদ্ধকারী তিনজনের মাথাতেই দুই হাত লাগিয়ে প্রণাম করবে।

(২৪) যে মৃতের নামে ঝুপার হয়েছে সে প্রথমে জল চাইলে তাকে পাতার দনাতে জল ধরে দেওয়া হবে। সেই জলে হাত দিয়ে সে হাত মুখ ধোবে। তারপর শ্রাদ্ধকারী একটি দনাতে হাঁড়িয়া ধরে দেবে। ঝুপার লোকটি তারপর ভাই, ভাইপো, বউ, স্ত্রী ও আত্মীয় স্বজনের কাছে জল চাইবে। তারপর গ্রামবাসীদের কাছে এবং নদীর ওপারের লোকের কাছে জল চাইবে। প্রত্যেক বারই তার দনাটিতে হাঁড়িয়া ঢালা হবে এবং সে তা পান করবে। এই ভাবে তার জল খাওয়া শেষ হলে তাকে আবার জলের দনাটি দেওয়া হবে এবং তাতে হাত ডুবিয়ে সে হাত মুখ ধুয়ে নেবে।

(২৫) এবার প্রত্যেকের হাতে কুলা থেকে আতপ চাল নিয়ে দেওয়া হবে এবং কুশলাদি জিজ্ঞাসা করা হবে। মারাং বুরু এবং পুরুশুলের ঝুপারকে বলা হবে—আমরা তেল নাহান করছি। মৃত লোকটির যেন কুশল হয় এবং বাড়ির যারা বেঁচে আছে তারা যেন শান্তিতে থাকে, যেন আর অঘটন না ঘটে তা তোমরা দেখবে। মৃতকে বলা হবে তুমি কেন চলে গেলে? যদি সে অসুখে মরে থাকে তাহলে সে সেকথা বলবে। তার যদি গুপ্ত ধন থাকে তাহলে তাও সে বলে দেবে। বিপদের সম্ভাবনা থাকলেও বলে দেবে আর কে দামোদরে অস্থি নিয়ে যাবে তাও বলে দেবে।

(২৬) এইভাবে ঝুপার শেষ হওয়ার আগে তিনজনের হাত থেকে চাল ফেরৎ নেওয়া হবে। শ্রাদ্ধকারী কুলায় উপরে খালি পাতাতে কিছু সিদ্ধ চাল নিয়ে উঠানে বসবে। মৃতের ঘর থেকে একটি মোরগ বা মুরগি বার করে এনে পাতাতে ছড়ানো চালগুলি খেতে দেওয়া হবে। তারপর একটি কুড়ল দিয়ে তার মাথা ছেঁচে তার রক্ত চালের উপর ঝরানো হবে। এইভাবে আত্মীয় স্বজন ও শেষে গ্রামবাসীদের প্রত্যেকের বাড়ি থেকে আনা মুরগি মারা হবে। গ্রামের লোকেরা মৃতের উদ্দেশ্যে বলবে—আজ তোমাকে তেল নাহান করা হচ্ছে। তোমাকে উৎসর্গ করা হল। তুমি খুশি মনে নাও এবং যমরাজ্য হারদুড় রাজ্যের কাছ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিও। বাড়িতে যারা বেঁচে আছে তাদের বিপদ থেকে বাঁচিও আর দেবতাদের সঙ্গে মিশে থাক। —“নায় বাড়ে, নাপায় বাড়ে” — মানে শান্তি, শান্তি। তার পর পাতাটির চতুর্দিকে জল ঘুরিয়ে ঢেলে সবাই একসঙ্গে প্রণাম করলে তেল নাহানের (তৈল স্নান) কাজ তখনকার মত শেষ হয়।

শ্রাদ্ধের ভোজ

(২৭) ঘরের মুরগিটি এবং আরো দু-একটি শ্রাদ্ধকারীকে দেওয়া হবে। অন্য সব মুরগিগুলি গ্রামের পাঁচজন মিলে কাটবে এবং মাংস তিনভাগ করা হবে। এক ভাগ বাড়ির কর্তাকে দেওয়া হবে আত্মীয়, কুটুম্বদের খাওয়ানোর জন্য। দুই ভাগ দেওয়া হবে গ্রামের লোকদের। আর এই মাংসের পরিমাণ অনুযায়ী চালের গুড়ি দেওয়া হবে মৃতের বাড়ি থেকে। এই চালের গুড়ি মাংসের সঙ্গে ‘লেট’ মানে ঘেঁটে নিতে হবে। এই ‘লেট’ গ্রামের লোকেরা পাতা করে নিয়ে সকলে মিলে ভাগ

করে খাবে। তেল নাহানের দিন-গ্রামের পাঁচজন একটি হাঁড়িয়া পাবে। তার সঙ্গে কুলা ভর্তি ভাত, যত লাগে ততটা। খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে তেল নাহানের পর্ব চুকে যায়।

দামোদরে অস্থি বিসর্জন

(২৮) শ্রাব্দ শেষে দামোদর নদীতে বিসর্জনের জন্য মৃতের অস্থি নিয়ে যাওয়া হয়। আগে পুরুলিয়া জেলায় দামোদরের তেলকুপি ঘাটে পায়ে হেঁটে যাওয়া হত অস্থি বিসর্জনের জন্যে। সেই কাজের দায়িত্বে থাকতেন প্রতি পরগণায় একজন ‘আশুয়ান’। তামার পাতে রাজার সনদ থাকত আশুয়ানদের কাছে। রাস্তায় বিপদ ছিল তাই মকর-সংক্রান্তির পরে আখান যাত্রার সময় কিংবা সহরায় পরবের গরু খুটানোর পর একসঙ্গে দুই-তিনশো জন যেতেন। তাদের কাঁধে ঝোলা থাকত পাণ্ডাদের মত। ঝোলার একদিকে চাল অন্যদিকে চিড়ে থাকত।

(২৯) যারা দামোদরে অস্থি বিসর্জনের জন্য যাবে তারা আগে কোটালকে জানাবে। কোটাল ঝোলা সেলাই এবং অন্যান্য প্রস্তুতির জন্যে গ্রামের লোকদের জমায়েৎ করে। যে যাবে সে সকাল থেকে উপোস করবে এবং পূজার আয়োজন করবে। মারাংবুরুর নামে সাদা মোরগ, পুরুখুলের নামে লাল এবং মৃতের জন্যে যেকোন রঙের একটি মোরগ উৎসর্গ করা হবে।

(৩০) চালের গুড়ি দিয়ে একটি খুঁড় বানিয়ে তাতে সিদুর ও মেথি দিয়ে একটি হাঁড়িয়া ঢেলে দেওয়া হবে। তারপর সাদা মোরগ বলি দিয়ে দামোদর যাত্রী পূজো করবে। তারপর পুরুখুলের পূজো হবে। ঐ ভাবেই লাল মোরগটি বলি দিয়ে। মৃত ব্যক্তির নামে পূজো দেওয়ার সময় খালি পাতাতে সিদ্ধ চাল ছড়িয়ে মুরগিকে খাওয়ানো হবে আর ঠিক সেই সময় হাঁড়িয়া ঢেলে মুরগিটিকে ছেঁচে মারা হবে। তার রক্ত চালের উপর ঝরানো হবে। সাদা মোরগটি দামোদর যাত্রী একাই খাবে। পূজার সময় গ্রামবাসীদের নিবেদনে বলা হবে—হে মারাং বুরু, হে পুরুখুল অমুক দামোদরে যাচ্ছে, তার সঙ্গে থেকে, তার যেন বিপদ না হয়। পুরুখুলের কাছেও একই নিবেদন করা হবে। মৃত মানুষটিকে বলা হবে—তোমাকে দামোদরে যে নিয়ে যাচ্ছে তাকে রক্ষা করবে।

(৩১) তেল নাহান এবং নাইতে নিয়ে যাওয়ার সময় দু-বারই পিতৃপুরুষদের মাংস ভাতের ভোগ দেওয়া হয়। এবারও ঘরের প্রস্তুতি শেষ হলে, ঝোলাটি চাল চিড়েতে ভর্তি হলে, দামোদরে দান করার জন্য বাসনপত্র, টাকাকড়ি যোগাড় হলে ঘরের মধ্যেই পূজা ও প্রসাদ গ্রহণের ব্যবস্থা হবে। গাছের নীচ থেকে অস্তি পূর্ণ ভাঁড়টি তুলে এনে দবাটিতে সকলে সমবেত হবে। তিনটি সোজা কেঁদ কাঠের উপর একটি মঞ্চ তৈরি করে তার উপর অস্থিটিকে রাখা হবে একটি হলুদ ছোপানো ধান কাপড়ের উপর। অস্থির উপর হলুদ জল তারপর পরিষ্কার জল ঢালা হবে এবং কিছু পয়সা ফেলা হবে। প্রথমে বংশের লোক পরে গ্রামবাসী সকলের দেওয়া হয়ে গেলে দামোদর যাত্রী কাপড়টিতে গিট দিয়ে সেটি গলায় বুলিয়ে নেবে। যে মুখে যাওয়া হবে সেই দিকে ঘুরে হাত কেঁদ লাঠি নিয়ে মঞ্চের রাখা হাঁড়িয়া ও হলুদ জল ভর্তি ভাঁড়টিকে এক বাড়ি মেরে ভেঙ্গে দেবে। তার পর তার উপর দিয়ে সোঁজা চলে যাবে।

(৩২) চাল চিড়ের ঝোলা আশুয়ানের বাড়ি পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে দুজন লোক ঠিক করে রাখা হয়। দামোদর যাত্রী ধান কাপড়ে বাঁধা অস্থিটি বুরুর উপর রেখে ঘুমোবে এবং প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে হলে আশুয়ানের কাছে সেটি জিন্মা রেখে যাবে। আশুয়ানের বাড়ি থেকে ঝোলা বওয়া লোকদুটি ফিরে যাবে।

(৩৩) দামোদরে পৌঁছে যাত্রীরা ঘাট সর্দারের কাছে নিজের নিজের ঝোলা জিস্মা করে দেবে। নাপিত এসে সকলের মাথা কামিয়ে দেয়। তারপর যাত্রীরা জলে নেমে লাইন করে পুবদিকে মুখ করে দাঁড়ায় ও একসঙ্গে ডুব দেয়। ডুবন্ত অবস্থায় গিট খুলে অস্থিটি দামোদরের জলে ভাসিয়ে দেয়। তারপর সকলে জল থেকে উঠে ভিজ্ঞে কাপড় ছেড়ে নতুন হলুদে ছোপানো কাপড় পরে নেয়।

পিণ্ড দান

(৩৪) পিণ্ডি দেওয়ার জন্যে ঝোলা থেকে চিড়ে, মিষ্টি, একটি টাকা, পিতলের বালা ও শালগাছের একটি ছোট ডাল নিয়ে জলের ধারে বসবে। বিভিন্ন বংশের লোক আলাদা আলাদা লাইন করে পুব মুখে বসবে। প্রত্যেকে তিনটি বালির পিণ্ড তৈরি করবে। ডাইনেরটি মারাং বুরুর নামে, মাঝেরটি মৃতব্যক্তির নামে। একটি করে প্রতি পিণ্ডিতে টাকা পোতা হবে। পিণ্ডির চূড়ায় থাকবে পিতলের বালা তার উপর শালের ডাল। বাঁয়ের পিণ্ডিটি হচ্ছে পুরুধুলের নামে।

(৩৫) এইবার চিড়ে ও মিষ্টি দিয়ে ‘ভোগ দেওয়া’ হবে। প্রথমে মারাংবুরুর নামে ভোগ দেওয়ার সময় বলা হবে ‘জোহার গঙ্গায় মারাং বুরুর’ বলা হবে আমি অমুকের ‘গয়া গঙ্গা’ করছি। তুমি তার সঙ্গে থেকে তার কল্যাণ করো। তারপর মৃতলোকটিকে ভোগ দেওয়ার সময় বলা হবে ‘জোহার গঙ্গায় বাবা মা আমার’, বলা হবে আমি তোমাকে ‘গয়া গঙ্গা’ করলুম। তুমি আজ থেকে দেবতাদের সঙ্গে মিশে থাক। তারপরে পুরুধুলের নামে ভোগ দিয়ে পিণ্ডদানের কাজ শেষ হবে।

(৩৬) মৃত্যুর পরেও ধর্মের সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক থাকে। দামোদরের পাড়ে যাদের পিণ্ড প্রদান করা হল তাদের প্রত্যেককেই শালগাছের আশ্রয়েই পিণ্ড দেওয়া হল।

আচার বিধি

দেখা যাচ্ছে সমগ্র পারলৌকিক আচার ও ক্রিয়া কাণ্ড সম্বন্ধে নায়েক মঙ্গল চন্দ্র সরেনের বিবরণে মোট ছত্রিশটি প্রসঙ্গ আছে এবং অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে হয়তো তাঁর বিবরণে কোন তথ্য বাদ যেতেও পারে কিন্তু পারলৌকিক বিষয়ে এত বিস্তৃত এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য একত্রে আর কোথাও কেউ লিপিবদ্ধ করেননি। ‘সাঁওতাল জাতির ধর্ম ও সংস্কৃতি’ বইটিতে আমরা তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করে দেখলাম এতে যেমন আছে সাঁওতাল দেবলোকের কথা তেমনি আছে পূজার্চনা ও পরব পার্বণের কথা। তাছাড়া আছে বিভিন্ন ধরনের আচার-আচরণ (rites and customs) ও রীতি নিয়মের কথা। আছে কর্তব্য-অকর্তব্যের কথা এবং নিষেধ বিধির (taboo) কথাও। আর আছে বিস্তারিত ভাবে বলিদানের কথা। দেখা গেছে শূকর বলি, পাঁঠা ও ভেড়া বলি এক বার করে মাত্র উল্লিখিত হয়েছে। গরু বা মোষের বা অন্য কোনো জন্তুর বলির কথা নেই। প্রায় সর্বত্র আছে মোরগ, মুরগি বলির কথা। আর সর্বক্ষেত্রে আছে হাঁড়িয়া উৎসর্গ এবং হাঁড়িয়া পান করার কথা এবং মাংস ভোজনের কথা। মৃত ব্যক্তির অশরীরী আত্মার তৃপ্তির জন্য চালের উপর মোরগ/মুরগির রক্তঝরানোর কথাও পাওয়া যাচ্ছে। আর পাওয়া যাচ্ছে সমস্ত ক্রিয়া কর্মে মারাং বুরুর প্রাধান্যের কথা। তাঁর জন্যে সাদা রঙের মোরগ বলির কথাও লক্ষণীয়।

ছয় : ধর্ম ঠাকুর

সাদা রং

মারাং বুরুর সঙ্গে সাদা রঙের সম্পর্কটি নিয়ে একটি কৌতুহলোদ্দীপক প্রসঙ্গ আছে মঙ্গলচন্দ্র সরেনের বইটিতে যা এখানে উল্লেখযোগ্য। তিনি একটি গানের বঙ্গানুবাদ দিয়েছেন এই বলে— “এখানে লিটা বা মারাংবুর শিকারের সাজে, তিনি শ্বেত অশ্বে আরোহণ করিয়াছেন। তাঁহার মাথায় ময়ূর পুচ্ছ সুশোভিত শিরস্ত্রাণ, মুখে শুভ্র গৌফ দাঁড়ি, বাহতে সোনার তাগা এবং পৃষ্ঠদেশে রৌপ্য নির্মিত অসি। জাহের এরাও শ্বেতবর্ণ ঘুড়িতে আরোহণ করিয়াছেন।” —কিন্তু কথা হচ্ছে গানটিতে মারাংবুর কিম্বা জাহের-এরার নাম নেই। “পোডেগর সাদমরে লিটা গেচ/ পিয়ারী ঘুড়িরে বোয় গেচ।।/ লিটা লেকাগেঞ এঞ্জলেদে।/ বোয় লেকাগেঞ কারেকা লেদে।।/” সাদা বোড়ার লিটার কথা আছে কিন্তু মারাংবুরুর কথা নেই। কিন্তু মূর্তিটি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে অপরিচিত নয়।

খেরওয়াল বংশা ধর্ম পুঁথি’র অনুবাদক দ্বয় তাঁদের ভূমিকায় বলেছেন— “সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেন যে ধর্ম শব্দটি কূর্ম বাচক প্রাচীন-অস্ট্রিক শব্দের সংস্কৃত রূপ। ‘প্রাচীনবঙ্গে ধর্মপূজা’ (প্রবাসী ভাদ্র ১৩৫৬) নামে একপ্রবন্ধে দীনেশচন্দ্র সেনও ধর্ম ঠাকুরের সঙ্গে কচ্ছপের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন।” আবার অন্য কথাও এসেছে— “আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন যে ‘ধর্মশিলা সূর্যদেবতার প্রতীক।’ তারপর অনুবাদক দ্বয় বলেছেন— “সুনীতিকুমার কথিত কূর্ম উপাসনাই শাক্তী মহাশয় কথিত কচ্ছপাকৃতি ধর্মদেবতার পূজা বলে মনে হবে। মুণ্ডারি বর্গের লোকেরা যে ধরম দেবতার আরাধনা করে তার সাথে এই কচ্ছপরূপী দেবতার মিল থাকা সম্ভব।” (পৃ. ৩৪)।

ধর্মমঙ্গলের ধর্ম ঠাকুর

অধ্যাপক সুকুমার সেন তার বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ডের (আনন্দ সং, ৪র্থ মুদ্রণ আশ্বিন ১৪০৫) পঞ্চম পরিচ্ছেদে ধর্ম-ঠাকুর-কথা প্রসঙ্গে বলেছেন— “ধর্ম রাজা ঠাকুর। তাঁহার সাধারণ নাম ধর্মরাজ অথবা ধর্ম ঠাকুর এবং তাঁহার বিশেষ বিশেষ স্থানীয় পূজ্য নামের শেষ অংশ ‘রায়’ (রাজ = রাজা)। যেমন, বাঁকুড়া রায়, কালুরায়, খুনীরায় ইত্যাদি। সেকালের কথা বলিতেছি সেকালে ধর্ম-ঠাকুরের পূজা রাঢ় দেশে ও তৎসীমান্তবর্তী অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু একদা ইহা সমগ্র বাংলা দেশে এবং বাহিরেও প্রচলিত ছিল। বিহারে ধর্ম পূজার চিহ্নাবশেষ ‘ছট পরব’।” (পৃ: ১১০)। কিন্তু ছট পরবকে অনেকেই প্রধানত সূর্য পূজা হিসাবে গণ্য করে থাকেন— একথাও মনে রাখা প্রয়োজন। এরপর অধ্যাপক সেন বলেছেন— “শিক্ষিত সমাজে ধর্ম ঠাকুরের পরিচয় প্রথম প্রকাশ করেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। ইনি ধর্ম-ঠাকুরের পূজায় বাঙ্গালা দেশে বৌদ্ধ ধর্মের শেষ পরিণতি অনুমান করিয়াছিলেন কিন্তু সে অনুমান এখন আর সমর্থন করা যায় না।” (পৃ. ১১০)।

ধর্ম ঠাকুর সম্বন্ধে আরও বলা হয়েছে— “সদা ডোমের (এবং হরিশ্চন্দ্রের কাহিনীতে একাদশীর দিনে ধর্মঠাকুরের মাংস পারণার উল্লেখ আছে।” (পৃ. ১১১)।

ধর্ম ঠাকুরের গাজনের অনুষ্ঠানের একটি ছড়া উদ্ধৃত করেছেন অধ্যাপক সুকুমার সেন। আমাদের আলোচ্য প্রসঙ্গে ছড়াটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ :

ভাল গো ডোমের ঝি সরোবর বাধ

সুহসে চরিয়া যায় তাহা নাই দেশ

পখুর পাড়িতে সদা ডোমের কুড়িয়া
ঘন ঘন আইসে যায় ব্রাহ্মণ-বড়ুয়া।
ব্রাহ্মণ বড়ুয়া নয় নিরঞ্জন রাঘ
দেখিতে দেখিতে হংস শূন্যেতে লুকায়।
হংসা হংসী দুইজনে আকাশেতে জুতি
হংস চরিয়া যায় দোজ-প্রহর রাতি।
স্বর্গেতে থাকিয়া হংস নাছিল মরতে
কৌতুকে মৃণাল তুলি কে পায় দেখিতে।.....
হংসা হংসী দুই জনে আকাশেতে জুতি
হংস চরিয়া যায় তেজ প্রহর রাতি
এমনি অপূর্ব হংস নাই সমতুল
হংস ছিটিয়া যায় কমলের ফুল।
হংসা হংসী দুইজনে আকাশেতে যুতি।
হংস চরিয়া যায় নিশাভোগ রাতি।... (পৃ: ১১৩)

এরপর অধ্যাপক সুকুমার সেন আরো একটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন— “ধর্ম ঠাকুরের সৃষ্টি কাহিনী ঋক্বেদে বর্ণিত (১০.১২৯) সৃষ্টি তত্ত্বের মতোই। কূর্ম ধর্ম-ঠাকুরের পাদপীঠ সুতরা শূন্যমূর্তির প্রতীক স্থানীয়। মনে রাখিতে হইবে বৈদিক সাহিত্যে বিশ্বশ্রুতি প্রজাপতিকে ও সূর্যকে কূর্ম বলা হইয়াছে।

স যৎ কূর্মো নাম এতদ্ বৈ রূপং কৃতা প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত। স যঃ স কূর্মোহসৌ স আদিত্যঃ। (পৃ. ১১২) (শতপথ ব্রাহ্মণ, ৭.৫:১.৫-৬)।” কূর্ম যে কেন ধর্ম ঠাকুরের পাদপীঠ সে ব্যাখ্যা তো পাওয়া যাবে সাঁতাতাল সৃষ্টি তত্ত্বে। কূর্ম বা কচ্ছপের পিঠের উপরেই তো পৃথিবীকে নির্মাণ করা হয়েছে। খেরওয়াল বংশা ধরমপুথির অনুবাদক দ্বয় তাঁদের ভূমিকায় বলেছেন— “স্থলভাগ সৃষ্টি করার জন্য কচ্ছপকে আহ্বান করা হল। সেই কচ্ছপের চার পা সোনার শিকলে বেঁধে পিঠে কালনাগিনী সাপের বেড়ি দিয়ে একখানা সোনার থালা উপুড় করে দেওয়া হল। কেঁচো সেই প্রাণনের গভীরে জলে ডুব দিয়ে মাটি তুলে তুলে থালার উপর রেখে ভূভাগ গড়ে দিল।” (পৃ. ১৯)। অনুবাদক দ্বয় আরো বলেছেন— “আদি মানব মানবীর জন্ম সূত্র দেখাতে স্বর্গের দেবতারা ত্রিশ বছর ধরে পূজাপাঠ ও প্রার্থনা করে মেঘের মাঝে হাঁস জীবন সৃষ্টি করলেন। আর বেনা ঘাসের শিকড় দ্বারা ঠাকুর দুটি হাঁসহাঁসলী পাখি তৈরি করে নিলেন। সেই দুটি পাখি কারাম গাছের ডালে বাসা তৈরি করে ডিম পাড়ল। সময় হলে সেই ডিম থেকে পিলচু বুড়া ও পিলচু বুড়ি জন্মালো পৃথিবীতে।” (পৃ. ২১১) কূর্ম বা কচ্ছপ সম্বন্ধে জয়দেব লিখেছিলেন যে কথা, অনুবাদকদ্বয় তার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন— “সমুদ্র মগ্নকালে অতিকায় কচ্ছপরূপী বিশ্বের পৃথিবী ধারণ করে পৃষ্ঠে কড়া পড়ে গেছে, বিশ্বের কূর্ম অবতার বর্ণনা প্রসঙ্গে জয়দেব তা বলেছেন— ক্ষিতিরতিবিপুলতরে তিষ্ঠতি তবপৃষ্ঠে/ ধরণিধরণিকিশচক্র গরিষ্ঠে/ কেশব ধৃতকূর্মশরীর জয় জগদীশ হবে। হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরে, তোমার অতি বিপুল পৃষ্ঠ দেশে পৃথ্বী স্থিরা হইয়াছেন। সে ধরণী ধারণ জন্য তোমার পৃষ্ঠে শুষ্ক কঠিন ব্রণ চিহ্ন। কূর্মরূপী তোমার জয় হউক। এই গ্রন্থে পাই পৃথিবী সৃষ্টিতে কচ্ছপ ও সর্পের যুগপৎ বন্ধন। প্রলয় পয়োষিদ্ধিতে পৃথিবী সৃষ্টির জন্য মাঝে বক্রর আহ্বানে সাড়া দিয়ে স্বয়ং কচ্ছপরাজ আজীবন সোনার শিকলের বন্ধন স্বীকার করে মহী ধাবণ করতে রাজি হলো।” (পৃ. ২৮-২৯)।

অনুবাদক দ্বয় আরো বলেছেন—“সাঁওতালরা জাহের এরা, মারাংবুরু, মোড়েকো-তুরুইকো এবং ধরমের পূজা করে। এ ছাড়া হরি ওং, ঠাকুরং, সিংবোঙ্গা, মহাদেও, লিটা প্রভৃতি দেবতার কথা উল্লেখিত হলেও সাধারণত তাদের পূজা করা হয় না।

সিং বোঙ্গা হল প্রধান শক্তি, সে আলোক নিয়ে মানুষকে জাগ্রত করে উদ্দীপ্ত করে বর্ষা আনে। তার উদ্দেশ্যে গাওয়া হয়—ওহে বাবা সিং বোঙ্গা, বৃষ্টি নিয়ে এসো/ওহে মারাং দেব, মুঘলধারে ঢালো। সূর্যের দেবতাও সমান শক্তিশালী অন্ধকার দূর করে উজ্জ্বল আলো নিয়ে আসে সে।” তারপর আর একটি এগিয়ে বলা হয়েছে—“নৃতত্ত্ববিদ শরৎচন্দ্র রায় বলেছেন যে প্রাচীন হিন্দু সাহিত্যে সূর্যের এক নাম ধর্ম (তঁার গ্রন্থ The Kharias দ্র.)।” (পৃ. ৩২-৩৩)। মোটামুটি ভাবে উপসংহারে এসে অনুবাদক দ্বয়ের আর দুটি বক্তব্যের উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে—“সুনীতিকুমার কথিত কূর্ম উপাসনাই শাস্ত্রী মহাশয় কথিত কচ্ছপাকৃতি ধর্ম দেবতার পূজা বলে মনে হবে। মুণ্ডারী বর্ণের লোকেরা যে ধরম দেবতার আরাধনা করে তার সাথে এই কচ্ছপরূপী দেবতার মিল থাকা সম্ভব।” দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটি হল—“পৃথিবীর ধারক ধৈর্যশীল এই প্রাণীটিকে শ্রদ্ধা নিবেদন ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার তাই স্বাভাবিক বলেই ধরে নেওয়া যেতে পারে।” (পৃ. ৩৪)

মঙ্গলচন্দ্রের সংগৃহীত গানে মারাং বুরু

এবার আমরা ফিরে যাই মঙ্গল চন্দ্র সরেনের সংগৃহীত সেই গানটির কাছে—

“লিটা বা মারাং বুরু শিকারের সাজে, তিনি শ্বেত অশ্বে আরোহণ করিয়াছেন। তাঁহার মাথায় ময়ূর পুচ্ছ সুশোভিত শিরস্রাণ, মুখে শুভ গৌফ দাড়ি, বাহুতে সোনার তাগা এবং পৃষ্ঠ দেশে রোপ্য নির্মিত অসি।” (পৃ. ১৫)

—এই লিটা আসলে কে? মঙ্গলচন্দ্র বলেছেন—লিটা বা মারাং বুরু তাহলে কি লিটাই মারাংবুরু? লিটা তো বার্তাবাহক। কিন্তু মারাংবুরু প্রথমে ছিলেন ঠাকুরের কর্ম-সম্পাদক, ঠাকুরের প্রধান ব্যবস্থাপক পরে দেখা যাচ্ছে তিনিই প্রধান দেবতা হয়ে উঠেছেন এবং সব পূজা পরবে তিনিই প্রধান পূজ্য ও প্রথম পূজ্য। যাই হোক, সাদা ঘোড়ার সওয়ার এই মূর্তিটিকে ধর্মমঙ্গল কাব্যেও দেখা যায় এবং অধ্যাপক সুকুমার সেনের লেখায় এইভাবে তাকে পাওয়া যাচ্ছে—“রাম দাসের কাব্যের কোন কোন পুঁথিতে নিম্নে উদ্ধৃত আত্মকাহিনী পাওয়া যায়। ভাষায় আধুনিকত্ব এবং প্রথম পুরুষের উক্তি থাকিলেও আত্মকাহিনীটি কৃত্রিম মনে করিবার কারণ নাই। কিছু ঐতিহাসিক মূল্য আছে।” (পৃ. ১৩৮)।

রাম দাসের দেখা ধর্মঠাকুর

এই আত্মকাহিনীতে এই ছত্রগুলি পাওয়া যাচ্ছে—“পথে রামদাস শুভ লক্ষণ দেখিতে দেখিতে চলিলেন—

মাথায় ভ্রমণ করে উড়ে শঙ্খ চিল
চৌদুলী ধরেছে মৎস্য শুখায়েছে বিল।
নূতন বৎস লয়া গাভী আগুপিছু ধায়
দধি মাখে গোয়ালিনী দেখিল তথায়।।
শেওড়া গাছে ফুটে রয়েছে চাপা ফুল
মনে করে কোন দেব হেথা অনুকূল।

তুলিল চাঁপার ফুল গন্ধ মনোহর -
বিনা সুতায় হার হৈল পরম সুন্দর।।

এমন সময় ধর্মের আবির্ভাব হইল।

দেড় গ্রহর বেলা যখন বাগনান দেশে
শ্বেত অশ্বে চাপি ধর্ম রাউতের বেশে।

রামদাস ভাবিল, এখানেও সিপাইয়ের তাড়া।

দেশে স্বাভাবিক তরে পলাইয়া যাই
বিদেশে বেগারি বৃষ্টি লইবে সিপাই।— (পৃ. ১৩৮)

অবশ্য তাঁকে বেশি নিগ্রহ ভোগ করতে হয়নি। তবে তিনি ভয়ের চোটে জ্বরে পড়ে গেলেন।
এখানে সাদা ঘোড়ার সওয়ার রাউত বেশে স্বয়ং ধর্ম ঠাকুর আর সাঁওতালি গানে সাদা ঘোড়ার সওয়ার লিটা বা মারাংবুরু। তবে মনে হয় সাদা ঘোড়ার সওয়ারটি ধরম ঠাকুরও হতে পারেন। কারণ তিনিও শিঙ বোঙার সঙ্গে অভিন্ন বলে বিবেচিত হতে পারেন আর শিঙ বোঙা বা সূর্যদেবকে তো অস্বারোহী কল্পনা করা হয়ই। এখন কথা হচ্ছে, দুই আলাদা ক্ষেত্রের সাদা ঘোড়ার গল্পের মধ্যেও কি কোনো যোগসূত্র আছে? কেবল তো সাদা ঘোড়াই নয়, কূর্ম বা কচ্ছপ, ধর্ম ঠাকুর এবং ধরম এবং হংস ও হংসী এবং জলমগ্ন পৃথিবী— যোগসূত্র যে অনেকগুলি। এতগুলি মিল কি আকস্মিক হতে পারে? তবে কে কার থেকে কী নিয়েছেন সে কথা আদৌ জোর করে কিছু বলা যায় না।

সাত : সাধু রাম চাঁদ

সারি ধরম

আর একজন সাঁওতাল মনীষী সাঁওতালদের মধ্যে প্রচলিত ধর্মাচার ও ঠাকুর দেবতা নিয়ে কিছু ভাবনা চিন্তা করেছিলেন। তাঁর নাম সাধু রামচাঁদ মুরমু। তিনি ছিলেন প্রধানত গীতিকার, কবি এবং নাট্যকার। তাঁর একটি গদ্য প্রবন্ধও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। নাম 'ইসরড'। তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৬ই বৈশাখ, ১৩০৪ বঙ্গাব্দ, ২৯শে এপ্রিল, ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দ আর ১৩৬১ বঙ্গাব্দের ২৯শে অগ্রাণ (১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে) তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়েছে 'সারি ধরম সেরেও পুঁথি', প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড; 'অলদহ অনড়হে', কবিতার বই; লিটা গোড়েং', পৌরাণিক আখ্যান কাব্য, প্রায় মহাকাব্য বলা যেতে পারে। 'সংসার ফেন্দ' ; নাটক ; রোমান্টিক সামাজিক নাটক। 'ইসরড' তাঁর নিজের উপলব্ধি স্বরূপ বচন। হিন্দু বৌদ্ধ, জৈন, খ্রিস্টান ইত্যাদি ধর্মের মত সাঁওতালদের ধর্মের নাম কী হবে তা নিয়ে সংশয় ছিল। তাই এই ধর্মের নাম 'সারি ধরম', মানে— 'সত্য ধর্ম' হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করতেন।^{১২}

সাধু রামচাঁদ তার গানগুলিতে এই সারি ধরমের যে পরিচয়টি তুলে ধরতে চেয়েছেন এখানে তাঁর সেইসব গানের উদ্ধৃতি থেকেই পরিচয়টিকে বোঝার চেষ্টা করা হবে। এজন্য আমরা বেছে নেব তাঁর 'সারি ধরম সেরেও পুঁথি'। এই বইটির দুইটি বঙ্গানুবাদ পাওয়া যায়— একটি করেছেন গুরুচরণ মুরমু আর একটি প্রসাদ দাশগুপ্ত। এই 'সারি ধরম সেরেও পুঁথির' বাংলা নাম গুরুচরণ মুরমু দিয়েছেন 'সত্য ধর্ম গীতি পুস্তক আর প্রসাদ দাশগুপ্ত দিয়েছেন'।^{১৩} সনাতন ধর্মের গান'। গুরুচরণ মুরমুর দেওয়া নামটিই যথাযথ। সারি মানে সত্য। অন্য দিকে বলার কথা হল যে

সত্য আর সনাতন দুই শব্দের মানে আলাদা। তবে প্রসাদ দাশগুপ্তের অনুবাদের পাশে পাশে মূল সঁওতালি ভাষায়ও গানগুলিকে রাখা হয়েছে তাই প্রসাদ দাশগুপ্তের অনুবাদ ধরেই আলোচনা করা বেশি সুবিধাজনক। এখন এই সেরেও পুঁথির কয়েকটি গান আমরা-উদ্ধৃত করে আলোচনায় ঢুকব।

সারি ধরমের গান

৩ সংখ্যক গান থেকে —

সঁওতাল কোল মাইলী কোড়া
ভীল ভুইএগ মানকি মুড়া
সত্যধর্ম মানবো মোরা
জ্ঞাতিকে পার করবো।
পরস্পরকে ঠেলবো না আর
মনে প্রাণে আনবো জোয়ার
ধর্ম পথে প্রভুর* সেবায়
স্বজ্ঞাতিকে করবো পার।

(* প্রভু শব্দটি দিয়ে চাঁদো শব্দের অনুবাদ করা হয়েছে। ঠাকুর লিখলেই সম্ভবত যথাযথ অনুবাদ হত।)

৫ সংখ্যক গান থেকে —

“মারাং বুরু তৈরি করেন চাঁদো বোঙ্গা দেয় প্রাণ
জাহের এরা পাপ ঝাটায়* মঁড়েক দেখে দেখান।”

(* জাহের এরার হাতে এক খানি বাঁটা থাকে বলে মনে করা হয়।)

৮ সংখ্যক গান থেকে হেড়হেং রীড়—

চাঁদো বোঙ্গা মারাংবুরু জ্ঞানচক্ষু দাও গো প্রভু
সব দোষ মোর কর ক্ষমা শোন অধর্মের প্রার্থনা।
যন্ত্রণা বড় পৃথিবীতে দেশ দরিয়ার দীর্ঘ পথে
এই দরিয়া পারের ডোঙ্গা তোমরাই বাবা চাঁদো বোঙ্গা।

৮ সংখ্যক গান থেকে,—কাহিনি সুর—

মারাং বুরু এসো আমার সঙ্গীহও
এসো আমার মনের মাঝে ঠাই নাও
ভগবানের* কাছে আমার প্রার্থনা পৌঁছাও।
স্বর্গ নরক পাঠাও তুমি কেবল
দেখাও আমার ভগবানের বাখোল*
কীর নদীর পারে সুখের ঘর বাঁধতে দাও।

(* ভগবানের— মূল শব্দটি চাঁদো বাবা; * ভগবানের বাখোল—মূলশব্দ-চাঁদো বাখোল।)

দুঃখের সুর নামক গান থেকে—

সত্য ধরম মারাং বুরু
ধরবো মোরা করবো শুক
সত্য শাসের* আচ্ছাদনে
এবং সৃষ্ট জাহেব থানে।

ঝরনার মধ্যে এবং মাটির ভিতরেও দেবতারূপে কল্পিত এই বোঙ্গাদের বাস। সকল বোঙ্গার উপরে কিন্তু একজন পরম বোঙ্গা, প্রধান দেবতা বা পরমেশ্বর আছেন; Singi Bonga ‘সিং বোঙ্গা’ Sin Bonga ‘সিং-বঙ্গা’ বা Sing Bonga ‘সিং বোঙ্গা’; ইহাকে আর্য ভাষীদের ভাষায় সাঁওতালেরা কখনো কখনো ‘ঠাকুর বাবা’ বলিয়াও অভিহিত করে। ইহার কাছে সাঁওতাল ও অন্য কোলদের চরম আবেদন উদ্দিষ্ট হয়। সিং বোঙ্গা হইতেছেন সমস্ত বিশ্বের অদৃষ্ট সৃষ্টিকর্তা, সকলের পালক, পোষক ও শাসক, সকলের চেয়ে মহান প্রধান দেবতা, মানুষের পাপ-পুণ্যের সকল কাজের স্রষ্টা ও সাক্ষী; মানুষ দুঃখ কষ্টে তাঁহার কাছে প্রার্থনা জানাইয়া আরাম বা স্বস্তি পায় এবং তিনি আপংকালে মানুষকে প্রতীকারের উপায় জানাইয়া দেন।

এই পরমেশ্বর পরমাত্মা হইতেছেন, কোলদের ভাষায় ‘মারাঙ-উতেনি’— ‘সকলের চেয়ে মহান’; তাঁহাকে ‘হানি’ অর্থাৎ ‘উনি, ওই পুরুষ’ বলিয়া অনেক সময়ে অভিহিত করা হয়। এই পরমাত্মার প্রচলিত নাম ‘সিং বোঙ্গা’ শব্দের ‘সিং’ অর্থে দিন বা সূর্য; ইহাকে সূর্যের অধিষ্ঠাতা আলোকের দেব বলিয়া উল্লেখ করা হয়। আলোর সঙ্গে ইহার যোগ স্মরণ করিয়া কোলজাতীয় ‘সোকা’ বা ‘দেওড়া’ অর্থাৎ পুরোহিত ও ভবিষ্যৎ বক্তারা কখনো কখনো সিং বোঙ্গার উদ্দেশ্যে সাদা মোরগ বা পাঠা বলি দিয়া থাকে। সিং বোঙ্গা আর সমস্ত বোঙ্গার স্রষ্টা। ‘বোঙ্গা’ শব্দ আজকাল সাধারণত দেবতা অর্থে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু Korwa কোরওয়া প্রভৃতি দুই একটি ভাষার নজিরে এবং মুণ্ডারি প্রভৃতি ভাষার প্রাচীন প্রয়োগ দেখিয়া মনে হয় ‘বোঙ্গা’ শব্দের মূল অর্থ ছিল ‘চাঁদ’। আজকাল সাঁওতালি মুণ্ডারি প্রভৃতিতে ‘চাঁদ’ ও ‘সূর্য’ উভয়কেই বুঝাইবার জন্য আর্যভাষার শব্দ ‘চান্দো, চান্দুক’ শব্দ ব্যবহৃত হয়; এবং চাঁদের জন্য ‘বোঙ্গা’ শব্দ ব্যতিরেকে অন্য দুইটি শুদ্ধ কোল শব্দ আছে— ‘খাডিয়া ও জুয়াঙ’, ‘লোরাঙ’; শবর ‘আঙাই’, গদব ‘আঙায়িতা’। ‘সিং’ অর্থে ‘দিন’ বা ‘সূর্য’; ‘প্রিঙ্গা, নিদা’ অর্থে ‘রাত্রি’; এই জন্য চাঁদ অর্থে ‘প্রিঙ্গা চান্দো’ বা ‘প্রিঙ্গা বোঙ্গা’ শব্দও কোল ভাষায় (সাঁওতালি ও মুণ্ডারিতে) পাওয়া যায়। ‘সিং-বোঙ্গা’ (অথবা ‘সিং চান্দো’ ‘চান্দো এখানে ‘সূর্য’ অর্থে) অর্থাৎ ‘দিনের বা আলোর দেবতা’ যেন পরমেশ্বর বা দেবরাজ এবং ‘প্রিঙ্গা চান্দো’ অর্থাৎ ‘রাত্রির দেবতা’ চন্দ্র দেবী হইতেছে দেবতাদের রানি, সিং বোঙ্গার স্ত্রী—সাঁওতালি ও অন্য কোল পুরাণে এইরূপ কল্পনা আজকাল পাওয়া যায়। ‘সিং’ আলো বা দিন বা সূর্য, ‘প্রিঙ্গা’ আঁধার বা রাত; এই দুইটি শব্দের প্রাচীন অর্থ এখনও সাঁওতাল সমস্ত পদে ‘সিং-প্রিঙ্গা’তে ও মুণ্ডারি ‘প্রিঙ্গা সিঙি’-তে মিলে— ‘সিং-প্রিঙ্গা’ ও ‘প্রিঙ্গা সিঙি’ মনে ‘দিনরাত’, ‘অনবরত’। মূল কোল জাতির কল্পনায়, আমাদের ‘আলো ও ছায়া শিব শিবানীর, মত ঐশী শক্তির দুইটি বিকাশ রূপেই জ্যোতিঃ ও তমঃ অনুভূত হইয়াছিল, ইহা এই শব্দ দুইটি হইতে অনুমান করা অসম্ভব হইবে না। যাহা উৎক, সিং-বোঙ্গার কল্পনায়, যে কোনো সভ্য সমাজের মানুষের উপযোগী একটি দেব কল্পনায় কোল জাতি আসিয়া উপনীত হইয়াছিল, তাহা বুঝা যায়। প্রধান দেবতা সিং-বোঙ্গা এবং নানা অপ্রধান বোঙ্গা বা দেবতা ব্যতীত, কোলদের মধ্যে পিতৃপুরুষ বা প্রেতগণের সম্বন্ধেও বিশ্বাস আছে, এবং এই পিতৃপুরুষদের পূজার অনুষ্ঠানে কবিত্বময় বা কল্পনাপ্রবণ দৃষ্টিরও পরিচয় পাওয়া যায়। এখন কোলদের মধ্যে ধার্মিক ও সামাজিক জীবনে নানা হিন্দুভাব ও অনুষ্ঠান প্রবেশ করিয়া গিয়াছে এবং এখন ইহাদের মধ্যে খাঁটি কোল জিনিস ও হিন্দু জিনিস পৃথক করিয়া বিশ্লেষণ করা কঠিন। লৌকিক বা গ্রাম্য হিন্দু ধর্ম-বিশ্বাসে ও অনুষ্ঠানে কোল (বা প্রাচীন দক্ষিণ জাতির) জগৎ হইতে লব্ধ বহু ব্যাপার যে নিষ্কল্যাণ করিয়া লইয়াছে, তাহাও নিঃসন্দেহ।”^৯

এই আলোচনায় পূর্বের ১ সংখ্যক রেখা চিত্রে প্রদর্শিত সাঁওতালদের অতিপ্রকৃত ভাবনাচিত্তার সাতটি আলাদা আলাদা বিষয়ই বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা গেছে। তবে এই কাজের জন্য রামদাস টুডু রেফা, নায়কে মঙ্গলচন্দ্র সরেন, সাধু রামচাঁদ মুর্মু এবং ধীরেন্দ্রনাথ বাক্সে মহোদয়গণের বই থেকে সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে। অন্যদিকে রেভারেন্ড 'স্ট্রেফসফোর্ডের' দ্বারা সম্বলিত— হড়কোরেন মারে হাপড়ামকো রেয়াঃ কাথা, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও মিহির চৌধুরী কামিল্যার রচনা থেকেও কিছু কিছু বিষয় উদ্ধৃত করা হয়েছে। ফলে, আশা করা যায় যে 'সাঁওতালদের ঠাকুর দেবতা ও ধর্মচার' সম্বন্ধে একটা পুরোপুরি চিত্র তুলে ধরা সম্ভব হয়েছে। তবে ইংরেজি ভাষায় সাঁওতাল ধর্ম ও ঠাকুর দেবতা সম্বন্ধে যেসব আলোচনা পাওয়া যায় সেগুলিরও একটি পর্যালোচনা করে দেখা যেতে পারে যদিও তাতে পুনরাবৃত্তি দোষ ঘটবে। বাইরের লোক সাঁওতালদের ঠাকুর দেবতা সম্বন্ধে কী মনে করেন— সেটাও জানা দরকার।

আট : অসাঁওতালদের দৃষ্টিতে সাঁওতাল ধর্ম ও দেবতা

মারাঙ বুরু

ডি, কে, কোচার তাঁর 'Tribal Deities of the Santals' ('সাঁওতালদের উপজাতীয় দেবতা') প্রবন্ধে লিখেছিলেন— "Marang Buru appeared before them and introduced himself as their grand father, He taught the first human pair, Pilchu Haram and Pilchu Budhi to cultivate, to dance, to hunt and to brew rice beer." মানে হচ্ছে— মারাঙ বুরু তাদের সামনে আবির্ভূত হয়ে নিজের পরিচয় দিলেন তাদের ঠাকুরদাদা বলে। প্রথম মানব-মানবী জুটি পিলচু হাড়াম ও পিলচু বুড়ীকে তিনি চাষ করা, নাচ করা, শিকার করা আর হাঁড়িয়া তৈরি করা শেখালেন। কথা হল— মারাঙ বুরু নিজেকে ঠাকুর দাদা বলে পরিচয় দিচ্ছেন— এই গল্পটা অন্য কারো আলোচনায় পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে ডি, কে, কোচারের এই গল্পটি নিয়ে একটু সংশয় থেকেই যাচ্ছে। তাছাড়া ধীরেন্দ্রনাথ বাক্সে তাঁর বইয়ে লিখেছেন "নওয়া দ জত হড়াঃ গে বাড়ায় মেনাঃ যে লিটা কাথাহ্ মারাঙ বুরু দ ঠাকুররেন গোডেত এ তাহেঁ কানা।"— মারাঙ বুরু তো ঠাকুরের বার্তাবাহক বা কর্ম সম্পাদক। এর একটু পরেই বাক্সে বলছেন— "লিটাঃ গে তাহেঁ কানায় উনকু বঙ্গাবুরু করেন মাথা মারাঙ বঙ্গা— মারাঙ বুরু।"— লিটাঃ হচ্ছেন সেই সব ঠাকুর দেবতার মাথা— প্রধান বঙ্গা— মারাঙ বুরু। নায়কে মঙ্গলচন্দ্রের উদ্ধৃত গানের অনুবাদেও পাওয়া যাচ্ছে 'লিটা বা মারাঙ বুরু' অর্থাৎ দুই এক।

জাহের এরা

পি, ও, বডিং এর A Santal Dictionary-তে (পৃ: ২২৮)^{১৪} পাওয়া যাচ্ছে— "The lady of the sacred grove, one of the national bongas (a female) that has a tree in the grove. Her name is said to be Ram, Salgi."— বাক্সে, রাম সালগী নামে আপত্তি জানিয়েছেন। তাছাড়া 'হড়কোরেন' মারে হাপড়ামকো রেয়াঃ কাথাতে অন্য একটা কথা বলা হয়েছে— "উনি তায়োম মারাং বুরু (আসল প্রতুমদ রাম সালগি)"— মানে তারপর মারাং বুরু (আসল নামতো রাম সালগি)। তো A Santal Dictionary তে জাহের এরার আসল নাম রাম সালগি আর হড়কোরেন মারে হাপড়ামকো রেয়াঃ কাথাতে মারাঙ বুরুর আসল নাম রাম সালগি—

কার কথা ভুল? বাস্কে বলেছেন সালগি জ্বীলোকের নাম, খাঁটি সাঁওতালি শব্দ। তার আগে রাম কেন? রামতো দিকু পুরুষ নাম। উনি অবশ্য বলেন নি বডিং ভুল করেছেন। তবে এর কারণ অনুসন্ধান করার কথা বলেছেন।

এদিকে *J. Troisi* তাঁর *Tribal Religion গ্রন্থের*^৫ পৃ. ৮১ তে লিখেছেন—“The Santals consider her a good natured spirit who never does them any harm but who on the contrary, is concerned about their bodily needs. A fowl is offered to her at all the festivals for the general welfare of the village, especially for obtaining good crops and for the good health of the villagers and their cattle. She is also involved, whenever any cattle disease ravages a village. The Santals regard her not only as a personal spirit but also as a distinctively individualised one. This is clearly seen during the Baha or flower festival.” মানে হচ্ছে—সাঁওতালরা একে ভালো স্বভাবের আত্মা বলে মনে করে যে তাদের কখনো কোনো ক্ষতি করে না, বরঞ্চ তাদের শারীরিক প্রয়োজনীয়তার দিকে নজর রাখে। সাধারণ ভাবে গ্রামের মঙ্গলের জন্য, বিশেষ করে ভালো ফসল পাওয়ার জন্যে এবং গ্রামের লোকদের এবং তাদের পশুদের সুস্থ্যতার জন্য সমস্ত পরবেই তার জন্য একটি মুরগি উৎসর্গ করা হয়। গ্রামে যখন পশু-মড়ক দেখা দেয় তখনো তাকে আহ্বান করা হয়। সাঁওতালরা তাকে কেবল একটি ব্যক্তিগত আত্মা হিসেবেই না বরং স্পষ্টত একটি ব্যক্তিক আত্মা হিসেবে গণ্য করে। এটা স্পষ্ট ভাবে দেখা যায় বাহা বা ফুলের উৎসবে।

এখানে তিনটি জিনিস লক্ষণীয়—(১) জাহের এরাকে লেখক বলেছেন Spirit বা আত্মা, দেবী নয়। (২) Personal spirit বা ব্যক্তিগত আত্মা নয়। কিন্তু distinctively individualised one বা স্পষ্টত একটি ব্যক্তিক আত্মা। কথা হচ্ছে জাহের এরা দেবী নন একটি আত্মা এবং কেবল ব্যক্তিগত (personal) আত্মা নন, স্পষ্টত ব্যক্তিক আত্মা। এই কথাগুলি কি কোনো ধর্মগ্রাণ সাঁওতাল মানবেন? মনে হয় না। তাছাড়া personal spirit কথাটির মানে হতে পারে কারো পোষা ভূত আর distinctively individualised one এর মানে হতে পারে এমন এক ভূত যে স্পষ্টত অন্যদের থেকে আলাদা। আমি অবশ্য এই মানে করতে চাইনা তবে আমার মনে হয় Spirit কথাটির মধ্যে শ্রদ্ধাবোধ এবং অনুভববোধের অভাব আছে। উদ্দেশ্যে বডিং বলছেন Lady of the sacred grove, one of the national bongas (a female) পবিত্র কুঞ্জের মহিলা, জাতীয় বঙ্গাদের একজন (এক নারী)। জাতীয় বঙ্গা বলা হচ্ছে কেন? এখানে জাতীয়তার প্রশ্ন ওঠে কি করে? প্রথমেই Lady বলে আবার ব্র্যাকেটে a female বলার মানে কী? Lady বলাটা ঠিক হয় নি? এখানেও বোঝবার ব্যাপারে বিশেষ চেষ্টা আছে বলে মনে হয় না।

মঁড়েকো—তুরুই কো

পি. ও. বডিং তাঁর *A Santali Dictionary, Vol-IV* এর ৩২৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন—“These bongas have than in the sacred grove and are considered dangerous or easily offended. There is some traditional story that they are five brothers and one sister. They have only one common sacrificial place and only one sacrifice is made to them all, or rather the five, as the sixth is not included. Hence these are also frequently called only Moreko”। এর মানে হচ্ছে—পবিত্র কুঞ্জে এই বঙ্গাদের থান

আছে এবং এরা সহজেই চটে যায় এবং বিপজ্জনকও। পরম্পরাগত কিছু গল্পে আছে যে এরা পাঁচভাই ও এক বোন। এদের জন্যে বলির জায়গা একটাই এবং এদের জন্যে একটাই বলি দেওয়া হয় পাঁচটা নয়, কারণ ষষ্ঠ জনকে ধরাই হয় না। তাই প্রায়ই এদের বলা হয় মঁড়েকো (মানে পাঁচ জন)। — কথা হচ্ছে, বডিং এর মতে মঁড়েকো তুরুইকো হচ্ছে পাঁচ ভাই এক বোন। মঁড়েকো মানে যদি পাঁচজন তবেতো তুরুইকো মানেও ছয়জন। ষষ্ঠ বা Sixth নয়।

এই সম্বন্ধে আর একটি মত দেখা যাক। ডি. কে. কোচার^{১৬} ভারতীয় লোকযান পত্রিকায় *Tribal Deities of the Santals* শব্দকে লিখেছিলেন— “**Moreko Turuiko** is actually not one bonga but a group of bonges— five brothers and six sisters named collectively as Moreko-Turuiko, Literally five-six’. The ‘five and six’ are somewhat loose tempered bongas in whom the Santals take more than casual interest in comparison to other Jaher deities.”। মানে হচ্ছে— মঁড়েকো-তুরুই কো বাস্তবিক একজন বঙ্গা নয়, এক দল বঙ্গা; পাঁচ ভাই আর ছয় বোন যাদের এক সঙ্গে বলা হয় মঁড়েকো-তুরুইকো, শব্দগত ভাবে মানে পাঁচ-ছয়। ‘পাঁচ-ছয়’ কিছুটা বদ মেজাজি বঙ্গা। অন্য জাহের দেবতাদের তুলনায় সাঁওতালরা এদের সম্বন্ধে সাধারণের থেকে অনেক বেশি নজর দেন। — তাহলে কার কথা ঠিক? বডিং বলেছেন পাঁচ ভাই এক বোন আর কোচার বলেছেন পাঁচ ভাই-ছয়বোন। বাক্সে বলছেন— “বোডিং সাহেব সঙ্গে খালি মিৎটেন কাথাগে বাং মিলাঃ কান তায়। অনা দ কোচার সাহেব মিৎটেন মিসেরা বাংকাতে তুরুই গটেন মিসেরায় মেন আকাদা। নওয়া দ পাসেং উনি চারুলাল মুখার্জিঃ The Santals পুঁথি ষনে এগাম আকাদা।” — মানে হচ্ছে— বোডিং সাহেবের সঙ্গে খালি একটি কথায় মিল নেই। সেটা হল কোচার সাহেব এক বোন না বলে ছয় বোন বলেছেন। এটা উনি চারুলাল মুখার্জির The Santals বই থেকে নিয়েছেন। কিন্তু পাঁচ ভাই-ছয় বোনের কথা তো সব সাঁওতাল লেখকরাই বলেছেন। তার মানে এখানেও বডিং এর বক্তব্যের উপর আস্থা রাখা যাচ্ছে না।

তো, দেখা দরকার চারুলাল মুখার্জির *The Santals*^{১৭} বইয়ে ঠিক কী লেখা আছে এই বিষয়ে। চারুলাল বলেছেন— “Another village deity is Monreko Turuiko’ (lit. the five-six) who is now a single entity but addressed in the plural (the suffix ko indicates plurality). The santals believe that they were five brothers (Monren = five) who were wedded to six sisters name Dangi Purgi, Hisi, Dumni, Chita and Kapra (Turui = six). They are supposed to preside over the welfare of the village. His younger sister, ‘Gosane era’ constitutes a separate deity of the Jaher than (Holy grove) and is offered worship in a different hut. ‘Jaher era’ another sister of ‘Morenko’ is the goddess of Jaher than (Holy grove) named after her. She has a stone assigned as her symbol. The santals worship her for the general welfare of the village, so that their children may have good health, crops may grow in plenty and youths and maids of the tribe may be married quickly. For propitiation, she needs a brown hen (Herak’ sim); and if a goat is sacrificed in her honour, it must be a red she goat”। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে চারুলাল মঁড়েকো তুরুইকো সম্বন্ধে যে সব কথা বলেছেন সে কথা প্রায় সব সাঁওতাল লেখকদের বইতেও পাওয়া যায়।

পারগানা বঙ্গা ও মঞ্জিহি বঙ্গা

পারগানা বঙ্গা সম্বন্ধে *Tribal religion* বইয়ে Troisi বলেছেন— “This spirit also is said to reside in the sacred grove where he is represented by a stone at the foot of one of the Sarjom trees (shorea roubusta).” এখানে বলার কথা এই যে— পারগানা বোঙ্গার সেবার দায়িত্ব কুডাম নাইকের— যাকে অনেক সময়েই নিজের শরীরের কয়েক ফোঁটা রক্ত উৎসর্গ করতে হয়। আর মঞ্জিহি বোঙ্গা সম্বন্ধে Troisi বলেছেন— “As in all Santal villages this spirit does not reside in the ‘Jaher than’ but has a special place built for him facing the headman’s house. This is called *Manjhi than*. Here he is represented by a stone at the foot of the central wooden post. He is believed to act as the spiritual adviser to the current head man.” (ibid, p. 84) মঞ্জিহি বঙ্গার নিবাস সম্বন্ধে Troisi মোটামুটি ভাবে ঠিকই বলেছেন কিন্তু পারগানা বঙ্গা ও যে জাহের থানে থাকেন— এই কথাটা নিয়ে সংশয় আছে। বাল্কেও বলেছেন— ‘নশে-মিৎ টেন কাথাও মেনলেগে— সহরায়, : বাহা, এর সিম, ইড়ি য়াড় সিম, জান থার,—এমান পরব করে নায়কে দ জাহেররে মারাও বুরু মঁড়েকো তুরুই কো, জাহের এরা আর গঁসায় এরা এতুতমতে দাঁড়েকয় সামাভা, মেনখান পারগানা বঙ্গা বেলারে দ কুডাম নায়কেগে বুল মায়ামে জর আয়া।’ মানে— এখানে আমি একটা কথা বলব সহরায়, বাহা, এরঃসিম, ইরিয়াড় সিম, জানথার এই সব পরবে নায়কে তো জাহের থানে মারাও বুরু মঁড়েকো তুরুই কো জাহের এরা আর গঁসায় এরার নামে পূজা দেনই কিন্তু পারগানা বঙ্গার বেলায় কুডাম নায়কেগে নিজের শরীরের রক্ত উৎসর্গ করতে হয়।

গঁসায় এরা

গঁসায় এরা সম্বন্ধে Troisi বলেছেন— “She is represented by a matkom tree (bassia latifolia) at the foot of which there is a stone. The Santals propitiate her against sores. A White fowl is sacrificed in her honour by the naike. The spirit is worshipped by the Murmu and the Naike Khil (a subclan of the murmu clan) as their abge bongá (subclan spirit). The Nij, gar, Jugi and Sad subclan of the Murmu clan worship her as their orak’ bongá (house hold spirit)” Troisi র বক্তব্যের মানে হচ্ছে সংক্ষেপে এই রকম। এর প্রতীক হচ্ছে মছয়া গাছ যার গোড়ায় থাকে এর জন্যে একটি পাথর। কাটা, ছেঁড়া ঘা ইত্যাদি থেকে বাঁচবার জন্যে সাঁওতালরা এর পূজা দিয়ে থাকেন। নায়কে এর সম্মানে একটি সাদা মুরগি বলি দিয়ে থাকেন। মুরমু এবং নায়কে খিল (মুরমু গোত্রের একটি উপগোত্র বা sub-clan) একে তাঁদের ‘আবগে বোঙ্গা’ (উপগোত্রের দেবতা) হিসেবে পূজা করে। নিজ, গাড়, জুগি এবং সাদা উপগোত্রের লোকেরা, যারা সকলেই মুরমু গোত্রের লোক, একে তাঁদের অরাঃ ক বোঙ্গা হিসেবে পূজা করে।— এই সব কথাও মোটা মুটি ঠিকই আছে। তবে বাল্কে বলেছেন— “তা ছাড়া জাহেররে অকাদ লাহারেগেও মেনআকাদা মে আডি সনৎ জাগাকানা অশে যেখান হাপড়ামকো ঠাওকো এম আকাও দেয়া বুঝাকানা যে মানমি দরদীয়া ভালে বঙ্গা কানায়।” (হড় সমাজের বঙ্গাবুরুকো, পৃ. ৪৫)। এর মানে হচ্ছে, আগেই বলা হয়েছে যে জাহের থান হচ্ছে একটা অতি পবিত্র জায়গা। সেখানে যখন কাউকে জায়গা দেওয়া হয় তখন বুঝতে হবে যে দেবতাটি মানবদরদী।

অড়াঃ বঙ্গা।

অড়া বঙ্গা সম্বন্ধে বোডিং সাহেব বলেছেন— “The names of the orak-bonga are kept secret like that of the abge. Sacrifices of fowls (black or speckled) pigs and goats are made to these at the Sohrae, baha and erok festival, generally in the cow shed.” (P.O. Bodding : *A Santal English Dictionary*, Vol IV, p. 476)। এর মানে হচ্ছে, আবগের মতই অড়ার বোজাদের নাম গোপন রাখা হয় : সাধারণত গোয়াল ঘরে — এরংক সিম, বাহা এবং সোহরায় পরবের সময় পাঁঠা, শুওর এবং মুরগি (হয় কালো না হয় কালো ফুট ফুট রঙের) বলি দেওয়া হয়ে থাকে।

ভি, কে, কোচার এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় অড়াঃ বঙ্গা সম্বন্ধে লিখেছিলেন— “The names of the *Orak* – *bonga*, the nature of *dāre* and the incantations are kept secret confidential. Information about these is passed by the father to the eldest son before the former’s death. The Orak-bongas in these sense, are inherited patrilineally so that the domestic groups belonging to the same family-line are likely to have the same set of Orak-bongas: (V.K. Kochar : *Family spirit and deities among the Santals* (article, *journal of the Asiatic Society*, Vol-V, No 3 and 4 1963 Page-63, এর মানে হল অড়াঃ বঙ্গাদের নাম তাদের ক্ষমতা বা শক্তির প্রকৃতি এবং মন্ত্রাদি গোপন এবং অপ্রকাশ্য রাখা হয়। বাপ মরবার আগে তার বড়ছেলের কাছে সংবাদটি জানিয়ে যায়। এই অর্থে— পিতৃ সূত্রে অড়াঃ বঙ্গা উত্তরাধিকারীতে বর্তায়। তার ফলে এক পরিবারের লোকেরা একই অড়াঃ বঙ্গাকে লাভ করতে পারে। বাস্কে তাঁর বইয়ে সমস্ত অড়াঃ বঙ্গাদের নামের একটি তালিকা করে লিখে দিয়েছেন।

আবগে বঙ্গা

বোডিং সাহেব বলেছেন— “Each Santal subsect has a tutelary bonga called abge. The particular name of the abge is kept back and must not on any account be revealed to the women. The head of the family tells the name of his abge whispering it to his eldest son, when he feels death coming. Sacrifices are performed to the abge by the head of the family, males only being present and males only eat the flesh of the sacrificed fowl or pig. The sacrifices are performed at the time of sowing (asar) and harvest (aghar). The Arge is believed to give earthly blessing and save in danger and it is liable to being spoilt by woman. (P.O. Bodding: *A Santal Dictionary*, Vol I page 3)”। মানে, প্রত্যেক সাঁওতাল উপগোত্রের মানুষদের একটি করে অভিভাবক বোজা আছে যাকে বলা হয় আবগে। এই বিশেষ বোজাটির নাম গোপন রাখা হয় এবং কোনোমতেই মেয়েদের কাছে প্রকাশ করা চলে না। পরিবারের কর্তা যখন অনুভব করেন যে মৃত্যু সমাগত তখন তিনি তাঁর বড়ছেলের কানে কানে তাঁর ‘আবগে’র নামটি বলে যান। পরিবারের কর্তা যখন আবগের কাছে বলিদান করেন তখন কেবল পুরুষরাই উপস্থিত থাকে এবং বলিপ্রদত্ত শুওর বা মুরগির মাংস কেবল পুরুষদেরই খাদ্য হতে পারে। বলিদান করা হয় একবার রোওয়ার সময় (আষাঢ়) আর একবার ফসল কাটার সময় (আঘার=অম্রাণ)। আবগে পার্শ্বি বিষয়ে আশীর্বাদ দেন এবং বিপদ থেকে রক্ষা করেন বলে বিশ্বাস করা হয়। মেয়ে মানুষ

এঁকে বিগড়ে দিতে পারে বলেও মনে করা হয়। বাস্কে এই আবগে বঙ্গাদের নামের একটি তালিকাও দিয়েছেন।

“আবগে বঙ্গাদের সম্বন্ধে ভি কে কোচার লিখেছেন “There are indications to suggest that Abge Bongas have reference to a wider group than a family lineage. The fact that Abge Worship is performed out side the house near an anthill differentiates it from other family deities whose abode is within the *Bhitri* of the house, strict exclusion of the females and possibly the younger males indicate that Abge worship may not strictly be a family affair. Bodding and after him Culshaw, have referred to Abge worship as connected with sub-sept or sub clan.” এর মানে হচ্ছে— ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যা থেকে মনে হয় ‘আবগে বঙ্গা’র প্রাসঙ্গিকতা আছে আরো বড়ো ছন গোষ্ঠীর কাছে, কেবল পারিবারিক গম্ভীর মধ্যোই তা আবদ্ধ নয়। আবগে পূজার অনুষ্ঠানকে বাড়ির বাইরে উই টিপির সামনে করা হয় এই তথ্য থেকে বোঝা যায় যে বাড়ির ভিতরে যাদের রাখা হয়, সেই পারিবারিক দেবতাদের সঙ্গে এঁদের পার্থক্য আছে। মেয়েদের এবং সম্ভবত অল্প বয়সী ছেলেদেরও কঠোর ভাবে দূরে রাখার ব্যাপার থেকে বোঝা যায় যে ‘আবগে পূজা’ একেবারে পারিবারিক বিষয় নাও হতে পারে। বোডিং এবং তাঁর পরে কুল্‌শ উপগোত্রের সঙ্গে আবগে পূজাকে যুক্ত করে দেখিয়েছেন।— তবে বাস্কে আগে একবার কথাটা উল্লেখও করেছেন যে একই বঙ্গা কারো আবগে বঙ্গা আবার কারো কাছে অড়াঃ বঙ্গা। সেক্ষেত্রে পার্থক্যটা কি বাস্তব? তাছাড়া তালিকাতেও ব্যাপারটা ধরা পড়ে স্পষ্ট ভাবে। একটি পার্থক্যের কথা বাস্কে উল্লেখ করেছেন যার নিশ্চয়ই কিছুটা গুরুত্ব আছে। বাস্কে বলেছেন— “নশে উল্লেখ লাগতি কানা যে, আবগে বঙ্গায়রে ইঁশি দ বাক চডরা” (পৃ. ৬৪)। মানে, এখানে উল্লেখ করতে হচ্ছে যে আবগে বঙ্গাকে হাঁড়িয়া দেওয়া হয় না।

কিসাঁড় বঙ্গা

বোডিং সাহেবের লেখায় পাওয়া যাচ্ছে— “They are believed to be small like a child and to have ‘*jaia*’ (matted) hair. They have got their name from the belief that they steal from others and bring wealth to the person with whom they are. If the bonga for some reason becomes angry, he is believed to be very dangerous and to eat (kill off) every one in the house. It is a very costly and circumstantial affair to get a Kisar bonga out of a house in such cases.” (P.O. Bodding: *A Santal Dictionary Vol. III, P-546*) এর মানে হচ্ছে— বিশ্বাস করা হয় যে এরা হচ্ছে ছোট শিশুর মত, তবে এদের মাথায় থাকে জট। তাদের এরকম নাম হওয়ার কারণ হল, বিশ্বাস করা হয় যে তারা অন্যের ধন সম্পত্তি চুরি করে এনে দেয় যার কাছে থাকে তাকে। যদি কোনো কারণে এই বোঙ্গা চটে যায়, তা’হলে বিশ্বাস করা হয় যে সে খুব বিপজ্জনক হয়ে ওঠে এবং বাড়ির সকলকে খেয়ে ফেলে (মেরে ফেলে)। এরকম ক্ষেত্রে তাকে বাড়ি থেকে তাড়ানো খুব খরচের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় এবং নানা ছোটো খাটো খুঁটিনাটির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। বাস্কে অবশ্য একটা লম্বা ফিরিস্তি দিয়েছেন খুঁটিনাটি জিনিসপত্রের যেগুলি শেষ পর্যন্ত ওঝার দখলে যায়। সবশেষে বলেছেন— “কিসাঁড় বঙ্গা, ‘ধন কুদরী ইঁক মেতাকওয়া।’ — মানে কিসাঁড় বঙ্গাকে ‘ধন কুদরী’ ও বলা হয়ে থাকে।

নাইহার বঙ্গা

Troisi বলেছেন— “.....As we have seen marriage, for a girl, involves a change in her bongas. This ensures that she will not be able to bring any calamity to her husband's household : the naihar bonga, however, does not belong to her husband's household and is therefore, an alien spirit. He is believed to have followed the girl because of something which the girl took along with her and from which he did not want to be parted” (Troisi : *Tribal Religion* P. 106-107). — মানে, আমরা দেখেছি যে বিয়ে হলে মেয়েদের বঙ্গাও বদলে যায়। এর ফলে সুনিশ্চিত হয় যে মেয়েটি তার স্বামীর গৃহস্থালিতে কোনো বিপত্তি ঘটাতে পারবে না। অবশ্য নাইহার বঙ্গা তার স্বামীর ঘরের নয়, কাজেই সে হচ্ছে একটি বহিরাগত আত্মা। বিশ্বাস করা হয় যে সে মেয়েটির পিছু নিয়ে চলে এসেছে কারণ মেয়েটি হয়তো এমন কোনো জিনিস সঙ্গে নিয়ে এসেছে যার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়া বোঙ্গাটির পছন্দ নয়। — তবে বাক্সে বলেই দিয়েছেন যে এক্ষেত্রেও এই বঙ্গার কবল থেকে মুক্ত হতে গেল ভালোরকম খরচপত্র করতে হয়। মনে হয় এখানেও ওঝাদের কারসাজির বেশ ভালোরকমের সুযোগ আছে।

সিমা বঙ্গা

এরপর আসছে সিমা বঙ্গার কথা, Troisi সাহেব লিখেছেন— “Both the sima and bahre bongas are said to be very jealous and if they are in any way hurt for example, if sacrifices are not offered to them, they become hungry for a sacrifice and cause disease. It is very difficult to propitiate them and not everyone is competent to do so. For this reason, in almost every Santal village, there is a Kudam Naeke whose primary function is to propitiate these spirits through collective sacrifices. This is done twice a year, on the occasion of transplanting and harvesting. Fowls are offered in their honour and all present, with the exception of women partake of the food. The mode of sacrifice is called ‘Bul Mayam’ since the ‘Kudam Naeke’ offers some of his blood along with the ‘adwa caole’ given to these bongas. If in case of sickness, the ojha through divination finds out that the bahre or sirha bongas are the cause of the evil, he offers them sacrifices on behalf of the sick man's family. In such cases, the ojha also performs the ‘Bul Mayam’ ceremony.” (Troisi : *Tribal Religion*, P-120). এর মানে হচ্ছে সিমা এবং বাহরে বঙ্গা, দুজনেই ভারি হিংসুটে প্রকৃতির। যদি কোনো কারণে তাঁরা চটে যায়, যেমন তাদের জন্য হয়তো কোনো বলি উৎসর্গ করা হয়নি, তাহলে তারা বলির জন্যে ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ে এবং রোগ ঘটিয়ে ছাড়ে। তাদের সন্তুষ্ট করা খুব কঠিন কাজ আর সকলের সে যোগ্যতাও থাকে না। এই কারণেই প্রায় প্রতিটি সাঁওতাল গ্রামেই একজন করে কুডাম্ নায়কে থাকেন যার প্রধান কাজই হলো সমবেত ভাবে বলি উৎসর্গ করে এই সব আত্মাদের সন্তুষ্ট রাখা। এই কাজটি বছরে দুবার করে করা হয়ে থাকে, একবার ধান রোয়ার সময় আর একবার ফসল কাটার সময়। তাদের সম্মানে মুরগি উৎসর্গ করা হয় এবং মেয়েরা বাদে অন্য সবাই সে খাদ্য গ্রহণ করে থাকে। বলির পদ্ধতিটিকে বলা হয় ‘বুল মায়াম’ কারণ কুডাম্ নায়কে তার শরীরের খানিকটা রক্তের সঙ্গে আতপ

চাল দিয়ে বঙ্গাদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করে থাকে। রোগ দেখা দিলে কুডুম নায়কে ধ্যানে বসে জ্বেনে নেয় বাহরে বা সিমী, কোন বঙ্গা অমঙ্গলের কারণ; তার পর রোগীর বাড়ির পক্ষ থেকে সেই বঙ্গার উদ্দেশ্যে বলি উৎসর্গ করা হয়। এই সব ক্ষেত্রে গুণা নিজে 'বুল মায়ামের' অনুষ্ঠান করে থাকে।

রঙ্গোরুজি বঙ্গা

ধীরেন্দ্রনাথ বাক্সে রঙ্গোরুজি বঙ্গা সম্বন্ধে তাঁর বইয়ে লিখেছেন— “রঙ্গোরুজি বঙ্গা দ সেন্দরা বঙ্গা কানায় আর নুইদ কুড়ি বঙ্গা কানায়।” (পৃ. ৭২)। মানে রঙ্গোরুজি বঙ্গা হচ্ছে শিকারের দেবতা আর সে হচ্ছে স্ত্রী দেবতা। এই সম্বন্ধে ‘রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর’ বইয়ে ড. অমলেন্দু মিত্র লিখেছেন— “সাঁওতালদের মধ্যে প্রাচীন শিকার জীবী সমাজের চিহ্নটিকে আছে তাদের রঙ্গোরুজি পর্বের মধ্যে। ইনি পশু শিকারে বাগড়া দেবার অপদেবতা। সমাজের বার্ষিক শিকার যাত্রার প্রাককালে বৃক্ষ মূলে এই অপদেবতার অধিষ্ঠান ক্ষেত্রে তারা বিবস্ত্র হয়ে নৃত্য করে এবং মূত্র ত্যাগ, মূত্র উৎসর্গ ইত্যাদি ন্যাকার কাজ করে থাকে। এখন এই প্রথাটি (সর্বত্র নয়) সাঁওতাল বালকেরা পালন করে।”^{১৮} বাক্সে অবশ্য বলেই দিয়েছেন যে — “রঙ্গোরুজি বঙ্গাগে সেন্দরা বিররেন মুখিয়া বঙ্গা কানায়।” (পৃ. ৭৩)। শিকারের অরণ্যে মুখ্য বঙ্গা হচ্ছে রঙ্গোরুজি বঙ্গা।

Troisi বলেছেন— “As there is a village priest (naeke) and a priest for the bahre and sima bongas (Kudam naeke), so also there is a dihiri (hunt priest) responsible for the hunt. He sees to it that the necessary sacrificial offerings are made so that no mishap occurs during the hunt. Prior to the actual start of the hunt and also on each successive day, he sacrifices fowls to various bongas, imploring them not to cause any harm to the hunters. One of the bongas so propitiated is called Rongoruji. This spirit is said to reside in the forest, where a special tree called Terel (diaspyros fomentosa) is reserved for her. A stone representing this bonga is placed at the base off this tree. This spirit is believed to be completely obsessed with sex, as a result of which, it is very important to regale her with obscene song and stories. The Santals believe that, if she is not satisfied she causes terrible mischief during the hunt.” (J. Troisi : *Tribal Religion*, P. 104).

এর মানে হচ্ছে— যেমন আছেন গ্রামের পুরোহিত, (নায়কে); যেমন ‘বাহরে এবং সিমী বোঙ্গার পুরোহিত (কুডাম নায়কে) তেমনি আছেন দিহরি (শিকারের পুরোহিত) যিনি দায়ী থাকেন শিকার অনুষ্ঠানের জন্য। তিনি নজর রাখেন যাতে প্রয়োজনীয় বলি ঠিক ভাবে প্রদত্ত হয় এবং যাতে শিকারের সময় কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে যায়। বাস্তবে শিকার পর্ব শুরু হওয়ার আগে এবং তারপর প্রতিদিন তিনি বিভিন্ন বঙ্গার নামে বলি উৎসর্গ করে থাকেন এবং তাদের কাছে আবেদন জানান যাতে শিকারীদের কোনো বিপদ না ঘটতে পারে। যাদের সন্তুষ্টি বিধান করা হয় সেই সব বঙ্গাদের একজন হলেন রঙ্গোরুজি বঙ্গা।

এই আত্মাটি বনে বাস করে। সেখানে তার জন্যে ‘তেরেল’ নামে একটি বিশেষ গাছ নির্দিষ্ট করা থাকে। এই গাছের গোড়ায় থাকে এই বঙ্গার প্রতীক হিসেবে একটি পাথর। বলা হয় যে এই আত্মাটি যৌনতার দ্বারা পুরোপুরি আচ্ছন্ন। ফলে অশ্লীল গান এবং গল্পের দ্বারা তাকে আমোদে

রাখা খুব গুরুত্বপূর্ণ। সাঁওতালরা বিশ্বাস করেন যে তিনি তুষ্ঠ'না থাকলে শিকারে প্রচণ্ড বিপত্তি ঘটে।^{১৯} মোটামুটি ভাবে দেখাগেল যে Troisi আলাদাভাবে সাঁওতালদের ঠাকুর দেবতা ও ধর্মাচার সম্বন্ধে বই লিখলেও, অনেক বিষয়েই তাঁর জ্ঞানা, দেখা এবং বোঝার মধ্যে এমন একটা মনোভাব আছে যা প্রায় উন্নাসিকতার মতো মনে হয়। আর Bodding পাদ্রী এবং ভাষাবিজ্ঞানী হওয়ার জন্যে গোটা ব্যাপারটাই জ্ঞানেন প্রায় পুরোপুরি তথাপি ঠাকুর দেবতা সম্বন্ধে তিনিও কিছু কিছু অসতর্ক উক্তি করেছেন। অন্যদিকে অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বিদেশী মিশনারী এবং ইংরেজ প্রশাসকদের সাঁওতালি চর্চা সম্বন্ধে শ্রদ্ধা প্রকাশ করলেও পাদ্রীদের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে ধর্মান্তরীকরণের ব্যাপারটা পছন্দ করতেন না। তাঁর আগ্রহ ছিল সাঁওতালি চর্চা যেন উদার মানবতাবাদের দৃষ্টি থেকে করা হয়। স্বাধীন দেশের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতিকে তিনি কৃপার দৃষ্টিতে দেখতে চাননি। শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা সহ তাকে দেখতে চেয়েছেন বিশুদ্ধ জ্ঞান চর্চার দৃষ্টিকোণ থেকে। সাঁওতাল মনীষীদের লেখায় অবশ্য রিফর্মিস্ট বা সংস্কারকামী মনোভাবই প্রবল। আজকের দিনে আমরা বিজ্ঞান মনস্ক ও উদার গণতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকেই সমগ্র বিষয়টি দেখতে চাই।

সাঁওতাল মনীষীরা প্রায় সকলেই তাঁদের ধর্মটিকে সারি ধরম বা সত্যধর্ম বলে দেখাতে চান। এবং বলি-আচার ইত্যাদিকে গোঁণ বলে মনে করেন। অন্যদিকে ইউরোপীয়রা এই ধর্মের মধ্যে কেবল প্রেতাধ্যাক্ষে সন্তুষ্ট করাটাকেই বড়ো করে দেখাতে চেয়েছেন। মনে হয় সাঁওতাল ধর্মভাবনায় প্রেত পূজার গুরুত্ব কালক্রমে আরো অনেক হ্রাস পাবে কারণ সব মানুষের মধ্যেই বিজ্ঞানমনস্কতা অতিদ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

টীকা

- ১ এই প্রবন্ধ ছাড়া, ড. মিহির চৌধুরী কামিল্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা গ্রন্থ — *রাঢ়ের গ্রাম্য দেবতা*, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৯।
- ২ সাঁওতাল জাতির ধর্ম ও সংস্কৃতি — নায়কে শ্রীমঙ্গলচন্দ্র তুড়কু লুমাম সরেন; গ্রামীণ গবেষণা ও চর্চাকেন্দ্র, ঝাড়গ্রাম; ২৩শে জুন, ১৯৮২।
- ৩ ধীরেন্দ্র নাথ বাক্সে : *হড় সমাজের বঙ্গাবুককো* : শ্রীমতী অনিতা বাক্সে, ১৮/১ শান্তিনগর, রিজেন্ট পার্ক, কলকাতা ৭০০ ০৪০। লেখক এই বইটি আমাকে উপহার দিয়ে বাণিত করেছেন। এবং বর্তমান প্রবন্ধ রচনায় তিনি আমাকে উৎসাহিত করেছেন। এই সুযোগে তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। বইটি প্রকাশিত হয়েছে— নভেম্বর, ২০০৩।
- ৪ *হড়কোরেন মারে হাপড়াম কো রেয়াঃ কাথা* : পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী উন্নয়ন সমবায় নিগম লিঃ প্রকাশনা : প্রথম সং ১৯৯৩। রোমান হরফে প্রথম ছাপা হয়েছিল বোনাগড়িয়া মিশন প্রেস থেকে ১৮৮৭ সালে। এই বইয়ের একটি বঙ্গানুবাদ এবং একটি ইংরেজি অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছিল।
- ৫ *খেরওয়াল বংশা ধরমপুঁথি* : বঙ্গানুবাদ সুকুমার শিকদার ও সারদাপ্রসাদ কিস্কু (খে, বা) : নির্মল বুক এজেন্সি : ২য় সং মে, ২০০৫।
- ৬ দ্রষ্টব্য — *খেরওয়াল বংশা ধরমপুঁথি* — অনিমেঘ কান্তি পাল — বইয়ের কাগজ ২২ বর্ষ, সংখ্যা ৬, অশ্বিন ১৪১০, ৩ নং শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩।
- ৭ দ্রষ্টব্য — *লোক সংস্কৃতি* — অনিমেঘকান্তি পাল : বামা পুস্তকালয় : ১১এ বক্সিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩; ১ম সং ১৯৯৬ জানুয়ারি, ২য় সং মে ২০০০। বিশেষ দ্রষ্টব্য — *ধর্ম* : লোক ধর্ম পৃ: ৭৩ - ১৬ নং রেখাচিত্র।

- ৮ সুধীর কুমার করণ : উপজাতি সমাজের চিন্তা ও চেতনা : সংহতি — রচনা সংকলন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২৬শে নভেম্বর, ১৯৮৭।
- ৯ বিশ্বভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত, অর্ধশতাব্দী প্রাচীন, সুনীতিকুমারের অতিশয় মূল্যবান এই রচনাটি সম্প্রতি পুনঃ প্রকাশিত হয়েছে শ্রীদীপকর ঘোষ সম্পাদিত একটি সংকলন গ্রন্থে। গ্রন্থটির নাম— *বাংলা সাময়িক পত্রে আদিবাসী কথা*। প্রাক স্বাধীনতা পর্বে প্রকাশিত নৃতত্ত্ব ও আদিবাসী চর্চা বিষয়ক প্রবন্ধ সংকলন। প্রকাশক লোক সংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র। এই প্রকাশনাটির জন্য সম্পাদক ও প্রকাশক ধন্যবাদার্থ।
- ১০ নায়কে মঙ্গল চন্দ্র তাঁর এই বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করবেন লিখেছিলেন গ্রন্থ শেষে। লেখা হয়েছিল কিনা জানি না। লেখা হয়ে থাকলে তা সংগ্রহ করে অবিলম্বে প্রকাশ করা উচিত।
- ১১ এই ছবিগুলি নেওয়া হয়েছে ধীরেন্দ্রনাথ বাক্সের *পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ* (প্রথম খণ্ড) বইয়ের ১৯৭ পৃষ্ঠা-থেকে। ৩য় সং ১৯৯৯। সুবর্ণ রেখা। ৭৩ মহাত্মা গান্ধীরোড কলকাতা।
- ১২ সাধু রামচাঁদ অনলমালা : তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এপ্রিল ১৯৯৭।
- ১৩ সত্য ধর্ম গীতি পুস্তক (১ম খণ্ড) সাধু রামচাঁদ মূর্মু। অনুবাদক শুকচরণ মূর্মু। ভারতীয় ক্ষুদ্র ভাষা অধ্যয়ন ও উন্নয়ন কেন্দ্র, ১০/১৬, কবি ভারতচন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৮
- ১৪ আশ্চর্যের ব্যাপার যে অভিধানেই P.O. Bodding দেবদেবীদের সম্বন্ধে প্রধান কথাগুলি বলে দিয়েছেন।
- ১৫ J. Troisi সাঁওতালি ভাষা, সাহিত্য, সমাজ, সংস্কৃতি নিয়ে রচিত বই ও প্রবন্ধাদির একটি বড়োতালিকাও প্রস্তুত করেছেন যাতে পাঁচশোর কাছাকাছি entry রয়েছে। এটির নাম *The Santals*।
- ১৬ V. K. Kochar সাঁওতালদের নিয়ে অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখেছেন। The Asiatic Society-র জার্নালেও তাঁর একাধিক লেখা বেরিয়েছে এই সম্বন্ধে, যথা *Family Spirit and Derties among the Santals: Vol-V, No. 3 & 4, 1963.*
- ১৭ চারু লাল মুখার্জি দুমকায় ওকালতি করতেন। সেই সূত্রে তিনি সাঁওতালদের সংস্রবে এসেছিলেন। সাঁওতালি চর্চার জন্য তিনি ময়ূর ভঞ্জের রাজ্যের আমন্ত্রণে কয়েকবার ক্ষেত্রীয় অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন ময়ূর ভঞ্জ রাজ্যে। তার বইটি ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের অনুদানে ছাপা হয়েছিল স্বাধীনতার দু বছর আগে কিন্তু কলকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ১ম সংস্করণের সব বই নষ্ট হয়ে যায়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সরকারের অর্থ সাহায্যে বইটির ২য় সং প্রকাশিত হয়। তিনি রায়ব্রহ্মপুরে রঘুনাথ মুর্মুকেও জিজ্ঞাসাবাদ করেন। Charulal Mukherjee— *The Santals*, A Mukherjee and Co. 2 Bankim Chatterjee Street, Calcutta, 1962
- ১৮ ড. অমলেন্দু মিত্র — *রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্ম ঠাকুর*, ১৯৭২।
- ১৯ Troisi, Bodding এবং Kochar এর মতামত পাওয়া গেছে ধীরেন্দ্র নাথ বাক্সের — *হড় সমাজের বঙ্গাবুক* বইয়ে। তাছাড়া এমনি সব উক্তি পাওয়া যায় Culshaw, Bompas প্রমুখ আরো অনেকের লেখাতে।

লেখা থেকে কথায় রূপান্তর এবং বাংলা অ

মীনা দাঁ

১ প্রাককথন

গণকযন্ত্র অর্থাৎ কম্পিউটার। কম্পিউটারের হাত ধরেই আমাদের একুশ শতকে প্রবেশ। আর আপাতত আমাদের ঘরকন্যা পেটিয়াম ওয়ান, টু, থ্রি পেরিয়ে ফোরের সঙ্গে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কম্পিউটার এখন নানান ভাবে নানান মাপে মানুষের জীবনে অঙ্গাঙ্গী জড়িয়ে গেছে। আর এই সম্বন্ধ ব্যক্তি মানুষকে অতিক্রম করে ক্রমশ সমাজ ও দেশের জীবনেও গড়িয়ে যাচ্ছে। দেশ-কাল-সমাজের সমস্যা সমাধানে কম্পিউটার ব্যবহৃত। এই সব সমস্যার অন্যতম ভাষা সমস্যা— বিশেষত ভারতবর্ষের মত বহুভাষী দেশে তো বটেই।

ভাষা ও কম্পিউটারবিজ্ঞানের হাতে হাত রেখে চলার এই যৌথ চারণভূমিই হল কম্পিউটেশনাল লিঙ্গুইস্টিকস। এ ক্ষেত্রের গবেষণার প্রধান দিকগুলি হল— কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা Artificial Intelligence বা IA, যন্ত্রানুবাদ বা Translation, বাক সংশ্লেষ বা Speech Synthesis ও অকৃত্রিম ভাষার মর্মোদ্ধার বা Natural Language Processing বা NLP।

সাক্ষর জগতে লেনদেনের ভাষা দুটো চেহারায়ে প্রচলিত—কথ্য ও লেখ্য। কথ্য ও লেখ্য— এই শব্দদুটিতে ভাষাতত্ত্বের বিভিন্ন পরিসর বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও গুরুত্ব আরোপ করে। ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে লিখিত ডকুমেন্টের ভাষাই বিবেচ্য বলে কথ্য ভাষার কোনো গুরুত্বই নেই। আবার সংগঠনী সঞ্জননী ভাষাতত্ত্বে কথ্য ভাষারই একচেটিয়া আধিপত্য, লেখ্য ভাষা তেমন কক্ষে পায় না। অন্যদিকে শৈলী বিজ্ঞানের পরিসরে লেখ্য ও কথ্যকে দুটি পৃথক শৈলী হিসেবে নির্ধারিত করা হয়। আর এই একুশ শতকের কম্পিউটেশনাল লিঙ্গুইস্টিকসের পরিসরে কথ্য ও লেখ্য ভাষাকে পরস্পরের প্রতিফলন হিসেবে গণ্য করা হয়। অর্থাৎ এখানে, বিভিন্ন ধ্বনি সাজিয়ে মুখে যা উচ্চারণ করছি তা হল কথ্য ভাষা আর সেই উচ্চারণের অক্ষরবন্দি রূপ হল লেখ্য ভাষা। উলটো দিক থেকে বলা যায়, যা অক্ষরে বা বর্ণে লেখা আছে তা হল লেখ্য ভাষা আর তার রিডিং পড়াটা হল কথ্য ভাষা। কম্পিউটেশনাল লিঙ্গুইস্টিকসের জগতে এই দুই কথ্য ও লেখ্য ভাষার নাম যথাক্রমে speech ও text।

একুশ শতকের বৈজ্ঞানিকের একটি নতুন কাজ হল কম্পিউটারকে লেখাপড়া শেখানো। অর্থাৎ কম্পিউটারকে text দিলে সে তা গড়ে দিতে পারবে, অর্থাৎ text কে speech-এ রূপান্তরিত করবে এবং speech দিলে সে তা লিখে ফেলবে বা text-এ রূপান্তরিত করবে। একে বলে লেখা থেকে কথায় ও কথ্য থেকে লেখায় রূপান্তর বা text-to-speech ও speech-to-text conversion।

NLP-র অন্যতম কাজ হল এই দুই ধরনের রূপান্তর। দু ক্ষেত্রেই নিবেশিত বা input লেখা বা কথাকে কম্পিউটার তার নিজস্ব বোধগম্য ডিজিটাল ভাষার বাইনারি সংকেত ১, ০ তে রূপান্তরিত করে। কম্পিউটারের এই নিজস্ব অধিভাষা বা metalanguage-এর বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা কম্পিউটার সায়েন্সের এলাকায় পড়ে, এই প্রবন্ধের পরিসরে নয়। এই প্রবন্ধে বাংলা লেখা থেকে কথায় রূপান্তরের ক্ষেত্রে অ-বর্ণ কেন্দ্রিক কিছু সমস্যা নিয়ে কথা বলব।

২ সমস্যা

লেখা-থেকে-কথায় রূপান্তরের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা বর্ণমালার প্রথম বর্ণ অ-এর সমস্যা মূলত অ-এর বর্ণরূপ ও তার উচ্চারণ— এই দুই-এর মধ্যে অসামঞ্জস্যের কারণে। সমস্যা উৎপত্তির কারণ হিসেবে বাস্তব ও আদর্শের ফারাক, অ-এর নিজস্ব জটিলতা ও কিছু সমাধান সূত্র— এই তিনভাগে আলোচ্য সমস্যাটির ওপর আলোকপাত করছি। আলোচনায় বর্ণ বোঝাতে < > এবং উচ্চারণ বোঝাতে []—এই দ্বিবিধ বন্ধনীর ব্যবহার করব।

২.১ আদর্শ আর বাস্তবের ফারাক

আদর্শগতভাবে এই লেখা ও কথা পরস্পরের সার্থক প্রতিফলন হওয়াই কাম্য। কিন্তু বাস্তব এই আদর্শের তেমন ধার ধারে না। ফলে তৈরি হয় সমস্যা, সমস্যাটি একটু খতিয়ে দেখা যাক।

কথার ক্ষেত্রে ভাষা উচ্চারণের বিভিন্ন এককগুলি হল ক্রমান্বয়ে ধ্বনি, দল, শব্দ, বাক্যাংশ, বাক্য ইত্যাদি। আর লেখার বিভিন্ন একক হল বর্ণ, শব্দ, বাক্যাংশ, বাক্য ইত্যাদি। অর্থাৎ এই দুইটি রীতির ক্ষুদ্রতম একক দুটি হল ধ্বনি বা phoneme এবং বর্ণ বা grapheme।

যদি ভাষায় ধ্বনি ও বর্ণের সাযুজ্য সম্বন্ধটি সর্বতোভাবে ১ঃ১ হয় তবে ধ্বনি সম্বন্ধে গঠিত যে কোনো বৃহত্তর একক এবং বর্ণ সম্বন্ধে গঠিত অনুরূপ কোনো বৃহত্তর এককের পারস্পরিক সম্বন্ধও ১ঃ১ হবে। ফলত কথা ও লেখা হয়ে উঠবে পরস্পরের সার্থক প্রতিফলন।

ধ্বনি ও বর্ণের ১ঃ১ সম্বন্ধ অসম্ভব দুটি শর্তসাপেক্ষ। প্রথমত, পরিমাণগতভাবে, একটি ধ্বনি একটি বর্ণের বা বিপরীতক্রমে একটি বর্ণ একটি ধ্বনির প্রতিনিধিত্ব করবে; তার কম বা বেশি নয়। দ্বিতীয়ত, গুণগতভাবে, একটি নির্দিষ্ট ধ্বনি সর্বক্ষেত্রেই একটি নির্দিষ্ট বর্ণের বা বিপরীতক্রমে একটি নির্দিষ্ট বর্ণ একটি নির্দিষ্ট ধ্বনির প্রতিনিধিত্ব করবে। অর্থাৎ একই ধ্বনি বা একই বর্ণ স্থানবিশেষে ভিন্ন বর্ণ বা ভিন্ন ধ্বনির প্রতিনিধিত্ব করবে না।

বাস্তবে কিন্তু ভাষার ধ্বনি ও বর্ণের মধ্যে এই রকম আদর্শ ১ঃ১ সাযুজ্য সম্বন্ধ দুর্বল। দুটি উদাহরণ দেব। প্রথমটি কৃত্রিম ভাষা এসপেরান্তোর— যেখানে বর্ণ ও ধ্বনির মধ্যে রয়েছে আদর্শ ১ঃ১ সাযুজ্য সম্বন্ধ। দ্বিতীয়টি সমস্যাসম্মূল বাংলা ভাষার।

এসপেরান্তো বর্ণমালায় ২৮টি বর্ণ। প্রতিটি বর্ণেরই উচ্চারণ সুনির্দিষ্ট, কোনো নড়চড় নেই। J. C. Well-এর (১৯৬৯) কথায়— The Esperanto orthography is phonemic, every word is pronounced just as it is spelt.—এ ভাষায় এক বর্ণের একাধিক উচ্চারণ বা একাধিক বর্ণের এক উচ্চারণের সমস্যা নেই; ইংরেজির মতো কোনো অনুচ্চারিত বর্ণও নেই। যেমন এখানে <a, e, i, o, u> বর্ণের উচ্চারণ যথাক্রমে [আ, এ, ই, ও এবং উ]। এইভাবে

<amiko> [আমিকো] 'বন্ধু'
 <grupo> [গ্রুপো] 'দল'
 <karaktero> [কারাকতেরো] 'চরিত্র'
 <irlando> [ইরলান্দো] 'আয়ারল্যান্ড'
 <multipliku> [মূলভিত্তিক] 'গুণ করা'
 <tuta> [তুতা] 'সম্পূর্ণ' ইত্যাদি।

বর্ণ ধ্বনির এই আদর্শ সাযুজ্য সম্বন্ধের জন্য এসপেরান্তোয় লেখা-থেকে-কথা বা কথা-থেকে-লেখায় রূপান্তরে কোনো সমস্যা নেই।

বাংলা ভাষায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধ্বনি ও বর্ণের মধ্যে আদর্শ সম্বন্ধে দেখা গেলেও সামগ্রিকভাবে আদর্শচ্যুতিই নজর টানে। <ক, খ, গ, ঘ, চ, ট, ত, ম> ইত্যাদি বর্ণ সদাসর্বদাই [k, kh, g, gh, c, T, t, m] ইত্যাদি ধ্বনিতে রূপান্তরিত। যদিও যুক্তাক্ষরের ক্ষেত্রে এই সব বর্ণের চেহারা কিছু তারতম্য দেখা যায়, তবুও মোটামুটিভাবে বলা যায় যে পরিমাণগত ও গুণগত— উভয় শর্তসাপেক্ষেই এইসব বর্ণ ও ধ্বনির মধ্যে ১ঃ১ সম্বন্ধ বিদ্যমান। কিন্তু <ই, ঈ, উ, ঊ, এ, অ, ন, ণ, শ, স, ষ, য, জ> ইত্যাদি বর্ণ ও তাদের ধ্বনি প্রতিনিধির মধ্যে আদর্শ সম্বন্ধের নেহাতই ঘাটতি, যেমন <ন, ণ> দুয়েরই উচ্চারণ [n]; <য, জ> উচ্চারণে [j]; <শ, স, ষ> উচ্চারণে [S]; <ই, ঈ> উচ্চারণে [i]; <উ, ঊ> উচ্চারণে [u]; আবার <অ> এর উচ্চারণ কোথাও [O] যেমন অনেক, আবার কোথাও [O], যেমন অতি।

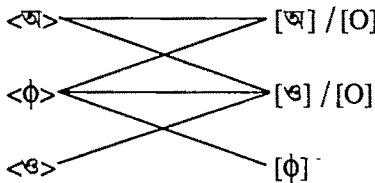
এই বৈষম্যের জন্যই বাংলায় লেখা-থেকে-কথা বা কথা-থেকে-লেখায় রূপান্তর সমস্যাসঙ্কুল। এই সমস্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস <অ>।

২.২ <অ>-এর জটিলতা

<অ>-এর প্রকৃতি অন্য বর্ণের চেয়ে কিছু পৃথক। লেখায় <অ> কখনো দৃশ্য, কখনো অদৃশ্য। প্রায় প্রতিটি ব্যঞ্জন বর্ণের মধ্যে <অ>-এর অদৃশ্য উপস্থিতি। যেমন ক=ক্+অ। ক-এর অ-কে বাদ দিতে হলে হসন্ত চিহ্ন ব্যবহার করতে হয়। সুতরাং বর্ণস্তরে <অ>-এর দুটো চেহারা <অ> ও শূন্য বা ϕ ।

ধ্বনি বা উচ্চারণের স্তরে <অ>-এর রূপান্তর হয় তিনভাগে [অ/O], [ও/o] এবং শূন্য বা ϕ ।

বর্ণ ও ধ্বনি-এ দুই স্তরে অ-এর সাযুজ্যের ছবিটা নীচের মতো :



এই একই বর্ণের দুই চেহারা, তাদের তিনটি ধ্বনি মূল্য, এবং ভিন্ন একটি বর্ণের সঙ্গে অভিন্ন এক ধ্বনিমূল্য— এই সব তথ্যই সম্মিলিতভাবে জটিলতার সৃষ্টি করে একাধিক ক্ষেত্রে— ধ্বনিতত্ত্বে, ভাষাশিক্ষণে ও NLP তে।

শব্দের বিভিন্ন অবস্থানে <অ>-এর ধ্বনি রূপান্তর কেমন হয় দেখা যাক।

ক. <অ> ও তার বিকল্প ϕ , অর্থাৎ <অ/ ϕ > কে শব্দের আদিতে ও প্রথম দলে দেখা যায়। এই দুই অবস্থানকে একসাথে শব্দ আদি অবস্থান সাব্যস্ত করছি।

শব্দ আদিতে <অ/ ϕ >-এর দু রকম ধ্বনিক রূপান্তর হয় [অ] ও [ও] যেমন—

১. <অ/ ϕ > = [অ/ও]

<অনেক> [Onək]	<অত> [Oto]	<কমল> [kOmɔl]
<অর্জন> [Orjɔn]	<সরল> [SOrol]	<পটল> [pOTol]
২. <অ/ ϕ > = [ও/ও]

<নতুন> [notun]	<অতি> [oti]	<দলিল> [dolil]
<অর্জুন> [orjun]	<মরু> [moru]	<প্রথম> [prothom]

খ. শব্দান্ত অবস্থানে কেবলমাত্র < ϕ > এর উপস্থিতি দেখা যায়— যার ধ্বনিক রূপান্তর দু রকম [ও] ও [ϕ]।

৩. < ϕ > = [ও/ও]

<অন্য> [onno]	<গল্প> [gOlpo]	<শত> [SOto]
<আস্ত> [asto]	<গর্ত> [gOrto]	<নষ্ট> [nOSTo]
৪. < ϕ > = [ϕ]^২

<জল> [jOl]	<আকাশ> [aKaS]	<নরম> [nOrom]
<দেশ> [deS]	<বাগান> [bagan]	<গভীর> [gobhir]

গ. শব্দ মধ্য অবস্থানেও শুধুমাত্র < ϕ > এর উপস্থিতি দেখা যায় এবং এর ধ্বনিক রূপান্তর তিন ধরনের— [অ], [ও] ও [ϕ]।

৫. < ϕ > = [অ/ও]

<বিগত> [bigOto]	<উজ্জ্বল> [ujjOl]	<উর্বর> [urbOr]
<বিষয়> [biSOY]	<অসবর্ণ> [OSobOrno]	<অনর্গল> [OnorgOl]
<আকর্ষ> [akOrno]	<অনলস> [OnolOs]	<অনবরত> [OnobOroto]
৬. < ϕ > = [ও/ও]

<অলস> [OloS]	<আলোচনা> [alocona]	<গরম> [gOrom]
<অবসর> [OboSOor]	<অবদমিত> [Obodomito]	<ভীষণ> [bhiSon]
৭. < ϕ > = [ϕ]^২

<একমাত্র> [Ekmatro]	<হাতকড়া> [hatkORa]	<কলতলা> [kOltOla]
---------------------	---------------------	-------------------

ঘ. একদল শব্দে শব্দান্ত < ϕ > উচ্চারণে সর্বদাই [অ/ও], কিন্তু দুই ব্যঞ্জনের মধ্যবর্তী < ϕ >-এর ধ্বনিক রূপান্তর দু রকম [অ] ও [ও]।

৮. শব্দান্ত < ϕ > = [অ/ও]

<থ> [thO]	<শ> [SO]
-----------	----------

৯. <φ> = [অ/0]
 < পথ > [pOth] < মত > [mOt] < রঙ > [rON]
 < জ্বর > [jOr] < সর > [SOOr] < কল > [kOl]
১০. <φ> = [ও/০]
 < মন > [mon] < বন > [bon]
 < ধন > [dhon] < যম > [jom]

বিভিন্ন ধরনের ধ্বনিতাত্ত্বিক টানাপোড়েনের ফলে <অ/φ> -এর এই বিভিন্ন ধ্বনিক রূপান্তর ঘটে। এই টানাপোড়েনের সূত্রগুলির মধ্যেই লুকিয়ে আছে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ সাপেক্ষে <অ/φ> -এর সঠিক ধ্বনিক রূপান্তরের চাবিকাঠি।

২.৩ কয়েকটি সমাধান সূত্র

ভাষায় এক সেট ধ্বনিসমিবেশের বিধিনিষেধ বা Phonotactic restrictions এবং এক সেট ধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্র বা phonological rules যৌথভাবে <অ/φ> -এর সঠিক ধ্বনিক রূপান্তর নির্দিষ্ট করে।

ধ্বনিসমিবেশের বিধিনিষেধগুলি একটি ভাষার প্রাথমিক ধ্বনিতাত্ত্বিক রূপটি নির্ধারিত করে। কোনো ভাষায় ব্যবহারের অযোগ্য ধ্বনিসমিবেশগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে এই বিধিনিষেধগুলি। যেমন, বাংলার এই রকমই একটি বিধিনিষেধ অনুযায়ী বাংলা উচ্চারণে তালব্য শ ও র এর সমিবেশ অগ্রহণযোগ্য, যদিও বাংলায় এই দুটি ধ্বনিই আলাদা আলাদা ব্যবহার হয়। র-এর সমিবেশে তালব্য শ সর্বদা দন্ত্য স-এ পরিণত হয়— শ্রী শব্দের <শ> -এর উচ্চারণ দন্ত্য, তালব্য নয়।

আর ধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্র অনুসারে সাধারণত ভাষার এক ধ্বনি অন্য ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়। যেমন— বাংলায় প্রায় প্রতিটা ক্রিয়ারই অন্তত দুটি করে রূপ—লিখ/লেখ, দেখ/দ্যাখ, শু/শো ইত্যাদি। ধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্রই এক্ষেত্রে নির্দেশ দেয় যে যদি ক্রিয়ার বিভক্তি অংশে ই/উ স্বরধ্বনি থাকে তাহলে সেই বিভক্তির সঙ্গে ক্রিয়ার লিখ, দেখ, শু ইত্যাদি রূপগুলি ব্যবহার হবে— লিখুন (লিখ + উন); দেখি (দেখ + ই) ; শুক (শু + উক) ইত্যাদি।

এই দু ধরনের বিধিনিষেধ ও সূত্র হাতে হাত মিলিয়ে <অ/φ> -এর সঠিক ধ্বনিক রূপান্তরের সূত্র নির্ধারণ করে। নীচে এই রকমই কিছু সূত্র দেওয়া হল।

১১. শব্দসীমা সূত্র বা rule of word boundary

এই সূত্র অনুসারে শব্দসীমার অব্যবহিত পরবর্তী দলের <অ/φ> -এর উচ্চারণ [অ/0] যেমন—

অনেক # Onek # ° আকর্ষ # a#kOrmo#
 সরল # SOrol# পটল # pOTol # ইত্যাদি।

১২. সমীভবন সূত্র বা rule of assimilation

পরবর্তী দলে <ই/ঈ> বা <উ/ঊ> থাকলে <অ/φ> -এর উচ্চারণ হবে [ও/০]। যেমন
 oti orjun dolil notun moru ইত্যাদি।

১৩. বিষমীভবন সূত্র বা rule of dissimilation

পূর্ববর্তী দলে <ই/ঈ> বা <উ/ঊ> থাকলে <অ/ঔ>-এর উচ্চারণ হবে [অ/ও] যেমন—

ujjOI biSOY urbOr ইত্যাদি।

১৪. শ্বাসাঘাতের স্থান পরিবর্তন সূত্র বা rule of stress shift

যদি শব্দসীমা সূত্র প্রয়োগের ফলস্বরূপ দেখা যায় কোনো শব্দে শব্দ মধ্যবর্তী দ্বিতীয়, তৃতীয় এমনকি চতুর্থ দলে পরপর দুটি বা তিনটি <অ/ঔ> তাহলে তাদের উচ্চারণ যথাক্রমে [ও/ও], [অ/ও] ও [ও/ও] হবে যেমন—

অনবরত # On # Obo # rOtO # → OnobOrOtO

অনলস # On # OloS # → OnolOS

অসবর্ণ # O # SO # bOrno # → OSobOrno ইত্যাদি

১৫. শব্দান্ত সূত্র বা word final rule

অ. দুটি যুক্ত ব্যঞ্জন বা <cc> র অব্যবহিত পরবর্তী শব্দান্ত <অ/ঔ>-এর উচ্চারণ [ও/ও]। যেমন—

gOlpo nOSTo gOrto ইত্যাদি।

আ. সাধারণত <ত> এর অব্যবহিত পরবর্তী <অ/ঔ> এর উচ্চারণ [ও/ও] যেমন—

bigOto jibito Ononto ইত্যাদি।

ই. অন্যথায় শব্দান্ত <অ/ঔ> এর উচ্চারণ [ঔ]। যেমন—

akaS deS bagan gobhir ইত্যাদি।

১৬. বর্ণ সাপেক্ষ সূত্র বা character specific rule

<প্র>, <ব্র> <প্ৰ> ইত্যাদির <অ/ঔ>-এর উচ্চারণ [ও/ও]। যেমন—

prothom groho prodhan broto proSno ইত্যাদি।

১৭. একদল শব্দের সূত্র বা rules of monosyllables

অ. শব্দান্ত <অ/ঔ>-এর উচ্চারণ [অ/ও]। যেমন—

thO SO ইত্যাদি।

আ. দুই ব্যঞ্জনের মধ্যবর্তী <অ/ঔ>-এর উচ্চারণ [অ/ও], যদি পরবর্তী ব্যঞ্জনটি অ-নাসিক্য হয়। যেমন—

jOl pOth mOt jOr kOl ইত্যাদি।

ই. পরবর্তী ব্যঞ্জনটি নাসিক্য হলে দুই ব্যঞ্জন মধ্যবর্তী <অ/ঔ>-এর উচ্চারণ [ও/ও]। যেমন—

mon bon jom dhon ইত্যাদি।

এর পরবর্তী ধাপে এই সূত্রগুলি রূপান্তরিত হবে অ্যালগোরিদম-এ। সেই অ্যালগোরিদমের ভিত্তিতে তৈরি হবে প্রোগ্রামিং কম্পিউটারের বোধগম্য ডিজিটাল সংকেতে, কম্পিউটার বিজ্ঞানীর গবেষণাগারে।

অর্থাৎ NLP-র একটি কম্পিউটেশনাল প্যাকেজে এই সব সূত্রগুলি অবশ্যই অত্যন্ত মনশিয়ানার সঙ্গে সংস্থিত হবে। এই সংস্থিতি প্রসঙ্গে দুটি প্রশ্ন হল— কেমন ভাবে ও কোথায় হবে এই সংস্থিতি। কেমন ভাবে প্রসঙ্গে দু-এক কথা তো বললাম। কোথায় প্রশ্নে বলা ভালো যে এই সূত্রগুলি প্যাকেজের একটি নির্দিষ্ট অংশে বা module-এ সীমাবদ্ধ না রেখে প্রয়োজন অনুযায়ী

বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক অংশে ছড়িয়ে দেওয়াই কার্যকরী। কারণ সেক্ষেত্রে প্রতিটি সূত্রই তার পক্ষে জরুরি অন্যান্য অংশের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করে লেখা-থেকে কথায় রূপান্তরের দায়িত্ব পালন করবে।

বস্তুত, কেমনভাবে ও কোথায়— এই দুই সমস্যার সমাধান খোঁজার ক্ষেত্রটাই হল কম্পিউটার বিজ্ঞানী ও ভাষাতাত্ত্বিকের হাত মিলিয়ে কাজ করার প্রকৃত ক্ষেত্র। বর্তমান বিশ্ববাজারের পরিপ্রেক্ষিতে এই ক্ষেত্র অত্যন্ত সম্ভাবনাময়। কম্পিউটার বিজ্ঞানী ও ভাষাতাত্ত্বিকের মধ্যে চিন্তার আদানপ্রদান সবে শুরু হয়েছে। এই দুই তরফের পারস্পরিক বোঝাপড়া যত বৃদ্ধি পাবে এই যৌথ ক্ষেত্রটির সম্ভাবনা ততই সাফল্যের মুখ দেখবে।

৩ পরিধির বাহিরে ঝাঁকি দর্শন

<অ>-এর লেখা-থেকে-কথায় রূপান্তরের ধাপগুলো পর পর যতটা সরলভাবে বর্ণনা করা হলো বাস্তবে কাজটা কিন্তু সত্যিই এত সহজ নয়। কারণ উপরোক্ত সূত্র বা নির্দেশগুলো অনুসরণ করলেও ভাষার প্রতিটি <অ>-এর সঠিক ধ্বনিক রূপান্তর হবে না, অর্থাৎ অনেক বৈঠিক রূপান্তর তখনো থাকবে। এই বৈঠিক রূপান্তরের যে কারণগুলো ভাষাতত্ত্বেরই এলাকাধীন সেইরকম কিছু কারণের ওপর আলোকপাত করছি।

প্রথমত, এখানে দেওয়া ১১—১৭ পর্যন্ত সূত্রগুলি সঠিক ধ্বনিক রূপান্তরের সূত্র হলেও এই তালিকা কিন্তু সম্পূর্ণ নয়। বস্তুত বাংলা ভাষায় শুধু <অ> নয় <এ> ধ্বনিটিরও উচ্চারণ বিকল্প দেখা যায়— [এ/e] এবং [এ্যা/E]। এই দুটি স্বরধ্বনিই তাই বাংলা ধ্বনিতত্ত্বে সমস্যা সঙ্কুল এলাকা বলে চিহ্নিত। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে অনেক ভাষার কারবারীরই দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে এ সমস্যার প্রতি। হয়েছে ধ্বনিতাত্ত্বিক গবেষণাও। কিন্তু এখনো পূর্ণাঙ্গ সমাধান সম্ভব হয়নি।

দ্বিতীয়ত, শুধু মাত্র ধ্বনিতত্ত্বের ভিত্তিতে <অ>-এর সঠিক ধ্বনিক রূপান্তরের ব্যাখ্যা দেওয়াও সম্ভব নয়। ধ্বনিতাত্ত্বিক ছাড়াও অন্যান্য অনেক কারণ বা factorও এখানে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই সব কারণ কখনো ভাষার বিবর্তনগত, কখনো উপভাষাগত, কখনো সমাজ ভাষাতত্ত্বজনিত, কখনো শৈলীভিত্তিক, আবার কখনো বা মনস্তাত্ত্বিক ভাষাতত্ত্বগত। উদাহরণ দিয়ে আলোচনা করলে তবেই এ বস্তুব্য প্রাঞ্জল হবে।

সে কাজ করে।

করে = kOre

সে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে এল।

করে = kore

এই দুটি বান্ধেই <করে> লেখা হয় একভাবে যদিও তাদের উচ্চারণ আলাদা। শব্দ দুটি এক কালে চেহারা পৃথক ছিল। ভাষার বিবর্তনের ফলে কালক্রমে লেখায় শব্দ দুটির চেহারা এক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোনো সরল স্বচ্ছ ধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্র দিয়ে এই দুই ক্ষেত্রে <অ>-এর সঠিক ধ্বনিক রূপান্তরের ব্যাখ্যা দেওয়াই সম্ভব নয়।

বাংলায় উপভাষাগত মিশ্রণ সদাসর্বদাই ঘটছে। কোলকাতার মুখের ভাষা, যা মান্য বলে সাব্যস্ত, তাতেই রয়েছে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের উপভাষা মিশ্রণ। ফলে একই শব্দের <অ>-এর উচ্চারণ দুই মুখে দু'রকম— মহল শব্দটিকে কেউ উচ্চারণ করেন [mOhol], কেউ [mohol]; ভক্ষণ হল [bhOkkhon] বা [bhokkhon]; একই মানুষ অতুলকে কেউ ডাকেন [Otul], কেউ ডাকেন [otul]; সুবল নামের ব্যক্তির কেউ বলেন তাঁর নাম [SubOI], কেউ বলেন [Subol]। ভারি,

বড় শব্দ অসবর্ণ-এর উচ্চারণ [OSobOrno]-র পাশাপাশি [OSObOrno]ও হয়। এ সবই গ্রাহ্য। কোনো ক্ষেত্রেই বুঝতে বোঝাতে তিলমাত্রও অসুবিধে নেই। এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলা দেশের দুই ভিন্ন মান্যভাষা ভেদে <অ>-এর উচ্চারণ তো ভিন্ন হবেই।

সমাজ ভাষাতত্ত্বের প্রেক্ষিতে দেখা যায় পারিপার্শ্বিকের বদলের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উচ্চারণ বদলাচ্ছে— <অ>-এর উচ্চারণ সহ। যে শিল্পী গান বা আবৃত্তির আসরে মন; ধন, অন্তর-এর উচ্চারণ করছেন [mOn], [dhOn], [OntOr] তিনিই দিন দৈনিকের মুখের ভাষায় বলেন [mon], [dhon], [Ontor]।

শৈলীর নিরিখে দেখা যায় আমাদের কথা বলা ও লেখা— এই দুই রীতিতে শব্দ চয়নের পার্থক্য হয়। লেখায় বিষয়বস্তুর খাতিরে ভারী, বড় অচেনা শব্দ ব্যবহার হয় যা মুখের স্বাভাবিক কথায় অনুপস্থিত। এই সব শব্দের সঙ্গে যাঁদের চেনাজানা কম বা একেবারেই নেই তাঁরা কিন্তু এদের মুখোমুখি হলে এদের উচ্চারণ নিয়ে সংশয়াস্থিত হন।

যে কোনো ভাষাশিক্ষণের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে ভাষা-ব্যবহারের চারটি চ্যানেলকে সক্রিয় করে তুলতে হয়— শোনা, বলা, পড়া ও লেখা। মাতৃভাষা বা প্রথম ভাষার ক্ষেত্রে শোনা ও বলা আপনা আপনিই আয়ত্তে আসে। কিন্তু পড়া ও লেখা শিখতে হয় প্রথাগত শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে। এই প্রথাগত ব্যবস্থায় একটি শিশু নীচু ক্লাস থেকে যত ওপরের ক্লাসে ওঠে ততই পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে তার সঙ্গে লেখার জগতের বড়, ভারী নতুন শব্দের পরিচয় ঘটে। কিন্তু প্রথম পরিচয়ের প্রথম রিডিং পড়ার সময়ে এই সমস্ত শব্দে <অ>-এর সঠিক ধ্বনিক রূপান্তর নিয়ে সে সমস্যায় পড়ে। সাত বছর বয়স্ক তৃতীয় শ্রেণির একটি শিশু আদর্শ সমর্থন, গোবর্ধন, প্রস্তর, গদ্য, কীটপতঙ্গ শব্দগুলি প্রথম পাঠে উচ্চারণ করল [adOrSo], [SOmOrthon], [gobordhOn], [prOstor], [gOddo], [kiTpOtONgo]।

একই ক্লাসের বিভিন্ন শিশুকে দিয়ে এই শব্দগুলিই রিডিং পড়ালে <অ>-এর সঠিক রূপান্তরের সমস্যা থাকবেই— সমস্যার ধরণ একই হোক বা ভিন্ন মুখে ভিন্ন ভিন্নই হোক।

বাংলায় ওপরে উল্লিখিত শব্দগুলির পুনরাবৃত্তির হার খুব কম। তাই এগুলি সাত/আট বছর বয়সি বাংলাভাষী শিশুর কাছে নেহাতই অপরিচিত। কিন্তু এই সাত/আট বছর বয়সী শিশুদের কাছে তাদের কথা ভাষার ধ্বনি সম্বন্ধীয় বিধিনিষেধ ও সূত্রাবলি ভালোভাবেই মজুত। তাই কথা বলার সময় তারা কখনো অ এবং ও-র উচ্চারণ ভুল করে না। কিন্তু তারা তাদের কথা ভাষার রীতিনীতিগুলো লেখায় দেখা এই অচেনা শব্দগুলোতে প্রয়োগ করতে সমর্থ হয় না। ফলে দেখা যায় <অ>-এর বেঠিক ধ্বনিক রূপান্তর।

এই উদাহরণের সাহায্যে যে কথাটা স্পষ্ট করতে চাইছি তা হল কথা ভাষার ধ্বনিতত্ত্বের পূর্ণ জ্ঞান লেখার ভাষার বিভিন্ন ধরনের শব্দে উপস্থিত <অ>-এর সঠিক ধ্বনিক উচ্চারণ নির্ধারণ করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। দুই-এর মধ্যে কোথাও একটা ফাঁক থেকে যায়। শিশুর মস্তিষ্কের মত অত্যন্ত কম্পিউটারও যদি এই ফাঁকের মোকাবিলায় সক্ষম না হয় তাহলে কম্পিউটারের এই সাফল্যে পৌঁছতে অর্থাৎ কম্পিউটারকে এই সাফল্যে পৌঁছে দিতে আমাদের কতদিন লাগবে? আর ধ্বনিতত্ত্বের পরিধির বাইরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা <অ>-এর ধ্বনিক রূপান্তর সম্পর্কিত খবরাখবরই বা কম্পিউটারকে শেখানো হবে কী ভাবে?

৪ অন্ত্যকথন

এ যাবৎ আলোচনার সংক্ষিপ্ত সার হল :

ক. বাংলা লেখা-থেকে-কথায় রূপান্তরের ক্ষেত্রে <অ> হল একটি চ্যালেঞ্জ।

খ. এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হবে ভাষার ধ্বনি সমিবেশের বিধিনিষেধ ও ধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্রাবলির তথ্যের সাহায্যে।

গ. এক্ষেত্রে ধ্বনিতত্ত্ব দিয়ে শুরু করলেও ধ্বনিতত্ত্বই শেষ কথা নয়। কারণ ধ্বনিতত্ত্বের পরিধির বাইরেও রয়েছে কিছু অক্ষরিক তথ্য।

আসলে শুধু লেখা-থেকে-কথা বা কথা-থেকে-লেখার ক্ষেত্রেই নয়, <অ>-এর উচ্চারণ হল একাধারে বাংলাভাষার নিজস্ব একটি বৈশিষ্ট্য ও চ্যালেঞ্জ। এই বহুভাষী কোলকাতা শহরেই <অ>-এর ঠিক-বেঠিক উচ্চারণের ভিত্তিতেই চিনে নেওয়া যায় বাঙালি এবং অবাঙালি বাংলা প্রেমী বাংলাভাষীকে। সামান্য রসগোল্লা কথাটির উচ্চারণ থেকে চিনে নেওয়া যায় অবাঙালি রসনাকে। অর্থাৎ কিনা অ-এর আমি, অ-এর তুমি, অ-দিয়ে যায় চেনা।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার বাংলা পরিভাষা নির্মাণের প্রয়োজনে প্রফেসর প্রবাল দাশগুপ্তের সঙ্গে আলোচনার প্রচুর উপকৃত হয়েছে।

টীকা

- ১ P. S. Roy et al (1966)-এর রীতি অনুসারে বাংলা শব্দের উচ্চারণ দেখানো হয়েছে। পাঠোদ্ধারে অসুবিধে হতে পারে এমন কয়েকটি বর্ণের ধ্বনিমূল্য নীচে দেওয়া হল :

a	-এর	উচ্চারণ	আম	শব্দের	আ	এর	মত
O	"	"	অনেক	"	অ	"	"
o	"	"	অতি	"	অ	"	"
e	"	"	একি	"	এ	"	"
E	"	"	এক	"	এ	"	"
Y	"	"	ভয়	"	য়	"	"
T	"	"	টিয়া	"	ট	"	"
t	"	"	তিন	"	ত	"	"
S	"	"	শাল	"	শ	"	"
s	"	"	স্থান	"	স	"	"
N	"	"	ব্যাং	"	ং	"	"

- ২ উচ্চারণে [ɔ]-র অবস্থান দেখাতে চাইলে লিখতে হবে জঙ্গ [jɔɪɔ], কলকাতা [kɔɪɔtɔɪa] ইত্যাদি।

- ৩ # শব্দাংশ সীমা নির্দেশক।

গ্রন্থপঞ্জি

বাংলা

সরকার, ড. পবিত্র, ১৯৯৯, ভাষা জিজ্ঞাসা, বিদ্যাসাগর পুস্তক মন্দির, কলকাতা।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ১৩৯৫ (বাংসন) বাংলা শব্দতত্ত্ব, বিশ্বভারতী, কোলকাতা।

ইংরেজি

- Bharati, Akshar, V. Chaitanya and R. Sangal. 2000. *Natural Language Processing : A Paninian Perspective*. Prentice Hall of India. New Delhi.
- Dan, M. 1992. *Some Issues in Metrical Phonology of Bangla : The Indigenous Research Tradition*. Unpublished Ph. D. thesis. University of Poona. Pune.
- Dasgupta, Probal, 2003. Bangla. George Cardona & Dhanesh Jain (eds.) *The Indo Aryan Languages*. Routledge. London/New York. 351-90.
- Lass, R. 1984. *Phonology*. Cambridge University Press. Cambridge.
- Ray, P.S., M.A. Hai, & L. Ray 1966. *Bengali Language Handbook*. Center of Applied Linguistics, Washington D. C.
- Scovel, Thomas. 2000. *Psycholinguistics*. Oxford University Press.
- Wells, J. C. 1969. *Esperanto and English Dictionary*. The English Universities Press Ltd London.

ব্রেল, বাংলা ও কম্পিউটার

বিদ্যুৎবরণ চৌধুরী

হাই ও ব্রেলের আবির্ভাব :

১৭৭১ সালের শরৎকালের কথা। ভ্যালেনটিন হাই (Valentin Haüy) নামে এক যুবক স্যাঁ ওভিদের (Saint Ovid) পথমেলা দেখতে প্যারিসে এসেছিলেন। সেই যুগে স্যাঁ ওভিদের পথমেলা ছিল প্যারিসের একটি বিখ্যাত উৎসব। মেলায় ঘোরাঘুরির পর দুপুরে একটি রাস্তার পাশে রেন্টারায় তিনি যখন মধ্যাহ্নভোজ সারছিলেন, তখন সেখানে একদল দৃষ্টিহীন ব্যক্তি রাস্তার ওপরে একটি ভাঁড়ামির নক্সা শুরু করে। বিদ্যুটে টুপি পরে; গাধার কানের মতো চাউস কৃত্রিম কান লাগিয়ে ও কার্ডবোর্ডের বড়ো বড়ো চশমা চোখে তারা এমন ভাব দেখাচ্ছিল যেন তারা এক একজন বিরাট সংগীতশিল্পী। স্বরলিপি লেখা কাগজগুলো উলটো করে সামনে রাখা, তার সঙ্গে চলছিল বিকৃত অঙ্গভঙ্গি, কর্কশ গলায় অর্থহীন কিচিমিচি এবং বেটপ ও বেসুরো পুরনো বাদ্যযন্ত্রে তোলা কিছুকিমাকার প্যাক পোক আওয়াজ। করুণ, অকৃত্রিম ও নিকৃষ্ট সেই ভাঁড়ামো দেখতে দেখতে চারপাশে ভীড় করে লোকজন হাততালির সঙ্গে ঝুল উল্লাসে ফেটে পড়ছিল। কিন্তু মজা পাওয়া দূরে থাক, এই দৃশ্যে হাই এতই দুঃখিত ও বিচলিত হন যে অর্ধেক খাবার ফেলে দিয়ে সেখান থেকে উঠে পড়েন।

এই ঘটনা দৃষ্টিহীনদের জগতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূত্রপাত করে। হাই প্রতিজ্ঞা করেন, একদিন ঘৃণা, অনুকম্পা ও উপহাসের জীবন থেকে তিনি তাঁদের মুক্তি দেবেন। বছকাল পর ১৭৮৪ সালের বসন্তকালে হঠাৎ তাঁর সামনে সেই সুযোগ আসে। সেদিন প্যারিসের স্যাঁ জার্মাইন দ্য প্রেস চার্চ (Saint Germain des Pres Church) থেকে বেরিয়ে তিনি এক অন্ধ ভিখারি বালককে একটি মুদ্রা দান করেন। আশ্চর্যের ব্যাপার, মুদ্রাটি হাতে অনুভব করে বালকটি সঙ্গে সঙ্গে তার সঠিক মূল্যমান বলে উঠল। এই ঘটনায় তড়িৎশিখার মতো হাইয়ের উপলব্ধি হয়, দৃষ্টিহীন ব্যক্তিরা প্রকৃত অর্থে স্পর্শকাতর, তারা স্পর্শ দিয়ে নানা রকমের তথ্য লাভ করে। হয়তো স্পর্শের সাহায্যে তারা লেখাপড়াও শিখতে পারবে।

ফ্রান্সোয়া লাস্যুর (Francois Lesueur) নামে সেই বারো বছরের অন্ধ বালকই ভ্যালেনটিন হাইয়ের প্রথম সুযোগ্য ছাত্র। হাই তাকে স্পর্শের সাহায্যে অক্ষর পরিচয় করান ও শব্দ উচ্চারণ করতে শেখান। লাস্যুর এত বুদ্ধিমান ছিল যে কোনো ছাপা কাগজের পৃষ্ঠার উলটোদিকে সামান্য উঁচু হয়ে থাকলে তার ওপর আঙ্গুল বুলিয়ে ওলটানো লেখাটি নির্ভুলভাবে পড়তে পারত। শিক্ষিত গণীজনকে প্রভাবিত ও আগ্রহী করে তোলার জন্য হাই একদিন তাকে প্যারিসের রয়্যাল অ্যাকাডেমিতে নিয়ে যান। রয়্যাল অ্যাকাডেমির পণ্ডিত ও বিজ্ঞানীরা ছেলেটির

ক্ষমতা দেখে প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তাঁরাও স্পর্শের মাধ্যমে দৃষ্টিহীনদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য হাইকে উৎসাহিত করেন।

লাসুয়ের দৃষ্টান্তে আশাবাদী হাই দৃষ্টিহীনদের জন্য একটি স্কুল খুলতে প্যারিসের বিখ্যাত ব্যক্তিদের কাছে আবেদন জানালে অনেকেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। এই পৃষ্ঠপোষকদের একজন ছিলেন খ্যাতিমান অন্ধ পিয়ানোবাদিকা মারিয়া ধেরেসিয়া। প্রথমে তাঁর বাড়িতেই হাইয়ের স্কুল শুরু হল। তারপর ফ্রান্সের সম্রাট বোডোশ লুইয়ের বদান্যতায় চক্ষিশূন্য ছাত্র নিয়ে বিশ্বের প্রথম দৃষ্টিহীনদের নিজস্ব স্কুল স্থাপিত হয় ৬৮ রু স্যা ভিক্তর (Rue Saint Victor) ঠিকানায়। প্রথমদিকে এই স্কুলের ছাত্রছাত্রী সবাই ছিল অভিজাত পরিবারের সন্তান। হাই তাদের খুব যত্ন করে লেখাপড়া শেখাতেন এবং সম্রাট ও অন্যান্য ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের দরবারে নিয়ে গিয়ে তাদের কৃতিত্ব দেখাতেন। সেই সময় দৃষ্টিহীনদের জন্য তিনি এক ধরনের এমবস (Emboss) করে লেখার প্রবর্তন করেছিলেন। ওই স্কুলে একটি প্রকাশনা সংস্থাও গড়ে উঠেছিল। সেখান থেকে তাঁর ও অন্য লেখকের এমবস-করা বইপত্র প্রকাশিত হত। পণ্ডিতদের মতে হাইয়ের রচিত শ্রেষ্ঠ বই হচ্ছে *An essay on the education of the blind*.

ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে হাইয়ের দিনগুলো ভালোই চলছিল, কিন্তু ইতিমধ্যে ফরাসী বিপ্লব শুরু হয়ে গেল। বিপ্লবের ডামাডোলে তিনি স্কুলের কর্তৃত্ব হারিয়ে শেষ পর্যন্ত ফ্রান্স থেকে পালাতে বাধ্য হন। তারপর দশ বছর ধরে রেমি ফর্নিয়ের (Remi Fournier) নামে একজন মেধাবী ছাত্রের সঙ্গে ইউরোপের নানা দেশে দৃষ্টিহীনদের শিক্ষা বিস্তারের কাজে ব্যস্ত থাকেন। তাঁদের উদ্যোগে একে একে লিভারপুল, ভিয়েনা, বার্লিন, সেন্ট পিটার্সবুর্গ, আমস্টারডাম, ড্রেসডেন, জুরিখ ও কোপেনহাগেনে অন্ধদের জন্য স্কুল গড়ে ওঠে। বিপ্লবের পর হাই দেশে ফিরে এলেন; কিন্তু তাঁর দুর্ভাগ্য, তখনকার ডিরেক্টর ড. গুইয়ের (Guillie) বিরোধিতায় নিজের প্রতিষ্ঠিত স্কুলে ঢুকবার পর্যন্ত সুযোগ পাননি।

১৮১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে লুই ব্রেল নামে এক দশ বছরের-বালক তার বাবার সঙ্গে কুপ্রে (Coupvray) থেকে প্যারিসে এসে এই স্কুলে ভর্তি হয়। সেই সময়ে কেউ কল্পনা করতে পারেনি, এই বালক একদিন দৃষ্টিহীনদের শিক্ষাজগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবেন। বালক লুই যখন ভর্তি হন, তখন স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ছিল প্রায় একশো। এই একশো ছাত্রের মধ্যে লুই ছিলেন বয়সে সবার চেয়ে ছোটো। সেজন্য স্কুলের বয়স্ক ছাত্ররা তাঁকে বেবি ব্রেল বলে ঠাট্টা করত।

সেই আমলের স্কুল ডিরেক্টর ড. গুইয়ে মোটেই সৎ ও ভদ্রলোক ছিলেন না। তিনি ছাত্রদের ওপর খুব অত্যাচার করতেন। লুই ভর্তি হওয়ার দুবছর পর চরিত্রহীনতার জন্য তাঁকে বরখাস্ত করে আঁদ্রে পিনিয়ের (Andre Pignier) নামে একজন শূণ্য ব্যক্তিকে স্কুলের দায়িত্ব দেওয়া হয়। দায়িত্ব নিয়েই তিনি ছাত্রদের অবস্থার উন্নতি শুরু করেন। একদিকে তিনি তাদের জামাকাপড়, বাসস্থান ও খাওয়া দাওয়ার প্রতি নজর দেন এবং অন্যদিকে পড়াশোনার ব্যাপারে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন।

শুধু তাই নয়, পিনিয়ের স্কুলের ইতিহাস স্মরণে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সেখানে তার প্রতিষ্ঠাতা হাইয়ের সংবর্ধনা দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। সেই সংবর্ধনায় লুই ব্রেল ও তাঁর সঙ্গীরা সংগীত পরিবেশন ও হাইয়ের এমবস করা বই থেকে পাঠ করেন। সেখানে হাইয়ের সঙ্গে লুইয়ের পরিচয়ও হয়। হাই ততদিনে বৃদ্ধ ও নিজেই প্রায় অন্ধ। পরের বছর

দৃষ্টিহীনদের এই পরম বন্ধু ও শিক্ষকের মৃত্যুতে যে অল্প কয়েকজন ব্যক্তি তাঁর শবানুগমন করেন, লুই ব্রেল ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

ব্রেলসঙ্কেতের আলো :

লুই ব্রেল তাঁর চর্মকার পিতার চতুর্থ সন্তান, জন্ম ১৮০৯ সালের ৪ঠা জানুয়ারি কুপ্বের্তে (Coupvetry)। জন্মকালে তাঁর চোখের দৃষ্টি ছিল স্বাভাবিক। বালক লুই তিন বছর বয়সে বাবার একটি তীক্ষ্ণধার যন্ত্র নিয়ে খেলতে গিয়ে চোখে আঘাত পান। স্থানীয় হাতুড়ে ডাক্তারের অপচিকিৎসায় তাঁর চোখে সংক্রমণ হয়। সেই সংক্রমণ দুই চোখে ছড়িয়ে পড়ায় তিনি পুরোপুরি অন্ধ হয়ে যান।

অন্ধ লুইয়ের পড়াশোনার আগ্রহ দেখে বাবা তাকে সাধারণ বালকদের জন্য স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। দৃষ্টিহীন হওয়া সত্ত্বেও স্থানীয় স্কুলে অত্যন্ত ভালো ফল করেন লুই। কিন্তু ইতিমধ্যে অন্ধদের পড়াশোনার বিরুদ্ধে এক সরকারি পরোয়ানা জারি হওয়ায় লুইয়ের পড়াশোনা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। তখন স্থানীয় গণ্যমান্য লোকেরা এই প্রতিভাবান বালকের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। ফলে প্যারিস গিয়ে হাইয়ের স্কুলে ভর্তি হওয়ার সুযোগ হল লুইয়ের।

লুই যখন স্কুলে ভর্তি হন তখন সেখানে মাত্র চোদ্দটি এমবস করা বই ছিল। হাইয়ের পদ্ধতি ছিল গোটা অক্ষরকেই বইয়ের পৃষ্ঠায় এমবস করে উঁচু করা। ফলে প্রতিটি অক্ষরের ওপর আঙ্গুল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গোটা একটি শব্দ পড়তে ছাত্রদের বেশ সময় লাগত। তাছাড়া অক্ষরগুলো ছিল সালঙ্কারা, লতাপাতার মত তার নানা অংশ এদিক ওদিক ছড়িয়ে থাকার জন্য দৃষ্টিহীনদের স্মৃতির ওপর অনেকখানি চাপ পড়ত। তবু এইভাবেই তাঁরা পড়াশোনা করতেন, কারণ এর চেয়ে কোন ভালো উপায় তাঁদের সামনে ছিল না।

কিন্তু লুই ভর্তি হওয়ার কদিন পর চার্লস বার্বিয়ের নামে এক আগন্তুক তাঁদের স্কুলে এসে একটি পরিবর্তনের দুয়ার খুলে দেন। বার্বিয়ের ছিলেন পেশায় সৈনিক। বিভিন্ন যুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি লক্ষ করেন, রাতের বেলায় আসা বার্তা পড়তে গিয়ে যখন কোনো সৈন্য একটি বাতি জ্বালায়, অমনি শত্রুপক্ষ তাদের অবস্থান বুঝতে পেরে আক্রমণ করে। তিনি ভাবছিলেন, এর চেয়ে কোনো স্পর্শগ্রাহ্য উপায়ে যদি বার্তা পাঠানো যায়, তবে সৈন্যদের আর বাতি জ্বালাতে হয় না। শুধু রাতে নয়, দিনের বেলাতেও কামানের আওয়াজ, আলোর ঝলকানি ও ঘন ধোঁয়ার মধ্যে কাগজে লেখা খবর পড়া অনেক সময় অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই অসুবিধে দূর করার জন্য বার্বিয়ের মোটা কাগজে স্থানে স্থানে তীক্ষ্ণ শলাকার সাহায্যে চাপ দিয়ে এমবস করা এক সাক্ষেতিক বার্তার কথা ভাবেন, যা আঙ্গুল দিয়ে স্পর্শ করে অন্ধকার জায়গাতেও পড়া যাবে। অবশেষে তিনি বারোটি ফুটকির নানা বিন্যাসের সাহায্যে গোটা বর্ণমালা লেখার এক অভিনব উপায় বের করেন। তবে নানা জটিলতা থাকার জন্য সনোগ্রাফি (Sonography) নামে সেই সঙ্কেত ব্যবস্থা সৈনিকদের মধ্যে তেমন জনপ্রিয় হয়নি। তখন একে দৃষ্টিহীনদের কাজে লাগাবার কথা ভেবে বার্বিয়ের একদিন প্যারিসের রয়্যাল ইনস্টিটিউশন ফর ব্লাইণ্ডের ডিরেক্টরের সঙ্গে দেখা করেন এবং স্কুলের ছাত্রদের ব্যাপারটি বোঝান। সেখানে এই পদ্ধতির পরিচয় পেয়ে বালক লুই অবাক, কারণ এর সঙ্গে তাঁর নিজের চিন্তাধারার গভীর সাদৃশ্য ছিল। তিনিও ছুটিতে বাড়ি গিয়ে এইরকম ফুটকির সাহায্যে নানা বর্ণ প্রকাশ করার চেষ্টা করতেন।

বার্বিয়েরের সঙ্কেতে কোনো বর্ণ গঠিত হত বারোটি বিন্দু দিয়ে। সেই সঙ্কেত দৃষ্টিহীনদের এক আঙ্গুলের ডগায় আঁতট না, ফলে পড়তে বেশ অসুবিধে হত। তাছাড়া এগুলো লিখতে বা এমবস করতে সময় লাগত অনেক বেশি। অন্যদিকে এই বর্ণমালা শার্টহ্যান্ডের মতো অক্ষরের চেয়ে ক্ষণিকের বর্ণনা হওয়ায় এতে অজস্র সাঙ্কেতিক সংক্ষেপীকরণ ছিল, যার নিয়ম মনে রাখা দৃষ্টিহীনদের পক্ষে মোটেই সোজা ছিল না। লুই সেজন্য একটি সহজ বর্ণমালার কথা চিন্তা করে বার্বিয়েরের সঙ্গে কয়েকবার আলোচনার চেষ্টা করেন। কিন্তু বার্বিয়ের লুইয়ের মতো একজন অল্পবয়সী বালকের মতামতকে গুরুত্ব দিতে চাননি। অগত্যা তিনি একা একাই একটি বর্ণসঙ্কেত উদ্ভাবনের কাজ শুরু করেন।

১৮২৪ সালের অক্টোবর মাসে মাত্র পনেরো বছর বয়সী কিশোর লুইয়ের নতুন বর্ণসঙ্কেতের কাজ শেষ হয়। দেখা গেল, তিনি তেষটি উপায়ে একটি ছয় বিন্দুর সেল ব্যবহার করে রোমান বর্ণমালা ও যতিচিহ্ন প্রকাশের উপায় খুঁজে পেয়েছেন। গণিতের নিয়ম অনুযায়ী, ছয় বিন্দুর সেল দিয়ে চৌষটি রকমের বিন্যাস সম্ভব। অব্যবহৃত একটি বিন্যাস শূন্য স্থান বোঝায়, যা তিনি ব্যবহার করেন শব্দান্তর প্রকাশ করতে। যাঁরা উচ্চ-মাধ্যমিক গণিত পড়েছেন, তাঁদের হয়তো এই ফল জানা, কিন্তু বালক লুই অঙ্ক না জেনেও যে চমকপ্রদ আবিষ্কার করেন, তার ভেতরে তাঁর যুগান্তকারী প্রতিভার ছাপ দেখা যায়। লুইয়ের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে স্কুলের ছাত্ররা এই ব্যবস্থা লুফে নিল। সৌভাগ্যবশত ডিরেক্টর পিনিয়েরও এই পদ্ধতিতে মুগ্ধ হয়ে একে সাদরে গ্রহণ করেন এবং স্কুলের ওয়ার্কশপে এইভাবে লেখার জন্য বিশেষ ব্লোট প্রস্তুতের ব্যবস্থা করেন। শুধু তাই নয়, পিনিয়েরের চেষ্টায় মাত্র সতেরো বছর বয়সে লুই প্রথম স্কুলের শিক্ষক এবং অল্পকালের মধ্যে পূর্ণ অধ্যাপকের পদ পেয়েছিলেন।

শিক্ষক হিসেবে লুই ছিলেন অত্যন্ত জনপ্রিয় ও ছাত্রদরদী। শুধু পড়ানো নয়, ছাত্রদের অভাব অনটনে তিনি সাধার্মত টাকাপয়সা দিয়ে সাহায্য করতেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি সঙ্কেত পদ্ধতি নিয়েও তাঁর গবেষণা চলছিল পুরোদমে। কিছুকালের মধ্যে তিনি সাঙ্কেতিক উপায়ে দৃষ্টিহীনদের জন্য সংগীত রচনার উপায়ও বের করেন। ১৮২৯ সালে মাত্র কুড়ি বছর বয়সে তাঁর বই *Methods of Writing Words, Music and Plain Songs by Means of Dots, for Use by the Blind and Arranged for Them* প্রকাশিত হয়। ১৮৩৭ সালে এই বইয়ের একটি উন্নত সংস্করণ বেরিয়েছিল।

ব্রেল একটি সাঙ্কেতিক উপায় হওয়ায় চক্ষুস্থান লোকের এইভাবে এমবস করা কাগজ পড়তে অসুবিধে হত। ফলে তাঁরা তাঁদের অঙ্ক ছেলেমেয়েকে বাড়িতে পড়াতে পারতেন না। বাড়ির অভিভাবকদের পড়াশোনার সুবিধে করতে লুই বহু চিন্তা করেন র্যাফিগ্রাফি (Raphigraphy) নামে এক উপায় উদ্ভাবন করেন। এর মূল ধারণা ছিল হাইয়ের মতো, বিন্দু দিয়ে এমবস করা বর্ণমালার আদল সৃষ্টি করা। তবে এটা ছাত্রদের পক্ষে ছিল অসুবিধেজনক, কারণ সবচেয়ে ছোটো রোমান অক্ষর (আই) লিখতেই কমপক্ষে ষোলটি বিন্দু এমবস করতে হত।

১৮৪০ সালে ডিরেক্টর পিনিয়েরকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হলে লুইয়ের দুর্দিন শুরু হয়। পিনিয়েরের পর অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর আরমান্দু দুফো (Armand Dufau) স্কুলের ভার নেন। প্রথমদিকে দুফো ছিলেন ব্রেল ব্যবস্থার ঘোরতর বিরোধী। এর বদলে তিনি প্লাসগোর জন

আলস্টনের উদ্ভাবিত একটি সঙ্কেত পছন্দ করতেন, যা অনেকটা হাইয়ের পদ্ধতির মতো। ব্রেল সঙ্কেতের ওপর দুফোর এত ঘৃণা ছিল যে তিনি একদিন স্কুলের পেছনের জমিতে এই উপায়ে এমবস করা সমস্ত বই পুড়িয়ে ফেলেন। শুধু তাই নয়, তিনি ব্রেল সঙ্কেত ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞাও জারি করেন। কিন্তু ছাত্ররা তা অমান্য করে একে ব্যবহার করেই যাচ্ছিল। ফলে দুফোও কিছুকাল পর তাঁর মত পালটাতে বাধ্য হন। সৌভাগ্যের কথা, তিনি আস্তে আস্তে এই পদ্ধতির একজন অনুরাগী ভক্ত হয়ে ওঠেন।

তখন পর্যন্ত স্টেট ও স্টাইলাসের (state and stylus) সাহায্যে হাতে হাতে ব্রেল এমবসিং করতে হত। কোনো সোজা যান্ত্রিক ব্যবস্থা ছিল না। যান্ত্রিক এমবস করার উপায় প্রথম বের করেন ফ্রান্সোয়া পিয়ের ফুকো (Francois Pierre Foucault) নামে একজন অন্ধ আবিষ্কারক। ১৮৪৭ সালে তাঁর আবিষ্কৃত পিস্টন বোর্ডে (Piston board) একটি মাত্র চাবিতে আঘাত করেই একটি বর্ণ ফুটিয়ে তোলা যেত। বলা যেতে পারে, ফুকোর যন্ত্রই ব্রেল মুদ্রণ ব্যবস্থার আদি সংস্করণ। এই প্রযুক্তি উদ্ভাবনে তাঁকে নানাভাবে সাহায্য করেন লুই ব্রেল।

শুধু আদর্শ শিক্ষকই নন, লুই ছিলেন একজন সংগীতানুরাগী ও দক্ষ পিয়ানোবাদক। তিনি বহুদিন একটি স্কুলে অর্গান বাজিয়েছেন ও অন্ধ ছেলেমেয়েদের সংগীত শিখিয়েছেন। এইভাবে কঠোর পরিশ্রমের ফলে ১৮৪৮ সাল থেকে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে এবং ১৮৫২ সালের ৬ই জানুয়ারি মাত্র তেতাশ্লিশ বছর বয়সে তিনি পরলোকগমন করেন। দুঃখের কথা, প্যারিসের একটি সংবাদপত্রও এই মহান শিক্ষক ও মানবতাবাদীর মৃত্যুসংবাদ প্রকাশ করেনি।

ব্রেল পদ্ধতির বিস্তার :

ব্রেল ইহলোক থেকে চলে গেলেও তাঁর কীর্তি চাপা পড়ে থাকেনি। ফ্রান্স থেকে ধীরে ধীরে ব্রেল পদ্ধতি সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। ডাঃ আর্মিটেজ নামে একজন ইংরেজ চিকিৎসক ছিলেন ইংল্যান্ডে এই আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা। তিনি কয়েকজন ছাত্রছাত্রী নিয়ে দৃষ্টিহীনদের জন্য এমবস করা পাঠ্যবস্তু মুদ্রণের একটি সোসাইটি গড়ে তোলেন। এই সোসাইটি পরে ইংল্যান্ডে রয়াল ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর দি ব্লাইন্ড নামে ইউরোপের বৃহত্তম ব্রেল প্রকাশনা সংস্থায় পরিণত হয়।

ইউরোপের তুলনায় আমেরিকায় ব্রেল পদ্ধতি চালু হতে আরো খানিকটা সময় লেগেছিল। উইলিয়াম বেল ওয়েট (Walt) নামে নিউইয়র্কের ইনস্টিটিউট ফর দি ব্লাইন্ডের সুপারিন্টেন্ডেন্ট প্রথমে নিউইয়র্ক পয়েন্ট নামে একটি এমবস করার সঙ্কেত চালু করেছিলেন। নিউইয়র্ক পয়েন্টে তিনটি উল্লম্ব সারিতে দুটি করে বিন্দু দিয়ে অক্ষরের সেল গঠিত হত। অক্ষরের সঙ্কেতও ছিল ব্রেল পদ্ধতির চেয়ে অন্যরকম। কিন্তু কিছুকাল পরে মিঃ ওয়েট নিজেই ব্রেল ব্যবস্থা গ্রহণ করে এর নানা উন্নতি করেন। যেমন, প্রথম যুগে ব্রেল এমবস করা হত কাগজের এক পৃষ্ঠায়। ওয়েটের বের করা ইন্টারপয়েন্ট পদ্ধতিতে ১৮৯০ সাল নাগাদ কাগজের দুই পিঠেই ব্রেল মুদ্রণ শুরু হয়।

সারা আমেরিকা জুড়ে ব্রেল পদ্ধতি পুরোপুরি চালু হতে আরো প্রায় পঞ্চাশ বছর লেগে যায়। কারণ ১৯১৩ সালে ব্রেল এবং নিউইয়র্ক পয়েন্ট এই দুই ব্যবস্থাই বাদ দিয়ে নেওয়া হয়েছিল স্ট্যান্ডার্ড ডট সঙ্কেত। তবে নানা সময়ে বিভিন্ন সঙ্কেত চালু হলেও ব্রেল ব্যবস্থার ওপর

একদল শিক্ষাব্রতীর অনুরাগ ছিল অটুট। ইতিমধ্যে ইংরেজিতে মান্য ব্রেল কোড গঠনের চিন্তাভাবনাও শুরু হয়ে গিয়েছিল। বহুদিন ধরে দীর্ঘ আলোচনা, বিতর্ক ও পরীক্ষা নিরীক্ষার পর ১৯৩৪ সালে স্ট্যান্ডার্ড ইংলিশ ব্রেল নামে একটি আন্তর্জাতিক মান্য ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, যা আমেরিকাতেও অবিসংবাদিতভাবে গ্রহণ করা হয়। এইভাবে আদর্শ ইংরেজি ব্রেল বর্ণমালা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। দ্রষ্টব্য Aldridge (1997), Caton (1979)।

ব্রেল বর্ণমালায় যাঁরা শিক্ষা পেয়েছেন, তাঁদের মধ্যে বিশ্বের সবচেয়ে গুণী ব্যক্তি বোধহয় হেলেন কেলার। সুলেখিকা, সুবক্তা ও সমাজসেবিকা এই মহীয়সী নারী দৃষ্টিহীনদের নানা সমস্যা সমাধানে আজীবন কাজ করে গিয়েছেন। তিনি একবার বলেন, “সমগ্র মানবজাতি যেমন গুটেনবার্গের কাছে ঋণী, আমরা দৃষ্টিহীনরা লুই ব্রেলের কাছে তেমনভাবে ঋণী।” ১৯৬৮ সালে কেলারের মৃত্যুর পর হেলেন কেলার ইন্টারন্যাশনাল নামে যে সংস্থা স্থাপিত হয়, সেটি অন্ধদের দূর করার জন্য প্রতিষ্ঠিত বিশ্বের বৃহত্তম সংস্থা।

দৃষ্টিহীনদের জন্য শিক্ষা দেশান্তরে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য খ্রিস্টীয় ধর্মযাজকদের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার। পরাধীন ভারতেও এঁদের উদ্যোগেই দৃষ্টি-প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য ১৮৮৭ সালে অমৃতসরে প্রথম স্কুল গড়ে ওঠে। কিছুকাল পরে পালায়ামকোট্টাই এবং কলকাতার বেহালায় আরো দুটি স্কুল স্থাপিত হল।

অন্ধ ছেলেমেয়েদের পড়াতে ভারতীয় ভাষায় ব্রেল পদ্ধতির দরকার বুঝতে পেরে রেভারেণ্ড নোলেস এবং গার্ধারাইট নামে দুই পাদ্রী ১৯০২ সালে প্রথম ওরিয়েন্টাল ব্রেল নামে একটি সংকেত প্রচলন করেন। পরের কয়েক বছরে বেশ কয়েকজন ব্যক্তি ভারতীয় ভাষার জন্য নিজস্ব ব্রেল পদ্ধতির প্রস্তাব করেছিলেন। এগুলির মধ্যে রয়েছে সিরেফ ব্রেল, মিস আসুক উইথের তামিল ব্রেল, পি. এম. আদবানির ব্রেল এবং স্যার সি. ম্যাকেঞ্জির সভাপতিত্বে প্রস্তাবিত একটি সংকেত ব্যবস্থা। এই প্রয়াসে দুজন বাঙ্গালীর নামও রয়েছে। এঁরা হলেন ডঃ নীলকণ্ঠ রায় এবং অধুনালুপ্ত বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা প্রবাসীর সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সংকেতের নাম দেওয়া হয়েছিল চ্যাটার্জি কোড।

ইতিমধ্যে সারা ভারতে যখন রেল ও সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হল, তখন এইসব রেল কোডের মধ্যে সমন্বয়ের দরকার পড়ে। করাচী অন্ধ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পি. এম. আদবানির চেষ্টায় সর্বভারতীয় কোড বের করতে ১৯৪২ সালে একটি ছোট কমিটি গড়া হয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশত সেই কমিটিতে কোন ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এছাড়া ১৯৪৫ সালে ক্যাপ্টেন মর্টিমার ও লাল আদবানিকে নিয়ে আর একটি আদর্শ ভারতীয় রেলের একটি খসড়া প্রস্তুত করেন। কিন্তু দক্ষিণ ভারতীয় ভাষাগুলির জন্য প্রামাণ্যতার অভাবে সেই খসড়া গৃহীত হয়নি। তারপর ভারত সরকারের শিক্ষামন্ত্রক ১৯৪৬ সালে একটি কমিটি গঠন করেন, মতানৈক্যের কারণে তাও ব্যর্থ হয়েছিল।

পরের পদক্ষেপের নায়ক স্বাধীন ভারতের শিক্ষামন্ত্রী ড. হুমায়ুন কবীর। তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় আন্তর্জাতিক ব্রেল কোড গঠনের জন্য ইউনেস্কোর কাছে দৃঢ় যুক্তিপূর্ণ প্রস্তাব দেন। তাঁর প্রস্তাবে গুরুত্ব দিয়ে ১৯৫০ সালে ইউনেস্কোর উদ্যোগে একটি আন্তর্জাতিক ব্রেল আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ভারতের প্রতিনিধি ছিলেন প্রখ্যাত ভাষাবিদ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও লাল আদবানি। এই আলোচনাচক্রের সুপারিশ অনুযায়ী ভারত সরকারের শিক্ষা

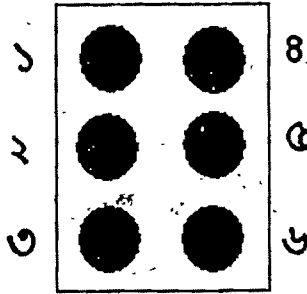
মদ্রক ভারতীয় ভাষাগুলির জন্য ভারতী ব্রেল নামে একটি সাধারণ ব্রেল কোড গড়ে তোলেন। ভারতী ব্রেলের খসড়া কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের অষ্টাদশ সভায় অনুমোদিত হয় এবং ১৯৫১ সালে এর চূড়ান্ত রূপ সারা ভারতে ব্যবহারের জন্য সুপারিশ করা হয়। সেই বছরেই দেরাদুনে রেল প্রেস স্থাপন করে বইপত্র এমবসের কাজ শুরু হল।

ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলির মধ্যে নেপাল ও বাংলাদেশ ভারতী ব্রেল কোড গ্রহণ করে, কিন্তু পাকিস্তান এই ব্যবস্থায় রাজি হয়নি। তবে ভারতী ও সিংহলী ব্রেল (শ্রীলঙ্কার) এবং ভারতী ও মালয়ী (মালয়েশিয়ার) ব্রেল সঙ্কেতের মধ্যে ঐকমত্য স্থাপিত হয়েছে। এইভাবে ব্রেলপদ্ধতি পৃথিবীর নানা ভাষায় ছড়িয়ে গিয়ে দৃষ্টিহীনদের পড়াশোনায় সাহায্য করছে। এখন শতাধিক প্রধান ও কয়েকশো স্থানীয় ভাষায় পাঠ্যবস্তু ব্রেল সঙ্কেতে এমবস করা সম্ভব হচ্ছে। দ্রষ্টব্য Landfors (1997)।

ব্রেলপদ্ধতির ও কম্পিউটার :

ব্রেল নিয়ে কতদিন ধরে গবেষণার ফলে এই উপায়ের নানা উন্নতি সম্ভব হয়েছে। এখন আন্তর্জাতিক ব্রেল সঙ্কেতের একাধিক ধাপ বা গ্রেড রয়েছে। প্রথম ব্রেল বেশ সহজ ও প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য উপযোগী। এতে রয়েছে কোন ভাষার বর্ণমালার প্রত্যেক অক্ষরের জন্য ছয়টি সাঙ্কেতিক বিন্দুর সমাহার।

এই প্রসঙ্গে আবার বলা দরকার, ব্রেল সঙ্কেতের মূলে রয়েছে ব্রেল কোষ বা সেল। একটি ব্রেল কোষ (Cell) ছয়টি বিন্দু দিয়ে গড়া। বিন্দুগুলির এক ধরনের বিন্যাস একটি অক্ষর প্রকাশ করে। আলোচনার সুবিধের জন্য বিন্দুগুলিকে ১ থেকে ৬ সংখ্যা দ্বারা ১ নং চিত্রে দেখানো হল।



ব্রেল কোষের বিন্দুগুলি

এমবস শলাকার চাপে অক্ষর অনুযায়ী কয়েকটি বিশেষ বিন্দু উঁচু হয়ে ফুটে ওঠে। যেমন 'ক' অক্ষরটি ফুটিয়ে তুলতে ১ এবং ৩ নং বিন্দুযুক্ত সঙ্কেতটি ব্যবহার করতে হয়, অর্থাৎ এই দুটি বিন্দু উঁচু হয়ে উঠে থাকে বা কাগজে এমবস হয়। প্রথম গ্রেড ব্রেলে ইংরেজি বর্ণ প্রকাশ করতে একটি কোষই যথেষ্ট। বাংলা বর্ণে কিন্তু কোথাও কোথাও দুটো কোষ লাগে।

তাছাড়া বাংলা বা ইংরেজিতে বিশেষ চিহ্ন বা গাণিতিক সংখ্যামালার জন্য কিছু পূর্বস্থাপনীয় (Prefix) সঙ্কেত বা প্রাকচিহ্ন রয়েছে। এই প্রাকচিহ্নের জন্য একটি অতিরিক্ত কোষ ব্যবহৃত হয়। যেমন, সংখ্যা বোঝাতে সংখ্যাচাক প্রাকসঙ্কেত (৩-৪-৫-৬) আগে বসিয়ে a থেকে ; (Semi-colon) পর্যন্ত বিভিন্ন বর্ণের কোড ব্যবহার করতে হয়। বড়ো হাতের (Upper-case) অক্ষর বোঝাতে প্রথমে কোড (৬) দিতে হয়। ইটালিক (Italic) বা হেলানো অক্ষরের জন্যও নির্দিষ্ট কোড আছে। এইরকম অল্প কয়েকটি প্রাকসঙ্কেত জানলেই প্রথম গ্রেডের ব্রেলে কোনো বাক্য লেখা যায়। তবে উন্নত, সংক্ষিপ্ত কিন্তু জটিলতর ব্যবস্থা হচ্ছে দ্বিতীয় গ্রেডের ব্রেল, যেখানে নানা রকমের বিশেষ সংকোচন (Contraction) ব্যবস্থা মনে রাখতে হবে।

দ্বিতীয় গ্রেডের ব্রেল গল্প, উপন্যাস, পাঠ্যপুস্তক, ইত্যাদি বড়ো বড়ো রচনা লিখতে বেশি উপযোগী। ইংরেজির জন্য আমেরিকান গ্রেড টু ব্রেলে প্রায় ২৫০টি বিভিন্ন সংকোচন আছে। আমরা জানি, সাধারণ অক্ষর লিখতে ছয় বিন্দুর একটি ব্রেল কোষ লাগে। কিন্তু শব্দ বা শব্দাংশ (Compression) সংকোচনের জন্য এক সেল এবং দুই সেল সংকোচন রয়েছে। এক সেল সংকোচন, যেমন (১-৪-৫-৬) এবং (২-৪-৬) যথাক্রমে th এবং ow বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। দুই সেলের সাহায্যে সংকোচনের উদাহরণ [(৫), (২-৩-৫-৬)] এবং [(৫-৬), (১-৩-৪-৫)], যা যথাক্রমে time এবং tion বোঝায়। সংকোচনে অনেক সময় একটি অক্ষর দিয়ে একটি গোটা শব্দ বোঝানো হয়। যেমন 'b' একা থাকলে but বোঝায়, 'e' প্রকাশ করে every এবং 'p' বোঝায় people ইত্যাদি। যে শব্দগুলো ভাষায় বহুব্যবহৃত, সেগুলোই সংকোচনের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। এতে রচনায় জায়গা লাগে কম এবং এমবস করা যায় তাড়াতাড়ি। কখনো কখনো দুই বর্ণ দিয়েও সংকোচন করা হয়। যেমন 'ab' দিয়ে about এবং 'rcv' দিয়ে receive বোঝায়। কোনো কোনো সঙ্কেতের একাধিক অর্থ আছে। যেমন (২-৫-৬) দিয়ে ক্ষেত্রবিশেষে dis, dd, একটি পূর্ণচ্ছেদ (.) এবং ডলার চিহ্ন (\$) নির্দেশ করে।

দ্বিতীয় গ্রেডের পরে আরো বেশি সংকোচন ব্যবস্থায়ুক্ত ব্রেল কোড বের হয়েছে। যেমন তৃতীয় ধাপ বা গ্রেড থ্রি ব্রেল ব্যবস্থা। তাছাড়া গাণিতিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত একটি সঙ্কেততন্ত্র হচ্ছে আব্রাহাম নেমেথ প্রবর্তিত নেমেথ ব্রেল কোড (Nemeth Braille Code)। এটি সাধারণ ব্রেলের চেয়ে একটি পৃথক কোড ব্যবস্থা (Nemeth, 1972; Crammer and Nemeth, 1991 ; Buntrock, 1996)। তেমনি সংগীতের জন্য রয়েছে একটি ভিন্ন সাক্ষেতিক ব্রেল কোড। সংগীতের স্বরলিপিকে ফুটিয়ে তুলতে স্বরলিপি ও এই ব্রেল কোড দুটোই ভালোভাবে জানা দরকার। কম্পিউটারের মাধ্যমে দৃষ্টিহীনদের উচ্চশিক্ষার জন্য আট বিন্দুর উন্নত ও জটিলতর ব্রেল ব্যবস্থার প্রস্তাব করা হয়েছে।

কম্পিউটার ব্রেল কোড বের করা হয়েছে কম্পিউটারে নানা ধরনের কাজ করার জন্য। এই কোডের সাহায্যে দৃষ্টিহীন ব্যক্তিরা নানা কম্পিউটারসাধ্য কাজ করতে পারেন। বস্তুত গত শতকের আটের দশক থেকে পারসোন্যাল কম্পিউটার শব্দা হওয়ায় ব্রেল এমবস করা ও দৃষ্টিহীনদের শিক্ষাব্যবস্থায় অভাবনীয় উন্নতি হয়েছে। তবে কম্পিউটার ছড়িয়ে যাওয়ার আগে শিক্ষিত দৃষ্টিহীনরা যে যন্ত্রে এমবস করতে পারতেন, তা হল পার্কিনস্ ব্রেলার।

পার্কিনস্ ব্রেলারকে ব্রেল টাইপরাইটারও বলা যায়। দীর্ঘ গবেষণার পর ১৯৩৯ সালে এই যন্ত্রটি আবিষ্কার করেন ডেভিড আব্রাহাম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য প্রায় এর যুগ ধরে এই

যন্ত্রের ব্যবসায়িক উৎপাদন শুরু হতে পারেনি। অবশেষে আমেরিকার ম্যাসাচুসেট্‌স রাজ্যে ওয়াটার টাউনের একটি প্রেস থেকে ১৯৫১ সালে উৎপাদিত হতে শুরু হয়ে এই যন্ত্র সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। ছয়টি ব্রেল বিন্দুর জন্য ছয়টি ও শূন্যস্থান বা শব্দান্তরের জন্য একটি চাবি দিয়ে এর সাহায্যে মোটা কাগজে ব্রেল এমবস করা সম্ভব। এমবস করতে ভুল হয়েছে কিনা বোঝার জন্য যন্ত্রের পেছনে আঙ্গুল দিয়ে ছুঁয়ে দেখতে হয়। এক লাইন এমবস হলে পুরনো টাইপরাইটারের মতো টুং শব্দ করে লাইন শেষ হওয়ার সঙ্কেত শোনার ব্যবস্থা আছে। আজকাল মেকানিকাল ও ইলেকট্রিক্যাল দুই রকমের পার্কিনস ব্রেলারই বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। দৃষ্টিহীন ব্যক্তির সামান্য ট্রেনিংয়ের পর বেশ সহজে এই যন্ত্রে এমবস করতে পারেন। হাঙ্কা, বহনযোগ্য এবং শক্তসমর্থ হওয়ার ফলে এই কম্পিউটারের যুগেও এর জনপ্রিয়তা কমেনি। আজও পৃথিবীর ১৪০টি দেশে পার্কিনস ব্রেলার দিয়ে ব্রেল এমবসের কাজে চলে আসছে।

আজ থেকে প্রায় পঁচিশ বছর আগে সফটওয়্যার বিশেষজ্ঞরা কম্পিউটারে রাখা কোনো রচনার ফাইলকে ব্রেল সঙ্কেতে পরিবর্তনের প্রোগ্রাম লিখতে শুরু করেন। এই ধরনের সফটওয়্যার উৎপাদক সংস্থার মধ্যে সবার আগে ডাক্সবারির (Duxbury) নাম করা দরকার। সফটওয়্যার লেখার পাশাপাশি কম্পিউটার-চালিত ব্রেল এমবসারও নির্মাণ করা হয়েছে। টেলিসেঙ্গারি, ভার্চুয়ালি, কোয়ান্টাম টেকনোলজি, জেরক্স কর্পোরেশন ইত্যাদি বেশ কয়েকটি সংস্থা দৃষ্টিহীনদের জন্য কম্পিউটার প্রযুক্তি বের করে বাজারে ছাড়ছেন। এঁদের সম্পর্কে জানার জন্য উল্লেখপঞ্জি দ্রষ্টব্য।

পার্কিনস ব্রেলারে মেকানিক্যাল উপায়ে মাত্র একটি ব্রেল কোষের বিন্দুগুলি ছয়টি পিন দিয়ে এমবস করা হয়। আধুনিক প্রযুক্তিতে কম্পিউটারে থাকে পনের থেকে কুড়িটি কোষের সারি। এই ধরনের সারির নাম দেওয়া হয়েছে ট্যাকটাইল সারি (Tactile array)। ব্রেল সঙ্কেতে কয়েকটি শব্দ লিখলে সেই অনুযায়ী কোষের পিনগুলি উঁচু হয়। দৃষ্টিহীন ব্যক্তি তার ওপর আঙ্গুল বুজিয়ে শব্দগুলি পড়তে পারেন। বুঝতে পারেন, লিখতে গিয়ে কোনো ভুল করেছেন কিনা। কম্পিউটারে এর সঙ্গে থাকতে পারে সফটওয়্যারের সাহায্যে কথা বলার (Text to speech) ব্যবস্থা। এইরকম দুটো উপায় একসঙ্গে থাকলে প্রতিবন্ধী লোকেরা কম্পিউটারে কাজ করতে বেশ স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। কথা-বলা সফটওয়্যার নিয়ে আমরা অন্য প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছি (চৌধুরী, বাং ১৪১০)।

তাছাড়া কম্পিউটারে আগে থেকে টাইপ করা ব্রেল ফাইল একটি ড্রাইভার রুটিনের সাহায্যে কম্পিউটার-চালিত এমবসারে ফুটিয়ে তোলা যায়। এইভাবে একজন দৃষ্টিহীন ব্যক্তিও ব্রেল কাগজে তাঁর বক্তব্য ছাপিয়ে নিতে পারেন। তবে শুধু একজন ব্রেল জানা ব্যক্তির পক্ষেই সেই রচনা পড়া সম্ভব।

আর ব্রেল না-জানা সাধারণ পাঠক যাতে দৃষ্টিহীনদের রচনা পড়তে পারেন, সেজন্যও সফটওয়্যারকে কাজে লাগানো যায়। এক্ষেত্রে দৃষ্টিহীন ব্যক্তি ব্রেল কোডে তাঁর বক্তব্য কম্পিউটারে তোলেন এবং সফটওয়্যার তাকে সাধারণ বর্ণমালায় পরিবর্তিত করে মনিটারে দেখায়। এমন পরিবর্তন সবক্ষেত্রে খুব সহজ নয়। বিশেষত দ্বিতীয় গ্রোডের ব্রেলে সঙ্কেচন কোডগুলি প্রসারণ করে সাধারণ অ্যাস্কি (ASCII) ব্যবস্থায় আনতে খানিকটা জটিল প্রোগ্রামিং দরকার।

শুধু ভাষা ও সংখ্যার সাহায্যে সব রকমের পড়াশোনা চলে না, এমন কিছু পাঠ্যবস্তু

থাকে যা বোঝানোর জন্য রেখাঙ্কন দরকার হয়। যেমন ভূগোলে মানচিত্র আঁকতে হয়, জ্যামিতির জন্যও নানারকম আঁকজোক দরকার। এই সব পড়াশোনার জন্য কোনো সমতল জায়গায় পিন ম্যাট্রিক্সের সাহায্যে উচ্চতার তারতম্য করে নানা আকার ফুটিয়ে তুলতে হয়। যেমন; কতগুলি পিন দিয়ে বৃত্তের পরিসীমা উঁচু করে দিলে তার ওপর হাত বুলিয়ে কেউ বৃত্তটি অনুভব করতে পারবেন। এমন উঁচু রেখা দিয়ে ভারতের মানচিত্রও বুঝতে পারা সম্ভব এবং তার ভেতর রাজ্যগুলির সীমা, নদীপথ, পাহাড়, পর্বত, একইভাবে প্রকাশ করা যায়। যে ফলকের ওপর এইভাবে নানা স্কেচ ফুটিয়ে তোলা যায়, তার সাধারণ নাম ট্যাকটাইল বোর্ড (Tactile Board)। বৈদ্যুতিন বর্তনীর সাহায্যে ছোটো ছোটো বর্গাকার বা বৃত্তাকার পিন উঁচুনিচু করে এমন আকৃতি দেওয়া সম্ভব। আধুনিক সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যারের সাহায্যে ট্যাকটাইল ডিভাইস নিয়ন্ত্রণ করে ছবি, ম্যাপ, টেবিল বা সারণি, বার চার্ট, ইউক্লিডের জ্যামিতি ইত্যাদি আঁকার ব্যবস্থা হয়েছে। দৃষ্টিহীনদের উচ্চশিক্ষার জন্য এই উপায় খুব উপযোগী, যদিও আমাদের দেশের ট্যাকটাইল বোর্ডের দাম খুব বেশি।

পৃথিবীতে অজস্র মানুষ রয়েছেন যাঁরা পুরোপুরি অন্ধ নন, কিন্তু তাঁদের দৃষ্টিশক্তি খুব ক্ষীণ। এঁদের অনেকে সাধারণ বইপত্রের লেখা চশমা দিয়েও দেখতে পান না, কিন্তু অক্ষরের আকার যথেষ্ট বড়ো করে দিলে পড়তে পারেন। এঁদের জন্য যে ধরনের কম্পিউটার-নির্ভর সমাধান বের করা হয়েছে, তাতে বইয়ের পৃষ্ঠা স্ক্যানার দিয়ে তুলে সফটওয়্যারের সাহায্যে অক্ষরের আকার বাড়িয়ে মনিটরে দেখানো হয়। যেসব সংস্থা দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য কম্পিউটার তৈরি করেন, তাঁরা এই ধরনের নানা সফটওয়্যার বাজারে বের করেছেন।

কথা-বলা সফটওয়্যার ছাড়াও কোনো কোনো সংস্থা এইসব যন্ত্রে যোগ করেছেন কথা-শোনা সফটওয়্যারের সরল সংস্করণ। এখানে কম্পিউটারের সঙ্গে যুক্ত মাইক্রোফোনে কয়েকটি নির্দেশ দিয়ে বিভিন্ন কাজ করিয়ে নেওয়া যায়। অল্প কয়েকটি শব্দ বুঝতে হয় বলে এসব ক্ষেত্রে কম্পিউটারের বাক-সনাক্তি (Speech recognition) হয় প্রায় নির্ভুলভাবে। আর ধ্বনি ও কী-বোর্ডের সাহায্য নিয়ে কাজ করাও যায় বেশ চটপট।

এইসব সুবিধের সঙ্গে যোগ করা যায় স্পর্শের সাহায্যে তথ্য ঢোকানো, তথ্য উদ্ধার এবং অন্যান্য কাজ করার নানা উপায়। স্পর্শের সাহায্যে কাজের জন্য দরকার একটি ট্যাকটাইল ফলক, যা একই সঙ্গে অন্তর্গ (Input) ও বহির্গের (Output) কাজ করবে। ধরা যাক, কোনো ডিরেক্টরিতে (Directory) কি কি ফাইল আছে তা এই ফলকে ব্রেল লিপিতে ফুটে উঠল। দৃষ্টিহীন ব্যক্তি স্পর্শ করে সেগুলো পড়ে নিলেন ও যে ফাইলটি খুলতে চান, তার পাশে একটি জায়গায় চাপ দিয়ে খোলার নির্দেশ দিলেন। কী-বোর্ডের সাহায্যেও খোলার নির্দেশ দেওয়া যায়। ঠিকমতো ব্যবহার করলে এই ট্যাকটাইল ফলক পি.সি.র মুষিকের (Mouse) মতো কাজ করবে।

কম্পিউটারে ইংরেজিতে লেখালেখির জন্য যেমন অ্যাস্কি (ASCII) কোড রয়েছে, তেমনি ব্রেল সঙ্কেতের জন্য বের হয়েছে ব্রেল অ্যাস্কি। এর ফলে কম্পিউটারে তৈরি কোনো ব্রেল ফাইল বিভিন্ন সংস্থার প্রিন্টার বা ব্রেল এমবসারে ছাপা সম্ভব। প্রত্যেক বৈধ ব্রেল সেলের জন্য একটি ব্রেল অ্যাস্কি কোড আছে। এই কোডের অনেকগুলিই অবশ্য ইংরেজি ভাষার অ্যাস্কির মতো। কিন্তু সংখ্যাবর্ণ, যতিচিহ্ন এবং সঙ্কেচনগুলির জন্য ব্রেল অ্যাস্কি কোড একটু

অন্যরকম। ফলে কোনো অ্যাক্সি ফাইল যদি সঙ্কোচনের তথ্য নেই এমন কোনো কম্পিউটারের মনিটরে দেখা হয়, তবে সেটা অনেক বর্ণের জায়গায় অঙ্কুৎ কিছু লেখা দেখাবে। যেমন underground শব্দটি দেখা যাবে "UGR.D এবং Andrew ফুটে উঠবে &REW হিসেবে। দ্রষ্টব্য Aldrige (1997), Collins et al (1998)।

আমেরিকার প্রায় সব ব্রেল এমবসার যন্ত্র অ্যাক্সি কোডের ফাইল নিয়ে কাজকর্ম করতে পারে। ইংরেজি থেকে ব্রেল অ্যাক্সি কোডে ফাইল প্রস্তুত করা অনেক সুবিধেজনক, কারণ যে কোনো ব্রেল এমবসারে সেই ফাইল ফুটিয়ে তোলা যায়। কোনো রচনা সরাসরি ব্রেল কোডে কম্পিউটারে ঢোকালে বাজারে বিক্রীত অধিকাংশ সফটওয়্যারই ফাইলটি ব্রেল অ্যাক্সিতে পালটে নেয়।

সাধারণ ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, গণিত পড়ার ট্যাকটাইল পদ্ধতি ছাড়াও উচ্চতর গণিত পড়াশোনার জন্য কিছু উপায় রয়েছে। এই বিষয়ে অন্যতম অগ্রণী গবেষক ভারতীয় বংশোদ্ভূত বিজ্ঞানী টি. ভি. রমন। এই মেধাবী দৃষ্টিহীন গবেষক পুণে থেকে অঙ্কে বি.এ করার পর মুম্বাই আই আই টি থেকে অঙ্ক ও কম্পিউটার বিজ্ঞানে মাস্টার্স ডিগ্রি নেন। এই সময় থেকেই তাঁর দৃষ্টিহীনদের জন্য কম্পিউটার-নির্ভর গাণিতিক উপায় উদ্ভাবনের প্রতিভা দেখা যায়। ফাইন্যাল ইয়ার প্রজেক্টের জন্য তিনি রেখাঙ্কন বোঝার কিছু ক্ষনিসাধ্য কৌশল বের করেছিলেন। ফলিত গণিত নিয়ে কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর ডক্টরেট থিসিস ১৯৯৪ সালে এসি.এম (Association for computing machinery) বিশিষ্ট ডক্টরাল থিসিসের পুরস্কার পায় (Raman, 1994)। এই থিসিসের কাজের ভিত্তিতে তিনি ASTER (Audio System for Technical Readings) নামে একটি সফটওয়্যার বের করেন। এখানে বলা দরকার, রামনের অ্যাস্টার নামে একটি কালো পথ-দেখানো কুকুর ছিল।

অ্যাস্টার সফটওয়্যার নানা ধরনের টেকনিক্যাল বইপত্র পড়ার একটি সুন্দর ব্যবস্থা। এর মধ্যে গণিতের সমীকরণ পড়ার পদ্ধতি অত্যন্ত অভিনব। রমন লক্ষ্য করেছিলেন, গাণিতিক বর্ণনা ও সমীকরণ সাধারণ পাঠ্যবস্তুর মতো শুধু বৈদিক থেকে ডানদিকে এগিয়ে যায় না। ডাইনে, বাঁয়ে, ওপরে, নিচে বিভিন্ন জায়গায় অঙ্কের সংখ্যা এবং নানা চিহ্ন ছড়ানো থাকে। সুতরাং বৈদিক থেকে ডানদিকে গড়গড় করে গণিতের চিহ্ন, অপেক্ষকের নাম ও সংখ্যাগুলো পড়ে গেলে অনেক সময় কিছুই বোঝা যাবে না। অর্থাৎ সাধারণ লেখার একমাত্রিকতার তুলনায় গণিতের লেখা একটি দ্বিমাত্রিক পাঠ্যবস্তু। কম্পিউটারে টেকনিক্যাল লেখালেখির জন্য ডোনাল্ড নুথ ও লেসলি ল্যামপোর্ট উদ্ভাবিত ল্যাটেক্স (LATEX) সফটওয়্যার বেশ জনপ্রিয়। এই ধরনের কম্পিউটার ফাইল দৃষ্টিহীনদের পড়ানোর ব্যবস্থা করে অ্যাস্টার। সে জন্য অ্যাস্টার তিনটি পর্যায়ে কাজ করেন। প্রথম পর্যায়ে ল্যাটেক্স নোটেশন থেকে সফটওয়্যার প্রোগ্রামের সাহায্য একটি অন্তর্বর্তী নোটেশনে পরিবর্তন করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে একটি শ্রাব্য ফরম্যাটের ভাষায় (Audio Formatting Language) এই অন্তর্বর্তী বর্ণনাকে ভাষা-ক্ষনি ও অভাষ-ক্ষনিতে রূপান্তর করে। অ্যাস্টারের তৃতীয় অংশ হচ্ছে শ্রাব্য ব্রাউজিং (Audio Browsing) করার ব্যবস্থা, যার সাহায্যে ব্যবহারকারী ওই নথির বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ফিরে শুনতে ও বুঝতে পারেন।

ভারতী ব্রেল ও বাংলা :

এ পর্যন্ত যে সব সফটওয়্যারের কথা বলা হল, তার সবই ইংরেজি ভাষা ও রোমান লিপিতে ব্যবহারের জন্য। ভারতীয় ভাষা ও লিপির জন্য বিদেশি সংস্থাগুলি কোনো উপায় বের করেননি। এই কাজগুলো ভারতীয়দের করার জন্যই পড়ে ছিল। বিষয়টি আলোচনার আগে ভারতী ব্রেল নিয়ে কয়েকটি কথা বলা যাক (চ্যাটার্জী, ২০০১ ; মজুমদার, ১৯৯৩ ; আফজা, ১৯৮৯)। প্রথম গ্রোডের ভারতী তথা বাংলা ব্রেল ব্যবস্থায় ১১টি স্বরবর্ণ এবং ৪০টি ব্যঞ্জনবর্ণের জন্য সংকেত চিহ্ন রয়েছে। ২ নং চিত্র থেকে এই সব সংকেতে ব্রেলবিন্দুর সমবায় ও বিন্যাস স্পষ্ট হবে। দেখা যাচ্ছে, স্বরবর্ণগুলির মধ্যে ঋ লিখতে দুটি ব্রেল কোষ বা সেল ব্যবহার করা হয়, অন্য সমস্ত বর্ণের জন্য একটি সেল ধার্য। ব্যঞ্জনগুলির মধ্যে ঢ এবং ঞ-র জন্য দুটি করে সেল লাগে। তাছাড়া ৭ গঠিত হয় প্রথমে হসন্ত ও তারপর ত-র সংকেত দিয়ে। অন্য সব ব্যঞ্জন একটি সেলের সাহায্যে এমবস করা যায়। যুক্তব্যঞ্জনের জন্য তিনটি বা তার বেশি কোষ লাগে। তবে ক্ষ এবং ঞ এই দুটি যুক্তক্ষর এক সেলেই এমবস করা যায়। স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ আ-কার, ই-কার ইত্যাদির জন্যও আলাদা চিহ্ন রয়েছে। বিরাম চিহ্নগুলিও একটি করে কোষ দিয়ে তৈরি। সেলের ওপরের সারির বিন্দু দুটি বিরাম চিহ্ন প্রকাশ করতে ব্যবহার করা হয় না। তবে বিশেষ চিহ্ন যেমন ড্যাস, উদ্ধৃতি চিহ্ন, বন্ধনী চিহ্ন ইত্যাদির জন্য একটির বদলে দুটি সেল লাগে। সংখ্যাও রচিত হয় দুটি সেলে, তার মধ্যে একটি সেল সংখ্যাচিহ্নের জন্য এবং অন্য সেলটি সংখ্যার মান বেঝানোর জন্য ব্যবহৃত। এই সেলে ওপরের দুই সারিতে চারটি বিন্দুর সাহায্যে সংখ্যাগুলি প্রকাশ করা হয়। এছাড়া বর্ণলোপ চিহ্ন, তির্যক চিহ্ন, তারকা চিহ্ন এবং কবিতার লাইন লেখার জন্য বিশেষ প্রয়োগবিধি রয়েছে। আর আছে কোনো বইয়ের ব্রেল সংস্করণে নামাক্ষন পত্র, সূচিপত্র, উৎসর্গ, শিরোনাম, পৃষ্ঠাসংখ্যা লেখার নির্দিষ্ট নিয়ম। এই নিয়মগুলি আন্তর্জাতিক ব্রেল সংকেতের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ঠিক করা হয়েছে।

ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটে এই লেখকের গবেষণাগারে ১৯৯৩ সালে ভারতী বাংলা ব্রেল থেকে বাংলা লিপিতে এবং বিপরীতভাবে বাংলা বর্ণমালা থেকে ভারতী ব্রেল সংকেতে রূপান্তরের সফটওয়্যার বের হয়। খুব সম্ভব, এটিই কোনো ভারতীয় ভাষায় কাজ করার জন্য প্রথম কম্পিউটার সফটওয়্যার। এর সাহায্যে একজন ব্রেল জানা অন্ধ লোক কম্পিউটারে পাঠ্যবস্তু লিখতে পারেন এবং তা বাংলা লিপিতে সাধারণ প্রিন্টারে ও ব্রেল সংকেতে কম্পিউটার-চালিত এমবসারে ফুটিয়ে তোলা যায়। অর্থাৎ একজন দৃষ্টিহীন ব্যক্তি নিজের ও অন্য দৃষ্টিহীনের জন্য তো বটেই, স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির জন্যও লেখালেখির কাজ করতে পারেন। বিপরীতভাবে একজন স্বাভাবিক দৃষ্টিবান লোকের টাইপ করা লেখা ব্রেল সংকেতে ফুটিয়ে তোলার ব্যবস্থাও হয়েছিল। এই কাজটিকে দৃষ্টিহীন ভারতীয়দের সমাজের মূলত্বোতে আনার জন্য একটি বিশেষ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা যেতে পারে (Chaudhuri, 1994)।

বহু-চাবিযুক্ত কম্পিউটার কী-বোর্ড নিয়ে কাজ করতে গিয়ে যাতে দৃষ্টিহীনেরা অসুবিধেয় না পড়েন, সেজন্য একটি অভিনব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। আধুনিক কী-বোর্ডে একশোর বেশি চাবির মধ্যে দরকারি চারিগুলি ছাড়া বাকিগুলো বন্ধ করা হয়েছিল একটি শক্ত প্লাস্টিক ঢাকনার সাহায্যে। ঢাকনার ওপরে ছয়টি ব্রেল চাবি, একটি শব্দান্তর চাবি, একটি লাইন-অন্তর বা প্রবেশ (Enter) চাবি, একটি পিছিয়ে যাওয়া ও আর দু-তিনটি নিয়ন্ত্রণ চাবি রাখা হয়েছিল। আসল

ঁ	ঃ	ঐ	ঃ	ঋ	ঃ	ন	ঃ	ষ	ঃ
ং	ঃ	ও	ঃ	ঋ	ঃ	প	ঃ	স	ঃ
া	ঃ	ঔ	ঃ	ট	ঃ	ফ	ঃ	ব	ঃ
জ	ঃ	ক	ঃ	ঠ	ঃ	ব	ঃ	ড	ঃ
আ	ঃ	খ	ঃ	ড	ঃ	ড	ঃ	ঢ	ঃ
ক	ঃ	গ	ঃ	ঢ	ঃ	ম	ঃ	ফ	ঃ
খ	ঃ	ঘ	ঃ	ণ	ঃ	য়	ঃ	জ	ঃ
গ	ঃ	ঙ	ঃ	ত	ঃ	য	ঃ		
ঙ	ঃ	চ	ঃ	থ	ঃ	র	ঃ		
ক	ঃ	ছ	ঃ	স	ঃ	ল	ঃ		
এ	ঃ	জ	ঃ	ষ	ঃ	শ	ঃ		

(ক)

া	ি	ী	ু	ূ	্	ে	ৈ	ো	ৌ	্
ঃ	ঃ	ঃ	ঃ	ঃ	ঃ	ঃ	ঃ	ঃ	ঃ	ঃ

(খ)

বিরাম চিহ্ন

-	;	,		'	'	“	”	(	)	[	]
ঃ	ঃ	ঃ	ঃ	ঃ	ঃ	ঃ	ঃ	ঃ	ঃ	ঃ	ঃ

(গ)

সংখ্যাচক প্রাক চিহ্ন



০	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ঃ	ঃ	ঃ	ঃ	ঃ	ঃ	ঃ	ঃ	ঃ	ঃ

(ঘ)

অঙ্ক

ঃ	ঃ	ঃ	ঃ
---	---	---	---

সকালবেলা

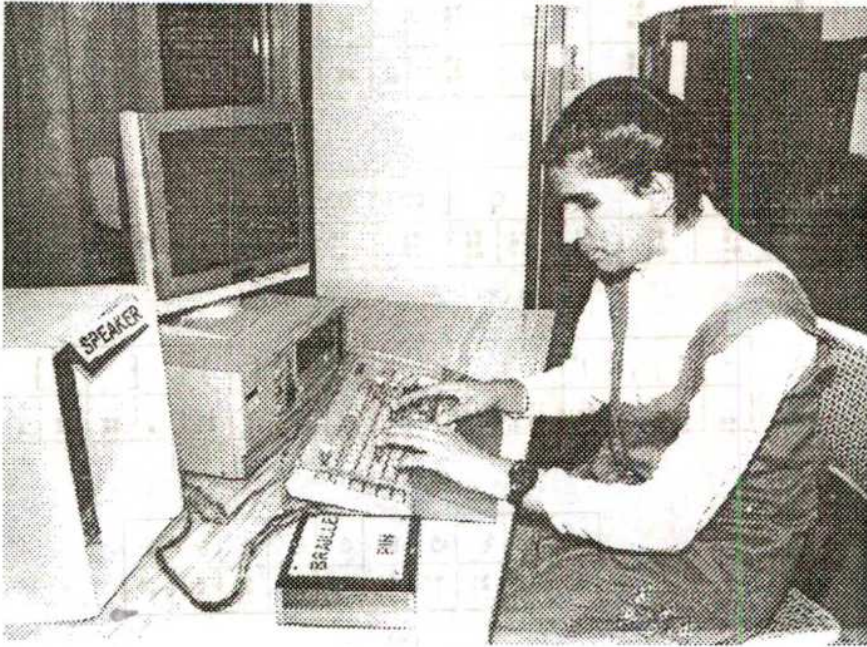
ঃ	ঃ	ঃ	ঃ	ঃ	ঃ	ঃ	ঃ
---	---	---	---	---	---	---	---

(ঙ)

২নং চিত্র

ভারতী বাংলা ব্রেল সংকেত। (ক) মূল বর্ণ (খ) স্বরচিহ্ন (গ) বিরামচিহ্ন (ঘ) সংখ্যাচিহ্ন
(ঙ) দুটি শব্দের ব্রেল লিপি।

কী-বোর্ড এই ঢাকনা নিয়ে ঢেকে দিলে একজন দৃষ্টিহীন শুধু অল্প চাবি কয়টি হাত দিয়ে অনুভব করবেন। এগুলি আসলে নকল বা ডামি (Dummy) চাবি, এর কোনো একটা টিপলে তার তলার দণ্ড নিচের আসল কী-বোর্ডের একটা চাবিতে চাপ দেয় ও কম্পিউটারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে। অল্প কয়েকটা চাবি থাকায় এই পরিবেশে দৃষ্টিহীনদের টাইপ করতে অনেক সুবিধে হয়। অন্য দরকারি কাজগুলো করে দেয় সফটওয়্যার। ৩ নং চিত্রে ১৯৯৩ সালে এই লেখকের ডিজাইন করা এমন একটি কী-বোর্ডের ছবি দেখা যাচ্ছে। দৃষ্টিহীনদের কাজ করার সময় সফটওয়্যারের সাহায্যে ব্রেল লেখার চাবিগুলি ছাড়া বাকি সব চাবি নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। এখানে দৃষ্টিহীনদের সুবিধের জন্য অক্ষরটি টাইপ করার পরেই সেটি শুনিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। দরকার হলে গোটা শব্দও শোনানো যায়। এইভাবে ছয়টি চাবি দিয়ে স্বচ্ছন্দে ব্রেল সঙ্কেতে লেখালিখি করতে পারেন যে কোনো দৃষ্টিহীন ব্যক্তি। আবার বিমুক্তি (Escape) চাবি টিপলেই কম্পিউটার স্বাভাবিক কাজকর্মের পরিবেশে ফিরে আসে। তখন ঢাকনাটি খুলে নিয়ে যে কোনো ব্যক্তি কী-বোর্ডের সাহায্যে সাধারণ কাজকর্ম করতে পারেন।



৩ নং চিত্র

লেখকের উদ্ভাবিত পদ্ধতি পরীক্ষারত জনৈক দৃষ্টিহীন ছাত্রী (১৯৯৪ সালে)

ব্রেল থেকে বাংলা লিপিতে পরিবর্তন ও মুদ্রণের জন্য সেই সময়ে কম্পিউটারে একটি বাংলা অক্ষরস্যাট বা ফন্ট তৈরি করা হয়েছিল। সেই পুরোনো ফন্টের বর্ণগুলিতে মসৃণতা ও সূক্ষ্মতা (Smoothness and resolution) ছিল কম। পরে ২০০১ সালে একটি উন্নত ফন্ট বের করা হয়। শুধু অক্ষরস্যাট থাকলেই তা দিয়ে কম্পিউটারে লেখা যায় না। লেখালেখির সময়ে

লাইন সাজানো, কোনো অংশ মোছা, অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া, নতুন কোনো লেখা পুরোনো লেখার মাঝখানে ঢোকানো, কপি করে সাঁটা ইত্যাদি নানা কাজের ব্যবস্থা থাকা দরকার। কখন কোথায় কি আকারের ও কি স্টাইলের (সরু, মোটা, হেলান, খাড়া, চ্যাপটা) হরফ বসানো হবে, তার সহজ ব্যবস্থাও করতে হয়। এমন সফটওয়্যারের সাধারণ নাম টেক্সট এডিটর (Text editor) বা লিপি সম্পাদক। আমাদের ব্রেল ব্যবস্থায় একটি বাংলা টেক্সট এডিটর রয়েছে।

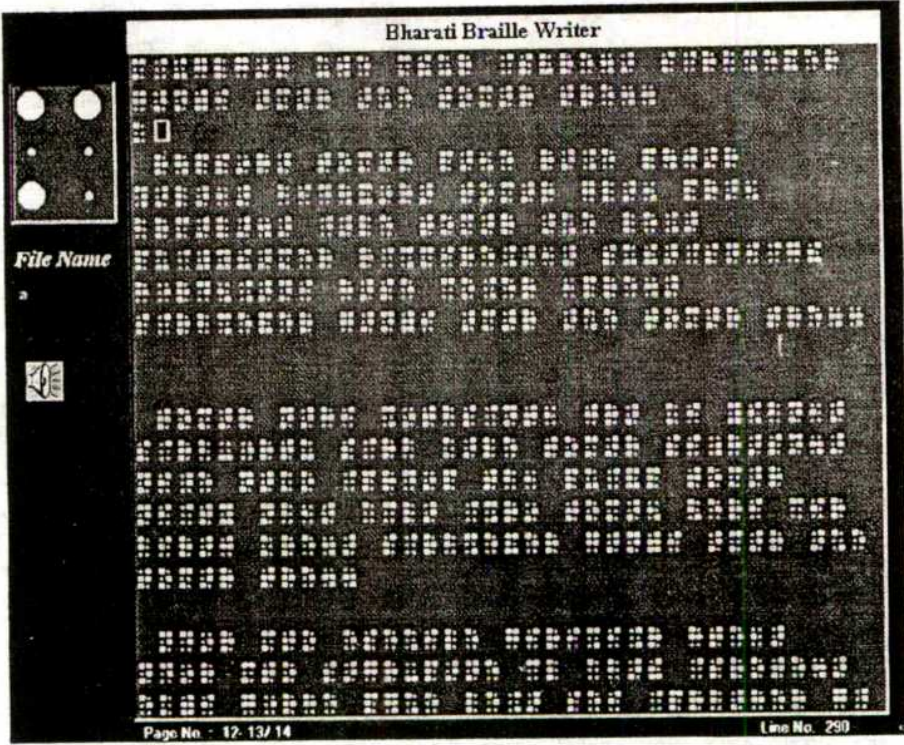
এই টেক্সট এডিটরের পাশাপাশি ছাড়াও ব্রেল লেখালিখির জন্য দরকার একটি ব্রেল এডিটর। ইংরেজির জনপ্রিয় এডিটর MS Word, Notepad কিংবা বাংলা লেখার iLEAP জাতীয় এডিটর দিয়ে ব্রেল সঙ্কেতে লেখা যায় না। সুতরাং বাংলার জন্য আমাদের নিজস্ব একটি ভারতী ব্রেল এডিটর লিখতে হয়েছিল।

ব্রেল এডিটরে টেক্সট এডিটরের সমস্ত বৈশিষ্ট্য ব্রেল সঙ্কেতে ফুটিয়ে তুলতে হয়। অর্থাৎ এতে কোনো নতুন ফাইল খুলে ব্রেল সঙ্কেতে লেখা, লেখা হয়ে গেলে ফাইলে বাঁচিয়ে (Save) রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। ব্যবহারকারী ইচ্ছে করলে যেন ফাইলটি শেষ না করেও ব্রেল রাইটার থেকে বেরিয়ে যেতে পারেন, কিংবা আগে থেকে সেভ করা ফাইল খুলে পরিবর্তন ও সংশোধন করতে পারেন, এমন উপায়ও থাকা চাই। তাছাড়া তিনি তির-চিহ্নিত চাবির (Arrow key) সাহায্যে একটি লিখিত তথ্যের যে কোনো জায়গায় যেতে পারেন, সেখানে গিয়ে নতুন তথ্য যোগ করতে পারেন, বা সেখানকার তথ্য মুছেও ফেলতে পারেন। এই কাজ করতে গিয়ে মুছে দেওয়া অংশ শোনাবার ব্যবস্থা রাখতে হয়, যেন দৃষ্টিহীন ব্যবহারকারী ঠিকঠাক মুছেছেন কিনা বুঝতে পারেন,।

সব মিলিয়ে এই সফটওয়্যারের নাম দেওয়া হয়েছে ভারতী ব্রেল রাইটার। এতে এক লাইনে ৩৬টি ব্রেল সঙ্কেত থাকতে পারে। কম্পিউটারে এক লাইন লেখা শেষ হলে এডিটর একটি বিশেষ আওয়াজ করে, যা শুনে ব্যবহারকারী বুঝতে পারেন লাইন লেখা শেষ হয়েছে। আর দৃষ্টিবান লোক যাতে লেখাটি পড়তে পারেন, সেজন্য টাইপ করা বর্ণটি বড়ো করে মনিটরের গবাক্ষে (Window) দেখানোর ব্যবস্থা আছে। তাছাড়া ব্রেল সঙ্কেতে কয়েক লাইন পুরোনো লেখা অন্য একটি গবাক্ষে দেখানো হয় (চিত্র নং ৪ দ্রষ্টব্য)। ব্রেল রাইটার ব্যবহার করার সময় কেউ তির-চাবিগুলির (Arrow Key) সাহায্যে এক ঘর বাঁদিক, এক ঘর ডানদিক, এক লাইন উপর বা এক ঘর নীচে চলে আসতে পারেন এছাড়া একঘর ডান বা বাঁদিক যাবার জন্য যে অক্ষর পেরোতে হয়, দৃষ্টিহীনদের জন্য সেটিও আওয়াজ করে শোনানোর ব্যবস্থা আছে। এক লাইন ওপর বা নীচে গেলেও সেই কথা একটি বার্তার সাহায্যে শুনিতে দেওয়া হয়। এখানে মনে রাখা দরকার, একটি পঙ্ক্তির অর্থাৎ ৩৬টি ব্রেল কোষ সমসময় ৩৬টি অক্ষর নাও বোঝাতে পারে। তার কারণ সংখ্যা ইত্যাদির জন্য কিছু পূর্বস্থাপনীয় সঙ্কেত এবং কোনো কোনো বাংলা বর্ণের জন্য একাধিক ব্রেল কোষ দরকার হয়।

এখানে ব্যবহারকারীর উদ্দেশ্যে দেওয়া বার্তা (Message) ধ্বনির সাহায্যে শুনিতে দেওয়ায় দৃষ্টিহীন ব্যক্তি বুঝতে পারেন কোনো ভুল হয়েছে কিনা, বা সফটওয়্যারটি তাঁর কাছে কোনো বিশেষ নির্দেশ চাইছে কিনা। এইভাবে লিখিত তথ্য স্মৃতি বা মেমারিতে প্রবেশের সময় ব্রেল ছাড়াও ভারতীয় ভাষার জন্য গড়া ইস্কি (ISCII) সঙ্কেতে লিখে রাখার ব্যবস্থা আছে।

ফলে কোনো দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি সেই ফাইল বাংলা এডিটর খুলে বাংলা লিপিতে দেখে নিতে পারেন এবং দরকার হলে বাংলা ভাষায় ছাপিয়ে নিতে পারেন।



৪নং চিত্র

ভারতী ব্রেল সফটওয়্যারের একটি মনিটর চিত্র।

(বাঁদিকে ব্রেল কোষটি সবার শেষে কম্পিউটারে ঢোকানো হয়েছে)।

আমাদের সফটওয়্যারের বর্তমান সংস্করণে ব্রেল সঙ্কেতে তথ্য ঢোকানোর ছয়টি চাবি ছাড়াও যে কয়েকটি বিশেষ চাবি ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলি হচ্ছে প্রবেশ চাবি (Enter Key), পেছিয়ে যাবার চাবি (Backspace Key), শব্দান্তর চাবি (Space bar), বিমুক্তি চাবি (Escape Key) এবং F1-F4 অপেক্ষক চাবি (Function Key)। সফটওয়্যারটিতে কাজ করতে করতে যে কোনো সময়ে কেউ বিমুক্তি চাবি টিপে বেরিয়ে যেতে পারেন। তবে এই চাবি টেপার সময় যদি কোনো ফাইল খোলা অবস্থায় থাকে, তবে ব্যবহারকারীকে ধনির সাহায্যে জিজ্ঞাসা করা হয়, তিনি বেরিয়ে যাবার আগে ফাইলটি মেমোরিতে রেখে দেবেন কিনা। তাছাড়া F1 চাবি টিপে ব্যবহারকারী তাঁর কোনো সাহায্যের দরকার জানাতে পারেন। তিনি যে ফাইলে এখন কাজ করছেন সেটি F2 চাবি টিপে মেমোরিতে তুলে রাখতে পারেন।

F3 চাবি টিপে বর্তমান ফাইলটিতে কাজ করা বন্ধ করে দিতে পারেন। যদি ব্যবহারকারী ধ্বনিত্রে কিছু শুনতে না চান, তবে F4 চাবি টিপে আওয়াজ বন্ধ (Sound Off) করে দিতে পারেন। পরে ইচ্ছা করলে দ্বিতীয়বার F4 চাবি টিপে ধ্বনি চালু করে নেওয়া যায়। ধ্বনিসৃষ্টির জন্য আমাদের উদ্ভাবিত কথা-বলা সফটওয়্যারটি ব্যবহার করা হয়েছে।

বাংলা ব্রেল কোডে লেখার জন্য আরো কিছু নিয়ম আছে। যেমন কবিতা লেখার সময় কবিতার পঙ্ক্তিশুলি ছোটো হলে প্রত্যেক পঙ্ক্তি আলাদা আলাদা না লিখে জায়গা বাঁচাবার জন্য একই লাইনে পর পর লেখা যেতে পারে। এই ক্ষেত্রে (৩-৪-৫) বিন্দু কবিতার পঙ্ক্তি শেষ বোঝাবার জন্য ব্যবহার করা হয়। যদি কবিতার পঙ্ক্তিটির শেষ অক্ষর বিরাম চিহ্ন হয় তবে বিরাম চিহ্নটির পরই (৩-৪-৫) বিন্দু এবং তারপর একটি শূন্যস্থান (Blank Space) এমবস করতে হবে। তারপর পরের পঙ্ক্তিটি লেখা যেতে পারে।

এছাড়া আরো একটি উপায়ে বাংলা ব্রেল সঙ্কেতে কবিতা লেখা রীতিসিদ্ধ। এখানে কবিতার প্রত্যেক পঙ্ক্তি ব্রেল ফাইলের প্রথম স্তম্ভ (Column) থেকে শুরু করতে হয়। যদি কবিতার একটি পঙ্ক্তি একটি ব্রেল লাইনে না লেখা যায়, তবে পরের লাইনের তৃতীয় ঘর থেকে পঙ্ক্তিটির বাকি অংশ লিখতে হবে। মনে রাখা দরকার, কবিতার যে কোনো নতুন পঙ্ক্তি অবশ্যই ফাইলের নতুন লাইনের প্রথম ঘর থেকে শুরু করতে হবে। তাছাড়া কবিতার দুটি স্তবকের (Stanza) মধ্যে পার্থক্য বোঝানোর জন্য দুই ব্রেল লাইনের মধ্যে একটি শূন্য লাইন রাখতে হবে।

আমাদের সফটওয়্যারে বাংলা এবং ইংরাজি মিশিয়েও কোনো তথ্য লেখা সম্ভব। এক্ষেত্রে বাংলা থেকে ইংরাজিতে পরিবর্তনের জন্য বিশেষ ব্রেল সঙ্কেত ব্যবহার করতে হবে। (৫-৬) বিন্দু সঙ্কেত দিয়ে ইংরাজি রচনা বোঝানো হয়। ইংরাজিতে লিখবার জন্য প্রথমে (৫-৬) লিখলে ব্রেল রাইটার পরের বর্ণের জন্য ইংরাজি পরিবেশ বা মোডে (Mode) চলে যায়। যদি পর পর তিনটির বেশি ইংরাজি বর্ণ লিখতে হয়, তবে প্রথমটির আগে বিশেষ সংকেত দিয়ে বোঝাতে হয় যে এখানে তিনের বেশি ইংরাজি বর্ণ আছে। এক্ষেত্রে শেষ ইংরেজি বর্ণটির আগে একবার (৫-৬) বিন্দু লিখতে হবে। অন্যদিকে এক থেকে তিনটি ইংরাজি বর্ণ পরপর লেখার সময় প্রত্যেকটি অক্ষরের আগে (৫-৬) বিন্দু লেখা হয়। ইংরাজিতে বড়ো অক্ষর (Capital Letter) এবং ছোটো অক্ষরের (Small Letter) ধারণা রয়েছে, তাই বড়ো অক্ষর বোঝাতে বিশেষ সংকেত দরকার। আগেই বলেছি, বড়ো অক্ষর বোঝানোর জন্য তার আগে (৬) বিন্দু দেওয়া দরকার। যদি পুরো শব্দটি বড়ো অক্ষরের হয়, তবে শব্দের আগে দুবার (৬) বিন্দু লিখতে হয়।

লেখার জন্য অপরিহার্য নয়, এমন কিছু সুবিধাও সফটওয়্যারের সাহায্যে দেওয়া যেতে পারে। যেমন, একটি বৈদ্যুতিন অভিধান সঙ্গে থাকলে লেখক তার সাহায্যে বানান ও অর্থ দেখে কোন একটি শব্দ লেখায় ব্যবহার করতে পারেন। এছাড়া থাকতে পারে স্বয়ংক্রিয় বানান পরীক্ষার ব্যবস্থা। সফটওয়্যার যদি ভুল বানান আপনা আপনি দেখিয়ে দেয়, তবে লেখকের পক্ষে টাইপ করতে বেশ সুবিধে হয়। অনেক সময় একটি শব্দের শুদ্ধ বানান লেখকের জানা থাকে না; সেই সময় এই সফটওয়্যার-অভিধান খুলে বানান জেনে নেওয়া যেতে পারে।

বৈদ্যুতিন অভিধানগুলি পরে সঙ্কলিত করে আমাদের ব্রেল-বাংলা এবং বাংলা-ব্রেল সফটওয়্যারের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

এবার দ্বিতীয় গ্রেড বাংলা ব্রেলের কথা। মাস কয়েক আগে দ্বিতীয় গ্রেড ব্রেলের জন্য একটি কমিটি কিছু প্রস্তাব গ্রহণ করেন। সেই প্রস্তাব সফটওয়্যারে বাস্তবায়িত করেছে পশ্চিমবঙ্গের ওয়েবেল মেডিয়াট্রিনিয়ং সংস্থা। আগেই বলেছি, দ্বিতীয় গ্রেডের বৈশিষ্ট্য তার অতিরিক্ত সঙ্কোচন, যাতে অল্প কোষের সাহায্যে বেশি লেখা প্রকাশ করা যায়। বাংলার ক্ষেত্রে সঙ্কোচন হয়েছে তিন রকমের : (১) শব্দের শুরুতে, (২) শব্দের মধ্যে ও শেষে এবং (৩) গোটা শব্দে। তাছাড়া রয়েছে শব্দবিত্ত ও যুক্তবর্ণের সংক্ষেপায়ন। শুরুতে সঙ্কোচন করা হয়েছে প্র-, পরা-, উৎ-, প্রতি-, অভি-, দুর্-, ইত্যাদি উপসর্গের। দ্বিতীয় গ্রেডে এগুলি একটিমাত্র ব্রেলকোষে লেখা যায়। ফলে চারবর্ণের 'প্রতি-' এক বর্ণের কোষে সঙ্কুচিত হচ্ছে। শব্দের মধ্যে ও শেষে সঙ্কোচনগুলি দুই কোষের। উদাহরন, -আনা-, -আরা-, -ইনি-, -ইকা-, -আলী-, -ওয়া-, -শালী-, -বান-, -বতী-, -ওলি-, -ওলো-, -ছে-, -ছিলেন-, -ছিলাম-, ইত্যাদি। শুধু শেষের জন্য সঙ্কোচনও রয়েছে দু-একটি। যেমন -ইয় এবং -এর দুটি এককোষী সঙ্কোচন।

বাংলা লেখায় প্রচুর শব্দবিত্ত দেখা যায়। দ্বিতীয় গ্রেড বাংলা ব্রেলে শব্দবিত্তের জন্য শব্দটি লিখে একটি এককোষী সঙ্কোচন-চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, অতীতে যেমন শব্দটির পাশে ২ সংখ্যা লেখা হত। ব্রিত্তের দ্বিতীয় অংশে স্বরবর্ণ পরিবর্তন হলে ব্রিত্তচিহ্নের আগে স্বরবর্ণের ব্রেল সঙ্কেত লিখতে হয়। যেমন নাচানাচি, খুনোখুনি-র বেলায়।

এছাড়া যুক্তবর্ণের এককোষী ও দুইকোষী সঙ্কোচন করা হয়েছে। য-ফলা, র-ফলা ও রেফ একটি ব্রেল কোষে প্রস্তুত। কিন্তু -জ্ঞ-, -জ্ঞ-, -জ্ঞ-, -জ্ঞ- ইত্যাদি জন্য দুই কোষ ধার্য। যুগ্মব্যঞ্জনের জন্যও আছে একটি বর্ণবিত্ত কোষচিহ্ন। সেটি আগে বসিয়ে ব্যঞ্জনের কোষ লিখলে যুগ্মব্যঞ্জন রূপায়িত হয়। তাছাড়া ছ, জ, ঞ, ঙ বোঝাবার জন্য ছ, ঞ, থ, এবং ধ-র আগে একটি এককোষী চিহ্ন দেওয়া প্রয়োজন। অনুসাসিক বর্ণ দিয়ে শুরু যুগ্মব্যঞ্জনের জন্যও রয়েছে বিশেষ ব্যবস্থা।

যে শব্দগুলি বাংলা রচনায় বেশি ব্যবহার করা হয়, তার কয়েকটির জন্য এককোষী বর্ণনা আছে। যেমন না, করে, আমি, সে, এবং, কোন, ছাড়া, জন্য, যে, আর, মাঝে, হয়। দুইকোষে রচিত শব্দসংক্ষেপও রয়েছে। এই ধরনের শব্দের কয়েকটি উদাহরণ : আমাকে, তোমাকে, অথচ, একটা, কেবল, চেয়ে, ছেড়ে, জন্য, তুমি, ছিল, তবু, নেই, খুব, পাশে, মধ্যে, পিছে, আমার, একটি, তোমার, মানুষ, লোক, শিক্ষা, মূল, অনেক, আমাদের, ইত্যাদি, কোথাও কাদের, তোমাদের, ছিলাম, প্রভৃতি, সামনে, বাইরে, অভাব, অবশ্য, প্রধান, অযথা, আবার, উচিত, এখন, কখন, তখন, বিভিন্ন, যখন ইত্যাদি। তিন-কোষে প্রকাশিত পূর্ণ শব্দ রয়েছে পর্যন্ত, প্রয়োজন, অন্যান্য, অর্থাৎ মাধ্যমে, বিশাল, সাধারণ, সম্পর্ক, সুতরাং ইত্যাদি। এইসব সঙ্কোচনে ব্যবহার-প্রাচুর্য ছাড়াও দেখা হয়েছে অন্যান্য ভাষার সঙ্গে সামঞ্জস্য, অন্য সঙ্কোচনের সঙ্গে কোন বিভ্রান্তি না হওয়ার সম্ভাবনা এবং মনে রাখার সুবিধে।

উপসংহারে বলার বিষয়, ভারতের অধিকাংশ ভাষার প্রথম গ্রেড ব্রেল সঙ্কেতের চেহারা মোটামুটি এক। সুতরাং প্রথম গ্রেড ব্রেলের জন্য ভারতী ব্রেল রাইটারের খুব অল্প পরিবর্তন

করে হিন্দি, গুজরাতি, পাঞ্জাবী, ওড়িয়া ইত্যাদি ভাষার জন্য ব্যবহার করা যাবে। কিছুকাল ধরে ওয়েবেল মেডিয়াট্রনিক্স সংস্থা এইসব প্রযুক্তি ব্যবহার করেছেন। ব্রেল এমবস করার জন্য তাঁরা পার্কিনস ব্রেলারকে কম্পিউটার দিয়ে চালাবার হার্ডওয়ারও বানিয়েছেন। তার সাথে আমাদের ভারতী ব্রেল সফটওয়ার জুড়ে একটি গোটা ইউনিট তৈরি হয়েছে। এই ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই তাঁরা ভারতের বেশ কিছু স্থলে বিপণন/বিতরণ করেছেন।

তবে এই ধরনের দু একটি প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিগত চেষ্টাই যথেষ্ট নয়। ভারতের কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তির অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও এই কাজে এগিয়ে এলে ভালো হয়। কিন্তু আর্থিক মুনাসা এইসব বাণিজ্যিক সংস্থার বড়ো চালিকাশক্তি। ভারতে দৃষ্টিহীনদের জন্য কম্পিউটার প্রযুক্তি থেকে আপাতত লাভের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। সুতরাং একমাত্র ভরসা অলাভজনক এন জি ও এবং জনহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলি। নতুন উদ্যমে তাঁদের এই কাজে এগিয়ে আসার আহ্বান করি।

উল্লেখ পঞ্জি :

- আম্বজা, স্বপ্ন (১৯৮৯)। ভারতী ব্রেল শিক্ষক (হিন্দি), ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন ফর দি ব্লাইন্ড, মুম্বাই।
চ্যাটার্জী, কমা (সম্পাদনা) (২০০১)। বাংলা ভাষা বাংলা ব্রেল নিজে শেখা, সোসাইটি ফর দ্য ভিসুয়ালি হ্যান্ডিক্যাপড, কলিকাতা, ২০০১।
মজুমদার, শিখা (১৯৯৩)। মাতৃভাষায় ব্রেল চর্চা, বাংলা ব্রেলের অনুশীলন পদ্ধতি, সোসাইটি ফর দ্য ভিসুয়ালি হ্যান্ডিক্যাপড, কলিকাতা, ১৯৯৩।
চৌধুরী, বিদ্যুৎবরণ (১৯১০) কথা-কলা কম্পিউটার, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১১০ বর্ষ, ৪ সংখ্যা, পৃ: ১৫০-১৬৫।

Aldridge V. (1997), *The unification of English Braille*, International Braille Seminar, the Swiss Federation of the Blind and Partially Sighted, CH-3792 Saaner nr, Gstaad.

Basu H. (1993), *Bi-lingual training manual for primary level teachers* (English), Education to sightless citizens series-1, Society for the visually handicapped, Calcutta.

Braille Authority of North America (1987). *Code for computer Braille notation*.

Louisville, KY: American Printing House For The Blind.

Buntrock, G. (1996), *Common Nemeth Symbols*, National Braille Association.

Caton, H. (1979), *A Primary Reading Program for Beginning Braille Readers*, Journal of Visual Impairment and Blindness, Vol. 73, No. 8, pp. 309-313.

Chaudhuri B. B. (1994), *Development of character recognition in Bangla and a PC based workstation for the blind*. Final Report of Homi Bhabha Fellowship, Indian Statistical Institute, Kolkata.

Collins, S., Harold, S. J., Kifer K. (1998), *Brialle for the Sighted (Beginning Braille)*, Garlic Press.

- Crammer T. V. and Nemetj A. (1991), *A Uniform Braille Code*, memo to the members of the BANA Board dated January 15, 1991 ; archived on the World Wide at either of the URLs: <http://www.nfb.org>, <http://world.std.com/~iceb/>
- Duxbury Systems-**Braille translation software**, URLs: www.duxburysystems.com/
- Freedom Scientific (2002), *Versa Point Dou Interpoint Braille Embosser User's Guide*, published by. URLs:<http://www.freedomscientific.com>
- Kurzweil R. (1992), *The End of Handicaps, Part 1*, Library Journal, Reed Elsevier, USA.
- Lachiver, G.; Vachon, J. and Seufert W. D. (1984), *An optoelectronic device to read and spell Braille – Braillect* IEEE Trans. Biomed. Eng. Vol BME-31 no. 8, pp 560-563.
- Landfors M., (1997), *An historical overview of Braille and its adaptation to various languages*, International Braille Seminar, the Swiss Federation of the Blind and Partially Sighted, CH-3792 Saanen nr. Gstaad.
- Nemeth, A (1972). *The Nemeth code of Braille mathematics and scientific notation*. Louisville, KY: American Printing House For The Blind.
- Perkins activity and resource guide (2004) : *A handbook for teachers and parents of students with visual and multiple disabilities*; 2nd Ed., (www.perkinspublications.org).
- Telesensory video magnifiers*- URLs;<http://www.telesensory.com/>
- Raman, T.V. (1994), *Audio system for technical reading*, Ph.D. Thesis, Cornell University.
- The National Federation of the Blind (1995), *The World Under my Fingers Personal Reflection on Braille*.

বাংলা প্রবাদে শস্য-শত্রু এবং শস্য-রক্ষা

মনোঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায়

সংস্কৃতে একটি শ্লোক এইরকম :

জীৰ্ণমলং প্রশংসীয়াৎ ভাৰ্য্যাঞ্চ গতবৌকনম।

রণাৎ প্রত্যাগতং শূরণ শস্যঞ্চ গৃহমাগতম॥

এই শ্লোকটির একটি অংশ ‘শস্যঞ্চ গৃহমাগতম’ বাংলাতে প্রবাদ রূপে গৃহীত। শস্য ঘরে এসে পৌঁছালে তবেই প্রাপ্তি বলে বিশ্বাস করতে হয়, তার আগে নয় (সমার্থক প্রবাদ ‘না আঁচালে বিশ্বাস নেই’)। কেননা হাজারো বাধা বিপত্তি পেরিয়ে ফসল ঘরে তুলতে হয়। পোকা-মাকড়, রোগ-বালাই, ইঁদুর-বাদুড়, আগাছা-পরগাছা ইত্যাদির ক্ষতি রয়েছে। তারপর বিবিধ প্রাকৃতিক বিপর্যয় যেমন খরা, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, ভূ-কম্পন ইত্যাদি রয়েছে। আছে মানুষের হিংসা-দ্বेष-শত্রুতা-লোভ। বাধ মানে না গবাদি পশুও। এতসব ঝঙ্কি পেরিয়ে তবে তো ফসল ঘরে তুলতে হবে। এই চিত্র কেবল বাংলার জমি জিরেতে নয়, পৃথিবীর সব দেশে, সব কৃষি-জলবায়ু অঞ্চলে এই দৃশ্য। প্রাচীন পুঁথিতে উল্লেখ আছে ‘কীটপতঙ্গ অর্ধেক গম ধ্বংস করিল, বাকী অংশ জলহুত্তীরা খাইয়া ফেলিল; মাঠে ইঁদুরের ঝাঁক দেখা দিল; ফড়িং নামিয়া আসিল; গরুতে খাইতে লাগিল; ছোট পাখিরা চুরি করিতে শুরু করিল এবং চাষী জমিতে অবশিষ্টাংশের প্রতি মুহূর্তের জন্য নজর দিতে ভুলিয়া গেলে ডাকাতেরা সেটুকু লইয়া গেল।’ পেস্টিসাইড অ্যাসোসিয়েশনের একটি সমীক্ষায় প্রকাশিত হয়েছে ভারতের খাদ্য উৎপাদনের ৪৫ ভাগ বিভিন্ন কারণে নষ্ট হয়, যার আর্থিক মূল্য বার্ষিক ৫০০০ কোটি টাকা। এই নষ্টামির মূলে রয়েছে আগাছা, কীটশত্রু, ইঁদুর এবং রোগজীবাণু। প্রস্তুত প্রবন্ধে বাংলা প্রবাদে বর্ণিত ফসলের শত্রু ও তাদের ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। তার আগে জেনে নেওয়া প্রয়োজন ফসলের শত্রু বা পেস্ট (pest) বলতে কি বোঝায়।

ফসলশত্রু (Pests)

পেস্ট শব্দটির উৎপত্তি ল্যাটিন ‘Pestis’ শব্দটি থেকে যার অর্থ মহামারি। পেস্ট হচ্ছে এমন উদ্ভিদ, প্রাণী বা জীবাণু যারা মানুষ ও তার সম্পদের পক্ষে অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণের বিচারে অর্থপূর্ণভাবে ক্ষতিকারক। সেই হিসাবে পোকা (Insects), মাকড় (Mites), কৃমিশত্রু (Nematodes), রোগজীবাণু (Microbes), ছত্রাক (Fungus), ভাইরাস (Virus), মাইকোপ্লাসমা (Mycoplasma), আগাছা (Weeds), ইঁদুর (Rodents), পাখী (Birds), গবাদিপশু (Cattle) প্রভৃতিকে পেস্ট হিসাবে গণ্য করা হবে। ফসলের বৃদ্ধি ও পরিষ্করণের বিবিধ দশায় এই সমস্ত

শত্রুরা গাছের শিকড়, ডাঁটি, পাতা, কচি বা পাকা ফসল এবং বীজ খেয়ে প্রভূত ক্ষতি সাধন করে। কেউ পাতা কাটে, কেউ রস চুষে খায়, কেউ রোগের বিস্তার ঘটায়, কেউ সমূলে শস্য বিনষ্ট করে। এইভাবে আবাদি ফসলে পোষ্টের ক্রমবর্ধমান আক্রমণে উৎপাদন গুরুতরভাবে ব্যাহত হয়। আলোচ্য প্রবন্ধে বাংলা প্রবাদের সূচি বিশ্লেষণ করে ফসলশত্রুর একটি তালিকা তৈরি করা হয়েছে।

বাংলা প্রবাদে ফসল শত্রুর প্রসঙ্গে যেমন এসেছে, এসেছে তার দমন বিধিও (Pest Control)। যে পদ্ধতির সাহায্যে পোষ্ট-এর সংখ্যা কমিয়ে এনে, ক্ষতি রোধ করা যায় তাই হল পোষ্ট কন্ট্রোল। এই অধ্যায়ে আমরা সেই শস্যরক্ষা প্রসঙ্গের অবতারণাও করব। শস্যরক্ষার অনেক উপায় আছে। সবচেয়ে সহজলভ্য উপায় হচ্ছে পোষ্টিসাইড বা কীটন ব্যবহার। এছাড়া রয়েছে কর্ষণ পদ্ধতি (Cultural Practice), জৈব দমন পদ্ধতি (Biological Control) ইত্যাদি। আশ্চর্যের বিষয়, বাংলা প্রবাদ সমস্ত কিছুকেই ছুঁয়ে গেছে। প্রবাদের সংখ্যা এবং তথ্যের নিরিখে তা অপ্রতুল হওয়া সত্ত্বেও যা আছে তাই বা কম কিসে। বাংলা প্রবাদে বর্ণিত ফসলশত্রু (Pest)-র একটি তালিকা দেওয়া হল। ফসলশত্রুর প্রসঙ্গ অবশ্য সর্বদা প্রত্যক্ষভাবে আসেনি। সামাজিক অনুশঙ্গও হাজির হয়েছে। পরে এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হবে।

তালিকা : বাংলা প্রবাদে ফসলশত্রু

আগাছা :	উলুঘাস, দুকো ঘাস, মুখা, শেওলা, পানা, লতানো আগাছা, কাশ ঘাস
শত্রুকীটপতঙ্গ :	উই, গোবরে পোকা, গন্ধিপোকা, তিলের আচা পোকা, আলুর ঘুরঘুরে পোকা, আরশোলা, এঁটুলি, মাকড়, পিপড়ে, কলার মাক্কা পোকা, আমের পোকা, ঘুগপোকা
রোগ-বালাই :	আমের মুকুলে গুঁড়ো ছাতা রোগ
স্তন্যপায়ী শত্রু :	ইদুর, গেছো ইদুর, ছাগল, গরু-বাছুর, বাদুড়
অন্যান্য শত্রু :	শামুক (ধান গাছে), কাক (পাকা আমে), টিয়া, মাছরাঙ্গা, বক ইত্যাদি।

আগাছা

'Weeds are the plants, which grow where they are not wanted.' অস্থানে জন্মানো যাদের প্রকৃতি সেই অবাস্তিত গাছই হল আগাছা। এরা ফসলের সঙ্গে খাদ্য, জল, স্থান এবং সূর্যালোক নিয়ে লড়াই করে। ফলে কৃষিক্ষেত্রে এক প্রতিযোগিতার জন্ম নেয় ফসল বনাম আগাছার মধ্যে। এতে শস্যের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, জমির উর্বরতা নষ্ট হয়। ইংরাজিতে একটি প্রবাদ আছে 'One year seeding, seven years weeding' অর্থাৎ আগাছার বীজ যদি ভুলেও একটিবারের জন্য জমিতে ঝরার অনুমতি দেওয়া যায়, তবে সাত সাতটি বছর নিড়িয়েও জমি থেকে সেই আগাছার বাড়বাড়ন্ত নিষ্পত্তি করা কঠিন। একটি তামিল প্রবাদ হল 'কলাই এড়াবন/বিলাইবু এডান্' অর্থাৎ যে নিড়ায় না সে ফসল তোলে না। সুতরাং জমির আগাছা নিড়িয়ে সাফাই করা অত্যন্ত জরুরি। তার অন্যথা ঘটলে ফসল সাংঘাতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আগাছা জমির ৫০ শতাংশ খাদ্যোৎপাদন টেনে নিতে পারে। বাংলা প্রবাদে তাইতো বলা হয়েছে 'আগাছার বড় বাড়'। বৃহৎ বনস্পতিকে বৃক্ষলতা ছেয়ে ফেলে। সূর্যালোক থেকে বঞ্চিত হয়ে

বৃহৎ বৃক্ষেরও মৃতপ্রায় অবস্থা হয়ে দাঁড়ায়। একটি বাংলা প্রবাদে বলা হয়েছে ‘গাছের শত্রু লতা, মানুষের শত্রু কথা।’ এটি অপ্রত্যক্ষ কৃষি প্রবাদ হলেও প্রথমাংশটি কৃষি বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মিথ্যে নয়। আগাছার ক্ষতি অন্যভাবেও উপলব্ধ হতে পারে। যেমন ফসলহীন মাঠের শত্রু সাময়িকভাবে আগাছায় (Host) আশ্রয় করে। তারপর নতুন করে চাষাবাদ করলে তারা ‘উড়ে এসে জুড়ে বসে।’ আগাছা জলসম্পদেরও অনিষ্ট করে। জলজ আগাছার বিছানায় ঢাকা খাল-বিল-নদী-নালায় জলপ্রবাহের ধারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। কচুরিপানা প্রভৃতি ভাসমান আগাছায় বিয়িত হয় নাব্যতা। জলাশয়-পুকুরে মাছচাষে ব্যাপক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এই আগাছা। সুতরাং ‘গাঁ নষ্ট কানায়, পুকুর নষ্ট পানায়’—প্রবাদটিকে মিথ্যে বলা যাবে না। আগাছা কৃষিজীবী মানুষের পরম শত্রু, প্রবল এক বিরুদ্ধশক্তি। সুতরাং অলক্ষী বিদায়ের মতো আগাছা দমন করে আমরা লক্ষীর আসনই পাকা করে তুলি। কৃষিজমিতে নিড়ান দেওয়া তো একরকম অলক্ষীকে তাড়িয়ে লক্ষী আহ্বান—‘থাক লক্ষী, যাক বালাই।’ তামিল প্রবাদেও তারই ইঙ্গিত—‘কলাই পিড়ুঙ্গা-প্-পয়ির কাল পয়ির।’ অর্থ হল : না নিড়ানো ফসল—চার আনা ফসল।

এইবার আমরা বাংলা প্রবাদে আগাছা প্রসঙ্গের বিস্তারিত অনুসন্ধানে যাব। তার আগে চোখ বুলিয়ে নিই প্রাসঙ্গিক প্রবাদমালার তালিকায় :

- ১ চাষার পো, সময় মতো খেতে দিও চাষ।
জো না মতে চাষ দিলে হবে আড়াইল ঘাস।।
- ২ উগাল সামাল তিন চাষ, জমিনে যেন না হয় ঘাস।
- ৩ সকল গাছ কাটি কুটি।
কাঠাল গাছে দিই মাটি।
- ৪ নাই ধান, নিড়ানে আন।
- ৫ যমের হাতে খুঁপ দিয়ে দুকো ঘাস ছোলাই।
- ৬ ঘাস কাটা কঠিন কাম।
ঠসকে ঠসকে পড়ে ঘাম।।
- ৭ আষাঢ় শ্রাবণে নিড়ানে মাটি।
ভাদরে নিড়ানে করবে খাঁটি।।
- ৮ ডাংগা নিড়ান বাধন আলি।
তাতে দিও নানা শালি।।
- ৯ উলুবনে আগুন লাগলে ছড়ছড়িয়ে যায়।
যে ছেলেটি বাপ ডাকবে, আমার সাথে আয়।।
- ১০ উলুবনে মুস্তা ছড়ান।
- ১১ যদি পায় খন্দে বাতে
কি করবে ঘাসে পাতে?

যথাসময়ে চাষ না দিলে কৃষিক্ষেত্রে নানা ধরনের আগাছা জন্মায়। গোত্রানুসারে আগাছা বিবিধ: ঘাসগোত্রীয় (Gramineae), মুথাগোত্রীয় (Cyperaceae), শিষগোত্রীয় (Leguminosae), বার্তাকুগোত্রীয় (Solanaceae), পটিগোত্রীয় (Tiliaceae), কলমীগোত্রীয় (Convolvulaceae), এরণ্ডগোত্রীয় (Euphorbiaceae) ইত্যাদি। প্রথম প্রবাদে চাষ দিয়ে আগাছা বিনষ্ট করার (Tillage Operation or Cultural Method) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আগাছা বিনাশ করার যথার্থ সময় হচ্ছে জমির ‘জো’ অবস্থা। ‘জো’ কথাটি এসেছে সংস্কৃত ‘যোগ’ কথাটি থেকে, খুলনায়

শব্দটি ‘যো’। সুতরাং জমিতে হাল চাষের উপযুক্ত অবস্থা বা যোগ বোঝাতে ‘জো’ শব্দটির ব্যবহার। বৃষ্টির পর বা সেচ দেওয়ার পর ফুটিফাটা শক্ত মাটি জল শুষে নরম হয়। এই অবস্থায় জমিতে হাল দিলে লাঙলের ফলার খোঁচায় শিকড়সুদূর আগাছা উপড়িয়ে আসে। সমূল উৎপাটিত আগাছা সূর্যের তাপে শুকিয়ে মারা যায়। শুকনো ঘাস মাটিতে মিশে জৈব খাদ্যের যোগান দেয়। এই প্রবাদে যে আড়াইল ঘাসের উল্লেখ রয়েছে তা সম্ভবত তৃণপত্রী কাশ (*Saccharum spontaneum*) কিংবা উলু (*Imperata cylindrica*)। কেননা ঢাকা জেলায় এই প্রবাদটির যে পাঠান্তর পাওয়া যায় সেখানে আড়াইল ঘাসের পরিবর্তে এরাইল ঘাস বলা হয়েছে। সিলেটে ‘এরাইল’ হচ্ছে এক প্রকার ধারাল ঘাস। ঢাকা এবং ফরিদপুরেও ‘আরালি’ মানে ধারযুক্ত আগাছা। কাশ এবং উলু উভয় ঘাসের পাতার কিনারা ধারাল এবং ‘জো না মতে চাষ দিলে’ উভয়কে দমন করা খুবই কষ্টসাধ্য।

আগাছা সম্পর্কিত দ্বিতীয় প্রবাদে ‘উগাল’ অর্থে আগাছা ধ্বংসের জন্য দেয় চাষ। ফরিদপুরে কথাটি ‘উঁগেল’ (খ্যাতে আগাসার এ্যাত চোট, উঁগেল না দিলে আর চলে না)। চট্টগ্রামে ‘উগালন’ মানে মূলোৎপাটন করা, বাখেরগঞ্জে ‘উগলানো’ মানে উৎপাটিত করা। ‘সামাল’ মানে রোধ করা। সুতরাং জমির আগাছা রোধ করতে ক্রমাঘ্যে তিনটি চাষ দিতে হয়। এর ফলে জমিতে জন্মানো সমস্ত গাছ মরে গিয়ে মাটিতে মেশে। আগাছার সঙ্গে ফসলের প্রতিযোগিতার প্রয়োজন হয় না।

আবাস সন্নিহিত উদ্যানে গাছ লাগানর ক্ষেত্রে অনেকেই একটা বিষয়ে ভুল করেন। সব ধরনের গাছের আশায় বসত ভিটের স্বল্প পরিসর স্থানে অনেক গাছ বসিয়ে দেন। গাছ যখন কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পা দেয়, তখন বাড়ি অন্ধকার হয়ে যায়। গাছগুলো একে অপরের পায়ে পড়ে ঝগড়া করে, আলো পাওয়ার জন্য মারপিট করে। অশান্তিতে গাছগুলোর চেহারা খারাপ হয়। ফল হয় না, রোগা ঢাঙ্গা দু’চারটে গাছ দাঁড়িয়ে থাকে, আখেরে লাভ কিছুই হয় না। এ রকম প্রতিযোগিতার মাঝে কাঁঠাল নিষ্ফল হতে পারে। তখন পার্শ্বস্থ গাছগুলি নির্দিষ্ট সীমানায় কেটে পাতলা করে দিতে হয়, তারপর গোড়ায় দেওয়া হয় সারমাটি (Earthing up)। এইভাবে অব্যাহত গাছ কেটেকুটে কাঁঠালের ফল আনার প্রচেষ্টাও এক ধরনের আগাছা দমন। তৃতীয় প্রবাদটির নির্ধারিত এমনতর।

চতুর্থ প্রবাদে ধান নিড়িয়ে আনার তাৎপর্য হল ধান জমিতে নিড়ান দিয়ে আগাছা মুক্ত করা। নিড়ান দেওয়ার বিভিন্ন কৃষি যন্ত্র রয়েছে, তার মধ্যে ‘নিড়ানি’ একটি অন্যতম আদি লোকযন্ত্র। আমন ধানের জমিতে সুনি, ঝাঁঝি, কানসিরা, চটচটি, মোথা, শ্যাওলা, জোয়ানে ইত্যাদি আগাছা জন্মায়। দমন না করা হলে এরাই ধানগাছের উপর হামলে পড়ে, খাবার-জল-আলো-স্থান দখল করে। ফলে ধান উৎপাদন সম্পূর্ণরূপে ব্যবহৃত হবার সম্ভাবনা থাকে। এই প্রবাদে ধান না থাকা সত্ত্বেও তা নিড়িয়ে আনার মধ্যে আনুপূর্বিক কাজটি কিন্তু নিড়ানো, তারপর ফসল প্রাপ্তি।

পঞ্চম প্রবাদটি আসলে একটি প্রবাদাংশ। মূল প্রবাদটি হচ্ছে—‘আমি কি তেমনি চাঁপা রাই/ যমের হাতে খুঁপ দিয়ে দুকো ঘাস ছোলাই’। প্রবাদটির কৃষিগত নির্ধারিত হল দুকোঘাস দমন একটি অত্যন্ত কষ্টকর কাজ। মৃত্যুর দেবতা যম। যমের মৃত্যুযন্ত্রেও যে ঘাস বেঁচে বর্তে থাকে তার মত অব্যাহত আগাছা (Abnoxious weed) আর কি হতে পারে? এখানে আগাছা

দমনের যন্ত্রটির নাম ‘খুর্প’। যন্ত্রটির ব্যবহার খুবই প্রাচীন, বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে তার নামভেদ রয়েছে। সুতরাং এই প্রবাদটির কৃষিকথা মূলত দুটি— ১. দুকোঘাস (*Cynodon dactylon*) একটি অবাধ্য আগাছা, ২. তার দমনযন্ত্র হচ্ছে খুর্প বা খুর্পি।

কৃষিজমিতে নানা রকমের ঘাস জন্মায়। এদের কেউ কেউ উঁচু জমিতে, কেই নিচু জমিতে ফসলের প্রতিদ্বন্দ্বী। আগাছা ঘাসের একটি তালিকা দেওয়া গেল—

আগাছার নাম	উদ্ভিদবিদ্যাগত নাম
শ্যামাঘাস, (Samaghas)	<i>Echinochloa colona</i>
জলী ধান (Barnyard Grass)	<i>Echinochloa crusgalli</i>
দুর্বাঘাস (Bermuda Grass or Doob)	<i>Cynodon dactylon</i>
কাশ (Wild Sugarcane or Kans)	<i>Saccharum spontaneum</i>
সাত গাঁঠিয়া (Johnson grass or baru)	<i>Sorghum helepense</i>
বুনো জই (Wild Oats of Jungli Jai)	<i>Avena fatua</i>
ফ্যালা ঘাস	<i>Phalaris minor</i>
গুঁয়া ঘাস	<i>Digitaria sanguinalis</i>
উলু ঘাস	<i>Imperata cylindrica</i>
কুকড়ো ঘাস	<i>Ischaemum rugosum</i>
বন্য ধান	<i>Oryza sativa var fatua</i>
শেয়াল লেঙ্গা	<i>Setaria viridis</i>
দাড়ি ঘাস	<i>Leptochloa chinensis</i>
কোদাই ঘাস	<i>Eleusine indica</i>

এছাড়াও মুখা গোত্রীয় (Sedge Family—Cyperaceae) বিভিন্ন আগাছাকে বাংলায় ঘাস নামে অভিহিত করা হয়। যেমন—জলমুখা (*Cyperus iria*), মুখা (*Cyperus rotundus*), গোলমুখা (*Cyperus difformis*), ইত্যাদি। এই সমস্ত ঘাসকে জমি থেকে নিড়িয়ে দূর করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ও ব্যয়সাপেক্ষ। প্রখর গ্রীষ্মে বোনা আউশ কিংবা রোয়া আউশ জমিতে; শ্রাবণ-ভাদ্রের শুমেটি রোদে আমনের ক্ষেত্রে নিড়িয়ে আগাছা তোলা কি ভয়ংকর পরিশ্রমের ব্যাপার তা কৃষিজীবী মানুষ মাত্রই জানেন। ৬নং প্রবাদে তাই বলা হয়েছে ‘ঘাস কাটা কঠিন কাম’। পরিশ্রম আরো এই জন্য যে মুখাঘাসের গের্গেড়া (Underground stem) গুলো মাটি থেকে উপড়িয়ে না দিলে তা থেকে পুনর্ব্যবহার গাছ বেরোয়। সুতরাং ‘ঠসকে ঠসকে’ ঘাস ঝরার মধ্যে সেই মেহনতী মানুষের কঠোর শ্রমের চিত্রটাই বিধৃত আছে।

সপ্তম প্রবাদটি খনার বচনের একটি অংশ। এটি হলুদ চাষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে হলুদ রোপন করে আষাঢ়-শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে উত্তমরূপে জমি নিড়িয়ে আগাছা নির্মূল করে দিতে হয়। তবেই হলুদ ফসল ভালো হয়। এর অন্যথা হলে বা অন্য নিয়মে পুঁতলে হলুদ পাবার আশাই থাকে না। কৃষি বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, চাপান সার প্রয়োগের (Top Dressing) আগে জমিতে নিড়ানি দিয়ে আগাছা তুলে মাটি আলাগা করে দিতে হবে ও গাছের গোড়ায় মাটি দিতে হবে (Earthing Up)। প্রথম চাপান লাগবে ৪৫ দিন পর এবং দ্বিতীয় চাপান ৯০ দিন পর। সুতরাং বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে বীজকন্দ লাগানোর ৪৫ দিন পর সময়টা দাঁড়ায় আষাঢ়-শ্রাবণ এবং ৯০ দিন পরের সময়টা ভাদ্রই হয়।

‘শালি’ কথাটির অর্থ হচ্ছে সরু হৈমন্তিক আমন ধান (Fine Grained Autumn

Paddy)। কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ‘শালি ধানের অন্ন’, চৈতন্যচরিতামৃত-এ ‘পীতযূত সিন্ধু শালি অন্নের স্ক্রপ’ কিংবা গোপীজনবল্লভদাসের রসিকমঙ্গলকাব্য-এ, ‘উত্তম শালি অন্ন’র লোকায়াত বিবরণ পাওয়া যায়। ধান অর্ধজলজ শস্য (Semi Aquatic Crop)। বিভিন্ন প্রকার ধান ভাসা জমি থেকে শুরু করে গভীর জলে-জন্মাতে পারে। বোনা আউস উঁচু জমির মরশুমী বৃষ্টিপাতের ওপর নির্ভর করে ফলন দিলেও বোয়া আউস, আমন এবং বোরো ধানের বৃদ্ধি ও পরিষ্ফুরণ দশায় (দানা বাঁধা পর্যন্ত—Dough Stage) গাছের গোড়ায় ৩০ থেকে ১৫০ মিলিমিটার পর্যন্ত গভীর জল থাকা প্রয়োজন। এই পরিমাণ জল ধরে রাখতে জমির আল বেঁধে দিতে হবে। বৃষ্টির জল বাড়লে আল খুলে অতিরিক্ত জল নিকাশ করে দেওয়া জরুরি। আল বাঁধার আনুপূর্বিক কাজটি হচ্ছে জমির আগাছা দমন। অষ্টম প্রবাদে তাকেই বলা হয়েছে ‘ডাংগা নিড়ান’। ‘ডাংগা নিড়ান’ এবং ‘আলি বন্ধনে’র কাজ দুটি যথার্থভাবে সম্পন্ন হয়ে গেলে তবে জমিতে শালি ধানের চারা রোপণের প্রশ্ন ওঠে। এই প্রবাদে ‘নানা শালি’র প্রসঙ্গ আছে। তাই একেবারে অপ্রাসঙ্গিক হবে না মনে করেই আমরা এখানে বাংলার কয়েকটি শালি ধানের উল্লেখ করব—মধু শাইল, করিমশাল, পরমান শাল, মরীচশাল, রাণিশাল, টিপুলামশাল, পিঁপড়াশাল, রূপশাল, বেণীশাল, কার্তিকশাল, সুন্দরশাল, কতিশাল, চাইকাশাল, কুসুমশালি, রামশাল, শাইলজটা, যূত শাইল, ডিম্ভামনি রাজাশাইল ইত্যাদি। খনার বচনেও পাচ্ছি—

আগে বাঁধো আলি। রোও তবে শালি।।

না যদি ফল ফলে। গালি পেড়ো বনা বলে।।

উলুবন অর্থাৎ Imperata cylindrica তৃণের ঘন আন্তরণ। নবম প্রবাদে উলুবনে আগুন লাগানোর প্রসঙ্গ আছে। যে অনুষঙ্গেই এই প্রবাদটি রচিত হোক না কেন আগুন দিয়ে আগাছা পুড়িয়ে ফেলা (Flame Throw) একটি প্রাচীন দমন পদ্ধতি। আজও পতিত জমি পুনরুদ্ধার করার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। উলুবনে আগুন দিলে কাঁচা পাতা পোড়ার যে ফটফট শব্দ এবং আগুনের লেলিহান শিখা এগিয়ে যাওয়া—তাকেই এই প্রবাদে বলা হয়েছে ‘ছড়ছড়িয়ে যাওয়া’। শস্যক্ষেত্রে প্রায় সব ধরনের আগাছাই বিভিন্ন রকমের, রোগ ও পোকাকার আশ্রয়স্থল। ঘাস ফড়িং, পঙ্গপাল প্রভৃতি পোকা ফসলের পাতা না পেলে ঘাস খেয়ে জীবনধারণ করে। আগুন প্রয়োগে আগাছার সঙ্গে এই ফসলশত্রুও ধ্বংস হয়। দশম প্রবাদে ‘উলুবনে মুস্তা ছড়ানো’র প্রকৃত তাৎপর্য সম্ভবত আগাছা সমাকীর্ণ ভূ-খণ্ডে বীজ (এখানে মুস্তার মতই মহার্ঘ) ছড়ানোর মূর্খামি। তাতে ফসল পাওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই নেই। আগাছার বাড়-বাড়ন্তে শস্যবীজ অঙ্কুরিত হওয়ার সুযোগই পায় না।

পোকামাকড়

প্রাণীজগতে ‘কীট’ গোষ্ঠী সবচাইতে বড়ো। যত প্রজাতির জীবকুলকে প্রাণিরাজ্যের মধ্যে চেনা গেছে তার বারো আনাই কীটপতঙ্গ। চাষিরাও কীটপতঙ্গ বা পোকামাকড় কথাতুলির সঙ্গে বিশেষ পরিচিত। জমি-জিরেতে তারা দেখতে পান অজস্র রকমের, নানা রঙের আর বিভিন্ন আকার-আয়তনের পোকামাকড়। কীটশ্রেণির অনেকেই ফসলকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। ফলে ফসলের কম-বেশি ক্ষতি হয়। ফসল শুদাম জাত হওয়ার পরও কীটশত্রুর হাত থেকে রেহাই পাওয়া কঠিন। অবশ্য আপাত দৃষ্টিতে অনেক সময় ক্ষতির পরিমাণ বেশি মনে হলেও,

আসলে আর্থিক দিক দিয়ে কৃষক-বন্ধুরা ক্ষতির সম্মুখীন হন না। কারণ ওই সামান্য পরিমাণ ক্ষতি রোধ করতে চাষিদের যে পরিমাণ ওষুধ ব্যবহার করতে হয়, তাতে 'ঢাকের দায়ে মনসা বিক্রি' হয়ে যাওয়ার জোগাড়।

বাংলা প্রবাদে বিবিধ কীটশত্রুর উল্লেখ পাই। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই উল্লেখ সরাসরি। কোথাও কীটশত্রুর দ্বারা ক্ষতির বর্ণনা রয়েছে যার থেকে, কীটশত্রুকে সনাক্তকরণ করা যেতে পারে। বর্ণিত কীটশত্রুর একটি তালিকা তৈরি হয়েছে। এই তালিকা থেকে বোঝা যাবে অতীত দিনের কৃষিতে মুখ্য কীটশত্রু কি কি ছিল। আজকের দিনে যথেষ্ট কীটনাশক ব্যবহারের ফলশ্রুতিতে অনেক অপ্রধান কীটশত্রু (Minor Pest), প্রধান কীটশত্রুতে (Major Pest) পরিণত হয়েছে। অতীতে সেই সমস্যা ছিল না। ফলে প্রধান ফসলের প্রধান কীটশত্রুগুলিই কৃষকের মাথাব্যথার কারণ ছিল। সমকালীন কৃষি বাস্তবতায় দৃশ্যমান পোকামাকড়গুলিই প্রবাদকারের রচনায় হাজির হবে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। ধান ছিল সেকালের প্রধান কৃষি ফসল। তাই ধানের কীটপতঙ্গের অবতারণা হয়েছে বেশি। উই সর্বভুক (Polyphagous), সর্ববিস্তারী কীট (Cosmopolitan)। তাই উই প্রসঙ্গের অবতারণা স্বাভাবিক। তিল অন্যতম প্রাচীন তৈলবীজ, কলা-আম-নারকেল জনপ্রিয় ফল, বেগুন অধিক উৎপন্ন সবজি। এই সমস্ত ফসলের সমকালীন গুরুত্বও ছিল প্রগাতিত। তাদের কীটশত্রুর নাম প্রবাদকারের মনে আসা স্বাভাবিক।

তালিকা—বাংলা প্রবাদে উল্লিখিত কীটশত্রু

ক্রমিক সংখ্যা	কীটশত্রুর নাম	ইংরাজী নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	প্রবাদের উদাহরণ
১	উই	Termite	<i>Microtermes obesi</i> <i>Odontotermes obesus</i>	• উই আকাশে ওড়ে পাখিতে খায় ধরে। • উইয়ের পৌঁড়ে পালক হলে আকাশ ছুঁতে চায়।
২	গোবরে পোকা	Rhinoceros Beetle	<i>Oryctes rhinoceros</i>	গোবরে পোকা গোবর খোঁজে, বেঙ খোঁজে ডোবা।
ক্রমিক সংখ্যা	কীটশত্রুর নাম	ইংরাজী নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	প্রবাদের উদাহরণ
৩	কলার জুই	Banana Pseudostem Borer	<i>Cosmopolites sordidus</i> , <i>Odoiporus Longicollis</i>	কটি বটে খাবি নে। কলা ভায়ে খাবি নে।। লেগে যাবে জুয়ে। কলা পড়বে শুয়ে।।
৪	বেগুনের পোকা	Epilachna Beetle	<i>Epilachna vigintioctopunctata</i>	বলে গেছে বরাহের পো, দশটি মাসে বেগুন রো, চৈত্র বৈশাখ দিবি বাদ, ইথে নাই কোন বিবাদ; ধরলে পোকা দিবে ছাই, এর চেয়ে ভাল উপায় নাই। মাটি শুকালে দিবি জল, সকল মাসেই পাবি ফল।

৫	তিলের আঁচা	Sesamum Caterpillar	<i>Diacrisia obliqua</i>	খনা বলে চাষার পো। আচার তিল মাঠে ধো।।
৬	ধানের কেড়ি পোকা	Rice Weevil	<i>Sitophilus oryzae</i>	যদি ঝড়ে পৌষ, উগরের ধান তুষ।
৭	ধানের সরুই পোকা বা গোলা মথ	Angoumois Grain Moth	<i>Sitotroga cerealella</i>	যদি ঝড়ে পৌষ, উগরের ধান তুষ।
৮	ধানের গন্ধি পোকা	Rice Bug	<i>Leptocoris varicornis</i>	বুড়া গরু, বস্ত্র পুরান, চোরা গাই, গাঙ্গিচোষা ধান। সেই সেমান যে বেচতে না কবে আন।।
৯	পাকা আমের পোকা	Mango fruit fly	<i>Dacus dorsalis</i>	• পাকা আমে পোকা। • মিষ্টি আমেই পোকা ধরে।

এছাড়াও ঘুরঘুরে পোকা (Mole Cricket—*Gryllotalpa africana*), মাষ কলায়ের পোকা (Pulse Beetle—*Callosobruchus chinensis*), গরুর ঐটুলি (Ticks and mites), কাঠের পোকা বা বাঁশের ঘুণ ইত্যাদির প্রসঙ্গ আছে।

অর্ধোপটেরা বর্গের অন্তর্গত ঘুরঘুরে পোকা নরম মাটির আলুর খুব ক্ষতি করে। পূর্ণাঙ্গ ঘুরঘুরে পোকা লম্বায় ৩.২ সেমি, দেহ সূক্ষ্ম রোমে ঢাকা, বর্ণ বাদামী। সরু পশ্চাৎ ডানাদুটি পিছনের দিকে প্রসারিত, উদর সম্পূর্ণরূপে ডানা দিয়ে ঢাকা নয়। ঘুরঘুরে পোকা মাটির তলায় আলুতে ফুটো করে দেয় অথবা আলুর ভিতর সুড়ঙ্গ করে ঢোকে। ফলে আলু পচে যায়। বাংলা প্রবাদে ঘুরঘুরে পোকাকার প্রসঙ্গ এসেছে বাস্তব চরিত্র প্রকাশের প্রেক্ষিতে—

কোকিলের রব শুনে পেঁচার হল হাসি

ঘুরঘুরে বলে আমি উন্টে দেব ফাঁসি।

এই সমালোচনাত্মক প্রবাদে তিনটি সামাজিক শ্রেণি চরিত্রকে তুলে ধরে সমালোচনা করতে গিয়ে ঘুরঘুরে পোকাকার প্রসঙ্গটি আনা হয়েছে। কোকিল শুনীজন, সে সুমিষ্ট কণ্ঠের অধিকারী। পেঁচার স্বর কর্কশ, অমঙ্গলকর। পেঁচা কোকিলের মিষ্টি সুর শুনে তাজিল্যের হাসি হাসে। পক্ষান্তরে ঘুরঘুরে পোকা ক্ষতিকারক শ্রেণির প্রতীক, সে ফসলের শুধু ক্ষতিই করে। একইভাবে সে সুমিষ্ট কণ্ঠী কোকিলেরও ক্ষতি করতে চায় (যা প্রবাদে প্রকাশিত হয়েছে ফাঁসি দেওয়ার মাধ্যমে)।

‘মাষকলায়ে পোকা ধরে না’ প্রবাদটির কৃষিবিজ্ঞানগত সত্যতা আংশিক। কৃষিজমিতে মাষকলাই (Black Gram)-এর অন্যতম প্রধান শত্রু লাল শূয়া পোকা (Red Hairy Caterpillar-*Amsacta moorei*) এবং আঁচা বা বিছা পোকা (Bihar Hairy Caterpillar-*Diacrisia oblique*)। তবে গোলাঘরে ডালের কীড়া (Pulse Beetle-*Callosobruchus chinensis*) দ্বারা কলাই ডাল খুব কমই আক্রান্ত হতে দেখা যায়। এর কারণ সম্ভবত মাষকলাই-এর বীজত্বকের বৈশিষ্ট্য—অত্যন্ত শক্তপোক্ত, মসৃণ, তেলতেলে এবং কালো যা ডালের কীড়ার পক্ষে দানায় গর্ত করে প্রবেশ করা একরকম দুঃসাধ্য ব্যাপার।

গরুর ঐটুলি সম্পর্কিত প্রবাদ ('কুঁড়ে গরুর ঐটুলি সার' এবং 'গো-ভাগ্য নেই, ঐটুলি-ভাগ্য আছে') গো-পালন কেন্দ্রিক আলোচনার অঙ্গ। উই সম্পর্কিত প্রবাদ বন্ধুজীব (Defenders) পর্যায়ে আলোচিত হয়েছে। কারণ প্রবাদ দুটিতে জৈব দমনের (Biological Control) অভিপ্রায় (Motif) টি স্পষ্ট। কাঠের পোকা বা বাঁশের ঘুণ সম্পর্কে আলোচনা কৃষি বিজ্ঞানের নিরিখে অতিকথন বলে তা বাদ রাখা হয়েছে। তবে প্রবাদ দুটি হচ্ছে: 'কাঠের পোকা কাঠেই চরে' এবং 'কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরে'।

গোবরে পোকা বা গণ্ডারে পোকা (Rhinoceros Beetle) নারকেলের সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকর কীটশত্রু। এদের পূর্ণাঙ্গ কীট কালো এবং ধনুকের মত শক্ত ও বক্রদেহী। শুককীট দশায় এরা সারের গাদায় বা অন্য জৈব পদার্থে অবস্থান করে। পূর্ণাঙ্গ কীট নারকেলের কচি পাতা খায়, ফলে কাঁচি দিয়ে কাটার মতো ক্ষতিগ্রস্ত নতুন পাতা বেরতে থাকে। গোবরে পোকা সংক্রান্ত প্রবাদে ব্যাঙের বসতির প্রসঙ্গও আছে। ব্যাঙটি দশায় ব্যাঙের বসতি ডোবা বা জলাশয়। সুতরাং প্রবাদটিকে বাস্তবত্বের একটি খণ্ডচিত্র হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।

কলার জুই সংক্রান্ত প্রবাদটি পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় তা সম্ভবত কলার ভ্রাম্বকাণ্ড বা খোলা ছিদ্রকারী মাজরা পোকা। সিলেটে 'যাই' শব্দের অর্থ পোকা এবং তার ক্ষতির লক্ষণ এমনতর। 'কলা পড়বে শুয়ে' বাক্যাংশটি থেকেও বোঝা যাচ্ছে কলার খোল ভেদ করে থোড় বা ভারালি অংশটি যদি পোকায় কুরে কুরে খায় তবে তা ভূ-পতিত হবারই কথা। কিন্তু 'কলা তলায় যাবি নে' কথাটির কোন বিজ্ঞানভিত্তিক সত্যতা নেই। কলার চারা রোপণের পর পরিচর্যার জন্য চাষিকে বাগানে যেতেই হবে।

বেগুনের পোকা সম্পর্কিত খনার বচনটি থেকে ধারণা করা যায় পোকাটির নাম সম্ভবত বাঘা পোকা বা কাঁঠালে পোকা (Epilachna Beetle)। এদের আকৃতি কচ্ছপের মতো। পূর্ণাঙ্গ কীট ৮ থেকে ৯ মিলিমিটার লম্বা এবং ৫ থেকে ৬ মিলিমিটার চওড়া। গায়ের রঙ ঘোর লাল কিংবা তামাটে। অগ্রদানায় কয়েকটি কালো ফোটা আছে। কেননা এই পোকাটিকে ছাই-কেরোসিনের মিশ্রণ ছিটিয়ে এখনও সার্থকভাবে দমন করা সম্ভব। বেগুনের মূল শত্রু তার ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা (Brinjal Shoot and fruit borer)। যেহেতু এদের কীড়া গাছের ডগা ও ফলের ভেতরে প্রবেশ করে ক্ষতি করে সুতরাং বাইরে থেকে ছাই ছিটিয়ে তাদের দমন করা কঠিন। এমনও ধারণা করা সম্ভব—বেগুনের ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ প্রবাদকারের রচনাকালে (প্রায় হাজার বছর আগে) ছিল না। হয়তো সে সময়ে এই পোকাটি ছিল অপ্রধান শত্রু (Minor pest)। কালের গতিতে, বিভিন্ন নিত্যনতুন ফসলের আমদানিতে এবং কৃষিক্ষেত্রে যথেষ্ট রসায়ন প্রয়োগের পরবর্তী পর্যায়ে সেই অপ্রধান শত্রু প্রধান শত্রুতে (Major pest) পরিণত হয়েছে। কৃষি বিজ্ঞানের পরিভাষায় একেই বলা হয় কীটশত্রুর পুনরুদয় (Resurgence of Pest)।

এরাজ্যে তিলের একটি অন্যতম প্রধান কীটশত্রু আচা বা বিছাপোকা (Bihar harry Caterpillar)। তিল ছাড়াও মাষকলাই, মুগ, রেড়ি এবং পাট ফসলে এরা মারাত্মক ক্ষতি করে। ক্ষতির প্রকৃতি এতটাই বেশি হতে পারে যে পাতার শিরা-উপশিরা মাত্র অবশিষ্ট থাকে। আক্রান্ত গাছ এবং জমি অত্যন্ত রুগ্ন দেখায়, বিন্দুমাত্র ফলনের আশা থাকে না। সুতরাং তিলের আচা সংক্রান্ত খনার বচনে বলা হয়েছে আচা আক্রান্ত তিল ঝাড়াই-মাড়াই-এর প্রয়োজন নেই, বরং

সেটা মাঠে থাকলে কর্তন খরচ (Harvesting Cost) বেঁচে যায়।

ধানের কেড়ি পোকা এবং সরুই পোকা বা গোলা মথের উল্লেখ বাংলা প্রবাদে সরাসরি নেই। 'যদি রাড়ে পৌষ/উগরের ধান তুষ'—প্রবাদটিতে ধানের ক্ষতির লক্ষণ দেখে মনে হয় তা উপরি উক্ত পোকা দুটিই হবে। সিলেটে 'উগার' কথাটির অর্থ ধানের গোলা, বরিশাল এবং রাজশাহীতে 'উগের' মানে হাঁড়ি পাতিল ও শস্যাদি রাখার জন্য সামান্য উঁচু মাচা। সুতরাং ধান তুষ হয়ে যাচ্ছে গোলাঘরে এটা সুস্পষ্ট। এখন ধানের শস্য অংশ (Endosperm) বিনষ্ট হলেই তা তুষে পরিণত হয়। গোলাঘরে এই রকমের ক্ষতি করতে পারে কোলিওপ্টেরা (Coleoptera) গোত্রের কেড়ি পোকা এবং লেপিডপ্টেরা (Lepidoptera) গোত্রের গোলা মথ। কেড়িপোকা শস্যদানার ভেতরের অংশ খায় এবং বর্ষা ও হেমন্তকালে এদের উপদ্রব সর্বাধিক। পৌষ মাসে বৃষ্টি হলে ধানে আর্দ্রতা বাড়ে, সেই অবস্থায় গোলায় রাখলে কেড়িপোকার অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়। কেড়িপোকার সংখ্যাধিক্য ঘটে, শস্যের সারাংশ ভক্ষিত হয়, ফলে ধান তুষে রূপান্তরিত হয়। সরুই পোকার মথ হলেদেটে এবং ঝালরযুক্ত। আর্দ্রভাবাপন্ন স্ত্রীপোকার শস্যের স্তরে এদের ক্ষতির মাত্রা বেশি। এদের কীড়া ধানে ছিদ্র করে প্রবেশ করে এবং কেন্দ্রস্থল খেয়ে নষ্ট করে। প্রবাদটির মর্মার্থ এই হতে পারে—ধান কাটার মরশুমে বৃষ্টি-বাদল হলে তা তৎক্ষণাৎ গোলায় রাখা উচিত নয়। বরং কর্তন পরবর্তী রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিবসে তা ভালোভাবে শুকিয়ে আর্দ্রতা-যথাসম্ভব কমিয়ে তবে গুদামজাত করা উচিত। নয়তো সেই ধানের পরিণতি হতে পারে তুষ। এ প্রসঙ্গে একটি তামিল প্রবাদের কথা বলা যায়—'আইরঙ্গলেন্দ্রক্কু ওরু অন্দু-প-পুচ্চি পোদুম'। যার বাংলা অর্থ 'হাজার বস্তা ধান করতে নষ্ট/একটা ঝাঁঝরা পোকা যথেষ্ট'।

ধানের গন্ধিপোকার প্রসঙ্গ এসেছে সরাসরি। এই সংক্রান্ত প্রবাদে বলা হয়েছে 'গন্ধিচোষা ধান' বিক্রি করতে পারে একমাত্র সেয়ানা। কথায় বলে 'দুর্জনের ছলের অভাব হয় না'। দুর্জন বা সেয়ানা ব্যবসায়ী কথার মারপ্যাচে গন্ধিপোকা আক্রান্ত ধানকে সামান্য সমস্যা আখ্যা দিয়ে বিক্রেতাকে ঠকায়। এই প্রবাদটি থেকে স্পষ্ট, গন্ধিপোকার আক্রমণ ধানে একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা। আক্রান্ত ধানের বিক্রয়যোগ্যতা কমিয়ে দেয়। পূর্ণাঙ্গ গন্ধিপোকা এবং তাদের অপূর্ণাঙ্গ দশা ধানশ্রীষের ক্ষতি করে। শীষের দানা যখন নরম এবং দুধ অবস্থায় থাকে তখন গন্ধিপোকা শীষের দুধটুকু চুষে খায়। ফলে ধান চিটে হয়ে যায়, জলবিন্দু দাগটিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আক্রান্ত ধান সহজেই চেনা যায়। কোন ক্রেতাই তা কিনতে চায় না। কেই বা পয়সা দিয়ে চিটে ধান কিনবে?

আমের পোকার প্রসঙ্গ একাধিকবার এসেছে। প্রবাদগুলি সামাজিক অনুষঙ্গে রচিত হলেও প্রত্যক্ষ উক্তিটি বাদ দেওয়া হবে কেনন করে? ভালর মধ্যে মন্দ থাকতেই পারে, কেননা 'চাঁদের কলঙ্ক আছে'। ফলের রাজা আম, সে তো সুখাদ্য। তার মধ্যে মান্দ্য কি? আমের পোকা বললেই তো আর তাকে সনাতনকরণ করা সম্ভব নয়। কেননা আমেও অসংখ্য পোকা লাগে। বিভিন্ন প্রজাতির শোষক পোকা, আমের সাইলা, কাণ্ড ছিদ্রকারী পোকা, ছাল-থেকে গুঁয়োপোকা, ফলের মাছি, দিয়ে পোকা, পাতাকাটা কেড়িপোকা, আঁটির কেড়িপোকা, উই পোকা, আঁশ পোকা, লাল পিপড়ে, পাতার স্ফীতি বা গল সৃষ্টিকারী পোকা ইত্যাদি। কৃষিরিজ্ঞানের দৃষ্টিতে যদি পোকাটিকে চিহ্নিত করতে হয় তবে এক্ষেত্রে দু'টি বিষয়ের উপর নজর দিতে হবে। প্রথমতঃ পোকাটি কোথায় দেখা যাচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ আমের কোন অবস্থায় পাওয়া যাচ্ছে। উত্তর

দুটি হচ্ছে অবিভক্ত বাংলাদেশ এবং পাকা আম। সময়কাল বিচার করে বাংলাদেশে পাকা আমের পোকা বলতে ফলের মাছি (Fruit Fly) কেই বুঝব। কেননা পাকা আমেই এরা পরিলক্ষিত হয় এবং এত সুন্দর একটা ফলাকে এরা পুরোপুরি পচিয়ে নষ্ট করে দিতে পারে। এদের অপূর্ণাঙ্গ কীট বা ম্যাগট পাকা আমের শাঁস ও রস খেয়ে ক্ষতি করে।

ইঁদুর

ইঁদুর হচ্ছে শস্যের ধ্বংসাত্মক শক্তি, সে 'পাকা ধানে মই দেয়'। আর এই ইঁদুরের সঙ্গে মানুষের পরিচিতি অনাদিকাল থেকে। কুখ্যাতির কারণ তার নস্টামি। বাংলায় একটি প্রবাদ আছে 'উই, ইঁদুর, কুজল, ভালো ভাঙে তিনজন'। প্রবাদটি থেকেই তাই বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না উই এবং ইঁদুর পার্থিব সম্পদ কিভাবে ক্ষতি করে। বার্নেট এবং প্রকাশের (১৯৭৫) মতে, 'Rodents, by and large, are the most destructive vertebrate pests to the agricultural produce in India'।

ইঁদুর হল স্তন্যপায়ী শ্রেণির রোডেনশিয়া বর্গের মুরাশি গোত্রের প্রাণী। ইঁদুরের চোয়ালে দু'জোড়া ছেদন দাঁত আর ছ'জোড়া পেষণ দাঁত আছে। এই ছেদন দাঁতগুলির বৃদ্ধির হার অস্বাভাবিক বেশি। তাই এদের স্বভাব হল অনবরত কোনো জিনিসপত্র দাঁতে কেটে বর্ধিত দাঁতের অংশ ক্ষয় করা। খাদ্য সংগ্রহের জন্য ইঁদুর প্রচুর ফসল নষ্ট করে। শস্যক্ষেত্রে ইঁদুর যত না খায় তার বহুশুণ নিয়ে গিয়ে জড়ো করে গর্তে। ছ'টা ইঁদুর একজন মানুষের খাদ্য খায়, কিন্তু নষ্ট করে তার দশশুণেরও বেশি।

ভারতের ক্ষেত্রে-খামারে ইঁদুর-বৈচিত্র্যের (Rodent Bio-diversity) সংখ্যা ৭০, পশ্চিমবঙ্গে ৯—তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রজাতি হচ্ছে মেঠো ইঁদুর, গেছো ইঁদুর, নেংটি ইঁদুর, ভিটে ইঁদুর প্রভৃতি। 'গেছো ইঁদুর পৌদে-চেনা যায়'—প্রবাদটি থেকে স্পষ্ট, বাহ্যিক গঠন বৈশিষ্ট্যের তারতম্যে ইঁদুর প্রজাতিকে সনাক্তকরণ করা সম্ভব। ইঁদুরের লেজের রঙ, লেজের দৈর্ঘ্য, উদর ইত্যাদির বৈশিষ্ট্যে এক প্রজাতি থেকে অন্য প্রজাতির ইঁদুরকে পৃথকভাবে চেনা সম্ভব। এই লোকজ্ঞান প্রবাদকার ও লোকসাধারণ উভয়েরই আছে। প্রবাদটি সেই অনুসঙ্গেই রচিত।

আমাদের দেশে যৌনতা সবসময় অপবিত্র, অসংযত পাপকর্ম। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে বলা হয়েছে—অসময়ে কিংবা দিবাভাগে যে মৈথুন আচরণ করে লক্ষ্মী তার গৃহে গমন করে না। বাংলায় একটি চলতি কথা হচ্ছে 'দুপুরে ছেলে' অর্থাৎ দিবসে মৈথুন-জাত সন্তান যা মোটেই কাঙ্ক্ষিত নয়। যৌনাচরণ বিবেচনা করলে ইঁদুরও অলক্ষ্মী পদবাচ্য। একটি তামিল প্রবাদ—'অকপ্পু-ক-কালন্তিল্ এলিক্কু অইন্নু পেরুশাদি'। অর্থাৎ বাংলা করলে দাঁড়ায়—মরশুমের ধানকাটা/এক ইঁদুরের বৌ পাঁচটা। ইঁদুরের জন্মহার অস্বাভাবিক বেশি। তারতবর্ষে ইঁদুরের সংখ্যা বাড়ছে জনসংখ্যার ছ'শুণ হারে। একটি ইঁদুর বছরে ছ'বার বাচ্চা প্রসব করে। প্রতিবারে ৬ থেকে ১৫টি বাচ্চা দেয়। বাচ্চা জন্মানোর ১০ দিন পর দাঁত গজায় এবং ৩ মাস বয়সে সন্তান ধারণের উপযুক্ত হয়। এই জন্য অনুকূল পরিবেশে এক জোড়া ইঁদুরের সন্তান সন্ততির সংখ্যা তিন বছরে ৩৫ কোটিতে দাঁড়াতে পারে। যৌনাচরণ এবং সন্তান প্রসবের মাত্রা খাদ্য যোগানের সঙ্গে সমানুপাতিক। খাদ্যের জোগান বাড়লে সন্তান প্রসবের মোট পরিমাণ বেড়ে যায়। বাঁশের ফুল

ফুটলে দুর্ভিক্ষ মহামারীর যে আশঙ্কা লোকসাধারণ করে থাকে তা মূলত ইঁদুরের বংশ বিস্তারজনিত কারণে। ধান কাটার মরশুমে ইঁদুরের যৌনাচরণ বাড়ে, তাই ইঁদুরের সংখ্যা বেড়ে যায়। বাঁশের ফুল-ফল ইঁদুরের অতি উপাদেয় খাদ্য। সেই খাদ্যের আকর্ষণে দূর দূরান্ত থেকে ইঁদুরের আগমন হয়। চলে অনন্য সাধারণ ভোগোৎসব আর উদ্দাম যৌনাচরণ। হাজার হাজার কচিকাঁচায় ইঁদুর বংশের কলেরব বাড়ে। তারপর বাঁশের ফুল-ফল শেষ হয়ে গেলে তারা শস্যক্ষেত্রে দলে দলে বাঁপিয়ে পড়ে। এলাকায় দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া নেমে আসে।

একটি চলতি কথা হল—‘পেঁচাই লক্ষ্মী—ইঁদুর অলক্ষ্মী’। কেননা পেঁচার খাদ্য তালিকায় ইঁদুরের স্থান সর্বাগ্রে, তারপর ক্ষোতের অন্যান্য কীটপতঙ্গ। ধানের সবচেয়ে ক্ষতিকর প্রাণীটি হচ্ছে ইঁদুর। ইঁদুর ভক্ষণ করে পেঁচা অনেককাল আগে কৃষিজীবী মানুষের মন জয় করেছিল। ‘শত্রুর শত্রু আমার বন্ধু’—এই নীতিতে পেঁচা একসময় জুমর্ফিক বা প্রাণীদেহী দেবতায় উন্নীত হল। শ্রমার্জিত ফসল ধান। তার জন্য মানুষের স্বেদ-শোণিতের কার্পণ্য নেই। সকাল থেকে সন্ধ্যা ক্ষেত-খামারেই তার দিনাতিপাত। কিন্তু রাতে ফসল পাহারা দেবে কে? প্রয়োজন ঘটল নৈশ প্রহরীর। তিনি পক্ষী-স্বরূপা-পেঁচা। অনেক অনেক দিন বাদে সেই পক্ষী দেবতাই মানুষের মনোভূমিতে মানবীর অবয়ব পেল। তিনিই আজকের লক্ষ্মী। একটি বাংলা প্রবাদ হচ্ছে—

পেঁচা ও ইঁদুর কছু মিতালি না হয়।

বাজ ও কোতরে কুষ্ঠি দেখিচু পোণয়।

প্রবাদটির অর্থ নিরূপণ করতে হলে পেঁচা ও ইঁদুরের পারস্পরিক খাদ্য-খাদক সম্পর্কটি আগে যাচাই করে নিতে হবে। দেব-দানব যেমন পরস্পর বিপরীত শক্তি, পেঁচা-ইঁদুরও তাই। সুতরাং পেঁচা ও ইঁদুরে কখনো বন্ধুত্ব হয় না। অনুরূপভাবে বাজ ও পায়রার মধ্যেও কখনো প্রণয়-ভালোবাসা দেখতে পাওয়া যায় না। পূর্বে বলা হয়েছে পেঁচা লক্ষ্মী। কিন্তু প্রশ্ন হল অলক্ষ্মীটি কে? কৃষি-মৃত্যুর দৃষ্টিতে বলতে পারি তা হল ইঁদুর, শস্য ধ্বংসকারী শক্তি। পৃথিবীর সব দেশে, সব কৃষি পরিবেশে এবং সর্ববিধ ফসলে ইঁদুর একটি চরম উৎপাত। শুধুই কি জমি? কোথায় নেই ইঁদুর? গাঁ-ঘরের বাসস্থানটিকেও পর্যন্ত অলক্ষ্মীর আসন করে ছাড়ে—সুযোগ পেলেই।

ময়মনসিংহের একটি প্রবাদে বলা হচ্ছে ‘আওরের ডাকাত, ঘরের ইঁদুর’। ‘আওর’ (< হাওর) শব্দের অর্থ হল বিল বা জলাভূমি। ডাকাতদের ভয়ে অনেক জলাভূমিই ত্রস্ত হয়ে ওঠে। মৎস্যজীবী, জলপথের যাত্রী, নিকটস্থ বাসিন্দা—সকলের কাছেই এই ডাকাতদল চরম বিতীর্ষিকা। একইভাবে ইঁদুরের নির্মম আগ্রাসনে জনজীবন বিপর্যস্ত কি শহরে, কি গ্রামে। এ এক অদ্ভুত আপদ যার খাদ্য তালিকায় আছে মানুষের শস্য সম্পদ, মেধা সম্পদ ও শিল্প সম্পদ। সম্পদ বিনষ্ট করা যে প্রাণীটির উদ্দেশ্য তাতে সে অলক্ষ্মী পদবাচ্য হবে এতে আশ্চর্য কি! আর অলক্ষ্মী দূর করে লক্ষ্মীর বাঁশিওয়ালা যেভাবে ইঁদুর তাড়িয়েছিলেন, তার সঙ্গে কুলো বাজিয়ে অলক্ষ্মী বিনায়ের অমিল কোথায়? [‘থাক লক্ষ্মী, যাক বলাই’]। আসলে সারা বিশ্বেই ইঁদুর একটি উৎপাত, একটি যন্ত্রণা। বুদ্ধদেব গুহের ‘ইঁদুর’ গল্পে দেখা যায়, আধুনিক জীবনযাত্রায় মানুষের চিরন্তন সুকুমার প্রবৃত্তি ও কোমল অনুভূতিগুলি কোনও না কোন ভাবে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ছে। যৌথ পরিবার ভেঙে পড়েছে যেন অসংখ্য ইঁদুররূপী নির্মমতার আগ্রাসনে। সোমেন চন্দ্রের ‘ইঁদুর’ গল্পটির প্রতীকী তাৎপর্যও অপরিসীম। বাজলি মধ্যবিত্ত শ্রেণির আবহমান

দারিদ্র্যের প্রতীক এই ইঁদুর। নিম্নমধ্যবিত্তভুক্ত অসহায় একটি পরিবার যেন অবিরাম ইঁদুরের উৎপাতের মতো একটা না একটা অর্থনৈতিক দুর্দশায় কোনোভাবেই সুখে-স্বস্তিতে বাঁচতে পারে না। আপাতদৃষ্টিতে অসংলগ্ন কতকগুলি পারিবারিক ও সামাজিক চিত্রাবলিকে এই ইঁদুর-ধারণাই একটা টান-টান উদ্ভেজনা যথেষ্ট রাখতে চায় ওই সব কাহিনিতে। এটাই তো 'To put a spoke in another's wheel'।

ইঁদুর আমাদের চোখের আড়ালে থাকতে ভালোবাসে। আর এরা অলক্ষ্যে থেকেই সমস্ত অপকর্ম করে। একটি বাংলা প্রবাদ বুঝি এজন্যই সৃষ্ট হয়েছে :

ঘরের ইঁদুর কাটে বেড,
কেউ কখনো পায় না টের।

এর থেকে বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না মানুষের অজান্তে ইঁদুর কতখানি অনিষ্ট করে। কথায় আছে 'ইঁদুর জালি'। ইঁদুর জিনিসপত্র কেটে জালের মতো ফোঁপরা বা অন্তঃসার শূন্য করে ফেলে। এই তীক্ষ্ণদন্তীটি কাপড়-চোপড়, বই-কাগজ ও ঘরের দরকারী জিনিসপত্র কেটে কুটি কুটি করে। ইঁদুরের ছেদন দন্তগুলি ক্রমাগত ব্যবহারেও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, আবার বাড়ে। দাঁতগুলির বৃদ্ধি ও তীক্ষ্ণতা কখনো কমে না, ইঁদুরেরও এই ক্ষয়ক্ষতিতে উৎসাহ ধৈর্যে অধ্যবসায় কখনো ভাটা লাগে না। 'ইঁদুরের কাছে পুরাণ কি - কোরাণ কি?' অর্থাৎ ইঁদুরের আক্রমণে কিছুই রেহাই পাওয়ার জো নেই। স্মরণাতীত কাল থেকেই ইঁদুর মানুষের বহুবিধ ক্ষতি সাধন করে এসেছে। বৈদিক যুগেও ইঁদুরের ক্ষতি সম্পর্কে মানুষ বিশেষ অবহিত ছিল। এই প্রবাদটির সমার্থক অপর একটি প্রবাদও বাংলাদেশে প্রচলিত—

অমাইনযে ন বুঝে ভালো মাইনযের গতি।
উদ্দুরে ন বুঝে কোরাণ ন পুঁথি॥

আসলে জীবন বিষমুতময়। সমুদ্রমস্থানে যেমন অমৃতের ভাণ্ড উঠেছিল, তেমনি নির্গত হয়েছিল তীর গরল। একই পিতার পুত্র সুর আর অসুর। জীবনবোধ এক চৈতন্যের ব্যাপার। সংসারের পবিত্রতা যেমন লক্ষ্মী, পবিত্রতা লঙ্ঘনকারী মানসিকতাই হল অলক্ষ্মী। একটি প্রবাদে আছে 'মানুষই লক্ষ্মী, মানুষই বাকি।' মানুষ যেমন মানুষের উপকার করে মনুষ্যত্বের পরিচয় দেয়, তেমন অনিষ্টও করে। ইঁদুর কোরাণ কিংবা পুঁথি কোন কিছুই বোঝে না। জীবনের সবক্ষেত্রেই এটা সত্য—ভালো আর মন্দ, বন্ধু আর শত্রু, মঙ্গল আর অমঙ্গল, বিদ্যা আর অবিদ্যা, সুশ্রী আর বিশ্রী, রূপ আর কুরূপ। মুষিককূল হচ্ছে জীবনের নিত্য প্রকটিত বিঘ্ন-বিপত্তির প্রতীক। তাই তো 'বিঘ্নেশ' গণেশের বাহন এই মুষিক—সাধন বৈপরীত্যের এক মূর্তি রূপ। গণেশবাহন মুষিকের সাধনার কাঠিন্য জয়েরই ইঙ্গিত।

'অলক্ষ্মীর দ্বিগুণ খিদে' প্রবাদে অধিক ভোজন তার একটি বৈশিষ্ট্য। ইঁদুরের দাঁতের কাঠামোটাও অধিক চিবানোর উপযোগী। বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থার একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে সারা বিশ্বে ইঁদুরের আক্রমণে যে পরিমাণ শস্যের ক্ষতি হয়, তা পৃথিবীর ২৫টি দরিদ্রতম দেশের মোট জাতীয় উৎপাদনের সমতুল্য। শুধু দানাশস্য নয়, তৈলবীজ, ডালশস্য, সবজি সমস্ত ফসলেই ইঁদুরের ক্ষতিকর থাবা বসানো রয়েছে। তার চরম অলক্ষ্মী বিষয়ে কিছু তথ্য দেওয়া গেল। হাসান এবং প্রথির (১৯২২) পরিসংখ্যান অনুযায়ী 'recorded an extent of 25% to 75% losses by rodents to the crops of sesame, paddy and water melon.'

ফসলের ক্ষতি (শতকরা হিসাবে)	তথ্য সূত্র
১০.০ থেকে-৩৫.০	পিঙ্গল এবং সহ গবেষক বৃন্দ (১৯৬৭)
৫.২ থেকে-৬০.৮	জটোয়ালি এবং বেরি (১৯৭৫)
৪.৬ থেকে ৬০.৮	রাজশেখরন এবং ধর্মরাজ
৫.৭ থেকে-৯.৪	সুদ এবং গুরাইয়া (১৯৭৬)
৪.০ থেকে ১০.০	রাও (১৯৭৯)
২৫.০ থেকে ১০.০	প্রভাকরণ এবং মাইকেল (১৯৮০)
৫.০ থেকে ১০.০	কাটলিগ এবং ইয়াসিন (১৯৮১)
১৩.৩ (গড়)	চৌধুরি এবং বাদ্যা (১৯৮৫)
১৯.০	অজ্ঞাত (১৯৮৮)
০.৪৭	চোপড়া এবং সান্ডারাল (১৯৮৮)
১১.৮	প্রসাদ (১৯৯২)
১.৩ থেকে ৬.৭	প্যাটেল এবং সহ গবেষকবৃন্দ (১৯৯২)

গম জমিতে ইঁদুর কর্তৃক ক্ষতির মাত্রা

ক্ষতি (শতকরা হিসাবে)	স্থান	তথ্য সূত্র
১০.০	উত্তরপ্রদেশ	জটোয়ালি এবং বেরি (১৯৬৮)
২.৩৭	পাঞ্জাব	সুদ এবং গুরা (১৯৭৬)
		রাজশেখর এবং ধর্মরাজ (১৯৭৫)
১২.০	বাংলাদেশ	পট্টে এবং সহ গবেষকবৃন্দ (১৯৮১)
৭.৫৬	পাঞ্জাব	চোপরা (১৯৮৬)
০.২২—৪.৩২	হরিয়ানা	চোপরা এবং সান্ডারাল (১৯৮৮)
২.১ (চারা অবস্থায়)	হরিয়ানা	ভার্মা (১৯৯০)
১০.৫ (দানা পুষ্ট অবস্থায়)	হরিয়ানা	সিংগাল (১৯৯২)

এই তথ্যগুলি Chopra, *et al* (1996) লিখিত 'Rodents : Ecology, Biology & Control' গ্রন্থটি থেকে গৃহীত।

এর পরেও কি আমরা ইঁদুরকে অলক্ষ্যী বলব না?

ইঁদুরের অনুষঙ্গে জমিতে আসে সাপ। কেননা একটি প্রবাদে আছে—'ইঁদুর গর্ত খুঁড়ে মরে, সাপ এসে দখল করে'। ইঁদুর এবং সাপের খাদ্যখাদক সম্পর্ক সুবিদিত। ইঁদুর ভক্ষণের জন্য সাপ ইঁদুরের গর্তে প্রবেশ করে। ইঁদুর স্বভোজী উদ্ভিদ (Producer) ভক্ষণ করে, তাই ইঁদুর হচ্ছে বাস্তুতন্ত্রের (Eco System) প্রাথমিক খাদক (Primary Consumer)। ইঁদুরকে সাপ খায়, সুতরাং সাপ হচ্ছে দ্বিতীয় শ্রেণির খাদক (Secondary Consumer)। পেঁচা ইঁদুর ভক্ষণ করে, তাই পেঁচাও দ্বিতীয় শ্রেণির খাদক। আবার সাপকে যখন ময়ূর কিংবা চিল ভক্ষণ করে, তখন তারা হবে তৃতীয় শ্রেণির খাদক (Tertiary Consumer)। বাস্তুতন্ত্রে এইভাবে খাদ্য-খাদক সম্পর্ক চলছে সৃষ্টির আদি লগ্ন থেকে। একটি চমৎকার খণ্ডচিত্র এই বাংলা প্রবাদটি।

ইঁদুর মারতে ঘর পোড়ানোর মধ্যে চরম মুখতার দৃষ্টান্ত থাকলেও মানুষকে ইঁদুরের

কাছে কতটা নাজেহাল হয়ে ওই সিদ্ধান্ত নিতে হয়, তার নির্যাস আছে ওই প্রবাদটির মধ্যে। অপর একটি সমার্থক প্রবাদও এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য—‘পোড়ে ঘর পুড়ুক, ইঁদুর তবু মরুক।’ ঘর পুড়িয়ে ইঁদুর দমন সম্ভব নয়। এটা আত্মহত্যার সামিল। এই রকম চরম সিদ্ধান্তের আধুনিক রূপটি হচ্ছে ইঁদুর নিধনের জন্য বিষ প্রয়োগ। তাতে ইঁদুর হয়তো মরে, কিন্তু তার সুদূর প্রসারী ফল হয়। বিশ্বের অবশিষ্টাংশ গৃহ পরিবেশকে কলুষিত করে।

বাংলায় ‘ইঁদুরের কলে পড়া’ একটি জনপ্রিয় প্রবাদ। ইঁদুর মারা কল ব্যবহার একটি যান্ত্রিক দমন পদ্ধতি (Mechanical Control)। ইঁদুর আসা যাওয়ার পথে এই কল পাততে হয়। তবে যেখানে ইঁদুরের উপদ্রব কম, সেখানে কল ব্যবহার কার্যকরী। বেশি সংখ্যায় ইঁদুর থাকলে কল কার্যকরী হয় না। প্রতিবার ইঁদুর মারার পর কলটি সাবান জলে ধুয়ে পুনরায় ব্যবহার করতে হয়। কলে ইঁদুরের গায়ের বা পুরানো টোপের দুর্গন্ধ থাকলে ইঁদুর কলের পথ মাড়ায় না। প্রবাদটির মধ্যে তারও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ঐতিহাসিক নাটক *দুর্গাদাস*—এ এই প্রবাদটির অবতারণা লক্ষ করা যায়—‘তোমাদের তা’লে রাজপুতেরা ঠিক ইঁদুরের কলে ফেলেছিল।’

জৈবিক পদ্ধতিতে (Biological Control) শিকারী পশুপাখিকে ইঁদুরের আন্ডানায় ঘোরাফেরা করার সুযোগ দিলে ইঁদুর কিছুটা নিয়ন্ত্রিত হয়। যেমন গৃহপালিত বিড়াল। এই বিষয়টিকে অবলম্বন করে কয়েকটি বাংলা প্রবাদ প্রচলিত আছে। তার মধ্যে অন্যতম দুটি হচ্ছে—‘ইঁদুর জানে না বেড়াল কানা।’ এবং ‘ইঁদুর বলে—বিড়াল মাসি, তোরে আমি বড় ভালবাসি।’ জীব দিয়ে জীবের দমন পদ্ধতি হল জৈবিক দমন পদ্ধতি অর্থাৎ ‘কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা’র মত ব্যাপার।

কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার ব্রতকথা অনুসারে অলক্ষ্মীর জন্য লক্ষ্মীকে গৃহচ্যুত হতে হয়। কেননা একই ঘরে লক্ষ্মী-অলক্ষ্মীর সহাবস্থান সম্ভব নয়। বাংলা প্রবাদে বুদ্ধি তারই প্রতিধ্বনি—‘ভিতরে ইঁদুর থুইয়া গাতার মুখ মুজান।’ আসল ব্যাপার হল ইঁদুর দমন করতে গর্তে বিষাক্ত দ্রব্য ব্যবহার করতে হলে প্রথম দিন সব ইঁদুরের গর্তের মুখ বায়ু নিরোধক ভাবে বন্ধ করে দিতে হয়। পরের দিন যে সব গর্তের মুখ খোলা দেখা যায়, সেগুলিতে দেওয়া হবে অ্যালুমিনিয়াম ফসফাইডের বড়ি কিংবা অ্যাণ্টিকোয়াগুলেন্ট জাতীয় ধূপন বিষ যাতে বিষক্রিয়ায় কিংবা রক্তের জমাট বাঁধার ক্ষমতা হারিয়ে ইঁদুর মারা পড়ে।

ফসলের অন্যান্য শত্রু

ফসলের ক্ষতিকর অন্যান্য প্রাণিকুলের মধ্যে রয়েছে এ্যারাকনিডা শ্রেণির মাকড় (Mites), কৃমিশত্রু (Nematodes), পাখি (Aves), স্তন্যপায়ী (Mammalia) ইত্যাদি। স্তন্যপায়ী ইঁদুর সম্পর্কে পূর্বেই পৃথকভাবে আলোচনা করা হয়েছে। মাকড় সম্পর্কিত কোনো তাৎপর্যপূর্ণ প্রবাদ নেই। ‘মাকড় মারলে ধোকড় হয়, টিকটিকি মারলে গোবধ হয়।’—প্রবাদটির কৃষিবিজ্ঞানগত কোনো গুরুত্ব নেই। ‘মাকড়সার মত চুষে খাওয়া’—প্রবাদে মাকড়সার পরভোজী (Predation) চরিত্র ফুটে উঠেছে, ফসলের শত্রু মাকড়সা নয়। মাকড় শত্রু (Pest), কিন্তু মাকড়সা বন্ধু (Defender)। ফসলের কৃমি শত্রু সম্পর্কিত কোনো প্রবাদের সম্ভাবন পাওয়া যায় না। তবে পাখি এবং স্তন্যপায়ীর প্রসঙ্গ আছে।

একটি তামিল প্রবাদ হল—‘এম্বুন্ধু-প্পু-বরুম্,/এচ্চিলুন্ধু এরুম্বু বরুম্।’ অর্থাৎ তিল খেতে পাখি আসে, থুতু খেতে পিপড়ে আসে। তিল জমির একটি প্রধান শত্রু পাখি। এ রাজ্যে ইদানীং সূর্যমুখী চাষ হওয়ায় টিয়াপাখির (Rose-ringed parakeet—*Psittacula krameri*) আক্রমণ ব্যাপক হারে দেখা যাচ্ছে। সূর্যমুখী চাষ আগে ছিল না। কিন্তু তখনও টিয়া—ধান, গম, ভুট্টা, জোয়ার এবং বাগিচা ফসলের ক্ষতি করত। যেমন—‘টিয়ায় খাইল ধান পের্চার মাথায় ধুমকুম।’ টিয়া ধানের শিষ কেটে নষ্ট করে, প্যাঁচা নয়। বাংলার প্রায় সর্বত্র টিয়া এইভাবে ফসলের ক্ষতি করে। কাক (*Corvus splendens*) সর্বভুক। আবর্জনা ছাড়াও এরা গাছের পাকা ফল খায়। একটি বাংলা প্রবাদ—‘কাকের মুখে সিঁদুরে আম।’ আম পাকলে কাকের দল ভীড় করে। মরশুমে পাকা আমের লোভে কাকপক্ষী হাপিত্যেশ করে বসে থাকে—‘আম পড়বে বাতাসে, কাউয়া রইল প্রত্যাশে।’ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে কাকের খাদ্য তালিকায় আম একটি উল্লেখযোগ্য নাম। গাছে একটি-দুটি করে আম প্রথমে রং ধরে, সেটিই পরিপক্কের সূচনা। কাক কিংবা অন্যান্য ফলাহারী পাখি তা প্রথমে টের পায়। পাকা আম কাক-পাখিতে ঠোকরায়, তা মাটিতে পড়লে মালী বুঝতে পারে গাছের আম পাড়ার সময় হয়েছে। একটি চলতি কথা—‘পাকা আম দেখলেই কাকে ঠোকরায়।’ মৎস্যভুক পাখির সম্মানও বাংলা প্রবাদে রয়েছে, যেমন মাছরাঙা, বক, পানকৌড়ি।

বাদুড় পাখি নয়, স্তন্যপায়ী। এরা ফলবাগিচা ও শস্যের মারাত্মক ক্ষতি করে। ভারতীয় ফল-চোষা বাদুড় (Indian fruit-bats or flying foxes—*Pteropus giganteus*) বাংলার সর্বত্র দৃশ্যমান। বাংলার একটি প্রবাদ—‘সেই কলা বাদুড়ে চোষে।’ কলাবাগান বাদুড়ের আক্রমণ প্রবণ এলাকা, একথা প্রবাদটি থেকে সুস্পষ্ট। ‘আদুড় বাদুড়/চালতা বাদুড়/ কলা বাদুড়ের বে।’—ছড়ায় কলা বাদুড়ের প্রসঙ্গ আছে। কৃতিবাসী রামায়ণের একটি অতি পরিচিত পংক্তি :

কুম্ভকর্ষ স্বন্দে চড়ি বীরগণ নাচে,

বাদুড় ঝুলিছে যেন তেঁতুলের গাছে।

ভারতের সর্বত্র বাদুড় একটি সমস্যা। একটি তামিল প্রবাদ হচ্ছে—‘বৌবাল্ তিন্নাদ পলম্ ইল্লাই।’ যার অর্থ হল—বাদুড় খায়নি বল্/কি আছে এমন ফল? বাদুড় নিশাচর জীব। এরা রাতের অন্ধকারেই পাকা ফল খায় এবং উদ্যানজীবীদের প্রভূত ক্ষতি করে।

শাখাশ্রয়ী অন্য স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে বানর (Common Monkey বা *Rhesus Macaque—Macaca mulatta*) এবং হনুমান (Langurs বা Leaf Monkey—*Presbytes intellus*) অন্যতম। এই শাখামগদের খাদ্যাভ্যাসে কাঁচা কিংবা পাকা আম উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে। বাগানের মরশুমী আমের স্থায়িত্ব (মুকুল থেকে পাকা আম) সব মিলিয়ে চার-পাঁচ মাস, তারপর তাদের খাদ্যসংকট শুরু হয়। একটি বাংলা প্রবাদ এই রকম—‘ফুরল বাগানের আম, কি খাবি রে হনুমান।’

গবাদি পশু কৃষিকাজের সম্পদ হলেও অসাবধানে ফসলের বিস্তার ক্ষতি করে। গরু, মোষ, ছাগল, ভেড়া, শুয়োর প্রভৃতিকে বেঁধে না রাখলে জমির ফসল খায়। কথায় আছে, ‘গরু ছাগলের মুখে বিষ।’ তবে গরুতে খেলে যদিও বা ফসলের ডাল-পালা গজায়, ছাগলে খেলে গজায় না। অপর একটি প্রবাদে সে কথাই বলা হয়েছে—‘গরুতে খেলে বাড়ে, ছাগলে খেলে মুড়িয়ে যায়।’ ছাগলের থেকে ক্ষতি সম্পর্কিত আর একটি প্রবাদের সম্মান পাওয়া যাচ্ছে—

অতি বাড় বেড়ো না, ঝড়েতে উড়াবে।

অতি নিম্ন হয়ো না, ছাগলে মুড়াবে।

প্রবাদটির রচনায় সামাজিক অনুসঙ্গ যাই হোক মালদা জেলার একটি প্রচলিত রীতি ছাগলের হাত থেকে রেহাই পেতে আমের কলমের চারার দৈর্ঘ্য দেড়-দু'মিটার রাখা হয়।

বাংলাদেশে শিবের বাহন বৃষ (ধর্মের ষাঁড়) যত্রতত্র চরে বেড়ায়। ফসলের জমিতেও তাদের অবাধ অধিকার—‘কোন বা ষাঁড়, তা আবার ধানক্ষেতে শোয়।’ ভারতের সর্বত্রই এই একই চিত্র। আমরা কয়েকটি তামিল প্রবাদে গবাদি পশু থেকে ক্ষতির সমস্যাটি বোঝার চেষ্টা করব :

তামিল প্রবাদ ১. কায়ন্দ মাডু কন্মঙ্গোন্নয়িল্ বিলুন্দাপোল্।

অর্থ : জোয়ারের খেতে উপোসী গরু পড়ার মতো।

তামিল প্রবাদ ২. উলকু নেম্বুকু উলাইক-প্-পোয়/পদকু নেম্বাই-প্-পন্ডি তিব্দ্দাম্।

অর্থ : এক কুনকে ধানের তরে বেশি খাটতে গেলো/বড় ঘড়ার ধানগুলো সব শুয়ের খেয়ে গেলো।

তামিল প্রবাদ ৩. অডাইওবন্ কট্টাই-প্-পার, মেইওবন্ মট্টাই-প্-পার।

অর্থ : বেড়া দেওয়া মাঠে ফসল দেখো,/ চরানো গরুর স্বাস্থ্য দেখো।

বেড়া দেওয়া মাঠের ফসল দেখলেই বোঝা যায় গবাদিপশু থেকে ফসলকে রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা কতখানি। ফরিদপুরের একটি প্রবাদে সেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—
‘চারিদিকে দিয়া বেড়া। তবে ধর চাষের গোড়া।’ বেড়া দেওয়ার কাজটি বোধহয় চাষাবাদের সবচেয়ে গোড়ার কথা।

রোগ-বালাই

রোগ-বালাই বলতে বোঝায় 'An abnormal condition in the plant (Host) due to infection by microorganisms like fungi, bacteria, virus and mycoplasma (Pathogen)' অর্থাৎ ফসলের অস্বাভাবিকতা দৃষ্ট হয় কতকগুলি জীবাণুর দ্বারা যেমন ছত্রাক, ব্যাক্টেরিয়া, ভাইরাস কিংবা মাইকোপ্লাজমা। এই জীবাণুগুলি রোগগ্রস্ত উদ্ভিদ থেকে সুস্থ গাছে সংক্রমিত হয়। জীবাণুর পোষক (Host) হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফসল।

বাংলা প্রবাদে ফসলের রোগ বালাইয়ের তেমন উল্লেখ নেই। যা দু' একটা রয়েছে তাও প্রত্যক্ষ নয়। হতে পারে পোকা, আগাছা, ইঁদুর প্রভৃতি শত্রুর সম্পর্কে বাংলার মানুষ যতটা সচেতন ছিলেন রোগ-বালাই-এর ক্ষেত্রে ততটা নন। এখনও বাংলার মানুষ রোগনাশককে (Fungicide) ও কীটনাশক (Insecticide) বলেন। যে শত্রু খালি চোখে দেখা যায়, তার সম্পর্কে আতঙ্ক বেশি হওয়া স্বাভাবিক। রোগজীবাণু খালি চোখে দৃশ্য নয়। রোগের লক্ষণ কেবল প্রকাশ পায়। এমনও হতে পারে কৃষিজীবী মানুষ রোগের লক্ষণকে কীটের আক্রমণ বলে ভুল করতেন। এ ভুল তারা এখনও করে যাচ্ছেন। যেখানে ছত্রাক নাশক (Fungicide) কিংবা ব্যাক্টেরিয়া নাশক (Bacteriocide) দেওয়া উচিত সেখানে অপ্রয়োজনীয় ভাবেই কীটনাশক (Insecticide) দেওয়া হচ্ছে। রোগ সংক্রান্ত একটি পরোক্ষ প্রবাদের উল্লেখ করা হল।

একটি প্রচলিত খনার বচন হচ্ছে—‘যত কুয়া আমের ক্ষয়, তাল তেঁতুলের কিবা হয়।’

বাংলাদেশে ‘কুয়া’, ‘কুয়ে’ (কুমিল্লা), ‘কুয়ো’ (খুলনা), ‘কুয়া’ (ফরিদপুর) মানে কুয়াশা। আমের মুকুলে ফুল ফুটতে শুরু করলে মেঘলা আবহাওয়া, কুয়াশা, মাঝে মাঝে বৃষ্টি ভালো নয়। এই রকম পরিস্থিতি শুঁড়ো চিতি রোগের (Powdery Mildew) পক্ষে অনুকূল। এ রোগ লাগলে সব মুকুল মরে যায়, একে ‘মুকুল পড়া’ বলে। একবার রোগ দেখা দিলে এবং অনুকূল আবহাওয়া চলতে থাকলে ক্ষতিটা হয়ে যাবে দু-তিন দিনের মধ্যে। আলপিনের মাথার মতো ছোটো ছোটো আমও রক্ষা পাবেন না। যদি মুকুলের গায়ে সূক্ষ্ম সাদা রৌয়া বা ছাই রঙের সাদা সাদা দাগ দেখা যায়, তবে বুঝতে হবে শুঁড়ো চিতি রোগ লেগেছে। রোগ একবার লেগে গেলে তার সফল চিকিৎসা করা মুশকিল। পক্ষান্তরে, তাল-তেঁতুলের ফুল কিংবা পুষ্পকিন্যাস এইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। বাংলায় ‘আমের আনা মাছের কোনা’—প্রবাদটিতে মুকুলের তুলনায় কম ফল লাভের একটি কারণ এই শুঁড়ো চিতি রোগের আক্রমণ। যদিও এটিই একমাত্র কারণ নয়। তবে আমের মতোই আমড়া ও শিমূল ফুল বসন্তের ঝড়-জলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়—‘আম, আমড়া, শিমূল, ফাগুনের জলে নির্মূল।’

ফসলের শত্রু মানুষ

ফসলের সমস্ত শত্রুর মোকাবিলার পরও চাষীর ফসল কিন্তু সুরক্ষিত নয়। যদিও সামাজিক-রাজনৈতিক কারণে ফসল হারানোর বিষয় ফসল শত্রু (Pest)-র আলোচনায় অপ্রাসঙ্গিক তবুও বাংলার কৃষি ও কৃষককে সম্পূর্ণভাবে অনুধ্যান করতে হলে মানুষ শত্রুকেই বা অস্বীকার করা যাবে কিভাবে? যে চাষি অক্লান্ত পরিশ্রম করে সোনার ফসল ফলার, নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে তার দুবেলা আহারও জুটত না। ‘লাঙ্গল যার মাটি তার’ ধারণাটি যখন দানা বাঁধেনি তখন ছিল ‘যার লাঠি তার মাটি।’ একটি তামিল প্রবাদে পাচ্ছি—

ইডিওবল্ পুডাইওবল্ ইসে ইক্ক,

এট্টি-প-পার্তাবল্ কোটি-ক্-কোণ্ডু পোনালাম্।

বাংলায় এর অর্থ—

ধান ভানলো ধান ঝাড়লো (কন্যে)

উকি মেরে নিয়ে গেল অন্যে।

পরিশ্রমের ফল কৃষিজীবী মানুষ কখনই সার্থকভাবে ভোগ করতে পারে নি। দেশ-কাল ভেদে সর্বত্রই একই চিত্র। বাংলা প্রবাদেও সে কথা বিধৃত আছে—

হালিয়া হাল চষে কৃষাণ বোনে ধান।

আগে খায় চোর চোঁট্টা-পিছে খায় কৃষাণ॥

এখানে ‘চোরচোঁট্টা’ বলতে কেবল চুরি-ডাকাতি (Pilferage-pillage) নয়, সুদখোর মহাজন সামন্ত প্রভুর কায়মি স্বার্থসিদ্ধিকেও বোঝানো হয়েছে। এদের খাওয়ার প্রক্রিয়াটি কেমন তা বাদাবনের মৌলে-বাউলে-কাকড়ামারাদের ট্র্যাডিশান থেকে বোঝা যাবে। রুজি রোজগারের তাগিদে বাঘের পেটে যাওয়া, নৌকাডুবি কিংবা কুমিরের আক্রমণে মারা যাওয়া পিতার সন্তানের ছুটি নেই। মউলে মহাজনের কাছ থেকে দানদ নিয়েছিল। তাই ছেলেকেও ছুটতে হয় সুন্দরবনের ভয়ঙ্কর জঙ্গলে। মধু ফসলে এ শত্রুই বা কম কি?

বাংলায় একটি প্রবাদ আছে ‘ঠিকের জমি, নিকের মাগ।’ ভূমি সংস্কারের পূর্বে অধিকাংশ

ক্ষেতে চাষী যে চাষ করত, তা নিজের জমিতে নয়, অন্যের জমিতে। তাই তাকে গুণাগার কম দিতে হত না। ফের জমিতে চাষ করতে পারবে কিনা, তার জন্য ঠিকে চাষির নিরন্তর অনিশ্চয়তা। এই অবস্থাটি বোঝানোর জন্যই এই প্রবাদের অবতারণা। উৎপন্ন ফসলের উপর মালিকের ভাগ কতটা বর্তাবে তার অনিশ্চয়তাও ছিল।

মানুষের অন্ধবিশ্বাস, অশিক্ষা, অজ্ঞতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি কৃষককে একেবারে কোনঠাসা করে ফেলেছিল। একটি বাংলা প্রবাদে সে বার্তাটি পরিষ্কার—

বাড়লে চাষ বামনে খায়

কমলে পরে গক।

‘মাকড় মারলে ধোকড়’ প্রবাদটিতেও তার ইঙ্গিত স্পষ্ট। প্রগল্ভটি বলা যাক। এক ধোপা একদিন একটি মাকড়সা মেরে ফেলে। জীবহত্যা করেছে বলে সে ভট্টাচার্যির কাছে হাজির হল প্রতিকার জানতে। ভট্টাচার্যি তাকে দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করাল। ব্রাহ্মণ দক্ষিণাও আদায় করল। অথচ একদিন ধোপার সামনেই ভট্টাচার্যির ছেলে মাকড়সা মারল। ধোপা সে কথা ভট্টাচার্যিকে জানাল। কিন্তু ভট্টাচার্যি হেসে বলল, মাকড় মারলে ধোকড় হয় অর্থাৎ কাপড় চোপড় লাভ হয়। ছেলের বেলায় ভট্টাচার্যি আর প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিল না। অর্থঋণ, রাজঋণ, ঋষি ঋণ সবকিছু শোধ দিয়ে চাষির কিই বা অবশিষ্ট থাকে? সুতরাং পুনরায় দেনার দায়ে ভুবে যাওয়া ছাড়া গতাস্তর নেই। তাছাড়া মানুষের হিংসা-দ্বেষ ইত্যাদি আদিম প্রবণতাও রয়েছে। তাই হামেশাই দেখা যায় গুপ্ত শত্রুতা। ভরা পুকুরে ফলিউলের বিষে রুই, কাতলা ভেসে ওঠে। ফলন্ত গাছকে ‘বান’ মেরে ঝলসানো হয়; গাছের গোড়ায় কুড়ল পড়ে; পাকা ধানে পড়ে মই। সুতরাং মানুষের শত্রুতাই বা কম কিসে?

প্রাকৃতির বিপর্যয়

‘বাংলার কৃষকেরা স্বপ্নেই সন্তুষ্ট। অনুকূল বর্ষণ হলে এবং শাসনযন্ত্রের অত্যধিক নিষ্পেষণ ভোগ করতে না হলেই কৃষকেরা পরম পরিতৃপ্ত। ধানের ক্ষেতে সারাদিনের কাজের শেষে অবকাশ মুহূর্তে ঘরের নিকোনে দাওয়ায় কিংবা বারোয়ারী চাতালে বসে সে গানে গানে ভরিয়ে দেয়। তরঙ্গ বয়সীরা অন্য এক কোণায় ভৌতিক কাহিনী, উপকথা ও অন্যান্য লোকগল্প গাথায় ভরপুর আড্ডা বসায়। কৃষক রমণীরা সাতবিধি কিংবা ষষ্ঠীর মত লৌকিক দেবদেবীর পূজার্চনা করে। প্রতিকূল পরিবেশের মুখোমুখি হলে বহুজনমান্য সম্মাসী ও পীর ফকিরের শরণাপন্ন হয়। মনে নতুন আশা নিয়ে দিনের পর দিন সজলনেত্রে আকাশের দিকে তাকিয়ে দিন গোনে মেঘের প্রতীক্ষায়।’ কয়েকটি বাংলা প্রবাদ বুঝি এভাবেই সৃষ্টি হয়েছে—‘আশায় মরে চাষা’, ‘আশা আর বাসা, ছোটো করে মরে চাষা’, ‘আশার গোড়ায় জল ছেঁচা’। প্রকৃতি-নির্ভর কৃষিকাজে (Rainfed Farming) ‘আশায় আশায় জীবন গেল,/ সুদিন আর নাই এল।’ অতিবৃষ্টি, বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে তাকে সমুহ ক্ষতি সহ্য করতে হয়। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে তীব্র অনটন এলে মুসলমান চাষী হতাশায় বলে ওঠে : ‘আম্মা, ভাত-কাপড়ে একেবারেই মারলো।’ মরশুমে ভালো ধান ফললে কৃষকের সুদিন, আনন্দের বন্যা। যে কৃষিতে ধানের কোনো বিকল্প নেই সেখানে তো পাকা ধানই ভরসা—‘আপন ধান পেকেছে, এখন মারুক খরা।’ তবে প্রবাদটির

মধ্যে ব্যক্তির স্বার্থপরতার মনোভাবও সুস্পষ্ট। ‘নিজের ফসল’ পেকে যাওয়ার পর অত্যধিক রোগ-অপরের ফসল নষ্ট করলে যেন কিছুই ক্ষতি নেই। এই তো বাংলার কৃষিজীবীদের জীবনেতিহাস। তবুও আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব দুলে কৃষিকাজের অবসরে বাংলার কৃষকেরা লোকসংস্কৃতির ধারাকে বয়ে নিয়ে গেছে চিরকাল, তৈরি হয়েছে অসংখ্য প্রবাদ-প্রবচন।

বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস, নদীর ভাঙ্গন ও ভূ-কম্পনের মতো বহু প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের শাস্তী বাংলার মানুষ। লোকস্মৃতিতে (Folk Memory) তা রয়ে যায় বহু বছর। সংস্কৃতি একটি প্রবাদ আছে—‘দুর্ভিক্ষমন্ত্র স্মরণে চিরায়।’ প্রবাদটি বাংলাতেও প্রচলিত—‘দুর্ভিক্ষ অল্পকাল, স্মরণ থাকে চিরকাল।’ দুর্ভিক্ষের অনাহারে প্রিয়জন হারিয়ে যায় চিরকালের জন্য। খনার বচনেও আকাল-অজন্মের আনুপূর্বিক কর্তব্যের নির্দেশ আছে—‘শতক ধেনু, হাজার কলা। কি করবে আকাল শালা।’ দেখা যাচ্ছে, মাঠের ফসল ভিত্তিক কৃষি অর্থনীতির পরিপূরক গো-পালন এবং উদ্যান পালন। উঁচু ডাঙ্গা জমিতেই কলার মতো উদ্যান ফসল ফলে, তৈরি হয় গোশালা এবং গো-চারগভূমি। সুতরাং বন্যা পরিস্থিতিতে আকাল দেখা গেলে মাঠের ফসল নষ্ট হলেও, মানুষ অভুক্ত থাকে না। একটি তামিল প্রবাদ—

অট্টুই অডুও বয়লুম অরশনাই অডুও

কুড়িমুম মুমুকুবরাদু।

বাংলায় অর্থ করলে দাঁড়ায় নদীর ধারে ক্ষেত আর রাজ্যশ্রমী পরিবার—দুটোই নষ্ট। সুলতানি আমলে গৌড় রাজ্যের সেনাপতি ছিলেন চক্রপানি দে। তার কন্যার উপর নবাবের দৃষ্টি পড়ায় তিনি ছগলি জেলার মহানাদ থেকে সুন্দরবনের জঙ্গলে পালিয়ে এসে আত্মগোপন করেন। পশ্চিম সীমান্ত বাংলার একটি প্রবাদ ‘লদী ধারে চাষ/ মিছা কর আশ—’। কৃষিকাজের অব্যবহিত ফল সম্পর্কে সংশয় দৌদুল্যমানতা বিষয়েই এমন কথা বলা যায়। নদীর ধারে চাষে বহু বিপদের সম্ভাবনা—বন্যা, ভাঙ্গনের মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয় রয়েছে। চাষের সমস্ত প্রক্রিয়াটাই আক্ষরিক অর্থে জলে যেতে পারে। এই প্রবাদের সামাজিক তাৎপর্য হল বিপদ জেনেও কাজে হাত দিলে কাঙ্ক্ষিত ফল নাও হতে পারে। প্রবাদটির তাৎপর্য শুধু পশ্চিম সীমান্ত বাংলায় নয়, নদীকেন্দ্রিক সমস্ত সভ্যতার ক্ষেত্রেই এ সমানভাবে প্রযোজ্য। সমার্থক প্রবাদ বাংলায় স্বতঃই রচিত হচ্ছে। যেমন—‘পর প্রত্যাশে বাস, নদীর কূলে চাষ।’ ‘পরের আশ, গাওপারে বাস।’ ‘নদীর কূলে চাষ, হয়তো ভাল, নয় ত মন্দ, নয় ত সর্বনাশ।’ ‘নদীর পাড়ের গাছ।’

‘নদীর ধারে চাষ, বালির ওপর বাস।’

সু-অদৃষ্টের আশ, নারীর মুখের হাস।

এর ওপর যার বিশ্বাস, তার সাত পুরুষে কাটে ঘাস।’

বন্যা, মড়ক, বৃষ্টি ও অনাবৃষ্টির মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয় সম্পর্কিত কয়েকটি প্রাসঙ্গিক প্রবাদ উল্লেখ করা হল :

১. চেতে কুয়া, ভাদরে বান। নরের মুণ্ড গড়াগড়ি যান।

অর্থ : চৈত্র মাসে কুয়াশা এবং ভাদ্র মাসে বন্যা দেখা গেলে সে বৎসর শস্যহানি ঘটে। অনাহারে অসংখ্য মানুষ মারা যায়।

২. যদি বর্ষে আগনে। রাজা যায় মাগনে।।

যদি বর্ষে পুষে। কড়ি হয় তুষে।।

অর্থ : অগ্রহায়ণ মাসের বৃষ্টিতে রাজাকে ভিক্ষাপাত্র নিতে হয়। পৌষ মাসের বৃষ্টিতে পাকা ধানের প্রভূত ক্ষতি হয়। রোগ-পোকা লেগে ধান চিটে হয়ে যায়। সূত্রাং চাষীর গোলা ভরে না। তুষ বেচে কিছুটা পয়সা হতে পারে মাত্র।

৩. পাঁচে রবি মাসে পায়। করায় কিংবা খরায় যায়।।

অর্থ : এক মাসে পাঁচ রবিবারের ফল অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি।

৪. পূর্ণ (পাঠান্তর পূর্ব; ময়মনসিংহ, বাংলাদেশ) আষাঢ় দখিনা বায়, সেই বৎসর বন্যা হয়।

অর্থ : পুরো আষাঢ় মাস জুড়ে দক্ষিণাবায়ু বইলে, সেই বৎসর কন্যা হবে।

৫. ফাঙ্কনে রোহিণী যতনে চাই

আগামী বৎসর গণিয়া পাই;

সপ্তমী, অষ্টমী হয় ধান,

নবমীতে বন্যা, দশমীতে নির্মূল পাতান। (নোয়াখালি, বাংলাদেশ)

অর্থ : ফাঙ্কন মাসে চন্দ্রের সপ্তমী ও অষ্টমী তিথিতে রোহিণী নক্ষত্র দেখা গেলে সামনের বছর প্রচুর ধান জন্মায়। নবমীতে দেখা গেলে কন্যা হয়, দশমী তিথিতে দেখা গেলে ধান মোটেই হয় না।

৬. মধুমাসে ত্রয়োদশ দিনে রয় শনি,

খনা বলে : এ বৎসর হবে শস্যহানি। (পাবনা, বাংলাদেশ)

অর্থ : ফাঙ্কন মাসের ১৩ তারিখ শনিবার পড়লে পরবর্তী বৎসর নানা কারণে শস্যহানি হয়।

৭. মধুমাসে প্রথম দিবসে হয় যেইবার,

রবি শোষে, মঙ্গল বর্ষে, দুর্ভিক্ষ বুধবার,

সোম, শুক্র, গুরু আর,

পৃথী না সয় শস্যের ভার। (চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ)

অর্থ : ফাঙ্কন মাসের প্রথম তারিখ রবিবার হলে খরা, মঙ্গলবার হলে সুবর্ষা এবং বুধবার হলে দুর্ভিক্ষ হবে। কিন্তু সোম, শুক্র আর বৃহস্পতিবার হলে শস্যশালী হয়।

৮. পাঁচ শনি পায় মীনে

শকুনি মাংস না খায় যিনে। (রংপুর, বাংলাদেশ)

অর্থ : মীন বা চৈত্র মাসে (১২তম মাস) পাঁচটি শনিবার পড়লে প্রবল ঋদ্যাভাব দেখা দেয়। ফলে গো-মড়ক মহামারী রূপ ধারণ করে। শকুনির সংখ্যার তুলনায় এই গো-মড়ক অনেকগুণ বেশি।

৯. শনি রাজা মঙ্গল পাত্র,

চষ, খোড়, কেবল মাত্র। (কুমিল্লা, বাংলাদেশ)

অর্থ : যে বৎসর শনি রাজা ও মঙ্গল মন্ত্রী সে বৎসর শস্যহানি অবশ্যজ্ঞাবী। কর্বণ, রোপণ করলেও ফসল মেলে না।

১০. ডাক দিয়ে বলে মিহিরের স্ত্রী

শোন রে পতির পিতা,

ভাদ্র মাসে জলের মধ্যে

নড়েন বসুমাতা।

রাজ্য নাশে, গো নাশে

হয় অগাধ বান,

কাঠা হাতে গৃহী ফিরে

কোথা না পায় ধান। (পারনা, বাংলাদেশ)

অর্থ : ভাদ্র মাসে ভূমিকম্প হলে বিপুল সংখ্যায় গবাদি পশু বিনষ্ট হয়। দেখা দেয় প্রবল বন্যা। ধানের অভাবে, ফসলের অঙ্কনায় নিদারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। গৃহস্থ ভিক্ষার পাত্র নিতে বাধ্য হয়। রাজ্যের প্রভূত সম্পদ হানি ঘটে।

খরা, বন্যা, মড়ক, ভূ-কম্পন বিষয়ক এই যে ১০টি প্রবাদের উদাহরণ দেওয়া গেল তার দু'একটির যৌক্তিকতা আছে নিশ্চয়ই। তবে অধিকাংশ প্রবাদই যুক্তির বিচারে নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক। যতদূর মনে হয় প্রাচীন যুগের মানুষ সংখ্যাভেদের বিচারেই আবহাওয়ার পূর্বাভাস বিচার করতে চেয়েছেন। তবে আবহাওয়া-জলবায়ুর পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, সৌরকিরণ, বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা সহ যে বিভিন্ন নির্ণায়ক পর্যালোচনা করা দরকার তা সম্ভবত করা হয় নি। সে সমস্ত পরিমাপ নেওয়ার পরিকাঠামোই বা কোথায় ছিল? যে সংখ্যাভেদের বিচার করে প্রবাদগুলি রচিত হয়েছে তা কেবল অবৈজ্ঞানিক নয়, কৌতূহলকরও বটে। যেমন—একটি মাসে পাঁচটি রবিবার কিংবা চারটি রবিবার যাই থাকুক না কেন তার সঙ্গে অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টির সম্পর্ক থাকতে পারে না। একইভাবে চৈত্র মাসে পাঁচটি শনিবার পড়লেই প্রবল খাদ্যাভাব দেখা দেবে কেন? ফাল্গুন মাসের ১৩ তারিখ শনিবার পড়া আর না পড়ার মধ্যে শস্যহানি হওয়া কিংবা না হওয়ার কোন আপাত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। আসলে কৃষিজীবী মানুষ ফসলের অনিশ্চয়তার কারণ খুঁজতেই সমকালীন বৌদ্ধাঙ্কের মাপকাঠিতে এই বিশ্লেষণ করে থাকবেন। তখন বিজ্ঞান, কৃষি বিজ্ঞান কিংবা আবহাওয়া বিজ্ঞানের সে রকম অগ্রগতি ছিল না। আজকের দিনেই কি ভূ-কম্পন, জলোচ্ছ্বাস, সুনামী সম্পর্কিত পূর্বাভাস দেওয়া যাচ্ছে? অত দূর যাওয়ারও দরকার নেই। আবহাওয়া দপ্তরের সব পূর্বাভাস কি ফলপ্রসূ হচ্ছে? প্রকৃতির খেলালখুশি ভারী অদ্ভুত। ঘটায় ঘটায় নিম্নচাপের বলয় দিক পরিবর্তন করে, ভারী নিম্নচাপ লঘু হয়ে আসে। আবহাওয়ার পূর্বাভাস দিতে হলে বহু ফ্যাক্টর বিচার করতে হবে, প্রয়োজন অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি। সে সব বাদ দিয়ে জ্যোতিষ গণনা করে যদি পূর্বাভাস দেওয়া হয় তবে তা কালের বিচারে হাস্যকর বস্তু হয়ে দাঁড়ায়।

যে দু' একটি প্রবাদের ব্যাখ্যা দেওয়া যায় এবার তার আলোচনা করব। যেমন 'চৈতে কুয়া, ভাদরে বান। নরের মুণ্ড গড়াগড়ি যান।' প্রবাদটি আলোচনার সময় মনে রাখতে হবে আগেকার দিনে কৃষি মূলত এক বা দু' ফসলী ছিল। কোনো প্রাকৃতিক কারণে তা বিনষ্ট হলেই অনাহার-দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস নেমে আসত। মূল ফসল বলতে বৃষ্টিনির্ভর আমন ধান, পরিস্থিতি ভেদে আউশ। ভাদ্র মাস আউশ ধান কাটার সময়। সে সময়ের বন্যা মানেই 'পাকা ধানে মই' পড়ার মত অবস্থা। বীজ বোনা, রোওয়া, সার-সেচ-নিড়ানের স্বৈদ-সিঙ্কতার পর বাকি থাকে ফসল তোলা। তা যদি 'মাঠে মারা যায়' তবে অনাহার ছাড়া সমকালে থাকে কি? আমন ধানের ক্ষেত্রে ভাদ্র মাস হচ্ছে ডগমগে যৌবনের মাস। গুছির পাশকাঠি ছাড়ার কাজ শেষ হয়ে এসেছে। কোথাও হয়তো এখনও পাশকাঠি ছাড়ছে। বাতাস তার সবুজতাকে দোলা দিয়ে যাচ্ছে। এমন অবস্থায় বন্যা মানে সমুহ ক্ষতি। মাঝ নদীতে ঝরে পড়ার মতো অবস্থা। বন্যার জলে ফসল রক্ষারও কোনো উপায় নেই। বন্যা পরবর্তী পরিস্থিতিতে বীজতলা তৈরি করে চারা রোয়ারও সময় নেই আর। সুতরাং ফসল নষ্ট।

দ্বিতীয় প্রবাদে বলা হচ্ছে—‘যদি বর্ষে আগনে, রাজা যায় মাগনে।’ আগন মানে অগ্নাহায়ণ মাস। সেটা ফসলের পেকে ওঠার মরশুম। আমন চাষের সমস্ত প্রক্রিয়া শেষ। চাষের সব খরচই সারা। এবার শুধু ফসল লাভের পর্যায়টুকু বাকি। অকাল বর্ষণ মানেও ফসল থেকে বঞ্চনা। যেন একেবারে ‘কূলে এসে তরী ডোবা’র মতো অবস্থা। কৃষকের পুজি শেষ, ফসল শেষ। সুতরাং অনাহার বিনা গতান্তর নেই। শাসন করলেও রাজস্ব মেলে না। অতএব রাজার ভিক্ষাবৃত্তি ভিন্ন উপায় কি? ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান সহ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির অবস্থা এক সময় এমনই ছিল। এমন অকাল বর্ষণে ফসল হানি ঘটলে বিশ্বব্যাঙ্ক, রাষ্ট্রসংঘ কিংবা উন্নত দেশগুলির কাছে খাদ্য ও অর্থের জন্য ঋণ ও অনুদান পাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না।

এখন অবশ্য এই ধরনের প্রবাদের তাৎপর্য কমেছে। ফসল হানি মানেই আর্থিক ক্ষতি এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এখন একটি ফসল নষ্ট হলেই কৃষক অনাহারে মরে না, দেশে দুর্ভিক্ষও হয় না। সেই অনিশ্চয়তা বাংলার মানুষ কয়েক দশক আগে পেরিয়ে এসেছেন। এখন ‘সহস্রসর নবাম’। বছরের প্রায় সব সময়েই কোনো না কোনো নতুন ধান উঠছে। ফলছে বিভিন্ন শাক-সব্জি, তৈলবীজ, ডালশস্য। এখনও বর্ষার ধান-চাষ মূল কৃষি হলেও, তার হিসেবে প্রথাসম্মত মাঠপুঞ্জো, লৌকিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি ব্যয়বহুল থাকলেও এখন চাষি মানুষের ঘরে বছরে তিন চারবার লক্ষ্মীর আবাসন। এই সুবাদে বোরো চাষ বঙ্গের নবতম লক্ষ্মী, নতুন সংযোজন। গ্রীষ্মের ধান (Summer Paddy), বাংলার গ্রাম ঘরে যার নাম বোরো, এরা জ্যেষ্ঠ অত্যন্ত সুপরিচিত নাম।

বন্ধুজীব (Defenders)

পোকামাকড়ের আবার কিছু প্রাকৃতিক শত্রু আছে, যারা এই সব ক্ষতিকারক পোকা খেয়ে বেঁচে থাকে। ফসলের শত্রুকে ওরা ধ্বংস করে। কেউ পরাগমিলন ঘটায়। তাই এরা কৃষকের বন্ধু। ফসল শত্রুর পাশাপাশি বাংলা প্রবাদেও উপকারী জীব ও বন্ধুপোকার প্রসঙ্গ এসেছে। যেমন মাকড়সা, কাঁচপোকা, পাখি (উইপোকাকার পাখি হলে ধরে খায়), পেঁচা (ঘুরঘুরে পোকা ধরে খায়), মৌমাছি, ভ্রমর ইত্যাদি।

প্রকৃতির আড়িন্যম খাদ্য-খাদকের সম্পর্ক চিরন্তন। কৃষকের চাওয়া বা না চাওয়ার তোয়াক্কা না করে খাদ্য শৃঙ্খলের (Food Chain) অন্তর্গত হরেক রকম জীব ক্ষতিকারক পোকা ধ্বংস করে। এভাবেই প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় থাকে। কৃষকের অজান্তে এরা অতুল প্রহরীর মতো ফসল ও জিনিসপত্র ক্ষতিকারক পোকাকার হাত থেকে বাঁচায়। বন্ধু জীবের কিছু হল শিকারজীবী। এরা শত্রুপোকা শিকার করে খায়। খাদ্যের তেমন বাছবিচার নেই। যতখানি খায়, তার থেকে অনেক বেশি সংখ্যায় শত্রু পোকাকার দেহ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে। অপর বন্ধুপোকাকার হল পরজীবী। এরা শত্রুপোকাকার মধ্যে জীবনচক্র শেষ করে। বিশেষ বিশেষ জাতের শত্রুপোকাকে আশ্রয় করে বাঁচে বিশেষ জাতের পরজীবী। কৃষিজীবী মানুষকে খেয়াল রাখতে হবে, খাদ্যশস্যের চাহিদার বাড়াবাড়ির জন্য এই শৃঙ্খল যাতে বিনষ্ট না হয়, বন্ধুপোকা যাতে অযথা মারা না পড়ে। তা হলে ‘নিজের পায়েরেই কুড়ুল মারা’ হবে। বাংলা প্রবাদকারেরা এই পরিবেশবান্ধব কৃষিকাজের প্রতি নজর দিতেও ভোলেন নি।

বন্ধুজীব (Defenders) সংক্রান্ত বাংলা প্রবাদের একটি তালিকা দেওয়া গেল—

- ১ উই আকাশে ওড়ে, পাখীতে খায় ধরে।
- ২ কাঁচপোকাকার তেলাপোকা ধরা।
- ৩ পিপড়ের পাখা ওঠে মরবার তরে।
- ৪ উইয়ের পোঁদে পালক হলে আকাশ ছুঁতে চায়।
- ৫ টিয়ায় বাইল ধান পেঁচার মাখায় ধুমকুম।
- ৬ প্যাঁচা ও ইন্দুর কঁতু মিতালি না হয়
বাজ ও কোতরে কুঠি দেখিচু পোণয়।
- ৭ ইন্দুর গর্ত খুঁড়ে মরে। সাপ এসে দখল করে।

বন্ধুজীব সংক্রান্ত কয়েকটি প্রবাদের উদাহরণ—

- ১ কেঁচো দিয়ে কাতলা ধরা।
- ২ গুণের আদর গুণীতে, ফুলের আদর ভোমরাতে।

রাসায়নিক প্রয়োগে রোগ-পোকা নিয়ন্ত্রণের একটি বিকল্প উপায় হচ্ছে জৈব নিয়ন্ত্রণ (Biological control)। যথেষ্ট রাসায়নিক ব্যবহারের যে ভয়ঙ্কর ক্ষতিকারক দিক রয়েছে তা থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় এই জৈব নিয়ন্ত্রণ। অপরিমিত ও বেহিসেবি কীটনাশক ব্যবহারের কুফল বিজ্ঞানীদের নজরে আসার পর ইদানীং কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কৃষি বিভাগ সুসংহত উপায়ে ফসল শত্রু নিয়ন্ত্রণের (Integrated pest Management সংক্ষেপে IPM) কথা প্রচার করছেন। এই পদ্ধতিতে বলা হচ্ছে ফসলে শত্রু থাকবেই, তাকে একেবারে নির্মূল করা যাবে না, নির্মূল করা প্রাকৃতিক ভারসাম্যের পরিপন্থী। দরকার শত্রুর মাত্রা অর্থনৈতিক চরমসীমার (Economic Threshold Level) নিচে রাখা। জৈব নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে তা সম্ভব। ইদানীং কৃষিজীবী মানুষ আই. পি. এম. সংক্রান্ত কিছু প্রবাদ ধর্মী ছড়া ব্যবহার করেছেন। তত্ত্ব ও তথ্যের নিরিখে বলতে হয় এই প্রবাদগুলি খুবই অর্বাচীন। একেবারে অপ্রাসঙ্গিক হবে না মনে করেই প্রবাদগুলির একটি তালিকা দেওয়া গেল।

তালিকা : আই. পি. এম. সংক্রান্ত প্রবাদমালা—

- ১ শত্রুপোকা মিত্রপোকাকার সমান অনুপাত
দেখলে পরে কীটনাশকে দিয়ে নাকো হাত।
- ২ শত্রুপোকা মিত্রপোকা চিনব কেমন করে
প্রত্যেকদিন মাঠে যাব দেখব ভাল করে।
- ৩ আই পি এমের কবচমালা রয়েছে আমি গলায় পড়ে
মাকরা, ল্যাড়া, শোষক পোকা আর কি আমি ডরাই তোরে।
- ৪ সবুজ শস্য নীলাকাশ এই তো মোদের পাঠশালা
আই পি এমে নেই অবকাশ পড়ুয়া চাষীর অটচালা।
- ৫ শত্রু পোকাকার চোখরাজনি?
মোটেই ভয় পাবেন না।
আই পি এম আছে সাথে
বিষ ওষুধে যাবেন না।

শস্যরক্ষা সম্পর্কিত একটি প্রবাদ কৃষিজীবী মানুষেরা ইদানীং খুব মেনে চলেন। তা হল—‘জুতোর শুকতলাই ওষুধ’। প্রবাদটির প্রতীকী তাৎপর্য অসীম। জমি জরিপ করে কীটপোকাকার

সংখ্যা যাচাই করাটাই হচ্ছে শস্যরক্ষার মূলমন্ত্র। ফসলের ধারাবাহিকতায়, কৃষি বাস্তুতন্ত্রের সামান্য পরিবর্তনে অনেক শত্রুই আবির্ভূত হয়, আবার দমিতও হয়। সুতরাং Survey and Surveillance বা ফসলের জরিপ ও অতীত নজরদারি ফসল শত্রু মোকাবিলার জন্য জরুরি। একেই বলা হচ্ছে 'সব মাটি মাড়িয়ে চলা'। এই প্রবাদ দুটি সেই জ্ঞানেরই সারাংশ। অত্যন্ত মন্থর গতিতে সমস্ত জমিতে হেঁটে জুতোর শুকতালি খোয়ানোর মতই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে চাষিকে জমি জিরেতের সংবাদ নিরন্তর নিতে হবে। চাষির স্বয়ং উপস্থিতিই সেরা ওষুধ। আই. পি. এম. সংক্রান্ত প্রবাদ ১ এবং ২ নির্মিত হয়েছে এই প্রবাদটির আদলে। শত্রু-মিত্রের অনুপাত যাচাই করতে নিয়মিত মাঠে যেতে হবে। সরেজমিনে তদন্ত করেই কীটনাশক প্রয়োগের পথে হাঁটতে হবে। এটাই পরিবেশ-বান্ধব কৃষির আসল চাবিকাঠি। ফসলের শত্রু কে, মিত্রই বা কে তা জানতে গেলে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ জরুরি। ক্ষতির প্রকৃতি ও লক্ষণ দেখে ফসল শত্রু চেনা যায়। আবার শত্রুর বিনাশ দেখে চিনে নিতে ভুল হয় না মিত্রটি কে। প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, ক্যালেন্ডার ভিত্তিক ওষুধ প্রয়োগ করে প্রকৃতির ধ্বংসই ডেকে আনা হয়। সেই কৃষিকাজ পরিবেশ-বান্ধব (Eco-Friendly) বা লোক-বান্ধব (Folk-Friendly) কোনোটিই নয়।

আই. পি. এম. বা সুসংহত শত্রু দমন বিধিকে কৃষকেরা কবচমালা হিসাবেই মেনে নিয়েছেন। তাই মাজরা পোকা (Stem Borer); ল্যাঁদা পোকা (Cut Worm and Swarming Caterpillar), শোষক পোকা (Brown Plant Hopper and Green Leaf Hopper)-র আক্রমণ দেখা গেলেও চাষি তার তোয়াক্ষা করেন না। আই. পি. এম.-এর পাঠ নিতে তো প্রথাগত স্কুলে যাবার প্রয়োজন নেই, দাঁত বিজারী সবুজ ক্ষেতই একমাত্র পাঠশালা। সেই Non-formal Education, প্রকৃতির আড়িনায় থেকে এই পাঠেরই আজ ভীষণ প্রয়োজন। এই পাঠে শত্রুপোকার চোখরাঙানিতে ভয় থাকে না, কৃষি-পরিবেশ কলুষিত হয় না, বিষ ওষুধের খরচ লাগে না। সুতরাং 'সাপও মরে, নড়িও না ভাঙে'।

তথ্যপঞ্জি

- ১ সুশীলকুমার দে (১৩৫২ বঙ্গাব্দ), বাংলা প্রবাদ ছড়া ও চলতি কথা (তৃতীয় সংস্করণ সম্পাদনা ভবতোষ দত্ত ও তুষার চট্টোপাধ্যায়) এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রা. লি, কলকাতা
- ২ সত্যরঞ্জন সেন (১৯৬১), প্রবাদ—রত্নাকর, ওরিয়েন্ট লিমিটেড
- ৩ মোহাম্মদ হানীফ পাঠান (১৯৭৬), বাংলা প্রবাদ পরিচিতি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা : ৩৮৪-৩৮৭ এবং ৫৩৯-৫৬৮
- ৪ মোহাম্মদ হানীফ পাঠান (১৯৮৫), বাংলা প্রবাদ পরিচিতি (দ্বিতীয় খণ্ড : দ্বিতীয় পাঠ), বাংলা একাডেমী, ঢাকা : ১২০-১২৪
- ৫ আলি নওয়াজ (১৯৭৯), খনার বচন ও কৃষি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল ঢাকা, বাংলাদেশ
- ৬ আশুতোষ ভট্টাচার্য (১৯৭২), বাংলার লোকসাহিত্য : ষষ্ঠ খণ্ড-প্রবাদ, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা
- ৭ অমলকুমার দে (২০০০), সংস্কৃত প্রবাদ প্রবচন, বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ, কলকাতা
- ৮ বরুণকুমার চক্রবর্তী (১৯৭৯, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯৬) বাংলা প্রবাদে স্থান-কাল-পাত্র, পুস্তক বিপণি, কলকাতা : ১৩-১৮
- ৯ রত্ন সরকার (২০০১), বাংলা প্রবাদ প্রবচন, বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ : ১৭-৩৬

১০. মঞ্জু সাহা (১৯৯৮), 'বাংলা প্রবাদের সংগঠন ও শৈলী', বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় : ৮২-১১৯
১১. সুব্রমণিয়ন কৃষ্ণমূর্তি ও শ্যামাপ্রসাদ দে (১৯৯৮) *নির্বাচিত তামিল প্রবাদ*, বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ, কলকাতা : ১-১০০
১২. শক্তি সেনগুপ্ত (১৯০৬ বঙ্গাব্দ), 'পরশর ও কৃকাসর', *নীলকণ্ঠ* ২৫ (শারদ সংকলন) : ১৫-২৫
১৩. উজ্জ্বল বিশ্বাস (সম্পাদনা সাল এবং প্রকাশ কাল অনূদিত), *খনার বচন বা সরল জ্যোতিষ বচন*, সঞ্জল পুস্তকালয়, কলকাতা
১৪. মনাজ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায় ও কল্যাণ চক্রবর্তী (২০০২), 'বাংলা প্রবাদে অখণ্ড কৃষির খণ্ডিত চিত্রালোক', ৯ম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কংগ্রেসে পঠিত গবেষণা পত্র, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, ২৮ ফেব্রুয়ারী - ২ মার্চ, ২০০২ : গবেষণাপত্রের সারসংক্ষেপ, সমাজ ও পরিবেশ : ৩৬
১৫. মলয় ঘোষ (২০০০), 'ছোটনাগপুরের আদিবাসীদের প্রচলিত প্রবাদ', *নীললোহিত*, ৮ (আশ্বিন ১৯০৭) : ৫০-৫৬
১৬. মুহম্মদ আবদুল খালেক (১৯৮৫), *মধ্যযুগের বাংলাকাব্যে লোক উপাদান*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা : ৩৪৫-৩৮৩
১৭. কাজী দীন মুহম্মদ (সম্পাদনা ১৯৬৮), *লোক-সাহিত্যে ধাঁধা ও প্রবাদ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা : ৪-১৫
১৮. মনাজ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায় ও কল্যাণ চক্রবর্তী (২০০৩), 'বাংলা প্রবাদে ফল প্রসঙ্গ', ১০ম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কংগ্রেসে গঠিত গবেষণাপত্র, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, মেদিনীপুর, ২৮ ফেব্রুয়ারী-২ মার্চ, ২০০৩ : গবেষণাপত্রের সারসংক্ষেপ : ৭৩
১৯. Monanjali Bandyopadhyay, Alope Kumar Mazumder, Kalyan Chakraborti, Barun Kumar Chakraborti, Tuhinsree Sen (2002), A List of Flora in the context of Agriculture as Mentioned in 'Khanar Bachan' : A Series of Bengali Proverbs, Paper presented in National Conference on Research & Development in Farm Sector with Human Face, 1-3, 2002, organised by Visva Bharati, Santiniketan and BCKV, Mohanpur : P. 3
২০. বরুণকুমার চক্রবর্তী (১৯৮৬), *প্রগল্ভ, অপরূপা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স*, কলকাতা : ৭১
২১. সমরেন্দ্র খাঁড়া (১৯৯৪), 'ছোট ছোট ফলগাছ', *নবান্ন ভারতী* ২৬ (১২) : ৫৭৬-৫৭৭
২২. পুণ্যব্রত চট্টোপাধ্যায় (দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯১), *কীটতত্ত্ব, কীটদমন ও শস্য সংরক্ষণ*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ : ১৩-৩৪২
২৩. কল্যাণ চক্রবর্তী ও মনাজ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায় (২০০৩), 'বাঙালি মুসলমান কৃষক : খান-কেদ্রিক কৃষ্টি', *লোকসংস্কৃতি গবেষণা*, ১৫(৪) : ৭৮২-৭৯৪
২৪. বরুণকুমার চক্রবর্তী (১৩৮৭ বঙ্গাব্দ), *লোকসংস্কৃতি : নানা প্রসঙ্গ*, বুক ট্রাস্ট : ৪২-৫৪
২৫. মনাজ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায় ও কল্যাণ চক্রবর্তী (২০০৪), 'প্যাচাই লক্ষ্মী—ইদুর অলক্ষ্মী', *লোক সংস্কৃতি গবেষণা*, ১৭ (২) : ৩২৪-৩৩৫
২৬. মনাজ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায় (২০০২), 'খনার বচন : অতীতের পর্যবেক্ষণ ভিত্তিক কৃষি বিজ্ঞানের নিদর্শন', *আজ্ঞা ও অন্বেষণ* (বার্ষিক সংকলন, অক্টোবর, ২০০২), ষড়্গাপুর : ৬৬-৭৩
২৭. জনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য (২০০১) *শস্যবিজ্ঞান পরিভাষা*, প্রগতি লাইব্রেরী, কলকাতা : ৬৬-৭৩
২৮. P.L. Jaiswal, A.M. Wadhwani (1961-Reprinted 1984), *Hand Book of Agriculture*, ICAR, New Delhi.
২৯. Monanjali Bandyopadhyay, Abhijit Ghosh, Kalyan Chakraborti, M M. Ahmed, Arindam Badyopadhyay (2002), The Essence of the traditional Knowledge regarding Pest Management in the Folk Literature of Bengal, Paper presented in International Seminar on Traditional Knowledge-Health and Environment, Feb 23-24, 2002,

Orrissa University of Agriculture & Technology, Bhubaneswar : Abstract Volume: 122

- ৩০ কল্যাণ চক্রবর্তী (১৯৯৮), 'সুসংহত উপায়ে কীটশত্রু দমন পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা', নবাম ভারতী, ৩০ (১১) : ৫১৯-৫২১
- ৩১ Debabrata Mitra, Jibes Guha and Salil Kumar Chaudhuri (1968-Reprinted Edition 1993), Studies in Botany, Moulik Library, Calcutta : 454-465
- ৩২ কল্যাণ চক্রবর্তী (১৯৯৬), 'আমার আবিষ্কার, আমার জয়', নবাম ভারতী জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৩
- ৩৩ অমিতাভ কোনার (১৯৯৪), 'শস্যক্ষেতে আগাছা', নবাম ভারতী ২৬ (১২) : ৫৮৪-৫৮৭
- ৩৪ Girish Chopra, Patwant Kaur, S.S.Guranga (1996), Rodents : Ecology, Biology & Control, R. Chand & Co., New Delhi : 2-26
- ৩৫ কে. এম. আশরাফ (১৯৫৯), হিন্দুস্থানের জনজীবন ও জীবনচর্যা : অর্থনৈতিক অবস্থা ('Life & Conditions of The People of Hindustan' মূল গ্রন্থটির অনুবাদ করেছেন তপতী সেনগুপ্ত, ১৯৮০), পার্ল, পাবলিশার্স, কলকাতা।
- ৩৬ মুহম্মদ এনামুল হক, শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী এবং স্বরোচিষ সরকার (১৯৭৪-পরিমার্জিত সংস্করণ ২০০০), ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা
- ৩৭ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৩৭২ বঙ্গাব্দ—দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ ২০০০), বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান (অখণ্ড), বাংলা একাডেমী, ঢাকা
- ৩৮ Barnett, S. A. and Prakash I. (1975), Rodents of economic importance in India, Arnold-Heinemann Publ., New Delhi : 175.
- ৩৯ Hussain M. A. and Pruthi, H.S. (1922), 'Some doservations of the Control of field rats in Punjab'. Bull Agric, Res Inst., Pusa.
- ৪০ গোষ্ঠা ন্যায়বান (১৯৯৮), 'ইঁদুর দ্বারা ক্ষয়ক্ষতি ও ইঁদুর দমন', নবাম ভারতী, ৩১ (২) : ১২১-১২৩
- ৪১ শান্তিকুমার মিত্র (১৯৯৯), 'সম্বৎসর নবাম', নবাম ভারতী ৩১ (৭) : ৩০৯-৩২১
- ৪২ দিলীপকুমার নাথ ও সুমিত কুমার চক্রবর্তী (১৯৯৯), 'আমাদের আশেপাশের বন্ধুপোকা ও মাকড়সার পরিচিতি', নবাম ভারতী, ৩১ (৬) : ২৮১-২৮২
- ৪৩ পূণ্যব্রত চট্টোপাধ্যায় (১৯৯৮), 'ক্ষেত্রে বন্ধু পোকা ও শত্রু-পোকা চেনার উপায়', নবাম ভারতী, ৩০(৮) : ৪০২-৪০৬
- ৪৪ শান্তিকুমার মিত্র (১৯৯৫), 'গ্রীষ্মের ধান যেমন আশীর্বাদ, তেমনি ঝুঁকিরও', কৃষি বিকাশ বার্তা, ২ (১) : ১৮-২১
- ৪৫ পরেশচন্দ্র মজুমদার (২০০২), 'সোমেন চন্দ্রের ইঁদুর : শৈলী বিচার', শিক্ষাদর্পণ ৪ (১) : ১
- ৪৬ স্বামী নির্মলানন্দ (১৪১০), দেবদেবী ও তাঁদের বাহন, ভারত সেবাশ্রম সম্ভব, কলকাতা : ২৬৩-২৬৪

রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা : ঐতিহাসিক অনুসন্ধান

মহিবুল ইসলাম

আধুনিক সভ্য সমাজে সাময়িক পত্র-পত্রিকার ভূমিকা অনস্বীকার্য। মানব সভ্যতা বিকাশে এবং কোনো অঞ্চল বা দেশের রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক অবস্থা তুলে ধরতে পত্র-পত্রিকার অবদান বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চায়ও এর ভূমিকা অসামান্য।^১ ঔপনিবেশিক আমলের প্রায় সূচনাকাল অর্থাৎ উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকেই পত্র-পত্রিকা প্রকাশনার ক্ষেত্রে রংপুরের অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে। বর্তমান রংপুর অতীতে রঙ্গপুর নামে পরিচিত ছিল।^২ রংপুর থেকে যে সব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হল *রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা*। এই গবেষণামূলক পত্রিকাটিতে মালদহ, আসাম, কোচবিহার এবং রংপুর তথা বগুড়া, পাবনা, রাজশাহী, দিনাজপুরসহ প্রায় সমগ্র উত্তরাঞ্চলের প্রাচীন ইতিহাস, সাহিত্য-সংস্কৃতি, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয় স্থান পেত। অবিভক্ত ভারতের সাংস্কৃতিক রাজধানী কলকাতার 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের' প্রাচীন শাখা 'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ' থেকে *রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা*টি প্রকাশিত হত। রংপুর তথা উত্তরবঙ্গের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাহিত্য, দর্শন, লোক-সংস্কৃতি, প্রাচীন কীর্তি রক্ষা, দুর্গাপ্য পুঁথি সংগ্রহ, ঐতিহাসিক উপকরণ ও প্রাচীন কাব্যাদি সংগ্রহ, গবেষণামূলক গ্রন্থাদি প্রকাশ ও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার লক্ষ্যে 'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ' ১৩১২ বঙ্গাব্দের ১৯ বৈশাখ বা ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত হয়।^৩ তদানীন্তন রংপুরের সংস্কৃতিমনা ও সাহিত্য অনুরাগীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ একটি উন্নতশীল শিক্ষা-সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শাখা হিসেবে কলকাতার বাইরে রংপুরের এই প্রতিষ্ঠানটি খুব সম্ভব সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। উত্তরবঙ্গের সমাজ ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন এবং সাহিত্য সম্মিলনের আয়োজনে রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের অসামান্য অবদান ছিল। এই পরিষদের পক্ষ থেকে মাসিক ও বার্ষিক সাহিত্য সম্মেলন, চিত্রশালায় পুরাকীর্তি সংগ্রহ, গ্রন্থাগারে পাণ্ডুলিপি ও দুর্লভ গ্রন্থাবলি সংরক্ষণ এবং ভাষা সাহিত্য ও ইতিহাসচর্চায় উৎসাহ প্রদানের জন্য *রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা* প্রকাশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

বস্তুত রংপুরের ঐতিহ্যবাহী সাহিত্য প্রতিষ্ঠান রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের মুখপত্র হিসেবে *রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা* প্রকাশিত হত। উল্লেখ্য কলকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের *সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা* ছিল সমগ্র বঙ্গের প্রথম গবেষণা পত্রিকা^৪ এবং *রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা*টিকে বাংলা ভাষার দ্বিতীয় গবেষণা পত্রিকা হিসেবে অভিহিত করা যায়। এই পত্রিকার বিষয়-রচনাশৈলী-প্রকাশনার মান প্রভৃতি জনগণকে বিমুগ্ধ করেছিল। এই পত্রিকাটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল। সাহিত্য পরিষদের মুখপত্র হিসেবে প্রাচীন সাহিত্য, কবি ও সাহিত্যিকদের

সাহিত্যকর্ম, রংপুর তথা উত্তরবঙ্গের ইতিহাস, ঐতিহ্য, ভাষাতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্ব গবেষণা জ্ঞানসমক্ষে তুলে ধরার লক্ষ্যে ১৩১৩ বঙ্গাব্দের আশ্বিন বা সেপ্টেম্বর ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। পঞ্চানন সরকার পত্রিকাটির প্রথম সম্পাদক ছিলেন। এটি একটি গবেষণা ও প্রচারমূলক ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্র। তদানীন্তন সময় কলকাতার বাইরে এজাতীয় গবেষণামূলক পত্রিকা প্রকাশ ও পরিচালনার অর্থবল, দক্ষতা, বিদ্বৎশক্তি প্রভৃতি সহজসাধ্য ছিল না। বিশেষত রংপুরের মতো মফসসল শহর থেকে এই দুর্লভ কাজটি করা কিছু নিবেদিতপ্রাণ কর্মী ও মাতৃভাষার প্রতি প্রীতি থাকার ফলেই সম্ভব হয়েছিল।

এই পত্রিকার পৃষ্ঠপোষক, লেখক, সম্পাদকের মধ্যে বহু প্রখ্যাত লেখক, গবেষক ও সমাজকর্মীর পরিচয় পাওয়া যায়। রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠপোষক কুণ্ডির জমিদার সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরীসহ কুণ্ডির জমিদারগণ বহুকাল পর্যন্ত সমাজসেবী ও সংস্কৃতিকর্মী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। কাকিনার জমিদার মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী, তাজহাট জমিদার গোপাল লাল রায়, ডিমলা জমিদার রাজা জানকি বল্লভ সেন, পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্ন প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ খ্যাতিমান ছিলেন।

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা পরিচালনা এবং গ্রন্থ প্রকাশের জন্য ১৩১৫ বঙ্গাব্দে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়কে সভাপতি করে গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রকাশ সমিতি গঠিত হয়।^৬ উদাহরণ হিসেবে ১৩১৯ বঙ্গাব্দের রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা^৭ ও গ্রন্থ প্রকাশ সমিতি এবং তার অধিবেশন সভ্যগণের নামের তালিকা^৮ নিম্নে উপস্থাপিত হলো,

শ্রীযুক্ত	পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্ন, সভাপতি	
"	পণ্ডিত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী, কাব্য ব্যাকরণতীর্থ	রঙ্গপুর
"	অতুলচন্দ্র গুপ্ত, এম, এ, বি, এল,	"
"	বিধুরঞ্জন লাহিড়ী, এম, এ, বি, এল,	"
"	জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়	"
"	পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার	"
"	পঞ্চানন সরকার, এম, এ, বি, এল, পত্রিকা সম্পাদক	"
"	হরগোপাল দাস কুণ্ডু, সহকারী পত্রিকা সম্পাদক	"
"	পণ্ডিত ললিতমোহন গোস্বামী, সহকারী পত্রিকা সম্পাদক	"
"	সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক	"
"	পূর্ণেন্দু মোহন সেহানবীশ	"
"	পণ্ডিত কোকিলেশ্বর বিদ্যারত্ন	কোচবিহার
"	হরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, বি, এল,	"
"	আমীকদিন আহমদ-উকীল	"
"	চৌধুরী আমানতুল্লাহ আহমদ, জমিদার	"
"	মহেন্দ্রনাথ অধিকারী	"
"	কুমার জগদীশ্রদেব রায়কত	জলপাইগুড়ি
"	রণজিৎচন্দ্র লাহিড়ী, এম, এ, বি, এল,	পাকনা
"	প্রিয়নাথ পাকড়াশী, জমিদার	"
"	কালিকান্ত বিশ্বাস	"

শ্রীযুক্ত	পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্তী	মালদহ
"	রাধেশচন্দ্র শেঠ, বি, এল,	"
"	তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য, এম, এ,	"
"	হরিদাস পালিত	"
"	কৃষ্ণলাল চৌধুরী, জমিদার	"
"	অনারেবল শ্রীযুক্ত কুমার শারদিন্দু নারায়ণ রায়, এম, এ,	দিনাজপুর
"	যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী, এম, এ, এল,	"
"	বরদাকান্ত রায় বিদ্যারত্ন, বি, এল,	"
"	সারদাচন্দ্র কবিভূষণ	"
"	শরৎকুমার রায়, এম, এ,	রাজশাহী
"	অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, বি, এল,	"
"	কিশোরীমোহন চৌধুরী, বি, এল,	"
"	ব্রজসুন্দর সান্যাল স্বরস্বতী, এস, আর, এ, এস,	"
"	শ্রীরাম মৈত্রেয়	"
"	কুমুদবিহারী রায়, জমিদার	বগুড়া
"	প্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত, এম, এস, এস,	"
"	রাজেন্দ্র আচার্য, বি, এ, সাবডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট	"
"	প্রভাসচন্দ্র সেন, বি, এল,	"
"	মোহিনী মোহন মৈত্রেয়	"
"	বিপিন চন্দ্র কাব্যরত্ন	"
"	অনারেবল শ্রীযুক্ত রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর	আসাম
"	দ্বিজেশচন্দ্র চক্রবর্তী, বি, এল,	"
"	প্রিয়নাথ চক্রবর্তী, বি, এল,	"
"	অধ্যাপক পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ, এম, এ,	"
"	সতীশচন্দ্র বড়ুয়া, জমিদার	"
"	অমৃতভূষণ অধিকারী, বি, এল,	"
"	আনন্দচন্দ্র সেন	"

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকাটি দু'টি অংশে বিভক্ত ছিল এবং এর প্রথম অংশে উত্তরবঙ্গের লোক-সাহিত্য, প্রত্নতত্ত্ব, বিভিন্ন ধরনের ঐতিহাসিক নিদর্শনাবলির সংস্রবশেষ ও অত্রাঞ্চলের প্রাচীন অপ্রকাশিত পুঁথির বর্ণনার উপর নিবন্ধ প্রকাশিত হত। এর অপর অংশটিতে প্রাচীন অপ্রকাশিত বই ও লেখকদের বর্ণনা, পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থাবলি এবং পত্রিকাটির পরিশিষ্টে রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের মাসিক ও বার্ষিক বিভিন্ন কার্যাবলি সম্বন্ধে বিস্তারিত উল্লেখ থাকত। গবেষণামূলক এই পত্রিকাটি ১৩১৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশের শুরুতে পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুলসহ ১।।০ টাকা নির্ধারণ এবং ত্রৈমাসিক হিসেবে প্রকাশ ও পত্রিকার আকার রয়েল আটপেজি চারি ফর্মার কম হবে না বলে বিজ্ঞাপিত করা হয়েছিল। প্রথম বছর পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলো ছিল নিম্নরূপ :

প্রবন্ধকারের নাম

প্রবন্ধ

সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী (সম্পাদক, রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ), প্রাচীন কামরূপ।

হরগোপাল দাসকুণ্ডু (সহ, পত্রিকা সম্পাদক), করতোয়া।

কালীকান্ত বিশ্বাস গড়র শুভলিপি বা শিলালিপি।

হরগোপাল দাস কুণ্ডু, চণ্ডিকা বিজয় কাব্য (রঙ্গপুরের কবিকমল লোচন লিখিত)।

হরগোপাল দাস কুণ্ডু, প্রাচীন গ্রাম্য কবিতা সংগ্রহ।^৭

পত্রিকার কভার পৃষ্ঠার উপরে বাংলায় বড়ো অক্ষরে রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা এবং নীচে পত্রিকার ভাগ, সম্পাদকের নাম, সন ও প্রকাশনা সংস্থা লিখা থাকত [দেখুন, পরিশিষ্ট ক]। পত্রিকাটি সাহিত্য পরিষদের সভ্যগণের মধ্যে বিনামূল্যে এককপি করে বিতরণ করা হত।^৮

চতুর্থ বর্ষে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলো সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় স্থান পায়।

মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন পণ্ডিতরাজ, রঙ্গপুরের জাগের গান।

রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি, এ, বগুড়ার পুরাতত্ত্ব।

হরগোপাল দাস কুণ্ডু, সহ-পত্রিকা সম্পাদক ও

পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ, রঙ্গপুরের ভাওয়াইয়া গান।

সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী ধর্মভূষণ, প্রাচীন-মুদ্রা।

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, উত্তরবঙ্গের পুরাতত্ত্বানুসন্ধান।^৯

পত্রিকাটি বিভিন্ন সময়ে অস্বাভাবিক পরিস্থিতির জন্য কিছু বিরতির মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠালগ্ন ১৩১৩ বঙ্গাব্দ থেকে ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত সাতজন সম্পাদকের অধীনে ১৯টি ভাগে প্রকাশিত হয়েছিল।^{১০} পত্রিকাটি প্রকাশের পর থেকে বিভিন্ন সময়ে দায়িত্ব প্রাপ্ত সম্পাদকগণের নাম উল্লেখ করা হল^{১১} :

১ম - ৭ম ভাগ : শ্রীপঞ্চানন সরকার

৮ম - ১৩শ ভাগ : শ্রীভবানী প্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

১৪শ - ১৫শ ভাগ : শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন

১৬শ ভাগ : শ্রীকালীপদ বসাক

১৭শ - ১৮শ ভাগ : শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী

১৯শ ভাগ : শ্রীকেশবলাল বসু।

১৩১৩ থেকে ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়ে পত্রিকাটির ১ম ভাগ হতে ১৯ ভাগে ৪৬টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকাটি বছরে একটি ভাগ ও চারটি সংখ্যা প্রকাশের পরিকল্পনা ছিল। প্রতি বছরকে পত্রিকার ভাগ এবং ত্রৈমাসিক খণ্ডকে সংখ্যা বলা হত। প্রথম দিকে পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি শুরুর দিক হতে অর্থাৎ ১৩১৩ থেকে ১৩২৫ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত ১৩টি ভাগ যথারীতি প্রকাশ পায়। কিন্তু এরপর পত্রিকাটি দীর্ঘদিন বন্ধ থাকে এবং ১৩৩১ বঙ্গাব্দে ১৪শ ভাগ প্রকাশিত হওয়ার পর পুনরায় মুদ্রণ বন্ধ হয়ে যায়। অতঃপর ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ হতে ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের মধ্যে ১৫শ, ১৬শ ও ১৭শ ভাগ নিয়মিতভাবে মুদ্রিত হয়। আর্থিক অসচ্ছলতা ও নানাবিধ সমস্যার কারণে ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ থেকে পুনরায় পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায় এবং দীর্ঘ সাত বছর পর ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে ১৮শ ভাগের ২টি এবং ১৯শ ভাগের ২টি

সংখ্যা ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে পুনঃ প্রকাশিত হয়।^{১২} তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর পর ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ থেকে পত্রিকাটির প্রকাশনা খুব সম্ভব সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। এরপরে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছে থাকলে তথ্যভাবে তা সঠিক জানা যায় না। বিশেষত এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে বলা যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর (১৯৩৯-১৯৪৫ খ্রি.) ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে এদেশ (ভারতবর্ষ) বিভক্তির ফলে রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের অগ্রযাত্রা ব্যাহত হয় এবং বহুল প্রশংসিত সাহিত্য-সংস্কৃতিমূলক সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।^{১৩}

রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত বিবরণ ও রচনাবলি বিশ্লেষণ করলে নিম্নোক্ত বিষয়াবলি সাধারণভাবে লক্ষ্য করা যায়।

- | | |
|--|---------------------------------|
| (ক) ভাষণ ও অভিভাষণ, | (খ) বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য, |
| (গ) অসমীয়া ভাষা ও সাহিত্য, | (ঘ) লৌকিক সাহিত্য, |
| (ঙ) সংস্কৃত এবং অন্যান্য প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্য, | (চ) প্রত্নতত্ত্ব, |
| (ছ) ইতিহাস, | (জ) দর্শন, |
| (ঝ) বিজ্ঞান, | (ঞ) জীবন কথা, |
| (ট) ধর্মীয় বিষয়াবলি, | (ঠ) স্থান পরিচয়, |
| (ড) স্মৃতি পূজা, | (ঢ) পরিষদের বার্ষিক প্রতিবেদন ও |
| (ণ) পরিষদের মাসিক অধিবেশনের কার্যাবলি ^{১৪} প্রভৃতি। | |

উদাহরণ স্বরূপ রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার সপ্তম ভাগ, অষ্টম ভাগ, নবম ভাগ ও দশম ভাগের সূচি নিম্নে উপস্থাপিত হলো :

সপ্তমভাগের সূচি (১৩১৯ বঙ্গাব্দ)

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সপ্তম সাপ্তাহিক অধিবেশনে	শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়, এম,এম,	১
সভাপতির অভিভাষণ		
পঞ্চভূত	„ কুঞ্জবিহারী হার, এম, এ, বি, এল	৯
শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ গোখলে মহাশয়ের		
শিক্ষা আইন ও বাঙ্গালা সাহিত্য	„ অতুলচন্দ্র গুপ্ত, এম, এ, বি, এল	২৬
একখানি গিরি-লিপি	„ প্রভাসচন্দ্র সেন, বি, এল,	৩১
কলাপ ব্যাকরণের উৎপত্তি	„ পণ্ডিত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাক্ষরণ	৩৪
কথা ও ছিঙ্কা	„ পক্ষানন সরকার, এম, এম, বি, এল,	৩৭
আমরাজ ও কুমারপাল	„ পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্তী	৪২
শেরসার কামান (সচিত্র)	„ সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী	৪৫
ময়মনসিংহের ন্যায়-চর্চা (সচিত্র)	„ অম্বিকারণ কাব্যতীর্থ বিদ্যাবাচস্পতি	৪৭
আয়ুর্বেদ (সন্তানোৎপত্তি)	„ কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ রায়, কবিরঞ্জন কাব্যতীর্থ,	৫৩
নারায়ণদেব ও পদ্মপুরাণ	„ বিরজাকান্ত ঘোষ, বি, এ,	৬১
উদ্ভিদ তাহার উপকরণ ও বর্ধন	„ আশুতোষ লাহিড়ী, বি, সি, ই,	৭৭, ১১৫, ১৬৯
ইন্দ্রপালের তাম্রশাসন	„ পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ তস্ক-	
	স্বরস্বতী, এম, এ,	৮১, ১৫৩

ভিক্টোর আদিরাজ্য ও যুধিষ্ঠিরের	„ রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর, সি,আই,ই,	৯৩
স্বর্গারোহণ		
পরীষ্যামি বা গ্যাসালোকের ইতিবৃত্ত	„ পণ্ডিত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ,	৯৮
কালঞ্জেস্বরী	„ পণ্ডিত বিপিনচন্দ্র কাব্যরত্ন বিদ্যানিধি	১০১
ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে পরমানুতত্ত্ব	„ পণ্ডিত হৃদয়নাথ তর্করত্ন তর্ককণ্ঠ	১০৬
মহাত্মা হ্যানিমান	„ ডাক্তার ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, ডি,	১২৯
পরিশিষ্ট		
সভার সপ্তম সাপ্তাহিক কার্য-বিবরণ		১-৪৭
সভার অষ্টম বর্ষের কার্য-বিবরণ		১-৬০
চিত্রসূচি		
ডিম্ভা রাজবাড়িতে রক্ষিত শেরসাহ নামাঙ্কিত কামানের চিত্র নিম্নাংশ ও শীর্ষাংশ		৪৬
এ, পূর্ণ		৪৬
শ্রীযুক্ত পণ্ডিত তারা প্রসন্ন ভট্টাচার্য		৪৭

অষ্টমভাগের সূচি (১৩২০ বঙ্গাব্দ)

বর্ণানুক্রমিক প্রবন্ধের নাম	লেখক	পৃষ্ঠা
উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন ষষ্ঠ	শ্রীযুক্ত মাননীয় বিচারপতি আশুতোষ	
অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণ	চৌধুরী বি, এ, (ক্যাম্বার), এম, এ,	
	বি, এল, বার-এট-ল	১
উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন সপ্তম	শ্রীযুক্ত মাননীয় মহারাজ জগদীন্দ্রনাথ রায়	৮১
সভাপতির অভিভাষণ		
উদ্ভিদ ও তাহার উপকরণ	শ্রীযুক্ত আশুতোষ লাহিড়ী বি, সি, ই	৭২
কামরূপ অনুসন্ধান-সমিতির দ্বিতীয় বর্ষের		
আংশিক কার্যাবিবরণী	শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ দে	১৪৩
গৌড়-পাণ্ডুয়া-প্রদর্শক	শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত	৪৯
ঢাকার মসলিন	এ, এফ, এম, আব্দুল আলী এম, এ,	২৮
ভদ্রের বিশেষত্ব	শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহনবিশ	১৪৮
নারায়ণদেব ও পদ্মপুরাণ	শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চন্দ্রবতী	১১৩
ভারতীয় নাট্য	শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী	
	কাব্য ব্যাকরণতীর্থ	১৫
রঙ্গপুরে প্রচলিত প্রবাদ-সংগ্রহ	শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর তর্করত্ন	৪৩
শঙ্করদেব	শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দে	৯৭
সদৃ গ্রন্থের তালিকা	শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী বি, এ	৩৩
সভাপতির অভিভাষণ (অষ্টম বার্ষিক	শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বিদ্যারঞ্জন	
অধিবেশন)	(মাননীয় মহারাজা কাশিমবাজার)	৬৪
হৃদীকেশ শাস্ত্রীর জীবনী (বিদ্যোদয়-	শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	৩৩
সম্পাদক)		

পরিশিষ্ট

অষ্টম সাপ্তাহিক কার্য-বিবরণ	১-২৬
নবম বর্ষের মাসিক অধিবেশনের কার্য-বিবরণ	১-৪৬

নবমভাগের সূচি (১৩২১ বঙ্গাব্দ)

প্রবন্ধের নাম	লেখক	পৃষ্ঠা
অসমীয়া গ্রন্থ-বিবরণ	শ্রীউমেশচন্দ্র দে	১
উদ্ভিদ-তাহার উপকরণ ও বর্ধন	শ্রীআশুতোষ লাহিড়ী বি, সি, ই.	৭
সভাপতির অভিভাষণ (চিত্রশালার - দ্বারোদঘাটনকালে)	শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ, সি, আই, ই	১৭
কনমাঙ্গাদের তাম্রশাসন	অধ্যাপক শ্রীপদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ তত্ত্বস্বরস্বতী এম, এম	৩৩
রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালা	শ্রীকৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি, এ	৪১
শঙ্করদেব	শ্রীউমেশচন্দ্র দে	৪৭
কামরূপ-ইতিহাসের উপকরণ	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব	৮২
বঙ্গের পালরাজ্যগণ	শ্রীকালীকান্ত বিশ্বাস	৯২
নারায়ণদেবের বংশ-তত্ত্ব	শ্রীবিরজাকান্ত ঘোষ বি, এ,	১০৯
স্ত্রীশিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে কয়েকটি কথা	শ্রীবিপিনমোহন সেহানবীশ (রায়সাহেব)	১১৭
উত্তরবঙ্গের স্বাস্থ্যতত্ত্ব	শ্রীকেশবলাল বসু	১২৩
পৌণ্ড্রবর্ধন-নগরের মহাস্থান নাম হইবার কারণ কি	শ্রীপ্রভাষচন্দ্র সেন বি, এল	১৩৮
পরিশিষ্ট		
নবম সাংস্কৃতিক কার্য-বিবরণ		১-৩৪
নবম বার্ষিক অধিবেশনের কার্য-বিবরণ ও দশম বর্ষের কার্য-বিবরণ		১-৪০

দশমভাগের সূচি (১৩২৩ বঙ্গাব্দ)

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সভাপতির অভিভাষণ	শ্রীযুক্ত রাজা মহেন্দ্ররঞ্জন রায়চৌধুরী	১
রত্নপালের তাম্রশাসনদ্বয়	„ পণ্ডিত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ তত্ত্ব-স্বরস্বতী এম, এ	১২
পীর, সত্যপীর, পীরবাহক, বড়পীর	„ মৌলবী খান তস্লেম উদ্দীন আহম্মদ বি, এল	৩৩
পদ্মাপুরাণ ও তাহার লেখকগণ	„ সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী	৪৫
ধর্মপালের তাম্রশাসন	শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ তত্ত্ব-স্বরস্বতী এম, এ	৭০

উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের রঙ্গপুর অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধাবলি

বাঙ্গালা সাধুভাষা	„ বীরেশ্বর সেন	৮৩
বঙ্গসাহিত্যে কবিকল্পণ	„ জ্ঞানেন্দ্রকুমার কাব্যার্ণব	৮৭
অদ্বৈতমঙ্গল পুথি ও অদ্বৈতাচার্য্যের কাল নিরূপণ	„ উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ বি, টি	১০৭
বাঙ্গালাভাষার ব্যাকরণ ও শব্দকোষের অভাব	„ রাজকুমার বেদতীর্থ	১১৫

বাঙ্গালাভাষার উপর বৈদেশিক গ্রাম্য শব্দের প্রভাব	„ রাজকুমার বেদতীর্থ	১২১
বঙ্গীয় গ্রাম্য-শব্দ-পরিচয়	„ রজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ	১৩০
সাহিত্যের অণুপ্রাশন	„ শরচ্চন্দ্র দেবশর্মা	১৪৪
বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি প্রধান অভাব	„ সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত	১৪৮
পরিশিষ্ট - দশম সাম্বৎসরিক কার্য্যবিবরণ		১-৩০
দশম সাম্বৎসরিক ও একাদশক বর্ষের কার্য্যবিবরণ		১-২৬

এভাবে রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের বহুবিধ কার্য্যক্রম প্রতিফলিত হয়েছে। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের ২৯ অক্টোবর দার্জিলিং লাউইস স্যানিটরিয়াম হলে অনুষ্ঠিত সাহিত্য পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে সম্পাদক সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী পরিষদের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন : “তন্ম্রালস বঙ্গবাসীর অনুসন্ধিৎসার ক্ষণিত্র অতীত গৌরবের এই মহার্ঘ খনির প্রতি যথোপযুক্ত রূপে প্রযুক্ত না হওয়ায় আজও তাহাদের জাতীয় ইতিহাসের আদি কাণ্ড রচিত হইতে পারে নাই। ...এই ক্ষুদ্র পরিষৎ নবনব তত্ত্ব উদঘাটন করিয়া সগর্বে দেখাইতেছেন যে বাঙ্গালার ইতিহাস তথাকথিত রূপমসীময় নহে। কেবল অনুসন্ধিৎসা ও চর্চার অভাবে বাঙ্গালার ইতিহাস অসম্পূর্ণ ও সাম্ভ্যতমিত্রায় সমাচ্ছন্ন। ...রত্নগর্ভা শৈলমালা পরিশোভিতা বঙ্গোত্তর ভূমির পুষ্পমণ্ডিত শ্যামল অঞ্চলান্তরে ভারতীয় সভ্যতার আদিযুগ হইতে যে অমূল্য রত্নরাজি লুণ্ণায়িত রহিয়াছে তাহা লোকলোচনের সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া দিলে বঙ্গবাসীর অতীতকালের কল্লিত দৈন্য অপসারিত ও জগৎ বিমুক্ত হইবে।”^{১৫}

বস্তুতপক্ষে এই উদ্দেশ্যে রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠা এবং সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা প্রকাশ করা হয়েছিল। প্রতিবছর সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন এবং প্রতিমাসে সাহিত্য অধিবেশন অনুষ্ঠিত হত। এসব অধিবেশনে প্রবন্ধ পাঠ ছাড়াও পরিষদের উদ্যোগে সংগৃহীত পাণ্ডুলিপি, শিলালিপি, পুরাতন মুদ্রা প্রদর্শিত ও প্রতিবেদনসহ পরিষদের কার্য্যাবলি সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হত। এক্ষেত্রে উদাহরণ স্বরূপ পরিষদের সপ্তম বর্ষের মাসিক সাধারণ অধিবেশনের কার্য্যাবলি হুবহু তুলে ধরা হল।^{১৬}

অধিবেশনের নাম ও তারিখ	পঠিত প্রবন্ধ ও লেখক	প্রদর্শিত দ্রব্য ও তাহার প্রদর্শক	অন্যান্য আলোচনা
প্রথম অধিবেশন ১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০, ২৫ মে, ১৯১৩, রবিবার	গৌড়-পাণ্ডুয়া প্রদর্শক -প্রথমার্ণব। শ্রীহরিদাস পালিত।	মহাম্মদপুরের রাজা সীতারাম রায়ের বাড়ির কাককার্য্য বিশিষ্ট ইষ্টক- শ্রীকালীপদ বাগচী।	(১) সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার কবি ধ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের অকল্লমৃত্যুতে শোক প্রকাশ। (২) উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মি- শনের দিনাজপুরে আহূত ষষ্ঠ অধিবেশনে উপস্থিত হওয়ার জন্য এ সভার পক্ষ হইতে প্রতিনিধি নিৰ্ব্বাচন।

একখানি প্রাচীন পুঁথি ও মহামান্য বঙ্গীয় গভর্ণর

দ্বিতীয় মাসিক ওই অধিবেশন ১৫ই আষাঢ়, ১৩২০, দ্বিতীয়াংশ। ১৯ জুন, ১৯১৩, রবিবার।		একটি চীনদেশীয় রৌপ্যমুদ্রা-শ্রীমান কালীপদ বাগচী (ছাত্র- সদস্য) দিনাজপুর-বাগগড়েপ্রাপ্ত মান্য করা বিবিধ প্রকারের মুদ্রাভণ্ডের অংশ ও প্রস্তরনির্মিত মকরাকৃতি পয়ঃপ্রণালী- শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ সেন জমিদার।	বাহাদুরের রঙ্গপুর পরিদর্শ- নোপলক্ষে এ সভার পক্ষ ইহাতে তৎপ্রতি সম্মান প্রদর্শনের ব্যবস্থা। গভর্ণর বাহাদুরের অভ্যর্থ- নাদির-ব্যবস্থা।
তৃতীয় মাসিক অধিবেশন ১ ভাদ্র, ১৩২০, ১৭ আগস্ট, ১৯১৩, রবিবার।	সদগ্রন্থের তালিকা শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী বি, এ, ঢাকার মসলিন এ, এফ, এম, আবদুল আলী এম. এ।	খুবইল রাজবাটিতে প্রাপ্ত কারুকার্যবিশিষ্ট কয়েক- খানি ইস্টক শ্রীযুক্ত কালিদাস চক্রবর্তী।	ছন্দবোধ-শব্দসাগর প্রণেতা কালীমোহন রায়চৌধুরী মহাশয়ের মৃত্যুতে শোক- প্রকাশ।
চতুর্থ মাসিক অধিবেশন ২২ ভাদ্র, ১৩২০, ৭ সেপ্টেম্বর ১৯১৩।	কুণ্ডার ইতিহাস শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী	একটি প্রাচীন রৌপ্যমুদ্রা রঙ্গপুর ধাপ মহিলা-সমি- তির সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা হেমদাসুন্দরী দেবী।	মহুনার ভূম্যাধিকারিণী শ্রীযুক্তা ভবসুন্দরী দেবী চৌধুরাণী কর্তৃক এ সভার গৃহ-নির্ম্মাণ-তহবিলে এক- কালীন ১২০০ টাকা দানের ঘোষণা ও তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। টেপার সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যাধিকারী শ্রীযুক্ত অন্নদামোহন রায়- চৌধুরী মহাশয় এ সভার স্থায়ী ধনভাণ্ডারে এককালীন ২০০০ টাকা দান করায় তাঁহাকে আঞ্জীবন সদস্যরূপে গ্রহণ।
পঞ্চম মাসিক অধিবেশন ২১ অগ্রহায়ণ, ১৩২০, ৭ ডিসেম্বর, ১৯১৩, রবিবার।	ইংরাজ-রাজত্ব শ্রী অবনীচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এ।	মৃত্তিকানির্ম্ম হইতে উদ্ধৃত গণেশমূর্ত্তি শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী।	শোক-প্রকাশ : এ সভার আঞ্জীবন সদস্য কোচ- বিহারের মহারাজ রাজ- রাজেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের অকালমৃত্যুতে।
ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন ২৭ পৌষ, ১৩২০, ১১ জানুয়ারী, ১৯১৪, চক্রবর্তী রবিবার	অদ্বৈতাচার্যের রামায়ণ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রজনীকান্ত প্রাচীন রৌপ্যমুদ্রা।	সভাকর্তৃক ক্রীত দুইটি শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রজনীকান্ত প্রাচীন রৌপ্যমুদ্রা।	নানাবিধ গ্রন্থ সঙ্কলয়িতা গুরুনাথ কাব্যতীর্থ-বিদ্যানিধি মহাশয়ের অকাল মৃত্যুতে শোক-প্রকাশ।

সপ্তম মাসিক অধিবেশন ৩ ফাল্গুন, ১৩২০, ১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯১৪, রবিবার।	আর্য্যভট্টের সময়- নিরূপণ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।	দুইখানি প্রাচীন পুঁথি -শ্রীযাদবচন্দ্র দাস।	কবির শ্রীযুক্ত ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিতে আনন্দপ্রকাশ। পাবনায় আহুত উত্তরবঙ্গ সাহিত্য- সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনের দিন-নির্ধারণ ও নাটোরের মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদ্বিনোদ রায় বাহাদুরকে ঐ সম্মিলনের সভাপতি নির্বাচন। মহামান্য বঙ্গীয় গভর্নর বাহাদুর এ সভার চিত্রশালা পরিদর্শন- পূর্বক কলিকাতা হইতে তাঁহার সহকারী মহাশয়ের মধ্যবর্তিতায় যে মন্তব্য প্রেরণ করেন তাহা পঠিত হয়। বিদ্যোদয় পত্রিকা-সম্পাদক পণ্ডিত হরীকেশ শাস্ত্রী মহাশয়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ। পাকনা-সম্মিলনে উপস্থিত হইবার জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন।
অষ্টম মাসিক ১৫ চৈত্র, ১৩২০, ২৯ মার্চ, ১৯১৪, রবিবার।	অবগুণ্ঠনের ইতিহাস শ্রীরাজেন্দ্রলাল সেনগুপ্ত প্রাচীন ভারতের স্থাপত্য বা মণি-ভূমিকা কস্ম শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিপিনচন্দ্র কাব্যরত্ন বিদ্যানিধি	কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিনী শ্রীকসন্তকুমার লাহিড়ী।	এই সভার অন্যতম বিশিষ্ট সদস্য ও ভূতপূর্ব সভাপতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেন্দ্র তর্করত্ন মহোদয়ের “কবি সম্রাট” উপাধি প্রাপ্তিতে আনন্দ- প্রকাশ। নবম:সাপ্তাহ্যসরিক অধিবেশ- নের দিন-নির্ধারণ।
	পদ্মাপুরাণের কবি নারায়ণদেবের বংশ-ভঙ্গ শ্রীযুক্ত বিরাজাকান্ত ঘোষ বি.এ	কান্তজীর মন্দিরের স্থাপিত কারুকার্য বিশিষ্ট ইষ্টক শ্রীনগেন্দ্র- নাথ সরকার ও পুণ্ডিনবিহারী সেন।	

বহুবিধ বিষয়ে গবেষণামূলক এই রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকাটি তথ্যনির্ভর ও সমৃদ্ধশালী করতে যারা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন তাঁদের মধ্যে পঞ্চানন সরকার, ভবানী প্রসন্ন লাহিড়ী, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, প্রভাসচন্দ্র সেন, খান বাহাদুর তসলীম উদ্দীন আহমদ, প্রকাশচন্দ্র চৌধুরী, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ লাহিড়ী, রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, উমেশচন্দ্র দে, হারাগোপাল দাস

গুপ্ত, কেশবলাল বসু, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রমুখ উল্লেখ্য। এই পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের মধ্যে সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরীর ‘প্রাচীন কামরূপ’, পণ্ডিত যাদবেন্দ্র তর্কভট্টের ‘রঙ্গপুরের জাগের গান’, ‘রঙ্গপুরের ভৌগোলিক অবস্থা’, কেশবলাল বসুর ‘রঙ্গপুরের প্রাচীন প্রসঙ্গ’, অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, ‘উত্তরবঙ্গের পুরাতত্ত্বানুসন্ধান’, পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ তস্কের ‘ইন্দ্রপালের তাম্রশাসন’, হরিদাস পালিতের ‘গৌড়-পাণ্ডুয়া প্রদর্শক’, উমেশচন্দ্র দেবের ‘অসমীয়া গ্রন্থ বিবরণ’, তসলীম উদ্দীন আহমদ এর ‘পীর সত্যপীর পীরবাহক বড়পীর’ শীর্ষক প্রভৃতি গবেষণামূলক প্রবন্ধগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনে রচিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হলেও বিশেষত রঙ্গপুর ও সম্মিহিত প্রাচীন ইতিহাস, প্রাচীন ও মধ্যযুগের কবি-সাহিত্যিকদের সম্পর্কে প্রামাণিক বিবরণ, রঙ্গপুর তথা উত্তরবঙ্গের পুরাতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, লোক সাহিত্য প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে মূল্যবান নিবন্ধ গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হত। রঙ্গপুরের আঞ্চলিক ভাষা, বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাচীন ইতিহাস, সাহিত্য ও ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে মূল্যবান নিবন্ধ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকাটি বর্তমানকালের বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত গবেষণামূলক পত্রিকার মতো বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ও আধুনিক পদ্ধতি বা মেথডলজি অনুসৃত না হলেও বিষয় নির্ধারণে এর রচনাবলিতে গবেষণা প্রবণতা ও অনুসন্ধান মনস্কতা পরিলক্ষিত হয়। এতে সমগ্র উত্তরবঙ্গ, আসামের সাহিত্য, ও প্রত্নবস্তুর পরিচয় দানের প্রয়াস ছিল। পত্রিকাটিতে প্রাচীন সাহিত্যের বর্ণনা, ইতিহাস ও দর্শন আলোচনা, প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা, ভাষা বিষয়ক রচনার প্রচেষ্টা প্রতিফলিত হয়েছে। পত্রিকার অভিনবত্ব লক্ষ করা যায় ‘ঢাকার মসলিন’, ‘প্রাচীন ভারতের নৌবাহিনী’, ‘প্রাচীন ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়’ প্রভৃতি প্রবন্ধে।

রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩২০ সন ১ম সংখ্যার এ, এফ, এম, আব্দুল আলির ‘ঢাকার মসলিন’, নিবন্ধটি গবেষণামূলক। এতে লেখক বহুপূর্ব থেকেই ঢাকার প্রসিদ্ধ মসলিনের গুরুত্ব এবং স্বদেশি কার্পাস দ্বারা প্রস্তুত এবং উৎকৃষ্ট মিহি ও সুস্বাদুভাবে তৈরি মসলিনের দেশ-বিদেশে চাহিদার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন। ভারতবর্ষের মুঘল শাসক ও মহীয়সীগণ এই মসলিনের প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত ছিলেন। প্রবন্ধটিতে এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপে মসলিনের চাহিদা সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। ঢাকার মসলিনের জগৎব্যাপী খ্যাতি, সৌন্দর্য্য, সুস্বাদুতা ও উৎকৃষ্টতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন অনেকে। টেভারনিয়ার ভ্রমণবৃত্তান্তে উল্লেখ করেছেন : “পারস্যরাজের ভারতীয় দূত মহম্মদ আলিবেগ ভারত হইতে পারস্যে ফিরিয়া আসিয়া বাদশাহ দ্বিতীয়-চাঙ্গের বহুমূল্য পস্তুর খচিত অস্ত্রীচ পক্ষীর ডিম্বাকৃতি একটি ক্ষুদ্র নারিকেল উপহার দিয়েছিলেন। যখন নারিকেল ভাঙ্গা হইল, তখন তাহার মধ্য হইতে যষ্টি হস্ত পরিমিত দীর্ঘ মসলিনের পাগড়ীর কাপড় বাহির হইল, উহা এমন সুস্বাদু যে হাতে রাখিয়াও সঠিক জানা যায় না যে, কি হাতে রহিয়াছে।”^{১৭}

প্রাচীন এবং মধ্যযুগে ভারতবর্ষ নামক গ্রন্থে মিসেস ম্যানিং লিখেছেন, “নবাব আলিবর্দি খাঁর রাজত্বকালে জনৈক তন্তুবায়ের গাড়ী শম্পাপরি প্রসারিত একখণ্ড মসলিন বস্ত্র খাইয়া ফেলিয়াছিল বলিয়া ঢাকা হইতে নিবাসিত হইয়াছিল। ঐ প্রকার মসলিন ‘আব্বিরাওয়ান’ বা ‘প্রবহমান সলিল’ নামে অভিহিত হইত।”^{১৮} ঐতিহাসিক খাফি খাঁর বর্ণনা হতে জ্ঞাত হওয়া যায়

যে; “আলোকসামান্য্য রূপবতী নূরজাহান বেগম ঢাকাই মসলিনের প্রতি এত অনুরক্ত ছিলেন যে, তৎকালে তাঁহার জন্য দিম্মি দরবারে এবং দিম্মির সংস্রবযুক্ত অন্যান্য রাষ্ট্রীয় নগরীতে ঢাকাই মসলিন বিশেষ আদরের সামগ্রী হইয়া পড়িয়াছিল। সূক্ষ্মত্বগুণে উৎকৃষ্টতম মসলিন সমস্তই বাদসাহ-অন্তঃপুরচারিণীগণের ব্যবহারেই পর্যাপ্ত হইত। অন্যকেহ তাহা ব্যবহার করিতে পারিত না।”^{১৯} মি. ক্রে-এর বর্ণনায় জানা যায়, মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনামলে আবি-রাওয়ান নামের একখানি মসলিন ৪০০ পাউণ্ড মূল্যে বিক্রি হত।^{২০} লন্ডন শিল্পাগারে রক্ষিত ২০ গজ দীর্ঘ ও ১ গজ প্রশস্ত মসলিনের ওজন ছিল সাড়ে সাত আউন্স। ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার প্রখ্যাত গ্রন্থ প্রণেতা টেলর ২০০ গজ দীর্ঘ একখানা মসলিনের ওজন মাত্র ৫ গ্রেন ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এই মসলিন ইউরোপে প্রভূত পরিমাণে রপ্তানী হত। ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা থেকে ১,৫২,০০,০০০ (এক কোটি বাহান্ন লক্ষ) ঢাকার মসলিন রপ্তানী হয়েছিল।^{২১} কিন্তু পরবর্তীতে এই বিখ্যাত মসলিন শিল্প কর্মটি উনিশ শতক থেকে ক্রিভাবে অতীত ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলে এবং এর পরিবর্তে তাঁত বয়ন শিল্পের প্রচলন হয়েছে তার ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে।

অনুরূপভাবে সাহিত্য পরিষদের অষ্টম সাপ্তাহসরিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে মণীন্দ্রচন্দ্র পরিষদ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস, বাঙলা ভাষার মান উন্নয়ন ও বাঙলায় জাতীয় ইতিহাস রচনার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। তাছাড়াও পরিষদের কার্যক্রম ক্রমশ বৃদ্ধির বিষয়ে সন্তোষে আলোকপাত করা হয়েছে।^{২২}

কালীকান্ত বিশ্বাসের ‘প্রাচীন ভারতের নৌ-বাণিজ্য’ বিষয়ে নাতিদীর্ঘ রচনায় প্রাচীন গ্রন্থাবলী বেদ, পুরাণ প্রভৃতির বিক্ষিপ্ত বর্ণনায় ভারতবর্ষের এক সময়ের নৌবাণিজ্য, ভারতীয় সভ্যতা বিষয়ে উল্লেখ পাওয়া যায়। স্বরণ্যাত কাল থেকে নদীবন্দল ভারতে নৌপথে পণ্যসামগ্রী আমদানী, রপ্তানী হত। এজন্য নদীর কূলে কূলে প্রাচীন নগর বা বন্দরাদির চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়।

প্রাচীন মিশর, ভারত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ বিশেষত সুমাত্রা, জাভা, বালি প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ, সিংহল, চীন, পশ্চিম এশিয়া, এশিয়া-মাইনর ইত্যাদি অঞ্চলের সহিত নৌ-বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। চীনের সাথে ভারতের বাণিজ্যিক ও ধর্মীয় সংযোগ ছিল। ভারতীয় বণিকগণ ভারতীয় আদর্শে সর্বপ্রথম চীনে ধাতুমুদ্রার প্রচলন করেন। সুপ্রসিদ্ধ রোমান ঐতিহাসিক তাসিটাসের (Tacitus) গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না। প্লিনী তাসিটাসের অনুবাদ গ্রন্থ বলে খ্যাত। প্লিনীর অনুবাদে পাওয়া যায় যে খ্রিস্টপূর্ব ৬০ অব্দে জার্মান সাগরের উপকূলে একখানি ভারতীয় বাণিজ্য জাহাজ জলমগ্ন হয়েছিল। এর থেকে অনুমিত হয় আদিমকাল থেকে ইউরোপের সহিত ভারতে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল।^{২৩} ভারতীয় পণ্য নিয়ে ভারতীয় বণিকগণ রোমে বাণিজ্য করতে যেতেন বলে জানা যায়। প্রাচীন ও আধুনিক ভারতের বাণিজ্য প্রভৃতি-সম্বন্ধীয় গ্রন্থে প্লিনীর অনুবাদে উল্লেখ আছে যে : “If the commerce with India became a source of fortune to the industrious traders and an important branch of revenue to the Government the introduction of the product of the East also headed to stimulate and increase the already excessive luxury which prevailed at Rome. Pliny states the balance against Rome of trade with the east at a hundred millions sesterces or 1,041,666 pound sterling. Pliny when speaking of muslin

terms it, a dress under whose slight veil our women contrive to show their shapes to the public.^{২৪}

এই নিবন্ধে বাঙ্গালার নৌবাণিজ্যের বিবরণ ইংরেজ জাতিসহ বহু বিদেশি পরিব্রাজক ও ভ্রমণকারীর বর্ণনা আছে। দিল্লীর বর্ণনায় বাঙ্গালার সপ্তগ্রাম পুরাকালে শ্রেষ্ঠ বন্দর ছিল বলে জানা যায়। David Rhys এর *Buddhist India* গ্রন্থে ভারতের নৌবাণিজ্য সম্পর্কে অনেক তথ্য আছে। চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়েন, হিউয়ান সাং এবং আরবীয় মুসলিম পরিব্রাজক সলেমান ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে নানা কথা বলেছেন। সলেমান এর ভ্রমণ বৃত্তান্ত P. Ghosh ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন। Geographical Society of Paris থেকে প্রকাশিত এই ভ্রমণ বৃত্তান্তে P. Ghosh বলেন : "During the time of the Arab invasion of India (8th Century of the Christian Era) Soleman came to this Country. His account says that the Delta of the Ganges was then in a flourishing condition. There existed then many cities which traded with Arakan."^{২৫}

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠা হলেও এদেশে নৌপথে দেশবাসীর অবাধ গতি ছিল। পাশ্চাত্যের সাথে ভারতের নিম্নলিখিত দ্রব্যসমূহের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রচলিত ছিল ;

- | | | |
|--------------------------------------|-----------------|---------------------|
| (1) Lac | (2) Cochineal | (3) Dyeing |
| (4) Silk | (5) Attar | (6) Indigo |
| (7) Salt | (8) Lime | (9) Sugar |
| (10) Ghee | (11) Salt Petre | (12) Tea |
| (13) Opium | (14) Paper | (15) Til |
| (16) Sandal | (17) Iron | (18) Muslin |
| (19) Tobacco | (20) Pan-leaf | (21) Musk |
| (22) Kumkum | (23) Barilla | (24) Stone |
| (25) Alum | (26) Cotton | (27) Cotton fabrics |
| (28) Ising glass | (29) Mhowa | (30) Mhowa Daroo |
| (31) Butter tree | (32) Betal nut | (33) Snake stone |
| (34) Precious mineral. ^{২৬} | | |

কিন্তু পরবর্তীতে ভারতীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। তবে এই নিবন্ধে ভারতের প্রাচীন নৌ-বাণিজ্যের স্মৃতি আমাদের মানস পটে গভীরভাবে রেখাপাত করে।

.. 'প্রাচীন ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়' নিবন্ধটি শ্যামাপদ বগচীর তথ্যসমৃদ্ধ ধারাবাহিক রচনা। যা *সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা*র চতুর্দশ ও পঞ্চদশ ভাগের তিন সংখ্যায় ক্রমশ প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রবন্ধে প্রাচীন ভারতের বিখ্যাত তক্ষশীলা, কাঞ্চী, বিদর্ভ ও নাগন্দা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে সবিস্তারে প্রামাণিক তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে ভারতের প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয় খ্যাতির শীর্ষে আরোহন করেছিল। দেশ-বিদেশের সকল শ্রেণির শিক্ষার্থীগণ বিদ্যার্জনের জন্য এই প্রাচীন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান তক্ষশীলায় আসত। কুটনীতি বিশারদ চাণক্য, অষ্টাধারী ব্যাকরণকার পাণিনি, গোভরগ, মাতঙ্গ প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ তক্ষশীলার ছাত্র ছিলেন।^{২৭} অর্থশাস্ত্র, আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গন্ধর্বেদ, বেদবেদান্ত ছাড়াও ভাস্কর্য, চিত্রশিল্প, মূর্তি নির্মাণ প্রভৃতি বহুবিধ বিষয়ে এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা দেওয়া হত।^{২৮} এতদ্ব্যতীত এই নিবন্ধে

তক্ষশীলা নামের উৎপত্তি, তাৎপর্য প্রাচীনত্ব প্রভৃতি বিষয়ও গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হয়েছে।

প্রাচীন ভারতের গৌরবস্থল জ্ঞানের কেন্দ্রভূমি ও বিদ্যামণ্ডলীর মিলনক্ষেত্র ছিল নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী হতে খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত বিশেষত পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে ইহা সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল বলে জানা যায়।

স্থাপত্যে ও ভাস্কর্যেও ইহা অতুলনীয় ছিল। সপ্তম শতকে প্রখ্যাত চৈনিক পবিত্রাজক হিউয়েন সাং, খ্যাতিমান ও অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী আচার্য শীলভদ্রের সময় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে আগমন করেছিলেন এবং অত্র প্রতিষ্ঠানে ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এসময় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি প্রায় সমগ্র এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল।^{২৯} এছাড়াও প্রবন্ধটিতে কাঞ্চী বিদর্ভ বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

অষ্টম ভাগ, ১৩২০ বঙ্গাব্দে রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ৪৩-৪৮ পৃষ্ঠায় তারাক্ষর তর্করত্ন এর ‘রঙ্গপুরের প্রচলিত প্রবাদ-সংগ্রহ’ শীর্ষক রচনায় অর্থসহ রংপুরের প্রচলিত বিভিন্ন প্রবাদ প্রকাশিত হয়েছে। যা স্থানীয় তথ্য উপাত্ত, বিশেষত লোকসাহিত্যের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। নিবন্ধে বর্ণিত প্রচলিত প্রবাদের মধ্যে উদাহরণ স্বরূপ ২/৪টি প্রবাদ উল্লেখ করা যায়। যেমন,

বার নাতি তের পুতি, তেও বুড়ার অধোগতি। বধপুত্র-পৌত্র সন্তেও বৃদ্ধের অধোগতি হয়েছে ;
অর্থাৎ অদৃষ্টের উপরে কাহারও হাত নাই।

গাই কি বলদ লেঙ্গুড় তুলিয়া দেখেনা। লেঙ্গুড় পুচ্ছ। বিষয়টি অনুধাবন করে না।

বিয়াই তোর খরচ আর মোর খরচ
যত দেখিস ঝাউয়া আর চাউয়া।

বিয়াই-বৈবাহিক মোর-আমার, ঝাউয়া-খাদক,
চাউয়া-যাচক। খরচ কোথা হইতে হয়, সংবাদ রাখে
না বাহিরের লোকের ন্যায় খায় ও চায়।

মরিয়া যায় রাণী,
তেও না ছাড়ে দাঁতের কানী।

রাণী মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছেন (তেও)
তথাপি (দাঁতের-কানী) দস্তুর ঘর্ষণ ত্যাগ করিতেছেন
না। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত স্বীয় জেদ রক্ষা
করিতেছেন।^{৩০}

এই প্রবাদগুলো আঞ্চলিক ভাষায় হলেও যথেষ্ট অর্থবহ।

আশুতোষ লাহিড়ী তাঁর “উদ্ভিদ-তাহার উপকরণ ও বর্ধন” নিবন্ধটি ক্রমশ অর্থাৎ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার সপ্তম ভাগ (১৩১৯ বঙ্গাব্দ), অষ্টম ভাগ (১৩২০ বঙ্গাব্দ) ও নবম ভাগে (১৩২১ বঙ্গাব্দ) ধারাবাহিকভাবে রচনা করেছেন। নিবন্ধটিতে তিনি এদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য জমিতে রাসায়নিক সার ব্যবহারের পরিমাণ, উপকারিতা, প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বিষয়ে বর্ণনা করেন। সেই সঙ্গে জমির ধরন অনুযায়ী ফসল উৎপাদন সম্পর্কে বাস্তব-ভিত্তিক বৈজ্ঞানিক উপকরণ নিয়ে মূল্যবান তথ্য সন্নিবেশনের চেষ্টা করেছেন।^{৩১}

এতদ্ব্যতীত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যা—মহার্ণব এর ‘কামরূপ-ইতিহাসের উপকরণ’, কেশবলাল বসুর ‘উত্তরবঙ্গের স্বাস্থ্যতত্ত্ব’, প্রভাষচন্দ্র সেনের ‘পৌণ্ড্রবর্ধন নগরের মহাস্থান নাম হইবার কারণ কি’, ভবানী প্রসন্ন লাহিড়ীর ‘ভারতীয় নাট্য’, রজনীকান্ত চক্রবর্তী এর ‘প্রাচীন রৌপ্যমুদ্রা’, শরচ্চন্দ্র দেবশর্মার ‘সাহিত্যের অনুশাসন’, যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এর ‘ভারতীয়

স্বী শিক্ষা' প্রভৃতি নিবন্ধগুলো বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। অসমীয়া বাংলা সাহিত্য, ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ক নিম্নোক্ত প্রবন্ধগুলি তথ্যনির্ভর ও তাৎপর্যপূর্ণ ছিল :^{৩২}

প্রবন্ধ	লেখক	পত্রিকার ভাগ	সংখ্যা	পৃষ্ঠা
আসামী কামান	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	৫	২	৮২-৮৯
অসমীয়া গ্রন্থ বিবরণ	শ্রীপদ্মনাথ দেব শর্মা	৬	১	১-৮
প্রাচীন গ্রন্থাবলীর বিবরণ	শ্রীকালীকান্ত বিশ্বাস	২	১	২৭-৪২
উত্তরবঙ্গের মুসলমান সাহিত্য	শ্রীহামেদ আলী	৩	৩	১১৫-১৩১
বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি	শ্রীভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী	৩	৩	১৩২-১৩৮
রঙ্গপুর ভাষার ব্যাকরণ	শ্রীযতীন্দ্র মোহন চৌধুরী	১৩	১-৪	২০-৩১
রঙ্গপুরের প্রাচীন কবি কাজী হায়াত				
মামুদের কাব্য পরিচয়	শ্রীশ্যামপদ বাগচী	১৭	১-৪	২৯-৩৮
বঙ্গের শেষ সেনা রাজগণ	শ্রীকালীকান্ত বিশ্বাস	২	১	৭-২৬
বঙ্গের পাল রাজগণ	শ্রীকালীকান্ত বিশ্বাস	৯	২-৪	৯২-১০৮
শেখপুরের ইতিহাস	শ্রীহরগোপাল দাসকুণ্ড	৫	অতিরিক্ত	১-১২৫
বগুড়ার ভীম রাজগণ	শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন	৬	১	১৫-১১১
সেনের তাম্রশাসন	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	৪	৩	১২১-১৩২
ইন্দ্রপালের তাম্রশাসন	শ্রীপদ্মনাথ ভট্টাচার্য দেবশর্মা	৭	২	৮১-৮২
ধর্মপালের তাম্রশাসন	শ্রীপদ্মনাথ ভট্টাচার্য দেবশর্মা	১০	২	৭০-৮২

হরগোপাল দাসকুণ্ড রচিত 'শেরপুরের ইতিহাস' নিবন্ধটি সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার পঞ্চম ভাগের অতিরিক্ত শাখায় ১৩১৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এই প্রয়াস প্রাথমিক হলেও এতে বহু প্রাচীন ও মধ্যযুগের দলিলের বিবরণ পাওয়া যায়। যা ইতিহাস গবেষণায় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

'বঙ্গের পাল রাজগণ' প্রবন্ধের লেখক কালীকান্ত বিশ্বাস। ১৩২১ বঙ্গাব্দে পত্রিকার নবমভাগে প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধটি প্রাচীন কাব্য, পুরাণ ও ঐতিহাসিক তথ্যনির্ভর। প্রবন্ধটিতে পাল রাজাদের ইতিহাস ছাড়াও বাঙ্গালির গৌরবের পরিচয়দানের ইতিহাস বিবৃত হয়েছে। মূলত এভাবেই সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত ইতিহাস বিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে বাংলা, আসাম তিব্বত প্রভৃতি অঞ্চলের নানা প্রসঙ্গ উপস্থাপনের প্রয়াস লক্ষ করা যায়।

বস্তুত এভাবে রংপুর, বগুড়া ও শেরপুরের ইতিহাস, বঙ্গের পালরাজগণ, পাহাড়পুরের পুরাতনস্তুপ, মাধাইনগর, ভাঙ্কর বর্মা, চণ্ডিকা বিজয় কাব্য, উত্তরবঙ্গের মুসলিম সাহিত্য, আঞ্চলিক ভাষা ও লোকসাহিত্য, শরীর বিজ্ঞান ও জাতিতত্ত্ব প্রভৃতি প্রসঙ্গে যে আলোচনার সূত্রপাত এই পত্রিকায় হয়েছিল তা প্রশংসার দাবি রাখে।^{৩৩}

পরিশেষে বলা যায়, রংপুর থেকে প্রকাশিত এই গবেষণাধর্মী পত্রিকাটি বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। বর্তমানে দুস্তাপ্য এই রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা এখনও রাজশাহী বরেন্দ্র জাদুঘর লাইব্রেরি, কলকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ লাইব্রেরীসহ সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিবর্গের কাছে সংরক্ষিত আছে। বরেন্দ্র লাইব্রেরিতে পত্রিকার পঞ্চম (১৩১৭), ষষ্ঠ (১৩১৮), সপ্তম (১৩১৯), অষ্টম (১৩২০)

এবং নবম ভাগ (১৩২১) সংরক্ষিত আছে। তবে এগুলো অত্যন্ত জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। রংপুরের প্রখ্যাত ইতিহাস ও সাহিত্যানুরাগী হোমিও ডাক্তার মতিউর রহমান বসনিয়ার কাছে পত্রিকার ১৩২০ সনের ১ম সংখ্যা থেকে ১৩৪৬ সনের ২য় সংখ্যা পর্যন্ত কপিগুলো ব্যক্তিগত সংগ্রহে রয়েছে। কিন্তু *সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা*র উক্ত কপিগুলো যথাযথভাবে সংরক্ষণের অভাবে উইপোকার আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এতগুলো সংখ্যার ফটোকপি বর্তমান প্রবন্ধকারের কাছে আছে। কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ লাইব্রেরিতে এই পত্রিকার সংখ্যাগুলো সংরক্ষিত আছে বলে জানা যায়। যা এখনো গবেষণার কাজে বিশেষ উপযোগী।

কেননা রংপুর তথা উত্তরবঙ্গ এবং আসামের মধ্যযুগীয় সাহিত্যলোচনা, প্রাচীন ইতিহাস ও প্রত্নসম্পদের বিবরণ, চিত্র আলোচনার বহু প্রমাণিক দলিল এই *সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা*টিতে পাওয়া যায়। পত্রিকাটি (১৩১৩ থেকে ১৩৪৬ পর্যন্ত) দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল এবং রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ তথা উত্তরবঙ্গের সাহিত্য-সাংস্কৃতিক আন্দোলন জাগরুক রেখেছিল। কিন্তু সময়ের বিবর্তনে ইতিহাসের অমোঘ বিধান ও কালের করাল গ্রাসের অতল গহুরে হারিয়ে গেলেও *রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা*টি ইতিহাস অনুরাগীদের গবেষণার উৎস হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। সূত্রাং ইতিহাস, দর্শন, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে যে সব রচনা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল তা বর্তমান গবেষকদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান এবং নবপ্রজন্মকে ঐতিহ্যের সংবাদ দিতে পারে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ :

- ১ সমর পাল, *ব্রিটিশ ভারতে সংবাদ পত্র দঙ্গন*, নাটোর, দেবীপাল, ১৯৯৫ খ্রি., পৃ. ৬।
- ২ আধুনিক রংপুর অতীতে রঙ্গপুর নামে পরিচিত ছিল। রঙ্গপুর শব্দটির পরিবর্তিত রূপ রংপুর। বিস্তারিত দেখুন, মহিষুল ইসলাম, “রংপুর পৌর নগরী : ইতিহাস ও ঐতিহ্য (১৮৬৯-১৯৪৭ খ্রী.)”, অপ্রকাশিত পি এইচ. ডি. থিসিস, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ, ২০০৩, পৃ. ২৬-২৭।
- ৩ *রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা*, সপ্তম ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা, রঙ্গপুর, ১৩১৯ সন, সপ্তম সাপ্তাহিক কার্যবিবরণ, পৃ. ১; মতিউর রহমান বসনিয়া, *রংপুর পরিচিতি*, রংপুর, গ্রন্থকার, ১৯৭৩, পৃ. ৫১; মুহম্মদ মজিব উদ্দীন মিয়া, *বাংলা গবেষণা পত্রিকা*, (১৩০১-১৪০১), ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮, পৃ. ৩৬।
- ৪ *সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা*টি প্রথম গবেষণা পত্রিকা হিসেবে ১৩০১ বঙ্গাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। এই গৌবরদীপ্ত পত্রিকাটির শত বছরেরও অধিককাল ধরে প্রকাশনা অব্যাহত রয়েছে।
- ৫ মুহম্মদ মজিব উদ্দীন মিয়া, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৬ ; *রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা*, অষ্টম ভাগ, ১ম সংখ্যা, রঙ্গপুর, ১৩২০ সন, পৃ. ২৮-৩২।
- ৬ *রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা*, সপ্তম ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩১৯ সন, সপ্তম সাপ্তাহিক কার্যবিবরণ, পৃ. ১১-১২।
- ৭ প্রকাশচন্দ্র চৌধুরী, “রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের ইতিহাস”, *রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা*, ১৮শ ভাগ, ১ম সংখ্যা, রঙ্গপুর, ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩-৪।
- ৮ Muhammad Moniruzzaman, "Zaminders of Bengal : Case study of Selected Rengpur Zaminders, 1793-1950", Unpublished Ph. D Thesis, The Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi, 1996, P 225

- ৯ প্রকাশচন্দ্র চৌধুরী, “রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের ইতিহাস”, রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩-৭।
- ১০ পত্রিকার প্রত্যেক সংখ্যাকে এক একটি ভাগ হিসেবে আখ্যায়িত করা হতো।
- ১১ রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, বিজয় দিবস সংখ্যা, রংপুর, ১৯৮৭, পৃ. ৫০ ; মুহম্মদ মজির উদ্দীন মিয়া, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮।
- ১২ প্রকাশচন্দ্র চৌধুরী, “রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের ইতিহাস”, রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, পূর্বোক্ত, পরিশিষ্ট, পৃ. ২৯।
- ১৩ রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, বিজয় দিবস সংখ্যা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯।
- ১৪ মুহম্মদ মজির উদ্দীন মিয়া, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১।
- ১৫ রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, সপ্তম ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা, রঙ্গপুর, ১৩১৯ সন, সপ্তম সান্ন্যৎসরিক কার্যবিবরণ, পরিশিষ্ট, পৃ. ২৭।
- ১৬ রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, অষ্টম ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা, রঙ্গপুর, ১৩২০ বঙ্গাব্দ, নবম সান্ন্যৎসরিক কার্যবিবরণ, পরিশিষ্ট, পৃ. ৫-৮।
- ১৭ এ. এফ. এম আব্দুল আলি, “ঢাকার মসলিন”, রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, রঙ্গপুর, ১৩২০ সন, পৃ. ২৯।
- ১৮ তদেব।
- ১৯ তদেব।
- ২০ তদেব, পৃ. ৩১।
- ২১ তদেব।
- ২২ রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, অষ্টম ভাগ, ২য় সংখ্যা, রঙ্গপুর, ১৩২০ সন, পৃ. ৬৪-৭১।
- ২৩ কালীকান্ত বিশ্বাস, “প্রাচীন ভারতের নৌ-বাণিজ্য”, রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১ম-৪র্থ সংখ্যা, রঙ্গপুর, ১৩২৩ সন, পৃ. ১৮।
- ২৪ উদ্ধৃত, তদেব, পৃ. ১৮।
- ২৫ উদ্ধৃত, তদেব, পৃ. ২২।
- ২৬ তদেব, পৃ. ২৬-২৭।
- ২৭ “প্রাচীন ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়”, রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ২য় সংখ্যা, রঙ্গপুর, ১৩৩১ সন, পৃ. ৪৯।
- ২৮ তদেব, পৃ. ৪৯-৫০।
- ২৯ তদেব, পৃ. ৫১-৫৪।
- ৩০ তারাপঙ্কর তর্করত্ন, “রঙ্গপুরে প্রচলিত প্রবাদ সংগ্রহ”, রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, রঙ্গপুর, ১৩২০ সন, পৃ. ৪৩-৪৮।
- ৩১ আওতোষ লাহিড়ী, “উদ্ভিদ-তাহার উপকরণ ও বর্জন”, রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ২য় সংখ্যা, রঙ্গপুর, ১৩২০ সন, পৃ. ৭২-৮০।
- ৩২ মুহম্মদ মজির উদ্দীন মিয়া, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯-৪৪।
- ৩৩ তদেব, পৃ. ৩৭।

নাট্যাচার্য রাধামাধব কর

জগন্নাথ ঘোষ

১

বাংলা থিয়েটারের গোড়াপত্তনকালের অন্যতম কারিগর রাধামাধব কর। তিনি নাট্যমোদী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতৃদেব দুর্গাদাস কর চিকিৎসক হলেও নাট্যগত প্রাণ ছিলেন। রাধামাধবের জন্মস্থান হাওড়া জেলার সাঁত্রাগাছী। তাঁর জন্মতারিখ ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দের পৌষ মাস।^১ তাঁরা ছিলেন চারভাই। রাধামাধব দ্বিতীয়। তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতার নাম রাধাগোবিন্দ কর (১৮৫২-১৯১৮)। তিনি ছিলেন ডাক্তার। তাঁর নামে কলকাতায় একটি হাসপাতাল বিদ্যমান। তার নাম আর.জি.কর. হাসপাতাল। ডাক্তার হিসেবে যথেষ্টখ্যাতির অধিকারী রাধাগোবিন্দ নাট্যানুরাগী ছিলেন। রাধামাধবের পরবর্তী দুই ভাইয়ের নাম রাধারমণ ও রাধাকিষণ। রাধারমণের কন্যা মনোরমাকে বিবাহ করেন বিশিষ্ট সাংবাদিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ (১৮৭৬-১৯৬২)। রাধারমণ একজন নাট্যকার ছিলেন। তাঁর নাটকটির নাম *সরোজা*।^২ রাধামাধবের পিতৃদেব ডাঃ দুর্গাদাস করও একজন নাট্যকার ছিলেন। তাঁর *স্বর্ণশঙ্খল নাটক* রচিত হয় ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায়। ড. সুকুমার সেন এই নাটকটির পরিচয় দানপ্রসঙ্গে লিখেছেন^৩ : “পৌরাণিক নাটকে ভক্তিরসের সঞ্চার করিলেন ডাক্তার দুর্গাদাস কর স্বর্ণশঙ্খল নাটক (ঢাকা, ১৮৬৩) লিখিয়া। এই পঞ্চাঙ্ক নাটকটির বিষয় দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ। ভক্তিরসাত্মক নাটকে ইঁহার পথ অনুসরণ করিলেন মনোমোহন বসু। তাহার পরে গিরিশচন্দ্র ঘোষ।”

ড. সেন একথাও ওই গ্রন্থে জানিয়েছেন যে নাটকটি ১২৬২ সালের দিকে বরিশালে রচিত ও অভিনীত হয়। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর *বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস* গ্রন্থে জানিয়েছেন: “স্বর্ণশঙ্খল’ নাটকটি বরিশালে প্রথম অভিনীত হয় ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে।”^৪ একখানিমাত্র নাটক লিখে দুর্গাদাস বাংলা নাটকের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

তাঁর পিতৃদেব যখন ঢাকায় কর্মরত, তখন সেখানে পোস্টাল ইন্সপেক্টর ছিলেন দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩)। দীনবন্ধুর সঙ্গে দুর্গাদাসের গভীর সৌহার্দ্য স্থাপিত হয়। তিনি তখন সপরিবারে ঢাকায় অবস্থান করছিলেন। তখনই রাধামাধব দীনবন্ধুর নিকট সংস্পর্শে আসেন। বলাবাহুল্য, দীনবন্ধু মিত্র *নীলদর্পণ* লেখেন ঢাকায়।

১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে দুর্গাদাস ঢাকার বাস উঠিয়ে চলে আসেন কলকাতায়। তিনি কলকাতার মেডিকেল কলেজের মেডিসিনের অধ্যাপকপদে বৃত্ত হন। কলকাতায় আসার পর রাধামাধবকে ট্রেনিং স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়। বিশিষ্ট নট অর্ধেন্দ্রশেখর মুস্তাফী (১৮৫০-১৯০৯) রাধামাধবের এক ক্লাস উঁচুতে পড়তেন। রাধামাধবের সহপাঠী ছিলেন পাথুরিয়াঘাটার রাজবাড়ির জামাতা পুণ্ডরীকাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশিষ্ট মঞ্চবিশেষজ্ঞ যোগেন্দ্রনাথ মিত্রও রাধামাধবের সহপাঠী ছিলেন। ট্রেনিং স্কুলে ভর্তি হলেও রাধামাধব পাঠানুশীলনে মনোযোগী ছিলেন না। তাঁকে ওই স্কুল থেকে

নাম কাটিয়ে ভর্তি করা হয় হেয়ার স্কুলে। কিন্তু ওই স্কুলে রাধামাধব মনস্থির করে পড়াশুনা করতে পারতেন না। তাঁর আকর্ষণ ছিল গানবাজনার প্রতি। তিনি যখন ঢাকায় ছিলেন তখন তাঁদের বাড়ির বৈঠকখানায় পিতৃবন্ধুরা গান গাইতেন। সেইসব গান দুই তিনবার শুনেই, তিনি সেই গানের সুর তাললয় আয়ত্ত্ব করতেন। এইরকম একটি গানের উল্লেখ করেছেন তিনি তাঁর আত্মস্মৃতিতে।^৭ গানটি নিম্নরূপ :

নবীন নাগর রসের-সাগর

ভুলবে কেন আমায় দেখে।

তোমার মত নবীন নারী

হতেম যদি লো সুন্দরী,

নাগরের মন করে চুরি

কাল কাটাতাম মনের সুখে।।

ঢাকায় অবস্থানকালে নিতান্ত বালক বয়সে রাধামাধব সখের যাত্রাগান শোনে। সেই যাত্রাগানের একটি গান তাঁর বহুদিন মনেছিল। গানটির অংশবিশেষ নিম্নরূপ :

কালনিদ্রা কেন অঙ্গে এলি।

তোর কি এত ধার, ছিল রে রাধার

রাধার মূলাধার কোথায় লুকালি।

ঢাকায় রাধামাধব নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রকে প্রত্যক্ষ করেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর পিতৃদেব দুর্গাদাস করের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। দীনবন্ধু ঢাকায় কর্মোপলক্ষ্যে অবস্থানকালে তাঁর নীলদর্পণ নাটক মুদ্রিত করেন। নাটকটির মুদ্রণ ব্যাপারে রাধামাধব একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিবেশন করেছেন তাঁর স্মৃতিকথায়।^৮ তিনি লিখেছেন : “দীনবন্ধু বাবুর সঙ্গে বাবার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। ঢাকার একটি ছাপাখানায় ‘নীলদর্পণ’ মুদ্রিত হইতেছিল। প্রত্যহ রাত্রি ৯।১০ টার সময় দীনবন্ধু বাবু আমাদের বাসায় আসিতেন; বাবা তাঁহাকে লইয়া তাঁহার নিজের শয়ন ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া দুজনে নীলদর্পণের প্রুফ সংশোধন করিতেন।”

রাধামাধব তাঁর উক্ত স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন, শৈশবকালেই তিনি লাফালাফি, ঘোড়ায় চড়া, বন্ধুক ছোঁড়া প্রভৃতি ব্যাপারে দক্ষতা অর্জন করেন। তাঁর লেখাপড়ার প্রতি বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে মাত্র নয় বৎসর বয়সে রাধামাধবকে কলকাতার ট্রেনিং স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হলে, দেখা গেল, তাঁর পড়ায় মন নেই। তাঁর মন পড়ে থাকত সংগীতচর্চায় ও বাঁশি বাজানায়। ঐ স্কুলের ছাত্রাবস্থায় ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি তাঁর পিতৃবন্ধু ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের কাছ থেকে একটি ফুলটোঁবাঁশি উপহার পান। ঈশ্বরচন্দ্র ওই বাঁশি বাজানায় ওস্তাদ ছিলেন। তিনি কেমন করে ওই বাঁশি বাজাতে হয়, তা শিখিয়ে দেন রাধামাধবকে। তিনি সেই বাঁশি স্কুলে যাওয়ার সময় পকেটে করে নিয়ে যেতেন। পড়াশোনায় মন নেই দেখে রাধামাধবের পিতৃদেব তাঁকে ট্রেনিং স্কুল থেকে নাম কাটিয়ে ভর্তি করে দেন হেয়ার স্কুলে। এই স্কুলে রাধামাধব প্রথম শ্রেণিতে উঠেই চলে আসেন হিন্দু স্কুলে। হেয়ার স্কুলে পড়ার সময় তিনি জড়িয়ে পড়েন দাঙ্গায়। এই সময় স্কুলে স্কুলে দাঙ্গা হত। দাঙ্গাগুলি হত প্রতি শনিবার এবং ছুটির দিনে। রাধামাধবের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায় দাঙ্গা বেশি হত জেনারেল অ্যাসেম্ব্লির ছাত্রদের সঙ্গে হেয়ার ও হিন্দুর। হেয়ার স্কুলের দাঙ্গায় দলপতি ছিলেন স্বয়ং রাধামাধব। দাঙ্গার সময় তাঁর পালোয়ান বন্ধুরা এসে হাজির হত। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দের গ্রীষ্মের ছুটিতে অনুষ্ঠিত এই প্রবলদাঙ্গার কথা লিখেছেন রাধামাধব তাঁর স্মৃতিকথায়।

হিন্দুস্কুলে ভর্তি হবার পরই সেই স্কুলের তৎকালীন প্রধানশিক্ষকের নির্দেশে রাধামাধবকে স্কুল ছাড়তে হয়। তখন তাঁকে ভর্তি করে দেওয়া ডাফ সাহেবের স্কুলে। এই স্কুল থেকেই তিনি এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেবেন ঠিক ছিল। কিন্তু রাধামাধব পরীক্ষার ফিসের টাকা দিয়ে কিনলেন একটি বাঁশি। এখানেই তাঁর ছাত্রজীবনের সমাপ্তি ঘটল।

২

স্কুলের ছাত্রাবস্থায় রাধামাধব স্কুলের পড়া অপেক্ষা বেশি নজর দিতেন গানবাজনা, কবিতা আবৃত্তি ও যাত্রাপালার প্রতি। তিনি তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে কবিতা আবৃত্তি করতে বেশি পছন্দ করতেন। তাঁদের আবৃত্তির তালিকায় ছিল *মেঘনাদবধ কাব্য*, *নীলদর্পণ*, *স্বর্ণশঙ্কল* নাটক প্রভৃতি। তখন কলকাতায় যাত্রার খুব প্রচলন ছিল। যাত্রা তখন অনাদৃত ছিল না। বেশ কয়েকটি যাত্রার দল ছিল তখন কলকাতায়। রাধামাধব তাঁর স্মৃতিকথায় বেশ কিছু যাত্রার দলের উল্লেখ করেছেন।^৭ এসব যাত্রাপালার অনুষ্ঠানে নিয়মিত হাজিরা দিতেন রাধামাধব। যাত্রার গানগুলি তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুনতেন। এই রকম গানের উল্লেখ তিনি করেছেন তাঁর স্মৃতিকথায়। গানটি ছিল বৌ মাষ্টারের দলের *ঋচরিত্র* পালার। গানটি নিম্নরূপ:

রাজ-সিংহাসনে বসিতে বাসনা কোরো না।

জন্মজন্মান্তরে পুণ্যপুঞ্জ কোরে,

জন্মাইতে পারো যদি মম উদরে,

তবু হয় কি না হয়,—

আমার উত্তমকুমার আছে জানো না।

এই গানটি শোনার অভিজ্ঞতা রাধামাধব ব্যক্ত করেছেন নিম্নোক্ত ভাবে:

আমি এত নিবিষ্ট চিহ্নে সেই গান শুনলাম যে তৎক্ষণাৎ সুরতাল লয়-সুদ্ধ সেই গান আমার কণ্ঠস্থ হইয়া গেল।

যাত্রা ছাড়াও, তখন ব্যাপক প্রচলন ছিল কবিগানের। রাধামাধব তাঁর স্মৃতিকথায় একটি কবিগানের আসরের উল্লেখ করেছেন, যেখানে স্বয়ং কবি ঈশ্বর গুপ্ত (১৮১১-১৮৫৯) অংশ নিয়েছিলেন। তখন রাধামাধব নিতান্তই শিশু।

এন্ট্রান্স পরীক্ষার দিনের টাকায় বাঁশি কেনার কথা রাধামাধবের পিতার কানে গেল। তিনি তাঁকে বিষম ভাবে লালিত করেন। তিনি সিদ্ধান্ত নেন, গৃহত্যাগ করে তিনি বিলাতে পাড়ি দেবেন। এই পাড়ি দেবার ব্যাপারটি রাধামাধব তাঁর দাদা রাধাগোবিন্দ কর ও অন্যান্যবন্ধুদের কাছে ব্যক্ত করে পরামর্শ গ্রহণ করেন। পিতার লোহার সিন্দুক থেকে পাঁচহাজার টাকার নোট তুলে নিয়ে মাতার চোখে ধুলো দিয়ে রাধামাধব হাওড়া স্টেশনে গিয়ে ট্রেনে চাপেন। সারারাত্রি ট্রেনে আহার নিদ্রা তুলে তিনি গান গেয়েছেন। অবশেষে যখন ট্রেনটি জামালপুর স্টেশনে পৌঁছাল তখন স্টেশন মাস্টার, গার্ড ও পাহারাওয়ালারা মিলে রাধামাধবকে ট্রেন থেকে নামিয়ে কলকাতা পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। বিলাত যাত্রার পথ তাঁর চোখের সামনেই রুদ্ধ হয়ে গেল।

এবার রাধামাধব বই ছেড়ে বাঁশি ধরলেন। বাঁশিই তখন তাঁর ধ্যানস্থান। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন দেশীয় সংগীতের প্রতি অনুরাগী। তাঁর গুরুজনেরা এই অনুরাগ সম্বন্ধে অন্ধকারে ছিলেন। তখন কলকাতায় ব্যাপক প্রচলন ছিল পাঁচালীর। কলকাতার তৎকালীন ধনীগৃহে পাঁচালীর খুব কদর ছিল।

পুরাতন প্রসঙ্গ গ্রন্থে রাধামাধব, ৩ মাঘ ১৩২৩ বঙ্গাব্দ তারিখে যে আত্মকথা লিপিবদ্ধ করেছেন, তাতে জানাচ্ছেন, তিনি শীঘ্রই কলকাতা ত্যাগ করে কাশীবাসী হতে যাচ্ছেন। এই তারিখের স্মৃতিকথায় তিনি সখের থিয়েটারের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। তিনি যখন স্কুলের ছাত্র, তখন তিনি সখের থিয়েটারে গিয়ে অভিনয় দেখতেন। সখের থিয়েটার তখন কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। সখের থিয়েটারে তিনি যখন মঞ্চে আছেন তখনই তিনি জিমন্যাসটিকের মোহে পড়েন। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের দুর্গাপুজায় শোভাবাজারের রাজবাড়িতে পীটার সাহেবের জিমন্যাস্টিক দেখেন রাধামাধব। এই জিমন্যাস্টিক দেখে তিনি উৎসাহিত হন একটি জিমন্যাস্টিক ক্লাব তৈরির ব্যাপারে। তিনি সঙ্গে পেলেন তাঁর দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধু যোগেন্দ্রনাথ মিত্র ও শ্যামাচরণ ঘোষকে। শ্যামবাজারের ১০৭ নম্বর বাড়ির একটা ঘরের কড়িকাঠে দড়ি টাঙিয়ে তাঁরা জিমন্যাস্টিক শুরু করেন। রুট লেজ-এর Manual Exercises নামে একটি ব্যায়ামের বই কেনা হল। তারপর তাঁরা শ্যামবাজার স্ট্রিটের ৫০ নম্বর বাড়ির উঠানে ব্যায়ামের ব্যবস্থা করেন। তাঁদের তখন কোনো ওস্তাদ শিক্ষক ছিলেন না। তৎকালীন কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ওভারসিয়ার ডিসেন্ট সাহেব এসে তাঁদের ব্যায়াম শিক্ষা দিয়ে যেতেন। তখন পাড়ার অনেক ছেলে এসে জুটল রাধামাধবদের দলে। রাধামাধব কতকগুলি খেলা আয়ত্ত করেন। যেমন, জলপূর্ণ ঘড়ায় দড়ি বেঁধে দাঁতে করে তোলা; হোরাইজনটাল করে পা লাগিয়ে ঘুরতে ঘুরতে হাত পা ছেড়ে দশহাত দূরে সোজা হয়ে দাঁড়ান প্রভৃতি। ইতিমধ্যে তিনি দেখে এসেছেন উইলসনের সার্কাস। এই সার্কাস দেখেও তিনি কয়েকটি খেলা শিখে নেন। ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে রাধামাধবের জিমন্যাস্টিক দলের প্রথম Public Performance হল। সেই উপলক্ষ্যে বাজনার ব্যবস্থাও হল। এই বাজনার সূত্রেই রাধামাধবের দলে এসে ভিড়লেন পরবর্তীকালের ন্যাশান্যাল থিয়েটারের সেক্রেটারি ও অন্যতম সংগঠক নট নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫০-১৮৮২)। তৈরি হল একটি কনসার্ট দল। এই দলে ঢোল বাজাতেন নগেন্দ্রনাথ, বেহালা যোগেন্দ্রনাথ মিত্র এবং বাঁশি বাজাতেন রাধামাধব। কনসার্ট দলের নাম রাখা হল Bagbazar Amateur Concert। দলটির ঠিকানা ছিল ৫৭ নম্বর রামকান্ত বোসের স্ট্রিট। কনসার্ট দলের মাষ্টার ছিলেন কম্বুলিয়াটোলার গিরিশ মিত্র।^৮

কনসার্ট দল যখন গঠিত হয়, তখন রাধামাধব স্কুলের ছাত্র। তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন, স্কুলের ছুটির পর তাঁরা পোষাক তৈরি করতেন। স্কুলের টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে পোষাক তৈরির খরচ জোগান দিত। কনসার্ট দলের প্রথম অনুষ্ঠান হয় পাথুরিয়াঘাটার জর্জ অনুকুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে। তারপর আরও দুই বাড়িতে রাধামাধবের দল নিমন্ত্রিত হয়। সেই দুটি বাড়ি হল—জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় ও হেমচন্দ্র করের।

১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে বাগবাজারের রাজবল্লভপাড়ায় যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে একটি নাট্যসম্প্রদায় গঠিত হয়। এই দল তখন অভিনয় করে একটি নাটক ও একটি প্রহসন। নাটকটি রামনারায়ণ তর্করত্নের *রত্নাবলী* এবং প্রিয়মাধব বসুমন্ডিকের একটি প্রহসন। প্রহসনটি লেখা হয় আর একটি প্রহসনকে ব্যঙ্গ করার জন্য। সেই প্রহসনটির নাম *কিছুকিছু বুঝি*। প্রহসনটি অভিনীত হয় জোড়াসাঁকো মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কয়লাহাটার বাড়িতে। অভিনয় তারিখ ২ নভেম্বর ১৮৬৭। *রত্নাবলী* ও প্রিয়মাধব বসুমন্ডিক রচিত প্রহসনটি অভিনীত হয় ১২৭৪ বঙ্গাব্দের শেষার্ধ্বে।^৯

রাধামাধব কর তাঁর স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন *রত্নাবলী* ও প্রহসনটি অভিনীত হয় বাগবাজারের

প্রিয়মাধব ঘোষের বাড়িতে। *রত্নাবলী*র অভিনয়ে কনসার্ট বাজানোর দায়িত্ব ছিল রাধামাধবদের কনসার্ট দলের। রাধামাধব লিখেছেন^{১১} :

প্রিয়মাধব ঘোষের বাড়ীতে রত্নাবলী নাটক অভিনীত হইবার সময় আমরা বাজাইয়া ছিলাম।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য *রত্নাবলী*র অভিনয়ে অংশ নেন রাধামাধবের কনসার্ট দলের নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সংবাদ পরিবেশন করেছেন ব্যোমকেশ মুস্তাফী তাঁর বঙ্গীয় রঙ্গালয় শীর্ষক পুস্তিকায়।

*রত্নাবলী*র অভিনয়ের রাত্রে, রাধামাধবদের কনসার্ট দলে এসে যোগ দেন ধর্মদাস সুর (১৮৫২-১৯১০) ও অর্ধেন্দ্রশেখর মুস্তাফী।

রাধামাধব যখন জিমন্যাসটিক দল নিয়ে মেতেছিলেন, তখন তাঁর মনে বাসনা জাগে ভলানটিয়ার হবার। ‘সেখের সেনা’ হয়ে স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব নেবার তাগিদে বেশ কয়েকজন বঙ্গীয় যুবক তৎকালীন সেনাপতির কাছে আবেদন পত্র প্রেরণ করেন। এই যুবকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্বাক্ষরকারী হিসেবে ছিলেন রাধামাধব বাদে, তাঁর দাদা রাধাগোবিন্দ কর, উপেন্দ্রনাথ দাস, যোগেন্দ্রনাথ মিত্র, উমেশচন্দ্র বটব্যাল প্রভৃতি। দুঃখের বিষয়, সেনাপতির কাছ থেকে তখনই কোনও সাড়া আসেনি। এসেছিল নাকি আবেদনের পঞ্চাশ বছর পরে। তখন সেনাপতির আহ্বানে উৎসাহিত হবার মানসিকতা রাধামাধব হারিয়ে ফেলেন।

রাধামাধব যখন জিমন্যাসটিক নিয়ে ব্যস্ত তখন বাগবাজারের বসুপাড়ায় একটি সেখের যাত্রাদল গঠিত হয়। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত এই যাত্রাদলে ছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২) নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ধর্মদাস সুর এবং রাধামাধব কর। এই যাত্রাদলে অভিনয়ের জন্য গৃহীত হয় মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-১৮৭৩) *শর্মিষ্ঠা* নাটক। গিরিশচন্দ্র এবং উমেশচন্দ্র চৌধুরী এই যাত্রাপালার জন্য গান রচনা করেন।

বাগবাজারের উল্লিখিত যাত্রাদল প্রায় বছর ধরে *শর্মিষ্ঠা* অভিনয় চালিয়ে যান। তারপরই গিরিশচন্দ্র নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটি থিয়েটার প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দেন। অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর *গিরিশচন্দ্র গ্রন্থে*^{১২} এই প্রসঙ্গে লিখেছেন : “প্রায় বৎসরাধিককাল বাগবাজারে মাঝে মাঝে ‘শর্মিষ্ঠা’র অভিনয় হইত। গিরিশচন্দ্র যে আশা এতকাল ধরিয়া হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন তাহা এক্ষণে ফলবতী হইবার উপায় হইল। তিনি নগেন্দ্রবাবুর সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন, এইত যাত্রায় বেশ সুখ্যাতিলাভ করা গেল, ... একটা থিয়েটারের দল বসান যাক। নগেন্দ্রবাবু বলিলেন, ‘দৃশ্যপট ও পোষাক-পরিচ্ছদে বিস্তর খরচ পড়িবে, যে টাকা কি আমরা সম্বলান করিতে পারিব?’ নানা নাটকভিনয়ের কথা উত্থাপিত হইল, কিন্তু পরিচ্ছদের বাহুল্য বুঝিয়া তাহা পরিত্যক্ত হইতে লাগিল। বহুচিন্তার পর গিরিশবাবু দীনবন্ধুবাবুর ‘সধবার একাদশী’ অভিনয়ের প্রস্তাব করিলেন।”

নগেন্দ্রনাথসহ সকলেই গিরিশচন্দ্রের থিয়েটার স্থাপনের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। প্রস্তাবিত থিয়েটারের নাম রাখা হয়—বাগবাজার এ্যামেচার থিয়েটার। রাধামাধব তাঁর স্মৃতিকথায়^{১৩} এই থিয়েটার প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে লিখেছেন : “নগেন বলিলেন—‘ওরা যাত্রা করেছে, এস আমরা থিয়েটার করি। তাহার কথায় আমরা সকলেই নাচিয়া উঠিলাম। নগেন থিয়েটারের সবই জানে, কারণ সে যে ‘পদ্মাবতী’ নাটকে নিজে অভিনয় করিয়াছে। গিরিশবাবুর পরামর্শে ‘সধবার একাদশী’ অভিনয় করিবার ব্যবস্থা হইল। শনি-রবিবারে তালিম দেওয়া আরম্ভ হইল। বাগবাজারে দুর্গাচরণ মুখুজ্যের

পাড়ায় প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বাড়িতে স্টেজ বাঁধিয়া সপ্তমীপূজার দিন ‘সধবার একাদশী’ অভিনীত হইল।”

বঙ্গীয় রঙ্গালয়-এর লেখক ব্যোমকেশ মুস্তাফী বাগবাজার এ্যামেচার থিয়েটার স্থাপনের প্রথম এবং প্রধান পরামর্শদাতারূপে গিরিশচন্দ্রের নামই উল্লেখ করেননি। নগেন্দ্রনাথের মাথা থেকে যে ওই থিয়েটার প্রতিষ্ঠার চিন্তার প্রকাশ ঘটে, একথা জানিয়ে ব্যোমকেশ তাঁর উল্লিখিত রচনায় লিখেছেন : “শহরের সর্বত্র বাগবাজারের বাজনার দলের সুখ্যাতি বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। কাজেই তাহা পুরাতন বোধ হইতে লাগিল। আমাদের নতুনত্ব না হইলে আর তৃপ্তি হইতেছিল না ও ভাল লাগিতেছিল না। এই অবস্থায় নগেন্দ্রবাবু নিজে একটা থিয়েটারের দল বসাইবার পরামর্শ করিলেন।”

নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাবিত থিয়েটারে প্রথমত এসে যোগ দিলেন রাধামাধবসহ তাঁর কনসার্ট দলের অনুরা, বীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন—ধর্মদাস সুর, মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আপালচন্দ্র বিশ্বাস, ঈশানচন্দ্র নিয়োগী, অরুণচন্দ্র হালদার, মহেন্দ্রনাথ দাস, নগেন্দ্রনাথ পাল, নীলকণ্ঠ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি। এইদলে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানান হয় অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী ও গিরিশচন্দ্রকে। অর্ধেন্দুবাবুকে ডাকা হয় পরে। তাঁকে দেওয়া হয় নাট্যশিক্ষকতার দায়িত্ব। শেষে কেন্দ্রারাম চরিত্রে অভিনয়ের ভারও তিনি পান। প্রথমে এই চরিত্রে অভিনয়ের জন্য নির্বাচিত হন নীলকণ্ঠ গঙ্গোপাধ্যায়। কিন্তু তিনি চরিত্রপরিষ্কৃতিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এই চরিত্রের জন্য নির্বাচন করা হয় অর্ধেন্দুশেখরকে।

বাগবাজার এ্যামেচার থিয়েটারে দীনবন্ধু মিত্রের *সধবার একাদশী* প্রথম অভিনীত হয় ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দের সপ্তমী পূজার দিন। এই অভিনয়ে রামমাণিক্যর ভূমিকা গ্রহণ করেন রাধামাধব। এই তাঁর প্রথম মঞ্চাবতরণ। ইতিপূর্বে তিনি *শর্মিষ্ঠা* যাত্রাপালার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তারও আগে তিনি ছাত্রজীবনে একটি ইংরেজি নাটকের অভিনয়ে অংশ নেন। ইংরেজি নাটকটির নাম *Beauty and the Beast*। নাটকটি মঞ্চস্থ হয় শোভাবাজারের স্যার রাজা রাধাকান্ত দেবের (১৭৭৪-১৮৬৭) প্রদৌহিত্র রাখালচন্দ্র মিত্রের উদ্যোগে শ্যামলাল মিত্রের বৈঠকখানায়। সেই অভিনয়ে সীনের অভাব মেটান হয় পর্দা দিয়ে। সেই পর্দায় কখনও লেখা হয় উদ্যান, কখনও রাজবাটি প্রভৃতি। সেরকম লিখে বাগান বা রাজপ্রাসাদ বোঝান হয়।

বাগবাজার এ্যামেচার থিয়েটারে *সধবার একাদশী*র প্রথম ভূমিকাবন্টনের সময় রাধামাধবকে দেওয়া হয় কাঞ্চনের ভূমিকা। কিন্তু অর্ধেন্দুশেখর দলে নাট্যশিক্ষকতার দায়িত্ব নিয়ে এসে তিনি রাধামাধবকে কাঞ্চনের পরিবর্তে দেন রামমাণিক্যের ভূমিকা। এই থিয়েটারে *সধবার একাদশী* মোট সাতবার অভিনীত হয়। শেষ অভিনয় অনুষ্ঠিত হয় চোরবাগানের লক্ষ্মী নারায়ণ দত্তের বাড়িতে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের দুর্গাপূজার সময়। এই অভিনয়ের শেষে এখানে ওই দিন মঞ্চস্থ হয় দীনবন্ধু মিত্রের *বিয়ে পাগলা বুড়ো*। রাধামাধব কর প্রহসনটিতে গ্রহণ করেন রত্না নাপতের ভূমিকা।^{১৪}

রাধামাধব তাঁর স্মৃতিকথায় *সধবার একাদশী*র চতুর্থ অভিনয়ের বর্ণনা প্রসঙ্গে জানিয়েছেন যে, ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দের^{১৫} শ্রীপঞ্চমীর দিনে রায় রমাপ্রসাদ মিত্র বাহাদুরের ভবনে মঞ্চ নির্মাণ করে যে অভিনয় হয়, সেই অভিনয় দেখতে আসেন দীনবন্ধু মিত্রের সঙ্গে তাঁর পিতৃদেব দুর্গাদাস কর। এই দিনকার অভিনয়ে অর্ধেন্দুশেখর কেন্দ্রারামের পরিবর্তে গ্রহণ করেন কর্তার ভূমিকা।

রাধামাধব তাঁর স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন *সধবার একাদশী*র তৃতীয় অভিনয় দেখতে আসেন মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ। এই অভিনয় অনুষ্ঠিত হয় এটর্নী দীননাথ বসুর বাড়িতে। রাধামাধব

লিখেছেন^{১৬} : “সে রাত্রিতে মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ আমাদের অভিনয় দেখিয়া বলিলেন— তোমরা বেশ প্লে করেছ, কিন্তু তোমাদের স্টেজ ভাল নয়।”

সম্ভবার একাদশীর অভিনয় যখন স্মৃতির শিখরে আরোহন করল, তখন বাগবাজারের বসুপাড়ায় গতিনাথ দত্তের বাড়ির শর্মিষ্ঠা যাত্রাপালার দল বাগবাজার এ্যামেচার থিয়েটারের লোকদের বিদ্রুপ করেন। এই বিদ্রুপের বর্ণনা প্রসঙ্গে রাধামাধব তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন^{১৭} :

আমাদের সুখ্যাতি শুনিয়া ‘শর্মিষ্ঠা’ ওয়ালারা বিদ্রুপ করিয়া বলিল—‘ওঃ ভারিতে বাহাদুরি করেছ। ছবি একে পর্দার আড়ালে গুরুকম নাচি গান তো সকলেই করতে পারে। আমাদের মত খোলাআসরে যাত্রা করতে পারতো বুঝি।’ আমদপুর হইতে যাত্রার সাট মিলাইয়া পনের দিনের মধ্যে আমরা যাত্রাগানের আসরে নামিলাম। উষা অনিরুদ্ধ পালায় আমি উষা সাজিলাম; হিন্দুল খাঁর সুরে গিরিশবাবু গান বাঁধিয়া দিলেন। মহেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অনিরুদ্ধ সাজিলেন। মতিলাল সুর হইলেন বানরাজা। আমার একটি গানের দুই ছত্র মনে পড়িতেছে—

যামিনীতে একাকিনী ঘুমঘোরে অচেতন,

হেরিনু স্বপনে সখি পুরুষ রতন।

কলিকাতার একটি গল্পির ভিতরে একই দিনে দুই পৃথক আসরে ‘শর্মিষ্ঠা’ ও ‘উষা অনিরুদ্ধ’ যাত্রা গাওয়া হইল। উভয়ের মধ্যে ৩।৪ খানি বাড়ির ব্যবধান ছিল মাত্র। আমাদের পালা খুব জাঁকিয়া উঠিল। আমরা দৃষ্টান্তি করিয়া কয়েক টুकरা কাগজে দুই ছত্রে একটি কবিতা লিখিয়া ‘শর্মিষ্ঠা’ ওয়ালাদের আসরে ফেলিয়া দিয়া আসিলাম,—

সাগর পাব বলে তার বড় ছিল আঁটুনি,

সে বোল ফুরাল, এখন কি বলে তা শুনি।

তাহারা হিন্দুল খাঁর সম্পর্ক লইয়া একটি বিদ্রুপাত্মক গান রচনা করিল। গানটি আমার মনে নাই; তার ভাবার্থ এই যে আমরা অত্যন্ত অপদার্থ, যেহেতু আমরা মুসলমানের হস্তে উষাকে সমর্পণ করিলাম। গিরিশবাবু তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন—

ভেলারে ধনটা আমার জাহির করলি কারদানি।

নিই নি উষার বিয়ের ভার, করেছি হরণ,

হরণ করলে পাগুনা ঠাণ্ডর ধন্য তোরে বাখানি।।

ইহার উত্তরে শর্মিষ্ঠা-ওয়ালারা গিরীশবাবুর উদ্দেশে ‘ঘরে তোর ন্যাংটা দিগ্ধর’ বলিয়া যেতীত্র শ্রেষপূর্ণ গান রচনা করিল, তাহাতেই আমরা হটিয়া গেলাম।

রাধামাধবদের যাত্রার দল মোট ৪।৫বার আসর বসাবার পর ভেঙ্গে যায়। ইতিমধ্যে প্রকাশ পেয়েছে দীনবন্ধু মিত্রের লীলাবতী। সম্ভবার একাদশী অভিনয় চলাকালীন বাগবাজার এ্যামেচার থিয়েটারে শুরু হয় লীলাবতীর মহলা। এই থিয়েটার প্রথম লীলাবতীমঞ্চস্থ করে ১১মে ১৮৭২। অভিনয় অনুষ্ঠিত হয় শ্যামবাজারের রাজেন্দ্রনাথ পালের বহির্বাটির প্রাঙ্গণে। দৃশ্যপট নির্মাণের দায়িত্বে ছিলেন রাধামাধবের বন্ধু যোগেন্দ্রনাথ মিত্র। তিনি পুরাতনপ্রসঙ্গ গ্রন্থে যে আত্মকাহিনী^{১৮} বিবৃত করেছেন, তা থেকে জানা যায়—

পালের বাড়িতে ‘লীলাবতী’ অভিনীত হইবার পূর্বে স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গে স্টেজ ও সীন সম্বন্ধে আমাদের অনেক কথাবার্তা হয়। তিনি বলিলেন, ‘তোমাদের এই শুটান সীন-এ সবঘটনা ভাল করিয়া দেখান হয় না; সরান সীন আবশ্যক। যদি ভাল করিয়া স্টেজ করিতে চাও, ময়দানে গিয়া অলিম্পিক থিয়েটার দেখিয়া আইস।’.....যথারীতি টিকিট কিনিয়া ময়দানের থিয়েটারে আমরা ম্যাকবেথের অভিনয় দেখিয়া আসিলাম। ...আমার ঝাঁক হইল উহাদের স্টেজের অনুকরণে, আমি সীন করিতে শিখিব। আমাদের সাবেক ধরনের শুটান সীন-এ দরজা খোলা দেওয়া ইত্যাদি দেখান সম্ভবপর ছিল

না। আমি ময়দানে আমাদের তাঁবু হইতে অলিম্পিক থিয়েটার-ওয়ালাদিককে পত্র লিখিলাম। তাঁহাদের স্টেজের ভিতরে আমাকে অনুগ্রহ করিয়া যদি প্রবেশ কবিতো দেন, তাহা হইলে আমি কৃতার্থ হই। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। অল্পদিনের মধ্যেই আমি সমস্ত শিখিয়া লইলাম। কেমন করিয়া নৌকা ভাসান দেখাইতে হয় আকাশ পথে মানুষ অন্তর্হিত হইতে পারে। বিদ্যুৎ নির্ঘোষ, বৃষ্টিপাত প্রভৃতি সমস্তই আয়ত্ত করিলাম। রাজেন্দ্র পালের বাড়িতে স্টেজ রচিত হইতে বিলম্ব হইল না।

রাধামাধব তাঁর স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন, স্টেজ নির্মাণের পর গীতগোবিন্দ গায়ক মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রস্তাব দেন টিকিট বিক্রির মাধ্যমে অভিনয় হোক। এই পরামর্শ অনেকের কাছে গ্রহণীয় বলে বিবেচিত হয়। নাট্যশালা চালাতে গেলে অর্থের প্রয়োজন। রাধামাধব জানিয়েছেন, ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে জনসাধারণের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু চাঁদা আদায় হয়নি। কলকাতার তৎকালীন ধনীগৃহস্থ বাড়ির লোকেরা চাঁদা তোলার ব্যাপারে ‘বিদ্রূপ ও টিটকারী’ করেন। অবশ্য চাঁদা কিছু সংগৃহীত হয়েছিল। অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর *গিরিশচন্দ্র গ্রন্থে* জানিয়েছেন^{১৯} :

অবশেষে পাড়াপ্রতিবাসী ও বন্ধুবান্ধবগণের মধ্যে চাঁদা তুলিয়া সামান্য যাহা জমিয়াছিল। গোবর্ধন পোটো রাজপথের সীন আঁকিয়া দিয়া তাহা নিঃশেষ করিয়া দেয়। সম্প্রদায় হতাশ হইয়া পড়িলেন।

আর্থিক দুশ্চিন্তা মাথায় নিয়েই বাগবাজার এ্যামেচার থিয়েটার কর্তৃক মঞ্চস্থ হল *লীলাবতী*। এই অভিনয়ে ক্ষীরোদবাসিনীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন রাধামাধব।

১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের সপ্তমী পূজার দিন যখন *সধবার একাদশী*র সঙ্গে *বিয়ে পাগলা বৃড়া* অভিনীত হয়, সেসময় কিছুদিনের জন্য রাধামাধব মালদহে অবস্থান করছিলেন। তাঁকে সেখান থেকে ডেকে আনা হয়। তারপর *লীলাবতী* অভিনয়ের পর পুনরায় তিনি কলকাতা থেকে দূরে ছিলেন।

লীলাবতী পরপর তিনবার মঞ্চস্থ হয়। ১৬ আষাঢ় ১২৭৯ তারিখের *মধ্যস্থ* এবং ২৪ মে ১৮৭২ তারিখের *এডুকেশন গেজেট* পত্রিকায় *লীলাবতী*র অভিনয়ের বিস্তৃত সমালোচনা প্রকাশিত হয়। এই সমালোচনায় স্থান পেয়েছিল রাধামাধবের ক্ষীরোদবাসিনী চরিত্রে অভিনয়ের প্রশংসা। *মধ্যস্থ* পত্রিকায় লেখা হয় : “ক্ষীরোদবাসিনীর বিলাপলহরী এতস্বাভাবিক ও ভাবপূর্ণ হইয়াছিল যে তচ্ছবণে দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে অনেকেরই হৃদয় আর্দ্র হইয়াছিল।”

এডুকেশন গেজেট পত্রিকার অভিমত ছিল নিম্নরূপ : “কর্তার বধুমাতা দুঃখিনী ক্ষীরোদবাসিনীর অভিনয় আদ্যন্ত কোনস্থানেই সদৌষ বোধ হয় নাই। পঞ্চম অঙ্কের প্রথম গর্তাঙ্কে তাহার দুঃখশ্রবণে অনেক শ্রোতাকে অশ্রু-বিসর্জন করিতে হইয়াছিল। তাহার অঙ্গ সৌষ্টব ও কথাবার্তা অনেকটা স্ত্রীলোকের ন্যায় হইয়াছিল।”

রাধামাধব ইতিপূর্বে *সধবার একাদশী*তে রামমাণিক্যের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন, সেই অভিনয়ও যে সুশ্রাব্য হয়েছিল, সে কথা স্বীকার করেছেন ব্যোমকেশ মুস্তাফী তাঁর *বঙ্গীয় রঙ্গালয়ে*। তিনি *সধবার একাদশী*র দ্বিতীয় অভিনয় দর্শন করে মন্তব্য করেন : “তাহার পর কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রিতে (১৮৬৮) গিরিশবাবুর শ্বশুরালয়ে অভিনয়ের ব্যবস্থা হইল। এই অভিনয়ে অর্ধেন্দুবাবু, গিরিশবাবু, নগেন্দ্রবাবু ও রাধামাধববাবু বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করেন।”

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর *বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস গ্রন্থে* *সধবার একাদশী*র দ্বিতীয় অভিনয়ের প্রসঙ্গে লিখেছেন^{২০} : “পরবর্তী কোজাগরী পূর্ণিমার নিশীথে শ্যামপুকুরে নবীনচন্দ্র

সরকারের বাড়িতে আর একটি অভিনয় হয়, এই অভিনয় দেখিয়া সকলেই সন্তুষ্ট হন।”

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, বাগবাজার এ্যামেচার থিয়েটার যখন *লীলাবতী*-র মহলা শুরু করে, তখন দলটির নামপরিবর্তন করে রাখা হয় শ্যামবাজার নাট্যসমাজ। কিন্তু *লীলাবতী* অভিনয়ের পর দলটির নাম পুনরায় পালটে রাখা হয় ন্যাশান্যাল থিয়েটার। *লীলাবতী* অভিনয়ের সময় শ্যামবাজার নাট্যসমাজ-এ এসে যোগ দেন হিন্দুমেলার সম্পাদক নবগোপাল মিত্র (১৮৪০-১৮৯৪)। তিনিই প্রস্তাব দেন দলটির নাম দি ক্যালকাটা ন্যাশান্যাল থিয়েটার রাখার। মতিলাল সুর ক্যালকাটা অংশ বাদ দিয়ে রাখেন দি ন্যাশান্যাল থিয়েটার।

শ্যামবাজার নাট্যসমাজের অভিনেতারা টিকিট বেচে অভিনয়ের প্রস্তাব দিলে, গিরিশচন্দ্র সে প্রস্তাবে সম্মতি দিতে চাননি। তিনি বলেন, ন্যাশান্যাল থিয়েটার স্থাপন করার মতো সম্মতি এখনও অনায়ত্ত। কিন্তু তার অসম্মতি গ্রাহ্য হয় নি। তিনি দলত্যাগ করেন। তাঁর সঙ্গে দলত্যাগ করেন সুরেশচন্দ্র মিত্র, যোগেন্দ্রনাথ মিত্র, নন্দলাল ঘোষ, মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির সঙ্গে রাধামাধব কর। কথা ছিল ন্যাশান্যাল থিয়েটারে *নীলদর্পণ* নাটকের অভিনয়ে রাধামাধব গ্রহণ করবেন সৈরিন্ধীর ভূমিকা। তিনি থিয়েটার ত্যাগ করার পর ওই ভূমিকা গ্রহণ করেন থিয়েটারে নবাগত নট রসরাজ অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯)।

এই সময় বাগবাজারে একটি সখের যাত্রাদলের সৃষ্টি হয়। গিরিশচন্দ্র এইদলের জন্য একটি সঙ্গের পালা রচনা করেন। এই দলে যোগ দিয়ে ছিলেন রাধামাধব কর। তিনি শুধু সুঅভিনেতাই ছিলেন না ছিলেন সুগায়কও। তিনি অভিনয়ে গিরিশচন্দ্র রচিত ‘লুপ্ত বেণী বইছে তেরোধার’ শীর্ষক সুবিখ্যাত গানটি কবির সুরে গাইতেন। গানটি সম্পর্কে অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর গিরিশচন্দ্র গ্রন্থে^{২১} মন্তব্য করেছেন :

গানটি প্রয়াগের লুপ্তবেণী ত্রিধারা ভাগীরথীর কণাস্বর। গানটিতে ‘নীলদর্পণ’ সম্প্রদায়স্থ তৎকালীন প্রেসিডেন্ট হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক অভিনেতা ও উৎসাহদাতাগণের নাম অতি সুকৌশলে গ্রথিত আছে। গীতটি শ্রোয়াক্ষর হইলেও ইহা লইয়া উভয়পক্ষই বিলক্ষণ আমোদ উপভোগ করিয়াছিলেন। অভিনেতা গায়ক ও সংগঠক হিসেবে রাধামাধব সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কিন্তু তাঁর আর একটি পরিচয়ও ছিল। তিনি নাট্যশিক্ষকও ছিলেন। বাগবাজার এ্যামেচার থিয়েটার ও শ্যামবাজার নাট্যসমাজে যথাক্রমে অভিনীত *সধবার একাদশী* ও *লীলাবতী* নাটকের অন্যতম নাট্যশিক্ষক ছিলেন রাধামাধব। স্বয়ং গিরিশচন্দ্র তাঁর “বঙ্গীয় নাট্যশালায় নটচূড়ামণি স্বর্গীয় অর্ধেন্দ্রশেখর মুস্তফী” শীর্ষক নিবন্ধে জানিয়েছেন, “সধবার একাদশী ও লীলাবতী শিক্ষার দাবী শ্রীযুক্ত রাধামাধব করও রাখেন।”

১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের ৭ ডিসেম্বর ন্যাশান্যাল থিয়েটারে অভিনীত হয় দীনবন্ধু মিত্রের *নীলদর্পণ*। ইতিপূর্বে বলা হয়েছে রাধামাধব টিকিট বেচে থিয়েটার করার বিপক্ষে ছিলেন বলে। তিনি ন্যাশান্যাল থিয়েটারের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেন। তারপর তিনি কলকাতা ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যান। খুব সম্ভব মালদহেই তিনি চলে যান। এখানেই তাঁর অপেশাদার নাট্যজীবনের সমাপ্তি।

৩

রাধামাধব কলকাতা ত্যাগ করে বেশি দিন বাইরে থাকেননি। কলকাতায় ফিরে এলে তিনি পুনরায় থিয়েটারে যোগ দেন। পেশাদারি নটের জীবন চান না বলে যে রাধামাধব ন্যাশান্যাল থিয়েটারের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেন, তিনিই কিন্তু কলকাতায় এসে যোগ দেন পেশাদার থিয়েটারে। থিয়েটারটির

নাম দি গ্রেট ন্যাশান্যাল থিয়েটার। এখন এই থিয়েটারের ম্যানেজার ছিলেন রসরাজ অমৃতলাল বসু এবং ডিরেক্টর উপেন্দ্রনাথ দাস (১২৫৫-১৩০২ বঙ্গাব্দ)। রাধামাধব এই থিয়েটারে প্রথম অবতীর্ণ হন প্রকৃত বঙ্কু নাটকে। এই নাটকের রচয়িতা ব্রজেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী (হাট খোলার দিগু বাবু নামে পরিচিত)। প্রকৃতবঙ্কু প্রথম অভিনীত হয় ৮ জানুয়ারি ১৮৭৬। ওই দিনের স্টেটসম্যান পত্রিকার প্রকৃত বঙ্কুর অভিনয়ের নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়—

To-night! To-night!! To-night!!!
Greatnational Theatre
Prakrita Bandhu
By Baboo Brojendra Kumar Raichowdhury
(Digu Baboo of Hatkhola)
Doors open at 7 P.M.

প্রকৃতবঙ্কুর নায়ক ও নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন রাধামাধব কর ও বিনোদিনী। বিনোদিনী তাঁর ‘আমার অভিনেত্রী জীবন’ স্মৃতিকথায় এই অভিনয় সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, “হেমলতার পর আমাদের যে নতুন নাটকের অভিনয় হল তার নাম ‘প্রকৃতবঙ্কু’। এ নাটকে নায়ক সাজলেন স্বর্গীয় মাধুবাবু। ঐর পুরা নাম বাবু রাধামাধব কর। ইনি সুপ্রসিদ্ধ ডা. আর. জি. কর এর ভাই। আমি যখন থিয়েটারে যাই, তখন এই মাধুবাবুও আমাদের একজন শিক্ষক ছিলেন। ইনি অভিনেতাও ছিলেন ভাল, সুগায়কও ছিলেন। শিক্ষক বলেও ঐর খ্যাতি ছিল খুব। মাধুবাবু নায়ক, আমি বয়সে ছোট হলেও নায়িকা।” বিনোদিনীর এই স্মৃতিকথা পাঠে জানা যায়, প্রকৃতবঙ্কুর নাট্যকার ছিলেন রাধামাধবের বঙ্কু। সেই কারণে নাট্যকার তাঁর নাটকের নায়কের নাম রেখেছিলেন রাধামাধব।

গ্রেট ন্যাশান্যাল থিয়েটারে রাধামাধব দ্বিতীয় যে নাটকের অভিনয়ে অবতীর্ণ হন তার নাম রাজা বসন্ত রায়। তখন ওই থিয়েটারের অবৈতনিক ম্যানেজার ছিলেন কেশরনাথ চৌধুরী (?-১৮৯১)। বলাবাহুল্য, তিনিই ছিলেন নাটকটির নাট্যরূপদাতা। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য রাজা বসন্ত রায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বউ ঠাকুরাণীর হাট উপন্যাসের নাট্যরূপ। নাট্যরূপ দেন কেশরনাথ। রাজা বসন্ত রায় প্রথম মঞ্চস্থ হয় ৩ জুলাই ১৮৮৬। এই অভিনয়ের পূর্বে থিয়েটারটি প্রায় ছয় মাসের মতো বন্ধ ছিল। বন্ধ থাকার ইতিহাসটি এই রকম গ্রেট ন্যাশান্যাল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা (প্রতিষ্ঠা তারিখ ৩১ ডিসেম্বর ১৮৭৩) ছিলেন নিতান্ত নাবালক বয়সী নাট্যরসিক ভুবনমোহন নিয়োগী। তিনি ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দের ৬ অক্টোবর পর্যন্ত থিয়েটার চালিয়ে আর্থিক সংকটে বিব্রত হয়ে থিয়েটারটি লিজ দেন গিরিশচন্দ্র ঘোষকে। গিরিশচন্দ্র থিয়েটারের নতুন নামকরণ করেন—ন্যাশান্যাল থিয়েটার। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে গিরিশচন্দ্রের কাছ থেকে থিয়েটারটি নিলামে কিনে নেন প্রতাপচাঁদ জঙ্গী। প্রতাপচাঁদ গিরিশচন্দ্রকে ম্যানেজার করেন। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রতাপচাঁদের থিয়েটার জীবিত ছিল। তারপর পরিচালনা সম্পর্কিত ডামাডোলে থিয়েটারটি প্রায় ছয় মাসের মতো বন্ধ থাকে। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর পুনরায় থিয়েটারটির দ্বারোদ্বাটন হয় ৩ জুলাই ১৮৮৬। ওই দিন অভিনীত হয় রাজা বসন্ত রায়। থিয়েটারের অবৈতনিক সেক্রেটারি ও অবৈতনিক ম্যানেজার হন যথাক্রমে ভুবনমোহন নিয়োগী ও কেশরনাথ চৌধুরী।

৩ জুলাই ১৮৮৬ তারিখের স্টেটসম্যান পত্রিকায় রাজা বসন্ত রায়-এর অভিনয়ের নিম্নলিখিত
বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় :

FIRST OPENING NIGHT
Great
National Theatre
6 Beadon Street
Saturday, 3rd July 1886, at 9 P.M.
New Historical Tragedy
RAJA BASANTA RAI
From the 'Bow Thakurani's Haut' of
Baboo Rabindranath Tagore
For particulars see our play bills
By order of Managing committee
B.N.NEWGY, Honorary Secretary
K.N.CHOWDHURY, Honorary Manager

বিজ্ঞাপনে কেন 'ফার্স্ট ওপেনিং নাইট' বলা হয় তার কারণ এখন স্পষ্ট হল।

রাজা বসন্ত রায় নাটকের ভূমিকালিপি ছিল নিম্নরূপ : রাজা বসন্ত রায়—রাধামাধব কর;
প্রতাপাদিত্য—মতিলাল সুর; উদয়াদিত্য—মহেন্দ্রলাল বসু; রামচন্দ্র—নীলমাধব চক্রবর্তী; রমাই
ভাড়া—অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী; সুরমা—সুকুমারী দত্ত।

রাজা বসন্ত রায় গ্রেট ন্যাশান্যাল থিয়েটারে মোট পাঁচদিন অভিনীত হয়। শেষ অভিনয়
তারিখ—১৫ আগস্ট ১৮৮৬। এরপর স্টার থিয়েটারের মালিকরা থিয়েটারটি কিনে ভেঙ্গে গুড়িয়ে
দেন। এই থিয়েটারের জমিতেই কয়েক বছর পর স্থাপিত হয় মিনার্ভা থিয়েটার। থিয়েটার হাতছাড়া
হবার পর গ্রেট ন্যাশান্যাল থিয়েটারের নটনটীরা গ্রেট ন্যাশান্যাল থিয়েটার কোম্পানি নাম দিয়ে
লিভসে স্ট্রিটের অপেরা হাউস ভাড়া নিয়ে অভিনয় শুরু করেন। তাঁরা রাজা বসন্ত রায় অভিনয়
করেন মোট দুদিন—২৮ আগস্ট ১৮৮৬ ও ১১ সেপ্টেম্বর ১৮৮৬। এরপর গ্রেট ন্যাশান্যাল থিয়েটার
কোম্পানির মালিকানা বদল হয়। তখন থিয়েটারের নামও পালটে রাখা হয় ন্যাশান্যাল থিয়েটার
কোম্পানি। এই থিয়েটারেও রাজা বসন্ত রায় একাধিক দিন অভিনীত হয়।

রাজা বসন্ত রায় নাটকটি তারপর অভিনীত হয় এমারেন্ড থিয়েটারে। এই থিয়েটারের
মালিক ধনকুবের মতিলাল শীলের পৌত্র গোপাললাল শীল। তিনি ৬৮ নং বিডন স্ট্রিটের স্টার
থিয়েটারের বাড়িটি কিনে নিয়ে সেখানেই স্থাপন করেন এমারেন্ড থিয়েটার। এই থিয়েটারের
ম্যানেজার ও ডিরেক্টর হন কেদারনাথ চৌধুরী। এমারেন্ড থিয়েটারের দ্বারোদ্ঘাটন হয় ১৮৮৭
খ্রিস্টাব্দের ৮ অক্টোবর পাণ্ডব নির্বাসন নাটকের অভিনয়ের মাধ্যমে। নাট্যকার কেদারনাথ চৌধুরী।
এই অভিনয়ে রাধামাধবের ছিল শকুনির ভূমিকা।

পাণ্ডব নির্বাসন পরপর পাঁচরাত্রি অভিনয়ের পর এমারেন্ডে রাজা বসন্ত রায় প্রথম অভিনীত
হয় ২৩ অক্টোবর ১৮৮৭। এখানেও নাম ভূমিকায় রাধামাধব কর। নাটকটির জনপ্রিয়তার মূলে যে
রাধামাধবের ভূমিকা ছিল অত্যধিক তা স্বীকার করেছেন অনেকেই। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ রাজা বসন্ত

রায় নটকের অভিনয় দেখেছেন বলে মন্তব্য করেছেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর *রবীন্দ্রজীবনী* প্রথমখণ্ডে। গ্রেট ন্যাশান্যালে এই নটকের প্রথম অভিনয় দেখার সুযোগ তিনি পাননি। তবে পরবর্তী কোনো দিনের অভিনয় তিনি দেখে থাকবেন। তখন রবীন্দ্রনাথের পিতৃদেব বুহাই (বর্তমান মুহাই) এর কাছাকাছি নাসিকে অসুস্থ অবস্থায় ছিলেন। প্রভাতকুমার জানিয়েছেন,^{২২} “আমাদের মনে হয় রবীন্দ্রনাথ এই নটক অভিনয় দেখিয়া আষাঢ়ের শেষ দিকে কোনোসময়ে নাসিক গিয়াছিলেন।” বিশিষ্ট রবীন্দ্রগবেষক প্রশান্তকুমার পাল (১৯৩৮-) জানিয়েছেন^{২৩} : “নটকটির প্রথম অভিনয় রবীন্দ্রনাথ দেখেননি, কারণ সে সময়ে তিনি কলকাতায় ছিলেন না। কিন্তু পরবর্তী কোনো অভিনয় তিনি অবশ্যই দেখেছিলেন।”

মাননীয়া ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীও *রাজা বসন্ত রায়*-এর অভিনয় দেখেছিলেন। এই দেখার অভিজ্ঞতা তিনি ব্যক্ত করেছেন নিম্নোক্তভাবে^{২৪} :

একবার স্টার থিয়েটারে রাজা বসন্ত রায় নামে বউঠাকুরাণীর হাটের রূপান্তর দেখতে গিয়ে বুড়ো বসন্ত রায়ের গান ও অভিনয়ে খুব কৈদেছিলুম মনে পড়ে।

ইন্দিরা দেবী থিয়েটারটির নাম ভুল করে উল্লেখ করেছেন ‘স্টার’ বলে।

সোমপ্রকাশ পত্রিকা (২৫ শ্রাবণ ১২৯৩) *রাজা বসন্ত রায়* নটকের সমালোচনায় মন্তব্য করে :

কলকাতা/আমাদের একজন দর্শক গত ১৬ই ও ১৭ই শ্রাবণ গ্রেট ন্যাশান্যাল-থিয়েটারে আনন্দমঠ ও রাজা বসন্ত রায় নামক নটকের অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন। রাজাবসন্ত রায় নামক নটকখানির অভিনয় সুন্দর হইয়াছিল। বিশেষ রাজা বসন্ত রায়ের অমায়িকতা এবং উদয়াদিত্যের অসহ্য যাতনা দেখিয়া দর্শকমণ্ডলী কক্ষশারসে ভাসমান হইয়াছিলেন। দৃশ্যপটগুলিও দেখিতে অতিসুন্দর হইয়াছিল।

রাজা বসন্ত রায় নটকটির জনপ্রিয়তার মূলে ছিল গান। বসন্ত রায়ের ভূমিকাভিনেতা রাধামাধব ছিলেন একজন বিশিষ্ট গায়ক। তাঁর কণ্ঠনিসৃত গান ‘আজ তোমারে দেখতে এলেম’ সকল দর্শকের হৃদয় জয় করে। বলা যায়, বাংলা থিয়েটারে প্রথম রবীন্দ্র সংগীত পরিবেশনের কৃতিত্ব রাধামাধবের। অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর *গিরিশচন্দ্র* গ্রন্থে^{২৫} নটকটির অভিনয়ের প্রশংসায় লেখেন :

এই সময়ে যে-কয়েকখানি নটক অভিনীত হয় তন্মধ্যে কেদারবাবু কর্তৃক নটকাকারে পরিবর্তিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘বউঠাকুরাণীর হাট’ খুব জমিয়া ছিল। প্রবীন অভিনেতা স্বর্গীয় রাধামাধব কর বসন্ত রায়ের ভূমিকাগ্রহণ করিয়া সুমধুর সঙ্গীতে দর্শকগণকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন।

অবিনাশচন্দ্র রাধামাধবের সংগীত প্রয়োগের দক্ষতার প্রশংসাই করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রাধামাধবের অনুজ ভ্রাতা ‘রাধারমন করে’র অনুরোধেই কেদারনাথ *বউঠাকুরাণীর হাট*-এর নাট্যরূপ দেন।^{২৬}

গ্রেট ন্যাশান্যাল, গ্রেট ন্যাশান্যাল কোম্পানি ও এমারেণ্ডের পর রাধামাধব যোগ দেন মিনার্ভা থিয়েটারে। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে ৭ নভেম্বরে এই থিয়েটারে অভিনীত হয় ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের (১৮৬৩-১৯২৭) নটক *রঘুবীর*। তখন মিনার্ভার মালিক নাট্যকার ও নট অয়রেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৭৬-১৯১৬) এবং ম্যানেজার দুর্গাদাস দে। *রঘুবীর*-এর অনন্ত রাও-এর ভূমিকাগ্রহণ করেন রাধামাধব। *রঘুবীর* আদতে ভীল সন্তান। অনন্তরাও তাকে লালনপালন করেন। যেদিন *রঘুবীর* জ্ঞানতে পারল তাঁর প্রকৃত জন্মরহস্য সেদিন সে অনন্ত রাওকে বিদায় জানিয়ে স্বজাতির সঙ্গে মিলিত হয়। *রঘুবীর*ের চলে যাওয়ায় অনন্ত রাও উদ্ভ্রান্তবৎ আচরণ করেন। এই সময় অনন্তরাওবেশী

রাধামাধবের অভিনয় অতিশয় হৃদয়গ্রাহী হয়। শ্রদ্ধেয় দেবনারায়ণ গুপ্ত এই অভিনয় সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছেন:^{২৭}

১৯০৩ সালে মিনার্ভা থিয়েটারে অমরেন্দ্রনাথ দত্তের অধিনায়কত্বে ক্ষীরোদপ্রসাদের ‘রঘুবীর’ নাটকে অনন্তরাও এর ভূমিকায় অপরূপ অভিনয় করেন।

‘রঘুবীর’ মিনার্ভায় বহু রজনী অভিনীত হয়। তাতে বোঝা যায় নাটকটি দর্শকসাধারণের প্রশংসাধন্য হয়।

মিনার্ভায় ক্ষীরোদপ্রসাদের *বাংলার মসনদ* নাটক প্রথম মঞ্চস্থ হয় ২ জুলাই ১৯১০। এই অভিনয়ে রাধামাধবের ছিল হায়দরীর ভূমিকা। এই অভিনয়ের পর রাধামাধব আর কোনো থিয়েটারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন কিনা জানা যায় না। সেই দিক থেকে বলা যায় তাঁর অভিনয় জীবনের সীমারেখা ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯১০-মোট ৪২ বছর।

রাধামাধবের নাট্যকর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল নাট্যরচনাও। তিনি একটি নাটক রচনা করেন। তাঁর নাম *বসন্তকুমারী*। ড. সুকুমার সেন তাঁর *বাঙ্গালাসাহিত্যের ইতিহাস* দ্বিতীয়খণ্ডে (৩য় সং ১৯৬২) এই নাটকের পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে লেখেন^{২৮}: “সেকালের বিখ্যাত অভিনেতা রাধামাধব কর ‘বসন্তকুমারী’ (১৮৭৯) নামে একখানি বিয়োগান্ত রোমান্টিক নাটক গদ্যোপদ্যে রচনা করিয়াছিলেন।”

রাধামাধবের আর কোনো নাটকের কথা জানা না গেলেও তিনি আর একটি বিশিষ্ট নাট্যরচনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। উক্ত নাট্যরচনার নাম *হীরকচূর্ণ*। নাটকটির রচয়িতা রসরাজ অমৃতলাল বসু। নাটকটি রচিত হয় ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে। ড. অরুণ মিত্র তাঁর *অমৃতলাল বসুর জীবন ও সাহিত্য* (প্রথম প্রকাশ : ১৯৭০) গ্রন্থে^{২৯} উক্ত প্রসঙ্গে লিখেছেন :

নাটকটি তিনি মুখে মুখেই রচনা করেন। এই সময় তাঁহার ‘গণেশকর্ম’ করিয়াছিলেন রাধামাধব কর, যোগেন্দ্রনাথ মিত্র ও রাধাগোবিন্দ কর, (পরবর্তীকালে ডাঃ আর.জি.কর)।”

হীরকচূর্ণ নাটক রচনায় ইতিহাস নাট্যকার অমৃতলাল বসু ব্যস্ত করেছেন তাঁর ‘অমৃতমদিরা’য়। তিনি লিখেছেন :

লিখেছি ‘হীরকচূর্ণ’ পূর্ণপাত্র করে।

বয়স বাইশ যবে বলি ‘কর’ ঘরে।।

প্রথম নাটক তাতে খেলার আদর।

বাকশী পূজার সাথে বীণাপানিবর।।

মাধু লেখে যোগী লেখে মুখে বলে কবি।

লেখনী না চলে যদি সুধাঢালে গবি।।

উদ্ধৃতাংশে ব্যবহৃত ‘কর’ ঘরে, ‘মাধু’, ‘যোগী’ ও ‘গবি’-প্রভৃতির অর্থ যথাক্রমে : রাধামাধবের পিতৃদেব ডাঃ দুর্গাদাস করের বাড়ি, রাধামাধব কর, যোগেন্দ্রনাথ মিত্র এবং রাধামাধবের দাদা রাধাগোবিন্দ কর। রাধামাধবদের বাড়ি যে নাট্যমোদীদের বাড়ি, সেই ঘোষণা করেছেন অমৃতলাল।

১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের ২৭ জানুয়ারি (১৫ মাঘ ১৩০৪ বঙ্গাব্দ) মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের (১৮৪০-১৮৭০) ১৪৮ নং বারিাশসী ঘোষ স্ট্রীটের বাড়িতে স্থাপিত হয় ভারতসংগীত সমাজ। এই সমাজে সংগীতের সঙ্গে নাট্যাভিনয়কেও প্রাধান্য দেওয়া হয়। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির প্রত্যক্ষ উদ্যোগে

গঠিত হয় ভারতসংগীত সমাজ। এই সমাজে সংগীতের সঙ্গে নাট্যাভিনয়কেও প্রাধান্য দেওয়া হয়। এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯-১৯২৫)। রবীন্দ্রনাথ এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আবির্ভাবকাল থেকেই যুক্ত ছিলেন। তাঁরা উভয়েই ছিলেন নাট্যগতপ্রাণ। ভারতসংগীত সমাজের নাট্যাভিনয়কে সার্থক ও সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলার জন্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই রাধামাধব করকে সংগীত সমাজে যোগ দেবার জন্য তাঁর বাড়িতে গিয়ে অনুরোধ করেন। রাধামাধবদের পরিবার ছিল ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত। ব্রাহ্মধর্মও পারিবারিক সূত্রে রাধামাধব জোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবারের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তাছাড়া গ্রেট ন্যাশান্যাল থিয়েটারে অভিনীত *রাজা বসন্ত রায়* নাটকের নাম ভূমিকায় অভিনয় করে তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের বিশেষ আস্থাভাজন ছিলেন। রাধামাধব ভারতসংগীত সমাজের আচার্য পদে বৃত্ত হন। তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে নাট্যশিক্ষাদানও পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি এখানে নাটকের অভিনয়ে অংশগ্রহণ করতে রাজি হননি। এই তথ্য পরিবেশন করেছেন গৌতম বসুমঙ্গিক তাঁর একটি নিবন্ধে।^{৩০} নিবন্ধটির নাম—‘ভারত সংগীত সমাজ’। শ্রীবসুমঙ্গিক লিখেছেন : “সংগীত সমাজের প্রত্যেক অভিনয় যাতে প্রশংসনীয় হয়ে ওঠে সে দিকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দৃষ্টি ছিল প্রখর। রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে তিনি তৎকালীন নাট্যজগতের বিশিষ্ট অভিনেতা ও নির্দেশক রাধামাধব করকে সংগীত সমাজে যোগদান করবার জন্য আমন্ত্রণ জানান। সংগীত সমাজে যোগদান করবার জন্য আমন্ত্রণ জানান। পারিবারিক ও ব্রাহ্মসমাজের সূত্রে ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে রাধামাধবের পূর্বপরিচয় ছিল ; তথাপি তিনি সমাজ-এ অভিনয় করতে স্বীকৃত হলেন না। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে তিনি শুধু রাজি হলেন নাট্যশিক্ষাদান ও পরিচালনা করতে।”

শ্রীবসুমঙ্গিক উল্লিখিত তথ্য আহরণ করেছেন বিশিষ্ট সাংবাদিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের ‘সংগীত সমাজ’ প্রবন্ধ থেকে। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় *মাসিক বসুমতী* পত্রিকায় ১৩৬০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায়। পূর্বেই বলা হয়েছে হেমেন্দ্রপ্রসাদ বিবাহসূত্রে রাধামাধব করের পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত। তাঁর ওই প্রবন্ধ থেকে জানা যায়, রাধামাধবের কাছে শুধু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথই যান নি তাঁদের সঙ্গে গিয়েছিলেন তাঁদের ভ্রাতৃপুত্র বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরও (১৮৭০-১৮৯৯)। হেমেন্দ্রপ্রসাদ তাঁর উল্লিখিত প্রবন্ধে রাধামাধব প্রসঙ্গে লিখেছেন : “রাধামাধববাবুকে (রাধামাধব কর) সঙ্গীত সমাজে আচার্য (নাট্যাচার্য করিবার জন্যই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ বলেন্দ্রনাথকে তাদের ভ্রাতৃপুত্র ও প্রখ্যাত লেখক) সঙ্গে আনিয়াছিলেন। রাধামাধব আগন্তুকদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন নাই ; কিন্তু কখন সঙ্গীতসমাজে অভিনয় করেন নাই—অভিনেতাঙ্গিকে যেমন গায়কঙ্গিকে তেমনই শিক্ষা দিতেন।”

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য হেমেন্দ্রপ্রসাদ ছিলেন সংগীত সমাজের একজন সক্রিয় কর্মী। হেমেন্দ্রকুমার রায় তাঁর *সৌমিন নাট্যকল্যাণ রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থে* (প্রথমপ্রকাশ ২৫ বৈশাখ ১৮৮১ শকাব্দ) জানিয়েছেন, সংগীত সমাজের অভিনয়ে রাধামাধব অংশ নিয়েছিলেন। তিনি উক্তগ্রন্থে এই প্রসঙ্গে জানিয়েছেন :

রাধামাধব কেবল নাট্যাচার্যের কর্তব্য পালন করেন নি, অবতীর্ণ হয়ে ছিলেন সঙ্গীত সমাজের মঞ্চাভিনয়েও।

হেমেন্দ্রকুমার, রাধামাধবের একটি অভিনয় দেখেছিলেন। মিনার্ভা থিয়েটারে চন্দ্রশেখর-এর অভিনয়ে রাধামাধব অবতীর্ণ হন ফস্টরের ভূমিকায়। হেমেন্দ্রকুমারের কাছে সে অভিনয় আকর্ষণীয় বলে মনে হয়নি। তার জন্য তিনি দায়ী করেছেন রাধামাধবের বার্ষিক্যকে।

রাধামাধব সংগীত সমাজে যে নাট্যশিক্ষা দিতেন, তার সংবাদও পরিবেশন করেছেন হেমেন্দ্রকুমার তাঁর উল্লিখিত গ্রন্থে।^{৩২} তিনি লিখেছেন :

‘আমার মনে হয়, সঙ্গীত সমাজের যে সব পালার সঙ্গে ঠাকুরবাড়ীর কাকর কোন সম্পর্ক নেই, তাদেরই মহলায় সময়ে রাধামাধব নাট্যাচার্যের কর্তব্যপালন করতেন এবং জ্যোতিষিন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী দেবী ও নিজের লিখিত নাট্যকাবলীর মহলায় শিক্ষা দান করতেন রবীন্দ্রনাথই স্বয়ং।’

রাধামাধব ভারতসংগীত সমাজ কর্তৃক নাট্যাচার্য উপাধিতে ভূষিত হন। এই উপাধি প্রাপ্তি প্রমাণ করে রাধামাধব একজন নিষ্ঠাবান কলারসিক ছিলেন। সংগীত ও নাটক-উভয় ক্ষেত্রেই ছিল তাঁর অনায়াস গতি। তাঁর সংগীত ও নাট্যপীতি তাঁকে বিদ্যালয় শিক্ষার প্রতি বিমুখ করে তোলে। উনিশ শতকের মধ্যপর্বে যখন বাংলা থিয়েটার তার নবীন জন্মলগ্নের ইতিহাস রচনার পটভূমি রচনা করছিল, রাধামাধব সেই ইতিহাস স্রষ্টার অন্যতম বিশিষ্ট দাবিদার। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস লেখকেরা সেকথা বিস্মৃত হলে, সেই ইতিহাস রচনার কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

উল্লেখ পঞ্জি

১. দেকনারায়ণ গুপ্ত তাঁর *বাংলার নাট্যশিল্পী* (আগস্ট, ১৯৯০) গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে জানিয়েছেন—“রাধামাধব ১৮৫৩ সালের পৌষ মাসে সাতরাগাহিতে জন্মগ্রহণ করেন।” পৃ. ৪২
২. ড. সুকুমার সেন তাঁর *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (তৃতীয় সং ১৩৬২) দ্বিতীয় খণ্ডে জানিয়েছেন—“ডাক্তার দুর্গাদাস করের কনিষ্ঠপুত্র রাধারামণ করের ‘সরোজা’ নামক ক্ষুদ্র গার্হস্থ্য নাটকটিতে বাঙ্গালী-সংসারের বিধবা ননদের বধু-বিধেঘের একটি উজ্জ্বল স্বাভাবিক চিত্র পাইতেছি। রচনায় নাট্যকৌশলের ও লিপিচাতুর্যের বিশেষ পরিচয় আছে। সরোজা এমারেন্ড থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল।” পৃ. ২৯১
৩. *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮
৪. প্র. ব্রজেন্দ্রনাথ বল্লোপাধ্যায়-এর *বঙ্গীয় নাট্যশিল্পের ইতিহাস* (৪র্থ সং ১৩৬৮) পৃ. ৬৩
৫. প্র. পুরাতন প্রসঙ্গ—বিপিনবিহারী গুপ্ত (বিদ্যাভারতী সং ১৩৭৩) পৃ. ২৫০
৬. *তুই*, পৃ. ২৫৩
৭. গোবিন্দ অধিকারীর দল, রাধাকৃষ্ণ বৈরাগীর দল, বদন অধিকারীর দল, মহেশ চন্দ্রকর্তীর দল, বৌ-মাষ্টারের দল, ঝোড়োর দল, ব্রজঅধিকারীর দল, উমেশ মিত্রের দল (গোপাল উড়ের দল নামে প্রসিদ্ধ), মদন মাষ্টারের দল, লোকো ধোপার দল প্রভৃতি।
৮. *পুরাতন প্রসঙ্গ*, পৃ. ২৫৫
৯. রাধামাধব কর গিরিশ মিত্র সম্পর্কে লিখেছেন, “তাহার মত অদ্ভুত কারিকর প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। তিনি গৎ তৈয়ার করিয়া দিতেন। এখনও তাহার রচিত গৎ অনেক জায়গায় শুনিতে পাই।” প্র : *পুরাতন প্রসঙ্গ*, পৃ. ২৬৯
১০. ব্যোমকেশ মুস্তাফী তাঁর *বঙ্গীয় রঙ্গালয়* পুস্তিকায় লিখেছেন—“এই দলে ‘রত্নাবলী’ ও একখানি প্রহসন অভিনীত হয়। এই প্রহসন প্রিয়বাবুর লিখিত। প্রিয়বাবু একজন সুকবি ছিলেন ভাস্কর ও প্রভাকরের

কবিতাগুলি ইহার অনেক কবিতা থাকিত। এতদ্ভিন্ন যাত্রার পালা বাঁধিয়া দেওয়া হাফ আগড়াইএর গান বাঁধা প্রভৃতি পর্বে তিনি পটু ছিলেন ও সর্বদা তাহাতে লিপ্ত থাকিতেন। ১২৭৪ সালের শেষার্ধ্বে এই অভিনয় হয়।”

১১ দ্রষ্টব্য. পুরাতন প্রসঙ্গ, পৃ: ২৬৯

১২ গিরিশচন্দ্র (১৯৯৩ দেজ সংস্করণ দ্বিতীয়) পৃ: ৫১

১৩ পুরাতন প্রসঙ্গ পৃ: ২৭১

১৪ বিয়ে পাগলা বুড়োর অভিনয় তালিকা প্রদত্ত হয়েছে ব্যোমকেশ মুস্তাফীর বঙ্গীয় রঙ্গালয় পুস্তিকায়।

১৫ ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বঙ্গীয় নাট্যশালায় ইতিহাস গ্রন্থে সধবার একাদশীর চতুর্থ অভিনয়ের তারিখ বলেছেন ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের শ্রীপঞ্চমী।

অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী তাঁর আত্মকথায় উক্ত অভিনয় তারিখকে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে শ্রীপঞ্চমী বলে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু অমৃতলাল বসু তাঁর স্মৃতিকথায় রাধামাধব করের দেওয়া তারিখকেই সমর্থন করেছেন। ব্যোমকেশ মুস্তাফী ও তাঁর বঙ্গীয় রঙ্গালয় রচনায় রাধামাধবের দেওয়া তারিখই স্বীকার করেছেন।

১৬ পুরাতন প্রসঙ্গ, পৃ: ২৭১

১৭ ওই, পৃ: ২৭২-২৭৩

১৮ ওই, পৃ: ২৭৪

১৯ গিরিশচন্দ্র, পৃ: ৫৯

২০ বঙ্গীয় নাট্যশালায় ইতিহাস, পৃ: ৭৩

২১ পৃ: ৬৭

২২ রবীন্দ্র জীবনী প্রথম খণ্ড (১৯৭৯) পৃ: ২৩৩

২৩ রবীন্দ্রজীবনী তৃতীয় খণ্ড (১৩৯৪), পৃ: ৪৬

২৪ রবীন্দ্র স্মৃতি (১৩৯৬) পৃ: ৩৪

২৫ ওই পৃ: ২৩২

২৬ প্রশান্তকুমার পাল তাঁর রবি জীবনী তৃতীয় খণ্ডের ৪৬ পৃষ্ঠার ৪ সংখ্যক টীকায় গীতবিতানএ (১৯৫৭)

থেকে জানাচ্ছেন, বিশিষ্ট সংবাদিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ গীতবিতান কর্তৃপক্ষকে ১১.৬.১৯৫৩ তারিখে লেখা চিঠি জানিয়েছিলেন, রাধারমণ করের (রাধামাধব করের অনুজ ভ্রাতা) আগ্রহে এবং দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬২-১৯২২) সম্মতিতে কেশরনাথ চৌধুরী বউ ঠাকুরানীর হাট-এর নাট্যরূপ দেন।

২৭ দ্র: বাংলার নটনটী দ্বিতীয় খণ্ড (আগস্ট ১৯৯০) ভুক্ত রাধামাধব কর, অধ্যায়, পৃ: ৪৭

২৮ পৃ: ২৮৩

২৯ পৃ: ৬৫-৬৬

৩০ নিরঙ্কুশ প্রকাশিত হয় ১৪০৪ বঙ্গাব্দের শারদীয় দেশ পত্রিকায়।

৩১ সৌমিন নাট্যকলায় রবীন্দ্রনাথ পৃ: ৩৩

৩২ ওই, পৃ: ৮৫

রোকেয়া একশো পঁচিশ : ফিরে দেখা

সেরিনা জাহান

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের জন্মশতবর্ষ বেশ অন্যান্মনস্কভাবে কেটে গিয়েছে। তাঁর জন্মভিটে ওপার বাংলায় পড়েছে বলে দায় এড়ানোর উপায় আমাদের নেই কারণ তাঁর গোটা কর্মজীবন কেটেছিল এপারে, খোদ কলকাতায়। তাছাড়া তাঁর প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়টির ঠিকানাও কলকাতা। শহরের নামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম। শতবর্ষে ভুলে থাকলেও পরবর্তী বছরগুলিতে রোকেয়ার নাম নারী আন্দোলন-স্ত্রীশিক্ষার প্রসার-সমাজ সংস্কার সংক্রান্ত প্রসঙ্গে ঘুরেফিরে উচ্চারিত হয়েছে ও হয়ে চলেছে। তাঁর জীবন কাজ ও সাহিত্যচর্চা নিয়ে গ্রন্থ প্রবন্ধ রচিত হচ্ছে। আলোচনাসভায় তিনি আলোকিত হচ্ছেন। তাঁর নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ছাত্রীআবাস তৈরি হয়েছে। জন্মের একশো পঁচিশ বছর পরে রোকেয়ার কীর্তির কদর কিছুটা হলেও পশ্চিমবঙ্গের লেখাপড়া জানা মানুষের একটা বড়ো অংশের কাছে তিনি এখনও অপরিচিত রয়ে গিয়েছেন। উনিশ শতকের শেষদিকে বা বিশ শতকের প্রথমদিকে বাংলার মেয়েদের, বিশেষত মুসলমান মেয়েদের, পিছিয়ে পড়া অন্ধকার অস্তিত্বের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে রোকেয়া বুঝতে পেরেছিলেন যে কঠোর কঠিন অবরোধপ্রথাই নারীর মুক্তমন ও মুক্তচিন্তার অধিকারী হওয়ার পথে মূল বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তাই স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বোঝানোর পাশাপাশি সমান গুরুত্ব আরোপ করে মেয়েদের তিনি ঘরের অর্গল খুলে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে বেরিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। যে রোকেয়া পর্দাপ্রথার বিরোধিতায় নিজ জীবনধারা ও বিশ্বাসকে পরিচালিত করেছেন সেই রোকেয়ার কীর্তি ও অবদানকে বিস্মৃতির পর্দার আড়ালে হারিয়ে যেতে দেওয়া অসমীচীন, অন্যায়, অসংগত।

বর্তমান নিবন্ধে আমরা রোকেয়ার জীবন ও সময় নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনার পাশাপাশি এটাও বোঝার চেষ্টা করব যে আজকের বাংলার মেয়েদের জীবনে রোকেয়ার মতো নীরব কাবিগরদের হাতে গড়া ভিতের ভূমিকা কতখানি।

রংপুরের পায়রাবন্দের জমিদারবাড়িতে ১৮৮০ সালের ৯ ডিসেম্বর রোকেয়া জন্মগ্রহণ করেন। বাবা আবু আলি সাবের, মা রাহাতুল্লেসা সাবেরা চৌধুরী।

আবু আলির ইচ্ছায় ইংরাজি শিক্ষাগ্রহণ করে রোকেয়ার জ্যেষ্ঠ দুই দাদা ইব্রাহিম সাবের ও খলিল সাবের বুঝেছিলেন, সাবের পরিবারের ঐতিহ্য অনুযায়ী শুধুমাত্র কোরান পাঠের মধ্যে মেয়েদের স্তানার্জনকে আবদ্ধ রাখলে তাদের অন্ধত্ব ঘুচবে না। নিজের বোনদের শিক্ষাদানের মধ্য দিয়ে তাঁবা এই সামাজিক অভিশাপ দূর করার চেষ্টা করলেন। দাদাদের অনুসরণে বাড়ির উঠানে দাগ কেটে বাংলা বর্ণমালা লিখতে শিখেছিলেন রোকেয়ার দিদি করিমুল্লেসা (১৮৫৫-

১৯২৬)। সাময়িকভাবে পিতা আবু আলির আনুকূল্যও পেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু মোশ্লা, প্রতিবেশী আর অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের কোপানলে পড়তে হল তাঁকে। টিয়াপাখির মতো ধর্মগ্রন্থ আওড়ানো ছাড়া মেয়েদের অন্য কিছু পাঠ তখন নিষিদ্ধ।

কলকাতায় সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়ার সময় কলেজের মুক্ত পরিবেশে মোহাম্মদ আলি ও শওকত আলির দ্বারা প্রভাবিত হন রোকেয়ার দাদারা। সৈয়দ আমির আলির প্রেরণায় তাঁদের জীবনদর্শে একটা সুস্ববোধ প্রোথিত হয়। মেয়েদের অসহায় অবস্থান এবং যন্ত্রণা অনুভব করতে পেরেছিলেন ইব্রাহিম সাবের—রোকেয়ার বড়দা। শুধু তাঁদের পরিবারেই নয়, তখনকার অধিকাংশ পরিবারে যে মেয়েদের উপর এমন হাজারো বাধানিষেধ আরোপিত ছিল তা তিনি জানতেন। তবে এইসব সামাজিক বা পারিবারিক নিয়ম তিনি মানেননি। নিজের বাড়ি থেকেই তিনি ‘নিয়ম’ ভাঙার কাজ শুরু করলেন। রোকেয়াকে পড়াতে শুরু করলেন তিনি। দাদার অপরিসীম উৎসাহের কথা রোকেয়া সারাজীবন মনে রেখেছিলেন : ‘বালিকা বিদ্যালয় বা স্কুল কলেজ গৃহের অভ্যন্তরে আমি কখনও প্রবেশ করি নাই। কেবল জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতার অসীম স্নেহ ও অনুগ্রহে যৎসামান্য লেখাপড়া শিখিয়াছি। অপর আত্মীয় স্বজনেরা আমার শিক্ষায় উৎসাহ দান করিবেন দূরে থাকুক, বরং নানাপ্রকার বিদ্রূপ ও উপহাস করিতেন—কিন্তু তথাপি আমি পশ্চাৎপদ হই নাই। ভ্রাতাও কাহারও বিদ্রূপে ভ্রমোৎসাহ হইয়া আমাকে পড়াইতে ক্ষান্ত হন নাই।’

দাদা বললেন, ‘বোন, এই ইংরেজি ভাষাটা যদি শিখে নিতে পারিস, তবে পৃথিবীর এক রত্নভাণ্ডারের দ্বার তোর কাছে খুলে যাবে।’

দিনের আলায়ে মেয়েদের লেখাপড়া শেখার সুযোগ বা অনুমতি ছিল না। কঠোর শাসন, ক্রীড়াক্ষিপা অপ্রয়োজনীয়, অতএব রাত্রির অপেক্ষায় দিন কাটত রোকেয়ার। গভীর রাতে গোটা বাড়ি যখন অন্ধকারে নিমগ্ন, সকলে যখন ঘুমিয়ে পড়তেন, সেইসময় গোপনে ছোট্ট রোকেয়া দাদা ইব্রাহিমের কাছে পড়তে বসত। দাদার প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতার শেষ ছিল না। পদ্মরাগ উপন্যাসটি দাদাকে উৎসর্গ করে রোকেয়া লেখেন, ‘আমি আশৈশব তোমার স্নেহ-সাগরে ডুবিয়া আছি। আমাকে তুমিই হাতে গড়িয়া তুলিয়াছ। আমি জানি না,—পিতা, মাতা, গুরু, শিক্ষক কেমন হয়,—আমি কেবল তোমাকেই জানি। জননী সময়ে সময়ে শাসন করিয়াছেন,—তুমি কখনও শাসন কর নাই। তাই মাতৃস্নেহের কোমলতাও তোমাতেই অনুভব করিয়াছি।’*

বিদ্যালয়ে না গিয়েও দুর্লভ্য পারিবারিক ও সামাজিক বাধা অতিক্রম করে অত্যন্ত গোপনে রোকেয়ার বিদ্যার্জন পর্ব চলতে থাকল। রাত জেগে পড়তে হত, তাই কোনও কোনওদিন ফজরের (ভোরের) নামাজ পড়া হত না। এজন্য রোকেয়াকে অনেক ভর্ৎসনা সহ্য করতে হয়েছে। কোরান মুখস্থ ব্যতীত মেয়েদের লেখাপড়া শেখা সম্পর্কে বিদ্রূপ করে সেই সময় বলা হত, লেখাপড়া শিখে কি মেয়েরা জঙ্গ-ম্যাজিস্ট্রেট হবে?

পাঁচ বছর বয়সে রোকেয়া একবার মায়ের সঙ্গে কলকাতায় এসেছিলেন। তখন এক ইংরেজ শিক্ষিকার কাছে রোকেয়া বাল্যশিক্ষার সূচনা হয়েছিল। কিন্তু মেমসাহেবের ছাত্রী হলে পর্দা নষ্ট হবে—এই যুক্তিতে তাঁর লেখাপড়া অচিরেই বন্ধ হয়ে যায়।

রোকেয়ার বড়ো হয়ে ওঠার মুহূর্তগুলিতে একদিকে মেয়েদের সমস্ত রকমের শিক্ষাগ্রহণে বাধা, অন্যদিকে নিশ্চিহ্ন অবরোধপ্রথা বাংলার মুসলমান সমাজে ভীষণভাবে কায়েম ছিল। মেয়েরা ছিল কার্যত গৃহবন্দি। শুধু পুরুষ নন, অনাখ্যায় অচেনা মহিলাদের সামনে বেরোনোও

মানা ছিল। এরকম একাধিক ঘটনার বিবৃতি অত্যন্ত শ্লেষাত্মক ভাষায় রোকেয়া তাঁর অবরোধবাসিনী নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন।

শিক্ষায় পিছিয়ে পড়ার ফলে সেকালের মুসলমান উচ্চ ও মধ্যশ্রেণি এমন সব কুসংস্কারের শিকার হয়েছিলেন যে ধর্মের কাছে সর্বাঙ্গিক আত্মসমর্পণ করা ছাড়া তাদের আর কিছু করার ছিল না। শুধু পর্দা রক্ষার স্বার্থেই বাড়ির ভেতরে একান্তে অর্থ না বুঝে কোরান পাঠ ছাড়া যাবতীয় লেখাপড়া ছিল মেয়েদের জন্য নিষিদ্ধ। পর্দাপ্রথার দৌরাত্ম্য-বর্ণনাকারী রোকেয়ার লেখা বিবরণগুলি গল্পের মতো ঠেকে। ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত অবরোধবাসিনী গ্রন্থের ‘নিবেদন’ অংশে রোকেয়া স্পষ্ট ভাষাতেই বলেছেন, “কতকগুলি ঐতিহাসিক ও চাম্ফুস সত্য ঘটনার হাসি-কামা লইয়া ‘অবরোধ-বাসিনী’ রচিত হইল।”

অগ্রজ ইব্রাহিম সাবেরের উদ্যোগে ১৮৯৬ সালে ভাগলপুরের সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে রোকেয়ার বিবাহ হয়। উচ্চপদস্থ সরকারি চাকুরে সাখাওয়াত হোসেনের কুসংস্কারমুক্ত উদার ও শিক্ষানুরাগী মনের ছোঁয়া রোকেয়ার পরবর্তী জীবন ও কাজকে সমৃদ্ধ করেছিল। স্বামীব উৎসাহে ও আনুকূল্যেই তিনি বিবাহিত জীবনেও পড়াশোনা ও সাহিত্যচর্চা অব্যাহত রাখতে পেরেছিলেন। স্বামীর সযত্ন প্রচেষ্টায় তিনি উর্দু ও ইংরেজি ভাষা শেখেন। মাতৃভাষা বাংলা ছাড়া উর্দু ও ইংরেজিতে রোকেয়া লিখতে ও পড়তে পারতেন। তিনি ইংরেজিতে মৌলিক সাহিত্য রচনাও করেছেন। তাছাড়া উর্দু ও ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদও করেছেন। রোকেয়ার অন্যতম জীবনীকার শামসুন নাহার মাহমুদের রচনায় সাখাওয়াত হোসেন ও রোকেয়ার সহযোগিতাপূর্ণ সুন্দর যৌথ জীবনের বিশদ বিবরণ আছে। ‘স্বামীর সাহায্য ও সহানুভূতি রোকেয়ার শিক্ষার পথে সহায়তা করিয়াছিল। তাহার ফল ফলিতে বিলম্ব হয় নাই। সাখাওয়াত সরকারি লেখাপড়ার কাজে রোকেয়ার নিকট হইতে প্রচুর সাহায্য পাইতেন। শুধু তাহাই নয়। সাখাওয়াতের বাংলা শিখিবার আগ্রহ ছিল...। রোকেয়া নিজে বিহারী স্বামীকে বাংলা শিখাইবার ভার নিয়াছিলেন। ... মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে কালব্যাপির প্রকোপে সাখাওয়াতের দুইটি চক্ষু নষ্ট হইয়া যায়। সাখাওয়াত চক্ষু হারাইলেন—সেই হইতে লেখাপড়ার ব্যাপারে জ্বী-ই হইলেন তাঁহার চক্ষু। রোকেয়া গভীর অনুরাগে স্বামীর রোগশয্যার পাশে বসিয়া তাঁহাকে নানা বিষয় পড়িয়া শুনাইতেন।”^৪

১৯০৯ সালে সাখাওয়াত হোসেনের অকালমৃত্যুতে রোকেয়ার সুন্দর সুসমায় দাম্পত্যজীবনে ছেদ পড়ে। স্বামীর মৃত্যুর কয়েকমাস পরে ভাগলপুরে মাত্র পাঁচজন ছাত্রীকে নিয়ে রোকেয়া গড়ে তোলেন সাখাওয়াত মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয়। ভাগলপুরের মতো একটি বিভাষী অঞ্চলে প্রতিকূল পরিবেশে এই বিদ্যালয়টি গড়ে তোলা সহজ ছিল না। বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার জন্য সাখাওয়াত হোসেন রোকেয়াকে যে দশ হাজার টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন, সেই টাকা এবং রোকেয়ার কিছু গয়নার লোভে স্বশুরবাড়ির কিছু আত্মীয় রোকেয়ার জীবন বিপন্ন করে তোলে। ‘মিশনারিদের চর’ বলে তাঁর নামে কুৎসা রটানো হয়। নানাভাবে, নানা দিক থেকে বাধা আসায় সদ্য গড়ে ওঠা বিদ্যালয়টি অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়। দুঃখী হতাশ রোকেয়া ভাগলপুর ছেড়ে সাখাওয়াত হোসেনের স্মৃতিবিজড়িত বাড়ি ছেড়ে ১৯১০ সালের ৩ ডিসেম্বর কলকাতায় চলে আসেন। এরপর শুরু হল রোকেয়ার জীবনের কলকাতা-পর্ব।

১৯১১ সালের ১১ মার্চ (মতান্তরে ১৬ মার্চ) ওয়ালিউল্লাহ লেনের একটি ছোট্ট ভাড়াবাড়িতে রোকেয়া দ্বিতীয়বার শুরু করলেন সাখাওয়াত মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয়।

মাত্র দুটো ক্লাস, দুখানা বেঞ্চ আর আটজন ছাত্রী। বাড়ি বাড়ি গিয়ে অনেক সাধাসাধি করে ‘পর্দানসীন’ মেয়েদের ডেকে এনে শুরু হল মুসলমান মেয়েদের জন্য রোকেয়ার স্কুল। বিশ শতকের গোড়ার দিকে বিশ্বব্যাপী শিক্ষা-শিল্প-বিজ্ঞানের নব নব উন্মেষ ও অগ্রগতির যে ছোঁয়াচ কলকাতায় লেগেছিল তার সঙ্গে মুসলিম নারী সমাজেরও একটা সংযোগসূত্র স্থাপিত হল। এই কষ্টসাধ্য কাজটা করলেন রোকেয়া, স্কুল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

এখানে একটা বিষয় মনে রাখা জরুরি। রোকেয়ার তৈরি এই বিদ্যালয়টি কিন্তু কলকাতার প্রথম মুসলিম বালিকা বিদ্যালয় নয়। শ্যামবাজার, এন্টালি, জানবাজারে মুসলমান মেয়েদের জন্য কয়েকটি স্কুল ছিল। তাছাড়া ১৮২২ থেকে ১৮২৫ সালের মধ্যে এই ধরনের বেশ কিছু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৯৭ সালে বেগম ফেরদৌস মহল কলকাতায় একটি মুসলমান বালিকা বিদ্যালয় পুস্তন করেন। এরকমই আরেকটি বিদ্যালয় গড়ে তোলেন সুরাবর্দির মা খুজ্জিতা আখতার বানু।

এরকম কিছু বিদ্যালয় কলকাতায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকলেও মুসলমান স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে রোকেয়াই ছিলেন অগ্রপথিক। তাঁর স্কুলে শুধু পুথিগত বিদ্যাই নয়, নারীর স্বাভাবিক ও স্বাধীনতার অধিকার সম্পর্কেও শিক্ষা দিতেন রোকেয়া। প্রকৃত শিক্ষার অর্থ রোকেয়ার কাছে কতটা ব্যাপক ছিল তা তাঁর বিভিন্ন লেখায় আমরা দেখতে পাই। তিনি বিশ্বাস করতেন, “... শিক্ষার অর্থ কোন সম্প্রদায় বা জাতি বিশেষের ‘অন্ধ অনুকরণ’ নহে। ঈশ্বর স্বাভাবিক জ্ঞান বা ক্ষমতা দিয়াছেন সেই ক্ষমতাকে অনুশীলন দ্বারা বৃদ্ধি-(develop) করাই শিক্ষা। ঐ গুণের সদ্যবহার করা কর্তব্য এবং অপব্যবহার করা দোষ।”

রোকেয়ার গোটা জীবনটা খুঁটিয়ে দেখলে নিঃসন্দেহে বলা যায়, তাঁর স্কুল তৈরি বা তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি—সবকিছুর পেছনে একটাই উদ্দেশ্য সবসময় কাজ করেছে—স্ত্রীশিক্ষার প্রসার এবং সেই শিক্ষাকে হাতিয়ার করে মেয়েদের ‘সংসারের এক গুরুতর বোঝা’ থেকে একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষে রূপান্তরিত করা। আর তাঁর এই লক্ষ্য পূরণ করার জন্য তিনি যে কোনো মূল্য দিতে প্রস্তুত ছিলেন। কোনো কুৎসা, অপবাদ, অভাব, বিপর্যয় তাঁকে টলাতে পারে নি।

কোনোদিন স্কুলে পড়েননি, কী করে অন্য স্কুলে ক্লাস নেওয়া হয়, তা দেখতে যেতেন যেই রোকেয়া সেই তিনিই নিজের গড়ে তোলা স্কুলের জন্য যোগ্য শিক্ষিকার খোঁজে ভারতব্যাপী ঘুরে বেড়িয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেছেন : “বাহিরে নানা প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে লড়াই করিয়াছি, ভিতরে যে শুধু ছাত্রীদিকেই উপযুক্ত শিক্ষাদান করিবার চেষ্টা করিয়াছি তাহা নয়। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষয়িত্রীদিগকেও ক্রমাগত নিজের হাতে গড়িয়া লইতে হইয়াছে। স্কুলের জন্য ‘জগৎ ছানিয়া কি দিব আনিয়া’—এভাবে প্রাণপণ যত্ন করিয়া মাদ্রাজ, আরা, গয়া, আগ্রা প্রভৃতি স্থান হইতে শিক্ষয়িত্রী আনাহিবার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে।”

সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলের মাধ্যমে মুসলমান নারীসমাজে আধুনিক ও যুগোপযোগী শিক্ষার ব্যাপক প্রচারই ছিল রোকেয়ার অন্তরের একান্ত কামনা। অর্থ উপার্জনকে শিক্ষালাভের মূল উদ্দেশ্য বলে রোকেয়া কোনোদিন মেনে নিতে পারেন নি। তিনি চাইতেন, মুসলমান মেয়েরাও যেন আধুনিক জগতের অন্যান্য জাতির মেয়েদের মতো জীবনের সবক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে পারে। এ প্রসঙ্গে ‘ধ্বংসের পথে বঙ্গীয় মুসলিম’ প্রবন্ধের এক জায়গায় রোকেয়া লিখেছিলেন : “... একটি আদর্শ মোসলেম বালিকা বিদ্যালয়,—যেখানে আমাদের মেয়েরা

আধুনিক জগতের অন্যান্য সম্প্রদায় এবং প্রদেশের লোকের সঙ্গে তাল রেখে চলবার মতো উচ্চশিক্ষা লাভ করতে পারে। অন্যান্য সুসভ্য সম্প্রদায়ের এবং এই ভারতবর্ষেরই অন্যান্য প্রদেশের মুসলমান মেয়েরা ডাক্তার, ব্যারিস্টার, কাউন্সিলার এবং গোল-টেবিল বৈঠকের সদস্য হচ্ছেন, আমাদের মেয়েরা কোন পাপে এই সব সমৃদ্ধি থেকে বঞ্চিত থাকবে?’

১৯৩১ সালের ৮ মার্চ সাধাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির অধিবেশনে ‘ধ্বংসের পথে বঙ্গীয় মুসলিম’ শীর্ষক অভিভাষণটি পাঠিত হয়। বিশ শতকের তিনের দশকের গোড়াতে দাঁড়িয়ে রোকেয়া ভাবছেন বাংলা মুসলমান মেয়েরা কেন অন্যান্য প্রদেশের মেয়েদের সঙ্গে তিনি তাল মিলিয়ে এগিয়ে যাবে না? কেন আধুনিক বিশ্বের জ্ঞান-বিকাশের অংশীদার হবে না? কেন সামাজিক বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রথম সারির একজন হয়ে উঠবে না? কখন রোকেয়া এমন ভাবনা চারিত করতে প্রয়াসী হচ্ছেন? যখন অভিভাবকদের একটা বড়ো অংশ কন্যাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে অনাগ্রহী; যখন কন্যাদের অধিকাংশই বিবাহ করে সংসারধর্ম পালনকে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলে মানতে অভ্যস্ত এবং একাজে উচ্চশিক্ষা লাভের কোনও প্রয়োজনীয়তা নেই— এমন বিশ্বাসেই তারা অনড়; বেশিরভাগ সমাজপতি দ্বী শিক্ষার প্রসঙ্গে উদাসীন, দ্বীশিক্ষা খাতে আর্থিক সহায়তা বা উৎসাহ প্রদর্শন দিবাস্বপ্নেরই সামিল— এরকম একটা সময়ে রোকেয়া বাংলার মুসলমান মেয়েদের টেনে এনে আলোর নীচে দাঁড় করাতে চাইছেন।

এই কর্মকাণ্ডে কত যে অসুবিধার সম্মুখীন তিনি হয়েছিলেন, আজকের পরিবেশ পরিস্থিতিতে বসে তা সম্যক উপলব্ধি করা বোধ হয় আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। প্রত্যাশিত সরকারি সাহায্য মেলেনি, আর্থিক অনটন ছিল লাগাতার, বিভিন্ন জায়গা থেকে সাহায্য এলেও তা ছিল নিতান্তই অপ্রচুর। আত্মীয়, সমাজ, পরিজন—সব জায়গা থেকে নিজে থেকে গুটিয়ে নিয়ে স্কুলটাকে শক্ত জমির উপর দাঁড় করানোর জন্য নিরন্তর লড়াই করে গেছেন তিনি। মাসিক মোহাম্মদীতে রোকেয়া সম্পর্কে আমীনউদ্দীন আহমদ যথার্থই লিখেছিলেন, ‘শিক্ষাহীন বাঙালী মেয়ের জন্য নিজের জীবনকে তিলে তিলে ক্ষয় করিয়াছেন। মনে হয়, সমাজের সহিত তিনি জোয়ান অব্ আর্কের ন্যায় যুদ্ধিয়াছেন, গৃহ শত্রুর সহিত চাঁদ সুলতানার ন্যায় লড়িয়াছেন।’ (‘স্মৃতির অর্ঘ্য’, মাঘ ১৩৩৯, পৃষ্ঠা ২৭০)।

সমাজের সঙ্গে লড়ার, সব শত্রুতাকে তুচ্ছ করে দেওয়ার প্রেরণা তিনি পেতেন বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের উজ্জ্বল মুখচ্ছবি থেকে, তাদের স্বাবলম্বী ভবিষ্যতের কথা ভেবে। সাধাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলের ইতিহাসই রোকেয়ার জীবনেরও ইতিহাস। তিনি বলতেন, ‘... বেহেশতের নিমন্ত্রণ পেলেও স্কুল ছেড়ে যেতে পারব না।’ যেই স্কুলের জন্য বেহেশতের সুখও হাসতে হাসতে ত্যাগ করতে রাজি ছিলেন রোকেয়া, সেই স্কুল চালাতে গিয়ে তাঁকে ‘শুনতে’ হয়েছিল ‘বিধবা রূপ-যৌবন প্রচার করছে’। এইসব কুৎসা, অপবাদ বা ষড়যন্ত্র তাঁকে এতটুকু টলাতে পারত না। বরং সমস্ত প্রতিকূলতা তাঁর মধ্যে এক বোধের উন্মেষ ঘটিয়েছিল। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন ‘যদি সমাজের কাজ করিতে চাও, তবে গায়ের চামড়াকে এতখানি পুরু করিয়া লইতে হইবে, যেন নিন্দা গ্লানি উপেক্ষা-অপমান কিছুতে তাহাকে আঘাত করিতে না পারে, মাথার খুলিকে এমন মজবুত করিয়া লইতে হইবে, যেমন ঝড়ঝঞ্ঝা বজ্র-বিদ্যুৎ সকলই তাহাতে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে।’

দ্বীশিক্ষার বিস্তার না হলে কোনও সমাজ অগ্রসর হতে পারে না—এই প্রত্যয়ে অনড়

রোকেয়া চাইতেন সমাজের বোঝা হয়ে না থেকে নারী যেন সমাজের সম্পদে পরিণত হয়। শুধু পুথিগত বিদ্যা নয়, মেয়েদের মানসিক ও শারীরিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন তিনি। রোকেয়ার এই আধুনিকমনস্কতার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর লেখা একাধিক প্রবন্ধের ছত্রে ছত্রে। তিনি লিখেছেন: ‘... বালিকাদিগকে প্রাথমিক শিক্ষা দিতেই হইবে। শিক্ষা অর্থে আমি প্রকৃত সুশিক্ষার কথাই বলি; গোটা কতক পুস্তক পাঠ করিতে বা দু’ছত্র কবিতা লিখিতে পারা শিক্ষা নয়। আমি চাই সেই শিক্ষা—যাহা তাহাদিগকে নাগরিক অধিকার লাভে সক্ষম করিবে, তাহাদিগকে আদর্শ কন্যা, আদর্শ ভগিনী, আদর্শ মাতা-রূপে গঠিত করিবে। শিক্ষা—মানসিক এবং শারীরিক উভয়বিধ হওয়া চাই। তাহাদের জ্ঞান উচিত যে, তাহারা ইহজগতে কেবল সুদৃশ্য শাড়ী, ক্রিপ ও বহুমূল্য রত্নালঙ্কার পরিয়া পুতুল সাজিবার জন্য আইসে নাই; বরং তাহারা বিশেষ কর্তব্য সাধনের নিমিত্ত নারীরূপে জন্মলাভ করিয়াছে। তাহাদের জীবন শুধু পতি-দেবতার মনোরঞ্জনের নিমিত্ত উৎসর্গ হইবার বস্তু নহে! তাহারা যেন অন্নবস্ত্রের জন্য কাহারও গলগ্রহ না হয়।’

রোকেয়া চাইতেন মেয়েরা যেন অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়। পাশাপাশি বহুমূল্য রত্নালঙ্কারখচিত পুতুল-জীবনের অসারতা নিয়েও যেন তারা সচেতন হয়। রোকেয়ার এই আধুনিক ও সাহসী চিন্তাভাবনা এখনও, এত বছর পরেও প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি। তিনি মেয়েদের শারীরশিক্ষার ও ব্যায়ামের প্রয়োজনীয়তার কথাও বারবার বলতেন। আজকের কলকাতায় পাড়ায় পাড়ায় গজিয়ে ওঠা জিম ও হেলথ ক্লাবের সংখ্যাধিক্যে আমাদের স্বস্তি বোধ করার প্রয়াস অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়। কারণ রোকেয়া মেয়েদের শরীরচর্চাকে দেখেছিলেন মানসিক শিক্ষার পরিপূরক হিসাবে, তাদের স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে গড়ে ওঠার পথে একটি পাকাপোক্ত সেতু হিসাবে। বহিরঙ্গের আকৃতি সংশোধনের উপায় নয়, মেয়েদের শরীরচর্চা ছিল তাঁর কাছে সুস্থ মনের ও নীরোগ শরীরের অধিকারী হওয়ার একটি ফলপ্রসূ পথ। সেই শরীরচর্চা আমাদের নারীসমাজের প্রাত্যহিকতায় আজও অবিচ্ছেদ্য হয়ে উঠতে পারে নি।

বাংলার মেয়েদের আহ্বান জানিয়ে তিনি বলতেন : ‘... মাতা, ভগিনী, কন্যা। আর ঘুমাইও না,—উঠ, কর্তব্য-পথে অগ্রসর হও।’ রোকেয়ার জীবনের সব পথই ছিল আসলে ‘কর্তব্যপথ’। তিনি ওই পথকেই একটা সর্বজনীন পথের চেহারা দিতে চেয়েছিলেন। এজন্য শুধু একটা স্কুল তৈরিতেই থেমে না থেকে একজন প্রকৃত পথস্রষ্টার মতো তিনি নানাদিকে নিজে থেকে ছড়িয়ে দেন। তাঁর ঘটনাবল্ল জীবনের আর একটি স্মরণীয় পরিচয়—তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট সমাজকর্মী ও সমাজ-সংস্কারক।

নারীর ব্যক্তিসত্তার বিকাশের লক্ষ্যে তিনি চেয়েছিলেন নারীমুক্তি ও নারী স্বাধীনতা। এই চাওয়ার ফলস্বরূপ গড়ে ওঠে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল। অন্যদিকে, মুসলিম নারীদের ঐক্যবদ্ধ করে সমাজে তাদের নিজের অধিকার বুঝে নিয়ে তা প্রতিষ্ঠা করতে, দেশ ও জাতি সম্পর্কে সচেতন করতে রোকেয়া প্রতিষ্ঠা করেন ‘আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে-ইসলাম’ বা ‘নিখিল বঙ্গ মুসলিম মহিলা সমিতি’। সেটা ১৯১৬ সালের ফেব্রুয়ারি-মাস। এই সংগঠন ‘Calcutta Mohamedan Ladies Association’ নামেও পরিচিত লাভ করে।

উনিশ শতকে বিভিন্ন সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলনের ফলে হিন্দু নারীদের সামাজিক অবস্থান তুলনামূলকভাবে উন্নত ছিল। তা সত্ত্বেও শিক্ষিত হিন্দু ও ব্রাহ্ম মহিলারা বাল্যবিবাহ,

পগপ্রথা ও বহুবিবাহের বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলেন। বিধবাবিবাহ ও নারীশিক্ষা বিস্তারের জন্য আন্দোলনকারী সমাজ সংস্কারকদের সমর্থন করেছিলেন তাঁরা। সমসাময়িক হিন্দু ও ব্রাহ্ম লেখিকারা নারীর প্রতি সামাজিক অনাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে এবং ক্রীতশিক্ষা বিস্তারের পক্ষে কলম চালিয়েছেন। কামিনী রায়, স্বর্ণকুমারী দেবী, মানকুমারী বসু, সরলাদেবী চৌধুরাণী একাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। 'সখী সমিতি' (১৮৮৬), 'মহিলা শিল্প সমিতি' (১৯০৭), 'ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল' (১৯১০) প্রভৃতি সংগঠন তখন হিন্দু নারীর জাগরণ ও শিক্ষার জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।

বাংলায় তখনও পর্যন্ত কোনো মুসলমান নারীকল্যাণ সংগঠনের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। এ সময়ে যুগ যুগ ধরে প্রচলিত নানাবিধ সংস্কারের করাল গ্রাস থেকে টেনে বার করে এক মুক্ত সমাজে পুরুষের সমান অধিকারে মুসলমান নারীকে প্রতিষ্ঠা করতেই 'আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম' গঠন করলেন রোকেয়া। এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল : "... to promote unity, social intercourse and friendly feeling among Mohamedan Ladies resident in Calcutta by providing them with a common meeting ground, to better the condition of Moslem women in general by eradicating prenicious social customs and by diffusing proper and useful knowledge, and to establish and conduct an industrial school for poor and needy Mohamedan women with a view to qualify them to earn their own livelihood."^{৩০}

সেসময়ের মুসলমান সমাজ ছিল কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। রোকেয়া তখন এই সমিতি গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে লোকের দোরে দোরে ঘুরেছেন। মুসলমান মেয়েরা গৃহকোণ ছেড়ে প্রকাশ্য সভাসমিতিতে যোগ দেবেন, এ কথা কেউ কল্পনাও করতে পারেননি, মেনেও নিতে পারেননি। ফলে রোকেয়াকে প্রভূতভাবে হেয় ও হাস্যাস্পদ হতে হয়েছিল। তবে তিনি হাল ছেড়ে দেননি। দিনের পর দিন মুসলিম মেয়েদের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছেন তিনি। বোরখার আড়াল থেকে তাদের টেনে বার করে এনেছেন বাইরে, মুক্ত আলোয়। 'হতভাগিনীদের' শেকল কাটার চেষ্টায় রোকেয়া বছরের পর বছর অতিবাহিত করেছিলেন।

'আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম'-এর কার্যাবলি বহুমুখী হলেও মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল মহিলাদের স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা। নারীসমাজ সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যা, যেমন বিবাহ, তালাক ইত্যাদি সম্পর্কে মহিলাদের সচেতন করে তোলাও এই সমিতির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল। এছাড়া শিক্ষা ও শিশুপালন ইত্যাদি বিষয়ে নারীদের অবহিত করাও আঞ্জুমানের কাজের আওতার মধ্যে পড়ত।

নারী আন্দোলনকে সফল করার জন্য রোকেয়া প্রতিষ্ঠিত আঞ্জুমান নানাভাবে মহিলাদের সচেতন করার চেষ্টা চালিয়ে গেছে। দেশ ও সমাজের স্বার্থে আঞ্জুমানের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। স্বদেশি ও খেলাফত আন্দোলনের সময় রোকেয়ার নেতৃত্বে এই সমিতি দেশ ও সমাজের বহু কাজ করেছে। সমিতির সদস্যরা বাড়ির বাইরে এসে সক্রিয় ও প্রত্যক্ষভাবে স্বদেশি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেননি ঠিকই, কিন্তু মুসলমান মেয়েদের মধ্যে স্বদেশি ভাবধারা প্রচারে তাঁরা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সে সময়টায় ছিল চরকা আন্দোলনের ঢেউ। রোকেয়ার নেতৃত্বে আঞ্জুমানের মহিলারা চরকা কেটে প্রচুর পরিমাণে সুতো তৈরি করে খন্দর বুনতে সাহায্য করেন। বিদেশি জিনিস বর্জনে সমিতির কর্মীরা প্রশংসনীয়ভাবে এগিয়ে আসেন।

রোকেয়া প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ না করলেও রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্রে থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন ছিলেন না। কংগ্রেস আন্দোলনের অন্তরালে তিনি নীরবে স্বদেশের স্বার্থে কাজ করেছেন। ১৯১৭ সালে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে আলি জননী বি-আম্মা ও অ্যানি বেসান্টের কলকাতা আগমন উপলক্ষ্যে যে স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনী গঠিত হয়েছিল, সেই স্বেচ্ছাসেবিকা দলে বহু মুসলমান মহিলা যোগ দিয়েছিলেন। এই বাহিনী সংগঠনে রোকেয়ার ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। কমলা দাশগুপ্ত রোকেয়াকে ‘বিপ্লবী’ নেতা হিসাবে চিহ্নিত করে বলেন, “...‘অবরোধবাসিনী’ পুস্তকে তিনি বাংলা ও বিহারের অবরোধবাসিনী মহিলাদের জীবনের যে বেদনাতুর চিত্র তুলে ধরেছেন তা সমাজ-ব্যবস্থার মূলে কুঠারাঘাত হানবার জন্য প্রেরণা জাগিয়েছে। এদিক থেকে তিনি বিপ্লবী। প্রত্যক্ষভাবে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান না করলেও অনগ্রসর সমাজের নারীদের মধ্যে দেশানুরাগ জাগাবার যে প্রচেষ্টা তিনি সারাজীবন ধরে করে গেছেন তার মূল্য কম নয়।”^{১১}

স্বদেশের স্বাধীনতা রোকেয়ার স্বপ্ন ছিল। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রোকেয়া উপলব্ধি করেন, দেশের স্বাধীনতা অর্জন ও সেই স্বাধীনতা বজায় রাখার জন্য সব থেকে আগে দরকার নারী স্বাধীনতা। তাই শুধু ‘আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম’-এর বিপুল কর্মকাণ্ডের মধ্যে তিনি তাঁর সমাজকর্ম সীমিত রাখেননি। ‘নিখিল ভারত মহিলা সমিতি’-র তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান সদস্য। এছাড়াও স্ত্রীশিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত ‘Bengal Women's Educational Conference’-এর সঙ্গেও রোকেয়া নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন। নারীকল্যাণ, বিশেষত নারীশিক্ষা বিষয়ে আলোচনা, সমালোচনা ও মতামত বিনিময়ের মাধ্যমে একটি কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা ছিল এই সম্মেলনের লক্ষ্য।

রোকেয়ার জীবন ও সময় বিশ্লেষণ করে, তাঁকে অনায়াসেই রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। হিন্দু সমাজে নারীকে ‘মানুষ’ পরিচয়ে পরিচিত করে তোলার ক্ষেত্রে রামমোহন বা বিদ্যাসাগর যে পথে হেঁটেছিলেন, মুসলমান মেয়েদের শিক্ষা ও মুক্তির দিশা দিতে রোকেয়াও তেমনই এক বন্ধুর পথের পথিক হয়েছিলেন। ১৯৩২ সালের ৯ ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়। আমৃত্যু তিনি ‘সমাজের অর্ধঅঙ্গ’ নারীকে স্বীয় পরিচয়ে পরিচিত করার সাধনায় রত ছিলেন। তিনি বলতেন, ‘আমরা সমাজেরই অর্ধঅঙ্গ। আমরা পড়িয়া থাকিলে সমাজ উঠিবে কিরাপে? ... পুরুষের স্বার্থ এবং আমাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে—একই। তাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যাহা আমাদের লক্ষ্যও তাহাই।’^{১২}

এক্ষেত্রে তিনি আর নারীকে শুধু নারীত্ব আবদ্ধ রাখতে চাননা। রোকেয়া চাইতেন মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ—সম্প্রদায় ভেদাভেদ ভুলে সকলের বিকাশ। সেখানে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের একটাই পরিচয়—মানুষ।

আজকের নারী যখন তার মানসিক মুক্তি, আর্থিক স্বাভাব্য ও সম অধিকারের দাবিতে সোচ্চার হয় তখন রোকেয়ার মতো যারা একদিন এই পথে হেঁটেছিলেন তাঁদের আদর্শ-স্বপ্ন-লক্ষ্য পথপার্শ্ববর্তী আলোকস্তম্ভের মতো আলো ছড়াতে থাকে। আধুনিকমনস্ক-সাহসী-দৃঢ়চিত্ত ও ইসব মহান মানবমানবীর প্রেরণা সম্প্রদায়-লিঙ্গ-জাতি ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডী অতিক্রম করে সমগ্র মানবকুলের উত্তরণে শরিক হয়ে ওঠে।

সূত্র নির্দেশ :

- ১ রোকেয়া-জীবনী, শামসুন নাহার মাহমুদ, বুলবুল পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ১৩৪৪; পৃষ্ঠা ১৯
- ২ তদেব; পৃষ্ঠা ১।
- ৩ রোকেয়া রচনাবলী, সম্পাদিত আবদুল কাদির, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৩৮০; পৃষ্ঠা ২৮৯।
- ৪ রোকেয়া-জীবনী; পৃষ্ঠা ৩৭।
- ৫ রোকেয়া রচনাবলী; পৃষ্ঠা ১৮।
- ৬ রোকেয়া-জীবনী; পৃষ্ঠা ৪৩।
- ৭ রোকেয়া রচনাবলী; পৃষ্ঠা ২৭৬-৭৭।
- ৮ রোকেয়া-জীবনী; পৃষ্ঠা ৬৯।
- ৯ রোকেয়া রচনাবলী; পৃষ্ঠা ২৭১।
- ১০ *The Mussalman*, Vol. XII, June 14, 198, N 28; p. 7.
- ১১ স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী, কমলা দাশগুপ্ত, কলকাতা, ১৩৭০; পৃষ্ঠা ২৮৫।
- ১২ রোকেয়া রচনাবলী; পৃষ্ঠা ২১।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : প্রযুক্তি শিল্পসাধক

অরুণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

এক

রবীন্দ্রনাথ অস্ত্রাচলে। শোকে ভেঙে পড়া, জোড়াসাঁকোয় সেদিন কত না মানুষের ভিড়। বাহিরে, ভিতরে। দ্বারকানাথের সাবেক ফটক প্রায় ভেঙে পড়েছে। হাজার হাজার মানুষের ঢল এসেই চলেছে জোড়াসাঁকোর ধারে। লোক সামলানো প্রায় অসম্ভব। এদিকে মহর্ষিভবনে, বিচিত্রার ভেতরে নানান ঘাত প্রতিঘাত। একদল বলছেন, শান্তিনিকেতনে নিয়ে যাওয়া হোক কবির মরদেহ। ওখানেই হবে শেষ কাজ। অন্যদলের মত কলকাতা। এখানেই শেষ নয়। মতবিরোধ, শেষ সংকার নিয়েও। শুনী ব্যক্তিদের প্রশ্ন শেষকৃত্যের ব্যবস্থা কি করা হবে। জোড়াসাঁকোয় সেদিন অনেকেই দ্বিধাবিভক্ত। অনিশ্চিত অবস্থা। প্রয়োজন নিশ্চিত সিদ্ধান্তের।

প্রতিমা দেবী অসুস্থ অবস্থায় শান্তিনিকেতনে। বিশ্বভারতী আর সেদিনের কলকাতা সমাজের ব্যক্তিত্বের ভিড়। রবীন্দ্রনাথ গত কমান্ডের নানান ধখলে, পরিশ্রান্ত। অসুস্থ অবস্থায় শয্যা নিয়েছেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সাবেক ঘরে, তিনতলায়। খবর পৌঁছেছে টানা পোড়েনের। শোকে মুহাম্মান। অসুস্থ। অথচ মাথা ঠাণ্ডা। নানান উৎকর্ষ আর মতবিরোধের সমস্যার সমাধান করলেন, অল্পসময়ের মধ্যেই চিরকুটের ওপর ছোট্ট দুটি লাইন লিখে পাঠালেন :

শান্তিনিকেতন নয়, কলকাতা

Crematorium নয়, নিমতলা।

এমন সংকটে যিনি মাথা ঠাণ্ডা রেখে, ছোটো ছোটো কটি শব্দে বড়ো সমস্যার সমাধান করতে পারেন, তাকেই তো বলে যোগ্য ব্যক্তিত্ব। স্থিতধী ডিজাইনার। প্রযুক্তিশিল্পী একই সাথে কবির জন্মস্থান ও শেষ দিনটিও তো কলকাতায় রয়ে গেল। এমন পেশাদার ব্যক্তিত্বই পারেন বড়ো মাপের কোনো ঘটনাকে জেনে বুঝে স্বল্প পরিসরে, অল্প সময়ের মধ্যেই সিদ্ধান্তে আসতে। যেমন পেরেছিলেন তিনিই, শান্তিনিকেতনে ফিরেই, রবীন্দ্রসংগ্রহশালার প্রস্তুতি নিতে। পরের বাইশে শ্রাবণেই (১৯৪২) যা বেশ ভালোরকম কাজের রূপ পেয়েছিল। একনিষ্ঠ রবীন্দ্রসাধক, গুরুদয়াল মল্লিক, এই প্রদর্শনশালার প্রথম অধ্যক্ষরূপে কাজের ভার নিলেন। শুরু হল রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে গবেষণা এবং সংগ্রহশালার আরও গভীর কাজ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহের রবীন্দ্রনাথের অনেক মূল্যবান স্মারণিক জিনিস দিলেন সংগ্রহশালায়। এল রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি, চিঠিপত্র, ব্যবহৃত বই আরও কতকী।

প্রকাশিত হল বিশ্বভারতী পত্রিকা। প্রথমে প্রমথ চৌধুরী পরে রবীন্দ্রনাথ সম্পাদনা কাজের দায়িত্ব নিলেন।

বিশিষ্ট পরিকল্পনাকারের অনেক গুণই তাঁর ছিল। পৃথিবীর যেখানেই রথীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যখন যেমন বিবরণ ও খবর প্রকাশিত হত, রথীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যখন যেমন বিবরণ ও খবর প্রকাশিত হত, রথীন্দ্রনাথ সেইসব সংগ্রহের স্থায়ী ব্যবস্থা করেন, সেই কবে যখন তিনি কবির সঙ্গে লগুনে গীতাঞ্জলি ভ্রমণে গিয়েছেন, ১৯১২ সালেই, দূরদর্শিতার লগুনের সবচেয়ে নামি International Newspaper Clipping Service-এর গ্রাহক হন। এমন ব্যবস্থা করেছিলেন যাতে সংবাদপত্রে রথীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত সবরকম উল্লেখ, কটিকা আকারে জড়ো হয়। সবই আসতে থাকল। পরবর্তীকালে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে রথীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত কটিকা একত্রিত হয়ে সমৃদ্ধ করেছিল রথীন্দ্রতথ্য, সংগ্রহশালা। প্রখর অনুভূতিতে ভবিষ্যৎকে বুঝতে পারা, এবং তাড়াতাড়ি নিখুঁত সিদ্ধান্তে আসতে পারার বিরল গুণ না থাকলে আধুনিক ডিজাইনার হওয়া যায় না। রথীন্দ্রনাথের যেসব গুণ ছিল। সঙ্গে ছিল সুভদ্র আচরণ, ঠাকুরবাড়ির মানানসই ব্যবহারের আভিজাত্য ও শালীনতা। পিতামাতার প্রতি হৃদয়ের ভালোবাসা। অথচ কত নীরব। কিন্তু সবল। শান্তিনিকেতন-রথীন্দ্রভবনের কাজ করতে গিয়ে ক্ষিতীশ রায় অবৈক্ষক রূপে একদিন আবিষ্কার করেন, কবিপত্নী মৃণালিনী দেবীর একটি খাতা ও তাঁর শেষ ব্যবহারের চটিজুতো সযত্নে রাখা রয়েছে।

জ্যোড়াসাঁকোয় ১৯০২ সালের ২৩ নভেম্বর মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু হয়। তার পরদিন রথীন্দ্রনাথকে ডেকে নিয়ে মায়ের সেই চটিজুতো কিশোর রথীর হাতে দিয়ে রথীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ‘এটা তোর কাছে রেখে দিস। তোকে দিলুম।’ পিতার আদেশ পালন করেছিলেন, বুঝেছিলেন কথা-কটির সুদূরব্যাপী-অর্থময়তা। কতই বা বয়স তখন চোদ্দো বছর। শ্রদ্ধায়, যত্নে লালন করেছেন মাতৃস্মৃতি পিতৃস্মৃতি। নিজের জীবনে ও কাজে চলমান স্মৃতিশিক্ষা প্রয়োগ করেছেন। তবে উচ্চকিত লোক দেখানিতে নয়, নীরবে গভীর কাজের প্রয়োগে। অনেক পরে প্রায় পঞ্চাশ বছরের ব্যবধানে রথীন্দ্রনাথ দিনটির প্রসঙ্গে বলেছেন, ‘এই দুটি কথা বলেই (বাবা) নীরবে তাঁর ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। মায়ের চটি এখন রথীন্দ্রসদনে সযত্নে রক্ষিত আছে।’ এই রথীন্দ্রসদনই পরে বড়োমাপের গবেষণা ও প্রদর্শনশালায় পরিণত হল। প্রতিষ্ঠা হল; বিশ্বভারতী রথীন্দ্রভবনের। আজ দেশ বিদেশের গবেষকদের কাছে যা অপরিহার্য। যার প্রথম উদ্যোক্তা ছিলেন রথীন্দ্রনাথ।

দুই

১৯৪৩ সালের বাইশে শ্রাবণ। রথীন্দ্রনাথ হিমালয়ের আশ্রয়ে, কালিম্পঙে বসে আঁকছেন ‘হিমালয়’। গড়ে উঠছে আর এক চিত্রভানু স্থাপত্য। মিলিয়ে নিয়ে নানা বাগানের স্থাপত্য শোভা। জ্যোড়াসাঁকোর বাড়ির অন্দর ও বাহিরের আলোছায়া। বারান্দার কোল, ঘরের কিনারা—সবই আজ এক রূপে, নির্মিত হয়েছিল উদয়নে, গুহাঘরে শান্তিনিকেতন চিত্রভানুতে—এবার কালিম্পঙে পাহাড়ি চিত্রভানুতে। আর জীবনের উপাশ্তে ১৯৫৪-৫৬ সাল নাগাদ মিতালিতে। দেবাদুনের রায়পুরে। এবারো পাহাড়ে।

মনমেলানো প্রাণমাতানো পরিবেশ নির্মাণের হাত ছিল রথীন্দ্রনাথের। সঙ্গে ছিল ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রযুক্তি শিক্ষা। সবুজ প্রযুক্তির প্রতি স্বাভাবিক ঝোঁক। আর ছিল ঠাকুরবাড়ির শিল্প ঘরানা। বাবার সৃষ্টির বন্যা। প্রায় সবই মেলাতে চেয়েছেন, প্রয়োগ শিল্প-প্রযুক্তিতে। সবুজ পরিসরে।

শান্তিনিকেতনে উত্তরায়ণ পরিকল্পনার বড়ো উদ্যোগী ছিলেন রথীন্দ্রনাথ। রথীন্দ্রনাথের পরিবেশ নির্মাণ ভাবনার আকারায়িত দর্শন যেন গড়ে উঠতে থাকল, রথীন্দ্রনাথ ও সুরেন করের যোগ্য নেতৃত্বে। গৃহস্থাপত্যের সঙ্গে সম্প্রসারিত পরিসর বিন্যাস উদ্যান স্থাপত্য। প্রতিস্থাপন শিল্প ও থাকল মিলেমিশে। বন্ধুশিল্পের আমন্ত্রণে। এমন বন্ধুশিল্প প্রসঙ্গ করেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। যেখানে ছবি, মূর্তি, দেওয়াল ছবি এমনকি আকারায়িত পুতুলশিল্পের দলও মিলেমিশে থাকতে চাইত সাহিত্যে, নাটকে গানে, যাত্রাপালায়। গগনেন্দ্রনাথ যোগ করলেন, ছাপ ছবি, হস্তশিল্প, বয়নশিল্পের গৌরব। রথীন্দ্রনাথের আশা ভারসার ঘটিতে বাঁটিতে ভিত্তিশিল্পে, জীবনযাপনের অঙ্গশিল্প যেন আপনা-হতে, এক অভিনব প্রয়োগ শিল্প আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আসন পেতে নিল। যার শুরু ১৯১৫-১৬ সালে জোড়াসাঁকোয় বিচিত্রাক্লাব শিল্প আন্দোলনে। প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন রথীন্দ্রনাথ। রথীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, রথীন্দ্রনাথ—একযোগে এই বিচিত্রাক্লাব ঘিরে নানা প্রয়োগ শিল্পের মালা গড়েছেন। নন্দলাল, সুরেন কর, অসিত হালদার, কালীনাথ দেবল, মুকুল দে, প্রতিমা দেবী একসঙ্গে কাজ করেছেন। জাপানি শিল্পী কাম্পো আরাইসন এসেছেন। আসবাব স্থাপত্য কাজে আচারি যোগ দিয়েছেন। সে যেন নতুন প্রয়োগ শিল্প ডেউ উঠল বাংলায়। অনেকটাই প্রায় শিল্পপ্রযুক্তির রেনেসাঁর মতন, স্থাপত্য, ছবি, ভাস্কর্য, উদ্যান বিন্যাস, আরও কত ধরনের লোকশিল্প, প্রথাগত প্রযুক্তি, মিলেমিশে নতুন বিন্যাসে আকারায়িত হয়ে চলল।

একজন দক্ষ ও দরদি-ডিজাইনার প্রথমই ঠিক করে নেন, সময়ের প্রেক্ষাপটে, সমাজে কী চাওয়া হচ্ছে। ভালো কাজের সাড়া জাগিয়ে রাখতে দৈনন্দিন শিল্প-সংস্কৃতিকে প্রয়োগশিল্পের আকারে মানুষের দোরগোড়ায় মনের কাছাকাছি আনতে হয়। কাজটি যদিও কঠিন কিছুটা 'বিমূর্ত' বলা যায় কি ?

বিদেশে পড়াশোনা শেষে (ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে Agri Haticulture, ১৯০৬-০৯) জোড়াসাঁকোয় দেখলেন, অবনদাদা, গগনদাদা আশ্চর্য সব নতুন ধারার শিল্পচর্চা করে চলেছেন বারান্দায়, দালানে, মাঝে মাঝে শুণী ছাত্রেরাও আসছেন, যাঁরা আধুনিক ভারতের শিল্প আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে পারেন—নন্দলাল, অসিত হালদার, সুরেন কর। রথীন্দ্রনাথও মেতেছেন গ্রামীণ শিল্প লোকশিল্প-সংস্কৃতির সংরক্ষণ কাজে। লোকস্থাপত্য, কারুপণ্য, মেয়েদের ব্রত-পাঁচালি, শাড়ির পাড়, বড়ি, সুপুরিকাটার শিল্প, ঘটি-বাঁটি শিল্প সৌন্দর্য সব ভেসে যেতে বসেছে, বিদেশের বেখাপ্পা পণ্যতোড়ে। ঘরের অন্দর-শিল্প সৌন্দর্য-সম্ভ্রা, আসবাব-সবই বিদেশ থেকে আসা জ্বরজঙ্গে ঠাসা। স্থাপত্যর আঙ্গুরিচয় যেন সংকটে। নড়বড়ে ডিজাইন নিয়ে বিশ্বসংস্কৃতির আকাশে প্রাচ্য তা হলে মিলবে কেমন করে। কলকাতা, বাংলাদেশ তখনও তো ভারতের নতুন আশার বাণী। প্রাচ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাপানি শিল্প ও শিল্পীরা জোড়াসাঁকোয় আসছেন। গগনদাদা, দারুশিল্পী আচারিকে দিয়ে নতুন আসবাব-স্থাপত্যের কথা ভাবছেন। উড় কাঁচারদের নতুন শৈলীতে আনার চেষ্টা চলছে। আর্ট-ক্রাফট আন্দোলনের এই তো সঠিক সময়।

রথীন্দ্রনাথও চাইছিলেন, শিল্পীরা কেবল ইজেল আঁকড়ে থাকবেন, তা হয় না। দৈনন্দিন শিল্প স্থাপত্যও তাঁদের ভূমিকা পালন করতে হবে। সঠিক Public art architecture দেশের নতুন রুচির চর্চা নিয়ে আসতে পারে। দেশজ লোকজ আঙ্গুরশক্তি মেলাতে, লোকশিল্প-সংস্কৃতির পাশাপাশি শিল্পস্থাপত্যের ব্যাপক চর্চার প্রয়োজন। প্রয়োগশিল্পের প্রবর্তনায় বিচিত্রা সভা-বিচিত্রা

ক্লাবের কাজে আত্মনিয়োগ করবেন রথীন্দ্রনাথ। তার আগে চারুশিল্প-কারুশিল্প নিয়ে বড়ো একটা মাথা ঘামাননি। কিন্তু এখানে এসে দেখলেন গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ এবং তাদের শিল্পীশিষ্যেরা কতরকম কাজ করছেন। সমস্ত কাজগুলো মিলিয়ে একটা সংগঠিত স্টুডিও ও প্রয়োগশিল্পের কাঠামো গড়ে তোলা দরকার। বিচিত্রা ক্লাব গড়ে উঠল। উদ্দেশ্য ছিল art এবং craft-এর মধ্যে সখ্যভাব ও আদানপ্রদান গড়ে তোলা। প্রস্তুত করা গ্রহণযোগ্য, উৎপাদনযোগ্য শিল্পসামগ্রী, দৈনন্দিন শিল্পস্থাপত্য।

আগেই গগনেন্দ্রনাথকে উৎসাহিত করেছিলেন রথীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতির illustration করার কাজে। সেসব ছবি গগনেন্দ্রনাথকে নতুন করে পরিচিত করেছিল। রথীর প্রিয় ছিল গগনদাদা। কারণ সম্পূর্ণ ডিজাইনার ও শিল্পসংগঠক যেন গগনদাদাই। এদিকে বিচিত্রার লিথো মেশিনে ব্যঙ্গচিত্র ছাপা হচ্ছে। গগনদাদা বাবার ও অন্যদেরও অভিনব পোশাক ডিজাইন করছেন। তিব্বতি খাঁচের বকু-পোশাক তৈরি হতে লাগল। রথীন্দ্রনাথের পোশাক-পরিচ্ছদ ও মাথার টুপি ডিজাইন করলেন রঙে। কারমাইকেলের সাহায্যে, গগনেন্দ্রনাথের উদ্যোগে বিচিত্রা থেকেই বাংলার কারুশিল্পের পুনরুদ্ধারের জন্য বেঙ্গল হোম ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশন গড়ে উঠল। হগ্‌স্ট্রিটের এম্পোরিয়ামে দেশজ শিল্পপণ্য বিশেষ খ্যাতি লাভ করল। মুর্শিদাবাদের রেশম শিল্পেরও যেন পুনরুজ্জীবন ঘটল। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার গড়ে উঠল। যেখানে গ্রাম বাংলার নিত্য শিল্প ও লোক সামগ্রী, শাড়ি, ঘরকন্নার তৈজসপত্র পাওয়া যেতে পাগল।

বিচিত্রার কাজে, শিল্পসংগ্রাহকদের বাংলার গ্রামাঞ্চল থেকে উপযুক্ত কারুশিল্পের নিদর্শন, আলপনা, ছুঁচের ফোঁড়ের কাজ, আসন, কাঁথা, মাটির বাসন, বাঁশ ও বেতের কাজের নমুনা জোগাড় করার কাজে লাগানো হল। আলপনার নকশা, ছেলে ভুলানো ছড়া, গ্রামের ব্রতকথা নিয়ে গবেষণা শুরু হল, জোড়াসাঁকোর বিচিত্রায়। পরে, অবনীন্দ্রনাথ এগুলিকেই একত্রিত করে বাংলার ব্রত বইটি প্রকাশ করেন। রথীন্দ্রনাথের কাজের প্রশংসা করলেন, রথীন্দ্রনাথ। জানালেন (জুলাই ১৮, ১৯১৫) : ‘... তাদের ক্লাব এবং ইস্কুল কীরকম চলছে। বিচিত্রার কাজ যাতে বেশ ভালোরকম এগোয় সেজন্যে ভাবিস ক্রমে ওটাকে নিবে যেতে দিসনে।’

রথীন্দ্রনাথ গৃহস্থাপত্য বিন্যাসেও গ্রহণ করলেন ঠাকুর বাড়ির ডিজাইন উদ্যোগ (দ্বারকানাথ থেকে রথীন্দ্রনাথ), ভারতীয় স্থাপত্য ঐতিহ্য সঙ্গে নিলেন সদ্‌্য অভিজ্ঞতা ও হাতে কলমে শিখে আশা পাশ্চাত্য স্থাপত্য-শিল্পের প্রকরণ প্রযুক্তি।

রথীন্দ্রনাথ বাসযোগ্য পরিবেশ রচনায় জীবনযাপনের মূল্য, মান, দুটিকেই গুরুত্ব দিতেন। অভিজ্ঞতায় বুঝেছিলেন বলেই প্রথমে শান্তিনিকেতন পরে শ্রীনিকেতনে প্রতিমা দেবীর সহযোগিতায় কারুশিল্প উদ্যোগের কাজ শুরু করলেন। কাজের সূত্র অনুসন্ধান এবং প্রাসঙ্গিকতা-দুই-ই এবার যেন আরও স্পষ্ট হবে। রথীন্দ্রনাথের দুটি বড়ো সাধনা—শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন। স্তান ও কর্ম। প্রকৃতি আশ্রিত চিরন্তন সত্যের অনুসন্ধান ও মানুষের ভাতকাপড় এবং প্রাণের সহজ শিল্পের প্রকাশ। রথীন্দ্রনাথের তিনটি প্রধান সাধনা—শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের রূপ গড়ে তোলা; সুদক্ষ কৃষি-কারিগরের নির্মাণ দর্শনে বিশ্বাস ও প্রকাশ; তৃতীয়—রথীন্দ্রনাথ। তিনটি সাধনার সমন্বয় সাধনাই, তার বিচিত্রা পর্বের পর থেকে অর্থাৎ ১৯১৮ থেকে ১৯৫১ প্রধান কাজ। ১৯৫১ থেকে জীবনের উপান্ত ১৯৬১ সাল পর্যন্ত শিল্পী-ডিজাইনার, লেখক রথীন্দ্রনাথকে পাওয়া যাবে। যেখানে তার তিনটি প্রধান সাধনাই এসে পড়বে সৃষ্টি রহস্যে, জানাকে আকারায়িত

করার সাধনায় এবং অবশ্যই সবুজ হাতের নতুন জেগে ওঠায়। মা-বারার স্মৃতি, নির্মিত পরিবেশ আকারে যেন আপনা হতে স্বচ্ছন্দ শিল্পবিলাসে ও বৈভবে মর্যাদা লাভ করল। জীবনযাপনে শিল্পীর এত বড়ো আত্মপরিচয় প্রায় বিরল বলা চলে।

তিন

রথীন্দ্রনাথ বলতেন জন্মেছি শিল্পীর বংশে, শিক্ষা পেয়েছি বিজ্ঞানের; কাজ করেছি মুচির আর ছুতোরের। বিশ্বভারতীর সচল পর্বে প্রয়োগশিল্পী রথীন্দ্রনাথকেও লাভ করব।

চামড়াকে ট্যানিং করে তার ওপর ছবি ও নকশা মিলিয়ে, কত না রঙে সাজিয়ে দৈনন্দিন শিল্প গড়ে তুললেন। হাতব্যাগ, ফাইল, ফোলিও ব্যাগ, লেদার কেস, বাস্র এমন কত ধরনের জিনিস। চামড়াশিল্পকে ডিজাইন প্রযুক্তিতে রূপান্তরিত করে ব্যাপকভাবে বিপণন ব্যবস্থা গড়ে উঠল। এই কাজে স্থানীয় কারুশিল্পীরা উপকৃত হল। বিক্রি থেকে ভালো রোজগার এল। স্বনির্ভরতার আশা ক্রমশই জেগে উঠতে লাগল। আরও একটি মৌলিক কাজ হল, শান্তিনিকেতন ডিজাইন—দেশে-বিদেশে প্রসারিত হতে লাগল। কলাভবনের শিল্পীরা ভালো ভালো নকশা দিতেন—কারিগরি কৌশলে চামড়ার নানান জিনিস প্রয়োজনের সঙ্গে শিল্পকে মিলিয়ে দিতে পারল।

কাঠের কাজ রথীন্দ্রনাথের প্রাণের সম্পদ। আজীবনই নিজের হাতে কাঠের কাজ করে গেছেন। শ্রমসুন্দর শিল্পীর রূপটি আরও নিবিড়ভাবে পাওয়া যায় তার আসবাবপত্র নির্মাণে। রোজকার শিল্পদ্রব্য গড়ে তোলায় কী করলেন রথীন্দ্রনাথ, সেই আলোচনাটাই করি। গগনেন্দ্রনাথ বিচিত্রায় আচারিকে নিয়ে কাঠের কাজ, আসবাবপত্র ও অন্দরসজ্জার যে নতুন বিন্যাস গড়ে তুলেছিলেন, রথীর নজর ছিল অভিনব ধারার সেই সূত্রটিতে। এবার শান্তিনিকেতনে এসে, প্রতিমাকে নিয়ে ‘বিচিত্রা কারুসংঘ’ গড়ে তুলেন। কাঠের কাজ, চামড়ার শিল্প, সেরামিক, পট্টারি, গালাশিল্প, ছবি, মূর্তি, বয়নশিল্প—সমস্ত মিলিয়ে যেন নতুন ধারার Landscaped Interior গড়তে লাগলেন। যেখানে লোকশিল্প ও প্রথাগত শিল্প মিলেমিশে দুই বোনের আনন্দ শক্তি মেলে ধরবে। যেমন বাগান, ফল-ফুল, গাছ, মাটি, স্থাপত্য, আলোছায়া, পথ-বিশ্রাম-মিলিয়ে জমির মাধুর্য গড়ে ওঠে—ল্যান্ডস্কেপ এক্সটেরিয়ারে; সেই ধাঁচটি অভিনব আঙ্গিকে নতুন প্রাণে সহজ-সরল সুন্দরের আমন্ত্রণে ল্যান্ডস্কেপ ইন্টেরিয়ার এর বিন্যাসে দেখা দিল। ফরাসি দেশের গুণী শিল্পী আঁদ্রে কার্পেলস প্রতিমা দেবীর সঙ্গে শান্তিনিকেতনে যোগ দিলেন। সুইডিশ স্নয়েড পদ্ধতির বয়নশিল্পে শিক্ষিত লক্ষ্মীশ্বর সিংহকে দলে নিলেন। জাপানি দারুশিল্পী কিন্তারা কাসাহারা, ১৯২২ সালের এপ্রিল মাস থেকে শ্রীনিকেতনে এলেন। পরে কোনোসান ও রথীন্দ্রনাথকে কাঠের কাজ ও আসবাবপত্র নির্মাণে সাহায্য করবেন।

সম্পূর্ণ অন্দর-পরিকল্পনা ও অন্দর-সজ্জার কাজে একটি ভালো প্রয়োগ শিল্পীর দল বিচিত্রা কারুসংঘে দানা বেঁধে উঠল। কাজও এগিয়ে চলল। উত্তরায়ণ অন্দর-স্থাপত্য, আসবাব, প্রতিটি ব্যবহারিক কাজের জিনিসের মধ্যে শিল্পের ছোঁয়ায়, রবীন্দ্র-শিল্প-আশা সচলায়িত হয়ে উঠল। বিচিত্রা কারুসংঘের প্রতিবেদনে লেখা হয়েছিল, শিক্ষিত ডিজাইনাররা দূর দূর প্রান্তে গিয়ে পেশাগত কাজ নেবে। ডিজাইন ও নির্মাণ একই সঙ্গে করতে পারবে। অন্তরসজ্জা, গৃহস্থাপত্য, বাটিক, সেরামিক, পোড়ামাটির শিল্প-সামগ্রী, গালাস কাজ, চামড়ার শিল্প, বাঁশ-

বেতের কাজ, তাঁতের ও কাঠের তৈরি ব্যবহারিক শিল্প, এমনকি আলপনা, গ্রামীণ লোক-নকশা ছড়িয়ে পড়ল নতুন ভাবে, ভাষায় ও নির্মিত অবয়বে। এই থেকেই গড়ে উঠেছিল শিল্পভবন। পরে স্থানান্তরিত ও রূপান্তরিত হয়ে শিল্পসদন।

নন্দলাল, সুরেন কর, অসিত হালদারদের সঙ্গে কারুশিল্পীদেরও যোগ করলেন। সঙ্গে গ্রামের লোক শিল্পী, কারিগর, আদিবাসী শিল্পকেও শ্রদ্ধায় গ্রহণ করলেন। এ সময় ও রূপের প্রকাশে। নিজের আয়তনের বাগান-শিল্প অন্দর সম্ভার গাছপালাও মিলতে থাকল। সমন্বয়ী পূর্ণ সচল অন্দর-বাহির শিল্প সম্ভার ও শিল্প-উৎপাদন ব্যবস্থা নতুন পথের-সন্ধান এনে দিল। যেখানে এক ঘেয়ে মেশিনে তৈরি, শিল্পহীন বস্ত্রসামগ্রী ও বিদেশ থেকে আসা নিছক দামি দামি বস্তুর বৈভব থেকে মুক্তির রাস্তা গড়ে উঠল। স্বাধীন চিন্তার কাজে রথীন্দ্রনাথ শ্রীনিবেশেন বিদ্যুৎ মেশিন চালিত পাওয়ার লুম, পটারিশিল্প এবং কাঠেরাই ও কার্ভিং কাজের ব্যবস্থা করলেন। শিল্প রইল, জেগে রইল রথীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তা লোকজ শিল্প সমাজ আধুনিক হল উৎপাদন ব্যবস্থা। পাশ্চাত্যের উৎপাদন-কাঠামো 'Hall of Industries' ধাঁচে গড়ে তুললেন শ্রীনিবেশেন কতরকম কাঠের নমুনা, বিভিন্ন আকার, রং, আঁশ, ছাপ—মিলিয়ে ভারতের কাঠের বৈচিত্র্য ও সম্পদ নিয়ে—প্রথম একটি কাঠের উপাদান ও কাঠের টালির রেফারেন্স ল্যাবরেটরি গড়ে তুললেন। পরবর্তী সময়ে রথীন্দ্রনাথের স্টুডিও ও কর্মশালা—উত্তরায়ণের গুহা ঘরে (১৯৩২) সেই নমুনা ব্যাক ছিল।

আসবাবপত্র, জ্যামিতিক ছন্দের সঙ্গে ভারতীয় স্থাপত্যশৈলীর করবেলিঙের রূপের মিশ্রণ ঘটালেন। যার খুব বড়ো প্রমাণ উদয়নের (১৯২১-৩৪) বসবার, খাওয়ার, শোওয়ার ঘরে আজও রয়েছে। সমান প্রাণে, প্রাসঙ্গিকতার আনন্দে। কোনার্ক বাড়িতে (১৯১৯-২৩) ভারতীয় শৈলীর উড কার্ভিং আসবাব খুব বেশি চিত্তকৃত নয়, পালিশও প্রায় ম্যাটের মতন। আশ্চর্য ব্যবহারিক রূপ। কোনার্ক বাড়ির বসার ঘরে, পাশের বিশ্রামের জায়গায়। সাজঘর-স্নান ঘরে, এমনকি কাঠের কোমোডেও রয়েছে। সামান্য বই রাখার তাক, লেখাপড়ার ডেস্ক, জিনিস রাখার ড্রয়ার—সবই সঠিক উপাদান নির্বাচনে, রঙের বিন্যাস ও আসবাবপত্রের গাঠনিক জ্যামিতির ছন্দে—যথার্থ আসবাব-স্থাপত্য সৃষ্টির আকারে উদয়ন-এও দোতলায় রথীন্দ্রনাথের শোওয়ার ঘরে, সাজঘরে, স্নানঘরে ও পড়াশোনার কেন্দ্রে রয়েছে। কাঠের সিলিঙের সরল সুপুরুষ সৌন্দর্য উদয়নের একতলায় রিহার্সাল ও সভাঘরে আছে ধাম, বিম ও কংক্রিটের স্লাবকে আড়াল সৌন্দর্য দিতে রথীন্দ্রনাথ কাঠের পালিশ করা আর্কিটেকচারাল মুখ্যাব অনেকটা ক্লাডিঙের ধাঁচে, থামে-বিমে-সিলিঙে নিয়ে এলেন। ভারতের অন্দর সম্ভার ইতিহাসকে যেমন গৌরব দিলেন, এগিয়ে দিলেন সময়ের দায়িত্বকেও। সেই সময়ে দেশের ধনী ও উচ্চ মধ্যবিত্ত মস্ত ছিল বিদেশি আসবাবের প্রভাবে। গ্রামের সাধারণ মানুষ বঞ্চিত ছিল আসবাবের সৌন্দর্য লাভে। রথীন্দ্রনাথই প্রথম উদ্যোগ নিলেন শিল্প সম্মত, সহজ-সরল অন্তর সম্ভার ও আসবাবপত্রের উৎপাদন ও বিস্তৃত প্রসারণে।

নতুন ধারার কাঠের কাজ, আসবাবপত্র এবং শ্রীনিবেশেনের শিল্প সামগ্রীর সঙ্গে গাছ-লতা-ফুল নিয়ে-শিল্প উপাদানে ছড়িয়ে পড়ল, দেশে-বিদেশে। শ্রীনিবেশেনের গোড়া থেকেই (১৯২২ খ্রি.) কুটির শিল্পের প্রসার হয়েছিল। রথী-প্রতিমার (শিল্পী দম্পতি) উদ্যোগে বয়ন, কাঠের কাজ, চামড়া পাকা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। বাটিকের কাজের সঙ্গে ক্যালিকো

প্রিন্টিং শিল্প কাজ যুক্ত হল। প্রথমে একটি টিনের শেডে স্টুডিয়ার মতন ছিল। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে শিল্পভবন বড়ো আকার নেয়। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে রথীন্দ্রনাথের নির্দেশনায়, সন্তোষকুমার ভঞ্জন চৌধুরীর পরিচালনায় কারুশিল্প শাখা আরও জোরদার হয়। ততদিনে রথীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ও উত্তরায়ণে শিল্প ওয়ার্কশপ (গুহাঘর) গড়েছেন। প্রতিমা দেবী চিত্রভানু স্টুডিও (১৯৩২) থেকে সেরামিক, বাটিক শিল্পের কাজ করছেন। দেশের নানান প্রান্ত ও গ্রামগঞ্জ থেকে শিল্প-উপাদান আসছে। গ্রামের লোকদের, মেয়েদের, আদিবাসীদের শিল্পশিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, আবার তাদের স্বাভাবিক শিল্প-ঐশ্বর্য গ্রহণও করা হচ্ছে।

বয়নশিল্পেরও প্রসার হল, শ্রীনিকেতন বয়ন কেন্দ্রে শাড়ি, কাপড়, গামছা, আসন, কম্বল, গালিচা, শতরঞ্চি, নেয়ারও ফিতে তৈরি হতে লাগল। ভারতীয় শিল্পের মাদুর্য, প্রযুক্তিকে সঙ্গে নিয়ে পরিবেশ বান্ধব গ্রামীণ শিল্পীদের সম্মিলিত কেন্দ্র জাগিয়ে তুলল। নন্দলাল, সুরেন কর, প্রতিমা দেবী, কাসাহারা, সন্তোষকুমার, রথীন্দ্রনাথ—রথীন্দ্রনাথের বড়ো আশার যেন ভাষা প্রস্তুত করছিল।

বিশ শতকের ভোরে রথীন্দ্রনাথ যখন দেখেছিলেন, শহরের কলকারখানার হাতছানিতে, গ্রামের শিল্পী সমাজ ভেঙে পড়ছে, সেদিন তিনি আক্ষেপ করেছিলেন, শিল্পীকে মজুরে পরিণত করা হচ্ছে। সদর্থক শিল্পভবন ও বিচিত্রা কারুসংঘ রথীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে সেই অভাবটাই অনেকটাই পূরণ করতে চেষ্টা করেছিল।

শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন শিল্প ও শিল্পী সমাজ যে ব্যবহারিক বস্তুসামগ্রী উৎপাদন করত, তার শিল্প সৌন্দর্য মুগ্ধ হয়ে দেশ-বিদেশের ক্রেতারা এগিয়ে এসেছিলেন। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বেতে শিল্প প্রদর্শনীতে যোগদান করে বেশ ভালোরকম বিক্রি হল। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে, খুব বড়ো শিল্প প্রদর্শনী হয়েছিল, লখনউতে, শিল্প ভবনের কাজ বিশেষভাবে সমাদৃত হল। ব্যবসাও ভালো হল। সেই বছরেই ইংল্যান্ডে NEF আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে শিল্প ভবনের বাটিক, চামড়ার কাজ, কাঠের কাজ হই চই ফেলে দিয়েছিল। সমস্ত শিল্প সামগ্রী নিঃশেষে বিক্রয় হয়ে যায়। শান্তিনিকেতনি শিল্প-স্টাইল বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠল। রথীন্দ্রনাথ, দোহিত্রী নন্দিতার বিয়েতে, নিজে হাতে শিল্পভবনের তৈরি সুন্দর চায়ের সেট উপহার দিলেন। অনেকেই সেদিন বিশ্বাস করতে পারেননি, কালেকটরস আইটেমের মতন পটারি-শিল্প এত কম আয়োজনে কীভাবে গড়ে উঠল শ্রীনিকেতনে। কারণ অর্থসংগতি ছিল অল্প। এদিকে রথীন্দ্রনাথের আদর্শে প্রায় ১৫০/১৬০ জন গ্রামবাসীকে প্রতিমাসে শিল্প শিক্ষা দেওয়া হত। শিল্প শিক্ষাদানের সঙ্গে উৎপাদন ব্যবস্থাও বজায় রইল। কাঁচামালের সংস্থান করা, ডিজাইন উদ্ভাবন এবং উৎপাদন প্রায় একই ছন্দে।

১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে রথীন্দ্রনাথ শ্রীনিকেতনের সচিব ছিলেন, ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে শিল্পভবন শ্রীনিকেতনে এল। বয়নশিল্পেরও উন্নতি হতে থাকল ধীরে ধীরে, দশটি পাওয়ার লুম ও কয়েকটি প্রিপারেটরি মেশিন এল। মণীন্দ্রচন্দ্র সেনকে জাপান থেকে কাজ শিখিয়ে আনাও হল। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে, তাঁতশালায়, ১১টি হাতে-চালিত তাঁত, পাঁচটি সুইডিশ তাঁত ও দশটি পাওয়ারলুম চলত। ছত্রিশটি গ্রামে তাঁতিরা কাজ শুরু করেছিল। নকশা ও কাঁচামালের ব্যবস্থা শ্রীনিকেতন করত।

১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে শ্রীনিকেতন শিল্পভবনের শিল্প দ্রব্যের চাহিদা মেটাতে কলকাতায় ২১০

কর্ণওয়ালিস স্টিটে ‘শ্রীনিকেতন শিল্প ভাণ্ডার’ বিক্রয়কেন্দ্র খোলা হল। সুভাষচন্দ্র বসু তখন জাতীয় কংগ্রেস সভাপতি। তিনিই এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাতে ভাণ্ডারটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। রথীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতিতে রথীন্দ্রনাথ তাঁর অভিভাষণটি পাঠ করেন :

আমাদের কর্মব্যবস্থায় আমরা জীবিকার সমস্যাকে উপেক্ষা করিনি, কিন্তু সৌন্দর্যের পথে আনন্দের মহাবর্তাকেও স্বীকার করছি। ... অর্থ না হলে একে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব নয় বলেই আমরা আশাকরি এই সকল শিল্পকাজ আপন উৎকর্ষের দ্বারাই কেবল যে সম্মান পাবে তা নয়, আত্মরক্ষার সম্বল লাভ করবে।

তখন শিল্পদ্রব্যের বিক্রির পরিমাণ ছিল প্রায় তিরিশ হাজার টাকার মতন। রথীন্দ্রনাথের উদ্যোগে, আসবাব শিল্পেরও বিক্রির পরিমাণ অনেক বেড়েছিল। রথীন্দ্রনাথের ভাবনায় কারুশিল্প প্রসারণ এবং গ্রামীণ শিল্পের সম্প্রসারণে আশা জেগেছিল। রথীন্দ্রনাথ সেই আদর্শকে মর্যাদা দিয়েছেন। ১৯৪৪-এ মোট বিক্রির পরিমাণ গিয়ে দাঁড়ায় দু-লক্ষ পঁচানব্বই হাজার টাকায়। শক্তপোক্ত আধুনিক গ্রামীণ শিল্প প্রযুক্তির সূচনা হল।

কারুশিল্পের উৎপাদনে সঠিক প্রয়োগ-প্রযুক্তির ব্যবহার করলে উৎপাদনে মান বেড়ে যায়। উৎপাদন ও অনেক বৃদ্ধি পায়। দরকার পড়ে, উন্নত মানের মেশিন—সঙ্গে মেশিন-শপ ও পাওয়ার হাউস। রথীন্দ্রনাথের শিল্প সাধনায়, প্রযুক্তির আমন্ত্রণ স্বাভাবিক ছন্দে এসে মিলিত। শ্রীনিকেতনে মেশিন-শপ ছিল। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে ছোটো পাওয়ার প্ল্যান্ট ও কাঠের আসবাব তৈরির জন্যে বৈদ্যুতিক যন্ত্র বসানো হয়েছিল। মেশিন-শপে গ্রামের মানুষের উপযোগী গরুর গাড়ির চাকা, লোহার উনুন ও গেরস্থালি কাজের বাসনপত্র তৈরি হত। কৃষি-যন্ত্রপাতি, চরখা ও নানান মডেলের উনুন পাওয়া যেত। পাওয়ার হাউসের অয়েল ইঞ্জিনও জেনারেটর দিয়ে খামারের সেচের পাম্প চলত। ওদিকে ডেয়ারির ঘর-কাটাই মেশিন-শপ চলত। কামারশালার কাজে স্থানীয় ছেলেদের হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া হত যাতে তারা স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারে। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে টিনে ভরতি ফল সংরক্ষণ ও বেকারিও শুরু হয়েছিল।

গ্রামের আশপাশ থেকে শিল্প ভবনের দেওয়া ডিজাইনে ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে থেকে তালপাতার পাখা, টুপি, বাঁশ ও বেতের ঝুড়ি, মোড়া, চটাই, মাদুর, বাঁশ ও বেতের আসবাব তৈরি হতে থাকল। প্রত্যেকটি কাজেই কিন্তু শান্তিনিকেতন শিল্পশৈলী নানান মাত্রায় ও মানে রূপ নিতে থাকল। টালি তৈরির মেশিন এল জার্মানি থেকে। পটারির কাজ ও সেরামিক কাজ ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রতিমা দেবীর উদ্যোগে শুরু হল। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে পটারি শেড ও ফার্নেস বসালেন রথীন্দ্রনাথ। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে আরও বড়ো ও নতুন চুল্লি বসানো হল। রথীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, প্রতিমা দেবী নতুন নতুন ডিজাইন দিলেন। হাতে তৈরি কাগজের উদ্যোগ নেওয়া হয়। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ। বিশ্বভারতীর বইপত্র শ্রীনিকেতনে বাঁধাই হত। কারুকাজ করা চামড়ার মোড়ক ব্যবহার করা হত।

প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের শিল্প বিশেষজ্ঞ স্টেলা ক্রামরিশ রথীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লিখেছিলেন :

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন রূপকার। আধুনিক ভারতের শিল্প জগতে তিনি কারুশিল্পের ঐতিহ্য-গৌরব ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর মানসমণ্ডলের গভীরে সঞ্চিত আছে নানা সামগ্রী দিয়ে রচিত বিচিত্র গঠনের সুখ সব রূপকল্প। নানা জাতের কাঠ খোদাই করে তিনি তাঁর এইসব

পরিকল্পিত রূপ প্রকাশ করতে চেয়েছেন। ... তাঁর রচিত শিল্প সামগ্রী আবাস গৃহের আসবাব ও পরিসংখ্যা রূপে নিত্য দর্শনীয় ও নিত্যব্যবহার্য, কৌটো, সিগারেট কেস, ট্রে, স্ট্যান্ড-প্রভৃতি সামগ্রী এমন সুন্দর ও সুবর্ণ পরিমাণে প্রস্তুত যে সেগুলি স্বচ্ছন্দে দৈনন্দিন ব্যবহারে উপযোগ্য করা যায়।...

রথীন্দ্রনাথ Art-utility মিলিয়ে ব্যবহারিক শিল্পের আধুনিক ভাষা গড়ে তুলেছেন। আবলুশ কাঠ থেকে গাম্ভীর—নানা ধরনের কাঠ তিনি সমান স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করতে পারতেন। বিভিন্ন জ্যামিতিক তল ও স্থাপত্য-আভিজাত্য মিলিয়ে অনবদ্য কাঠের শিল্প গড়ে তুলেছিলেন। জীবনযাত্রার শিল্প রচনায় তিনি প্রথম সারির প্রয়োগশিল্প ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠেছিলেন বিশ শতকের তিরিশ/চল্লিশ দশকেই। পরম্পরাগত ঐতিহ্য ও আগামীদিনের কারুশিল্পের নানা মডেল এবং তার নিজের হাতে করা দারুণশিল্প নিয়ে রথীন্দ্রভবনে সংগ্রহ শালায় আশ্রয় নিয়েছেন। প্রায় ১৬০ রকমের শিল্প রচনা সেখানে দেখা যাবে। রথীন্দ্রনাথের কারুকৃতির সংগ্রহ কলাভবন ও রথীন্দ্রভবনে রয়েছে। নিজের কাজের ছোটো মেশিন ও বিভিন্ন মাপের যন্ত্র ছিল শুশাধরের কর্মক্ষেত্রে। গামার, মেহগনি, আবলুস, কাঁঠাল, পাকুড়, কুকী, পেয়ারা, ব্ল্যাক সিমু, বনকাঁঠাল, আখরোট, হলুদ প্রভৃতি কাঠের ব্যবহার করেছেন। প্রায় সমস্ত গাছের চাষও নিজের হাতে করেছেন উত্তরায়ণ বাগানে। কাঠের কাজের অভিনবত্ব ছিল বড়ো স্থাপত্য ভাবনারই রূপ। ছোটো মডেলের মতন বাড়ি অথচ হয়তো পেনসিল রাখার স্ট্যান্ড। এই ধরনের বিচিত্র আকার ও প্রকারের নতুন প্রয়োগ রূপ ঘরের অন্তরে, পড়ালেখার টেবিলে, খাওয়ার ঘরের আসবাবে—নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র এনে দিলেন। যেন ছোটো ছোটো নিত্যব্যবহার্য ‘work of art’ সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে এসে গেল। ভারতীয় স্বাধীন ডিজাইন আন্দোলনও নতুন চেহারা পেল। যার বড়ো উদ্যোগী রথীন্দ্রনাথ, আধুনিক ভারতের উজ্জ্বল ডিজাইন ব্যক্তিত্ব। বিচিত্রা, শ্রীনিকেতন, উদয়ন, চিত্রভানু—রা তো সেই সাক্ষ্যই দেয়।

প্রয়োগশিল্প ভাবনা, ত্রিমাত্রিক স্থাপত্য-নিদর্শন আশ্রয় যেন সচলায়িত হল, কাজে এল সাধারণ মানুষেরও নিত্য ব্যবহারে। সঙ্গে বিভিন্ন কাঠের স্বাভাবিক রং মিলিয়ে, ছোটো ছোটো টুকরোয় আশ্চর্য সব ইনলে ডিজাইনও ছিল। ইনলের কাজে নতুন দিক তিনি খুলে দিয়ে গেছেন। এমনকি রথীন্দ্রনাথের চিত্রশিল্পের (Painting) রূপ দিয়েছেন কাঠের ইনলে কাজে। যা প্রায় আশ্চর্য হওয়ার মতন, কঠিন কাজ। একদিকে যেমন দেশলাই রাখার বাস্তু গড়েছেন আবার প্যাগোডার অনুকরণে কৌটো তৈরি করেছেন। উদয়ন বাড়ির মডেলও গড়েছেন, কোনোসানের সহযোগিতায় (উদয়ন বাড়ি সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই) এখন তো অবশ্যিক Building Model প্রস্তুত করা হয়ে থাকে আগাম নির্মাণের আভাস পেতে। বাস্তবিক চেহারা দেখে নিতে।

রথীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য সাধনাকে বাস্তবায়িত করতে দেশের নানান প্রান্তে সুন্দরের নির্মাণ ও অন্দর সজ্জাকে, বিস্তারিত করতে চেষ্টা করা হয়েছিল, বিচিত্রা কারুসংঘের কাজের মাধ্যমে, ব্যবহারিক শিল্পকে প্রয়োগ করা হল সমাজে, বিভিন্ন স্তরে নানা মাত্রায়। তারই বাস্তব চিন্তাভাবনা বিচিত্রা কারুসংঘের প্রতিবেদনে পাওয়া যায়। আঁদ্রে কার্পেল্‌স সেদিনের বাস্তব লক্ষ্য নিয়ে প্রতিবেদন লিখেছিলেন ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে।

... To establish permanent co-operation between the artists the craftsmen. ... To prevent as far as possible that harmful separation between art and crafts which is quite contrary to the Indian spirit and deprives art of all decorative qualities.

... To keep up love of beauty in the simplest objects of daily use which was so characteristic of Indian life and which field of creative expression

রথীন্দ্রনাথের জীবনভিত্তিক শিল্পচর্চার চিন্তা ভাবনা ‘স্বদেশী সমাজ’-এর যুগ থেকে দেহলি নির্মাণ পর্ব এবং ‘জাপানযাত্রী’র অভিজ্ঞতায় যেন আরও বিস্তারিত হয়েছিল। অল্পতে ও যে অনেকটা হয়, কিংবা ঘটিতে বাঁটিতে গৃহভিত্তিতে জীবনধারণ যে শিল্প আছে সেই সংস্কৃতির আধুনিক অনুবর্তন চাইছিলেন। বিচিত্রা কারুসংঘ যা কিছুদিনের মধ্যেই শিল্প ভবনে রূপ নেবে। ব্যবহারিক শিল্পের আয়োজনে সেই প্রত্যাশাই জেগে উঠতে থাকল।

রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী, কার্পেলেস এবং শিল্পসাধিরা মিলে ভারতের গণশিল্পকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন। ‘a thing of beauty is a joy for ever’—এই বাণীটিতে বিশ্বাস করে জীবনযাপন শিল্পে ও ব্যবহারিক বস্ত্রসামগ্রী এবং স্থাপত্য-পরিবেশের নির্মাণে প্রয়োগ করবেন। শান্তিনিকেতন-শ্রীনিবেশে ল্যাবরেটরিতে কলাভবনের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে শিল্প ভবনের পরীক্ষা নিরীক্ষা। খুব বড়ো অধ্যায়। কর্মচঞ্চল শিল্পময় ভারত—উদ্যোগ, যেখানে গণশিল্প ও মানবিক শিল্পচর্চা একই থাকে আসনলাভ করেছিল। বাবার প্রয়োগযোগ্য আদর্শ রথীন্দ্রনাথ অনুধাবন করতে পেরেছিলেন বলেই, আধুনিক শিল্পযাত্রার আয়োজন, বিজ্ঞান প্রযুক্তিভিত্তিক হয়েছিল। প্রয়োগশিল্প আন্দোলনের নতুনধারা বিশ শতকে বিশের দশকেই গড়ে উঠতে লাগল। অভিনব আয়োজনে ‘জাপানীযাত্রী’র (১৯১৬) আদর্শও ধরা রইল, রথীন্দ্রনাথের সমন্বয়ী বাস্তবিক কাজের আয়োজনে।

রথীন্দ্রনাথ ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দেই লোকশিল্প সংগ্রহ ও তার নতুন প্রচলন নিয়ে শিল্প আন্দোলনের কথা যে ভাবছিলেন, সে আলোচনা আগেই করা হয়েছে। বিচিত্রা, বিচিত্রা-কারুসংঘ পর্ব, শিল্পভবন-কলাভবন তারই যেন প্রতিধ্বনি। প্রত্যেক শিল্পীই স্বাধীন মাপে নিজেদের শৈলীকে প্রকাশ করতে পেরেছিলেন মুক্ত শিল্প নির্মাণ আবহাওয়ায়। জাপানযাত্রী পর্বে যে সরল অভিজ্ঞাতের খোঁজ পেলেন এবং বললেন; সেই প্রবল শিল্প সাংগঠনিক ইচ্ছাকে রথীন্দ্রনাথ, সুরেন কর, নন্দলাল উস্তরায়ণ নির্মিত পরিবেশের কাজে আনবেন। নিজেদের শিল্পশক্তি ও প্রয়োগ সামর্থ্য এবং দেশজ লোকজ ভূমি উপাদান হবে চিরসাথী।

১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমাদেবী কার্পেলেস কলাভবনের সহযোগিতায় ব্যবহারিক শিল্পদ্রব্য কাজের কেন্দ্র গড়ে তুলতে চেষ্টা করলেন। শিল্প সামগ্রীর উৎপাদন ও কারুশিল্প দেওয়া-নেওয়ার কাজ হতে থাকল কারুসংঘ ও শিল্পভবনে। এরপর, কলাভবন, শিল্পভবন বা কারুসংঘ দূর দূর জায়গায় গিয়ে পেশাদারি শিল্প-স্থাপত্য ও ব্যবহারিক শিল্পের কাজ করবেন। যেসব কাজ থেকে বিশ্বভারতীর আর্থিক সমৃদ্ধিও এসেছিল। ভারতের গ্রাম ও শহরের বিভিন্ন ধারার শিল্পীরা ও অন্য দেশের শিল্পীরাও প্রায় একই সঙ্গে মানুষের নাগালসাধ্য ব্যবহারিক শিল্প গৃহভিত্তিক জাগিয়ে তুলতে পারবে। রথীন্দ্রনাথ সার্থক Co-ordinator বা সংযোগকারীর কাজটি করতে সচেষ্ট ছিলেন। নিজে হাতে শিল্প গড়তে জানতেন, ছবি আঁকতেন, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির জ্ঞান যথেষ্টই ছিল। এমন যোগ্য কোঅর্ডিনেটর আজও প্রায় বিরল বলা চলে। সঙ্গে ছিল নিজেই আড়ালে রাখতে পারার সহজাত চরিত্র। যে গুণটিকে প্রায় নীরব অথচ সচল শিল্পের পর্যায়ে ক্রমশই যেন আনতে পারছিলেন। তাই তার ডাকে নন্দলাল, সুরেন কর, কাসাহারা, গৌরহরি মিস্ত্রি, বালি মেধেন, গৌরগোপাল ঘোষ, তেজসচন্দ্র সেন, কার্পেলেস, আর্থার গেডেস—এমন

কত গুণীরা একত্রিত হচ্ছিলেন। সেদিনের বিচিত্রা কারুসংঘ দেশ-বিদেশে তাদের প্রতিবেদনে জ্ঞানিয়েছিল :

... We have plenty of ideas and we find amongst the artists of Kala-Bhavana great help and plenty of good will— but we want outsiders to encourage us. We need orders to keep our place going ...

১৯২৩ খ্রিস্টাব্দেই রথীন্দ্রনাথদের উদ্যোগকে সমর্থন ও স্বাগত জ্ঞানিয়ে অবনীন্দ্রনাথ (অয়ন পত্রিকা, শ্রাবণ ১৩৩০) কাব্যকলা, শিল্পকলা, নাট্য, নৃত্য মিলিয়ে বৃহত্তর শিল্পী সমাজের সম্ভাবনা দেখেছেন। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের শান্তিনিকেতনের অনুবর্তন—আয়োজনকেই সমর্থন জ্ঞানালেন :

... সকল দেশেই রসিক ও শিল্পপন্থীরা সময়ে সময়ে কাকছত্র বিধ্বং গোষ্ঠী এমনই নানারকম আয়োজনের মধ্যে দিয়ে একত্র হওয়ার চেষ্টা করেছে এবং এই উপায়ে জনকতকের কাজের একতা ভাবের দিকে ক্রমে মানুষ ভিতরে-বাইরে বহু রকমের একতা লাভ করেছে।

রথীন্দ্র-আদর্শে শিল্প সমবায়নীতির রূপায়ণের যে-চেষ্টা রথীন্দ্রনাথেরা চালাচ্ছিলেন, তাকে স্বাগত জ্ঞানালেন অবনীন্দ্রনাথ। তিনি মনে করতেন, শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন সমন্বয়ের মধ্যেই বৃহত্তর ভাবের একতার মহাসম্ভাবনা, সমস্ত পৃথিবীর মানুষের পারস্পরিক মনের ঐক্য-সংস্কৃতি গড়ে তুলতে বড়ো ভূমিকা নেবে। ‘এইসব ছত্রের একটি গুণ দেখি—সেখানে সামাজিক উচ্চনীচভেদ মানুষে-মানুষে থাকে না, মান সেখানে কর্মের ও বুদ্ধির—জন্মগত বাঁধনগত নয়, কাজের যথার্থ সম্মান দিয়েই এইসব ছোটো-ছোটো ছত্র অটুট বল সঞ্চয় করেছে। ...’

২৭ নভেম্বর ১৯২৩। পোরবন্দর থেকে রথীন্দ্রনাথ রথীন্দ্রনাথকে চিঠিতে লিখছেন, কল্যাণীয়েষু,

মোটের উপর কাঠিয়ারাড়ে আমাদের আসর জমেছে। দুই-তিনটি জায়গা ছাড়া আর সর্বত্রই আশার অতীত ফল লাভ করা গেছে। এখানকার মহারাজা খুব চমৎকার লোক। আমি না চাইতে তিনি আমাদের পঁচিশ হাজার টাকা দিতে চাইলেন।

এলম্‌হস্ট আমার সঙ্গে থাকতে ভারী সুবিধা হয়েছে। আরও দিন দশেক ওকে আমার সঙ্গে ঘুরিয়ে তার পরে সুকলে পাঠিয়ে দেব। ... তা ছাড়া কৃষি সম্বন্ধেও বক্তৃতা করছে তাতে খুব উপকার হচ্ছে। লিমডির কুমার তা নিজে একটা farm খুলবেন, তার সঙ্গে আমাদের সুকলে যোগ থাকতে পারবে। এখানেও হয়তো কিছু হতে পারবে। নন্দলালের এদিকে হয়তো একটা opening হবে।

আমাদের খুব দরকার ওখানে একটা furniture-এর কারখানা খোলা। এ দিককার কোনো রাজা যদি একবার আমাদের design অনুসারে ঘর সাজায় তা হলে ক্রমে ভারতবর্ষের ঘরে ঘরে আমাদের কলাভবনের আদর্শ ছড়িয়ে পড়বে। ...

রথীন্দ্রনাথের এই চিঠির গুরুত্ব অনেকটাই অর্থময়তায় ভরা। এ দেশের Design Furniture ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা তাঁর বহুদিনের। ঘরের অন্দর-স্থাপত্যে মানানসই ফার্ণিচারের ভূমিকা অনেকখানি। জীবনযাত্রায় জীবন যাপনে তিনি রুচির চর্চা চেয়েছিলেন। রথীন্দ্রনাথ, সুরেন কর, প্রতিমা দেবী, নন্দলাল এঁদের মতো প্রতিভাবান শিল্পী-কারিগরদের কাছে পেয়ে বহুদিনের চিন্তা-ভাবনাকে তাই রূপ দিতে সেদিন উঠে পড়ে লেগেছিলেন। শ্রীনিকেতনে, পল্লিপুনর্গঠন কাজের মাঝে, কাঠের কাজ, আসবাবপত্র বিন্যাস, ঘর সাজানোর প্রয়োগ-প্রযুক্তিকে শিল্প ভবনের মতন

আন্দোলনে যুক্ত করেছিলেন। এই কাজে তিনি পাশে পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকে। একজন যোগ্য ব্যক্তিত্বের হাতে শ্রীনিকেতনে গড়ে উঠেছিল ‘furniture-এর কারখানা’। রবীন্দ্রনাথের শ্রীনিকেতন উদ্যোগের কর্ণধার ছিলেন-রবীন্দ্রনাথ। যে আগ্রহের সঙ্গে বিশ্বভারতীকে উৎসাহিত করেছিলেন, তেমন আগ্রহের সঙ্গেই একদিন তিনি জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন স্বদেশকেও।

উপযোগিতা ও সৌন্দর্য সাধনার ফসল, সুলভে মানুষের নাগালের মধ্যে এনে দিতে পারেন, একজন সার্থক ডিজাইনার এমন সাধনার চেউ তুলতে উদ্যোগ নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

শিল্পকলার প্রয়োগসৃজনে দেশকালপাত্রের সংগতি সাধন করতে প্রয়োজন হয় যথার্থ ডিজাইনারের। তাঁর ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছিল ‘দেশীয় রাজ্য’তে। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে (শ্রাবণ ১৩১২) ‘দেশীয় রাজ্য’তে বলেছিলেন :

... পিয়ের লোট ছদ্মনামধারী বিখ্যাত ফরাসি ভ্রমণকারী ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিতে আসিয়া আমাদের দেশের রাজনিকেতনগুলিতে বিলাতি আসবাবের ছড়াছড়ি দেখিয়া হতাশ হইয়া গেছেন। তিনি বুঝিয়াছেন যে, বিলাতি আসবাবখানার নিতান্ত ইতরশ্রেণীব সামগ্রীগুলি ঘরে সাজাইয়া আমাদের দেশের বড়ো বড়ো রাজারা নিতান্তই অশিক্ষা ও অজ্ঞতাবশতই গৌরব করিয়া থাকেন। বস্তুত বিলাতি সামগ্রীকে যথার্থভাবে চিনিতে শেখা বিলাতেই সম্ভব। সেখানে শিল্পকলা সজীব, সেখানে শিল্পীরা প্রত্যহ নব নব রীতি সৃজন করিতেছেন, সেখানে বিচিত্র শিল্প পদ্ধতির কালপরম্পরাগত ইতিহাস আছে, তাহার প্রত্যেকটির সহিত বিশেষ দেশকাল পাত্রের সংগতি সেখানকার গুণী লোকেরা জানেন—আমরা তাহার কিছুই না জানিয়া কেবল টাকার খলি লইয়া মূর্থ দোকানদারের সাহায্যে অন্ধভাবে কতকগুলো খাপছাড়া জিনিসপত্র লইয়া ঘরের মধ্যে পুঞ্জীভূত করিয়া তুলি—তাহাদের সম্বন্ধে বিচার করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। ...

... টাকার সাহায্যে জিনিস ক্রয়ের চর্চা বন্ধ হইয়া যদি রুটির চর্চা হইত। তাহা হইলে খনী গৃহে প্রবেশ করিয়া দোকানের পরিচয় পাইতাম না, গৃহস্থের নিজের শিল্পজ্ঞানের পরিচয় পাইতাম। ইহা আমাদের পক্ষে যথার্থ শিক্ষা, যথার্থ লাভের বিষয় হইত। এরূপ হইলে আমাদের অন্তরে-বাহিরে আমাদের স্বাভাব্য-ভাষ্যের, আমাদের গৃহভিত্তিতে, আমাদের পণ্যবীথিকায় আমরা স্বদেশকে উপলব্ধি করিতাম। ...

অনেক পছর পরে রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে (বৈশাখ ১৩৪০) সুরেন করকে আসবাব ঘিরে Collapsible মশারির Stand-এর উদ্ভাবনের জন্যে অনুরোধ করেছিলেন :

... মশারির একটা ছোটো তাঁবু তাব মধ্যে ব্যাটারি চালিত একটা ইলেকট্রিক বালব। মশাক্রান্ত সন্ধ্যাবেলাকার কথা স্বরণ করলে শান্তিনিকেতনকে দুঃস্বপ্নের মতো মনে হয়। দিনের বেলাতে ও ওই মশারির তাঁবুর মধ্যে আহরাদি করতে পারলে মাছির উৎপীড়ন ঠাকানো যায়। যেমনই শুনতে হোক, দুঃখটা যথার্থই গুরুতর, প্রতিদিনের উদ্বেজনা স্নায়ুমণ্ডলীকে খেপিয়ে তুলতে থাকে—পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে বিরক্তির ভার। নিশ্চয়ই এটা আদ্যক্ষয়কর। ...

‘সুদৃশ্য ও সুব্যবহার্য’ আসবাবপত্রের ডিজাইন-ভাবনার কথা চিঠিতে নিজেই নকশা ঐকে জানিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের অভিনব আসবাব-ভাবনাকে রূপ দিয়েছিলেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথই গুহাঘরের (১৯৩৪) শোওয়ার বসবার কাজের ও আলোচনার পেডেস্টাল আসবাব ডিজাইনে। মাত্র সাড়ে সাত ফুট লম্বা, প্রায় চার ফুট চওড়া, আড়াই ফুট উঁচু আসবাব মঞ্চ ঘিরে বলবেরারিংযুক্ত ওঠানামা কাঠের ফ্রেম ও তারের মিহি জাল নিয়ে কাজের কেন্দ্র গড়ে তোলেন। দু-পাশ থেকে বাতিদানের ব্যবস্থা। বসার সময়ে এরকম, শোওয়ার লেভেলে আর একরকম। তার মধ্যেই

কেবিন ফ্যানের ব্যবস্থা। আজও উত্তরায়ণের শুহাঘরে রবীন্দ্রনাথের কাজের বাস্তবিক আদর্শকে মেলে ধরে আছে।

ঠিক ওপরেই চিত্রভানু সুইডিয়ো প্রতিমা-দেবীর উপযোগী শোওয়ার খাট সঙ্গে আটকোনা কাজের টেবিল। সেই টেবিলের গায়ে প্রায় কুড়িটি ছোটোবড়ো ড্রয়ার। আধা শেল্ফ দেয়াল ঘিরে। প্রতিমাদেবী রথীন্দ্রনাথেরই মতন শিল্প-পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে ডিজাইনারের মতন নিজের হাতে সেরামিক, বাটিক, লেদার-ওয়ার্ক করতেন। অনেক রং, তুলি, সরঞ্জাম দরকার হত। কিন্তু ঘরময় ছড়িয়ে থাকলে চোখ ও মনের স্ফোভ তৈরি হত। সেই কারণেই সম্প্রসারণ ও সংকোচনশীল অচল আসবাব গড়লেন। অভিনবত্ব এমন ছিল কালিম্পঙের চিত্রভানু (১৯৪২) গৃহস্থাপত্য, আসবাব ও অন্তরসজ্জার নির্মাণেও। টেবিলের মধ্যে চা ও অন্যান্য জিনিসপত্র রাখার ও বসার-জায়গার নীচে Box System তৈরি করেছেন। আবার এই বিন্যাসটিই শান্তিনিকেতনের চিত্রভানুতে এল—আকৃতির দুই জানালার কোল ঘেষে, আলো-বাতাসযুক্ত আকাশ রেশমের মোড়া প্রকৃতিভিত্তিক সখীভাবের বসার জায়গার তলায়, কাপড় বিছানার Box System রূপে ব্যবহার করেছিলেন। যেমন উদয়নে রবীন্দ্রনাথের ঘরে বই রাখার সচল শেল্ফের ধাঁচে তাক-আসবাব গড়লেন। ভিতরে বই ও কাজের জিনিস। বাইরে কাঠের পালিশ-করা সারি সারি বইয়ের কাঠের আকৃতি। শেল্ফগুলিকে যেন রিলিফ-ভাস্কর্য অভিমুখী নির্মাণে একে দিলেন। রথীন্দ্রনাথ, নন্দলালদেরই মতন কাঠের বা চামড়ার উপকরণ নিয়ে নিপুণ তুলির চালনায় আসবাব শিল্প গড়তে লাগলেন। শীতলপাটি, বৈচিত্র্যময় কাঠের ফ্রেমে শুহাঘর, উদয়ন, অন্দর স্থাপত্যে ব্যবহার করেছেন। পরবর্তী সময়ে তারই প্রতিধ্বনি ররানগরে প্রশান্তচন্দ্র ও রাণী মহলানবীশদের আস্রপালী গৃহস্থাপত্যেও (১৯৫০) দেখা দিল।

একটি সুতির জাল যা দুদিক থেকেই টানা যায়, টানলে মশারি; এমনিতে পর্দার আড়াল— এই ব্যবস্থা রথীন্দ্রনাথ উত্তরায়ণে গড়লেন। চিত্রভানুতে, কোনার্কে, উদয়নে স্নানঘর ও স্নানঘর সংলগ্ন আসবাব-স্থাপত্য যখন নির্মাণ করলেন তখন ভারতীয় স্থাপত্য-শৈলীর ফুল ও প্রকৃতিমুখী জ্যামিতি ডিজাইন নতুন আঙ্গিকে ফিরে এল। ভারতীয় ডিজাইন-আন্দোলনে এও যেন নতুনভাবে জেগে ওঠা। যার অনুসন্ধান রতনকুঠি (১৯৩২) ও উদয়নের শাবার ঘর—আসবাবে রয়েছে। আছে কোণার্কের বিষয়ভিত্তিক আসবাব, মোটিফ—মেলানো ঝোলানো পর্দায়, উদয়নের গোলাকৃতি জানালায়, গুজরাটি আসবাবপত্রের সঙ্গে জাপানি শৈলীর মিশ্রণে। কাপড়, সেরামিক, বিভিন্ন ধাতু মেশানো স্থাপত্য সখ্য অন্দর ও বাহির পরিকল্পনায়। এমনকি খাওয়ার লেখবার থাকবার তৈজসপত্রও।

রথীন্দ্রনাথের কাজের শুণে মুগ্ধ বুদ্ধদেব বসু, সব পেয়েছির দেশ উদয়ন দেখে লিখেছিলেন: ‘নানা কোণ, মোড় ও উচুনিচুর ভিতর দিয়ে ছন্দের অক্ষুণ্ণ সুসমা বাইরে যেমন প্রকাশিত, ভিতরেও তেমনই অনুভূতি আনে। ... এই আসবাবপত্রগুলির বিশেষত্ব প্রথম দর্শনেই চোখে ঠেকে এবং এখানে তুচ্ছ-জ্ঞান কোনো প্রয়োজনের জিনিস দেখলাম না যা সুন্দর নয় ...।’

প্রয়োজনের সঙ্গে সুন্দরকে বৈজ্ঞানিক শিল্পদৃষ্টির সঙ্গে সবুজ হাতের নিরলস পরিশ্রমকে একত্রিত করতে পেরেছিলেন রথীন্দ্রনাথ। তিনি আশা করেছিলেন শিল্পভবন ও কলাভবন একসাথে মিলে জীবনযাপন-শিল্পের এই ভাব আন্দোলনকে বাস্তবায়িত করে তুলবে। পরাধীন ভারতের স্বাধীন শিল্পসমাজ গড়ে তুলতে নিন্ত জীবনে সামগ্রিক শিল্পকে যোগ করতে চেষ্টা

করেছিলেন। ভারত থেকে আবার নতুন করে আন্তর্জাতিক মানের ডিজাইন আসবাব ও স্থাপত্য-সংস্কৃতি যেন উদ্ভাসিত হতে পারে, সেই চেষ্টাই করেছেন। বিশ্ব সংস্কৃতির ডাকে প্রত্যেক দেশেরই শিল্প উপাদান যেন থাকে। রথীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, অবনদাদা ও গগনদাদার কাছ থেকে রথীন্দ্রনাথ বিভিন্ন মাত্রায় এই স্বপ্ন প্রত্যক্ষ করেছিলেন। শিল্প দীক্ষা অনেকটাই জোড়াসাঁকোর শিল্প-পরিবেশ থেকেই গড়ে উঠেছিল। নিজস্ব চিন্তাভাবনাগুলো পড়াশোনা ও অভিজ্ঞতায় মিলেমিশে আরও সক্রিয় হয়েছিল।

নিজে হাতে-ছেনিতে, সিমেন্ট চুন বালি সুরকিতে শিল্পদ্রব্য, কাঠের কাজে, চামড়া, বাটিকে ও ইনলের কাজে এগিয়ে চললেন। বিশ্বভারতীরও শিল্প পদ্ধতি উদ্যোগ ও নিজস্ব শিল্পচর্চা— দুই-ই প্রাধান্য পেতে থাকল। ইকোলজিক স্থাপত্য-ঘেঁষা সেসব কাজে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের যত ভালো সম্পদ গ্রহণ করতে লাগলেন। এমনি করেই বিদেশে বসে, অসুস্থ অবস্থায় চামড়ার ও রঙিন ছাপের সম্পূর্ণ লেদারওয়ার্ক শিখলেন। ভারতীয় ডিজাইন— ভাষায় চামড়ার কাজ নতুন করে যেন আবিষ্কার করলেন। রথীন্দ্রনাথ কারুশিল্পকে প্রথাযুক্ত বিদ্যালয়— ঘেঁষা শিল্পশিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করে নতুন মর্যাদায় প্রয়োগশিল্পকে আনতে চাইছিলেন। সবটা করে উঠতে পারেননি, তখনও কলাভবনে মূল স্রোতধারায় কারুশিল্প, স্থাপত্যশিল্প, দৈনন্দিন শিল্পের স্থান তেমন ভাবে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা দিতে অনেকেই চাননি। দেশের অন্যান্য শিক্ষাকেন্দ্রেও চাওয়া হয়নি। আজও হয় না। শিল্প সম্বন্ধে ছুঁতমার্গিতার বিরুদ্ধে ছিলেন বলেই তিনি সার্থক ডিজাইনার— যিনি সব মাধ্যমকে ও যেকোনও ভালো প্রকাশকে গ্রহণ করেন শিল্প-মর্যাদায়।

স্টেলা ক্র্যামরিস কিছুটা আক্ষেপের সুরেই বলেছিলেন :

... He (Rathindranath) carves objects from many woods and paints the portraits of many flowers. His work does not belong to any school. Self-taught and straightforward it follows the discipline of first principles and applies there with tenderness of precession to small objects and pictures. ...

ভারতে এমন চামড়ার কাজের ব্যাগ, শান্তিনিকেতনের বাটিকশিল্পের প্রবর্তন করেছিলেন। কিন্তু কোনোরকম প্রচার চাননি। আজও শান্তিনিকেতনি বাটিক ও চামড়ার ব্যাগ দেশে-বিদেশে বিখ্যাত। কতরকম অনুসরণ ও অনুকরণও হয়ে চলেছে। খুব বড়ো রকমের কারুশিল্প উদ্যোগ এই দুটি শিল্পনির্ভর। প্রথম সূত্রপাত করেছিলেন রথীন্দ্রনাথ শিল্পভবনের কাজের প্রসারের জন্যে। যেখানে অনেক শিল্পী ও গ্রামীণ শিল্প সমবায়ভিত্তিক কাজে যুক্ত ছিল।

বীরভদ্র রাও চিত্রা এই বিষয়টিকে নিয়ে পরে লিখেছেন :

Rathindranath was responsible for introducing leather craft in India. In 1928, he went to Europe for treatment and during his convalescence in of those upto date nursing homes he took his hobby which he developed later. He returned to Santiniketan with a lot of tools and opened a small class in his house to teach leather craft to some girls in the school. In about a year or two this new craft attracted several art students in the Kala-Bhavana and soon became one of the chief crafts in Sriniketan and Santiniketan. Today leather craft is a well paying handicrafts practised throughout India and the credit goes to Rathindranath ...

নিজের হাতে ভবিষ্যতের শিল্প বিপণনের জন্যে প্রস্তুত করেছিলেন, আধুনিক ব্যবহার্য living style items— দেশে-বিদেশে অফিস-কাছারিতে, হোটেলে ঘরে ঘরে যে ধরনের কাজ

আজ চোখে পড়বেই— যেমন, বক্স্‌ অ্যান্ড ক্যাসকেটস্‌, আরটিকেল অফ এভরিডে ইউজ্‌, অফিস অ্যাকসেসরিজ্‌, ব্লক স্ট্যান্ড, ল্যাম্প স্ট্যান্ড, ডাইনিং রুম রিকুইজেটস্‌, স্লোবাবস্‌ আউটফিট এবং নানা লেদার ক্রাফটস্‌।

ইউরোপে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে জার্মানির বাই হাউসেও শিল্পী, কারুশিল্পী, স্থপতিদের মিলিত প্রয়াসে ডিজাইন আন্দোলনের চেষ্টা হয়েছিল Walter Gropius, Paul Klee, Kandinsky দের চেষ্টায় Society-furniture গড়ার। রথীন্দ্রনাথের শিল্প ভবন স্বপ্ন ও প্রয়োগ-আদর্শ সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হলে, প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের ভাব-আন্দোলনে আরও বড়ো সাড়া পড়ে যেত। কারণ ভারতের জনসংখ্যা ও ক্রেতা সম্ভাবনা ব্যাপক। বিশ্বজাতিক মানবিক ডিজাইন চর্চার দরজা ও আরও অনেক উন্মুক্ত হত। আজ দিকে দিকে যে বিদেশি সম্ভা মানের আসবাবে ছেয়ে গেল, গড়ে উঠল না ভারতের নিজস্ব ডিজাইন অন্দের স্থাপত্য—তার খুব বড়ো কারণ স্বাধীন ভারত রথীন্দ্রনাথ ও শ্রীনিকেতনকে কাছে লাগাল না। বিশ্বভারতী হয়ে উঠল আরও একটি কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রয়োগ প্রযুক্তির উজ্জ্বল চরিত্র, সচল চরিত্রটি পড়ল ঢাকা।

চার

রথীন্দ্রনাথের স্থাপত্য-পরিবেশ ভাবনাও খুব মন দিয়ে, বুদ্ধি নিয়ে রথীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন। এই বিষয়ে তাঁর স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ অফুরান আগ্রহ ছিল। দেহলি যখন Split level architecture বিন্যাসে পরবর্তী পর্যায়ে বেড়ে উঠছে, রথীন্দ্রনাথের কত আগ্রহ। তখন বিদেশে ইলিনয়ে পড়াশোনা করছেন। দিদিমা রাজলক্ষ্মী দেবীকে চিঠিতে লিখছেন ‘বাবার বাড়ি কতদূর এগিয়েছে’। পরে বাবার মনের মতন শিলাইদহের তিনতলার ছাদঘর তৈরি করেছেন। রথীন্দ্রনাথের প্রিয় জায়গা। সেইজনেই জোড়াসাঁকোয় ছাদঘরে অভিনব ইকোলজিকে আর্কিটেকচারের ভাবনা রথীন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন রথীন্দ্রনাথ যেখানে আলো বাতাস, রাতের তারা, দিনের আলোকচ্ছটা—ঝোলানো, দোলানো সবুজের আমন্ত্রণে আর এক নতুন মাত্রা আবিষ্কার করবে।

ভোলেনি রথীন্দ্রনাথ, বাবা, জ্যাঠামশাই ও ঠাকুরবাড়ির সবুজ নির্মাণের সৃষ্টিকথার ইতিহাস। ইতিহাস-সচেতন ডিজাইনার আগের যা কিছু ভালো, তাকে কাছে লাগান। দেবেন্দ্রনাথ রুক্ষ ধূসরপ্রায় মরুপ্রান্তরকে সবুজায়নে রূপান্তরিত করেছিলেন। প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল শান্তিনিকেতন। যেমন গাছের নির্বাচন তেমন সবুজ অঞ্চল ও গাছ মিলিয়ে সবুজ পাড়ার নির্মাণ— সবই কাছে লাগালেন। রথীন্দ্রনাথের আগ্রহে উত্তরায়ণ (১৯১৯-১৯৩৯) গড়ে তুলতে, সঙ্গে পেলেন সুরেন করের মতন বিদগ্ধ শিল্পী-স্থপতির কেজো বন্ধুত্ব। ভারতের আধুনিক ডিজাইন ইতিহাসে যা বিশেষ তাৎপর্যময়।

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে আসাম সফর সেরে রথীন্দ্রনাথ উত্তরায়ণ প্রাঙ্গণের গোয়াল পাড়া-মুখী জমির মাথায় কোণার্ক এসে উঠলেন। তখন কলাভবন সংবেদিত হয়েছে। রথীন্দ্রনাথদের বিচিত্রা ক্লাবের আদর্শে লোকশিল্প নিয়ে দরমার বেড়া, দেয়াল, খড়ের চালা, কাঁকুরে মাটি মেশানো মেঝে-ঘরে নানান শিকলি, ঝোলানো বেতের বাতিদান সাজিয়ে সেদিনের প্রান্তর মুখী ‘কোণার্ক’—বাড়ি গড়ে উঠেছিল। রথীন্দ্রনাথ তখন সস্ত্রীক থাকতেন বেণুকুঞ্জে। বাবার সুবিধে ও সেবার কথা ভেবে কোণার্ক-বাড়ির কোল ঘেঁষে এল— আকৃতির নিচু ছাদের সরল গৃহস্থাপত্য, রান্নাবাড়ি

তৈরি করলেন। লাগোয়া ঘরে স্বামী-স্ত্রী অনেক কষ্টে থাকতে লাগলেন। তবুও ঘরের দেয়াল ফ্রেসকো আঁকতে ভোলেননি। ১৯২০-২১ খ্রিস্টাব্দ থেকে উদয়ন-উত্তরায়ণ এগিয়ে চলল। একদিকে সৃষ্টি হল সম্পূর্ণ কোণার্ক। আর একদিকে উদয়ন-ভাবনা গড়ে উঠতে লাগল। সঙ্গে মানানসই বাগান। রক্ষা খুসরের মধ্যে সবুজের ভাস্কর্য-স্থাপত্য। উদয়ন-স্থাপত্য ইতিহাসের সেই শুরু। উদয়ন আধুনিক ডিজাইন-ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রাচ্য ভাষা। নির্মাণ যেখানে রবীন্দ্র-আদর্শের সৃষ্টিতে গিয়ে মিলছে। প্রাচ্য ঘরানার শ্রেষ্ঠ আদর্শ-রাজপুতানা বৌদ্ধ, মোঘল, বাংলা, গুজরাত ও জাপানি স্থাপত্য শৈলী, আশ্চর্য সমন্বয়ে ১৯২০-২১ থেকে ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অন্দর ও বাহির স্থাপত্য-গৌরবে জেগে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে মানানসই বাগান, বসবার তোরণ, লতানে পারগোলা, জলদেহ, পদ্ম আধার, পাথুরে লতা মেলানো মিনিয়োচার বাগান, আরও কত না পরিবেশ স্থাপত্যের বিন্যাস। লোক-স্থাপত্য, কারুশিল্প ও প্রাচ্যশিল্প ভারতীয় স্থাপত্য শিল্প মিলেমিশে আশ্চর্য পরিবেশ সৃষ্টি, ইকোলজিকে স্থাপত্য যেন বিস্তারিত হল। অন্দরে নানান আসবাবের মেলা, রান্নাঘর, বসবার ঘর, খাবার ঘর হামাম স্নানঘর, সভাঘর, সজ্জাঘর, রিহাসালঘর, রবীন্দ্রনাথের বসবার থাকার লেখবার কাজের কেন্দ্র।

ওদিকে রাজমাটি ও নীল আকাশের মিতালিতে প্রায় সাড়ে তিনতলার বহু ছাদবিশিষ্ট ঘরের সারি উঠল। কত-না বিচিত্র থাম, শিল্প নিয়ে আড়াল করা বিম, বৌদ্ধিক কলাম, অলিন্দ, সিঁড়ির ধাপের পর ধাপ, আর অন্দর দেয়াল জুড়ে তাতামি, বাহির দেয়াল ফ্রেসকো সবই যেন নতুন ভাবনার স্থাপত্য ভাষা নিয়ে এল। শিল্পের সঙ্গে স্থাপত্যের কথোপকথন (art in architecture) মিলিয়ে গড়ে উঠল পরিবেশ মানানসই সচল সংস্কৃতি। রবীন্দ্রনাথের গানের, কবিতার, চিঠিপত্র, প্রবন্ধ এমনকি গল্প-উপন্যাস-নাটকেরও ভাব ও ভাষার সাহায্যকারী মূর্ত-বিমূর্ত স্থাপত্য-পরিবেশ অবয়বগুলি প্রায় অনেকটাই রবীন্দ্রনাথের ভাবনা। সঙ্গে পেয়েছিলেন সুরেন কর ও নন্দলালদেব। উদয়ন-চিন্তার নির্মিত অবয়ব রবীন্দ্রনাথেরই প্রাচ্য স্থাপত্যের আধুনিক বিশ্বের আঙিনায় মেলবার সবুজ প্রকাশ। যদিও অনেকেই সেদিন শান্তিনিকেতনে ও কলকাতায় উদয়ন—উত্তরায়ণকে প্রাসাদপুরী বলে নানান ইঙ্গিত করেছিলেন। যেন এখানে কেবল নাক-উঁচু বিলাস বৈভব। সেদিন বুঝতে পারেননি অনেকেই কী প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে ওরিয়েন্টাল আর্কিটেকচার, ল্যান্ডস্কেপিং, দেয়ালচিত্র, ভাস্কর্য, ইন্সটলেশন আর্ট, পারগোলা, লতানে আম জাম নিয়ে বেয়ে চলা চলমান সবুজ সংকেতময় পরিবেশ— ভাষা গড়লেন। কেনই বা তিনি অন্দর স্থাপত্যে লোকশিল্প, কারুশিল্প, দারুশিল্প, চারুশিল্প একত্রিত ও সমন্বিত করে, নিজে শ্রমিক শিল্পীর চোখ-মন-হাতে এত বড়োমাপের কাজ করলেন। নিজে প্রায় দিনে আঠারো ঘণ্টা পরিশ্রম করতেন। জীবনযাত্রার বহু বিচিত্র শিল্পের সমাহারে উদয়ন-উত্তরায়ণ গড়েছেন। নিজে হাতে বাগান করেছেন। আচারি, কোনোসান, কাসাহারাকে নিয়ে আসবাবপত্র গড়েছেন। সুরেন কর, আর্থার গেডেস, ডামন রাওদের নিয়ে ডিজাইন টিম করে গৃহস্থাপত্য সৃষ্টি করলেন। নানা প্রজাতির গাছপালা সংগ্রহ করে রক্ষা জমিতে বন্ধুত্বের আমন্ত্রণ নির্মাণ করলেন। ভারতীয় অরণ্যের আভাস ও অনুভব স্বল্প পরিসরে জেগে উঠল। বাহারি পোশাকি গাছপালার সঙ্গে অরণ্যজাত অনামি লতাগুচ্ছ, ফুল-ফলের গাছপালার শোভা ও সম্প্রসারণ, রচয়িতার উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের জ্ঞান ও শিল্প-সৌন্দর্যের প্রতি অকৃত্রিম প্রীতি ও ভালোবাসা জানিয়ে যায়। উত্তরায়ণ তাই সবুজ সমাজেও শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এই শতকেও সমান অর্থবহ সবুজ স্থাপত্য আদর্শ।

যার হদিশ পেয়ে দিকে দিকে পরিবেশ স্থাপত্যের চর্চা বেড়েই চলেছে। রথীন্দ্রনাথ তেমন নির্মিত সবুজ পরিসরের সৃষ্টি করেছিলেন প্রায় আশি বছর আগেই।

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে জুলাই মাস থেকে বিশ্বভারতীয় উত্তর-বিভাগে রথীন্দ্রনাথ Genetics বা সৌজাত্যবিদ্যা পড়বার ভার নিয়েছিলেন। তেজসচন্দ্র সেনের সঙ্গে আশ্রমের প্রকৃতিবিদ্যা পাঠে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছিলেন। পরীক্ষা মূলক Botany-র কাজ উত্তরায়ণ বাগানে হতে লাগল। ছাত্র শিক্ষকেরা দেখতে জানতে পেল জীববিদ্যার বৈচিত্র্যের সমাহার ও সবুজ অনুসন্ধানের স্বরূপ। শুহাঘরের কাছে যে আম সপেটা পেয়ারা গাছের লতাবিতান আজও দেখতে পাওয়া যায়, সে সবই রথীন্দ্রনাথের সবুজ পরীক্ষাগারের ফসল। রথীন্দ্রনাথ আমগাছ নিয়ে এমন ভাবনা আগে ভেবেছেন। রথীন্দ্রনাথ নানান গাছের লতাবিতানে আপাত-অসম্ভব কাজগুলিকে সবুজসম্ভব করে তুললেন উত্তরায়ণে।

রথীন্দ্রনাথের অনুরাগের ঔৎসুক্যে রথীন্দ্রনাথ তাঁর বৈজ্ঞানিক শিক্ষা, শৈল্পিক মনন ও দক্ষতায় বাগান, স্থাপত্য নির্মাণ ও পরিবেশ বিন্যাসের যে বিজ্ঞত কাজ করেছিলেন, তা আজও সবুজ পরিবেশ-স্থাপত্য রচনার আদর্শ হয়ে আছে। শান্তিনিকেতন স্থাপত্য রূপে এমন ঐশ্বর্যময় বোটানিক্যাল হার্টিকালচারাল সৃষ্টিগুলি অসীম হয়ে স্থায়ী হয়ে আছে। কঠিন মাটি থেকে, জীববিদ্যার প্রথর অনুভবে প্রাকৃতিক সম্পদ ও বৈচিত্র্য গড়ে তুলেছিলেন। রক্ষণাবেক্ষণ ও সবুজ সমৃদ্ধির জন্যে সুসংহত বাগান পরিচালনকেন্দ্রও গড়ে তোলা হয়। দেশ-বিদেশের নানান species নিয়ে এসে উত্তরায়ণে, মালঞ্চ চত্বরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছিল। গাছঘর, পম্পালেক গোলাপ বাগান, কোণার্কের পিছনে নানারকম কাঁটাগাছের সঙ্গে ক্যাকটাস জাতীয় ফুল-কাঁটার বিন্যাস—কণ্টিকারি; পাথুরে কলশিতে উদ্যানবিন্যাস, মৃন্ময়ী চাতালের কোণে মরশুমি বাহারি ফুলের বেড়ে ওঠা; মালঞ্চের বাগান, উদয়নে জাপানি ল্যান্ডস্কেপ গার্ডেন শুহাঘর ও চিত্রভানুর ইকোলজিক স্থাপত্য, তোরণ নির্মাণ সব মিলেমিশে অভিনব ও বিশিষ্ট উদ্যান পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল। দৃষ্টান্তগুলিকে বৃহত্তর প্রয়োগ ক্ষেত্রে, ব্যবহারিক মাত্রায় নিয়ে আসাটাই এখন বড়ো দায়িত্বের। রথীন্দ্রনাথের প্রয়োগবিদ্যা প্রতিভার নিদর্শন, তাঁর ওয়ার্কশপ, পম্পালেক, চিত্রভানু, পাতালঘর, শুহাঘরে রয়েছে। রথীন্দ্রনাথের ভূবিদ্যা-সম্বন্ধীয় প্রত্যক্ষ জ্ঞানের (১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে) নিদর্শন—উত্তরায়ণ এলাকার ভূমিস্তর ও জলস্তরের সংরক্ষিত তথ্যের display শুহাঘরেই আছে। আরও রয়েছে। প্রযুক্তিবিদের একটি নিবিড় কর্মশালা ও আদর্শ ব্যবহারিক শিল্পকর্ম। মূলত রথীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে একসময়ে শান্তিনিকেতনে যে শিল্প প্রযুক্তি ও উদ্যানচর্চা-সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল, তা-ই কিন্তু তরঙ্গায়িত হয়ে আজও শান্তিনিকেতনবাসীদের কাছে একটি পরিবেশ প্রথারূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রথীন্দ্রনাথের আদর্শে ধ্যানীবুদ্ধ রথীন্দ্রনাথের কাছে এসে প্রাচ্যিক বসার ঘরে পূব মুখে গভীর মহিমায় বিরাজ করেছেন। কাছেই জিয়োমেট্রি উদ্ভীর্ণ রথীন্দ্র শিল্প রসের টানে আসবাবপত্র ও অন্তরস্থাপত্য-উপাদান—যেন ‘এলেম নতুন দেশের’ ভাবে স্বাধীন-চিন্তার অন্দর সম্ভ্রায় জাগিয়ে তুলল। উদয়নের বসবার ঘরের অন্দর সেই সুরটিই যেন শোনায়, যেখানে মুক্তচিন্তা ছিল জেগে। যে-স্বাধীনতার ডাক রথীন্দ্রনাথের ছিল। সেই ডাকটিকেই নির্মিত পরিসর রচনায়, বহুমাত্রিক প্রয়োগশিল্পে রথীন্দ্রনাথ বিশ্ব প্রেক্ষাপটে ভারতের নির্মিত পরিবেশবার্তায় এনে দিলেন।

একদিকে ব্রিটিশ রাজস্থাপত্যের অহংকার। ওদিকে কলকারখানা চটকল মিলের ডাকে

গ্রাম শিল্প সমাজ তখন বিভ্রান্ত। নতুন দিল্লি স্থাপত্য বিতর্ক। ব্রিটিশরাজ রাজধানী স্থাপত্য হংকারে, কয়েক লক্ষ মানুষকে শাহজাহানাবাদে প্রায়-উঁচু পাঁচিল ঘেরা আবর্জনা-স্বকপ দূর প্রান্তে নিক্ষেপ করল। ভারতের শিল্প ঐতিহ্য নিয়ে তথাকথিত রাজসিক স্থাপত্যরাজের উন্নাসিকতা, আর ওদিকে শান্তিনিকেতনেই রবীন্দ্রনাথের প্রাসাদ রচনা (উদয়ন!) নিয়ে ব্যঙ্গ বিক্রপও চলছে। এমন প্রেক্ষাপটে আর্কিটেকচার নিয়ে রবীন্দ্রনাথের মনের মতো পরিবেশ রচনার কাজ যে কত গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক ছিল অনেকেই সেদিন ধরতে পারেননি। আধুনিক ভারতের পরিবেশ নির্মাণের ভাষা গড়ে তোলার রথীন্দ্র-উদ্যোগগুলিকে সেদিনের বুদ্ধিজীবীরা অনেকেই বোঝেননি। আজও কি সঠিক বুঝতে পেরেছি আমরা। উদয়ন, উত্তরায়ণ, চিত্রভানু, গুহাঘর আর আত্মীয়তার ছন্দে মেলে ওঠা সবুজ স্থাপত্য সংলাপ ও সবুজ মনের মাধুরী নিয়ে বৈজ্ঞানিক সবুজ প্রযুক্তি বাস্তবাত্মিক ভবিষ্যৎ গড়ে উঠছিল বিশেষ দশকেই। (যা সবুজ শিক্ষার পক্ষে ঐতিহাসিক) রথীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ উদ্যোগগুলিকে বুঝতে ঠাকুরবাড়ির ঘরানা ও পরম্পরা তাই অনুধাবন করতেই হয়। যেমন রবীন্দ্রনাথের ‘বলাই’, ‘বনবাণী’, ‘মালঞ্চ’, ‘বাসা’ কবিতা ‘পুব হাওয়াতে দেয় দোলা’, ‘আমার যাবার বেলায় পিছু ডাকে’, ‘আমার মস্তিকাবনে’— এমন শত সহস্র কবিতা-গান ও রবীন্দ্রসৃষ্টি অনুধাবন করারও প্রয়োজন আছে। এই নির্মিত প্রেক্ষাপটের উৎসাহী শিল্প নির্মাণ কথায়। পিতা ও পুত্রের যৌথ নির্মিত পরিবেশ সংগীত উত্তরায়ণেই আজও রয়েছে। নিভৃতচারী শিল্পরহস্য কথায়।

পাঁচ

ঐতিহ্যের অনুবর্তন, আধুনিক পরিবেশ-স্থাপত্যে আজ বিশেষ প্রাসঙ্গিক। ভেঙেপড়া পরিবেশ আর দূষণ ছায়ায় আক্রান্ত এ জীবনে— নির্মিত সুস্থ সুন্দর পরিসরের অনুভব জীবন সংস্কৃতিকে যেন আরও বেশি প্রাণবন্ত করে তোলে; আর্থ-সামাজিক জীবন আরও গতিময় হয়। এই ধরনের কাজ রথীন্দ্রনাথ প্রায় পঞ্চাশ-ষাট বছর আগেই পুস্তন করেছিলেন। খোঁয়াই মাটি বিছানো উত্তরায়ণ প্রাঙ্গণে সাবেককালের বড়ো পাথুরে ঘড়ায় ফুলবাহারি গাছ লাগিয়ে আর সঙ্গে ছোটো মাপের Pedestal-কে মানিয়ে নিয়ে যে সবুজ পরিবেশ-ভাষা রচনা করেছিলেন সেই বিন্যাস আজও প্রাসঙ্গিকতায় সচল। উনিশ শতকের ঠাকুরবাড়ির সংস্কৃতি ঐতিহ্যকে বিশ শতকের দেশপথে এনেছিলেন— উন্মুক্ত পরিসরে, বিরল প্রতিস্থাপন শিল্প নির্মাণে।

রবীন্দ্রনাথে শিল্পভাবনাকে আকারায়িত করা বেশ কঠিন কাজ। কারণ বহু মাত্রায়, নানা তলের রূপ নির্মাণের তরঙ্গ মিলিয়ে থাকত। তা থেকে সৃষ্টির নানা বৈচিত্র্যের আয়োজন করা ডিজাইনারের কাছে বেশ কঠিন পরীক্ষা। সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন রথীন্দ্রনাথ। নিজের অন্তরের শক্তি নিয়ে, উদ্ভাবনার উদ্যোগে। শান্তিনিকেতন ডিজাইন-সমাজ রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে বিশ্বসমাজে এসে মিলেছিল, চিন্তাভাবনা ও কাজের সমন্বয়ে।

রবীন্দ্রনাথ প্রতিমাদেবীকে একটি চিঠিতে স্টুডিও পরিকল্পনার কথা লিখেছিলেন। কবির বিচিত্র কল্পনায় আভাসে ইস্তিতে রূপ নিচ্ছিল জল দেহের সঙ্গে সিঁড়ির ধাপে ধাপে ওঠানো চাতাল, সঙ্গে থাকবে একটি মাত্র ঘর। যে-ঘরের মধ্যে শোওয়ার খাট আর আসবাবপত্র নিয়ে হবে নতুন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা। থাকবে লাগোয়া গাছের লতা, পাতাবাহারি ফুলের সঙ্গে পশুপ্রাণীরও সমাবেশ। হয়তো ডেকে উঠবে পাখির কলতান। আর সুরেলা গলায় কারও কিছু

গান। নির্মিত পরিবেশে কবির কল্পনায় জোড়াসাঁকোও ফিরে এসেছিল। এই চিঠি থেকেই রবীন্দ্রনাথ ‘বাসা’ কবিতা রচনা করেছিলেন। চিঠিটা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী প্রতিমা দেবীর উদ্দেশ্যে। প্রতিমা দেবীর সেরামিক ও বাটিক কাজের স্টুডিয়ার কল্পনায় রবীন্দ্রনাথ। সেখান থেকে ‘বাসা’ কবিতা আরম্ভ করছেন। সে-কবিতা সাহিত্যের দরবারে গিয়ে হাজির হল। রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করছিলেন আড়ালে থেকে। নিভৃত নীরবতার সচল কারিগর ছিলেন। এমন একটা কবির চিঠির ভাবকে কিংবা কবিতা থেকে অসাধারণ নির্মাণের রূপান্তর ঘটিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ চিত্রভানু ও গুহাঘরের সৃষ্টিতে, ১৯৩০-এর দশকে। একটিমাত্র বাড়ি। পূব আর পশ্চিমদিকে। দু-তলের আলাদা দুটো ঢোকবার পথ। একই গৃহস্থাপত্যের দু-দিকের দুটো আলাদা ক্রিস্ট সম্পূর্ণ রূপ। দু-ধরনের স্থাপত্য ব্যক্তিত্ব আর ব্যতিক্রমী সবুজ আভাস আর ইঙ্গিত। নৈপুণ্যে ভরা দুই স্তরের বাড়িতে ডিজাইনার স্বামী-স্ত্রীর প্রেমের স্থাপত্য কথাও বলা চলে। কোথা থেকে কোথায় নিয়ে আসতে পারলেন। চিঠি ও কবিতা থেকে পরিবেশ-স্থাপত্যের সৃষ্টির সমন্বয়ী ভাষায়। রবীন্দ্রনাথের কাব্য সাহিত্য থেকে সবুজ স্থাপত্যের নির্মিত অবয়ব। অথচ উপযোগিতা আর সফল বিল্ডিং ওরিয়েন্টেশনে ভরপুর।

আরও একটি নিদর্শন। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্বৃতি-তে জীবনধারণের উপযুক্ত স্থাপত্য প্রসঙ্গে বলেছিলেন পিছনে ফেরা বড়ো ঘরানা। জোড়াসাঁকোয় দ্বারকানাথের আমলে গঙ্গাজলের ঘড়া একতলায় রাখা থাকত। ঠাকুরবাড়ির জলব্যবস্থায় তা ছিল অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্বৃতিতে পাतालঘরে রাখা গঙ্গাজলের ঘড়ার প্রসঙ্গ করেছেন। চতুর্থ পুরুষ রবীন্দ্রনাথ সেই ঐতিহাসিক ঘড়াকে বিশ্ববিদ্যাশ্রম শান্তিনিকেতনে প্রতিস্থাপন করলেন পরিবেশ নির্মাণে, সবুজ দেহে। এ যেন পিছনের বড়ো সময়কে নিয়ে সামনে প্রয়োগ-পথে হেঁটে নতুন আঙ্গিকে ও ব্যবহারে তাকে রূপান্তরিত করা। আপাত-অসম্ভব কাজকে সম্ভবপূর্ণ করেছিলেন সৃষ্টিপথের নীরব অথচ সবল শিল্প কাজের প্রেরণায়, প্রয়োগশিল্পের মুনশিয়ানায়।

আর একটি প্রসঙ্গ করা যায়। রবীন্দ্রনাথ জাপান দেখে এসে প্রাচ্যের স্থাপত্যে, ঐতিহ্যের বিশ্বাস বোধকে সেদিনের আধুনিক ভারতস্থাপত্যে যোগ করতে চেয়েছিলেন। আধুনিক প্রাচ্য স্থাপত্য ও নির্মিত পরিবেশ শৈলীর শ্রেষ্ঠ প্রকাশ এই উদয়ন, তার অন্দর ও বাহির। ঘর সাজানো, ঘরের আসবাবকে উপযোগিতা আর রসের সঞ্চারে সমান তালে প্রকাশ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কাছেই ছিল কলাভবন শিল্প ভবনের তৎপরতা ও নিষ্ঠা। উদয়ন বাড়ির থাম, জানালার আদল, চাতাল, সিঁড়ির ধাপ, ঘরের সাজসজ্জা, হাওয়া চলাচল, আলোর রেখার আর ব্যবহারিক গুণের কত না সমন্বয় এই উদয়ন, চিত্রভানু আর মিতালি। ইকোলজিক আর্কিটেকচারের প্রায় প্রথম আধুনিক অনুসন্ধান। বিশ শতকের ভোর থেকে রবীন্দ্রনাথ যা চাইছিলেন, তেমনিই নিদ্রা প্রয়োগ ভাষায় রবীন্দ্রনাথ রচনা করলেন আলোছায়ায়, সবুজ খোয়াইমাটির রেখায়, নীল আকাশের নীচে তল-তলানো স্থাপত্যের এক আশ্চর্য ছন্দে। আজ বালকৃষ্ণ দোশি, চার্লস কোরিয়া, লরি বেকারের মতন অনেকেই, দেশে-বিদেশে যে-ধরনের মাটি-বৈষা স্থাপত্য রচনা করছেন, তার সূত্রপাত হয়েছিল আধুনিক শান্তিনিকেতন-স্থাপত্যে। ল্যান্ডস্কেপিং, বাগান-স্থাপত্য, তোরণ, বড়ো গাছ, মাঝারি গাছ, লতানো গাছ, ছোটো গাছ শুশুম, সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য সব বাতিদান, নির্মিত ইকোলজিকে স্থাপত্য দেহপ্রাণ-সব মিলিয়ে গড়ে তুলেছিলেন শান্তিনিকেতন ঘরানার আর এক বিচিত্র গতি। প্রয়োগশিল্পের আলোর রেখা ও রঙ।

শান্তিনিকেতনে রথীন্দ্র-আদর্শে রথীন্দ্রনাথের অনন্য সাধারণ সৃষ্টিকর্মে বায়োলজি কি, ইকোলজির আদর্শ ভূমি যেন নির্মিত হল। সাথে সাথে বাংলা ভাষায় Plant Genetics জীববিদ্যা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে বিজ্ঞান বই লিখেছেন। জীবনের উপাত্তে বাংলা ও ইংরেজিতে আরও লিখবেন। পিতৃস্মৃতি, *On The Edges of Time*—এমনই কতক আশ্চর্য ফসল।

শান্তিনিকেতন-পরিবেশের দিকেই শুধু তাকিয়ে নয়, অন্তর হতে ভাবনা-ভাবার ইশারা ও ইঙ্গিতগুলি অনুধাবন করলে বিম্বিত হতে হয় কবির কথা, কবির লিখিত সুরের ছন্দ কিংবা চিঠিপত্রের অমূল্য সম্পদকে রথীন্দ্রনাথ কত দক্ষতায়, আভিজাত্যের অনুরাগে ও শিক্ষিতের উপস্থাপনায় সাজিয়ে তুললেন অনায়াস ছন্দে। সৌন্দর্য সৃষ্টির অমোঘ টানে। যার মূল্য বিশ্বভারতীতে, ভারতে এবং প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের পরিবেশ-স্থাপত্য রচনার ইতিহাসে, বিশেষ গুরুত্বের। যা আগে কখনও হয়নি, পরেও এমন নির্মিত সংস্কৃতির ধারা গেল পাগটে। আমরা হয়ত বিস্মৃত হলাম, সি. এফ. অ্যান্ডরুজ রথীন্দ্রনাথের কাজের আন্তর্জাতিক 'Rathi is writing Poetry in bricks and Mortar'!

জীবনের প্রান্তরেখায় *On the Edges of Time* কে প্রসারিত করেছেন মননে, লেখায় ও প্রতিস্থাপনে। নীরব কিন্তু সচল এমন প্রয়োগশিল্পীই তো নিজের স্মৃতি রচনায় বলবেনই : 'Let your life lightly dance on the edges of time, like dew in the tip of a leaf' The Gardener-এর শিশির বিন্দু চরন করে—আমাদের সামনে মেলে ধরেছিলেন, সামগ্রিকতায় তিরতির করা বন্ধুশিল্প কাকে বলে। হাতে ছেনিতে শান্তিনিকেতনের ঠাকুরবাড়ির তৃতীয় পুরুষ পরিবেশ সংস্কৃতির মানবিক অবয়ব গড়ে দিয়ে গেলেন। রথীন্দ্রনাথকে যিনি শুধুই পিতা হিসেবে সেবা করেন নি, শিল্পী রথীন্দ্রনাথকেও আকারায়িত করে, শিল্পচর্চায় নতুন পরিবেশ সাধনার সম্ভান দিয়েছেন।

একুশ শতকের ডিজাইন ভাবনা সামগ্রিক পরিবেশ ও গৃহবাণীর চর্চাকে সরিয়ে রেখে কখনই আর সার্থক হবে না। প্রয়োজন সঠিক সৃষ্টির রেফারেন্স। রথীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন ল্যাবরেটরির, শ্রেষ্ঠ সবুজ মন ও হাতের কাজের গুরুত্ব তাই বেড়েই চলেছে। রথীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিকতা তাই ফুরোবার নয়। এই পরিবেশ শতকের বায়োলজিক ডিসন যখন অপরিহার্য উপাদান, তখন রথীন্দ্রনাথ হয়তো ক্রমশই উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠবেন, সবুজ সম্ভাবনাময় পৃথিবীর নতুন আলোক রেখায়।

পুলিনবিহারী সেন

পার্থ বসু

ময়মনসিংহ শহরের ব্রাহ্মপদ্ধিতে বাস করতেন চিকিৎসক বিপিনবিহারী সেন। তিনি দেশব্রতী ও দরিদ্রবান্ধব। বিপিনবিহারীর দয়াদাক্ষিণ্যের কথা সুবিদিত ছিল। তাঁর সহধর্মিণী দুটি পুত্র সন্তান রেখে অকালে প্রয়াণ করেন। বিপিনবিহারী সেনের সেই দুই সন্তান, নলিনবিহারী ও পুলিনবিহারী। পুলিনবিহারীর জন্ম ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ১১ আগস্ট। সেইদিনে বিখ্যাত ক্ষুদ্রিরাম বসুর ফাঁসি হয়। তদনুসারে পুলিনবিহারীর জাকন্নাম ছিল, খুদু বা ক্ষুদু।

প্রবল স্বদেশি আন্দোলনে ময়মনসিংহ শহর তখন আলোড়িত। সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জাতীয় বিদ্যালয়। সেই বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে প্রতিবেশী নীহাররঞ্জন রায়ের পরিবারের পরামর্শে ডাক্তার বিপিনবিহারী সেন কনিষ্ঠ পুত্রকে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ে পাঠিয়েছেন। প্রচলিত শিক্ষা ও পরীক্ষা ব্যবস্থার ঘোর বিরোধী ছিলেন বিপিনবিহারী।

১৯২৬ সালে পুলিনবিহারী ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। শান্তিনিকেতনের শিক্ষাভবন থেকে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষাও দিয়েছেন। সেইকালে ক্ষিত্তিমোহন সেন এবং প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের পরিবারে পুলিনবিহারী সনের সামিধ্য পেয়েছেন।

তখন প্রতি বুধবার শান্তিনিকেতন উপাসনাগৃহে বা মন্দিরে প্রাতঃকালীন উপাসনা হত। শান্তিনিকেতনে উপস্থিত থাকলে রবীন্দ্রনাথ সাপ্তাহিক উপাসনায় আচার্য হতেন। সেখানে কবি যেসব তাৎক্ষণিক ভাষণ দিতেন সেগুলি অনুলিখন করতেন সন্তোষচন্দ্র মজুমদার। পরে রবীন্দ্রনাথ সংশোধন ও পরিমার্জন করেছেন। সেসব ভাষণ শান্তিনিকেতন গ্রন্থে সমাহৃত হয়েছে।

সন্তোষচন্দ্রের অকালমৃত্যুর পর বিপত্তি দেখা দিল। সেইরকম শ্রুতিধর বা মনোযোগী অনুলেখক তখন আশ্রমে ছিল না। কখনো প্রাক্তন ছাত্র প্রদ্যোৎকুমার সেনগুপ্ত আশ্রমে উপস্থিত হলে সেই কাজ তিনি করতেন। তিনি অন্যত্র কর্মরত ছিলেন।

প্রতি বুধবার উপাসনাস্থলে উপস্থিত ছাত্র পুলিনবিহারী সম্পূর্ণ স্ব-ইচ্ছায় কবির ভাষণের শ্রুতিলিখন নিয়েছিলেন। বন্ধু ক্ষেমেন্দ্রমোহন সেন কানাইলাল সরকারের প্ররোচনায় পুলিনবিহারী সলজ্জ সংকোচে তার কিছু নমুনা রবীন্দ্রনাথ সমীপে পেশ করেন। গুরুদেব খুশি হয়েছিলেন, 'তোমার তো দেখছি বাংলা জ্ঞান বেশ ভালো। ...ঠিক আছে, এখন থেকে তুমি লিখে আনবি, আমি দেখব।' পুলিনবিহারী উৎসাহ পেলেন। যেসব ভাষণ আশ্রমের মুখপত্র শান্তিনিকেতন, কলকাতার প্রবাসী পত্রিকায় তখন প্রকাশ পেয়েছে। পরে শান্তিনিকেতন গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। রবীন্দ্রস্বাক্ষর পুলিনবিহারী সেনের যাত্রা শুরু হল।

অতঃপর পুলিনবিহারী কলকাতায় এসে পড়াশোনা চালিয়ে যাবার প্রস্তুতি নিলেন।

রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল যে, পুলিনবিহারী ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে অনার্স নেবেন সেই মর্মে সিটি কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ হেরষচন্দ্র মৈত্রেয় কাছের রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠি লিখে দিলেন। পুলিনবিহারীর ইচ্ছা, অর্থনীতিতে অনার্স নেবার। সিটি কলেজে সেই ব্যবস্থা ছিল না। পুলিনবিহারী স্কটিশ চার্চ কলেজে অর্থনীতিতে অনার্স নিয়ে বি. এ. শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছেন। তখন থাকতেন ওগিলভি হস্টেলে।

ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য পুলিনবিহারীর পাঠক্রমে বিশেষ রূপে ছিল না, কিন্তু ইংরেজি ভাষায় তাঁর বরাবর দক্ষতা ছিল। প্রবাসী পত্রিকায় পুলিনবিহারী যখন যোগ দিলেন, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত পুলিনবিহারীর পরিচিতি-পত্রে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন যে, কবির ইংরেজি থেকে বাংলা এবং বাংলা থেকে ইংরেজি, পুলিনবিহারী-কৃত ভাষান্তরে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ আস্থা আছে; সেখানে ভাব ও ভাষার বিকৃতি ঘটেনি। বি. এ. অর্থনীতিতে অনার্স পরীক্ষায় পুলিনবিহারী স্কটিশ চার্চ কলেজের ছাত্রদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করলেন। যথাসময়ে এম. এ. পরীক্ষাতেও কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হলেন।

স্নাতকোত্তর শ্রেণির ছাত্র যখন তখন রবীন্দ্রনাথের সন্তুর্নতম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে কলকাতায় মহাসমারোহে উৎসবের আয়োজন হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের এক কমিটি তৈরি হয়; একটি গ্রন্থপ্রকাশের প্রস্তাব হয়, নাম *কবিপ্রশান্তি*। সেই কমিটির প্রধান উদ্যোক্তাদের মধ্যে ইতিপূর্বে মুদ্রণ ও প্রকাশন বিষয়ে অভিজ্ঞতা ছিল না। তখন উৎসবের মুখ্য সংগঠক অমল হোম এবং নীহাররঞ্জন রায়ের পরামর্শে পুলিনবিহারী সেনকে ভার দেওয়া হয়। সম্ভবত প্রকাশন জগতে পুলিনবিহারীরও সেই প্রথম স্বাধীন পদক্ষেপ। *কবিপ্রশান্তি* গ্রন্থে তাঁর একটি রচনা ছিল, 'রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয়'।

পুলিনবিহারী সেন এম. এ. পাশের পর কিছুদিন এক বিমা অফিসে কাজ করেছেন। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র সুবীরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৌজন্যে সেই কাজ পেলেও অবশ্য পুলিনবিহারীর অধিকদিন ভালো লাগেনি।

অতঃপর পুলিনবিহারী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত *প্রবাসী* পত্রিকায় যোগ দিয়েছেন। সেখানে সহকর্মী রূপে পেলেন যোগেশচন্দ্র বাগল ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নীরদচন্দ্র চৌধুরী সজনীকান্ত দাসকে। এখানেই রামানন্দের আদর্শে তাঁর সম্পাদনা কর্মের শিক্ষানবিশি। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কর্তব্যনিষ্ঠা, নিজ আদর্শে অবিচল থাকার সততা, শ্রম, চরিত্রবল পুলিনবিহারী সর্বদা অনুসরণীয় মনে করতেন। রামানন্দের সম্পাদকীয় রচনার ভাব ভাষা ও ভঙ্গি পুলিনবিহারী চিরকাল সম্ভ্রান্তভাবে উল্লেখ করতেন। রচনা পঞ্জি প্রণয়নে এবং সংকলনকর্মে এইকালে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে পুলিনবিহারীর দীক্ষা। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একদা তরুণ পুলিনবিহারীর কাজের পদ্ধতি দেখে চিরকুট পাঠিয়েছিলেন, 'অত খুঁতখুঁত করিবেন না।' পুলিনবিহারী তাকে আশীর্বাণী স্তবন করতেন। *প্রবাসী* পত্রিকা পুলিনবিহারীকে যথেষ্ট অভিজ্ঞ করেছে।

১৯৩৯-এ ঠিক হয়, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করবে। তখন রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছানুযায়ী, রবীন্দ্রনাথের নির্দেশক্রমে পুলিনবিহারী সেনকে *প্রবাসী* পত্রিকা থেকে বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের অধ্যক্ষ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের সহকারী রূপে গ্রন্থনবিভাগে নিয়ে আসা হয়। সেই রচনাবলির প্রতি খণ্ডে রচনার উৎস, প্রকাশ কাল ও স্থান ও তৎসম্পৃক্ত

বিবিধ বিবরণের তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থপরিচয় যুক্ত হয়। প্রধানত পুলিনবিহারী সেন এই গ্রন্থ বা রচনা পরিচয়াদির সংকলক ছিলেন; তাঁকে সহায়তা করেছেন নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিজ্ঞানবিহারী ভট্টাচার্য কানাই সামন্ত।

রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে রচনাবলির সাত খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে, আর অপ্রচলিত বা বিস্মৃতপ্রায় রচনা-সংগ্রহ অচলিত রচনাবলি এক খণ্ড। এই প্রসঙ্গে পুলিনবিহারী এক কাহিনি বলতে ভালোবাসতেন। গঠনসৌষ্ঠবে, মুদ্রণসৌকর্যে-চমকপ্রদ সেই রচনাবলির প্রথম খণ্ডটির এক কপি নিয়ে দ্রুত তাঁর গুরুদেব রবীন্দ্রনাথকে দেখাতে পুলিনবিহারী শান্তিনিকেতনে গিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থটি অনুপুঙ্খভাবে, পাতার পর পাতা উন্টোচ্ছেন, বিশেষ করে ‘গ্রন্থপরিচয়’ অংশটি দেখে তাঁর মুখ বিস্ময়ে এবং আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। বারবার তাঁর একই কথা। ‘কোথা থেকে পাও এসব?’ কবির সামনে কিছু দূরে বসে পুলিনবিহারী কবির সেই তৃপ্তি, সলজ্জ হাসিতে উপভোগ করছেন। পুলিনবিহারীর সেই প্রচ্ছন্ন আত্মশ্রদ্ধার ভাব রবীন্দ্রনাথ মাঝেমধ্যে অপাঙ্গ দৃষ্টিপাতে লক্ষ্য করলেন। তারপর বইয়ের দিকে তাকিয়েই বলে উঠলেন, ঠুং, এমন ভাব যেন অর্ধেকটা ওঁরই লেখা।

কিশোরীমোহন সাঁতরার মৃত্যুর পর অধ্যক্ষ হয়েছেন চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, তাঁর সহকারী পুলিনবিহারী সেন। ক্রমশ তিনি গ্রন্থন বিভাগের অধ্যক্ষ হয়েছেন; সেই কাজে যেমন সর্বতো সহায়তা পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথের, তেমনই তাঁর সহকর্মীদের। তখনই দেখা গেল, পুলিনবিহারী রবীন্দ্রনাথের বহুতর লুপ্তপ্রায় রচনা, ভাষণ, প্রাসঙ্গিক পত্রাবলির যেমন সম্বান রাখতেন, তেমনই বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনেও নবীন কল্পনা ও দৃষ্টির পরিচয় দিতেন। সেই কারণে, পুলিনবিহারীর আমলে শুরু হল শুধু মুদ্রিত গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ নয়, সর্ব অর্ধে নতুন সংস্করণ অর্থাৎ প্রয়োজনীয়, সংযত ভাষ্যে গ্রন্থপরিচয় অধ্যায়ের সংযোজন; প্রচ্ছদেও কখনো-বা পরিবর্তন।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর আগেই ইংরেজি *বিশ্বভারতী কোয়াটারলি*-র অনুসরণে বাংলা ভাষায় একটি পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা ছিল: ‘শান্তিনিকেতনে বিদ্যার নানা ক্ষেত্রে যাঁহারা গবেষণা করিতেছেন এবং শিল্পসৃষ্টিকার্যে যাঁহারা নিযুক্ত আছেন, শান্তিনিকেতনের বাহিরেও বিভিন্ন স্থানে যে-সকল জ্ঞানব্রতী সেই একই লক্ষ্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাহাদের সকলেরই শ্রেষ্ঠ রচনা এই পত্রে একত্রে সমাহৃত হইবে।’

প্রথম বছরে, ১৩৪৯-এর শ্রাবণ প্রথম সংখ্যা থেকে পরিকল্পিত *বিশ্বভারতী পত্রিকা* মাসিকপত্র রূপে প্রকাশ পেল; সম্পাদক ছিলেন প্রমথ চৌধুরী। *সবুজপত্র*, *অলকা* পত্রিকার এই প্রাক্তন সম্পাদক তখন বৃদ্ধ এবং অসুস্থ। দ্বিতীয় বছর থেকে সম্পাদক হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর সরকারী প্রমথনাথ বিশি। চার সদস্যের সম্পাদকীয় সমিতির অন্যতম সদস্য পুলিনবিহারী। প্রত্যেকে স্ব-স্ব পেশায় ব্যস্ত; এতদ্ব্যতীত পুলিনবিহারীর সম্পাদনাকর্মে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অধিক, তাঁর এবং বিধ কাজে যথেষ্ট প্রবণতা ছিল। রবীন্দ্রনাথ, সুতরাং তাঁর উপর নির্ভরশীল ছিলেন। গ্রন্থন বিভাগের অধ্যক্ষ পদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সক্রিয় সহযোগী হলেন পুলিনবিহারী। ত্রৈমাসিক *বিশ্বভারতী পত্রিকা*র রচনা সংগ্রহ ও সম্পাদনাভার মূলত পুলিনবিহারীর উপর বর্তে ছিল দ্বিতীয় সংখ্যা থেকেই।

এরপর, দেখা গেল যে, ‘সংস্কৃতি ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে যে সকল মনীষী... শান্তিনিকেতনে তাহাদের আসন রচনা করাই... রবীন্দ্রনাথের ঐকান্তিক লক্ষ্য ছিল। বিশ্বভারতী পত্রিকা এই লক্ষ্যসাধনের

অন্যতম উপায়স্বরূপ হইবে’—এমন এক ঘোষিত উদ্দেশ্য থেকে দ্বিতীয়/তৃতীয় বর্ষ থেকেই বিশ্বভারতী পত্রিকা ক্রমশ দূরে চলে যাচ্ছে। পত্রিকার দ্বাদশ বর্ষ থেকে সম্পাদকের নাম হিসেবে মুদ্রিত হয় পুলিনবিহারী সেনের নাম। বেশ কিছু আগে থেকেই যে সৌকর্য অনুসৃত হয়ে আসছিল তার আরও পরিণত প্রকাশ দেখা গেল দশম/একাদশ, বিশেষ করে দ্বাদশ সংখ্যা থেকে। গভীর গবেষণাভিত্তিক উত্তম রচনাগুলিকে পরিকল্পনা-সৌষ্ঠবে, পৃষ্ঠার চারপাশে সমান মার্জিন রেখে, প্রায়-নির্ভুল অক্ষরবিন্যাসে এবং সমগ্র পত্রিকায় এক প্রচ্ছন্ন মর্যাদাবান রুচির প্রকাশের বিশ্বভারতী পত্রিকার প্রতি সংখ্যা যথেষ্ট আকর্ষক। বঙ্গীয় বিদ্বজ্জনের কাছে এই পত্রিকায় রচনার আমন্ত্রণ পাওয়া শ্লাঘ্য হয়ে উঠেছিল। সম্পাদনাকর্মেও পুলিনবিহারীর যথেষ্ট নৈপুণ্য ছিল। প্রখ্যাত পণ্ডিতদের রচনায়ও শব্দ-পরিবর্তনে তিনি সংকোচ করতেন না, তবে লেখকের অনুমতিক্রমেই সেই বদল হত। প্রসঙ্গক্রমে শশীভূষণ দাশগুপ্তের সঙ্গে এই শব্দপ্রয়োগের ব্যাপারে তাঁর দীর্ঘ পত্রবিনিময় উল্লেখযোগ্য। পুলিনবিহারী নত হতেন না সহজে।

যে ঘোষিত আদর্শ থেকে বিশ্বভারতী পত্রিকা-র চ্যুতি উল্লেখ করেছে, সেটি অনিবার্য ছিল এবং সেই কাজ অবশ্যই শুভকর হয়েছিল। পুলিনবিহারী বুঝেছিলেন, বিশ্বভারতী পত্রিকার অস্তিত্বরক্ষার এবং প্রচার ও প্রসারে শুধু শান্তিনিকেতনের কয়েকজন আশ্রমবাসী অধ্যাপকের রচনার পুনর্মুদ্রণ বা প্রকাশে কিছুমাত্র সাহায্য করবে না। প্রবোধচন্দ্র সেন ক্ষিতিমোহন সেন বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, মনে হতে পারে, একমাত্র নির্ভরশীল হতে পারেন না। দ্বাদশ বর্ষের সূচি লক্ষ করলে দেখা যাবে চৌত্রিশজন লেখকের মধ্যে ছাব্বিশ জনের সঙ্গে আশ্রমের কোনো সম্পর্ক নেই। সেইসময়ে বিশ্বভারতী পত্রিকার লেখকদের মধ্যে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় চিন্তাহরণ চক্রবর্তী বিমানবিহারী মজুমদার প্রমুখ প্রবীণদের সঙ্গে লেখকগোষ্ঠীতে এলেন বিনয় ঘোষ ভবতোষ দত্ত আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত প্রমুখ নবীন বিদ্বজ্জন। ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চায় পুলিনবিহারী পত্রিকাটিকে এইভাবেই বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রসারিত করে দিলেন। জ্ঞানের ভুবনে অচলায়তন এক অভিষাপ।

রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থের পূর্বাপর মুদ্রণ শুধু নয়; কবির লুপ্তপ্রায় ও বিস্মৃত রচনাগুলিকে নিয়ে প্রাসঙ্গিকভাবে নতুন গ্রন্থ প্রকাশেও পুলিনবিহারীর কীর্তি এখনও পর্যন্ত অনতিক্রমণীয়। *আত্মপরিচয়*, *সাহিত্যের স্বরূপ*, *স্মৃতি*, *ইতিহাস*, *পল্লীপ্রকৃতি*, *রূপান্তর* (প্রথম খণ্ড), *সংগীত চিন্তা*, এসবই তার উজ্জ্বল উদাহরণ। সেইসঙ্গে, ব্যক্তিপুরুষ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন সময়ে রচনাগুলি সন্ধান ও গ্রন্থনা করে প্রকাশ করেছেন; *মহাত্মা গান্ধী*, *বুদ্ধদেব*, *খৃষ্ট*, *মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ*, *ভারতপথিক রামমোহন রায়* ইত্যাদি। আর তো চলেইছে পত্রাবলির ক্রমাধ্বয়ে সংকলন যার গ্রন্থপরিচয় অংশের পরিকল্পনা পুলিনবিহারীর এক মহৎ কাজ; তার প্রথম ও সর্বোত্তম উদাহরণ হল, *চিঠিপত্র*’র ষষ্ঠ খণ্ড : রবীন্দ্রনাথ-জগদীশচন্দ্রের বন্ধুত্বে নতুন আলোকপাত। পূর্বপ্রচলিত গ্রন্থের সর্বতোভাবে নবীন ও বৃহত্তর সংস্করণ প্রকাশ করে চলেছেন তিনি : *চিত্রা*, *গীতাঞ্জলি*, *উৎসর্গ*, *শিক্ষা*, *সাহিত্য*, *জাপানযাত্রী*, *পারস্যযাত্রী*, *রক্তকরবী* ইত্যাদি। *জাপানযাত্রী* ও *পারস্যযাত্রী* গ্রন্থদুটিতে পুলিনবিহারী রাজশেখর বসুকে দিয়ে বর্ণলিপি করিয়েছেন।

আরও পরিকল্পনা ছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং চরুচন্দ্র ভট্টাচার্যের প্রত্যক্ষ সহায়তায় তার দুটি রূপ পেল। একটি তার নামেই পরিচিত, বিশ্বভারতী লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা। রবীন্দ্রনাথের *বিশ্বপরিচয়* তার প্রথম গ্রন্থ, ক্রমশ সুরেন ঠাকুর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

নির্মলকুমার বসু প্রমুখের গ্রন্থমালা তার অন্তর্ভুক্ত। অপরটি হল, ‘যুগশিক্ষার সহিত সাধারণ মনের যোগসাধন’ কল্পে সহজ সংক্ষিপ্ত ভাষায় আট আনা মূল্যের ক্ষুদ্রাকার ‘বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ’ গ্রন্থমালার ক্রমান্বয়ে প্রকাশ। এখানেও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের স্বরূপ পুস্তিকার সূচনা; রাজশেখর বসু ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল প্রমথ চৌধুরী অতুলচন্দ্র গুপ্ত এমত মনস্বীদের কলমে বিচিত্র বিষয় পরিচ্ছন্ন সংহত আকারে পরিবেশিত হল। এরকম সিরিজ বাংলা ভাষায় সেই ছিল প্রথম।

১৯৬১ তে রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিক বৎসর। বিশ্বভারতীর সঙ্গে পুলিনবিহারী সেনের বিচ্ছেদ ঘটে গেলে। রাজ্য সরকারের হাতে বিশ্বভারতীর তৎকালীন উপাচার্য সুধীরঞ্জন দাশ রবীন্দ্র-রচনাবলির সুলভ মূল্যে প্রকাশনভার তুলে দিলেন। তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা সচিব ধীরেন্দ্রমোহন সেন; তিনি শান্তিনিকেতনের প্রাপ্তন ছাত্র ও কর্মী। পুলিনবিহারীর ইচ্ছা ছিল, প্রচলিত রচনাবলি সুলভ মূল্যে প্রচারিত হবে, শুধু তার ক্ষতিপূরণের জন্য রাজ্য সরকার প্রস্তাবিত বাজেটের অর্থ বরাদ্দ করবে। সেখানে থাকবে বিশ্বভারতীর শীলমোহর। রাজ্য সরকার নিজস্ব অধিকার ছাড়তে পারল না, বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষেরও সেখানে সায় ছিল। পুলিনবিহারী তাঁর বিখ্যাত পূর্ববঙ্গীয় জিন্দ বজায় রাখলেন। এক দুঃসময় এল।

১৯৫৩-এর প্রথমে পুলিনবিহারীর অগ্রজ নলিনবিহারী স্ত্রী ও সাত পুত্রকন্যা সহ এই বঙ্গে নিঃস্ব অবস্থায় চলে এসেছিলেন। তিনি পুলিনবিহারীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিলেন, পৃথক বাস করতেন। এতদ্ব্যতীত পুলিনবিহারী অনেককে নিয়মিত সাহায্য করতেন, আশ্রিতের, সংখ্যাও কম ছিল না। পুলিনবিহারী হঠাৎ আবিষ্কার করলেন, তিনি অনেকটাই নির্বাক হয়ে পড়েছেন; বিশেষত বিশ্বভারতী বা শান্তিনিকেতনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেকেই তাঁর সংস্পর্শ এড়িয়ে চলেন, তখনো তিনি দৈনন্দিন জীবনের কর্মসূচি বজায় রেখেছিলেন।

পুলিনবিহারীর সঙ্গীর সংখ্যা কমলেও বন্ধু কিছু ছিলেন। বঙ্কালের বান্দব কানাইলাল সরকারের সৌজন্যে, অশোককুমার সরকারের সহায়তায় সত্যপ্রয়াত বিধানচন্দ্র রায়ের ৮২-তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে, ডাক্তার রায়ের ভাষণ ও রচনা এবং তাঁর সম্পর্কিত স্মৃতিচর্চার এক সংগ্রহ-পুস্তক সম্পাদনা করেছেন পুলিনবিহারী, সেই বৃন্দায়তন গ্রন্থের নাম, টুওয়ার্ডস এ প্রসপারাস ইন্ডিয়া। জিজ্ঞাসা-র ত্রিশচন্দ্র কুণ্ডুর প্ররোচনায় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কিত বিস্তৃত গ্রন্থপরিচয় সহ প্রকাশ করেছেন তাঁর স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যগ্রন্থ। একই প্রকাশন থেকে প্রকাশ করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতৃস্মৃতি; যুক্ত হয়েছে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে পুলিনবিহারীর মূল্যায়ন।

বিশ্বভারতী পুলিনবিহারীকে বর্জন করেছেন, পুলিনবিহারী রবীন্দ্রনাথকে অধিকতর ভাবে আশ্রয় করেছেন। বিনয় ঘোষের প্রস্তাব-অনুসারে বাক-সাহিত্য পুলিনবিহারীকে রবীন্দ্র-শতবর্ষ সংকলন গ্রন্থের সম্পাদনার অনুরোধ জানিয়েছে। সেই সুবাদে প্রকাশ পেল তাঁর উত্তম সম্পাদনাকর্মের পরিচায়ক দুই খণ্ডে রবীন্দ্রায়ণ। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র তত্ত্বকৌমুদী পত্রের রবীন্দ্রসংখ্যা; কিছু পরে রামানন্দ জন্মশতবর্ষপূর্তি সংখ্যা; রজনীকান্ত সেন জন্মশতবর্ষ পূর্তি সংখ্যা। এই কালে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার দু-বছর পুলিনবিহারী পত্রিকাধ্যক্ষ ছিলেন। পত্রিকার ৬৫ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা তিনি প্রকাশ করলেন জগদীশচন্দ্র বসু জন্মশতবর্ষপূর্তি সংখ্যা; ৬৬ বর্ষ তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যাদ্বয় তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশ পেল মূল্যবান সংগ্রহযোগ্য গ্রন্থ রূপে : রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষপূর্তি সংখ্যা।

আরও চলেছিল বিভিন্ন পুরোনো পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনা-পঞ্জির কাজ। রবীন্দ্রনাথের

ছোটোগল্পের তথ্যপঞ্জি, ভূমিকা-সংকলিত গ্রন্থ, সেইসঙ্গে ইংরেজি ভাষাতেও গ্রন্থপঞ্জি বা রচনার তালিকা, তাঁর ইংরেজি রচনা এবং ভাষান্তরের বিবরণ। ক্ষিতীশ রায় সহযোগে সংগীত-নাটক অকাদেমি পত্রিকার রবীন্দ্র-শতবার্ষিক সংখ্যার সম্পাদনা, ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যার সম্পাদনা, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট-এর বিশেষ সংখ্যা; এইসব পত্রিকায় শুধু সুযোগ্য রসজ্ঞদের রচনা-সংগ্রহ নয়, চিত্র এবং চিত্রের স্থাপন, বিন্যাস এসব কর্মে পুলিনবিহারীর শিল্পচেতনার পরিচয় মেলে। একদা তিনি প্রবাসী, পরে দেশ পত্রও চিত্র সমালোচনা করেছেন। রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সুধীর খাস্তগীর প্রমুখের চিত্রপ্রদর্শনীর পরিচায়কও লিখেছেন। সেই অভিজ্ঞতা বরাবর ফল দিয়েছে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-এর ভারতকোষ গ্রন্থ সংকলনকর্মে পুলিনবিহারী যথেষ্ট উদ্যোগ, উৎসাহ ও পরিশ্রম দেখিয়েছেন। এই কোষগ্রন্থের পাঁচটি খণ্ডেই তাঁর একাধিক রচনা রয়েছে। বিশ্বকোষ এবং বাঙালি চরিতাভিধান-এও তাঁর রচনা সংকলিত হয়েছে।

আকৈশোর রবীন্দ্র ও আনুসঙ্গিক তথ্যাদি চর্চার পুণ্য ফল পুলিনবিহারীর উত্তরসাধকদের সমৃদ্ধ করে চলেছে। প্রাতিষ্ঠানিক সম্মানও তিনি পেয়েছেন : সাহিত্য অকাদেমির রবীন্দ্র শতবর্ষ বিশেষ পুরস্কার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সরোজিনী বসু স্বর্ণপদক (১৯৬৩), রবীন্দ্রভারতীর রবীন্দ্র-পুরস্কার (১৯৬১), আনন্দবাজার পত্রিকার বিশেষ সরলাবালা পুরস্কার (১৯৬২) ইত্যাদি।

পুলিনবিহারী সেন তাঁর সহযোগীদের কাছে নিয়ত কৃতজ্ঞ ছিলেন; যেমন জগদীন্দ্র-ভৌমিক শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। বিচিত্র বিদ্যার গুণীজন তাঁর বন্ধুস্থানীয় ছিলেন। অথচ সবিনয়ে জানাতেন, আমার উপকরণ কাঁচি আর আঠা। বলতেন, আমি লেখক নই, শ্রমিক মাত্র।

১৯৮৪-র ১৪ অক্টোবর কলকাতার পি.জি. হাসপাতালে পুলিনবিহারী সেন প্রয়াণ করেন।

বাংলা ভাষায় চলচ্চিত্রচর্চা : রূপরেখা ও বিবর্তন

সোমেন ঘোষ

চলচ্চিত্র মাধ্যমের শতবর্ষ পূর্ণ হয়েছিল আজ থেকে এক দশক আগে। সেদিক থেকে চলচ্চিত্রের বর্তমান বয়স ১১০ বছর পূর্ণ হয়েছে। ১৮৯৫ এর ২৮শে ডিসেম্বর সেই ঐতিহাসিক সন্ধ্যা প্যারিসে জন্ম হয়েছিল এই শিল্প মাধ্যমের। লুমিয়ের ভ্রাতৃদ্বয়ের তৈরি *এ্যারাইভাল অফ এ ট্রেনই* বিশ্বের প্রথম চলচ্চিত্র। ছবির দৈর্ঘ্য ছিল এক মিনিটেরও কম। কিন্তু বিশ্বের অত্যাশ্চর্য শিল্প মাধ্যম হিসেবে এই ছবিটি সেদিন মানুষকে চরম বিস্ময়ে অভিভূত করেছিল। পর্দায় প্রতিফলিত চলমান মানুষ ও যন্ত্রের কয়েক মুহূর্তের পর্যায়ে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্প ও গণমাধ্যম রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। বয়সের নিরিখে চলচ্চিত্র সবচেয়ে কনিষ্ঠ শিল্প মাধ্যম। সাহিত্য, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, সংগীত ইত্যাদি অপরাপর শিল্প মাধ্যমের সূচনা হয়েছিল সিনেমা শিল্পের বহু বহু শতাব্দী আগে। অথচ আজ নতুন সহস্রাব্দে পৌঁছে সিনেমা সম্পর্কে এর নন্দন ও ব্যাকরণ নিয়ে ভাবতে গেলে বিস্মিত হতে হয় যে, এক শতাব্দীর কিছু বেশি সময়ের মধ্যেই এই শিল্প মাধ্যমের ব্যাপ্তি সারা বিশ্বের সব শাখায় মননশীল মানুষদের কাছে আমাদের চারপাশের পরিবর্তমান জগতটাকে নতুন দৃষ্টিতে দেখা ও ভাবার দরজা খুলে দিয়েছে। আসলে যোহেতু এই মাধ্যম গড়ে উঠেছে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সমন্বয়ে তাই এই শিল্পমাধ্যমের সৃজনধর্মী রূপকারেরা প্রতিনিয়ত তাঁদের পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে সিনেমার শরীর ও আত্মার বিকাশ করতে প্রয়াসী হয়েছেন নানান পথে। চলচ্চিত্র তাই আজ আমাদের প্রাত্যহিক অস্তিত্বের সঙ্গে অঙ্গাদীভাবে জড়িয়ে গেছে। যদিও প্রাথমিক শর্তে প্রমোদ উপকরণ হিসেবে এর উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছিল, কিন্তু পরবর্তী নানা পর্যায়ে এর অভাবনীয় সুদূর প্রসারী শক্তির লক্ষণ সৃজনশীল মানুষের নজর এড়ায়নি। তাদেরই মহতী সৃষ্টির পরম্পরায় চলচ্চিত্র আজ গোটা বিশ্বে শ্রেষ্ঠ শিল্পের স্বীকৃতি অর্জন করেছে। যদিও বিনোদনের দিকটা অন্তর্হিত হয়নি। কেননা, শিল্পের একটুকুতে চিন্তামনোরঞ্জনের উপাদান থাকেই। তবু, বিনোদনের সমান্তরালেই সিনেমার আধুনিক কারুশক্তি আজ আমাদের মানব সভ্যতার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম উপকরণগুলোকে নিয়ে নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছে।

আরও একটি কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা দরকার যে, চলচ্চিত্র এক মিশ্র শিল্প মাধ্যম। সাহিত্য, চিত্রকলা, ভাস্কর্য ইত্যাদি নানা শাখা থেকে প্রয়োজন মতো উপাদান সংগ্রহ করেও এ মাধ্যম নিজস্ব চরিত্রে এতটাই স্বতন্ত্র যে, অন্য কোনো মাধ্যমের সঙ্গে এর ফারাকটা সহজেই উপলব্ধ হয়। অথচ একটা ভালো চলচ্চিত্র কর্মের নান্দনিক আলোচনায় অন্যান্য মাধ্যমের প্রসঙ্গ উত্থাপন অনিবার্য হয়ে পড়ে স্বাভাবিক ভাবেই। তাই চলচ্চিত্রের শিল্প ব্যাখ্যায় ও আলোচনায় অন্যান্য শিল্পশাখার সঙ্গে আলোচকের অভিনিবেশটা জরুরি হয়ে পড়ে।

আমাদের দেশে কাব্য, উপন্যাস, নাটক, চিত্রকলা, সংগীত ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক চেতনার

যতটুকু বিকাশ ঘটেছে গত একশো বছরে, চলচ্চিত্র নিয়ে তন্মিষ্ট ডাবনা চিন্তার বিকাশ সে অনুপাতে খুবই কম। তার প্রধান কারণ সম্ভবত সর্বভারতীয় শিক্ষা বিস্তারের দুরত্ব। বহুস্তর মানুষের মধ্যে সাধারণ মানের সাংস্কৃতিক চেতনার উন্মেষ ঘটতে না পারলে, চলচ্চিত্রচর্চা ও তার বিস্তার ফলপ্রসূ হয় না। পাশ্চাত্য দেশগুলোর সঙ্গে এখানেই আমাদের মূলগত ফারাক।

আর একটা ক্ষোভের কারণ যে, আমাদের দেশে অন্যান্য শিল্প শাখা সম্পর্কে আলোচনা ও বিশ্লেষণের মান যখন যথেষ্ট উন্নত, সেখানে চলচ্চিত্র নিয়ে আলোচনার দৈন্য আমাদের পীড়া দেয়। এমনকি, এদেশে শিক্ষিত ও রুচিবান গোষ্ঠীর বহু মানুষের মধ্যে এখনো সিনেমা সম্পর্কে একটা উদাসীনতা ও অবজ্ঞাও লক্ষ্যীয়। চলচ্চিত্র নিয়ে যে আলাদাভাবে পঠন-পাঠন, চর্চা ও আলোচনা হ'তে পারে এ ধারণাটাই স্পষ্ট হ'য়ে ওঠেনি। তবু রক্ষে, ভারতীয় চলচ্চিত্রের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও দেশজ দৃষ্টির অসংখ্য সম্মানে উৎসাহী হ'য়ে এ দেশে চলচ্চিত্র নিয়ে পঠন-পাঠন ও হাতে কলমে চলচ্চিত্রবিদ্যা শেখার প্রতি সরকারি মহল থেকে ব্যবস্থা গৃহীত হয়। যার ফলে পুণতে গড়ে ওঠে ভারতের প্রথম চলচ্চিত্র শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ষাট দশকের গোড়ায়। পরবর্তী পর্যায়ে ভারতের অন্যান্য জায়গাতেও গণ মাধ্যমের অঙ্গ হিসেবে চলচ্চিত্র শিক্ষার সংস্থা গড়ে উঠেছে। তবু ভারতবর্ষে, চলচ্চিত্র চর্চার ক্ষেত্রে অন্যতম বিষয়ের তুলনায় খুব একটা আশাপ্রদ নয়। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে চলচ্চিত্র পঠন-পাঠন, বিশেষ করে কারিগরিভাবে চলচ্চিত্র নির্মাণের কয়েকটি বে-সরকারি সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেইসঙ্গে কয়েকবছর হল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক স্তরে চলচ্চিত্রচর্চার ১০০ নম্বর করে তিনটি ঐচ্ছিক পত্র অধ্যয়নের ব্যবস্থা হয়েছে, পাশাপাশি একক বিষয় হিসেবে 'ফিল্ম স্টাডিজ' এই শিরোনামে এম.এ. পাঠ্যক্রমও চালু হয়েছে। এ ছাড়াও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও ফিল্ম নিয়ে পড়াশোনাও সম্প্রতি শুরু হয়েছে যা এক দশক আগেও ছিল না। এটা একটা সুলক্ষণ।

বাংলা ভাষায় চলচ্চিত্রচর্চার রূপরেখা লিপিবদ্ধ করার আগে পূর্বোক্ত ভূমিকাটা প্রাসঙ্গিক ছিল মনে করি। ভাবতে অবাক লাগে যে, রবীন্দ্রনাথের মতো মনস্বী কবিও চলচ্চিত্রের মৌলিক স্বরূপ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেছিলেন। তাঁর কবি দৃষ্টিতেও এই শিল্প মাধ্যমের স্বাতন্ত্র্য ও শিল্প স্বরূপের বিশেষত্ব ধরা দিয়েছিল। অথচ তাঁর সমকালের অন্য কোনো বিদ্বৎ মানুষের মধ্যে তেমন চেতনার স্ফূরণ দেখা যায়নি। ১৯২৯ সালে মুরারি ভাদুড়ীকে লেখা একটি চিঠিতে চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে কবি বলেছিলেন : “উপকরণের বিশেষত্ব অনুসারে কলারূপের বিশেষত্ব ঘটে। রাষ্ট্রতন্ত্র স্বাতন্ত্র্যের সাধনা। কলাতন্ত্রেও তাই। ছায়াচিত্র এখনো পর্যন্ত সাহিত্যের-চাটুবৃত্তি করে চলেছে—তার কারণ কোনো রূপকার আপন প্রতিভার বলে তাকে এই দাসত্ব থেকে উদ্ধার করতে পারেনি। ছায়াচিত্রের প্রধান জিনিসটা হচ্ছে দৃশ্যের গতিপ্রবাহ।” কী অসীম পরাদৃষ্টির বলে রবীন্দ্রনাথ চলচ্চিত্রের সেই নির্বাক পর্বেই এ শিল্পের আত্মার সন্ধান পেয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু অক্ষিপের বিষয়, একেবারে ভিন্ন পথের পথিক রবীন্দ্রনাথের উক্ত মন্তব্য অন্য আরও পাঁচজন বিদ্বৎজনকে সেই পরিমাণে ভাবিত করেনি। করলে বাংলা ভাষায় চলচ্চিত্রচর্চার মান আজ একেবারে স্বতন্ত্র ধারায় বেড়ে উঠতে পারত। কিন্তু আদতে তা হয়নি। বাংলা কাব্য, নাটক, যাত্রা, সংগীত, চিত্রকলার নানা পরিধি নিয়ে বাংলা ভাষার যে বিপুল মননশীল ব্যাপক গবেষণা ও চর্চা এ কাল পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে এসেছে তার গর্বে আমরা নিশ্চিত গর্বিত হ'তে পারি। কিন্তু

বাংলা ভাষায় চলচ্চিত্রচর্চা নিয়ে সেই সম্মানের সিকি ভাগও অর্জিত হয়নি। তার কারণ চলচ্চিত্র মাধ্যমের জন্মলগ্ন থেকে প্রায় ষাট বছর পর্যন্ত এ দেশের আপামর মানুষের কাছে সিনেমা কেবল প্রমোদ হিসেবেই বিচার্য হয়ে এসেছে।

এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, সত্যজিৎ‌দের আবির্ভাবের পূর্বে ভারতীয়, ছবি নিয়ে গভীর মননশীল আলোচনার কোনো প্রেক্ষাপট তৈরি ছিল না। সত্যজিৎ‌দের কালজয়ী সৃষ্টি পথের পাঁচালীর মুক্তি, শিল্পস্বীকৃতি ও সারা বিশ্বে এ ছবির গুণগত মান নিয়ে অসংখ্য আলোচনা গোটা দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটিয়ে দেয়। প্রাক্‌ সত্যজিৎ‌ পর্বের ৯৫ ডাগ সিনেমার গুণগত মান নিম্নস্তরের হওয়ার দরুণ সে সব ছবি নিয়ে আলোচনারও কোনো নির্দিষ্ট মানদণ্ড ছিল না। গোটা ইউরোপ ও মার্কিন মূলুকে, এমনকী লাতিন আমেরিকার প্রকাশনা জগতেও চলচ্চিত্র বিষয়ক যে পরিমাণ গবেষণামূলক ও সৃজনশীল গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে এবং নিয়ত প্রকাশ হয়ে চলেছে তার প্রতি নজর দিলে আমাদের বিস্ময় উদ্বেক করে। অথচ আজ বাংলা প্রকাশনায় ক্ষেত্রে যে ব্যাপক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে আমাদের যৎসামান্য পরিচয় আছে, সেখানে চলচ্চিত্র বিষয়ক বইয়ের সংখ্যা শুধু নগণ্যই নয়, প্রকাশিত গ্রন্থের শিল্পগত মানও খুব উল্লেখযোগ্য নয়, বাংলা ভাষায় আজও চলচ্চিত্রচর্চার বিশিষ্ট কোনো ধারা গড়ে না ওঠার পেছনে অনেকগুলি প্রবণতা কাজ করেছে। ইউরোপ বা অন্যান্য দেশে সাহিত্য ও অন্যান্য শিল্প শাখায় বহু বিদ্বৎ মানুষ স্বস্ব মাধ্যমের পাশাপাশি চলচ্চিত্রের নান্দনিক গভীরতা সম্যকভাবে উপলব্ধি করেছিলেন এবং চলচ্চিত্র মাধ্যমে তাঁদের সক্রিয় সহযোগ ও লেখায় সে দেশের চলচ্চিত্রচর্চা একটা চূড়ান্ত সমৃদ্ধির চেহারা পেয়েছিল। বাংলায় সেটা একেবারে হয়নি। অথচ তিরিশ দশকের শুরু থেকে বাংলার অনেক সাহিত্যিক চলচ্চিত্রে যোগ দিয়েছিলেন কেবল এ মাধ্যমের বাইরের জঁলুসের মোহে। মূলত বণিকবৃত্তির তাগিদেই তাঁরা চলচ্চিত্র মাধ্যমের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সিনেমাকে স্বতন্ত্র শক্তিশালী অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হিসেবে মনে নেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁদের দীক্ষা ছিল না। ফলে সাহিত্যের পাতায় তাঁদের মনন ও অনুভূতির প্রতিফলনে আমরা মুগ্ধ হয়েছিলাম, সিনেমা সংক্রান্ত আলোচনায় নয়, তার একান্ত অনুপস্থিতি বাংলা চলচ্চিত্র আলোচনার কোনো ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে পারেনি। পরিমল গোস্বামী, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, হেমেন্দ্রকুমার রায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, হিমালীশ গোস্বামী, প্রমুখ কথাসিদ্ধিরা পুরোনো আমলে চলচ্চিত্র বিষয়ে বাংলা ভাষায় আলোচনা লিখতেন। কিন্তু মাধ্যমটি সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকায় এবং অপরাপর শিল্প শাখা সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসার অভাবে, তাঁদের রচনাকে কেন্দ্র করে কোনো মূল্যায়ন গড়ে ওঠেনি। বিদেশের বিদ্বৎজন, যঁারা চলচ্চিত্র নিয়ে গভীর মননশীল রচনায় উল্লেখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন, তাঁরা প্রত্যেকেই নিজ ক্ষেত্র ছাড়াও অন্যান্য সমস্ত শিল্প সম্পর্কে গভীর অধ্যয়ন ও চর্চার মেলবন্ধনে তাঁদের সিনেমা বিষয়ক রচনাগুলোকে এক প্রার্থিত রসলোকে উত্তীর্ণ করে দিতে পেয়েছিলেন। গ্রাহাম গ্রীন, সুসান সোন্টাগ, ভার্জিনিয়া উলফ প্রমুখ বরেন্ধ্য কথাসিদ্ধি এবং প্রতীচ্যের বহু চিত্রকর, দার্শনিক, সমাজবিদ প্রমুখের নিবিড় অভিনিবেশ ও আলোচনায় প্রতীচ্যে চলচ্চিত্র সমালোচনার একটা নির্দিষ্ট ধারা গড়ে উঠেছিল। যেমনটা এদেশে ঘটেনি। কারণ প্রমোদের মজা ছাড়া এ মাধ্যমে শিক্ষিত মানুষ ও শিল্পের তেমন কোনো লক্ষণ খুঁজে পাননি। কেবল এটাই নয়, বাংলা ভাষার প্রতিষ্ঠিত বহু কথাকার ও কবি, যঁারা সাম্প্রতিকালে চলচ্চিত্র নিয়ে এখানে ওখানে কিছু আলোচনা লিখেছেন

বা মস্তব্য প্রকাশ করেছেন, তার মধ্যেও পারস্পরিক অভিনিবেশ ও শিল্প ধারণার ফারাক চোখে পড়ে।

কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সত্যজিৎ‌র *সঙ্গতি* ছবির আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন : “সার্থক চলচ্চিত্রে যাঁরা কাহিনীর ভূমিকা নগণ্য বা অবাস্তব মনে করেন, আমি তাঁদের সঙ্গে একমত নই। কাহিনীহীন শিল্প একমাত্র সঙ্গীতই হ’তে পারে। সার্থক কবিতার মধ্যেও প্রচ্ছন্ন কাহিনীর সূত্র থাকে, কাহিনীহীন শিল্প হতে গিয়ে সমকালের চিত্রকলা অনেকাংশে ব্যর্থ হয়েছে। চলচ্চিত্র জগতে যাঁরা মিডিওকার, তাঁরাই শুদ্ধ কাহিনীকে অগ্রাহ্য করে শুদ্ধ আঙ্গিকে নিয়ে বেশী মাতামাতি করেন।”^১ এরই পাশে তাঁরই সমকালের অগ্রগণ্য কবি শঙ্খ ঘোষের চলচ্চিত্র চিন্তায় দেখতে পাই সিনেমার মৌলিক স্বপ্নের ছবি। তাঁর অনুভূতি ও শিল্প চেতনায় চলচ্চিত্রের অনাগত স্বরূপের সম্ভাবন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি বলেন : “যেমন গল্পের কোনো আক্ষরিক অনুবাদ হ’তে পারে না কোনো ছবিতে, তেমনি কবি তার এই কল্পেরও নিশ্চয় প্রয়োজন মতো বদল চাই ছবির কল্পে। ছবিতে আনতে হলে একে ঘুরিয়ে নিতে হবে কোনদিকে তা নিশ্চয় ভাবতে হবে পরিচালককে। কিন্তু আমরা কি আজ দাবি করব না সেই ভাবনা? আমরা কি চাইব না যে বাংলা ছবি আজ কেবল গল্প নির্ভর না থেকে হয়ে উঠুক কল্পনির্ভর? কেন আমাদের এত অসহায় হ’তে হবে যে পথের বাসিন্দাদের নিয়ে রূঢ় ছবি তুলতে গিয়েও মৃণাল সেনকে নিটোল একটি গল্পই বলতে হবে ‘পরশুরাম’-এ? এই প্রশ্নের কথা ভেবে আমাদের দর্শকেরা আজ সনাতন গল্পের অভ্যাস থেকে সরে এসে চোখের দেখায় সাবালক হ’তে চাইবেন হয়তো? কল্পের নির্বাহে, ছবির পর ছবির মস্তাজে, এই সময়ের একটা ঘূর্ণি চেহারা আলোড়িত হয়ে উঠুক কোনো এক ফিল্মে এই আগ্রহ নিয়ে কোথাও হয়তো অপেক্ষা করে আছেন তারা আজও।”^২ আসলে চলচ্চিত্র মাধ্যমগত বোধের ফারাকে দু’জনের চলচ্চিত্র চিন্তায় কতো বৈপরীত্য এর থেকে স্পষ্ট হ’য়ে ওঠে।

বাংলা কাব্য, নাটক, যাত্রা, চিত্রশিল্প, সংগীত নিয়ে আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় আলোচনা যে আঙ্গিকে সমৃদ্ধ হয়েছে, সার্থক দীক্ষাহীনতায় বাংলা ভাষার চলচ্চিত্রচর্চার দৈন্য তারপাশে অনেকটাই পীড়াদায়ক ঠেকে। চলচ্চিত্র সমালোচনাও যে সাহিত্যের আলোচনার সমান গুরুত্ব স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে পরিগণিত হতে পারে, এ ব্যাপারে প্রথম যুগের আলোচকদের কোনো ধ্যান ধারণা ছিল না, আকিঞ্চনও ছিল না। ফলত প্রথম যুগের চলচ্চিত্র আলোচনা অত্যন্ত দায়সারা বিজ্ঞাপন ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। প্রকৃষ্ট চলচ্চিত্র আলোচনার ক্ষেত্রে সমালোচকের জ্ঞান, রচনার চর্চা পাশাপাশি সিনেমার ভাষা ও ব্যাকরণ তথা অন্যান্য শিল্পের শর্ত সম্পর্কে গভীর মমত্ব ও পরিশীলন একান্ত জরুরি। বিদেশি পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত চিত্র-সমালোচনা তথা আঙ্গিক বিষয়ক নানা প্রবন্ধাবলিতে আমরা বারবার সেই গভীর মননের মুখোমুখি হয়েছি।

চলচ্চিত্র মাধ্যমের বয়স যখন মাত্র কুড়ি বছর, তখনই চলচ্চিত্রের অন্যতম আদিভূমি আমেরিকায়, ১৯১৫ সালে ডেভেল লিন্ডসে রচিত চলচ্চিত্র নন্দনের প্রথম গ্রন্থ *দ্য আর্ট অফ দ্য মুভিং পিকচার* প্রকাশিত হয়। সিনেমা বিষয়ক এই বুদ্ধিদীপ্ত বই-ই বিশ্বের প্রথম চলচ্চিত্র গ্রন্থ। এর পরের বছর প্রকাশিত হয় হিউ মানস্টারবার্গের *দ্য ফোটো প্লে : এ সাইকোলজিক্যাল স্টাডি*। ১৯১৭ সালে ফ্রান্সের লুই দেলুক *ফিল্ম* নামে পত্রিকা প্রকাশ করেন। এটিকে বিশ্বের প্রথম সিনেমা পত্রিকা বলা যেতে পারে। এবং সে অর্থে তিনিই চলচ্চিত্র সমালোচনার পথিকৃৎ

ছিলেন। অন্যদিকে বিশ দশকে প্রকাশিত হাঙ্গেরীয় চলচ্চিত্রবিদ্ বেলা বালাজের চলচ্চিত্র সংগ্রহস্থ দটি গ্রন্থ ও উল্লেখ্যযোগ্য যা সিনেমা অনুসন্ধিৎসু মানুষের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

বাংলা ভাষায় আদি গ্রন্থের রচয়িতা হলেন বীরেন দাশ। তাঁর লেখা ১৯৩০ সালে প্রকাশিত বইটাই প্রথম নিদর্শন বলা যেতে পারে। কিন্তু এই ক্ষুদ্র গ্রন্থটিতে বাংলা ভাষায় চলচ্চিত্র আলোচনার কোনো সুষ্ঠু নিদর্শন চোখে পড়ে না। চলচ্চিত্র সম্পর্কে অতি সরলীকৃত কিছু তথ্য ছাড়া এই বইটির গুণগত মান তেমন উল্লেখ্য নয়। কিন্তু গ্রন্থটির চারবছর পরে ১৯৩৪-এ প্রকাশিত কবি নরেন্দ্র দেব রচিত *সিনেমা: ছায়ার মায়ার বিচিত্ররহস্য* গ্রন্থটিতে আমরা প্রথম বাংলা ভাষায় চলচ্চিত্রচর্চার একটা পরিণত ও শিল্পিত চরিত্র দেখলাম। মূলত কবি হলেও নরেন্দ্র দেব এই গ্রন্থে সিনেমার প্রায় সমস্ত প্রয়োগ প্রকরণ ও মৌলিক শিল্প চরিত্রের সন্ধান দিয়েছেন নির্ভার সঙ্গে। চলচ্চিত্র মাধ্যমটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচিতির সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। এই গ্রন্থের আরও একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এই বইতে রাজশেখর বসুর সহযোগিতায় প্রদত্ত চলচ্চিত্র সংগ্রহস্থ নানা শব্দের পরিভাষাগত বর্ণনা, ও তালিকা তৎকালীন যুগের পক্ষে তো বটেই, এমনকি আজও সেগুলোতে চোখ রাখলে চলচ্চিত্র প্রেমীদের কৃতজ্ঞ বোধ করা উচিত। যে সময়ে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল সে সময়ে বিদেশেও সিনেমা সংগ্রহস্থ বইয়ের সংখ্যা অনেক ছিল এমনটি বলা যাবে না। তবু, ততোদিনে বেশকিছু উল্লেখ্যযোগ্য মননধর্মী বিদেশি গ্রন্থ রচিত হয়ে গিয়েছিল। যেমন পলরোথারের *ফিল্ম টিল নাউ*, পুদভকিনের *ফিল্ম এ্যাকটিং এ্যান্ড টেকনিক*, জার্মান সমালোচক রুডলফ আর্নহাইমের *ফিল্ম ইত্যাদি* গোটা বিশ্বে তখন সমাদৃত হয়েছে। এইসব গ্রন্থ পাঠের অভিজ্ঞতা যে নরেন্দ্র দেবের চলচ্চিত্রচর্চায় ছায়া ফেলেছিল তা তাঁর বাংলা বইটির মধ্যে দুনিরীক্ষণ নয়। সবাক্যুগের একেবারে গোড়ায় নরেন্দ্র দেব বাঙালির চেতনার সামনে সেদিন উন্মুক্ত করেছিলেন চলচ্চিত্র মাধ্যমের সুদূরপ্রসারী শিল্প ক্ষমতার ইশারা।

চলচ্চিত্র অনুরাগী ও অনুসন্ধিৎসুদের মধ্যে কেউ কেউ নরেন্দ্র দেবের গ্রন্থপাঠ হয়তো অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। যার পরিচয় পাওয়া যায় নরেন্দ্র দেবের অনুসরণে প্রকাশিত *ছায়াছবির মর্মকথায়* (১৩৪১ বঙ্গাব্দে)। লেখক ছিলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ৯৬ পৃষ্ঠার এই নাতি দীর্ঘ বইতে তেরোটি অধ্যায়ে সিনেমার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা বিধৃত আছে। এখানে উল্লেখ্য যে লেখক ছিলেন তদানীন্তন সময়ের একমাত্র সচিত্র মাসিক পত্রিকা *চিত্রপঞ্জীর* সম্পাদক। প্রাসঙ্গিকভাবে এও উল্লেখ্য যে এই গ্রন্থটি ছাড়াও আরো দুটি বই ১৯৩০ ও ১৯৩৩ এ প্রকাশিত হয়েছিল। যেমন *ছায়ালোকের নরনারী* লেখক বিজয়ভূষণ দাশগুপ্ত এবং সুধীর বসুর লেখা *বাংলায় নটনটী*। সেদিক থেকে নরেন্দ্র দেবের বইটি চলচ্চিত্র বিষয়ক চতুর্থ বাংলা গ্রন্থ। কিন্তু আমরা নরেন্দ্র দেবের গ্রন্থটিকেই বাংলা ভাষায় চলচ্চিত্রচর্চার গুরুত্বপূর্ণ, নন্দনদৃষ্টিসম্মত প্রথম উল্লেখ্যযোগ্য কাজ হিসেবে মান্যতা দেব। কেননা তাঁর আগে প্রকাশিত বইগুলির মধ্যে সিনেমার ভাষা আঙ্গিক তথা মৌলিক শিল্প চরিত্র নিয়ে কোনো গভীর আলোচনার ইঙ্গিত ছিল না।

কেবল গ্রন্থ প্রকাশই নয়, তিরিশ দশক এবং চল্লিশ দশক জুড়ে বাংলা সংবাদপত্র এবং সিনেমা বিষয়ক বেশ কিছু পত্র-পত্রিকায় চলচ্চিত্র বিষয়ক সমালোচনা, প্রবন্ধ প্রকাশ পেতে শুরু করে। বলা যেতে পারে যে, তখন সাহিত্য সমালোচনার প্যাটার্নে এক ধরনের চলচ্চিত্র সমালোচনার ইঙ্গিত সূচিত হয়। যদিও গুণমানে সে সব আলোচনা প্রার্থিত মননস্বল্প নন্দনতাত্ত্বিক চর্চার ফল হিসেবে বিচার্য নয়। তবু সেদিন একটা নতুন বাতাবরণ তৈরি হচ্ছিল। তদানীন্তন সিনেমা

আলোচনার গতি প্রকৃতি লক্ষ্য করে তৎকালীন সমালোচক খগেন্দ্রনাথ রায় লিখেছিলেন : “বাংলা দেশে সাধারণের অবগতির অন্তরালে যে ধীরে ধীরে এক সিনেমা সাহিত্য গড়ে উঠেছে, এ সম্বন্ধে বাদানুবাদের প্রয়োজন নেই। দিনের পর দিন একটির পর একটি করে চলচ্চিত্র সম্বন্ধীয় সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকার আবির্ভাব হচ্ছে। বাঙালি দর্শক সিনেমা দেখার সঙ্গে সঙ্গে সিনেমা সাহিত্য পাঠের লিঙ্গাও কিছু পরিমাণ বোধ করতে আরম্ভ করেছে, তার মধ্যে অকাটা প্রমাণ এই পত্রিকাগুলির স্থায়িত্ব ও উত্তরোত্তর আত্মপ্রতিষ্ঠা।”^{১০}

তিরিশ দশকের পরবর্তী পর্যায়ে, দেশব্যাপী টালমাটালে চলচ্চিত্র সম্পর্কিত আলোচনা ও শিল্পচর্চা একাধিক কারণে স্তিমিত হয়ে পড়ে। ১৯৩৯-এর দ্বিতীয় মহাসমর, ৪৩-এর মধ্যসমর এবং ৪৬-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পে তেমন কোনো পরিবর্তন সূচিত করেনি। তদানীন্তন ব্যবসায়িক পত্র-পত্রিকাগুলো সিনেমা আলোচনায় একটা নিজস্ব ছকে কেবল মনোরঞ্জন পথ বেছে নিয়েছিল। যেখানে আলাদা এক মহৎ শিল্পমাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্রের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়নি। দু’একটি ব্যতিক্রম অবশ্যই ছিল। যেমন তদানীন্তন সময়ে নানা কার্গজে প্রকাশিত বিনয় চৌধুরীর সিনেমা বিষয়ক প্রবন্ধগুলি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য। কিন্তু আদতে তিরিশ ও চল্লিশ দশক জুড়ে বাংলায় চলচ্চিত্র আলোচনার মান আমাদের কাছে খুব একটা গর্বের বিষয় ছিল না। তার কারণ সে সময়ে নির্মিত ৯৫ ভাগ ছবির শিল্পগত চরিত্রই খুব নিম্নমানের ছিল। তাই দীক্ষিত চলচ্চিত্র সমালোচককে লিখতে হয় : “প্রাক-সত্যজিৎ পর্বের বাংলা ছবির যে চরিত্র, তার অনুসঙ্গে সে যুগের ছবির আলোচনাও তথৈবচ।”^{১১}

ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন : চলচ্চিত্র চর্চার নতুন অভিমুখ

কলকাতায় ১৯৪৭ সালে সত্যজিৎ রায়, চিদানন্দ দাশগুপ্ত প্রমুখের উদ্যোগে ‘ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি’র পত্তন হয়। এটাই সার্থক অর্থে ভারতের প্রথম ফিল্ম সোসাইটি। চলচ্চিত্রচর্চাকে একটা সুনির্দিষ্ট রূপ দান করার প্রয়াসে, সেই সঙ্গে এই মাধ্যমের নন্দনতাত্ত্বিক আলোচনায় সর্বস্তরের মানুষকে আগ্রহী করে তোলার নিষ্ঠার এই সোসাইটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। এই সোসাইটির ধারাবাহিক ক্রিয়াকলাপের ভেতর দিয়েই পরবর্তী সময়ে বাংলা ভাষায়, চলচ্চিত্রচর্চার একটা নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। ১৯৫০-এ কমলকুমার মজুমদার, চিদানন্দ দাশগুপ্ত, নরেশ গুহ, রাধাপ্রসাদ গুপ্ত, সত্যজিৎ রায় ও সুভাষ সেনের সম্পাদনায় সিগনেট প্রেস থেকে প্রকাশ পেল *চলচ্চিত্র : প্রথম পর্যায়*। এই সংকলন বাংলায় চলচ্চিত্রচর্চার একটা নতুন অভিমুখ সূচনা করল। এতে প্রকাশিত কমলকুমার মজুমদার, সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক প্রমুখের চমকপ্রদ প্রবন্ধ ও আলোচনা বাংলায় চলচ্চিত্রচর্চার প্রতি আমাদের নতুন করে ভারতে শিখিয়েছিল। এই সংকলনের সূচনায় জানানো হয়েছিল : “শিল্পী, গুণী, দর্শক, চলচ্চিত্র ব্যবসায়ী সকলকেই সামাজিক ও শৈল্পিক শক্তি হিসেবে চলচ্চিত্রের গুরুত্ব আর সম্ভাবনার প্রতি অবহিত করে দেশীয় চলচ্চিত্র শিল্পে উন্নতির পথ সুগম করাই আমাদের অভিপ্রায়।”^{১২} আক্ষেপের কারণ যে পরবর্তী সময়ে এই সংকলনের আর দ্বিতীয় পর্যায় বেরোয়নি। ১৯৪৭ সালে কালীশ মুখোপাধ্যায়ের লেখা *বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাস* প্রকাশিত হয়। এটাই বাংলা সিনেমার তৎকাল পর্যন্ত প্রথম ধারাবাহিক ইতিহাস। তথ্যের দিক থেকে মূল্যবান নিঃসন্দেহ। এখনো পর্যন্ত বাংলা সিনেমার ইতিহাস সম্পর্কে কোনো প্রামাণিক গ্রন্থ রচিত হয়নি। সেদিক থেকে এটি গুরুত্বপূর্ণ অবশ্যই।

কিন্তু এ বইতে পরিবেশিত আলোচনার মান উন্নত নয় এবং তাতে শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গির তেমন কোনো পরিচয় নেই। প্রথম প্রকাশের প্রায় পঁচিশ বছর পরে ১৯৭২ সালে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই নতুন সংস্করণে ভারতের অন্যতম আদি চলচ্চিত্রকার হীরালাল সেনের ওপর একটি নতুন আলোচনা সংযুক্ত হয়েছে। বাংলা সিনেমার ইতিহাস নিয়ে আর একটি গ্রন্থ প্রকাশ পায় ১৯৭৭ সালে *বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাস*, লেখক প্রণবকুমার বিশ্বাস। ৪৮০ পৃষ্ঠার এই বিপুল আকৃতির গ্রন্থেও চলচ্চিত্রের ইতিহাস বলতে যা বোঝায় তার গভীর পরিচয় নেই। অনেকটা সাদামাটা বিবৃতিমূলক গ্রন্থ। এতে অসংখ্য ছবির সারসংক্ষেপ, ছবির মুক্তির তারিখ, ভূমিকা লিপি, চরিত্র লিপি ইত্যাদি প্রদত্ত হয়েছে। বাংলা সিনেমার ইতিহাস লেখার প্রয়াসে আর একটি গ্রন্থ *সোনার দাগ* আমরা পেয়েছি ১৯৮২ সালে। ৪৮০ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থ ও সিনেমার ইতিহাসের কোনো গভীর আলোচনায় মগ্নিত হয়ে ওঠেনি। বরং নিশীথকুমার মুখোপাধ্যায় রচিত *বাংলা সাহিত্য ও বাংলা চলচ্চিত্র* গ্রন্থে নির্বাক ও সবাক যুগ মিলিয়ে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বাংলা চলচ্চিত্র ও সাহিত্য সম্পর্কিত প্রবহমানতার একটি নিবিড় পরিচয় দেবার চেষ্টা লক্ষিত হয়। আলোচনার মান দারুণ মননস্বল্প না হলেও, এই গ্রন্থে পরিবেশিত প্রভূত তথ্য ও অজানা সংবাদ সিনেমার আগ্রহী পাঠক ও গবেষকদের কৌতূহলী করবে।

ষাট দশকের শেষে প্রভাতকুমার দত্ত রচিত *চলচ্চিত্র স্মরণীয় স্রষ্টা* বইটি বেরোয়। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রকারদের বারোজনকে নিয়ে এই বাংলা গ্রন্থে পাঠকেরা প্রথম একত্রে বিশ্ববরেণ্য এতজন পরিচালকের শিক্ষা নির্মাণের ইতিহাসটা জানতে পারেন। বর্তমান নিবন্ধের গোড়ায় উল্লেখ করেছিলাম যে, কলকাতায় ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের ফলশ্রুতি হিসেবে বাংলা ভাষায় চলচ্চিত্রচর্চা একটা গতি অর্জন করেছিল। এই গ্রন্থটিও নিঃসন্দেহে তার ফসল। ভূমিকায় লেখক জানিয়েছেন : “বাংলাদেশে আজ ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন খুবই প্রসার লাভ করেছে। ফিল্ম সম্পর্কে এক নতুন রুচি গড়ে তোলাই এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য। বর্তমান গ্রন্থখানি আলোচ্য আন্দোলন-উদ্ভূত আবহাওয়ার জন্যই প্রকাশ করা সম্ভব হ’ল।”^{১০} এই চরিত্রেরই আরও পরিণত ও পরিশ্রমসাধ্য উল্লেখযোগ্য দুটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয় *চলচ্চিত্রের স্রষ্টারা* ১ম খণ্ড (১৯৭৭) এবং ২য় খণ্ড (১৯৮১) সালে। বিপুলায়তন এই দুটি খণ্ডে লেখকের গভীর প্রযত্ন, মাধ্যমের প্রতি মমত্ব ও ব্যাপক পরিশ্রমের পরিচয় সুস্পষ্ট। সিনেমাপ্রেমী, অনুসন্ধিৎসু ও গবেষণায় উৎসাহী যে কোনো সুধীজনের কাছেই এই দুটি খণ্ড অত্যন্ত মূল্যবান হবে।

অসীম সোম সম্পাদিত *চলচ্চিত্র কথা* (১৯৬৯) গ্রন্থটিও বাংলায় চলচ্চিত্রচর্চার একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। চলচ্চিত্র সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ও অতি রসিকজনের বিভিন্ন স্বাদের অতি মূল্যবান রচনায় সমৃদ্ধ এই সংকলনটি চলচ্চিত্রে আগ্রহী মানুষদের কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হবার যোগ্য।

বাংলায় আরও কতকগুলি মৌলিক বই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যেগুলির উল্লেখ প্রয়োজন। জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা *চলচ্চিত্রের আবির্ভাব* প্রকাশ পায় ১৯৮৪ সালে। চলচ্চিত্র মাধ্যমের জন্মলগ্ন থেকে এই শিল্পের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস বিবৃত হয়েছে এই গ্রন্থে। বইয়ের শেষে যুক্ত হয়েছে এ শিল্পের কালানুক্রমিক ইতিহাস, যা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের পাশাপাশি আমাদের দেশের সিনেমার কথাও তুলে ধরে। এটি একটি গভীর পরিশ্রমসাধ্য কাজ। গ্রন্থটি শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র গ্রন্থ হিসেবে জাতীয় পুরস্কার অর্জন করে। সুরঞ্জন রায় রচিত *চলচ্চিত্র ও*

শিল্পীর সংকট একটি প্রশংসনীয় কাজ। চারজন বিদেশি পরিচালকের পাশাপাশি সত্যজিৎ ও মুণাল সেনকে নিয়ে মোট ছয়টি পরিচ্ছেদ, তৎসহ চলচ্চিত্র ও শিল্পীর সংকট শীর্ষক একটি আলোচনা পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত আলোচনা লেখকের স্বকীয় মনন ও এই মাধ্যমের প্রতি ভালোবাসার নিবিড় পরিচয় আছে। এটিও জাতীয় পুরস্কারে সম্মানিত। পুণা ফিল্ম ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রীধীরেশ ঘোষের লেখা *চলচ্চিত্র নির্মাণ ও পরিচালনা* (১৯৭৮) সিনেমার কারিগরি দিক নিয়ে লেখা গ্রন্থগুলির মধ্যে অন্যতম। এই লেখকের আর একটি প্রয়োজনীয় বই *চলচ্চিত্র সম্পাদনার কৌশল* প্রকাশিত হয় ১৯৮৭ সালে। চলচ্চিত্র সম্পাদনার প্রকরণগত ও নন্দনতাত্ত্বিক আলোচনা বিধৃত আছে এই গ্রন্থে। অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা *চলচ্চিত্র সমাজ ও সত্যজিৎ রায়* ১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯৮০ ও ১৯৯৫ সালে। সত্যজিৎ রায়ের শিল্পকর্ম ও শিল্প এষণা নিয়ে বাংলায় প্রথম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। প্রথম খণ্ডটি বাংলায় রচিত প্রথম গ্রন্থ রাষ্ট্রপতি পুরস্কার ‘রজত কমল’ অর্জন করে। অরুণকুমার রায় রচিত *রবীন্দ্রনাথ ও চলচ্চিত্র* (১৯৮৬) একটি মূল্যবান প্রচেষ্টা। এর আগে বাংলার কোনো কথাসিদ্ধী ও তার চলচ্চিত্রায়ণ নিয়ে এই ধরনের গবেষণাধর্মী বই লেখা হয়নি। চলচ্চিত্র ও রবীন্দ্র সাহিত্যের আন্তঃসম্পর্ক নিয়ে নন্দন তাত্ত্বিক এই গ্রন্থটি ১৯৮৭ সালে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার অর্জন করে।

পঞ্চাশ দশক থেকে আজ পর্যন্ত এই দীর্ঘ পাঁচ দশকের বেশি দেশি ও বিদেশি চলচ্চিত্রকারদের জীবন ও শিল্পকর্ম নিয়ে বেশ কিছু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে কিছু সংকলন গ্রন্থ, বাকিগুলো মৌলিক বিশ্লেষণ ধর্মী রচনা। প্রলয় শূরের লেখা *বার্গম্যান* (১৯৮৪) —বার্গম্যানকে নিয়ে রচিত আটটি পরিচ্ছেদের এক ভিন্নধর্মী বই। চ্যাপলিনের জীবনী ও শিল্পকর্ম নিয়ে দীর্ঘ গ্রন্থ অশোক সেন রচিত *চার্লি চ্যাপলিন* সম্ভবত চ্যাপলিনের জীবনীকেন্দ্রিক একমাত্র উল্লেখযোগ্য রচনা। যদিও গ্রন্থটির মূল আশ্রয় চ্যাপলিনের *My Autobiography*। তবু লেখকের স্বকীয়তায় গ্রন্থটি স্বতন্ত্র মর্যাদা পাবার যোগ্য। এর পাশে অর্ণব রায়ের এই যে আমি (১ম ও ২য় খণ্ড) চ্যাপলিনের আত্মজীবনীর বাংলা অনুদিত গ্রন্থে আমরা চ্যাপলিনের নিজস্ব রচনার প্রসাদগুণের উপভোগ থেকে বঞ্চিত হই। চ্যাপলিনের আত্মকথনের স্টাইলে যে সাহিত্যগুণ, শিক্ষিত মেজাজ ও কারুণ্যমন্ডিত রস আমাদের ইংরেজি গ্রন্থটি পাঠে বারবার আকর্ষণ করে, তার বাংলায়, ভাষান্তরিত এই গ্রন্থে তার কোনো পরিচয় ফুটে ওঠেনি। বরং মুণাল সেনের লেখা *চার্লি চ্যাপলিন* গ্রন্থটির অতি মনোজ্ঞ আলোচনা আমাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ৮৮ পৃষ্ঠার এই নাতিদীর্ঘ বইতে পরিচালক মুণাল সেন তাঁর সুন্দর, স্বচ্ছ লেখনী ভঙ্গির মাধ্যমে চ্যাপলিনের জীবন ও শিল্পকর্মের প্রেক্ষাপটকে চলচ্চিত্রপ্রেমীদের চোখের সামনে মেলে ধরেছেন অনুপম ভাবে। চলচ্চিত্রের একাধিক প্রকরণ ও শিল্পগত দিক নিয়ে কয়েকটি মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেছেন সমালোচক ও প্রাবন্ধিক ধীমান দাশগুপ্ত। তাঁর *চিক্রনাট্য রচনা ও বিশ্লেষণ*, *চলচ্চিত্রে রং* ইত্যাদি গ্রন্থে স্বকীয় ভাবনা চিন্তার মননশীল পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে। ভারতবর্ষে ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ ও বিদগ্ধ সমালোচক চিদানন্দ দাশগুপ্তের লেখা বই *নয় ছবি* (১৯৯১) বাংলা ভাষায় চলচ্চিত্র চর্চার একটি অপরিহার্য গ্রন্থ। বিভিন্ন সময়ে রচিত লেখকের আঠারোটি নিবন্ধ পরিমার্জনা ও পরিবর্তন করে নতুন লেখার সমন্বয়ে এই গ্রন্থে একসূত্রে গ্রথিত চলচ্চিত্র শিল্পের একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

সংগীতবিদ সমালোচক ও বিদগ্ধ অধ্যাপক সুধীর চক্রবর্তী *বাংলা ফিল্মের গান ও সত্যজিৎ*

রায় (১৯৯৪) গ্রন্থটি বিষয়গতভাবে ততোটা উল্লেখযোগ্য কাজ নয়। সুধীরবাবুর অন্যান্য প্রকাশিত গ্রন্থে আমরা লেখকের যে গভীর মনন ও গবেষণাধর্মী অভিনিবেশ লক্ষ্য করি, এ বইয়ে তার অনুপস্থিতি আমাদের কিছুটা হতাশ করে।

বাংলা সিনেমার তিন প্রধান পুরোহিত সত্যজিৎ, ঋত্বিক ও মৃণাল সেন বাংলা ভাষায় খুব বেশি গ্রন্থ লেখেননি। অথচ তাঁদের রচিত মুষ্টিমেয় গ্রন্থই বাংলায় চলচ্চিত্রচর্চার ব্যতিক্রমী নিদর্শন গড়ে দেয়। স্বকীয়তার ভিন্ন মনন, শিল্পদীক্ষা, অভিজ্ঞতা, দৃষ্টিভঙ্গির তারতম্য সত্ত্বেও চলচ্চিত্র মাধ্যমের গভীরতম সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিকগুলো এঁদের প্রত্যেকের রচনায় ঈর্ষণীয় উজ্জ্বলতার প্রকাশ পেয়েছে যা সিনেমাপ্রেমী ও চলচ্চিত্রচর্চায় অনুরাগী মানুষের কাছে পরম সম্পদ বলে বিবেচিত হবার যোগ্য।

সত্যজিৎ‌র সিনেমার শিল্প বিষয়ক একমাত্র বাংলা বই *বিষয় চলচ্চিত্র* (১৯৭৬)। গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ পায় ১৯৮২ সালে। প্রথম সংস্করণে ছিল তেরোটি নিবন্ধ। পরে আরো পাঁচটি রচনাসমেত দ্বিতীয় সংস্করণে স্থান পায় মোট আঠারোটি নিবন্ধ। অধিকাংশ রচনাই আগে দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের আকারে সংকলিত হবার আগে সেগুলোকে তিনি সময়ে সময়ে বিষয় ও রীতির অনুযায়ী বিন্যস্ত করেছিলেন। যাঁরা পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত লেখাগুলি পড়ার সুযোগ পাননি, তাঁরা টেরও পাবেন না যে লেখাগুলি নানা সময়ের বিক্ষিপ্ত রচনা। এতটাই তাঁর পরিমিতি বোধ ও গ্রন্থনা করার সহজাত ক্ষমতা যে গ্রন্থটি পড়লে মনে হয় যে প্রথমাধিই যেন তিনি এই গ্রন্থের পরিকল্পনা করে পরপর নিবন্ধগুলি লিখেছেন। লেখাগুলির সবচেয়ে বড়ো গুণ স্বকীয়তা। এক আশ্চর্য মৌলিকতায় লেখা এ বইয়ের রচনাগুলো চলচ্চিত্র পাঠের আকর গ্রন্থ হিসেবে বিবেচ্য হবার যোগ্য। বাংলায় চলচ্চিত্রের মৌলিক শিল্পগুণ নিয়ে এমন অনবদ্য গ্রন্থ আর লেখা হয়নি। তাঁর সিনেমাতেও যেমন, তাঁর চলচ্চিত্র বিষয়ক বাংলা রচনাতেও তেমনি, কোনো দুর্বোধ্য ধোঁয়াটে শব্দ বা দ্ব্যর্থক শব্দে তিনি পাঠককে বিভ্রান্ত করেন না। বিষয়টা তাঁর কাছে এতই পরিষ্কার যে তার ব্যাখ্যায় তাঁর রচনারীতি অতি প্রাঞ্জল এক স্বচ্ছতায় আপন স্বভাবেই এগিয়ে যায়। তাঁর গদ্য সুললিত, প্রসাদগুণে রমণীয়। কিন্তু কাব্যিক অলংকার-বর্জিত এক অদ্ভুত ঋজুতায় তিনি বিষয়ের প্রেক্ষণ বিন্দুকে পরতে পরতে মেলে ধরেন গভীর মনীষায়। তাঁর ইংরেজি রচনায় যেমন, তেমনি তাঁর বাংলা রচনাতেও ঈর্ষণীয় বিশ্লেষণ রীতি সমালোচনার ধারায় বিরলদৃষ্ট। পরিমিতি বোধ, পরিচ্ছন্নতা, অতি সূক্ষ্ম মনন—যা তাঁর চলচ্চিত্রকর্মের অনন্য সম্পদ সেই সমপারদর্শিতায় তিনি তাঁর বাংলা চলচ্চিত্র রচনাকে নজিরহীন করে গেছেন।

অন্যপ্রাণ্ডে ঋত্বিকের চলচ্চিত্র বিষয়ক বাংলা লেখাগুলি একবারে বিপরীতধর্মী এক শিল্পী সত্তাকে আমাদের সামনে মেলে ধরে। ঋত্বিকের মধ্যে একই সঙ্গে অনেকগুলি সৃজনীসত্তা মিশে মিশে একাকার হ'য়ে গিয়েছিল। তিনি একদিকে কবি, কথাসিল্পী, নাট্যকার, অভিনেতা, অন্যদিকে প্রথম শ্রেণির চলচ্চিত্র স্রষ্টা ও বিদগ্ধ প্রাবন্ধিক। তাঁর *চলচ্চিত্র মানুষ এবং আরো কিছু* (১ম খণ্ড) প্রকাশ পায় ১৯৭৫-এ। ১৯৬৬ থেকে ১৯৭২ পর্যন্ত কালসীমায় বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় লেখা ১৫টি প্রবন্ধ নিয়ে এই গ্রন্থটি সজ্জিত হয়। এই গ্রন্থের সমালোচনায় ঋত্বিকের ঘনিষ্ঠ পারিবারিক আত্মীয় মহাশ্বেতা দেবী লিখেছিলেন : “তাঁর প্রত্যেকটি লেখায় দেখা যাবে আশ্চর্য শৃঙ্খলা ও ধারাবাহিকতায় কয়েকটি অত্যন্ত মৌল চিন্তাকেই তিনি সম্প্রসারণ করে গেছেন এবং নিরন্তর

develop করেছেন।”^{১৯} কথাগুলি ভীষণভাবে সত্য। বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ শৈলীর মধ্যে আমরা যে স্বজ্ঞতা মননশীলতা এবং যুক্তির স্পষ্টতা লক্ষ্য করি, ঋত্বিকের সিনেমা বিষয়ক লেখায় সেই গুণাবলি চোখে পড়ে। তাঁর সব প্রতিপাদ্যের সঙ্গে পাঠক একমত হবেন এমন কথা নেই। কিন্তু এক বিবেকবান, সৎ, নিজের সৃষ্টির ক্ষেত্রে আপোষহীন এক দুর্মর চরিত্রের স্রষ্টার লেখনী শৈলীকে খারিজ করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

মৃণাল সেনের চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রথম গ্রন্থ *চার্লি চ্যাপলিন* একটি অনবদ্য রচনা। চ্যাপলিনের জীবন ও শিল্প নিয়ে প্রকাশিত অন্যান্য সব গ্রন্থের মধ্যে সবচেয়ে রমণীয়। লেখকের দ্বিতীয় গ্রন্থ *আমি ও চলচ্চিত্র* প্রকাশিত হয় ১৯৭২-এ। নাতিদীর্ঘ এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে চারটি প্রবন্ধ ও একটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকার। সহজ ভঙ্গিতে লেখা এই বইয়ে লেখকের সিনেমা কেন্দ্রিক স্বকীয় বোধ, প্রেম, চলচ্চিত্র মাধ্যমগত আনুষ্ঠানিক বিষয়াবলি আলোচিত হয়েছে। এর পাঁচ বছর পরে প্রকাশ পায় লেখকের তৃতীয় গ্রন্থ *চলচ্চিত্র ভূত-বর্তমান ও ভবিষ্যৎ*। মৃণাল সেনের বাংলা গদ্যের ভঙ্গিতে একটা অদ্ভুত সহজতা আছে যার ফলে সিনেমার অনেক জটিল বিষয়কেও তিনি প্রাঞ্জলভাবে পাঠকের চিন্তা চেতনায় পৌঁছে দিতে পারেন।

আশির দশক থেকে বাংলা চলচ্চিত্র গ্রন্থ ও নানা পত্র পত্রিকা প্রকাশের একটা নব উদ্দীপনা চোখে পড়ে। একাধিক প্রকাশক নানা ধরনের সিনেমা গ্রন্থ প্রকাশে উদ্যোগী হন। ‘বাণী শিল্প’ এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। বেশ কিছু সংকলন গ্রন্থ ও মৌলিক বই প্রকাশ করে এই প্রকাশন বাংলা ভাষার চলচ্চিত্রচর্চাকে উৎসাহিত করেছে নিঃসন্দেহে। ধীমান দাশগুপ্তের সম্পাদনায় এই প্রকাশনায় উদ্যোগে বেরোয় *চলচ্চিত্র অভিধান*। কয়েক বছরের মধ্যেই এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণও প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণও বেরিয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে কোনো বিষয়ের অভিধান বলতে প্রকৃত অর্থে যে কৌতূহলটা আমাদের উৎসাহিত করে তোলে, এ গ্রন্থের সামগ্রিক পরিকল্পনায় সেই উদ্যোগ তেমন চোখে পড়ে না। বিদেশে প্রকাশিত বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্র অভিধান আমাদের দেখার সুযোগ ঘটেছে। সেসব গ্রন্থে যে বিপুল পরিশ্রম, সামগ্রিক পরিকল্পনায় যে ধারাবাহিক নৈপুণ্য চোখে পড়ে, এই বাংলা অভিধানে তার অনেক কিছু অপ্রাপ্য থেকে গেছে। ফলে তাৎক্ষণিক রেফারেন্স হিসেবে খানিকটা কাজে লাগলেও, চলচ্চিত্রে সিরিয়াস পাঠক বা প্রকৃত গবেষণাকর্মীর তন্নিষ্ঠ চাহিদা পূরণ করে না। তবে সিনেমা সম্পর্কে প্রথম বাংলা অভিধান হিসেবে এর একটা প্রাথমিক ভূমিকা অবশ্যই রয়েছে। এই প্রকাশনা সম্প্রতি স্বতন্ত্র ভাবে বাংলা ছবির চিত্রনাট্য গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছেন। এটি খুব আনন্দের কথা। বিদেশে ইংরেজিতে অসংখ্য বিখ্যাত ছবির চিত্রনাট্য বই আকারে প্রকাশিত হয়ে পাঠক সমাজে দারুণ সমাদর পেয়েছে। মৌলিক নাটক যেমন স্বতন্ত্রভাবে সাহিত্য পাঠের উপাদান হ’য়ে ওঠে, তেমনি এই বাংলা চিত্রনাট্যেরও পাঠ্য হিসেবে একটা আলাদা মূল্য আছে। চলচ্চিত্রপ্রেমীদের এগুলি চলচ্চিত্রের শিল্প শরীর বোঝার ক্ষেত্রেও বিশেষ উপযোগী।

এক্ষণ পত্রিকায় প্রকাশিত সত্যজিৎ রায়ের প্রায় সবকটি চিত্রনাট্য এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। *এক্ষণ* ছাড়াও *বিভাব* পত্রিকাতেও বেশকিছু চিত্রনাট্য প্রকাশিত হয়েছে। এবং স্মরণযোগ্য প্রায়-প্রতি-আটটি চিত্রনাট্য সম্বলিত *বিভাব*-এর একটি বিশেষ সংখ্যাও চলচ্চিত্রপ্রেমীদের কাছে সমাদৃত হয়। এছাড়াও নানা সময়ে কিছু কিছু পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে বাংলায় কিছু চিত্রনাট্য মুদ্রিত হয়েছে। *ফিল্ম* ও *চলচ্চিত্র* দুটি পত্রিকাতেও বেশকিছু চিত্রনাট্য মুদ্রিত হয়।

চলচ্চিত্র মাধ্যমের শতবর্ষ পূর্তির লগ্নে ১৯৯৫-এ, অর্থাৎ আজ থেকে এক দশক আগে বাংলা ভাষায় সিনেমা বিষয়ক প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ছিল ২৬০টি। আজ এই মুহূর্তে গত দশ বছরে বাংলায় রচিত চলচ্চিত্রগ্রন্থের সংখ্যা কতো তা বলার মতো তালিকা আমার কাছে নেই। তাই আজ বাংলায় চলচ্চিত্রগ্রন্থের মোট সংখ্যা কতো সেটি বলা একটু কষ্টকর। তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। নির্দিষ্ট সংখ্যা বলতে না পারলেও, আমাদের বিশ্বাস গত এক দশকে বেশ কিছু মৌলিক ও সংকলন গ্রন্থ বাংলা ভাষার চলচ্চিত্রচর্চাকে পুষ্ট করেছে। যদিও সে সংখ্যা অন্যান্য বিষয়ের গ্রন্থের তুলনায় তেমন আশাপ্রদ নয়।

এই প্রসঙ্গে দুটি বিশেষ সংকলন গ্রন্থের কথা না বললে অপরাধের দায়ভাগী হতে হবে। দুটি গ্রন্থই চলচ্চিত্রের শতবর্ষ পূর্তির কথা মাথায় রেখে পরিকল্পিত হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে ‘নন্দন’ থেকে অংশু শূরের দায়িত্বে ১৯৯৫-এর সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত হয়েছিল *সিনেমার শতবর্ষে ভারতীয় সিনেমা*। সম্পাদনা করেছিলেন শ্রীপ্রজয় শুর। দ্বিতীয় বইটি করেছিল আনন্দ পাবলিশার্স; ১৯৯৬-এর এপ্রিলে, এই গ্রন্থটি দুটি বৃহৎ খণ্ডে প্রকাশ পায়। এর মূল পরিকল্পনার ব্যাপকতা ও বিষয় বৈচিত্র্যের জন্য সবকটি রচনাকে দুটি খণ্ডে বিন্যস্ত করতে হয়, প্রথমত শতবর্ষের পরবর্তী বছরে এর প্রকাশ ঘটে। বিলম্বের আরো একটি কারণ ছিল। এই গ্রন্থের প্রাথমিক পরিকল্পনা ও বিষয় বোধকে *এক্ষণ* সম্পাদক শ্রীনির্মাল্য আচার্য একটি সামগ্রিক রূপ দান করার কথা ভেবেছিলেন তাঁর সম্পাদনার রুচি অনুসারে। কিন্তু কাজ শুরু করার কিছুকাল পরেই দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে তিনি প্রয়াত হন। তাঁর অসম্পূর্ণ কাজটি সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব পান কথা সাহিত্যিক শ্রীদিব্যেন্দু পালিত। চলচ্চিত্র অনুরাগী, সমালোচক ও সুসাহিত্যিক দিব্যেন্দুবাবু স্বকীয় জ্ঞান, বিবেচনা ও বিষয়গত অভিমুখের প্রতি গভীর দৃষ্টি দিয়ে *শতবর্ষে চলচ্চিত্র* গ্রন্থটিকে দুটি খণ্ডে বিন্যস্ত করেন। প্রথম খণ্ড ‘অনুভব ও অভিজ্ঞতা’ এবং দ্বিতীয় খণ্ড ‘ইতিহাস ও বিবর্তন’।

নন্দন কর্তৃক প্রকাশিত সুদৃশ্য ও সুমুদ্রিত গ্রন্থটির বিষয় কেবল ভারতীয় সিনেমা কিছু দিক ও চলচ্চিত্র স্রষ্টাদের শিক্ষাকর্মের প্রতি নিবদ্ধ। সে অর্থে গোটা ভারতীয় সিনেমায় সমস্ত আঞ্চলিক সিনেমার স্বরূপ এখানে প্রতিফলিত নয়। এই গ্রন্থের তেইশটি নিবন্ধের মধ্যে মাত্র একটি অনূদিত রচনা রয়েছে। বাকি বাইটি লেখাই এই গ্রন্থের ফরমাশ অনুযায়ী মৌলিক রচনা। কিন্তু বলতে দিধা নেই যে, চলচ্চিত্রের শতবর্ষে প্রকাশিত এমন একটি বিপুল আয়োজনে সিনেমাপ্রেমী পাঠক যে আকুল কৌতূহলে অপেক্ষমান ছিলেন, এ গ্রন্থের সামগ্রিক পরিকল্পনা সে আশা তেমনভাবে পূরণ করে না। অথচ পরিশ্রম ও নিষ্ঠার কোনো অভাব ছিল না। তবু কেবল ভারতীয় সিনেমার প্রতি উদ্বীকিত বলেই এমন বিশেষ সংকলনের মধ্যে একটা সামগ্রিক চরিত্র ফুটে ওঠা কাম্য ছিল। সম্ভবত লেখক নির্বাচন করে তারপরে বিষয় বেঁধে দেবার ফলেই অপূর্ণতাটুকু থেকে গেছে। তবু এ গ্রন্থে প্রকাশিত ও বেশ কিছু লেখা আমাদের চৈতন্যকে নাড়া দিয়ে যায়। যেমন ইরাবান বসু রায়, পার্শ্বপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবীর মিত্র, প্রমুখের রচনাগুলি। বিশেষ করে বলতে হয় প্রলয় শূরের ‘সত্যজিৎ‌র ছবি : তৃণতরুণ বাংলা ও বাঙালির ধুলোমুদ্রা সংসার’ নিবন্ধটি। এমন উজ্জ্বল নান্দনিক রচনা বাংলায় খুব একটা লেখা হয়নি।

শতবর্ষে *চলচ্চিত্র* গ্রন্থের ভূমিকায় দিব্যেন্দু পালিত বলেছিলেন : “চর্চার মধ্য দিয়েই বিস্তৃত হবে দর্শকদের আগ্রহ ও জ্ঞান, এবং ভবিষ্যতের চলচ্চিত্রকারদের সৃষ্টির উদ্দীপনা,

শতবর্ষে চলচ্চিত্র সেই চর্চার ক্ষেত্রও আগ্রহ ও উদ্দীপনাতে কিছুমাত্র সাহায্য করলেও এই সংকলন প্রকাশের উদ্দেশ্য সফল হবে। দুই খণ্ডে পরিকল্পিত হলেও বিষয় বিন্যাসগত কারণে এই গ্রন্থের দুটি খণ্ডই স্বয়ংসম্পূর্ণ, যদিও সমগ্রতার বিচারে একটি অন্যটির পরিপূরক।” যে অনিশ্চয়তা ও প্রকাশনগত সমস্যা কাঁধে নিয়ে দিব্যেন্দুবাবু এই কাজ সম্পূর্ণ করেছিলেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা তাঁর কথাকে বিশেষভাবে মর্যাদা দিতে পারি।

বাংলা চলচ্চিত্র পত্র-পত্রিকার ভূমিকা : বাণিজ্য বনাম শৈল্পিক দায়বদ্ধতা

চলচ্চিত্র প্রযোজনার দিক থেকে ভারতবর্ষ বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম অগ্রগণ্য দেশ। প্রতি বছর এদেশে যে পরিমাণ ছবি তৈরি হয়, গুণগত দিক থেকে তার মান হয়তো বিশ্বের অন্য দেশের চলচ্চিত্র শিল্পের সমান্তরাল নয়। তবু, দেশের আপামর জনসংখ্যার বিরাট অংশ এই শিল্প মাধ্যমের পুষ্টিসাধন করেন প্রত্যক্ষভাবে। এমনই এক অবস্থায় চলচ্চিত্র প্রযোজনায় পাশাপাশি সিনেমা বিষয়ক প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার ভূমিকা ও চরিত্র নিয়ে আলোচনার অবকাশ অবশ্যই আছে। কেবল আমাদের দেশেই নয়, গোটা দুনিয়ার চলচ্চিত্র বাজারে এ ধরনের পত্র-পত্রিকার মান সম্মান এবং বহুমাত্রিক প্রভাব এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয়। যতদূর সম্ভব আমাদের এখানে চলচ্চিত্র নির্মাণের কারিগরি দিক, নান্দনিক উপলব্ধি, রসবিচার বা এ জাতীয় পত্র-পত্রিকার সামাজিক বা শিল্পগত দায়বদ্ধতা নিয়ে তেমন বিচার বিশ্লেষণ খুব একটা হয়নি।

ভারতীয় চলচ্চিত্রের দীর্ঘকালান্ত্রিত বহুবর্ণের ইতিহাসে বাংলা সিনেমার গৌরব অস্বীকার করার নয়। জাতীয় এবং অসংখ্য আন্তর্জাতিক সম্মানে ভূষিত অসংখ্য বাংলা ছবির কৌলীন্য সমগ্র ভারতীয় চলচ্চিত্রকে বিশ্ব সিনেমার মানচিত্রে একটা নির্দিষ্ট মাত্রা দিতে পেরেছে। আমাদের এখানে নিয়মিত প্রকাশিত বেশ কিছু চলচ্চিত্র পত্রিকা কেবল বাংলা সিনেমাতেই নয়, পরস্তু সমগ্র ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রতি অসংখ্য মানুষকে আকৃষ্ট করে রেখেছে। আমাদের এখানে মূলত দু’ধরনের সিনেমা পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এক, যারা বিশেষ ভাবেই চলচ্চিত্রের ব্যবসায়িক নানা দিকের প্রতি অনুরক্ত, এবং তাঁরা তাঁদের প্রকাশিত পত্রিকার মাধ্যমে বৃহৎগোষ্ঠীর জনসাধারণের মনোরঞ্জন এবং বিপুল চাহিদাকে ধরে রাখতে চান। তাঁদের কাছে চলচ্চিত্রের প্রমোদের মূল্য অগ্রগণ্য, তাই সিনেমার শিল্পনন্দন বা সামাজিক ভূমিকা নিয়ে তাঁরা ততো চিন্তিত নন। প্রাথমিক শর্তেই তাঁরা নিজেদের পত্রিকার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির ভেতর দিয়েই গোটা দেশের চলচ্চিত্রের স্পন্দনটিকে ধরতে চান। বলা বাহুল্য যে, এইসব পত্র-পত্রিকার চিত্র সমালোচকদের বেশির ভাগই পেশাদারি মনোভাব নিয়ে কাজ করেন। চলচ্চিত্র শিল্পের সুক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণ এঁদের কাছে ততোটা জরুরি নয়। তার অন্যতম কারণ এইসব পত্রিকার চরিত্র ও অভিপ্রায় সে সুযোগের অপেক্ষা রাখে না। এই ধরনের পত্রিকার প্রকাশন যে সংখ্যার দিক থেকে অনেক বেশি হবে সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, এই জাতীয় পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত চিত্র-সমালোচনা বহুলাংশে একপেশে। নিন্দা বা স্তুতি উভয় ক্ষেত্রে এই মাত্রাবোধের অভাব ভীষণভাবে চোখে পড়ে। আবার যে রকমের লেখা এই শ্রেণির কাগজে বেরোয় সেগুলি দায়সারা সমালোচনার নামান্তর। এ কথা বললে অসঙ্গত হবে না যে, এইসব কাগজপত্রের চলচ্চিত্র আলোচনা বা কোনো বিশেষ নিবন্ধও এ পর্যন্ত এ দেশে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর চলচ্চিত্র রসবোধ বা এই মাধ্যমের প্রকৃত গুণগ্রাহিতার মান বাড়াতে সক্ষম হয়নি। চটুল এবং

রম্য রচনার প্রচ্ছদে এবং সহজে আকর্ষণীয় বর্ণনার মাধ্যমে এইসব পত্র-পত্রিকার আলোচনা, সিনেমা বিষয়ক গালগল্প, স্টুডিও সংবাদ, কলাকুশলী ও নায়ক-নায়িকাদের ব্যক্তিগত জীবনের গোপন তথ্যের প্রতি এঁরা যতোটা মনোযোগী, চলচ্চিত্র মাধ্যমের সঠিক বিকাশে বা মানুষের অস্তিত্ব সংকটের বিশ্বস্ত আয়না হিসেবে সিনেমা কতোটা কার্যকরী, এ নিয়ে এঁরা কখনো বিচলিত হননি। ফলত সিনেমা দেখার প্রতি সাধারণ মানুষদের অদম্য কৌতূহলকেই এঁরা পরোক্ষে মদত দিয়েছেন। বৃহৎ গোষ্ঠীর দর্শককুলকে সিনেমার সামাজিক দায়িত্ব বা চলচ্চিত্রের বিপুল শিক্ষ সম্ভাবনার নানা দিক নিয়ে নিবিড়ভাবে আগ্রহী করে তুলতে পারেননি।

এই ধরনের পত্রিকার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগটা অন্য জায়গায়। চলচ্চিত্র সাংবাদিকতায় ক্ষেত্রেও সমালোচকের সামাজিক দায়িত্বটাও একটা বড়ো ব্যাপার। এ দেশের চিত্র-সাংবাদিকতা ক'জন সঠিকভাবে সে দায়িত্ব পালন করেন সে প্রশ্ন জানা অস্বাভাবিক নয়। চিত্রতারকার জীবনী, প্রথাগতভাবে রুটিনবদ্ধ চিত্র সমালোচনাতেই চলচ্চিত্র সাংবাদিকের ভূমিকা শেষ হয়ে যায় না। উৎকৃষ্ট ছবির প্রতি দর্শকদের আগ্রহ বাড়িয়ে তোলা চলচ্চিত্র মাধ্যমের প্রকৃত শিল্পশর্ত। চলচ্চিত্রের নন্দন তথা ভাষা ও ব্যাকরণের প্রতি আরো বেশি করে শিক্ষিত মানুষদের সচেতন করে তোলার ক্ষেত্রে সমালোচকদের দায়িত্ব থেকেই যায়। চলচ্চিত্র ও দর্শকের রুচিবোধের মান উন্নয়নে যেক্ষেত্রে চিত্র-সমালোচক সেতু বন্ধনের কাজ করতে পারেন সেখানেই গোটা ব্যাপারটা সদর্থক হয়ে ওঠে। আমাদের দেশের নব্বই ভাগ তথাকথিত কমার্শিয়াল পত্র পত্রিকায় সে কাজটা কখনো সম্ভব হয়নি। এই কারণেই এ দেশে চলচ্চিত্র সাংবাদিকতার কোনো সুষ্ঠু মান গড়ে ওঠেনি। একালের এক বিদেশি মহিলা চলচ্চিত্র সমালোচক সিনেমা সমালোচনা প্রসঙ্গে নিজের অভিমত প্রকাশ করেছেন যা আমাদের অন্যভাবে ধাক্কা দেয় : "I felt that, somehow, through film, as in all criticism, there was a way of expressing myself, of sharpening, my sensibility against this material." অদ্ভুত আত্মোন্মোচন। এ দেশের কোনো সমালোচক সম্ভবত এই উপলব্ধির কথা ভাবতেই পারেন না। নিজেকে নিয়ত জ্ঞানার মধ্য দিয়েই অন্য পাঁচজনকে উদ্বোধিত করা সম্ভব। শিল্প মনস্ক চলচ্চিত্র পরিচালক আজ নিয়ত যে অস্তিত্ব সংকট ও সামাজিক সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন, তার মধ্যে একদিকে যেমন মনস্তাত্ত্বিক গভীরতা জড়িয়ে আছে, তেমনি বর্তমান পরিবর্তনশীল মূল্যবোধের ছবিও তার মধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে। তাই পরিচালক যেমন তাঁর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে নিজেকে ব্যস্ত করছেন, চারপাশের জগৎ জীবনকে শিল্প দৃষ্টি নিয়ে বিশ্লেষণ করছেন, তেমনি সমালোচককেও সেখানে বিশেষ মনন ও নিষ্ঠায় সেই সৃষ্টির সম্ভাবনাময় দিক নিয়ে যোগ্য আলোচনায় পুরোদস্তুর দক্ষ হতে হবে। মনে রাখতে হবে, সিনেমা এখন আর কেবল প্রমোদ নয়, বাণিজ্যলক্ষীর অন্যতম আধার নয়, চলচ্চিত্র আজ মানুষের সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব জুড়ে বিরাজ করছে। বিদেশিনী সমালোচকের উক্তি তাই আমাদের আর একবার সচেতন করে তোলে : "The conventions of narrative are those we recognise in some way as ordering our own lives. And this is the appeal of film criticism". এই দৃষ্টিভঙ্গি সঞ্জাত চলচ্চিত্র সমালোচনা এখানে আজও চোখে পড়ে না।

এই শ্রেণির পত্র-পত্রিকার পাশেই আছে, দ্বিতীয় গোত্রের পত্রিকা, যারা প্রাথমিক ভাবেই গভীর ভালোবাসা ও মমত্বে সিনেমার নন্দন, সামাজিক দায়িত্ব, শিল্পশর্তের অনুপুঙ্খ অধ্যয়নের

ভেতর দিয়ে চলচ্চিত্র ব্যাপারটাকে আরো গভীরতায় দর্শকদের চেতনায় প্রোথিত করতে চায়। এই শ্রেণির পত্রিকার আবার দুটি ধরা আছে। এক হ'ল বিভিন্ন ফিল্ম সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত মুখপত্র। দ্বিতীয় হ'ল নির্দিষ্ট কোনো প্রতিষ্ঠান ছাড়াই ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও নিষ্ঠায় প্রকাশিত খাঁটি চলচ্চিত্র পত্রিকা। অর্থাৎ চলচ্চিত্র নিয়ে একান্ত আন্তরিক ও গভীর পঠন-পাঠন সমৃদ্ধ মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির চলচ্চিত্র পত্রিকা। ফিল্ম সোসাইটির কয়েকটি পত্রিকা ইদানীং খুব অনিমিত হয়ে গেছে। যেমন ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির *চিত্রপট*, সিনে ক্লাব অফ ক্যালকাটার *চিত্রকল্প*। *সেলুলয়েড* ও *পটভূমি* পত্রিকা দুটির প্রকাশ ও খুব অনিয়মিত। ফিল্ম সোসাইটির কাগজগুলির মধ্যে ক্যালকাটা সিনে ইনস্টিটিউটের মুভি *মনতাজ*, নর্থ ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির *চিত্রভাষা*, সিনে সোসাইটির *চিত্রবীক্ষণ* পরিকল্পনা ও রচনায় উৎকর্ষে নির্দিষ্ট মান অর্জন করেছে। ক্যালকাটা সিনে ইনস্টিটিউটের একটি মাসিক মুখপত্র *চলচ্চিত্র* বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে। কিন্তু মুভি *মনতাজ* ও *চলচ্চিত্র* দুটি কাগজই বহুদিন হ'ল আর প্রকাশিত হয় না। নৈহাটি সিনেক্লাবের *দৃশ্য* পত্রিকাটিও স্মরণ যোগ্য। অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে প্রকাশিত বালি সিনে গিগেন্ডের *প্রসঙ্গ*: *চলচ্চিত্র*, উত্তরপাড়া সিনে ক্লাবের *অযাত্রিক*, ঋত্বিক সিনে সোসাইটির *এফ* সিরিয়াস চলচ্চিত্র চর্চায় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। একথা বললে ভুল হবে না যে, এইসব নির্ভেজাল চলচ্চিত্র পত্রিকায় প্রকাশিত সিনেমা সমালোচনা এবং নানা ধরনের প্রবন্ধ তথাকথিত নামী-দামী পত্রিকার বহু-পরিচিত সমালোচকদের লেখার তুলনায় অনেক সমৃদ্ধ ও গুণগত মানে উন্নত, প্রচার-স্বল্পতার দরুন এইসব বহু মূল্যবান লেখা অধিক সংখ্যক পাঠকের কাছে পৌঁছতে পারে না। ফলে এইসব উৎকৃষ্ট রচনার লেখকদের পরিশ্রম, প্রযত্ন ও ভালোবাসা অনেকটাই অপব্যয়িত হচ্ছে। এক্ষেত্রে এই ধরনের পত্রিকায় প্রকাশিত অনেক উৎকৃষ্ট ও উপযোগী রচনার নির্বাচিত সংকলন প্রকাশের কোনো বিকল্প ব্যবস্থার কথা ভাবতে পারলে অন্তত বাংলা ভাষায় চলচ্চিত্রচর্চার এক সমান্তরাল আন্তরিক চেহারা অনুধাবন করা যাবে।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি গভীর মমত্বের জন্য ওপার বাংলার শিক্ষিত মানুষদের বিশেষ পরিচয় সুবিদিত, সাহিত্যচর্চায় পাশাপাশি ওখানকার এক শ্রেণির বিদগ্ধজন গভীর নিষ্ঠায় চলচ্চিত্রচর্চাকেও অব্যাহত রেখেছেন। ওপারবাংলায় চলচ্চিত্রচর্চার গভীর নিষ্ঠার নিদর্শন চোখে পড়ে মুহম্মদ খসরুর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত সিনেমা পত্রিকা *চলচ্চিত্র পত্র*-র নানা সংখ্যায় প্রকাশিত নানা নিবন্ধে। এ পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশ শুরু হয় ১৯৮০ সালে। ইদানীং বাংলাদেশের কয়েকটি ছবি রসিকজনের আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এলেও সার্বিকভাবে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র নির্মাণের মান খুব একটা উন্নত নয়। অথচ 'বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সংসদ ফিল্ম বুলেটিন' রূপে এই *চলচ্চিত্র পত্র*-এর মুদ্রণ পারিপাট্যের মতোই এই পত্রিকায় প্রকাশিত চলচ্চিত্র আঙ্গিক ও চলচ্চিত্রের সামাজিক দৃষ্টিকোণের প্রতি নিবন্ধ একাধিক রচনা আমাদের ভাবনা উদ্রেক করে।

বহুকাল আগে গোপাল সেন, দেবীপদ ভট্টাচার্য প্রমুখের সম্পাদনায় *চলচ্চিত্র* নামে একটি মূল্যবান পত্রিকা প্রকাশিত হ'ত। দীর্ঘকাল ধরে এই পত্রিকা একই সঙ্গে ধ্রুপদি সিনেমা ও সাধারণ মানের ছবির নানা দিক নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা প্রকাশ করে এসেছে। অধুনা পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ আছে, আর একটি মূল্যবান বাংলা চলচ্চিত্র পত্রিকা সিনেমা রসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। *ফিল্ম* নামের এই পত্রিকাটি অধ্যাপক ড. গুরুদাস ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে

আমাদের বেশ কয়েকটি সুন্দর সংখ্যা উপহার দিয়েছে। পঁয়ত্রিশ বছরেরও আগে থেকে প্রকাশিত হচ্ছিল একটি ভিন্ন চরিত্রের খাঁটি চলচ্চিত্র পত্রিকা *আন্তর্জাতিক আঙ্গিক*। এরও অনেকগুলি মূল্যবান সংখ্যা চলচ্চিত্রচর্চার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। বছর পঁচিশ আগের একটি সুন্দর পত্রিকা *কল্পনির্ঝর* বেশ কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশিত হবার পর এখন বন্ধ হয়ে গেছে। *ফিল্ম ও চলচ্চিত্র* পত্রিকার মতো এ কাগজেও বেশ কিছু মুদ্রিত চিত্রনাট্য বিশেষ আকর্ষণ গড়ে তোলে।

একটা কথা বলে নেওয়া জরুরি যে, আমরা প্রথমোক্ত যে শ্রেণির চলচ্চিত্র পত্রিকার কথা আলোচনা করেছি, তার সবটুকু ভূমিকাই যে ব্যর্থ হয়েছে, এমন মন্তব্য করলে সম্ভবত কিছুটা ভ্রান্তি থেকে যাবে। প্রায় ছিয়াত্তর বছর আগে একটি মাসিক পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হ'ত, নাম *চিত্রপঞ্জী*। নির্মীয়মান বাংলা ছবির আলোচনার পাশাপাশি এ পত্রিকায় হলিউড ও বিশ্বের অন্যান্য দেশের চলচ্চিত্র প্রযোজনার নানা দিক নিয়ে বহু রচনা এ পত্রিকায় সম্মিলিত হত। সেইসঙ্গে চলচ্চিত্র নির্মাণের বিভিন্ন পর্যায় নিয়ে নন্দনতাত্ত্বিক অনেক আলোচনাও এই পত্রিকার অন্যতম আকর্ষণ ছিল। ভারতীয় সবাক ছবির একেবারে গোড়ায় এমনতর একটি বাংলা পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা নিঃসন্দেহে প্রশংসারযোগ্য। এই পত্রিকার ৩ বর্ষের চতুর্থ সংখ্যায় (মার্চ ১৩৪০) সম্পাদকীয়তে প্রকাশিত কিছু মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য : “সংবাদপত্রের সৃষ্টি সাধারণের জন্য এ বিষয়ে আজ বোধ হয় কোনও মতভেদ নেই। কিন্তু সংবাদপত্রের ছবির যে সমালোচনা প্রকাশিত হচ্ছে এবং হয় তাতে সবচেয়ে বেশী ক্ষতি স্বীকার করেন ঐ পাঠক-সাধারণই। আমাদের অর্থাৎ এখনকার সমালোচকদের বেশীরভাগ সমালোচনাই হয় এক একপেশে—হয় ছবি অতি নিন্দা নয় অত্যাধিক প্রশংসা অর্থাৎ নির্লজ্জ স্তুতিবাদ। সাধারণত ঐ একপেশে সমালোচনার দুটি করে কারণ থাকে : বন্ধুপ্রীতি বা বিজ্ঞাপন প্রাপ্তি হয় স্তুতির কারণ ও ব্যক্তিগত মনোমালিন্য বা বিজ্ঞাপন না পাওয়ার ফলে ছবির ভাগ্যে জোটে অজস্র নিন্দা। ঐ দুটি কারণের ফলে যে শ্রেণীর সমালোচনা জন্মায় তা' পড়ে পাঠক-সাধারণ কাগজীয় সমালোচনার পরে আস্থা হারান।” এই কাগজেরই তৃতীয় বর্ষের ষষ্ঠ সংখ্যায় (চৈত্র ১৩৪০) সম্পাদকীয়তে যে কথাগুলি লেখা হয়, তার থেকে এটুকু অনুমান হয় যে, ওই তিরিশ দশকেও চলচ্চিত্র শিল্পমাধ্যম নিয়ে এক শ্রেণির রুচিবান শিক্ষিত মানুষ বাংলা ভাষার মাধ্যমে সিনেমাকে বৃহৎ শ্রেণির দর্শক ও পাঠকের কাছে স্বতন্ত্র চরিত্রে চিহ্নিত করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। ষষ্ঠ সংখ্যায় লেখা হয়েছিল : “সমালোচক যদি বিচারক হন, তবে তিনি কার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করবেন?—দর্শকের না অভিনেতা এবং অন্য শিল্পীসঙ্ঘের প্রতি? যদি তাঁকে দর্শকের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয় তাহলে তাঁকে নটনটী এবং অন্য শিল্পীর প্রতি রূঢ় হ'তে হবে—শিল্পকলার প্রতি রূঢ় হতে হবে। আর অপরপক্ষে, নট-নটী প্রভৃতিদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করতে হলে দর্শকগণকে প্রবঞ্চিত করতে হবে, এস্থলে প্রকৃত কর্তব্য হচ্ছে সত্য প্রকাশ করা। সত্যই যখন সুন্দর, তা যখন আর্ট—তখন আর্টের সমালোচনায় অসত্যের স্থান হতে পারে না।” গোটা তিরিশ দশক জুড়ে আমরা আরো কতকগুলি বাংলা পত্র-পত্রিকার হৃদিশ পাই যেগুলিতে সিনেমা নিয়ে আলোচনা লক্ষ করা যায়। যদিও এগুলিকে নির্ভেজাল চলচ্চিত্র পত্রিকা হিসেবে গণ্য করা যায় না। কারণ এগুলিতে সিনেমার পাশাপাশি আরো নানা বিষয়ের লেখা প্রকাশিত হ'ত। যেমন—*খেয়ালী*, *বাতায়ণ*, *সাহানা*, *রূপলেখা* ইত্যাদি। *চিত্রপঞ্জী*র মতো আর একটি পত্রিকা ছিল *চিত্রবাণী*। তিরিশ

বছর পরে, অর্থাৎ ষাট দশকে এসে আধুনিক বিশ্বের চলচ্চিত্র শিল্প নিয়ে বাংলা দেশে ব্যাপক শিল্প তন্ময়ী চালানোর যে উৎসাহে আমরা চলচ্চিত্র রসিকদের উজ্জীবিত হ'তে দেখেছি, তার বীজ অনেক আগেই বপন করেছিল এইসব পত্রিকায়। এ ছাড়াও ছিল কয়েকটি নিয়মিত পত্রিকা যেমন *রূপমঞ্চ*, *দীপালি*। এ দুটি কাগজও তদানীন্তন ভারতীয় চলচ্চিত্রের গতি প্রকৃতি নিয়ে অনেক সুষ্ঠু আলোচনার চেষ্টা করেছে। বাংলা ভাষায় চলচ্চিত্র-চর্চার ধারাবাহিক ইতিহাস রচনায় উৎসাহী গবেষকদের কাছে এদের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

বছরছর আগে চলচ্চিত্রকে একটা শিল্পমাধ্যম হিসেবে গণ্য করে বাংলা ভাষায় একটা পত্রিকার সূচনা হয়েছিল *ভারতী*। এটি ছিল মাসিক পত্রিকা। সাহিত্য ভালোবাসেন এমন মানুষদের কাছে পত্রিকাটির একটা নিজস্ব কদর থাকলেও সিনেমা-কেন্দ্রিক আলোচনায় এটি তেমন নির্দিষ্ট চরিত্র অর্জন করতে পারেনি। প্রথম সম্পাদক ছিলেন বিজ্ঞেননাথ ঠাকুর। এ ছাড়াও স্বর্ণকুমারী দেবী, হিরণ্ময়ী দেবী প্রমুখের নামও সম্পাদক হিসেবে সময়ে সময়ে দেখা যায়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও এক বছরের জন্য পত্রিকাটির সম্পাদনার ভার নিয়েছিলেন।

এর পরবর্তী পর্যায়ে যে পত্রিকাটি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেটির নাম *নাচঘর*। সাপ্তাহিক হিসেবে এর আত্মপ্রকাশ ঘটে। মূলত বিনোদন পত্রিকা হলেও নাটক সংক্রান্ত আলোচনার পাশাপাশি এ কাগজে চলচ্চিত্র আলোচনা ও নিয়মিত প্রকাশ পেত। দেশি ও বিদেশি চলচ্চিত্রের আলোচনা এতে স্থান পেত। এমন বললে ভুল হবে না যে, এই কাগজেই সিনেমা বিষয়ক আলোচনার যথার্থ প্রকাশ ঘটেছিল।

বাংলা ভাষায়, কেবল চলচ্চিত্রকেন্দ্রিক পত্রিকা *বায়োস্কোপ*-এর প্রথম প্রকাশ ঘটে ১৯২৯ সালে। চরিত্রের দিক থেকে এটি ছিল দ্বিভাষিক পত্রিকা। তবু, বাংলা ভাষায় চলচ্চিত্রচর্চার ব্যাপক নমুনা এ কাগজে ছড়িয়ে আছে। এই সময়ে প্রকাশিত *দীপালি* পত্রিকার চরিত্রও ছিল দ্বিভাষিক। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের আগে কয়েকটি পত্রিকার সম্মান পাওয়া যায়, সেগুলিতে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি চলচ্চিত্র সংক্রান্ত খবরাখবর ও আলোচনা প্রকাশিত হ'ত। এরকমই একটি পত্রিকা *বাঙলা*। ন'বছর স্থায়িত্বের শেষ দু'বছর এই কাগজে নিয়মিতভাবে চলচ্চিত্র নিয়ে আলোচনা স্থান পেত। আর একটি কাগজ বেকুত *নবশক্তি*। এটি ছিল সাপ্তাহিক কাগজ।

চলচ্চিত্রের নির্দিষ্ট মান বজায় রেখে আর একটি উল্লেখযোগ্য কাগজ প্রকাশিত হ'ত *চিত্রলেখা*। এর সম্পাদক ছিলেন সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কাগজটি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। পত্রিকাটির মাত্র আঠারোটি সংখ্যা বেরিয়েছিল।

পঞ্চাশ, ষাট দশকের সময় সীমায় এবং কিছু পরে বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্র পত্রিকা বাঙালি দর্শক ও পাঠকের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। *উন্টোরথ*, *সিনেমা জগৎ*, *জলসা* এবং *প্রসাদ* ইত্যাদি বাংলা পত্রিকাগুলো দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে বাঙালি দর্শকদের গভীর ভালোবাসার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে ছিল। কেবল বাংলা চলচ্চিত্রের স্টুডিও সংবাদ কিংবা নিছক সমালোচনা নয়, এইসব পত্র-পত্রিকা নির্দিষ্ট পছন্দ বাংলা সিনেমার বহুল প্রচারে পরোক্ষে যথেষ্ট মদদ দিয়েছে। উত্তম সূচিত্রার মতো অবিসংবাদী শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক জুটি কিংবা সৌমিত্র-অপর্ণার মতো অংশীদারিত্ব মননশীল জুটির জনপ্রিয়তার মানদণ্ড নির্ধারণের এইসব কাগজের বড়ো ভূমিকা উপেক্ষা করার নয়। কেবল বাংলা সিনেমাই নয়, এই সব কাগজে সময়ে সময়ে

হিন্দি ও আঞ্চলিক ছবির আলোচনাও বহুক্ষেত্রে দর্শকদের সর্বভারতীয় চলচ্চিত্রের সার্বিক চেহারাটা ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে।

এক সময়ে ঘরোয়া নামে একটি জনপ্রিয় পত্রিকা প্রকাশিত হত। সম্পাদক ছিলেন বীরেন সিমলাই। বেশ কিছু সাহিত্য রচনা মুদ্রণের সমান্তরালে ও পত্রিকার মূল লক্ষ্য ছিল সিনেমাকে নানাভাবে পাঠক ও দর্শকের কাছে জনপ্রিয় করে তোলা। এখন পত্রিকাটি কখনো কখনো চোখে পড়ে। প্রাসঙ্গিকভাবে একটি তথ্য এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই সব পত্রিকার রচনাগুলো যদিও মূলত বাণিজ্যিক অভিপ্রায়ের প্রতি লক্ষ্য রেখেই ছাপা হ'ত, তবু মাঝে মধ্যে এমন কিছু আন্তরিক ও সৃষ্টিভিত্তিক রচনাও এইসব কাগজে ছাপা হয়েছে যা রসিক পাঠকের কৃতজ্ঞতা অর্জন করে আছে। যেমন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য উন্টোরথ পত্রিকায় প্রকাশিত বেশ কয়েকটি ধারাবাহিক গুরুত্বপূর্ণ রচনা। এ পত্রিকায় 'ধ্রুপদী চলচ্চিত্র' শিরোনামে অধ্যাপক ড. গুরুদাস ভট্টাচার্য বিশ্ব চলচ্চিত্রের স্মরণীয় সৃষ্টি নিয়ে অত্যন্ত মননশীল আলোচনা করেছিলেন যা এখনো আমাদের স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। তথাকথিত বাণিজ্যিক পত্রিকায় এই জাতীয় রচনার একটা অন্য ভূমিকা থাকে। একেবারে চটুল, সাধারণ মানের চলচ্চিত্র জগতের খবরাখবরের পাশে এই ধরনের সিরিয়াস প্রবন্ধ জিহ্বাসু পাঠকের তৃপ্তি বিধানের সঙ্গে সাধারণ পাঠকদেরও ধীরে ধীরে কৌতুহলী করে তুলতে পারে। দুঃখের বিষয়, অধিকাংশে বাণিজ্যিক পত্রিকায় এ-জাতীয় প্রচেষ্টা চোখে পড়ে না।

আমরা এ কথা মনে করি যে, বাণিজ্যিক মনোভাবের বাইরে একান্তভাবে চলচ্চিত্র শিল্পের চর্চায় মগ্ন মননশীল সিনেমা পত্রিকার মাধ্যমে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর আমূল রুচি পরিবর্তন ঘটবে একথা অবিসংবাদী সত্য নয়। সাধারণ দর্শকের রুচির পরিবর্তনে, সুস্থ, সুন্দর বাস্তবসম্মত চলচ্চিত্রের প্রতি রসবোধ ও আকর্ষণ গড়ে তোলায়, প্রাথমিকভাবে অন্যান্য শিল্প শাখার সঙ্গে সিনেমার মৌলিক প্রভেদ এবং দায়িত্বটাকে সর্বাত্মক প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। প্রমোদ মানেই স্থূলতা নয়, রুচিবিকার নয়, কিংবা মনোরঞ্জনের একমাত্র লক্ষ্য সত্তা চটুল কাজের মাধ্যমে ব্যাপক শ্রেণির মানুষের জনপ্রিয়তা অর্জন, এই জাতীয় মনোভাবের পরিবর্তনটা আগে দরকার। বাণিজ্যিক পত্রিকার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগটা এইখানেই যে, তারা এ ব্যাপারে কোনো সদর্থক ভূমিকা পালন করেনি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কেবল জনপ্রিয়তার কথা মাথায় রেখে গোটা পত্রিকার পরিকল্পনা চালিত হয়ে এসেছে বলেই কেবল বাংলায় নয় গোটা ভারতীয় চলচ্চিত্রের সমালোচনার ধারা বা চলচ্চিত্র-চর্চার উৎকৃষ্ট মান নির্দিষ্ট হয়নি। পঞ্চাশ দশকে স্বর্গত পঙ্কজ দত্ত মহাশয় বাংলায় মৌলিক চলচ্চিত্র সমালোচনার একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। পরবর্তীকালে জ্যোতির্ময় বসু রায়, সেবাত্রত গুপ্ত প্রমুখেরাও সেই ধারাকে খানিকটা পুষ্ট করার চেষ্টা করেছিলেন।

এক সময় ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি থেকে বাংলায় একটি কাগজ বেরুত। নাম ছিল চলচ্চিত্র পূর্বভারতী। চলচ্চিত্র প্রযোজনার একেবারে অন্তরমহলের সংবাদ ছাড়াও, এ শিল্পে যুক্ত কলাকুশলীদের নানা সংকট, সমস্যা, জীবনজীবিকার বিবিধ প্রসঙ্গের অবতারণাও নিয়মিত প্রকাশিত হ'ত এ কাগজে। সিনেমার সঙ্গে সরাসরি ভাবে যুক্ত কলাকুশলীদের উদ্যোগে আর একটি কাগজ প্রকাশিত হয়েছিল চলচ্চিত্র। এ পত্রিকায় সিনেমার কারিগরি দিকের আলোচনা থাকত। ঠিক এই ধরনের কাগজ ইদানীং আর চোখে পড়ে না। বাংলা চলচ্চিত্র কলাকুশলীদের একমাত্র মুখপত্র ঘোষণাসহ সিনারিও-র প্রথম সংখ্যা হাতে পেয়ে আশান্বিত হওয়া গিয়েছিল যে, চলচ্চিত্র

মাধ্যমের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত টেকনিসিয়ানদের সিনেমা নির্মাণগত তথ্য জীবিকা সংক্রান্ত অনেক তথ্য, সংকট ও বিশ্লেষণ এ পত্রিকার গৌরব বাড়াবে। প্রথম সংখ্যাটির প্রকাশকাল ১৯৯৪ সাল। পরে পত্রিকাটি অন্য নামে প্রকাশিত হতে থাকে *চলচ্চিত্র অঙ্গনে* এই নাম নিয়ে। কিন্তু কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশিত হবার পর এই নামটির ও পরিবর্তন ঘটাতে হয়, কারণ ওই নামে আর একটি কাগজ আগে থেকেই প্রকাশিত হচ্ছিল। তাই পরিবর্তিত নাম নিয়ে ১৯৯৮ সালে চতুর্থ বর্ষ ১ম সংখ্যা থেকে পত্রিকাটির নতুন নামকরণ হয় *এই চলচ্চিত্র অঙ্গনে*। কিন্তু এ কাগজটির প্রকাশ ও ভীষণ অনিয়মিত।

এক সময় ‘ফেডারেশন অফ ফিল্ম সোসাইটিজ’ অফ ইন্ডিয়ার একটি অতি রুচিসম্মত মননশীল ইংরেজি মুখপত্র প্রকাশিত হত ‘ইন্ডিয়ান ফিল্ম কালচার’ নামে। এটি দীর্ঘকাল বন্ধ রয়েছে। এই ফেডারেশনের একটি বাংলা মুখপত্র *চিত্র ভাবনা* কিছু প্রতিশ্রুতি, কিছু নতুন ভাবনা ও কর্মোদ্যোগ নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল সত্যব্রত পালের সম্পাদনায়। এটিরও নিয়মিত প্রকাশ এখন চোখে পড়ে না। বিজয়কুমার বসুর সম্পাদনায় *সিনেমা সমালোচনা* নামে একটি পত্রিকার প্রথম সংকলন প্রকাশ পায় ১৯৬৬-র আগস্ট মাসে। বেশ কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশের পর এটি বন্ধ হয়ে যায়। *সিনে টেকনিক* নামে একটি পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যাও একটা ভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল। কিন্তু সিনেমার কারিগরি দিক এবং চলচ্চিত্রের টেকনিক সর্বস্বতার প্রতি মাত্রাতিরিক্ত ঝোঁকের জন্য কাগজটি সীমিত পাঠকশ্রেণির বাইরে তেমনভাবে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠেনি। যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে এই পত্রিকার প্রথম দিকের কয়েকটি সংখ্যার সঙ্গে আমি যুক্ত ছিলাম। সত্যজিৎ রায়ের ৫২-তম জন্মতিথি উপলক্ষ্যে দিলীপ ব্যানার্জী ও আমার সম্পাদনায় সত্যজিৎ রায় বিশেষ সংখ্যাটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই নিঃশেষিত হয়ে যায়।

চলচ্চিত্রের সমালোচনা বা শিল্প পর্যালোচনা কিংবা গভীর নন্দন তাত্ত্বিক আলোচনা যে কোনো ক্ষেত্রেই একটা দাবি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যিনি সমালোচনা লিখছেন বা শিল্প ব্যাখ্যা করছেন, তাঁর কেবল সিনেমাই নয়, অপরাপর শিল্প সম্পর্কে মোটামুটি দীক্ষাও থাকা দরকার। কেননা, চলচ্চিত্র বিবিধ শিল্পের নির্যাস গ্রহণ করে নিজের শরীর সীমা রচনা করে নিয়েছে। তাই অদীক্ষিত সমালোচকের ক্রটিপূর্ণ আলোচনায় দর্শকগোষ্ঠীর বিভ্রান্ত হবার সম্ভাবনাই বেশি। উপরন্তু রচনার ক্ষেত্রে তাঁকে নিরপেক্ষ বিচারকের ভূমিকা পালন করতে হয়। সমালোচনার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ভালোবাসার ব্যাপারটা খানিকটা কাজ করে ঠিকই, কিন্তু সেই ব্যক্তিগত রুচি ও পছন্দের তীব্রতাই যদি প্রধান হয়ে ওঠে তবে মূল আলোচ্য বিষয়ের প্রতিপাদ্য ও নির্মাণ-পরাকাষ্ঠার মৌলিক অভিপ্রায়টাই হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। দর্শক ও পাঠকের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষার ক্ষেত্রে চলচ্চিত্র-সমালোচক অনেকটা পথ প্রদর্শকের কাজ করেন। সাধারণ শ্রেণির দর্শক ও পাঠককে তাই তাঁর ওপর নির্ভরশীল হতে হয়। আর এক্ষেত্রে তথাকথিত বাণিজ্যিক পত্রিকাগুলো অধিকাংশ সময় দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয় দেন না। তাঁদের উদাসীনতা বেশিরভাগ সময়েই চলচ্চিত্র শিল্পের প্রগতির পরিবর্তে স্থূলতার পরিপুষ্টিতে সাহায্য করে।

আজ চলচ্চিত্র শিল্পের শতবর্ষ পূর্তির এক দশক পরে, পিছনের দিনগুলোতে তাকালে অসংখ্য পত্র-পত্রিকার পরিক্রমার একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাংলা ও বাঙালির প্রবহমান সংস্কৃতি চেতনার প্রতিফলনে বাংলা চলচ্চিত্র আজ ঠিক কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, সে নিয়ে প্রকৃত অনুসন্ধিৎসা কোনো পত্রিকার তরফ থেকে কতোটা হয়েছে সে প্রশ্নই বড়ো হয়ে দেখা দেয়।

বাণিজ্যিক পত্রিকাই হোক আর সমান্তরাল মননধর্মী সিরিয়াস চলচ্চিত্র পত্রিকাই হোক, চলচ্চিত্র মাধ্যমের সঙ্গে জনগণের গভীর সামাজিক সম্পৃক্তির শিকড়টাকে চিনিয়ে দেওয়াই মূল কথা। যিনি বা-যাঁরা এ কাছে খানিকটা নিঃস্বার্থ মানসিকতায় এখনো সচেত, আমরা নির্বিধায় তাঁদের সঙ্গে আছি। পত্রিকা আর্থিক সাফল্য ও জনপ্রিয়তায় আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু সেই অর্থকৌলীনের পাশাপাশি শিল্পমণ্ডিত মানসিকতার প্রগতিও একান্ত জরুরী।

তথ্যসূত্র :

- ১ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় : পুনর্মুদ্রণ যুগপট / দ্বিতীয় বর্ষ, ২য় সংখ্যা-২০০৪
- ২ শম্ভু ঘোষ : 'কল্পনির্ব্বর', ১৯৮০
- ৩ খগেন্দ্রনাথ রায় : দেশ : ৯ ডিসেম্বর, ১৯৩৩
- ৪ অসীম সোম : 'চলচ্চিত্র সমীক্ষা' / সম্পাদনা-মৃগাঙ্গশেখর রায়/১৯৮৩, পৃষ্ঠা-২৩৮
- ৫ 'সূচনা' চলচ্চিত্র প্রথম পর্ষয় / সিগনেট প্রেস-১৯৫০
- ৬ প্রভাতকুমার দত্ত : 'চলচ্চিত্র : স্মরণীয় দৃষ্টা' / মন্ডল বুক হাউস/১৯৬৭
- ৭ মহাশ্বেতা দেবী : এক্ষণ শারদীয় সংখ্যা-১৯৮৫
- ৮ চিত্রপঞ্জী : তৃতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, ১৩৪০
- ৯ ওই : ওই ষষ্ঠ সংখ্যা, মাঘ ১৩৪০

উপকূলবর্তী পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বিলুপ্ত প্রায় কিছু আঞ্চলিক শব্দ

অসীমকুমার মাম্বা

আরণ্যক গুহাবাসী মানুষ ইশারা ছেড়ে একদিন মুখে শব্দ করতে শিখেছিল, হাজার হাজার বছরের চেষ্টা ও অভ্যাসে তারা সেই শব্দকে বিশেষ মাত্রা দিয়ে অর্থবহ করে তুলেছে। তাই, শব্দ উচ্চারণে নির্দিষ্ট কোনও কিছুকে নির্দেশ করা যায়। আবার, বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীর মানুষ ভিন্ন শব্দের উচ্চারণে একই জিনিসকে বোঝায়। যেমন—আমরা বলি ইঁদুর—সাহেবরা বলে র্যাট (Rat), হিন্দিভাষী মানুষরা বলে 'চুহা', উৎকলের মানুষ বলে 'মুশা'।

ভাষা-তাত্ত্বিকদের মতে বিশেষ কিছু ভাষা থেকে অন্যান্য ভাষার সৃষ্টি হয়েছে। যেমন—সংস্কৃত ভাষা বহু ভাষার জননী। একইভাবে বাংলাভাষা নানাভাবে পরিবর্তিত হয়ে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা সৃষ্টি করেছে। একইভাবে খেজুরীতেও বাংলা শব্দ স্থানীয় উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যে নানাভাবে পরিবর্তিত হয়ে তৈরি করেছে নিজস্ব স্থানীয় ভাণ্ডার। বিশ্লেষণে দেখা যায় স্বরাগমের ফলে অসংখ্য ধ্বনি পরিবর্তিত হয়েছে। যথা—কসি>কসিয়া; কাঁচা>কচড়া; মাসী>মাউসী; সতীন>সউতুন; ঘামাচি>ঘামাচিয়া; ধূপচা>ধড়কচা ইত্যাদি। একদিকে যেমন স্বরাগম হয়েছে তেমনি অপরদিকে স্বরলোপের কারণেও বহু নতুন শব্দ সৃষ্টি হয়েছে। যেমন—বিনুনী>বৈগিয়া; ভগিনী>ভঁগ; ছাগল>ছেলি; উর্ধ্বগতি>উর্ধগতি; আ-নোনা>আমা ইত্যাদি। বহু ক্ষেত্রে ধ্বনি রূপান্তরের কারণেও অসংখ্য স্থানীয় বাংলা শব্দের পরিবর্তন ঘটেছে—কনুই>কৈউনী; তোমাদেরকে>তুমানকে; তাদেরকে>তানকে; শ্বাশুড়ী>শাউড়ী প্রভৃতি। সমীভবনের ফলেও বহু শব্দের পরিবর্তন ঘটেছে দেখা যায়—কাঠের মতো (শব্দ)>কাঠুঠুয়া; ব্যাগ (সব)>ব্যাগগা; উষ্মের>উষ্মর। ধ্বনি বিপর্যয়ের ফলেও বেশ কিছু শব্দ পরিবর্তিত হয়ে স্থানীয় রূপ লাভ করেছে। যথা—টিকটিকি>ঝিটপিটি; আছাড়>কাচাড়; একুণি>উক্ষুনি; রিক্সা>রিক্সা; বাস্ক>বাস্ক ইত্যাদি। শব্দের স্থানান্তর বা অপিনিহিতির কারণেও শব্দের পরিবর্তন দেখা যায়, যেমন—এসে>আইসি/আইসিয়া; ইত্যাদি।

নির্দিষ্ট কোনও অঞ্চলের ভাষা সেই অঞ্চলের মানুষের মনের ভাবকে যতটা প্রকাশ করতে পারে, অন্য কোনও ভাষার পক্ষে তা সম্ভব নয়। কিন্তু, কোনও এলাকার ভাষা সেই এলাকার নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে সীমায়িত থাকতে পারে না। অনাদিকাল ধরে চলেছে ভাষার সংযোজন ও সংমিশ্রণ—তথা বিয়োজনও। তবু নির্দিষ্ট কোনও এলাকার ভাষা থাকে অনেকটাই স্থিতিশীল। সেই হিসেবে উপকূলবর্তী এই এলাকায় একসময় পর্তুগিজ রাজত্বের ফলে তারা মিশেছে স্থানীয় মানুষের সঙ্গে। স্থানীয় মহিলাদের সঙ্গে যৌন সম্পর্কের ফলে দিয়ে গেছে সিফিলিস, গনোরিয়ার মতো গোপনীয় রোগ। বহু পর্তুগিজ বৈশিষ্ট্য এখনকার মানুষের রক্তে

এখনও প্রবাহিত। তাইতো আজও আমরা দেখতে পাই নীল চোখের মতো বহু পর্তুগিজ বৈশিষ্ট্য। স্বাভাবিকভাবেই বহু পর্তুগিজ শব্দ স্থানীয় মানুষ আত্মস্থ করেছে এবং সেগুলি এখনও স্বমহিমায় অবিকৃত থেকে কিংবা কিছুটা বিকৃতির মধ্যেও উচ্চারিত হয়, যথা—ঝরোখা-ঝুরকা, চিরাগ <চেরাক, পের্পঅ<পের্পে; প্রেগ<পেরেক<পেরোক ইত্যাদি। মুঘল রাজত্বকালে, শাহসুজা ছিল স্থানীয় সুবেদার। সুবেদারের সেনাবাহিনী ও লোকজনের সংস্পর্শে বহু উর্দু/পারসি শব্দ স্থানীয় লোকমুখে সঞ্চারিত হয়েছে, যেমন—মাড়-ই<মাড়া; কুঁই<কইলাড়ী/কইনাড়ী ইত্যাদি। আবার দীর্ঘদিন ইংরেজ শাসনের ফলে বহু ইংরেজি শব্দ বিকৃত বা অবিকৃতভাবে স্থানীয় শব্দভাণ্ডারে স্থান করে নিয়েছে, যেমন—চিট(cheat)<চিটিংবাজ। বর্গী আক্রমণের কালেও বর্গীদের বহুশব্দ ঢুকে পড়েছে স্থানীয় শব্দভাণ্ডারে।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ও তার কিছু পরে বিভিন্ন সময়ে সাঁওতাল, মাঝি, মুন্ডা, শবর প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর মানুষ বিভিন্ন কারণে এখানে এসেছে এবং তাদের কেউ কেউ থেকে গেছে স্থানীয় বাসিন্দা হয়ে। তাদের মুখের ভাষা ক্রমে বিস্তার লাভ করেছে নিজেদের গোষ্ঠী থেকে স্থানীয় এলাকার মানুষের মুখে মুখে। এইভাবে অসংখ্য অষ্ট্রিক/মুন্টারি শব্দের খোঁজ মেলে, যেমন—পাতা (মেলা), হিট্‌মা (হিটিম=কচ্ছপ। হিটিমের মতো নিশ্চল বা ধীর গতি বোঝাতে), কুঁকড়া ইত্যাদি। এছাড়াও পার্শ্ববর্তী রাজ্য ওড়িশার মানুষজনের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক ও অন্যান্য নানা কারণে ‘মাউসী’, ‘মাউগ’, ‘আজা’, ‘আই’ প্রভৃতি অসংখ্য শব্দ সংযোজিত হয়েছে স্থানীয় শব্দ ভাণ্ডারে। এলাকার মুঁড়াকাটি ডুস্বামী ও জমিদাররা জঙ্গল কেটে তাদের সীমানা বিস্তার ও ফসলের জমি তৈরির কারণে বহু হিন্দুস্থানী/বিহারি জন মজুর নিয়োগ করেছিল। সেঠেল, মেথর ও অন্যান্য কাজের জন্যও তাদের এনেছিল, পলে তাদের বহু শব্দগুচ্ছ স্বাভাবিক ভাবেই স্থানীয় লোকভাষায় স্থান পেয়েছে, যথা—দোবারা, পাঁড়ে, পানি প্রভৃতি। কিন্তু শহরে সভ্যতার আগ্রাসনে ইদানীংকালে গ্রামাঞ্চলের মৌখিক ভাষার বহু পরিবর্তন ঘটেছে।

দক্ষিণবঙ্গের পূর্ব-মেদিনপুর জেলার উপকূলবর্তী একটি এলাকা খেজুরী যা একসময় ছিল দ্বীপভূমি। এই এলাকার মানুষের নির্দিষ্ট লোকভাষা ছিল। কিন্তু, দশ-পনেরো বছরের মধ্যে খেজুরীর লোক সাধারণের মুখে যে সব শব্দ ব্যবহৃত হচ্ছে, তার সঙ্গে খেজুরীর কয়েকশো’ বছরের ভাষার ঐতিহ্যের ফারাক বিস্তর; হঠাৎ করে কেমন যেন—রাত দুপুরে আঁধার রাতে ঘাড়ের কাছে ভূতের নিঃশ্বাস ফেলার মতো শহরের সংস্কৃতি বিকৃত হয়ে, যেন কোন যাদুবলে গ্রামের সংস্কৃতির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। গ্রামের সহজ-সরল মানুষগুলো তাদের আঞ্চলের মাতৃভাষা ফেলে রাতারাতি অত্যাধুনিক হতে চেয়ে আঞ্চলিক ভাষার মিশ্রণে বাংলাভাষার বিকৃত উচ্চারণে পরঙ্গম হয়ে উঠতে লাগল। আঞ্চলিক ভাষা ও সংস্কৃতির এবং ঐতিহ্যের চরম দুর্দিন এসে হাজির হয়েছে বলে মনে হয়। তাই চাষি-বাসী আমজনতার মুখ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে বহু আঞ্চলিক শব্দ। পরবর্তী প্রজন্ম হয়তো বা সেসব শব্দ আর কোনোদিনও শুনে পাবে না। নাইবা শুনুক, তবু তাদের হয়তো বা কারু কারু অনুসন্ধিৎসা প্রণেয় জন্য সেরকম কিছু শব্দের তালিকা এবং তার ব্যবহার উল্লেখ করা হল।

অসংখ্য স্থানীয় শব্দ রয়েছে, কিন্তু, আলোচনার সুবিধার্থে এক একটি বিষয় ধরে কেবলমাত্র ৯টি বিষয় সংক্রান্ত এবং পরিশেষে বিবিধ বিষয়ক মিলে মোট ১০ টি বিষয়ের প্রত্যেকটি কুড়িটি করে উদাহরণ সহ ব্যবহার উল্লেখ করা হল। ব্যবহার উল্লেখ করার ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রবাদ, ছড়া,

ধাঁধা প্রভৃতি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। সেইসঙ্গে কিছু কিছু শব্দের উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে উল্লেখ করা হল। শব্দগুলির অধিকাংশই স্থানীয় শব্দ। কেবলমাত্র বিদেশি বা বহিরাগত শব্দগুলি চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

উদ্ভিদ বিষয়ক

আলতি—	কচু। মুন্ডারি শব্দ। কাঁচা তেঁতুল দিয়ে আলতির টক খেতে পছন্দ করে মেদিনীপুরের লোকজন।
কইলাড়ি, পাতলা, কুই—	শালুক ফুল বা শালুক ফুলের লম্বা বোঁটা। কুই (পারসি) >ক'ই>কই; নাড়ি (অন্ধ)>লাড়ি। কইলাড়ি। কইলাড়ি/কইনাড়ি<কন্নাড়ি<কহ্নার (সংস্কৃত)। 'গো-মা পূর্ণিমায়' কইলাড়ি ফুল দিয়ে গোরুর পুজো করা হয় মেদিনীপুরে।
কান্না—	করলা বা উচ্ছে। মুন্ডারি শব্দ। গরমকালে আলু, বেগুনের সঙ্গে 'কান্না-চচ্চড়ি' ভালো লাগে।
কঁচড়া—	অতি কাঁচা। 'কঁচড়া' বোয়ের কুল খেতে কষা লাগে।
খঁউস—	আঁটি। আমে 'খঁউস' না হলে আমসি ভালো হয় না।
শুমুক—	তরমুজ জাতীয় একপ্রকার আগাছার ছোটো ফল। শুমুকের শাঁস বের করে তার মধ্যে জোনাকী পোকা ঢুকিয়ে আমরা ছোটোবেলায় মশারির চাদোয়ায় রাখতাম 'নাইট ল্যাম্প' হিসাবে। শুমুক এখন বিপন্ন উদ্ভিদ।
টুমোর কঁড়ি—	অড়হর। দক্ষিণবঙ্গে এখন টুমোর চাষ হয় না।
ননীতরী; পুরুল—	ধুন্দুল। দক্ষিণবঙ্গে 'ননীতরী' কেউ চাষ করে না, আগাছা হিসেবে বোপে-ঝাড়ে জন্মায়। 'পুরুল ছাল' (ধুন্দুলের খোসা) গায়ে সাবান লাগানোর কাজে ব্যবহৃত হয়।
পঙ্গালি—	গাছের গোড়া থেকে মাটি ভেদ করে বেরনো চারাগাছ। ধান গাছের 'পঙ্গালি' বেরিয়ে বাড়ি হয়।
পুয়া—	চারাগাছ। পুত্র>পুত>পুয়া। 'বামন ছুয়া বেগুন পুয়া, রাত পুইলে ছকাছুয়া।'
পেদুর—	পেয়ারা। পেদুর<পেদর (পর্ভুগীজ)। 'টকা-ছ্যাকা (ছেলেপুলে) কসি পেদুর খায়।'
পাঁড়ুয়া—	পরিণত চালকুড়োর গায়ে জন্মা সাদা পাউডার। পাঁড়ুয়া পড়া কাখুরের (চাল কুমড়োর) তরকারি খেতে ভালো লাগে না।
বাটিয়া দড়ি—	পাটের দড়ি। পাট>পাটিয়া>বাটিয়া। 'এক সময় খেজুরীর ঘরে ঘরে বাটিয়া দড়ির দুলি (দোলনা)-র চল ছিল।'
বায়ালু—	শূর্যের আলু। বামাবর্ত লতার আলু<বায়ালু (স্থানীয়ভাবে সৃষ্ট শব্দ)। বায়ালুর চাষ করে না কেউ, বনে-জঙ্গলে জন্মায়।

রসালু—	শাঁকালু। মুন্ডারি শব্দ। ‘রসালুর ভাই চিনালু’। অর্থাৎ, চিনোতদারের ভাই বটে।
রায়া—	ডাঁশা। পাকা পেয়ারার চেয়ে ‘রায়া’ পেয়ারার স্বাদ ভালো।
লোদ—	শাঁস। দেশি আমের চেয়ে হিমসাগর আমের লোদ বেশি।
শম্মা—	চিচিঙ্গা—শোলার মতো ফাঁপা। ‘বনকাক শম্মা কুশি খাওয়ার যম।’
সারু—	বিশেষ এক জাতের জলজ কচুগাছ যার ডাঁটা শাক হিসাবে খাওয়া হয়। মুন্ডারি শব্দ। সারু ঘণ্ট গরীব মানুষের প্রিয় খাদ্য ছিল একসময়।
হুঁচকা—	গাছের গোড়া থেকে বেরনো দ্রুত বাড়যুক্ত লম্বা ডালপালা। পরবর্তীকালে উগ্র স্বভাবের ছেলেমেয়ে বোঝাতেও ব্যবহৃত হচ্ছে। ইউক্যালিপটাস গাছ কেটে নেওয়ার পরেও হুঁচকা থেকে কাঠ পাওয়া যায়। হুঁচকা ছেলেমেয়েরা অনেক সময় হঠকারী কাজ করে ফেলে।

প্রাণী বিষয়ক

কুইলি—	কোকিল, কোকিল > কোয়েল > কুইলি। মুন্ডারি শব্দ। ‘কুইলী-পাদা আম গাছে বেশিদিন থাকে না, খসে পড়ে।’
কলাবস্না পাখি বা সুয়াকরাতি—	লেজঝোলা। কলাবস্না বা সুয়াকরাতি পাখির প্রিয় খাদ্য বিভিন্ন পাকা ফল
কাঠা/বালিগড়/ চাঁচড়	সামুদ্রিক কচ্ছপ। হুগলি নদীর মোহনার চরে এখন আর কাঠা বা বালিগড় বা চাঁচড় ডিম পাড়তে আসে না।
কালপুংসা মাছ—	কালবোস মাছ। মুন্ডারি শব্দ। পুকুরে বেশি জাল ফেললে কালপুংসা মাছ পাকৈ মাথা গুঁজে মরে যায়।
কালিয়াখাড়ী—	বাগদা। ‘কালিয়াখাড়ির আঁন’ (মীন) ধরে বহুলোক জীবিকা অর্জন করে।
কুঁকড়া—	মোরগ, মুন্ডারি শব্দ। ‘কুঁকড়ার কুঁকড়ি ধরলে ডিমে তা দিতে বসে।’
খস্লা মাছ—	পারসে মাছ। ‘খস্লা মাছের খস্খসানি, তাউরি মাছের ঝোল।’
গাংকুই—	মৃগেল মাছ। মুন্ডারি শব্দ। কুই-কাতলার চেয়ে গাংকুই মাছের ডিম বেশি হয়।
গোলখাসি—	কচ্ছপ, দক্ষিণবঙ্গে গোলখাসি এখন বিরল প্রাণী।
জিয়া মাছ—	শিঙি মাছ। মাগুর মাছের চেয়ে জিয়া মাছের কাঁটায় বিষ বেশি।
ঝাল বা ঝালা—	দল বা পাল। ‘হওয়া বণির (গুয়ে শালিকের) ঝাল।’ ‘ইলিশ মাছ ঝালায় রয়।’

জ্যামরা কাওয়া—	দাঁড় কাক। মুন্ডারি শব্দ। ডেমরা কাওয়াকে বাসার কাছে দেখলে ফিঞ্জা পাখি ঠোঁকর মেরে নাজেহাল করে।
দামুয়া বা দামা মুসা—	বৃহৎ আকৃতির ইঁদুর। জলার ধারে বা দামে বসবাসকারী। ইঁদুর-দামামুসা 'সাঁওতালরা দামা মুসার মাংস খায়।'
বাইচড়ি—	মাঠ চড়াই। বাই—ছোটো বা অকিঞ্চিৎকর। মুন্ডারি শব্দ। বাই-চ্যাংরা—ছোটো চ্যাংরা বা কাজরী মাছ। বাইচড়ি—ছোটো পাখি বা চড়াই পাখি। 'সব পাখি ধান খায়, বাই-চড়ির নাম যায়।'
বাডুয়া—	কুঁচে মাছ। 'বাডুয়াকে সাপ-ভেবে অনেকে খায় না।'
বিচ—	ডিম (মাছ, কাঁকড়া, চিংড়ি ও কীট-পতঙ্গ প্রভৃতির)। বর্ষাকালে বিঁচালু পুঁটির স্বাদের তুলনা নাই।'
মইষা জৌক—	জলের বড়ো জৌক। মুন্ডারি শব্দ। মইষা জৌক এখন আর দক্ষিণবঙ্গে দেখা যায় না।
শাশুনা—	শকুন। 'কৃপণ আঁটকুঁড়া লোক মরলে ফুল-শাশুনা হয়।'
সমা পুঁটি—	সরল পুঁটি। মুন্ডারি শব্দ। 'পুঁটির রাজা সমা পুঁটি' এখন আর পাওয়া যায় না।
হিটিম—	কচ্ছপ। মুন্ডারি শব্দ। 'হাটিমা-টিম-টিম, হিটিম পাড়ে ডিম।'

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিষয়ক

অঁটা—	কোঁচোড়। নাভি ও কোমরের মধ্যবর্তী স্থান। 'এখন অঁটায় মুন্সি নেওয়ার রেওয়াজ প্রায় নেই।'
আঁউঠ—	হাঁটু। "...কচু বনমে ছিরছিরানি, ধান বনমে আঁউঠে পানি..."
আঁত—	নাড়িভুঁড়ি। বুদ্ধিমান লোকেরা শত্রুকে 'হাতে মারে না, আঁতে মারে।'
কল্লা—	মাথা, 'মারপিট করতে যাই কল্লা চিরি হাঁ।'
কুরুন/কুরুস্ত—	হাইড্রোসিল। 'কুটকুটিয়া মন যার, কুরুস্তিয়া ভাতার তার।'
কুঁখি—	কোমরের ঠিক উপর, নাভির বিপরীত দিক। অর্থাৎ পিঠের দিক। ব্যাপারীরা খাসি কেনার আগে কুঁখি ধরে তুলে মাংসের ওজনের অনুমান করে।
কুমটি—	রগ বা কপোল। 'ঠাণ্ডা লাগলে কুমটি ধিক্ ধিক্ করে।'
ঝাল-ঝাম্টিয়া—	ঝামাচি। 'ঝাল-ঝাম্টিয়া ভালো করার জন্য ছোটোবেলায় আমরা কুইলি সূতা (গুলঞ্চ)-র মালা গলায় নিতাম।'
ঠাট্টা—	কাঠামো। মুন্ডারি শব্দ। মধ্যস্তরে মানুষ ঠাট্টা-সার হয়। মুড়ির ঠাট্টা মাপজোক করে করতে হয়।
ড্যাম্‌রা—	চোখ। অন্যের ভালো দেখলে অনেকেরই ড্যাম্‌রায় অসহ্য লাগে পুকুরে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা পোনা মাছ বাঁচে কিন্তু বোয়াল মাছের ড্যাম্‌রা উন্টে যায়।

ড্যাপ, ড্যাফ—	বুড়ো আঙুলের প্রাপ্ত থেকে তজ্ঞীর শীর্ষদেশ পর্যন্ত দৈর্ঘ্য। কোনও পেনই এক ড্যাপের বেশি লম্বা হয় না।
ঢালা—	চোখ। মুন্ডারি শব্দ। ‘মানুষের ভালো দেখলে অনেকেরই ঢালা ঠিকরায়’ (চোখ খচ্ খচ্ করে বা ঈর্ষা হয়)।
তেলতালু—	মাথার চাঁদি। ‘রোদে তেলতালু ঠিকরি যাওয়ার উপক্রম’। শিশুর জন্মের পরে তিনমাস ধরে তেলতালুতে সরষের তেল লাগানো হয়।
তুঁড়—	মুখ। মুন্ডারি শব্দ। তুন্ড > তুঁড়। ‘শিবের মুড়ে, পুয়াতির তুঁড়ে।’
পেল—	শিশু। “ঘোল হাঁড়িয়ে পেল ঢুকনার দরকার কী?” (অকারণে নাক গলানোর দরকার কি?)
পঁদপিছা—	পাছ। “চিৎ করলে এঁ্যাড়বিচা, উপড় করলে পঁদপিছা।” (নিঃস্ব ব্যক্তি বোঝাতে)।
ফুলবুক—	ফুসফুস। রূপকথার গল্পে রাক্ষসরা মানুষের ফুলবুক ছিঁড়ে খায়।
বেঁউগ—	বাঁও। গদি খেলার প্রতিটি ঘর লম্বা-চওড়ায় এক বেঁউনের কিছু বেশি হয়।
ভাবা—	ভুরু। গ্রামে এক সময় ‘ভাবাছিঁড়া খেলা’ খুব জনপ্রিয় ছিল।
তুঁকুড়—	মুণ্ডাঘাত। “এক তুঁকুড়ে শিরদাড়া খাঁচি দিবা (টান টান করে দেব)।”

সম্পর্ক সম্বন্ধীয়

আইমা—	দিদিমা বা মায়ের মা। মুন্ডারি শব্দ। ‘আইমাকে প্রসব শিখাতে হবে না।’
আজা—	দাদু (মায়ের বাবা)। মুন্ডারি শব্দ। ‘মামু ঘর যা আজা ঘর তা।’
আঁড়ি-পাঁড়ি—	পিঠো-পিঠি। ‘আঁড়ি-পাঁড়ি ভাই-বোনের মধ্যে সব সময় খিটি-মিটি লেগে থাকে।’
কোড় পুছা—	সর্ব কনিষ্ঠ। ‘কোড় পুছা টকার (ছেলের) আদর বেশি।’
কানার মা—	গর্ভবতী রমণী। ‘বাংলার ঘরে ঘরে কানার মা-কে স্বাদ খাওয়ানোর রীতি আছে।’
খৈতা—	স্বামী। গুড়িয়াশব্দ। ‘খৈতা নাই ঘর, যা খুশি তা কর।’
ঢেম্ণী—	রক্ষিতা। একসময় বাংলার মধ্যবিস্তৃত মানুষরাও ‘ঢেম্ণী’ রাখত।
পড়ুয়া—	প্রথম সন্তান। ‘আগে হত, কিন্তু, এখন পড়ুয়া পূজার চল নাই।’
পড়িলাতি—	নাতির ছেলে। খুব কম লোকেরই ‘পড়িলাতি’ দেখার সৌভাগ্য হয়।
পুতরা—	ভাইপো বা বোনপো। ‘পো-পুতরার তফাত কি?’
বাঁয়াণী—	কম বয়সী মেয়ে। ‘তুমাহারে বাঁয়াণী কি রাঁধা-বাড়া শিক্চে (শিখেছে)?’

ভাউজ—	বৌদি বা ভাদ্র-বৌ। ‘দেউর (দেওর) ভাউজের সম্পর্কতো বন্ধুর মতো।’
ভঁন—	বোন বা ভগিনী। ভগিনি>ভগ্নি>ভঁণ। যেমন ভাই, তেমন ভঁণ।
ভাঁজী—	ভায়া, ভাঁজা ভাঁজী হয়ে গেলে বোন বা দিদির গুরুত্ব কমে যায়।
ভেঁণী—	ভগ্নিপতি। ‘শালা, ভেঁণী, শোশরা, যামী (যামাই) তাল তলাদি যায়, তিনটিয়া তাল পড়ি আছে সমান ভাগ চায়।’
মাইপো—	স্ত্রী। ওড়িয়া শব্দ। ‘টকা ছ্যাকা (ছেলেপুলে) নাই, নির্ঝাট মৈতা-মাইপোর (স্বামী-স্ত্রীর) ঘর।’
মাউগ—	মাগ বা স্ত্রী। ‘মাউগ ধুমসা, ভাতার মুসা (ইঁদুর)।’ (বেটপ মোটা-সোটা স্ত্রীর রুগ্ন ও বেঁটে স্বামী বোঝাতে ব্যবহৃত হয়)।
শোড়ু—	ভায়রা ভাই। ওড়িয়া শব্দ। ‘বাপের শড়ু ছেলে-মেয়ের মেসোমশায় হয়।
সাই-পোড়সা—	সাই<শাহী—পাড়া (ওড়িয়া শব্দ), পোড়সা>পড়সী—প্রতিবেশী (ওড়িয়া)। পাড়া-প্রতিবেশী। ‘সাই-পোড়সা নাই যেটি ঢাম দেখিবু সেটি।’ (অর্থাৎ যেখানে প্রতিবেশী নেই সেখানেই মিথ্যা গরব দেখানো যায়)।

আচরণ-সংক্রান্ত

আলুয়া—	অগোছালো। আলুয়া মা’র আলুয়া টকা-মাইঝি।
উদ্মা—	ল্যাংটা। গ্রামের অধিকাংশ ছোটো ছোটো ছেলে মেয়ে ‘উদ্মা হয়ে’ মান করে।
উদগতি—	>উর্ধ্বগতি—উন্নতি। খাদ্য ও ভিটামিনের অভাব হলে শিশুদের শরীরের উদগতি দেখা যায় না।
ঔঁাড়রাকাটা—	অকর্মণ্য। কিছু কিছু লোক কাজকর্ম করতে চায় না, সবসময় ‘ঔঁাড়রা কাটা’ হয়ে ঘুরে বেড়ায়
কঁপরামুয়া—	গোমড়া মুখো। কঁপরামুয়া বউর প্রতি সংসারের কেউ সন্তুষ্ট হয় না।
খাউল খাউল—	দুরু দুরু। ‘পরীক্ষার ফল বারিবার দিন ‘টকা-ছ্যাকার’ (ছেলে-পুলের) বুক খাউল খাউল করে।’
গ্যানসা—	অপরিচ্ছন্ন। ‘গ্যানসা লোকের গায়ে খোস-পাঁচড়া হয়।’
চহরম—	অকারণ তেজ। ‘পুলিশের মাউগের চহরম বেশি।’
ডম্পট—	দুষ্ট ও চিটিংবাজ। ‘বেশির ভাগ মধ্যস্থ (ঘটক) ডম্পট হয়।
থির—	স্থির, মুস্তারি শব্দ। ‘থির মুয়ানী (যার মুখ স্থির থাকে) খাই যায়, খোচ্ড় তুঁড়ি (যে অধিক কথা বলে)—র নাম যায়।’

- পটিঙ্গা— ভাব বা অন্তরঙ্গতা। রামের সঙ্গে সুগ্রীবের ‘পটিঙ্গা’ না হলে
সীতা উদ্ধার হত না।
- পালাধড়কি— যে বৌচকা-বুঁচকি সহ পালায়। ধোকড় (বৌচকা-বুঁচকি)
>ধকড়ি>ধড়কি। (শ্বশুর বাড়ি থেকে পলায়ন প্রবণ মহিলা)।
‘পালাধড়কী ম্যায়ার সম্মান শ্বশুর ঘরেও নাই, বাপের ঘরেও
নাই।’
- ফরিখেলা— পায়তারা কসা। ‘খলনায়ক অনেক ফরিখেলা দেখিয়ে শেষে
ধরা পড়ে।’
- বানুয়া কাঙালি— বন্যাপীড়িত খাদ্যাভাবে কাঙাল। এমন ভোজবাড়িতে বানুয়া
কাঙালির মতো অবস্থিত লোকের ভীড় হয় না।
- রিসালি— ঈর্ষাপরায়ণা। ‘রিসালী মেয়ের কোনও কিছুতে সুখ নেই।’
- লট-পটিয়া— মাখামাখি ভাব বা শারীরিক অসামর্থতার জন্য জবুথবু ভাব।
চচ্চড়িতে বেগুন না দিলে লটপটিয়া হয় না। ‘কার্তিকারান্তি’
চালের লট-পটিয়া ফ্যান ভাত খেতে খুব সুস্বাদু। ‘ছোটো
পরিবারের লট-পটিয়া পুয়াতিকে সংসারের কাজ করতে হয়।’
- সাঁজাল-ঠিকরা— সাঁজাল বা চিতাতে তুলে দিলেও যে ছিটকে বেরিয়ে উঠে
আসে, অর্থাৎ খুব দজ্জাল। সাঁজাল ঠিকরা মেয়ের পক্ষে শ্বশুর
ঘর করা কষ্ট।
- হা-কাঙালি— অতিরিক্ত কাঙাল পনা স্বভাবের ব্যক্তি। ভোজ বাড়িতে হা-
কাঙালিদের দেখা মেলে না এখন।
- হিমতিয়া— শক্তিশালী ও সাহসী। অনুশীলন দলের হিমতিয়া ছোঁকরা সব
খেজুরীতে থানা পোড়ানোর অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল।
- হিরপিত্তি— আড়ি। কেমোর এমন ‘হিরপিত্তি’ বারে বারে ছুঁড়ে ফেলতেও
কিছুক্ষণ বাদে বেয়ে বেয়ে একই জায়গায় এসে হাজির হয়,
‘সম্ভবত সহজাত প্রবৃত্তির (instinct) কারণে।’

ঘরবাড়ি ও জমি-জমা বিষয়ক

- আঁটা— বেড়া। কুমালি শব্দ। ‘লোক আঁটাধারে খামালু লাগায়।’
- আঁধারি— চাল ছাওয়ার ছোটো খড়। খড়ের চাল ছাওয়ার জন্য লম্বা ও
আঁধারি খড়ের প্রয়োজন হয়।
- উলিতল— যেখানে খড়ের চালের জল পড়ে। উলিতলে কোনও কিছু
রাখতে নাই।
- কাঁথড়া— পোড়ো বাড়ির উঁচুভূমি। মুন্ডারি শব্দ। কাঁথড়ায় মাছরাজা পাখি
গর্ত করে বাসা বাঁধে।
- কাঁথনিমু— মাটির ঘরের অসমাপ্ত মাটির দেওয়ালের শীর্ষভাগ, সেখানে

- কোনও কিছু রাখা যায়। গ্রীষ্মকালে কাঁথনিমুয়ে পাখিরা তুলে
রাখা হয়।
- কুঁন্দোর খোল—মাটির ঘরের গোপন-সংকীর্ণ স্থান। অতীতকালে গ্রামের লোকজন
বাড়ির বাসন-কোসন কুঁন্দোর খোলে লুকিয়ে রাখত।
- গাঢ়া—গর্ত, খাল বা ছোটো নদী। মুন্ডারি শব্দ, বোষ্টমরা গাঢ়া খুলে
মৃতদেহ কবর দেয়।
- গেরা-গাঁথুনি—পাড়া ইট-কাদার বোর দিয়ে, গাঁথা। এখন আর লোকে গেরা-
গাঁথুনি-বাড়ি তৈরি করে না।
- ঘাই—সংকীর্ণ স্রোতপথ বা ছোট নদী। কোলীয় শব্দ। বর্ষাকালে গ্রামের
রাস্তায় অনেক ঘাই পেরিয়ে যেতে হয়।
- ছামড়া—অস্থায়ী কাঠামো। মুন্ডারি শব্দ। মেলাতে ছামড়া বেঁধে দোকান
সাজানো হয়।
- ছিটাবেড়া—বাঁশের কঞ্চি বেড়া করার মতো সাজিয়ে মাটি জাব করে দুধারে
ছিটে (ছুঁড়ে ছুঁড়ে) বেঁধে দেওয়াল তৈরি হয়। ছিটাবেড়ার কাঁখে
চোর সিঁধ দিতে পারে না।
- ঝুরকা—জানাল। ঝুরকা-ঝুরকা-ঝুরোকা। পর্তুগীজ শব্দ।
- টিপা—বাস্তব। মেদিনীপুরের বহুলোক টিপা-বাড়ি বিক্রি করে লাটে
গিয়ে বসবাস করে।
- পগার—প্রাচীর-প্রাকার-পগার। ফার্সী শব্দ। গৃহস্থের ঘুম থেকে জেগে
ওঠার আগেই চোর পগার পার।
- পটচালা—অস্থায়ী খড়ের চালা বিশেষ। অতি গরীব মানুষরা পটচালা ঘরে
বাস করে।
- পড়িয়া বা পড়িহা—উঁচু পোড়ো জমি। মুন্ডারি শব্দ। 'আগে আড়িয়া পড়িয়ায় অনেক
বুনো ওল জন্মাতো।'
- পাউচি—সিঁড়ির ধাপ। সিঁড়ির সব পাউচি সমান হওয়া দরকার।
- হানা—নদীর পাড় বা খালের বাঁধের ভাঙন। মুন্ডারি শব্দ। বর্ষাকালে
মাঠের অতিরিক্ত জল হানা দিয়ে নদী বা খালে বের করা হয়।
- হাঁইশাল—রান্না ঘর। 'হাঁইশাল ঘরের খড়ের চালে ধোয়ার জন্য চড়াই
পাখি বাস করে না।'
- হাঁসিয়া—মাটির ঘরের বাইরে দেওয়াল সংলগ্ন স্থান। প্রতি বছর বর্ষা
শেষে হাঁসিয়া ধারে মাটি দেওয়া দরকার।
- আসবাবপত্র বিষয়ক
- আমলা হাঁড়ি—ঘরের কোণে সিকাতের ঝুলিয়ে রাখা মাটির হাঁড়ি—যার মধ্যে
খাকতো গুট, পিপুল, চাটর সিঁদুর, কমলা খোসা, ডালিম খোসা,

	বাই-বিড়িং ইত্যাদি মুষ্টিযোগ চিকিৎসার সামগ্রী। “সে ঠাকুমা-দিদিমারাও নেই, আমলা হাঁড়িও আর নাই।”
উলিয়া—	খড়ের তৈরির মুখবিহীন শম্যাধার। ‘উলিয়াতে বীজধান রাখার রেওয়াজ এখন নেই।’
কামড়ি—	চ্যাপ্টা লাটাই বিশেষ। কামড়িতে এখন আর কেউ সুতো গুটিয়ে রাখে না।
কোলোপ—	তালা। কোলোপ<কুলপ। পত্নীগিজ শব্দ।’ আগে সিঁধ কেটে চুরি হতো, এখন কোলোপ ভেঙ্গে চুরি হয়।’
গিনা—	তেল বা আলতা ইত্যাদি রাখার খুব ছোটো বাটি বিশেষ। মুস্তারি শব্দ। তেল গিনায় অতিথিকে তেল মাখতে দেওয়ার রীতি ছিল।
চুম্বকি—	পিতল বা কাঁসার তৈরি ঘাটি এবং প্লাসের মাঝামাঝি আকৃতির জল খাওয়ার পাত্র বিশেষ। চুম্বকি ভর্তি দুধে বিড়াল মুখ দিল।
ছটাকী—	এক ছটাক পরিমাণ তেল মাপার জন্য কিছুটা ঘণ্টের মতো আকৃতি বিশিষ্ট মাটির পাত্র বিশেষ।
জাউলিয়া—	বড় মুখ এবং ডিম্বাকৃতি সরু পেছন বিশিষ্ট ৪-৫ সের গুড় রাখার মাটির পাত্র বিশেষ।
বীজরা বা জিঞ্জরা<জিঞ্জির—	শিকল। লোহার বীজরা দিয়ে জাহাজ বাঁধা হয়।
টাউক—	সরষের তেল মাপার জন্য বাঁশের কাঠির হাতলযুক্ত তালের বীজের অর্ধেক অংশ দিয়ে তৈরি পাত্র বিশেষ। এখন টাউকে তেল মাপা হয় না।
ঢারা—	শন বা পাটের দড়ি তৈরির জন্য কাঠ ও বাঁশের কঞ্চি দিয়ে তৈরি স্থানীয় যন্ত্র বিশেষ যা প্রায় প্রতি বাড়িতেই ব্যবহৃত হত।
ধাউড়ি—	হেঁসাতি ঘাসের তৈরি প্রায় এক হাত চওড়া এবং ২০-২৫ হাত লম্বা ঠাটাই বিশেষ যা অনুষ্ঠান বাড়িতে পঙ্কুস্তি ভোজনের আসন হিসাবে ব্যবহৃত হত।
ধাবোড়—	বাঁশের বাখারি দিয়ে তৈরি দরজার পাল্লার মতো ধান ঝাড়ানোর আসবাব।
পাউল—	সামিয়ানা বা পাল বা কাঠের গুড়ির নির্দিষ্ট দিক। ‘অনুষ্ঠান বাড়িতে পাউল টাঙিয়ে নিমন্ত্রিত লোকজনকে খাওয়ানো হত।’ ‘পাউল টাঙালে নৌকা জোরে ছোটো’। ‘কাঠ চেরার সময় ঠিকমতো পাউল না ধরলে চেরা কষ্টকর হয়’।
পালোয়ারি—	কানা উঁচু কাঁসার থালা। গৃহস্থ বাড়িতে পালোয়ারিতে পাস্তাভাতে জল ঢেলে খাওয়া হত।
বোজনা দড়ি—	খড়ের তৈরি মোটা দড়ি বিশেষ। বোজনা দড়ি দিয়ে উলিয়া তৈরি হয়।

বৌনিয়া—	খড়ের তৈরি বিনুনী বিশেষ। এক এক প্রান্তে আগুন জ্বালিয়ে চাষবাসের সময় মাঠে কিংবা ঘরে আগুনের প্রয়োজনে সারা রাত-দিন আগুনের সংস্থান রাখা হত। “পারেনি বুড়া ভোরই উঠে, লুকা-বেনিয়া লি (নিয়ে) ডব-কে (মাঠে) ছুটে।”
লুটি—	খড়ের তৈরি দড়ি বিশেষ। খড়ের লুটি দিয়ে পুকুরের তেপাতি বা ক্ষুদি পানা এক জায়গায় জড়ো করে তোলা হয়।
সানকি—	কাঁসার তৈরি কানা উঁচু ছোটো থালা। ৩০-৪০ বছর আগে ঘরামী বা খড়ের চাল-ছাইতে আসা লোক গৃহস্থকে প্রথমে জিজ্ঞেস করত, “ঘরর ঘুম না সানকি পাতা?” অর্থাৎ বৃষ্টিতে জল না পড়ার মতো মোটা করে কিংবা বৃষ্টির সময় জল পড়লে জল ধরার পাত্র বসাতে হবে এমন পাতলা করে খড় দিয়ে ছাইবে।
সুডুঙ্গি—	জাল বোনার সুঁচ বিশেষ। সুডুঙ্গিতে সুতো ভরে জালের ফাঁস বোনা হয়।

ক্রিয়াপদ বাচক

অলান—	নামা। ‘কাজে অলান সোজা, ঘুরি আইসা কষ্ট।’
অস্রানা—	ঠেলে দেওয়া বা ধাক্কা মারা বা সজোরে মারা। ‘টেকিয়ে ধান কুটার সময় বউড়ি সব পাড় দেয়, শাউড়ি গড়ে অসরায়।’
আউটানা—	ফুটানো। ‘পেট ভালো নাই কাঞ্জি আউটিবু কার জিনে’। অর্থাৎ নিজের পেট ভালো না থাকলে কাঞ্জি ফুটানো নিরর্থক।
আউজি-যাওয়া—	ঠেসে যাওয়া। ‘সন্ধ্যাবেলা ভূতের গল্প শুনতে শুনতে নাতি-নাতনীরা ঠাকুমার গায়ে আউজি যায়।’
কাচাড়—	আছাড়। মুভারি শব্দ। ‘ধোপা কাঠে কাপড় কাচড়ায়,’ বর্ষাকালে কাদা রাস্তায় হাঁটার সময় কাচাড় খাওয়ার ভয় থাকে।
কেচরি যাওয়া—	কাদা বা নোংরা ইত্যাদি ঝেঁটে-চট্কে যাওয়া। ‘গ্রামে গ্রামে নেতার অভাব নাই, তবু বর্ষাকালে রাস্তাঘাট কেচরি রয়।’
ক্যালান—	খোসা ছাড়ানো। ‘কলা কোলি দিলে সকলে খাইতে পারে।
খাঁকা—	আচড়ানো (চুলের ক্ষেত্রে)। শিং-এর পানিয়ায় (চিরুনি) মাথা খাঁকা ভালো।
খাঁচা—	টেনে ধরা (কাছি দড়ি ইত্যাদি)। নৌকায় পাউল খাঁচা কষ্ট।
ঘটকানি—	মরার আগে আই-চাই করা। অনেক আগে মানুষের ঘটকানি আরম্ভ হলে তুলসী তলায় শোয়ানো হত।
ঘিনা—	বহন করা বা সঙ্গে নিয়ে বেড়ানো। ‘ঘিন তা ঘিনা, কাজ শুধু টকা (শিশু) ঘিনা।’

চহল বাঁধা—	সকলে একসঙ্গে উঁচৈস্বরে কথা বলা। ‘সকলে চহল বাঁধলে কারু কথা শুনা যায়নি।’
ছুঁড়া—	বিকৃত করা। ‘ক্লাসে ফেল করে মুখ ছুঁড়ে বসে থাকা’।
দিশাকাটা—	দেখতে পাওয়া। ‘ছানি পড়লে চোখে ভালো দিশা কাটেনি।’
পশা—	টোকা। ‘বেড়া দি (দিয়ে) বাগানে ছাগল পশা বন্ধ করা যায়নি।’
বুলা—	‘মাউগ ভাতারের মধ্যে সন্দেহ পশলে সংসার টিকে নি।’
মোজরি যাওয়া—	অলসভাবে দিন যাপন বা ছোটো ছেলে-মেয়েদের খেলা। ‘বুলা সই বেগার খাটা।’ ছোট ছোটো ছেলে-মেয়েরা পাড়ায় বুলে।
	প্রস্তুতি বা পরিপক্ব হওয়ার পরে বিমিয়ে যাওয়া। ‘জবায়ুল সম্ম্যাবেলা মোজরি যায়।’ ‘মোজরি গেলে তরমুজ বেশি মিষ্টি হয়।’
সই করা—	সমান করা বা ঠিকঠাক করা। বিছানার চাদর সই করে পাতলে ভালো লাগে।
সাপা করা—	পরিষ্কার করা। মুন্ডারি শব্দ। সুন্দরবনে জঙ্গলে সাপা করে এখন অনেক বসতি হয়েছে।
হাইরোল—	পরশ্রী কাতরতায় দীর্ঘশ্বাস বা হাছতাশ। ‘একজন লটারি পেলে পাশাপাশি নম্বরের অনেকের হাইরোল পড়ে’।

বিশেষণ বাচক

অঞ্জড়—	কোনও কিছুর জন্য অপরিচ্ছন্ন হয়ে থাকা। অধিকাংশ অবিবাহিত লোকের ঘর অঞ্জড় হয়ে থাকে জিনিসপত্র গোছ গাছের অভাবে।
অলার ভোর—	ওলি জাগা ভোর বা অতি ভোর। অলার ভোরে উঠে আমরা করবলি (কবরী) ফুলের মধু খেতে ছুটতাম।
আইগিনা—	বিস্বাদ। ‘তেল-মশলা বিহীন তরকারি আইগিনা লাগে।’
আঁড়িয়া অঁওতা—	ষাঁড়ের মতো তেজ ও ক্রোধ। আঁড়িয়া-অঁওতার জন্য কোর্ট-কাছারি করে বহুলোকের জমি-জিরাত গেছে।
উখলা—	তেলবিহীন। মুন্ডারি শব্দ। ‘উখলা মাথায় স্নান করলে চুল কটা হয়।’
এঁাড মাছি—	এঁাড—অন্তকোষ। কুকুরের অন্তকোষে ও পেটে বসা মাছি, যাকে বারে বারে কুকুর তাড়াতে চাইলেও পুনরায় এসে বসে। অর্থাৎ তুচ্ছার্থে নাছোড়বান্দা।
কিন্দ-কিন্দিয়া—	স্কীণা। ‘চৌপলের আলো কিন্দ-কিন্দিয়া’।
কুলকুলিয়া; টু-টুয়া, রদরদিয়া—	ভরপুর (দুপুর)। টু-টুয়া খরাবেলা টকা ধরার (ছেলেধরা) ভয়ে ছোটোবেলায় ঘরের বাইরে বেরনোর সাহস পেতাম না।
কাঁকড়োস মারা—	কাঁকড়োস (গিরগিটি) এর মতো রুগ্ন হওয়া। লোকটার রোগ ধরা পড়ছে না, অথচ কাঁকড়োস মারা দশা।

ছনকী—	ঠমকদার মহিলা। ‘ছনকী মাগী কত টকার (ছেলের)’ মাথা খাইছে ঠিক নাই’।
জরকা—	ভেজা ভেজা বা জবজবে হওয়া। কোলীয় শব্দ। ‘জরকা নুনে হাত দিতে বিরক্ত লাগে’।
ঝাঁতুয়া—	অতিবড়ো। ‘ঝাঁতুয়া কোলাব্যাঙা’
তুঁড়পেটা বা কাঁকপেটা—	পেট ভর্তি করে খেলেও যার পেট উঁচু হয় না। ‘তুঁড়পেটা/কাঁকপেটা খাই যায়, লাওয়া পেটার নাম যায়।’
ধুকুড়িয়া—	কঠিন প্রাণ। ‘কই মাছের জাহান (প্রাণ) ধুকুড়িয়া।’
পাঁগিয়া—	তরল পদার্থ বোঝাতে বা পাতলা। সওরের দশকে খেজুরীর বহু মানুষ পাঁগিয়া খুদবাঁটা আর গিরিয়াশাক খেয়ে দিন কাটিয়েছে।
বতুয়া—	ঘন। গরুর দুধের চেয়ে মহিষের দুধ বতুয়া।
ব্যেবসী—	বিলাস প্রিয় মহিলা। ব্যেবসী মায়ার (মহিলার) ছক-ছ্যাকার মা (ছেলেরপুলের) দিকে নজর নাই, নিজে লি (নিয়ে) ব্যস্ত।
ভালাভালা—	একসঙ্গে অনেক ঘুরে বেড়ানো বা ভেসে বেড়ানো। সম্ভবত ভেলা (float)-র মতো ভাসা বোঝাতে শব্দটি ব্যবহৃত হতো। ‘চিতি আমিষ্যায় খালে বিলে চিতি কাঁকড়া ভালাভালা হয়ে ভাসে।’
মুঙ্কামুয়া বা মনুয়া মুঙ্কা—	প্রাণ চাঞ্চল্যহীন। সম্ভবত মুঙ্কের দিকে দৃষ্টিযুক্ত অর্থাৎ মাথা নীচু করে ঝিমিয়ে থাকা বোঝাতে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। ‘এদিকে মুঙ্কামুয়া ওদিকে পালের গোদা’
ল্যাড় কুসিয়া—	লুডকি বেগুনের মত রুগ্ন এবং নিষ্প্রাণ। আজকাল ল্যাড়কুসিয়া টকা ছাকা (ছেলেপুলে) কি করে যে সেনাবাহিনীতে ঢোকে জানি না।

বিবিধ বিষয়ক

সিতান—	শিয়র। সিতান-সিথান। মুন্ডারি শব্দ। ‘শুয়ার সময় মাথা সিতানে টর্চ রাখে গ্রামের মানুষ।’
আখার-বাখার—	প্রাচুর্য। মুন্ডারি শব্দ। ‘যার আছে আখার-বাখার তার আমার কিসের অভাব’।
আঘুয়া—	অকর্ষিত। আঘুয়া জমি লাঙ্গল করা কষ্ট।
উমর বা উম্বোর—	বয়স বা কাল। ‘বাপের উমরে নাইকো দুলি, আজ রইছেন দু’ ঠ্যাং তুলি’।
কাউর—	কামুক। ‘পাতলা মায়ার কাউর বেশি’।
কুয়াট—	চিৎকার। কুয়াট-কুহাট-কোহাট। মুন্ডারি শব্দ। ‘স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস অমাবস্যার রাতে আটেশ্বরের কুয়াট কানে গেলে মৃত্যু সুনিশ্চিত’।

ক্যারাটোল/ক্যারাটুল—	ফুলে গোল হয়ে যাওয়া। ‘আঙুলে ফোঁড়া হয়ে আঙুল ক্যারাটোল’। ‘কিসমিস রাতে জলে ভিজিয়ে দিলে ভোরে ফুলে ক্যারাটুল হয়ে যায়।’
কেঁউচা—	দড়ি পাকানো সময় টান কমবেশি হলে দড়ির এখানে ওখানে গাঁটের মতো ভাঁজপড়া অংশ। কেঁউচা পড়া দড়ি টেকে কম।
ধড়কচা—	ধূপচা বা যা আধসেদ্ধ অবস্থায় থেকে যায় কোনও ভাবে সেদ্ধ হয় না। ‘বেগুন, বিশেষত পালুয়া বেগুন আছাড় খেলে ধড়কচা হয়, খাওয়া যায় না।’
নুনবাড়ি—	নুন মাটিতে জল দিয়ে নুন বের করার গর্ত বিশেষ। লবণ আন্দোলনের সময় খেজুরীতে নুন তৈরির জন্য হাজার হাজার নুনবাড়ি তৈরি করা হয়েছিল।
পুঞ্জা—	গুচ্ছ বা আঁটি। মাগধী প্রাকৃত। এখন তার পুঞ্জাদরে মূল্য বিক্রি হয় না, কিলোদরে হয়।
ফইলা—	প্রশস্ত। ‘বর্ষাকালে গ্রামের জননিকাশি ফইলা রাখা দরকার’।
বাইচার—	নির্দিষ্ট পথে না যাওয়া। ‘হাউলা (এলোমেলো) হাওয়া নৌকা বাইচার করে।’
মা কোল/মাকুল—	পরিপূর্ণ। আলোয় মাকুল। গন্ধে মাকুল।
মুআন—	মোহনা। ‘ফোঁড়া-খাঁড়ির কটালে মুআন ডাকে’।
মুলিয়া—	ধান কুড়ানী (gleaner)। ‘মুলিয়ার ধান না দেখে মাচা (মরাই), বঁড়সির মাছ না দেখে খাঁচা (খালুই)।
মুয়ান্দা—	মুখ অন্ধেরা বা গোধূলি বেলার ঠিক পরে। ‘মুয়ান্দা বেলা গরু গোয়ালে ঢোকানো হয়।’
মেই খুটা—	যে খুটিকে কেন্দ্র করে পতুলের গরু ঘোরে। ‘এখন মেশিনে ধান ঝাড়ানোর জন্য সেই খুটা পুঁতে পল মাড়াতে হয় না’।
রসড়—	জাড় বা শীত। ‘রোগা মানুষের রসড় বেশি’।
লই—	নদী। মুন্ডারি শব্দ। ‘লই পারিলে কুমীর শালা’।

বিস্মৃত বৈভবের কথা : বাংলার শিল্প ও সংস্কৃতিতে কামতাপুরের অবদান

মলয়শঙ্কর ভট্টাচার্য

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলার রাষ্ট্রীয় তথা রাজনৈতিক বিভাগগুলির বেশিরভাগ সাম্প্রতিককালে প্রায় অপরিজ্ঞাত। গৌড়, পুন্ড্র, বরেন্দ্রী, রাঢ়, সমতট, বঙ্গ, হরিকেল, মল্লভূমি, দণ্ডভুক্তি, কামতা, পট্টিকেরা প্রভৃতি শব্দের অধিকাংশ অধুনা প্রচলিত অভিধানগুলিতেও দৃষ্টিহীন। একথাও উল্লেখ করা দরকার প্রাচীন ও মধ্যযুগে এই রাজনৈতিক বিভাগগুলি সর্বদা একই সঙ্গে প্রচলিত ছিল না। এই বিভাগগুলির রাজনৈতিক সীমার অদলবদল ঘটত রাজনৈতিক কারণেই। কখনও বৃহৎ রাজনৈতিক শক্তির অভ্যুত্থান ঘটলে বিভাগগুলি একীকৃত হয়ে একটি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ হত। যেমন পালসম্রাটদের শাসনকালে, সেনরাজবংশের রাজত্বকালে, বাংলার সুলতানী আমলে বা মোগল আমলে হয়েছিল। কখনও কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল হয়ে পড়লে গড়ে উঠত অনেকগুলি স্বাধীন বা প্রায় স্বাধীন রাষ্ট্র। সমগ্র বঙ্গের ধারণাটিও ছিল স্বতন্ত্র। বিহার, উত্তরপ্রদেশ ওড়িশা এবং অসমের অনেকাংশে অনেকসময় একই রাজশক্তির অধীনে গৌড়, পাণ্ডুয়া, কর্ণসুবর্ণ থেকে শাসিত হত। কখনও বা উত্তরভারতের কোনও শক্তির দ্বারা শাসিত হত সমগ্র পূর্ব ভারত। বাংলাও ছিল যার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু প্রথমে আমরা যে অঞ্চলগুলির উল্লেখ করেছি সেগুলি এবং আরও কিছু অঞ্চল বাংলার শিল্প, সাহিত্য সংস্কৃতিতে পূর্বাপর প্রচুর অবদান রেখেছে। আমাদের দুর্ভাগ্য এই অবদানের কথা আমরা বহুলাংশে বিস্মৃত হয়েছি। আমাদের এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য বাংলার এমনই একটি অঞ্চলের সাংস্কৃতিক পরিচয় দেওয়া ও তার সঙ্গে বাংলার নিবিড় সম্বন্ধকে সংক্ষেপে আলোচনা করা।

এই নিবন্ধে কামতাপুর নামে যে অঞ্চলটিকে কেন্দ্রীয় বিষয় হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে সেটি অতি প্রাচীন যুগে স্বতন্ত্র রাজনৈতিক বিভাগ হিসাবে পরিচিত ছিল না। এই অঞ্চল থেকে অদ্যাবধি খ্রিস্টীয় একাদশ দ্বাদশ শতাব্দীর নগর সভ্যতার প্রত্ন অবশেষ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। অনেকে অনুমান করেন কামতাপুর প্রাচীনযুগে গুপ্তসাম্রাজ্যের এবং হর্ষবর্মানের সাম্রাজ্যের সমসাময়িক প্রাগজ্যোতিষ তথা কামরূপ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।^১

আদি মধ্যযুগে প্রাগজ্যোতিষ রাজ্যের বিভাজনের ফলে কামতাপুর রাজ্যের সৃষ্টি হয়।^২ এই কামতাপুরের রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক সীমানা উত্তরবঙ্গের (অবিভক্ত) কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, রঙপুর, দার্জিলিং জেলার সমতলভূমি, অসমের গোয়ালপাড়া, ধুবড়ী, গুয়াহাটি ও তৎসম্মিহিত অঞ্চল এবং ভূটানের সমতলভূমি ও সংলগ্ন পার্বত্য প্রদেশ অবধি বিস্তৃত ছিল। এই অঞ্চলটি তিস্তা, করতোয়া, ব্রহ্মপুত্র, জলঢাকা, তোরী প্রভৃতি খরস্রোতা নদী বিদ্যোত এবং সেই কারণেই পূর্বাপর

বন্যাগ্রবণ। কামতাপুর অঞ্চলে সুপ্রাচীন সভ্যতার প্রত্নচিহ্ন খুঁজে না পাওয়ার কারণও সম্ভবত তাই।

অতঃপর প্রাচীন কামতাপুর সম্পর্কে আমাদের অনুমানগুলির স্বপক্ষে কিছু প্রমাণ দেওয়া যাক। সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ লিপিতে কামরূপ তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।^{১০} কিন্তু গুপ্ত সম্রাটদের আধিপত্য কামরূপের উপর দীর্ঘদিন স্থায়ী ছিল এমন অনুমান করা দুরূহ। কারণ মহাসেন গুপ্তের একটি শাসনে দেখা যাচ্ছে কামরূপ নৃপতি সুহিতবর্মণের সঙ্গে লৌহিত্যের তীরভূমিতে তাঁর প্রবল সংঘর্ষ হয়েছিল।^{১১} পরবর্তীকালে ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে উত্তর ও পূর্বভারতের দুই প্রবল শক্তি হর্ষবর্ধন ও শশাঙ্কের সঙ্গে কামরূপ নৃপতি ভাস্করবর্মণের সম্পর্ক, বাণভট্টের হর্ষচরিত ও ইউয়ান চোয়াঙের বিবরণে বহু আলোচিত। ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে কামরূপ নৃপতি ভাস্করবর্মণ যে সার্বভৌমত্বের অধিকারী ছিলেন তা অনস্বীকার্য। হর্ষবর্ধনের মিত্র হিসাবে তিনি গৌড়েশ্বর শশাঙ্কের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন, এবং শশাঙ্কের মৃত্যুর পর কিছুকালের জন্য হলেও বাঙলা এবং শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণের উপর অধিকার কয়েম করেছিলেন। কারণ তাঁর নিধনপুর শাসন কর্ণসুবর্ণ থেকেই দেওয়া হয়েছিল।^{১২} কামরূপ থেকে পশ্চিমদিকে অগ্রসর হয়ে যে নৃপতি কর্ণসুবর্ণে (মুর্শিদাবাদ জেলা) অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি কামরূপের নিকট-পশ্চিমে কামতাপুর অঞ্চলে রাজ্যবিস্তার করেছিলেন বলে ধারণা করাই স্বাভাবিক। গুপ্তসাম্রাজ্য এবং হর্ষ-শশাঙ্ক-ভাস্কর বর্মণ যুগের মধ্যবর্তী সময়ে মালবাধিপতি যশোবর্মন উত্তর ও উত্তরপূর্ব ভারতের অনেকেংশে গুপ্ত আধিপত্যের অবসান ঘটিয়েছিলেন বলেও অনেকে মনে করেন।^{১৩} তাহলে দেখা যাচ্ছে ষষ্ঠ থেকে সপ্তম শতাব্দীতে কামরূপ রাষ্ট্রে (পশ্চিমে অবস্থিত কামতাপুরসহ) বর্মণ আধিপত্য থাকারই সম্ভাবনা। পরবর্তীকালে বর্মণ আধিপত্যের অবসান ঘটিয়ে শালস্তম্ভ নামে এক নৃপতি কামরূপ তথা আসামের বৃহদাংশে রাজত্ব বিস্তার করেন। তাঁর বংশধরেরা দশম শতাব্দী অবধি এই আধিপত্য বজায় রেখেছিলেন।^{১৪} রাজ্যের পশ্চিমে অবস্থিত কামতাপুর তাঁদের অধিকারভুক্ত ছিল কিনা তা নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। কারণ অষ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার পালসম্রাটরা বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বরেন্দ্রমণ্ডল বা পৌন্ড্রবর্ধনভুক্তি তাঁদের সাম্রাজ্যের হৃদভূমি ছিল। তার নিকট-উত্তরে অবস্থিত কামতাপুরে তাঁদের অধিকার বিস্তৃত হওয়াই স্বাভাবিক। নারায়ণপাল দেবের ভাগলপুর তাম্রশাসনে (দশম শতাব্দী) প্রাগজ্যোতিষরাজ্যকর্তৃক পালসম্রাট দেবপালের (নবম শতাব্দী) আজ্ঞানুসরণের ইঙ্গিতও আছে।^{১৫}

আনুমানিক দশম শতাব্দীতেই ব্রহ্মপাল নামক একজন নৃপতি কামরূপে অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। এই ব্রহ্মপাল এবং তাঁর বংশ বাংলার পালসম্রাটদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নন। এই বংশের ধর্মপাল নামক একজন রাজা তাঁর পুষ্পভদ্র তাম্রশাসনে^{১৬} কামরূপনগরে তাঁর রাজধানী নির্মাণের কথা বলেছেন। আমাদের অনুমান কোচবিহার জেলার অন্তর্গত গোসানীমারীর ধংসাবশেষ ও এই নগরে অভিন্ন। কামরূপের বা প্রাগজ্যোতিষ রাজ্যের পশ্চিমে প্রধান নগরী বা রাজধানীর স্থানান্তরের ফলে রাজনৈতিক ভারকেন্দ্রও পশ্চিমে সরে যায়। কালক্রমে পশ্চিম ও পূর্ব কামরূপ স্বতন্ত্র রাজনৈতিক পরিচিতি লাভ করে। একাদশ শতকের শেষপর্বে অথবা দ্বাদশ শতকের প্রথমে পালসম্রাট রামপালের বিশ্বস্ত এক রাজার সফল কামরূপ অভিযান শেষে রাজধানী রামাবতীতে প্রত্যাবর্তন এবং সম্রাট কর্তৃক সংবর্ধিত হওয়ার উল্লেখ আছে সঙ্ক্যাকর নন্দীর রামচরিতম কাব্যে :^{১৭}

তস্য জিতকামরূপাদিবিষয়বিনিবৃত্ত মানসদাধ্যঃ

রামপালের উত্তরসূরি কুমারপালের (দ্বাদশ শতক) বিশ্বস্ত মন্ত্রী বৈদ্যদেব তাঁর কমৌলি

লিপিতে কামরূপের এক নৃপতিকে পরাজিত করে রাজ্যবিস্তার করার কথা বলেছেন। কামৌলি লিপি ও রামচরিতমকাব্য বাংলার পালসম্রাটদের সঙ্গে কামরূপনৃপতিদের নিরন্তর সংঘর্ষের সাক্ষ্য দেয়।^{১১} বাংলায় সেনরাজবংশের শাসনকালেও তা বন্ধ হয়নি। কারণ বিজয়সেনের দেওপাড়া লিপিতেও কামরূপ বিজয়ের দাবি আছে।^{১২} যে কামরূপনৃপতি বিজয়সেন কর্তৃক পরাজিত হয়েছিলেন তিনি কি বৈদ্যদেব? কুমারপালের এই মন্তব্যই তো পরবর্তীকালে স্বাধীনতা অবলম্বন করে পরমেশ্বর পরমভট্টারক উপাধিধারী করেছিলেন।^{১৩} অনেকে মনে করেন তিনিই কামরূপের রাজধানী ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমতীরে স্থানান্তরিত করেছিলেন।^{১৪} বৈদ্যদেবের পরবর্তীকালে দেব উপাধি ধারণ করেছিলেন কয়েকজন রাজা কামরূপে রাজত্ব করেন।^{১৫} দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে কামতাপুরে আধিপত্য বিস্তার করেন পৃথু। তিনি সম্ভবত গৌড়ের সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহের আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে নিহত হন।^{১৬} তাঁর পুত্র সন্ধ্যারায় ও পৌত্র সিদ্ধু বাংলার শাসনকর্তাদের প্রতিহত করে ত্রয়োদশ শতকের শেষ অবধি কামতাপুরে রাজত্ব করেন। চতুর্দশ শতক কামতাপুরে অরাজকতার কাল বলে চিহ্নিত*। এই পর্বে আদিবাসী গোষ্ঠীপতিরা প্রবল হয়ে ওঠেন এবং কামতাপুর বহুধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। কামতাপুরে রাজনৈতিক ভারকেন্দ্র স্থানান্তরিত হওয়ার ফলে ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব ও পশ্চিমতীরের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি হয়।

পঞ্চদশ শতকে কামতাপুরে রাজা নীলধ্বজের আবির্ভাব ঘটে।^{১৭} নীলধ্বজ ও তাঁর বংশধরদের পৃষ্ঠপোষণায় কামতানগরকে কেন্দ্র করে এক বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক বলয় গড়ে ওঠে। নগর নির্মাণে ও শিল্পকর্মে কামতাপুরের বৈশিষ্ট্য বাংলার সংস্কৃতি ও শিল্পের ক্ষেত্রে একটি নতুন মাত্রা যুক্ত করে। এই উত্থান সম্ভব হয়েছিল শক্তিশালী রাজবংশের আধিপত্যে। প্রায় শতবর্ষের সেন শাসনকালে বাংলার উত্তরপ্রান্তে এক অভিনব নাগরিক সংস্কৃতির সূচনা ঘটেছিল। নীলধ্বজ, তাঁর পুত্র চক্রবর্ত্ত এবং পৌত্র নীলাধ্বর পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ অবধি কামতাপুরে তাঁদের আধিপত্য বজায় রাখেন। তাঁদের শাসনকালে বর্তমান অসমের বৃহদাংশ অহোম রাজাদের অধিকারভুক্ত ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সুকাফা নামক নরপতির নেতৃত্বাধীন অহোম যোদ্ধারা ব্রহ্মদেশের শানপ্রদেশ থেকে এসে অসমের বেশ কিছু অংশে আধিপত্য বিস্তার করেন। উত্তরপূর্ব অসম থেকে শুরু করে তাঁরা যে সমস্ত অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করেন সেগুলি হল লখিমপুর, শিবসাগর, দরং, নওগাঁ এবং কামরূপ।^{১৮} এভাবে ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকেই প্রাচীন প্রাগজ্যোতিষ বা কামরূপ রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিমাংশে (সাধারণভাবে ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব ও পশ্চিমতীরবর্তী অঞ্চলে) রাজনৈতিক ভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে নীলাধ্বর বাঙালার সুলতান হোসেন শাহ কর্তৃক পরাজিত হন। ফলস্বরূপ কিছুকালের জন্য কামতাপুর সার্বভৌমত্ব হারায়।^{১৯} প্রধান নগরটি (গোসানীমারীর ধ্বংসাবশেষ) ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু কয়েকদশকের মধ্যেই হোসেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহের মৃত্যুর পর গৌড়ের রাজশক্তি দুর্বল হয়ে পড়লে বিশ্ব সিংহ কোচরাজ বংশের গোড়াপত্তন করেন।^{২০} পরবর্তী আড়াইশত বছরে এই কোচরাজবংশের সার্বভৌমত্ব প্রায় অক্ষুণ্ণ ছিল। কোচ রাজসভায় বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষণার কথা বলতে গিয়ে সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন :^{২১}

* এই সময়ে কোনও শক্তিশালী রাজবংশ এই অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করেছে বলে অদ্যাবধি জানা যায়নি। এ বিষয়ে তথ্যের জন্য হলিরাম ডেকিয়াল ফুকন বিরচিত অসম বুরঞ্জী (সম্পাদনা : যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, গৌহাটি ১৯৬১) এবং আহোম বুরঞ্জী, (সম্পাদনা: বকরা, শিলং ১৯৩০) দ্রষ্টব্য।

বিশ্ব সিংহ কতটা সংস্কৃতিমান পুরুষ ছিলেন জানিনা কিন্তু তাঁহার পুত্রেরা এবং সন্ততিবর্গ প্রায় তিনশত বৎসর ধরিয়া, লুপ্ত গৌড়-দরবার হইতে জ্বালাইয়া লওয়া সাহিত্যের দীপটি অন্মান রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

কোচবিহার-কামতাপুরের বাঙলা চর্চার আলোচনার পূর্বে আমরা কালানুক্রমের প্রয়োজনে পুথুরাজ ও তাঁর বংশের এবং নীলধ্বজ তাঁর বংশের আধিপত্যের সময়ে কামতাপুরে নগরায়ন ও শিল্পচর্চার আলোচনা করব। নগরায়ন, বলা বাহুল্য, সভ্যতার বিকাশের অন্যতম প্রধান শর্ত।

২

এই নিবন্ধে কামতাপুরের প্রত্ন অবশেষ নিয়ে যে আলোচনা করা হচ্ছে তা ওই রাজ্যের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে (Core area or heartland) অর্থাৎ এখনকার জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলায় সীমাবদ্ধ। ইতস্তত ছাড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কিছু ক্ষুদ্রতর প্রত্নক্ষেত্রের কথা বাদ দিয়ে দিলে গোসানী-মারীর ধ্বংসাবশেষ, চিলাপাতা অভয়ারাণ্যের অন্তঃপাতী নলরাজার গড় এবং জলপাইগুড়ি জেলার ভিতরগড় অঞ্চলের পৃথু রাজার গড় এই অঞ্চলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থল। কতকগুলি প্রাচীন দেবালয় গুরুত্বপূর্ণ হলেও তাদের কাছাকাছি অঞ্চলে কোনও প্রাচীন জনবসতির (settlement site) চিহ্ন পাওয়া যায়নি যা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রথমে পুথুরাজার গড়ের উল্লেখ করি। প্রাকার ও পরিখা বেষ্টিত এই দু'গটি দ্বাদশ ত্রয়োদশ শতকে নির্মিত বলে অনুমান করা যায়। লোককথা, প্রবাদ ইত্যাদি কিছু সূত্র থেকে মনে হয় তলমা নদীতীরে অবস্থিত এই দুর্গে তুর্ক আফগান আমলে পৃথু নামে এক সার্বভৌম নৃপতি বাস করতেন। তিনি সম্ভবত সুলতানি ফৌজের দ্বারা পরাজিত ও নিহত হন। ইমারতের ধ্বংসাবশেষ ছাড়া এখানে আমরা বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোনও প্রত্নবস্তু দেখিনি।

এবারে গোসানীমারীর ধ্বংসাবশেষের প্রসঙ্গ। ভূমির উপরিতল থেকে উদ্ধার হওয়া কিছু প্রত্নবস্তু, বেশ কিছু শিলামূর্তি এবং অন্যান্য প্রত্ন অবশেষ একদা এখানে অবস্থিত বসতি সম্পর্কে ধারণা নির্মাণে সহায়তা করে। ১৯৮৮ সালের একটি সমীক্ষার সময় মৃৎপাত্রের যে অবশেষ (Pot sherds) বর্তমান নিবন্ধকার কর্তৃক সংগৃহীত হয়েছিল তাকে একাদশ-দ্বাদশ শতকের পূর্ববর্তী বলে মনে হয় না। এগুলির কালনির্ণয় করতে গিয়ে অবশ্য Circumstantial association বা অনুসঙ্গের উপর গুরুত্বারোপ করতে হয়েছে। অর্থাৎ একই স্তরে প্রাপ্ত অন্যান্য প্রত্নবস্তুর কালনির্ণয় করে সেগুলির ভিত্তিতে খোলামকুচির কালনির্ণয় করা হয়েছে। এগুলি একাদশ দ্বাদশ শতক থেকে চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকের বলে মনে হয়। প্রাকার সংলগ্ন একটি পুষ্করিণীর পাড়ে উপরিতল থেকে প্রায় তিন-চারফুট গভীরতা অবধি নানা সময়ের খোলামকুচি বিশেষ ভাবে লক্ষ করার সুযোগ হয়েছিল। এই স্থানটিতে বন্যার কারণে খোলামকুচির স্তরের Overlapping ঘটেছে।

বাংলার অন্যান্য অঞ্চলে প্রাপ্ত মৃৎপাত্রের সমকালীন ভগ্নাবশেষের সঙ্গে গোসানীমারীতে প্রাপ্ত খোলামকুচির একটি বিশেষ পার্থক্য হল শেযোক্ত নমুনায় অধিক পরিমাণে সিলিকন-ডাই-অক্সাইডের (SiO₂) উপস্থিতি। পার্বত্য অঞ্চল সংলগ্ন বন্যাবিধৌত অঞ্চলের ভূমিতে বালির ভাগ পুরাতন বা নতুন পলি সমন্বিত বা ল্যাটেরাইট সমৃদ্ধ অঞ্চলের চাইতে বেশি। এর ফলে খোলামকুচি বা মৃৎপাত্রের বর্ণেও পার্থক্য দেখা দেয়।

অতঃপর আমরা গোসানীমারীর কেন্দ্রস্থল রাজপাট (এখানে খেন রাজপ্রাসাদ অবস্থিত ছিল) এবং সম্মিহিত অঞ্চলে প্রাপ্ত শিলামূর্তির কথা বলব। এখানে প্রাপ্ত বা ছড়ানো ছিটানো ভাবে পড়ে থাকা শিলামূর্তি বা তার অবশেষগুলি ব্ল্যাক বাসন্ট (Black basalt) নামক কৃষ্ণপ্রস্তর বা বেলেপাথর (sandstone) থেকে তৈরি। গৌড়-পুন্ড্র বরেন্দ্রী বা পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গে উদ্ধার হওয়া শিলামূর্তিগুলির বেশিরভাগ এই গোত্রের। কৃষ্ণপ্রস্তর এই শিল্পকর্মের প্রধান উপাদান যা অবধারিতভাবে রাজমহল বা তার সংলগ্ন অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই কৃষ্ণপ্রস্তরের নমনীয়তার জন্য তাতে খোদাই করার সুবিধা বেশি। অপরপক্ষে স্থানীয় প্রস্তরে (হিমালয় পর্বতমালা থেকে আহরিত বা সংগৃহীত) কৃত শিল্পকর্মেরিলিফের কাজ অগভীর ও অস্পষ্ট। এগুলির বেশিরভাগ অতিদ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে বিনষ্ট হয়েছে।

গোসানীমারীতে প্রাপ্ত শিলামূর্তিগুলি শৈলীর দিক থেকে সাধারণভাবে বাংলার পাল সেন মূর্তি কলার থেকে অভিন্ন।^{২২} আমরা জানি দ্বাদশ ত্রয়োদশ শতকে সুবিখ্যাত পাল-সেন মূর্তিকলা ও চিত্রকলার অবক্ষয় ঘটতে থাকে।^{২৩} সমসাময়িক কালে তুর্ক-আফগান অভিযানের পর বাংলার শাসক গোষ্ঠীর পরিবর্তন ঘটলে মূর্তিকলা ও চিত্রকলা রাজকীয় ও অভিজাত সম্প্রদায় এবং সাধারণ মানুষের পৃষ্ঠপোষণা থেকে বঞ্চিত হয়ে প্রায় লুপ্ত হয়। কিন্তু কামতাপুর অঞ্চলে তুর্ক-আফগান অধিকার স্থায়ী হয়নি এবং পঞ্চদশ শতকেও সেনবংশের শাসনকালে বাংলার মূর্তিকলা অবক্ষয়িত হয়েও সেখানে টিকে ছিল। তাই বাংলার লুপ্ত মূর্তিকলার সর্বশেষ নিদর্শন পাওয়া যায় কামতাপুরের পঞ্চদশ শতকের ধংসাবশেষে। পরবর্তীকালে নির্মিত এবং বাংলার অন্যান্য অঞ্চলে প্রাপ্ত শিলামূর্তিগুলিকে ঠিক পাল সেন শৈলীর পরম্পরাগত উত্তরাধিকারী বলা যায় না।

আমাদের দুর্ভাগ্য কামতাপুরের ধংসাবশেষে যে মূর্তিগুলি দেখা যায় সেগুলির বেশিরভাগ ভগ্নদশাপ্রাপ্ত। মূর্তিগুলির সঙ্গে পরিকল্পিত শাস্ত্রাঘাতের চিহ্ন দেখা যায়। সম্ভবত তুর্ক-আফগান আক্রমণকারীরা মূর্তিপূজার বিরোধী ছিল বলে মূর্তিগুলির এই দশাপ্রাপ্ত হয়েছে। মধ্যযুগে সম্প্রদায় নির্বিশেষে পরধর্মদ্বৈষ একটি সাধারণ ঘটনা ছিল। মূর্তিগুলির ভগ্নদশা তাই অভিনব কিছু নয়। এবার মূর্তিগুলির আঙ্গিক ও বিষয় সম্পর্কে সংক্ষেপে দু-একটি কথা বলি।

অনেকগুলি মূর্তিতে জটা দেখা যায়। বলা বাহুল্য এটি শৈবপ্রভাবের চিহ্ন। অদ্যাবধি কামতাপুরে অর্থাৎ জলপাইগুড়ি-কোচবিহার-রঙপুর-গোয়ালপাড়া অঞ্চলে শৈবমতের জনপ্রিয়তা বর্তমান। বাণেশ্বর, জলেশ্বর, জটেশ্বর, বটেশ্বর, নীলেশ্বর, ভদ্রেশ্বর প্রভৃতি বহু দেবালয়ে শিবের পূজা হয়ে থাকে। এই মন্দিরগুলির কোনওটিই আধুনিককালে নির্মিত হয়েছে বলে মনে হয় না। সম্ভবত মধ্যযুগের কামতাপুরের অধীশ্বরেরাও শৈবমতাবলম্বী ছিলেন। গোসানীমারীতে প্রাপ্ত মূর্তিগুলির কোনও কোনওটিতে পোষাকের অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। একটি-দুটি পুরুষমূর্তিতে আলখাল্লার মতো পরিধেয় দেখা যায়। বাঙলার অন্যান্য অঞ্চলে মধ্যযুগের মন্দিরগাত্রের টেরাকোটা ভাস্কর্য্যে এই ধরনের পোষাক দেখা যায়। এই ধরনের পোষাকের কোমরবন্ধনীও মধ্যযুগের উত্তরভারতীয় যোদ্ধার মতো। সাধারণভাবে এই মূর্তিগুলিকে পাল মূর্তিকলার অবক্ষয়ের দূর্বর্তী নিদর্শন বলে উল্লেখ করলেও কয়েকটি মূর্তিতে বেশ কিছু অসাধারণত্ব আছে। দু-একটি চলমান মানুষের মূর্তিও দেখা গেছে। এখানকার এমন কটি মূর্তি উৎকৃষ্ট শিল্প নিদর্শন। চলমান মানুষের শরীরের বিভঙ্গ (চিত্র ৭), হাতে ধরে রাখা বস্তুটিকে (দেবতার নৈবেদ্য?) নিয়ে অগ্রসর হওয়ার সময় পদদ্বয়ের মধ্যে ব্যবধান, পৃষ্ঠদেশের বাঁক মুন্সীমানার সঙ্গে খোদিত হয়েছে। এই ধরনের দু

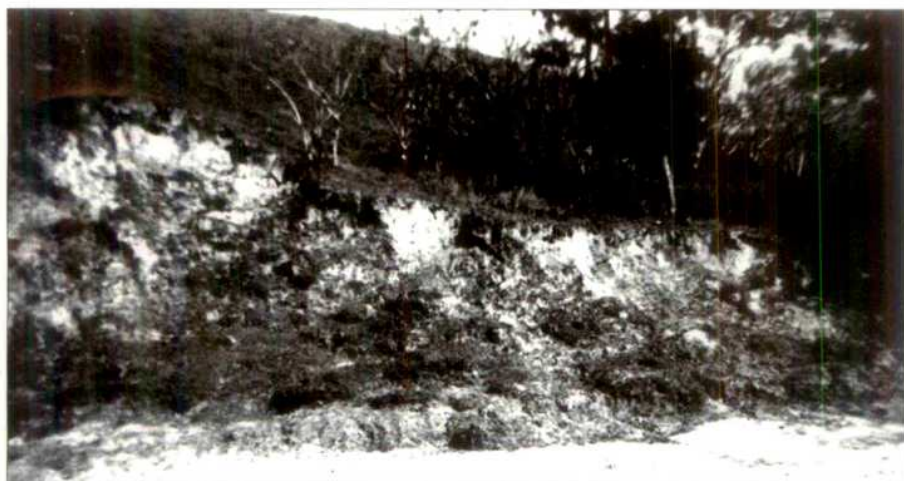
একটি মূর্তিতে শিল্পীর পরিমিতিবোধ ও দক্ষতা আমাদের বিস্মিত করে। কোনও কোনও নারী মূর্তিতে অনায়াস দক্ষতায় খোদিত পোষাকের ভাঁজ ও কুঁচি দর্শনীয়। বেশিরভাগ মূর্তিতে অবশ্য এই উৎকর্ষ অনুপস্থিত। কামতাপুরের শিল্পীরা পরম্পরাগতভাবে বাংলার মূর্তিকলারই চর্চা করে আসছিলেন। অবক্ষয়ের ধারাটিকেও তাঁরা লালন করে আসছিলেন যান্ত্রিকভাবে। কিন্তু এক সময় সম্ভবত প্রতিভাবান শিল্পীদের আবির্ভাবে সেখানে শিল্পকর্ম, শিল্পধারণা ও শিল্পরীতির ক্ষেত্রে এক ধরনের নবজাগরণ দেখা দিয়েছিল। পরম্পরাগত রীতি ও খোদাই এর দক্ষতা তুর্ক-আফগান এবং উত্তর ভারতীয় রীতির সমসাময়িক কিছু element আত্মস্থ করে নতুন রীতির জন্ম দিয়েছিল। আমাদের দুর্ভাগ্য এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনকে বিস্তৃতভাবে আলোচনার মতো প্রচুর উপাদান আমাদের হাতে নেই। কামতাপুরে সাহিত্যের ক্ষেত্রে কোচ রাজবংশের (নারায়ণ রাজবংশ) আমলে যে অভিনব পরিবর্তন ও উদ্যোগ দেখা গেছে, চারুশিল্প তথা মূর্তিকলার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী যুগে অর্থাৎ খেন আমলে তাই ঘটেছিল বলে মনে হয়। এ ক্ষেত্রে চূড়ান্ত মন্তব্যের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে ব্যাপক উৎখনন ও সমীক্ষা এবং খেন শিল্পকর্মের নবতর নমুনা আবিষ্কারের জন্য। তুর্ক-আফগান আক্রমণে এই নব উন্মেষিত শিল্পরীতি যে ধ্বংস হয়েছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে কামতাপুরের প্রধান প্রত্নক্ষেত্র গোসানীমারী। এখানে প্রাপ্ত প্রত্ন অবশেষগুলির অধিকাংশ বিশেষত উপরিতলের প্রত্নইমারতের ধংসাবশেষ এবং অন্যান্য প্রত্নচিহ্ন খেন রাজবংশের সমসাময়িক বলে মনে করা হয়। এই অঞ্চলে উৎখনন সম্পূর্ণ হলে আমরা জানতে পারব নীচের স্তরগুলিতে কোন ধরনের এবং কোন সময়ের প্রত্নবস্তু বর্তমান। সাম্প্রতিক উৎখননে প্রাপ্ত কিছু প্রত্নাবশেষ থেকে অনুমান করা হয় গোসানীমারীর প্রত্নক্ষেত্রের নিম্নবর্তী কয়েকটি স্তর প্রাকখেন যুগের। সম্ভবত বিভিন্ন সময়ে এখানে নগর নির্মিত হয়েছে। উপরিতলের প্রত্ন অবশেষগুলি দেখে অনুমান করা যায় পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দী অবধি এই নগরীর অস্তিত্ব ছিল। ধরলানদীর পশ্চিমপাড়ের এই নগরীর অপর তিনদিক প্রায় তিরিশ ফুট উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল। প্রায় পনেরো মাইল বিস্তৃত এই প্রাচীরের পাশে চওড়া পরিখার অস্তিত্ব ছিল। নগরদুর্গের অন্তত পাঁচটি প্রবেশপথ ছিল। এছাড়া প্রাচীরের বিভিন্ন স্থানে প্রহরার জন্য মিনারও ছিল। দুর্গের অভ্যন্তরে মন্দির ও প্রাসাদ সহ বেশ কিছু ইমারত ছিল। কামতেশ্বরী মন্দির তার অন্যতম। রাজপাট বলে পরিচিত দুর্গের প্রধান অংশে অবস্থিত ছিল রাজপ্রাসাদ। বেশ কিছু মূর্তি ও অন্যান্য প্রত্নবস্তু উদ্ধার হয়েছে এই অঞ্চল থেকে। রাজপ্রাসাদটিও ছিল স্বতন্ত্র প্রাকারবেষ্টিত। গঙ্গাতীরে অবস্থিত সুউচ্চ প্রাকারবেষ্টিত গোড় দুর্গের সঙ্গে কামতাপুরের কিছু সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। সেখানেও দুর্গের একপ্রান্ত দিয়ে প্রবাহিত ছিল নদী। অপর দিকগুলি ছিল প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। রাজপ্রাসাদ ও সংলগ্ন কিছু ইমারত এবং বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ ছিল ইটের সুউচ্চ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা।^{২৪}

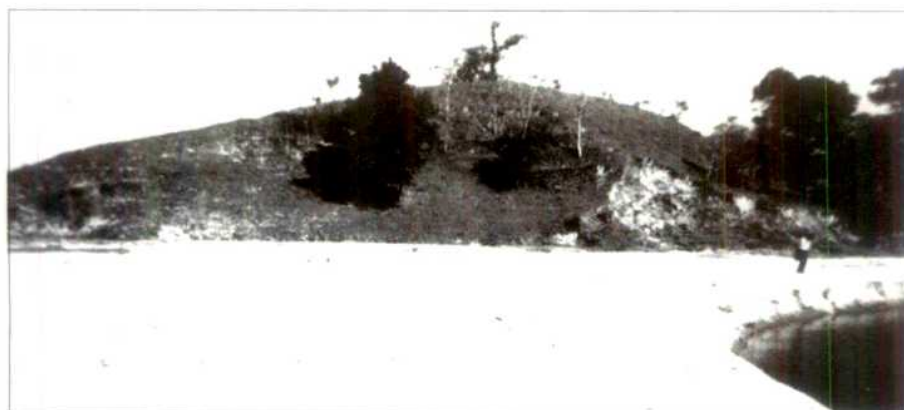
কামতাপুরের প্রত্নক্ষেত্র বা নগরসভ্যতার চিহ্নগুলির মধ্যে গোসানীমারীর পরেই জলপাইগুড়ি জেলার চিলাপাতা অভয়ারণ্যের মধ্যবর্তী নলরাজার গড়ের কথা বলতে হয়। এটিও ছিল একটি প্রাকারবেষ্টিত দুর্গ। দুর্গ প্রাকারের পার্শ্ববর্তী পরিখা তোর্বা নদীর একটি ধারার সঙ্গে যুক্ত ছিল। বানিয়া নামে একটি ছোটো নদীও এই দুর্গের নিকটবর্তী অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। গত ১৯৮৮ সালের সমীক্ষার সময় এখান থেকে খোলামকুচি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। অঞ্চলটি এখন গভীর জঙ্গল সমাকীর্ণ। গত ২০০০ সালে দেখেছি, গত শতকের ষাটের দশকে পরিষ্কৃত দুর্গচত্বর ও



চিত্র - ১



চিত্র - ২



চিত্র - ৩



চিত্র - ৪



চিত্র - ৫



চিত্র - ৬



চিত্র - ৭



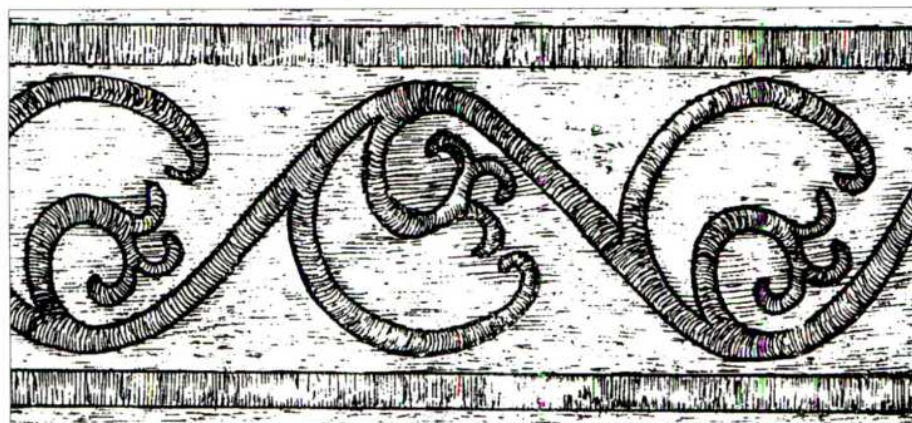
চিত্র - ৮



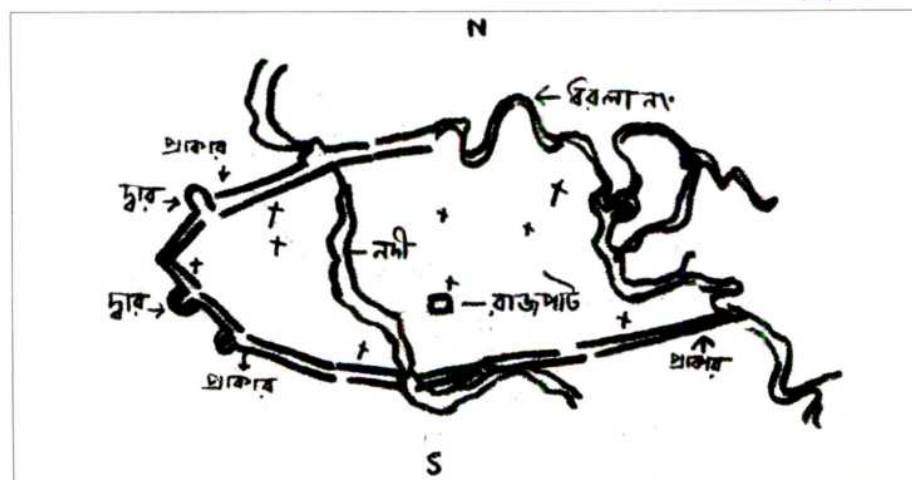
চিত্র - ৯



চিত্র - ১০



চিত্র - ১১



চিত্র - ১২

প্রাকার বন্যলতাপাতা ও গাছপালায় প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে। বুনো হাতির একটি দল এসে পড়তে আমাদের অতিদ্রুত অঞ্চলটি পরিত্যাগ করতে হয়েছিল।

প্রত্নবিদ পরেশ দাশগুপ্ত মনে করতেন নলরাজার গড় গুপ্তযুগে নির্মিত হয়েছিল।^{২৫} কিন্তু ধংসাবশেষের আকৃতি ও অন্য কিছু প্রত্নচিহ্ন যেমন ফুল লতাপাতার নকশা এবং সমগোত্রীয় মোটিফ দেখে এটিকে আদি মধ্যযুগের বলে মনে হয়। আবার দুর্গ প্রাকারের খিলানগুলির গঠন দেখলে মনে হয় দুর্গটি তুর্ক-আফগান যুগেই ব্যবহৃত হয়েছে। সন্দেহ নেই এই দুর্গের অভ্যন্তরের ইমারত ইত্যাদি একাধিকবার নির্মাণ ও মেরামত করা হয়েছে। জীর্ণ সংস্কারের কিছু প্রাচীন চিহ্ন এখন বর্তমান।

নল রাজার গড় ও গোসানীমারীর প্রত্নক্ষেত্রে সমীক্ষা করে অনুমান করা যায় কামতাপুরে একাদশ ও পঞ্চদশ শতকের অন্তর্বর্তী সময়ে নগর সভ্যতা তথা নগরায়নের বিকাশ ঘটেছিল। নগর দুর্গগুলি নদীতীরবর্তী হওয়ার দরুন বাংলা ও অসমের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের সঙ্গে নদীপথে বাণিজ্যেরও সুযোগ ছিল। কি ধরনের পণ্য রপ্তানি হত কামতাপুর থেকে? কামতাপুরের নগর সভ্যতা ধংস হওয়ার কয়েকদশকের মধ্যে রালফ ফিচ লিখেছেন^{২৬} :

I went from Bengala into the country of Couche, which lieth 25 days journey northward from Tanda. The king is a gentile, his name is suckel Counce; His country is great and lieth not far from Couchin China (Sic) for they say they have pepper from thence. The port is called Cacchegate. All the countrie is set with bamboos or canes.....Here they have much silke and muske, and cloth made of cotton.

রালফ ফিচ যে সাক্কেল কাউচ (Suckel Counce) এর কথা লিখেছেন তিনি সম্ভবত কোচরাজ নরনারায়ণের ভ্রাতা মহাবীর চিলারায় বা শুরুধ্বজ। এই প্রবল প্রতাপাশ্বিত সামরিক নেতা বহু শত্রুকে পর্যুদস্ত করে এক সুবিশাল কোচ সাম্রাজ্যের পত্তন করেন। সম্ভবত জ্যেষ্ঠ সহোদরের সম্মতিক্রমেই তিনি কোচ সাম্রাজ্যের একাংশ শাসন করতেন।^{২৭}

রেশম, মৃগনাভি (Musk), সূতীর কাপড় কামতাপুরে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত। চীন, তিব্বত, ভূটানের পণ্য ও যে এই পথে আসত তা জানা যায় বহু সূত্র থেকে। রিয়াজ উস-সালাতীন প্রণেতা গোলাম হোসেন অষ্টাদশ শতাব্দীতে লিখেছেন কোচবিহারের গোলমরিচ ও কমলালেবুর কথা।^{২৮} কামতাপুর থেকে একটি সড়ক ঘোড়াঘাট অবধি বিস্তৃত ছিল। ঘোড়াঘাটে (রঙপুর-বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তঃপাতী) তিব্বতী (ভোট) ও ভূটানী (ভোটাস্ত) পণ্যের বাজার ছিল। পাহাড়ী ঘোড়া (তঙ্গন), চামর, গন্ধদ্রব্য, ভোটকম্বল জাতীয় অনেক পণ্যই সম্ভবত বেশ কিছু পরিমাণে বাংলার অন্যান্য অঞ্চলে আসত কামতাপুর হয়ে। কামতাপুরের অশ্বেরও খুব খ্যাতি ছিল। জাগরণ চণ্ডীকাব্যে মাধবাচার্য্য যুদ্ধের বর্ণনায় লিখেছেন :^{২৯}

এরাকি টাঙ্গন তাজী, গুরঙ্গ কামদাবাজী, সিদ্ধু দেশি তুরগ বিশাল

কামদাবাজী নিঃসন্দেহে কামতা (কামতা) অঞ্চলের বাজি (অশ্ব) কোনও কোনও পণ্ডিত অবশ্য কামদাবাজী বলতে কছোড়িয়া বা তিব্বতের অশ্বের উল্লেখ করা হয়েছে বলে মনে করেন। এই অনুমান ভ্রান্ত। অষ্টাদশ শতকের কবি কামতা বা কামদা অর্থে কামতাপুরকেই বুঝতেন। কছোড়িয়ার অশ্ব ভারতে বিক্রির কথা কবিনকালেও শোনা যায়নি।

যাই হোক উদ্বৃত্ত পণ্যের বাণিজ্য এবং অনুকূল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ কামতাপুর তথা কোচবিহারকে একটি সমৃদ্ধ অঞ্চলে পরিণত করেছিল। গোলাম হোসেন তাঁর রিয়াজ উস সালাতীন গ্রন্থে লিখেছেন :^{৩০}

হিন্দুস্থানের পূর্ব অঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যাপেক্ষা কোচবিহার অধিবাসীগণ সুখ স্বাচ্ছন্দ, সুস্বাদু জল ও স্বাস্থ্যকর বায়ু বিষয়ে শ্রেষ্ঠ...কোচবিহারের রাজা স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত করিতে পারেন। রাজ্য নামাঙ্কিত টাকা নারায়ণী টাকা বলিয়া বিখ্যাত।

এই সমৃদ্ধ রাজ্য বাংলা ভাষার ইতিহাসের এক গৌরবজনক অধ্যায়কে লালন করেছে। প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় কোচ রাজবংশের উত্থানের কালেও বাংলা ও অসমীয়া ভাষার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখা যেত না।^{৩১} অসমীয়া ভাষার স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ পেয়েছে আরও কিছুকাল পরে। এই কারণেই অসমীয়া ভাষার ইতিহাসকারেরা কোচবিহার দরবারে প্রচলিত ভাষা এবং কোচ-কামতাপুরের সাহিত্যকে অসমীয়া ভাষার নমুনা বলে দাবি করেন।^{৩২} আমরা এই বিতর্কের মধ্যে প্রবেশ না করেও নির্দিষ্ট বলতে পারি কোচবিহার দরবারের সাহিত্য এবং দরবারী ভাষা ছিল বাঙলা। বাঙলা ভাষায় গদ্যের প্রাচীনতম নমুনা হল ষোড়শ শতকে কোচনৃপতি নরনারায়ণের অহোমরাজকে লেখা পত্র। বহু আলোচিত হলেও এই পত্রের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা যেতে পারে:^{৩৩}

লেখনং কার্যঞ্চ ● এথা আমার কুশল ● তোমার কুশল নিরন্তরে বাঞ্চা করি ● অখন তোমার আমার সন্তোষ সম্পাদক পত্নাপত্রি গতয়াত হইলে উভয়ানুকূল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে ● তোমার আমার কর্তব্যে সে বর্দ্ধিতাকপাই পুষ্পিত ফলিত হইবেক ● আমরা সেই উদ্যোগতে আছি

কোনও কোনও পণ্ডিতের মতে মহারাজা নরনারায়ণ নিজে সুসাহিত্যিক ছিলেন। তাঁর পরবর্তী নৃপতিদের মধ্যেও প্রাণনারায়ণ (সপ্তদশ শতকের মধ্যবর্তীকাল), হরেন্দ্রনারায়ণ (অষ্টাদশ-উনবিংশ শতক) ও শিবেন্দ্রনারায়ণ (উনবিংশ শতকের চতুর্থ-পঞ্চম দশক) সাহিত্যিক হিসাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন। শিবেন্দ্রনারায়ণের বিদূষী প্রধানা মহিষী পদ্যের আকারে কোচবিহারের রাজকীয় ইতিহাস রচনা করেছিলেন (প্রকাশকাল ১২৬৬)। নাম দিয়েছিলেন ‘বিহারোদন্ত’। একজন; অস্তঃপুর-চারিণী মহিলার এই উদ্যোগ অনন্যসাধারণ।^{৩৪}

অতঃপর কোচ-কামতাপুরের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের সম্পর্কে সংক্ষেপে দু-একটি কথা বলি। মহারাজ বিম্বসিংহের (ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যবর্তী কাল) পুত্র সমর সিংহের আদেশে পীতাম্বর মার্কেণ্ডেয় পুরাণ কাব্য লিখেছিলেন।^{৩৫} বৈষ্ণব সাধক শঙ্করদেব কোচরাজসভার আশ্রয়ে থেকে নানাবিধ সাহিত্যসৃষ্টি করেছেন। প্রকৃতপক্ষে শঙ্করদেবকে ব্রাহ্মণ্য প্রাতিষ্ঠানিকতা এবং অস্পৃশ্যতা ও জাতি বৈরের বিরোধিতা করার কারণে অসমে রাজরোষের সম্মুখীন হতে হয়। অহোমরাজের কাছে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল :

শূদ্র এক গোটা নাম শঙ্কর আছয়।

শ্রাদ্ধবিধি করিবার লোকক না দেয়।।

শঙ্করদেব অসম পরিত্যাগ করে কামতাপুরে আশ্রয় নিলেন। জাতিবৈদ্বেষের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযান সচল রইল। এখানেও ব্রাহ্মণরা তাঁর নিন্দা শুরু করলেন :

রাজার আগত খল দিলে বিপ্রলোক
সমস্ত রাজ্যক নষ্ট করিল শঙ্কর
শূদ্র স্ত্রী নমস্কার লয়ে ব্রাহ্মণর
কৈবর্ত কোলতা কোচ ব্রাহ্মণ সমস্ত
এক লগে খায় দুধ চিড়া ফল যত

রাজা নরনারায়ণ বা তাঁর ভ্রাতা শুক্লবজ্র তাঁর সহায়। কাজেই শঙ্করের লোকপ্রিয়তা বাড়তেই থাকল। কামতাপুরের সমাজে দেখা দিল বিপুল পরিবর্তন। সেই সঙ্গে চলতে থাকল সাহিত্যসৃষ্টি। তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তির মধ্যে আছে রাজা নরনারায়ণের উদ্দেশ্যে রচিত কয়েকটি ভটিমা, ভাগবত পুরাণ, রামায়ণ উত্তর কাণ্ড প্রভৃতি, রুক্মিণীহরণ নাট, শ্রীরাম বিজয় নাট, অনাদি পাতন ইত্যাদি। সংস্কৃতজ্ঞ শঙ্কর সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভারের বাংলা অনুবাদ করে বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছেন।^{৩৬} মৌলিক রচনাতেও রেখে গেছেন অসামান্য উদ্ভাবনীশক্তি ও প্রতিভার স্বাক্ষর।

কামতাপুরের বাঙালি রচনার প্রাচীনতম নিদর্শন মাধব কন্দলীর শ্রীরাম পাঁচালী, উপেন্দ্রযোগ্য প্রতিভাধর অন্যান্য কবিদের মধ্যে আছেন অনন্ত কন্দলী, হেম সরস্বতী, কবিরত্ন সরস্বতী, হরিবর বিপ্র, মনকর, দুর্গাবর, কংসারি ইত্যাদি। সৌভাগ্যক্রমে এঁদের বেশ কিছু পুঁথি সংরক্ষিত হয়েছিল কোচবিহারের রাজকীয় গ্রন্থাগারে। অর্ধশতাব্দীরও বেশি হল শশীভূষণ দাশগুপ্ত এই পুঁথিগুলির বিস্মৃত তালিকা রচনা করে বাঙালির কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। কিন্তু কামতাপুরের বাংলা সাহিত্যে তথা কোচ দরবারের সংস্কৃতির আবহ নিয়ে অনুপুঙ্খ গবেষণা আজও হয়নি।* কামতার বাংলা সাহিত্যের নমুনা সম্পর্কে শশীভূষণ দাশগুপ্তের মন্তব্য উদ্ধৃত করা যাক :^{৩৭}

We get here valuable information about many hitherto unknown important texts and authors of mediaeval Bengali literature and we have no hesitation in saying that no history of Bengali language and literature is complete without a thorough study of them.

আমরা ড. দাশগুপ্তের মন্তব্যের সঙ্গে একমত হয়ে বলতে পারি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে কামতাপুরের অবদানকে বিস্মৃত হলে অসামান্য ক্ষতি হবে আমাদের বৌদ্ধিক ইতিহাসের।

এখন পর্যন্ত আমাদের আলোচনার সারসংক্ষেপ করলে বোঝা যায় কামতাপুরের বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক অঞ্চল হিসাবে গড়ে ওঠা এবং বাঙলার শিল্প ও সংস্কৃতিকে গৌরবান্বিত করার পিছনে বেশ কয়েকটি কারণ ক্রিয়াশীল ছিল। এগুলি হল (ক) উত্তরপূর্ব ভারতের বৃহত্তম রাজ্যের রাজধানী কামতানগরে স্থানান্তরিত হওয়া (খ) অর্থনৈতিক বৈভব ও রাজনৈতিক স্থিতির কারণে খেন রাজবংশের সমৃদ্ধি এবং এই রাজবংশের দ্বারা শিল্পকলা ও স্থাপত্যের পৃষ্ঠপোষণা (গ) কোচ রাজবংশের উত্থান ও নিরঙ্কুশ প্রাধান্য বিস্তার এবং ফলস্বরূপ দরবারি সাহিত্যের উৎকর্ষ লাভ (ঘ) অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব শঙ্কর দেবের কোচবিহার রাজবংশের সমর্থন লাভ এবং ফলস্বরূপ শিষ্য পরম্পরায় ধর্মীয় সাহিত্যের ব্যাপক উৎকর্ষ।

কামতাপুরের বৈভব, তার সাংস্কৃতিক অবদান ইত্যাদি অষ্টাদশ উনবিংশ শতকেও সাধারণ বাঙালির কাছে অপরিচিত ছিল না। আমরা পূর্বেই রিয়াজ-উস-সালাতীন প্রণেতা গোলাম হোসেনের

* Dr A K Chakraborty বচিত *Literature in Kamta Kochi Raj Durbar* (1961) এই অভাব পূরণে একটি অসাধারণ পদক্ষেপ। তথাপি কামতাপুরের সাংস্কৃতিক ইতিহাস নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়নি।

মস্তব্য উদ্ধৃত করেছি। অতঃপর উনিশ শতকের শেষার্ধের উল্লেখ করব। এক্ষেত্রে আমাদের প্রধান সাক্ষী বঙ্কিমচন্দ্র।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যের ঐতিহাসিক আবহের বিশ্লেষণ করতে অদ্যাবধি কেবল বাংলার ইতিহাসের মূল স্রোতে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। তাতে কেবল মোগল, পাঠান শাসক ও সেনানায়ক, রাজপুত সৈন্যদল, তাঁদের অনুগত বা বিবাদী সামন্ত প্রভুদের নিয়ে আলোচনা হয়। এসে পড়ে উৎপীড়িত সাধারণ মানুষের দুর্দশার অমূল্য চিত্রাবলি। যাতে নজর পড়ে না তা হল প্রান্তিক অঞ্চলের ইতিহাস ও সমাজ সম্পর্কে তাঁর স্পষ্ট ধারণা এবং তাঁর সাহিত্যে প্রান্তিক বাংলা ইতিহাসের প্রবল উপস্থিতি। প্রান্তিক অঞ্চলের ইতিহাসের চর্চা তাঁর কালে তেমনভাবে প্রচলিত হয়নি। অথচ উনিশ শতকে প্রকাশিত বঙ্কিমের কোনও কোনও উপন্যাসে প্রান্তিক ইতিহাসের স্বচ্ছ ধারণা বিস্ময়কর। দেবী চৌধুরাণী থেকে উদ্ধৃত দেওয়া যাক :

পূর্বকালে উত্তর বাংলায়, নীলাধর বংশীয় প্রবল পরাক্রান্ত রাজগণ রাজত্ব করিতেন। সে বংশে শেষ রাজা নীলাধর দেব। নীলাধরের অনেক রাজধানী ছিল— অনেক নগরে অনেক রাজভবন ছিল... গৌড়ের বাদশাহ একদা উত্তরবাংলা জয় করিবার ইচ্ছায় নীলাধরের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। নীলাধর বিবেচনা করিলেন যে, কি জানি, যদি পাঠানেরা রাজধানী আক্রমণ করিয়া অধিকার করবে, তবে পূর্বপুরুষের সম্বন্ধিত ধনরাশি তাহাদের হস্তগত হইবে। আগে সাবধান হওয়া ভাল এই বিবেচনা করিয়া যুদ্ধের পূর্বে নীলাধর অতি সংযোগনে রাজভাণ্ডার হইতে ধনসকল এই স্থানে আনিলেন।

বঙ্গদর্শন-এর জৈষ্ঠ ১২৮৯ সংখ্যায় তাঁর এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। নাম *বাঙলার ইতিহাসের ভগ্নাংশ*। প্রান্ত উত্তরবঙ্গ ও উত্তর পূর্বভারতের ইতিহাস নিয়ে বঙ্কিমের মস্তব্য তা থেকে উদ্ধৃত করা যাক:^{৩৯}

একসময়ে এই কামরূপ রাজ্য অতি বিস্তৃত হইয়াছিল। পূর্বে করতোয়া ইহার সীমা ছিল, আধুনিক আসাম, মণিপুর, জয়ন্তিয়া, কাছাড়, ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ি ইহার অন্তর্গত ছিল। আইন-ই-আকবরীতে লেখে যে ভগদত্তের বংশে ২৩ জন রাজা এখানে রাজত্ব করেন। যাহাই হউক, পৃথু নামা রাজার পূর্বে কোন রাজার নামের নির্দেশ পাওয়া যায় না। পৃথুবাজার রাজধানী তন্ময়ান্নে নদীতীরে, চাকলা বোদা ও পরগণা বৈকুণ্ঠপুরের মধ্যস্থলে ছিল, অদ্যাপি তাহার ভগ্নাবশেষ আছে।

উত্তরবঙ্গের প্রান্তিক অঞ্চল ও উত্তরপূর্ব ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে বাংলা ভাষায় তখন পর্যন্ত বিশেষ কিছু লেখা হয়নি। ১২৮৯ সালের মাঘ মাসে কোচবিহার রাজসরকারের কর্মচারী ভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর *কোচবিহারের ইতিহাস* প্রকাশ করেন। এই বিষয়ে তিনি লিখেছেন:^{৪০}

এই বংশের পৃথুরাজা বিলম্বল শ্যাত্যাপন ছিলেন। চাকলা বোদা ও বৈকুণ্ঠপুরের মধ্যে তাহার রাজধানী ছিল। সেই রাজধানী মৃন্ময় প্রাচীরে বেষ্টিত ছিল। প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বর্তমান আছে।

একই গ্রন্থের অন্যত্র ভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন:^{৪১}

আইন আকবরীতেও ভগদত্তের বিবরণ উদ্ধৃত হইয়াছে। আইন আকবরীতে আকও উল্লেখ আছে যে, ভগদত্তের মৃত্যুর পূর্বে এই বংশীয় ২৩ জন ভূপতি যথাক্রমে কামরূপ শাসন করেন।

বঙ্কিমচন্দ্র ও ভগবতীচরণের বর্ণনায় বেশ কিছু বিস্ময়কর সাদৃশ্য আছে। ভগবতীচরণ পূর্বে *কোচবিহারের বিবরণ* নামে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা ‘এতদেশীয় পাঠশালাসমূহের ছাত্রদের শিক্ষা সৌক্যার্থে’ প্রণয়ন করেছিলেন। সম্ভবত তাতেও ওই বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছিল। কিন্তু *কোচবিহারের বিবরণ* লুপ্ত হয়েছে। আমাদের আর বোঝার উপায় নেই কে কাকে প্রভাবিত করেছিলেন। কিন্তু যা বুঝতে অসুবিধা হয় না তা হল বাংলাসাহিত্যের মূলস্রোতের প্রধান ব্যক্তিত্ব

রীতিমতো খোঁজখবর রাখতেন কোচবিহার-কামতাপুর-কামরূপের ইতিহাসের। তাঁর সময়ে তথ্যের অপ্রতুলতার দরুণ পুরাণকে বাদ দিয়ে ইতিহাস রচনা দুঃসাধ্য ছিল। কিন্তু প্রাচীন কিংবা মধ্যযুগের বাংলা সম্পর্কে নিষ্পৃহতার দায়, অজ্ঞতার দায় তাঁর উপর যে কখনও চাপান যাবে না তা প্রমাণিত হয়েছে। বরং তীব্র অনুসন্ধিৎসাতাকে সমগ্র বঙ্গের ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে জ্ঞানতে প্ররোচিত করেছে।

বস্তুত এই বিস্মরণ ও নিষ্পৃহতার দায় নিতে হবে বিশশতকের বাঙালিকে। এর আগেই আমরা লক্ষ করেছি মাধবাচার্য্যের জাগরণ চণ্ডীকাব্যের আলোচনায় কিভাবে ‘কামদাবাজী’ কসোডিয়া বা তিব্বতের ঘোড়ায় পরিণত হল। কামদাকে এই আলোচনায় ‘কামদ’ বলেও উল্লেখ করা হল। এই বিশ্লেষণ ১৯৩৫ সালের একটি গ্রন্থে লক্ষ করা যাচ্ছে।^{৪২} বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোধানের (১৮৯৪) চার দশকের মধ্যেই এটি ঘটে গেছে।

উনিশ শতকের শেষে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী দ্বাদশ শতকে সম্ভ্যাকর নন্দী রচিত *রামচরিতম* কাব্যটি আবিষ্কার করেন। এতে পালসম্রাট রামপালের বৃহত্তর বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের সামন্ত ও সমরনায়কদের সাহায্যে কৈবর্তরাজকে পরাজিত করে পিতৃভূমি পুনরুদ্ধারের কাহিনি আছে। কাব্যটি আবিষ্কারের পর প্রাচীন বাংলার ভূগোল নিয়ে আলোচনায় নানান বিভ্রাট দেখা দিল। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। রামপালকে যারা সাহায্য করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ঢেকুরীয় নৃপতি প্রতাপসিংহের উল্লেখ আছে। কোথায় এই ঢেকুরীয়? ঐতিহাসিকেরা বললেন এটি বর্ধমান জেলার কাটোয়ার নিকটবর্তী একটি গ্রাম।^{৪৩} অথচ রণপুর, কোচবিহার, গোয়ালপাড়া, ধুবড়ী ও জলপাইগুড়ি জেলার বহুসংখ্যক মানুষের কথা ভাবকে এই সেদিনও ঢেকুরী বলে অভিহিত করা হত। ভারতবর্ষে ভাষা সমীক্ষা ও গবেষণার অগ্রদূত গ্রীয়ার্সন সাহেব তা-জ্ঞানতেন।^{৪৪} কিন্তু তা আমাদের দেশের ঐতিহাসিকদের নজর এড়িয়ে যায়। আমাদের প্রতিপাদ্যের সমর্থনে একটি অকাট্য প্রমাণ দিই। দিনাজপুর জেলায় প্রাপ্ত একটি তাম্রশাসনেও ঢেকুরী নামে একটি স্থানের উল্লেখ আছে। আদি মধ্যযুগের এই তাম্রশাসনে বলা হচ্ছে মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষ ঢেকুরী দিয়ে প্রবাহিত জটদা নদীতে স্নান করে ভূমিদান করেছিলেন। ওই তাম্রশাসনে জটদা নদীতীরে এক শৈবতীর্থের অস্তিত্বের কথাও বলা হয়েছে।^{৪৫} সঙ্গতভাবেই অনুমান করা যায় জলপাইগুড়ি জেলার জটেশ্বর শিবালয় ওই প্রাচীন তীর্থক্ষেত্র যার পার্শ্ববর্তী নদীটিকে আজও জরদা বা ঝড়দা বলা হয়। তাম্রশাসনের প্রাপ্তিস্থল দিনাজপুর জেলায় তার নিকট উত্তরে অবস্থিতি জটেশ্বর মন্দিরের। অপরপক্ষে কাটোয়ার নিকটবর্তী ঢেকুরীর কাছে আছে গঙ্গা। সেখানে এমন কোনও স্রোতস্বিনী নেই যার নামের কোনও সাদৃশ্য আছে তাম্রশাসনের জটদার সঙ্গে। আর মহামাণ্ডলিক গঙ্গা স্নানের পর ভূমিদান করলে অন্য কোনও নদীর নামের উল্লেখও থাকতনা। বহু প্রাচীন তাম্রশাসনে গঙ্গাস্নানের পর ভূমিদানের কথা বলা হয়েছে। গঙ্গার পবিত্রতা সেকালেও সর্বজনমান্য ছিল।

আলোচনার শেষপর্বে একটি সদা উচ্চারিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি। কামতাপুরের বৈভব বিংশশতাব্দীর বাঙালি কিভাবে বিস্মৃত হল? এই প্রশ্নটি আমাদের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। প্রথমেই বলি শুধু কামতাপুর নয় বাংলার অনেক অঞ্চলই আমাদের স্মৃতি থেকে বিদায় নিয়েছে। একটি দৃষ্টান্ত দিই। চর্যাপদে ঢেউনপাদের একটি পদের উদ্ধৃতি দেওয়া যাক:^{৪৬}

টালত মোর ঘর নাহি পড়ি বেশী

হাড়িতে ভাত নাহি নিতি আবেশী।।

শ্রদ্ধেয় একজন বাঙালি পণ্ডিত 'টাল'-এর অর্থ করেছেন টিলা।^{৭৭} অর্থাৎ ছোটো পাহাড়। চর্যার দরিদ্র মানুষটিকে পাহাড়ে চড়িয়ে দিলে যেন তার ভাতের অভাব এবং প্রতিবেশীর অভাব পরিবেশের সঙ্গে খাপ খেয়ে যায়। আসলে বরেন্দ্রভূমি, পৌন্ড্রবর্ধন বা গৌড়ের (যেখানে হিউয়েন সাঙ বৌদ্ধধর্মের প্রাচীন লক্ষ্য করেছেন সেই সপ্তম শতাব্দীতে) পশ্চিম প্রান্ত দিয়ে বয়ে যাওয়া মহানন্দা নদীর পশ্চিমপারের এলাকার নাম টাল, বৃহত্তর বঙ্গের বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও ধর্মচর্চার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রগুলি যেমন নালন্দা, বিক্রমশীলা (বিহার) সোমপুর (পাহাড়পুর-রাজশাহী), নন্দীদীর্ঘী (মালদা), ভাসুবিহার (বগুড়া), জগদল (মালদা), কর্ণসুবর্ণ (রক্তমুক্তিকা মুর্শিদাবাদ), রামাবতী, ও পৌন্ড্রবর্ধন, টাল অঞ্চলের চারিদিকে ছড়ানো। টালের কোনও না কোনও প্রান্ত থেকে ওই শহর বা বৌদ্ধ বিহারগুলি কিম্বদন্তিধর্মী একশো মাইলের মধ্যে অবস্থিত ছিল। গৌড়, পাণ্ডুয়া, টাড়া, রাজমহল প্রভৃতি বাংলার প্রাচীন ও মধ্যযুগের রাজধানী নগরীগুলিও এই বৃত্তে অবস্থিত ছিল। বি, এম, মরিসন এই বরেন্দ্রভূমিকে বাংলার সবচেয়ে বেশি নগরায়ন সমৃদ্ধ অঞ্চল বলে উল্লেখ করেছেন।^{৭৮} চর্যাপদের দরিদ্র মানুষটি নাগরিক বৈভব থেকে দূরে, কোনো নগরের উপাঞ্চে বন্যপ্রাণ টাল অঞ্চলে থাকতেন বলে মনে করাই সম্ভব। তাছাড়া পদকর্তা তো সরাসরি টালই বলেছেন টিলা তো বলেন নি। দেখা যাচ্ছে বিংশশতাব্দীতে ঢেকুরী, টাল, কামতা প্রায় সবই আমরা বিস্মৃত হয়েছি। বাংলার প্রাচীন ভূগোলই আমাদের স্মৃতিতে নেই। তার সংস্কৃতি বা ইতিহাসের প্রশ্ন তো দূরস্ত। উনিশ শতকে ভোলাময়রার কবিগানে নোয়াখালির নৌকা, রঙপুরের স্বশুর, রাজশাহীর জামাই এবং বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলের বহু বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ আছে। আজ কিন্তু সমগ্র বাংলা সম্পর্কে সাধারণভাবে আমাদের ধারণা ভীষণ অগভীর। লোকসাহিত্য বা সাহিত্যের প্রধান ধারায় এই অভাব একইরকমভাবে অনুভূত হয়।

বাংলার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রাক্কেন্দ্র অষ্টাদশ শতকে মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়। কলকাতায় কালক্রমে যাঁরা বসতি করলেন তাঁরা প্রকৃতপ্রস্তাবে ছিন্নমূল। শিক্ষাদীক্ষায় ঐরাই ক্রমশ বাংলা তথা সারাভারতে নেতৃস্থানীয় হয়ে উঠলেন। তাঁদের সাংস্কৃতিক চরিত্রে সর্বভারতীয় একটি Dimension যুক্ত হল। কালক্রমে লুপ্ত হল ফেলে আসা প্রত্যন্ত গ্রামের সঙ্গে তাঁদের সংযোগ। দেশবিভাগ এই বিচ্ছিন্নতাকে স্পষ্টতর করল। একসময় বাঙালিমাঠেই নতুন পরিচিত কাউকে দেখলেই দেশ বা জেলার কথা জিজ্ঞাসা করতেন। এই অভ্যাস এক প্রজন্ম পূর্বে পরিত্যক্ত হয়েছে। তাই বাঙালি পশ্চাদপটবিহীন এক জাতি হিসাবে পরিগণিত হয়ে পড়ছে। বহির্বঙ্গের মানুষের কাছে কলকাতা ও বাঙালি প্রায় সমার্থক। আমরাও এই বিস্মৃতিকে স্বীকৃতি দিয়েছি। এই পরিস্থিতির পরিবর্তন চাইলে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙলার ভূগোল, ইতিহাস, ভাষা, সাহিত্য, শিল্প, লোকাচার নিয়ে ব্যাপক চর্চার প্রয়োজন। অভিনিবেশের প্রয়োজন।

সূত্র

১ Majumdar, W. B. *District Gazetteers, Kochbihar*, PP. 27-28, Kolkata, 1977

২ Ibid

৩ Fleet, *Corpus Inscriptionum Indicarum*, Vol. III P. 6, Calcutta, 1988

৪ Majumdar, Op cit., p. 28

৫ Ibid,

৬ যশোধর্মণের মাস্ত্রাসোর লিপি দ্রষ্টব্য। বিদ্বত আলোচনার জন্য Bhattacharyya, M S, 'The Sources

of the History of Coochbehar', *The Historical Review*, Vol XI, P 16 দ্রষ্টব্য।

- ৭ Majumdar, op. cit., P. 20
- ৮ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, *গৌড় লেখনীমালা*, প্রথম স্তবক, পৃ ৬৬ রাজশাহী, ১৩১৯।
- ৯ Bhattacharyya, P., *Kamarupa Śāsanavatlī*, L.C. 177 Rangpur, 1931
- ১০ সঙ্ঘাচর নন্দী, *রামচরিতম*, (৩, ৪৭,) সম্পাদনা রমেশচন্দ্র মজুমদার ইত্যাদি, রাজশাহী, ১৯৩৯।
- ১১ সূত্র ওই; অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, পূর্বোদ্ধিষিত, পৃ ১২৮-১৩৭।
- ১২ রজনীকান্ত চক্রবর্তী, *গৌড়ের ইতিহাস* (সম্পাদনা ড. মলয়শঙ্কর ভট্টাচার্য্য) পৃ ১৫৩-১৫৭, কলকাতা ১৯৯৯
- ১৩ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, পূর্বোদ্ধিষিত, পৃ ১২৮-১৩৭
- ১৪ আদি মধ্যযুগের কোচবিহার ও অসমের রাজনৈতিক ইতিহাসের জন্য দ্রষ্টব্য E. A. Gait প্রণীত *History of Assam* এবং কামরূপ বুরঞ্জী, দেওধাই অসম বুরঞ্জী, অসম বুরঞ্জী ইত্যাদি গ্রন্থগুলি। নিবন্ধের অন্যত্র এগুলির উল্লেখ করেছে।
- ১৫ See Gait, P. 48
- ১৬ পৃথুরাজা ও তাঁর বংশধরদের সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন ভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর *কোচবিহারের ইতিহাস* (১৮৮২) গ্রন্থে (সম্পাদিত সংস্করণ — নৃপেন্দ্রনাথ পাল, পৃ ৪৯, কলকাতা, ১৩৯৪; রায় গুণাভিরাষ বড়ুয়া সম্পাদিত কামরূপ বুরঞ্জীতেও এ বিষয়ে তথ্য পাওয়া যায়।
- ১৭ মজুমদার, পূর্বোদ্ধিষিত, পৃ. ২৯।
- ১৮ বিস্মৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য E.A. Gait, *History of Assam*.
- ১৯ মজুমদার, পূর্বোদ্ধিষিত, পৃ. ২৯।
- ২০ সূত্র ওই, পৃ. ৩০।
- ২১ সুকুমার সেন, *বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, পৃ ৩৩৭ কলকাতা, ১৯৪৮।
- ২২ বিস্মৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য M. S. Bhattacharyya, 'Sources of the History of Coochbehar— An Overview', *The Historical Review*, Vol XI, L.C. 18
- ২৩ M. S. Hnattacharyya, *Art of Bengal : The Sculptures of the Mahananda-Karatoya Valley, 2nd to 12th Century* Kolkata 2001
- ২৪ S. K. Saraswati, *Forgotten Cities of Bengal*, JRASB (NS) Vol. XXVIII, 1932
- ২৫ পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, *অরগ্যছায়াম মন*, পৃ ৬২, কলকাতা, ১৯৬৯।
- ২৬ বিস্মৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, J. Horton Ryley, *England's Pioneer to India and Burma*, London, 1899
- ২৭ সুকুমার সেন, পূর্বোদ্ধিষিত, পৃ. ৩৩৮ ও ৩৪৬
- ২৮ গোলাম হোসেন, *রিমাজ উস সালাতীন*, (রামপ্রাণ গুপ্তের বঙ্গানুবাদ, সম্পাদনা মলয়শঙ্কর ভট্টাচার্য্য ও অন্যান্য, পৃ. ৫-৬, মালদা ১৩৯৭।
- ২৯ বিস্মৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, T. C. Dasgupta, *Aspects of Bengali Society*, L.C 76, Calcutta, 1935
- ৩০ গোলাম হোসেন, পূর্বোদ্ধিষিত, পৃ. ৬।
- ৩১ সুকুমার সেন, পূর্বোদ্ধিষিত, পৃ. ৩৩৮।
- ৩২ সূত্র, ওই।
- ৩৩ মুণালকান্তি দাম, *মধুপর্ণী* (কোচবিহার জেলা সংখ্যা) পত্রিকায় এ প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন, মধুপর্ণী, পৃঃ ২৪৫, বালুরঘাট, ১৯৯০।
- ৩৪ সূত্র ওই।
- ৩৫ সুকুমার সেন, পূর্বোদ্ধিষিত, পৃ ৩৩।

- ৩৬ সূত্র ওই, পৃ. ৩৩৯।
- ৩৭ সূত্র ওই, পৃ. ৩৩৮; শচীন্দ্রনাথ রায়, 'রাজন্যশাসিত কোচবিহারে সাহিত্য সাধনা', মধুপুর্নী, কোচবিহার জেলা সংখ্যা, পৃ. ২২৮-২৪৪, বালুরঘাট, ১৯৯০
- ৩৮ S. B. Dasgupta, *A Descriptive Catalogue of Bengali Manuscripts Preserved in the State Library of Coochbehar*, L.C., Coochbehar, 1948
- ৩৯ দ্রষ্টব্য, বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৯।
- ৪০ ভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *কোচবিহারের ইতিহাস*, (সম্পাদিত সংস্করণ-সম্পাদনা নৃপেন্দ্রনাথ পাল) পৃ. ৪৯, কোচবিহার, ১৯৮৭।
- ৪১ সূত্র, ওই।
- ৪২ দ্রষ্টব্য T. C. Dasgupta, *Aspects of Bengali Society*, L.C. 76, Calcutta, 1935.
- ৪৩ *The Ramacaritam of Sandhyakarnandin*, (Ed. R.C. Majumdar et al.), Introduction L.C. XXVII.
- ৪৪ Gneron, G. A., *Linguistic Survey of India*, Vol V-Indo-Aryan Family, Eastern Group, Part I, Specimens of Bengali and Assamese Languages, Kolkata, 1903
- ৪৫ নির্মলচন্দ্র চৌধুরী, জ্ঞানেশ মহাপীঠের প্রাচীনত্ব, (প্রবন্ধ), *ঐতিহ্যে ইতিহাসে উত্তরবঙ্গ* (সম্পাদনা সরকার), পৃ. ১৮৬-১৮৭, ডিব্রুগড়, ২০০২।
- ৪৬ শশীভূষণ দাশগুপ্ত, *বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি*, পৃ. ৭৬ কলকাতা।
- ৪৭ সূত্র, ওই।
- ৪৮ B. M. Morrison, *Political Centres and Cultural Regions in early Bengal*, L. C. 180.



5



6



7



8



6



6



মঙ্গলকোটের যক্ষমূর্তি



মঙ্গলাকোটের যক্ষমূর্তি

সুন্দরবনে প্রাপ্ত শশাঙ্কের স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা

সাগর চট্টোপাধ্যায়

মোটামুটি পাল-সেন যুগ পর্যন্ত দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার একটা আবছা ইতিহাস পাওয়া যায় প্রত্ন নিদর্শন মারফৎ। নিদর্শনগুলি হল তাম্রশাসন, মূর্তি, ভাস্কর্য, দেউল শ্রেণিভুক্ত ইটের স্থাপত্য ইত্যাদি। কিন্তু ভূগর্ভ থেকে আবিষ্কৃত পোড়ামাটির বহু নিদর্শন ও মুদ্রা এই ইতিহাস অন্তত মৌর্য-শুঙ্গ যুগ পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়ার দাবি রাখে। এই পর্বে এই জেলায় পাওয়া গেছে পোড়ামাটির প্রচুর শুঙ্গ-যক্ষিণী, শুগু আমলের স্বর্ণমুদ্রা।^১ এ ছাড়াও পাওয়া গেছে নবগ্রাম, বুড়োবুড়ির তট থেকে স্বর্ণমুদ্রা।^২ যদিও এই মুদ্রা আবিষ্কার থেকে প্রমাণ হয় না যে ওই সময়ে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বিস্তৃত ভূভাগ সেন আমলের মতো কোনো প্রত্যক্ষ প্রশাসনে প্রশাসিত হয়েছিল।^৩ তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় এটাই যে একদা সুন্দরবনের গহন অরণ্য হাসিল করে দ্বীপগুলিতে জনবসতি পত্তনের পর বিভিন্ন সময়ে সেখানে পাল-পূর্ব যুগের ওই ধরনের প্রত্ন-নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। সুন্দরবনের পাথরপ্রতিমা ব্লকের জি-প্লট এমনই একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ যেখানে বর্তমান জনবসতির শুরু কমবেশি একশ বছর আগে। এই দ্বীপের বুড়োবুড়ির তট গ্রামটি (জে. এল. নং-২১২) থেকে একটি শুগু আমলের স্বর্ণমুদ্রা পাওয়ার কথা আগেই বলা হয়েছে। বুড়োবুড়ির তটের কিছুটা উত্তরে 'উত্তর সুরেন্দ্রগঞ্জ' এই দ্বীপেরই আর একটি মৌজা (জে. এল. নং-২০৯)। যেখানে আবিষ্কৃত হয়েছে পাল-পূর্ব যুগের দু-টি স্বর্ণমুদ্রা ও দুটি রৌপ্যমুদ্রা। এগুলি সংরক্ষিত আছে এই গ্রামেরই জি-প্লট বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরে। এগুলির মধ্যে রয়েছে গৌড়রাজ শশাঙ্কের একটি স্বর্ণ ও দুটি রৌপ্যমুদ্রা (খ্রিস্টীয় ৬০০-৬৩০ অব্দ) এবং শুগু পরবর্তী আমলের আর একটি স্বর্ণমুদ্রা।

ব্রাহ্মী হরফে 'শ্রী শশাঙ্ক' লিপি উৎকীর্ণ শশাঙ্কের স্বর্ণমুদ্রাটি পরিচিত হলেও, শশাঙ্কের রৌপ্যমুদ্রাদুটি বিরলদৃশ্য। এই ধরনের রৌপ্যমুদ্রা পাওয়া গেছে ময়নামতীর শালবন বিহার উৎখননে।^৪ তিনটি পাওয়া গেছে অবিভক্ত চব্বিশ পরগনা থেকে।^৫ আর একটি লক্ষ করা যায় ঢাকার একটি ব্যক্তিগত সংগ্রহশালায়।^৬ শুগু আমলের মুদ্রার অনুকরণে তৈরি এই মুদ্রা দুটির সোজা অংশে ব্যূহের ওপর উপবিষ্ট শিব। নীচে ব্রাহ্মী হরফে জয়া, ডাইনে 'শ্রীশ', উলটো দিকে পদ্মাসনে উপবিষ্টা লক্ষ্মীর অভিষেকক্রিয়া। দু'ধারে অভিসিদ্ধনরত হস্তী। এই পিঠেই ডানদিকে ব্রাহ্মী হরফে উৎকীর্ণ লিপি 'শ্রী শশাঙ্ক'। ব্যাকট শিবের আর্সনভঙ্গির তফাৎ দুটি মুদ্রায় লক্ষ করা যায়। এই জেলায় শশাঙ্কের একটি স্বর্ণ ও দু-টি রৌপ্যমুদ্রার আবিষ্কার বিরল ও তাৎপর্যপূর্ণ। এগুলি ছাড়াও স্কুলটিতে সংরক্ষিত অবশিষ্ট স্বর্ণমুদ্রাটি 'Sankh Shell' শ্রেণিভুক্ত বলে মনে

হয়েছে।^১ এটিও বিরলদৃশ্য এবং একান্তই বাংলার নিজস্ব শৈলী যুক্ত। শশাঙ্কের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই এ ধরনের স্বর্ণমুদ্রা তৈরি হয়ে এসেছে। উক্ত গ্রামটিতে এমনই আরো কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা পাওয়ার কথাও বলেন গ্রামবাসীরা। তবে এগুলির কোনো খোঁজ পাওয়া যায় না।

মুদ্রা ছাড়াও এই গ্রামটি থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে পোড়ামাটির একটি সুঅলংকৃত কলসী। অলংকরণের মধ্যে স্থান পেয়েছে কমণ্ডলু, মাছ, বরাহ, ময়ূর, ঘোড়া, ড্রাগন ও হাতি। এটিও পূর্বোক্ত বিদ্যালয়ে সংরক্ষিত। গবেষণার দাবি রাখে। প্রসঙ্গত বঙ্গোপসাগর লাগোয়া জি-প্লট দ্বীপখণ্ডের এই উত্তর সুরেন্দ্রগঞ্জ গ্রামটি প্রত্নতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণে উল্লেখ্য। প্রায় ১০ ফুট উঁচু বেশ কয়েকটি সুবিস্তৃত টিপিও গ্রামটিতে লক্ষ করা যায়। খোলামকুচি পরিবেষ্টিত এই টিপি কেটে পাওয়া যাচ্ছে Offset যুক্ত বিশেষ ধরনের সাবেকি টালি ইট (১৯ × ১৭ × ৬ ঘন সেমি) ও ইটের দেওয়াল। ইটগুলি যথেষ্টভাবে গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে ফলে টিপিগুলিও দ্রুত সমতল হয়ে আসছে। টিপি, টিপি সংলগ্ন অঞ্চল থেকে বিভিন্ন সময়ে আবিষ্কৃত হয়েছে কালো পাথরের অলংকৃত ও ভাস্কর্যমণ্ডিত দ্বারবাজু (গড় দৈর্ঘ্য চার ফুট)। দ্বারবাজুতে খোদিত গরুট, দ্বারী, বীণাপাণি ইত্যাদি দেব-দেবী মূর্তি। এমনই একটি দ্বারবাজু রয়েছে হংসেশ্বর শিবের আধুনিক শিবমন্দিরটিতে। শিবমন্দিরটি গ্রামের বাজার সংলগ্ন সুবিস্তৃত টিপিটির ওপর (প্রায় ৩০০ × ২০০ × ১০ ঘন ফুট)। মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত কালো পাথরের ক্ষয়প্রাপ্ত ও অর্ধভগ্ন শিবলিঙ্গটিও সুপ্রাচীন। এটি আবিষ্কৃত হয়েছে এই টিপি খুঁড়ে। এ ছাড়াও গ্রামটি থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে কালো পাথরের দেবী সরস্বতী সহ আরো কিছু বিগ্রহ। টিপিটির নীচে সুপ্রাচীন কোনো মন্দিরের ক্ষয়সাবশেষ থাকার সম্ভাবনা অমূলক নয়। আরো তাৎপর্যপূর্ণ গ্রামটির ভৌগোলিক অবস্থান। দক্ষিণে কয়েকটি গ্রাম ফেলে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে কার্জন ক্রীক। কার্জন ক্রীকের ঠিক ওপারে সুন্দরবনের এফ-প্লট-এর অন্তর্ভুক্ত বড়ো রাক্ষসখালি যার প্রচলিত নাম ব্রজবল্লভপুর গ্রাম তথা মৌজা (জে. এল. নং- ২০৬)। এই ব্রজবল্লভপুর-গ্রামটি থেকেই আবিষ্কৃত ডোমনপালদেবের সুপরিচিত রাক্ষসখালি তাম্রশাসন।^২ এই রাক্ষসখালি থেকে একাদশ শতকের হরক উৎকীর্ণ পোড়ামাটির সিল পাওয়ারও কথা উল্লেখ করেছেন নলিনীকান্ত ভট্টশালী^৩। উত্তর সুরেন্দ্রগঞ্জের মতো ব্রজবল্লভপুরেও রয়েছে একই ধরনের উঁচু-নীচু জমি ও প্রায় ৬০ বিঘে সুবিস্তৃত নাতিউচ্চ টিপি। টিপি খুঁড়লেই পাওয়া যাচ্ছে সাবেকি বৃহদাকার টালি ইট (৩২ × ২০ × ৪, ৩২ × ২২ × ৪, ৩৫ × ২২ × ৪ ঘন সেমি)। লক্ষ করা যাচ্ছে ইটের বনেদ সহ গোলাকার কূপের নিদর্শন ও মৃৎসামগ্রী। উত্তর সুরেন্দ্রগঞ্জ ও ব্রজবল্লভপুর (বড়ো রাক্ষসখালি) মুখোমুখি দুটি গ্রাম, মধ্যে কার্জন ক্রীক। গ্রামদুটির বৃহত্তম টিপি দুটিকে একই সরলরেখায় যুক্ত করা যায়। সম্ভবত দুটি টিপির মধ্যেই রয়েছে কোনো নিবিড় যোগসূত্র। গ্রামবৃদ্ধদের শ্রুতি অনুযায়ী অতীতে মুখোমুখি এই দুটি গ্রামের মধ্যে সংযোগকারী ইটের প্রাচীর বা গড়ের অস্তিত্ব ছিল যার একাংশ ক্রমশ চওড়া হয়ে আসা কার্জন ক্রীকের গর্ভে আজ নিমজ্জিত। অনুমিত হয় পাল-সেন কি তার আগে থেকেই প্রত্যন্ত সুন্দরবন অঞ্চলের এই দ্বীপগুলিতে জনবসতির অস্তিত্ব ছিল। ভূ-আন্দোলন বা অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে তা নিশ্চিহ্ন হয়েছে। যাইহোক প্রত্নতাত্ত্বিক দিক থেকে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ সুন্দরবনের এই গ্রাম দুটিতে দ্রুত প্রত্ন-উৎখন দরকার।

তথ্যসূত্র ও উল্লেখপঞ্জী :

- ১ John Allan—'Catalogue of the coins' of the Gupta Dynastics and of Sasanka, king of Gauda (in the British Museum), London, 1914, p. 60-61, 124-26
- ২ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার বারুইপুর ব্লকের নক্সামে পাওয়া গেছে কুমার গুপ্ত অন্যমতে জয়নাগ এবং পাথরপ্রতিমা ব্লকের বুড়োবুড়ির তটে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের একটি করে স্বর্ণমুদ্রা—গৌরীশঙ্কর দে, চব্বিশ পরগনায় প্রাপ্ত তাম্রলেখ ও মুদ্রা, ২৪ পরগনা প্রত্নতাত্ত্বিক সম্মেলন' ১৯৮৩, এ ছাড়াও দ্রষ্টব্য যুগান্তর (৫.১১.৮৫)
- ৩ দক্ষিণ ২৪ পরগনায় এ পর্যন্ত যতগুলি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়েছে তা প্রায় সবই সেন আমলের। যেমন লক্ষণ সেনের গোবিন্দপুর এবং বকুলতলা বা সুন্দরবন তাম্রশাসন। এ ছাড়াও আছে রামকুশালির তাম্রশাসন যা ওই সেন আমলের বলেই মনে করা হয়। এর আগে এই জেলার পশ্চিম জটা গ্রামে আবিষ্কৃত জটায় দেউলের নির্মাণ কাল সংক্রান্ত ৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের রাজা জয়ন্তচন্দ্রের তাম্রশাসনের উল্লেখ ১৮৯৬-তে পূর্তদপ্তরের List of Ancient Monuments in the Presidency Division বইটিতে পাওয়া গেলেও তা নিয়ে বিতর্ক আছে। এই উল্লেখটুকু ছাড়া তাম্রশাসনটির কোনো ছবি বা খোঁজ পাওয়া যায় না।
- ৪ Bangladesh Archaeology. I. i, 1979, p-76
- ৫ P. K. Bhattacharya, on Coinage of Sasanka" coinage of Bengal and its neighbourhood, edited by J. P. Zize Varanasi, 1980, সেই সঙ্গে দ্রষ্টব্য। Michal Mitchiner, The land of water, coinage and History of Bangladesh and Later Arkan. Circa 300 B. C to the Present day, London' 2000, P-38
- ৬ Ibid (Michal Mitchiner). P-38
- ৭ 'Gold Coinage of the Sankh Shell Series : Circa 640-730's. The 'Sankh Shell Standard' Staters, a Well Known Bengal Series, have generally been included among unattributed Bengal staters of the Post-Gupta Period. ...The Series connenced around AD 640, shortly after the death of Sasanka.—ibid (Michal Mitchiner), p. 49-51
- ৮ Epigraphia Indica Vol. XXVII এবং Vol. XXX, বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ সংগ্রহশালায় রক্ষিত।
- ৯ N. K. Bhattacharya—Antiquity of the Lower Ganges and its Courses, Science and Culture, Vol. VII, No. 5, 1941, P-233

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : গৌতম সেনগুপ্ত (রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব অধিকর্তা) ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী (আনন্দবাজার পত্রিকা), প্রকাশ মাইতি (রাজ্য প্রত্ন ও সংগ্রহালয় অধিকার) সুধাংশু ত্রিপাঠি (রামগঙ্গা, পাথরপ্রতিমা অঙ্কন খান (তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ)।
মুদ্রাগুলির সনাক্তকরণে ও লেখায় বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ নিরঞ্জন গোস্বামী (প্রাক্তন কিউরেটর, আশুতোষ সংগ্রহশালা), প্রতীপ মিত্র (কীপার, রাজ্য প্রত্ন সংগ্রহালয়) সূতপা সিন্হা (সেন্টার ফর আরকিয়লজিক্যাল স্টাডিজ অ্যান্ড ট্রেনিং, ইষ্টার্ন ইন্ডিয়া)

মঙ্গলকোটের যক্ষ মূর্তি

রঙ্গনকান্তি জানা

বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার মঙ্গলকোট থানার অজয় নদ ও কুনুর নদীর অববাহিকায় অবস্থিত, মঙ্গলকোট গ্রাম। বৃহদ্রম পুরাণ-এ^১ ‘মঙ্গল কোষ্ঠক’ নামে একটি স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়:

উজ্জয়িন্যাম তথা পূৰ্ব্বাম পীঠম্ মঙ্গলকোষ্ঠকম্।

শতামঙ্গল-চতুষাখ্য যত্রাহম্ বরদাযিনী॥ ১৪/১৪

পুরাণের এই স্থানোল্লেখ, বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট কিনা, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তবে মঙ্গলকোট, উজ্জয়ী-কোগ্রামের উল্লেখ তন্ত্রশাস্ত্র ও মঙ্গলকাব্যে পাওয়া যায়।^২ এই মঙ্গলকোটে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে^৩ এটা প্রমাণিত, অজয় নদ ও কুনুর নদীর অববাহিকায় প্রথম জনবসতি গড়ে উঠেছিল খ্রিস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দে, তবে তা ছিল গ্রাম। এই জনবসতি নগরের চেহারা নেয়, তারও বেশ কিছু সময় পরে। বিরাট অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে থাকা এই প্রত্নস্থলটি, প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে শুরু করে, মৌর্য-শুঙ্গ-কুবাণ-গুপ্ত এবং আরো পরবর্তীকালে মুসলমানী আমলের সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনেক অনেক চিহ্ন আজও বুকের মধ্যে আগলে রেখেছে।

আলোচ্য মূর্তিটি এই অজয় নদ ও কুনুর নদীর অববাহিকায় অবস্থিত মঙ্গলকোট প্রত্নস্থল থেকে (কুনুর নদী থেকে), গত ইংরাজি ২০০২ সালের প্রথম দিকে, ওই অঞ্চলের এক মৎস্যজীবী উদ্ধার করে। বর্তমানে মূর্তিটি বর্ধমান জেলার জেলাশাসকের দপ্তরে জমা আছে।

এই ত্রিমাত্রিক স্থলকায় খর্বাকৃতি পুরুষ মূর্তিটি বালুপাথরে তৈরি (Sand Stone)। মূর্তিটির মাপ হল, যথাক্রমে : উচ্চতা : ১.১৯ মিটার; প্রস্থ : ০.৬৩ মিটার; এবং বেধ : ০.৪৩ মিটার। (ছবি নং ১) (ছবি নং ২)। একটি চার কোণা পাথরের খণ্ডের ওপরে, প্রায় অর্ধেক বসা অর্ধেক দাঁড়ানোর ভঙ্গিমায়ে, এই পুরুষ মূর্তিটির সম্পূর্ণ শরীরের কাঠামোটিকে তৈরি করা হয়েছে। মূর্তিটির হাত দুটি ওপরের দিকে তোলা এবং কনুই থেকে দুটি হাতই ভাঙা। দেখে মনে হয়, স্থলকায় খর্বাকৃতি পুরুষ মূর্তিটি, মাথার ওপরে কোনো ভারকে ধরে আছে। মাথার ওপর ভাগটি ভাঙা। মাথার চারপাশে জড়ানো রয়েছে, কারু কাজ করা শিরপেঁচ বা টায়রা। প্রত্যেকটি কানে ঝুলছে, দুটি লম্বা মুক্তো যুক্ত দুল। গলায় শোভা পাচ্ছে চণ্ডা পাঁচগাছা হার। শরীরের উপর ভাগ আবরণ ছাড়া, তবে নীচের ভাগ হাঁটুর ওপর অবধি আঁটোসাঁটো ধুতিতে ঢাকা। পুরুষ মূর্তিটির নাভির নীচে ধুতি বাঁধার গাঁট, সামনে ও পেছনে ধুতির তাঁজ, কোমরে বাঁধা সুদৃশ্য কোমর বন্ধের গিঁট, এবং গলার পেছন দিকে গলায় পরা হারের গিঁট সুস্পষ্টভাবে খোদাই করা হয়েছে। চোখদুটি বন্ধ এবং হাস্যময় মুখ। এই স্থলকায় খর্বাকৃতি পুরুষ মূর্তিটির সমস্ত চেহারায় শাস্ত্র ভাবটি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

এই মূর্তিটি একটি বালুপাথরের (Sand Stone) খণ্ড থেকে তৈরি করা, বলে মনে হয়। যদিও মূর্তিটির একেবারে উপরের অংশটি ভাঙা। এই পাথর সংগ্রহ করা হয়েছিল, বাংলারই

কোনো বালুপাথরের উৎস থেকে। নির্মাণ শৈলীর বিচারে মূর্তিটির তৈরির সময়কাল আনুমানিক গুপ্ত-কুষাণ মধ্যবর্তী সময়। ত্রিমাত্রিক এই মূর্তিতে উত্তর ভারতীয় শিল্প ভাবনা ও আঞ্চলিক শিল্প ভাবনার মিশ্র প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে শিল্প ইতিহাসের প্রামাণ্য গবেষক গৌতম সেনগুপ্তের মতটি প্রণিধান যোগ্য।^৪ তাঁর মতে: “প্রাচীন বাংলার কোনও কোনও অঞ্চলের সঙ্গে উত্তর ভারত এবং মধ্য গাঙ্গেয় সমভূমি এলাকার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। অন্য কয়েকটি অঞ্চলের ক্ষেত্রে এই সংযোগ তত নিবিড় নয়। এই নৈকট্য এবং বিচ্ছিন্নতার প্রভাব দেখা যায় শিল্প শৈলীতে।”

এই ধরনের ভারবাহী যক্ষমূর্তি (male caryatid) সম্পর্কে আলোচনায় আনন্দকুমার স্বামী বলেছেন^৫: “As Atlantes, supporters of buildings and superstructures (Pl 13, fig 1, 2, 3) and as garland-bearers (Pl 23, fig 1, 2) Yaksas are constantly represented in early Indian art (Bharut, Sāñchī, Gandhāra etc). Those who support Kuvera’s flying palace are designated Guhyas (Mahābhārata 2, 10, 3); Kuvera is Guhyapatī. The Guhyas are essentially earth-gnomes (cf. Pl 13 fig 1)”.

প্রসঙ্গত বলা যায়, সাঁচীস্থলের পশ্চিম তোরণে, তোরণের চারকোণা স্তম্ভদুটির ওপর ভাগে এই ধরনের স্থলকায় খর্বাকৃতি একাধিক যক্ষের (male caryatid) মূর্তি দেখতে পাওয়া যায়।^৬ যদিও এই মূর্তিগুলির মুখের ভাবপ্রকাশ এক ধরনের নয়। এই প্রসঙ্গে দেবলা মিত্রের পর্যবেক্ষণটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ^৭: “The varied facial expressions of these dwarfs of rugged strength, all represented on the west Gateway, are particularly noteworthy; some are groaning under the weight, some again bearing it resignedly, while others taking it rather lightly.”

আদি ঐতিহাসিক পর্বে, বাংলায় মূর্তি ভাবনার একটি সামগ্রিক রূপ রেখা দেওয়া খুবই কঠিন কাজ। কারণ, এই পর্বের যে সব নিদর্শন এ যাবৎ পাওয়া গিয়েছে, তার সংখ্যা খুবই কম, এবং তা পাওয়া গিয়েছে আকস্মিকভাবে, কোনো উৎখননে নয়। যার দরুণ এই সব নিদর্শন ওই বিশেষ প্রত্নস্থলটির (যেখান থেকে পাওয়া গিয়েছে) সঙ্গে কোনো ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে জড়িয়েছিল, তার অনুসন্ধান খুবই দুষ্কর কাজ।^৮

তথ্য সূত্র

- ১ Haraprasad Sastri, *Brhaddharma Purāṇam*, Varanasi (Chaukhamba), 1974, 14 ch 14 Sloka.
- ২ R. C. Hazra, *Studies in the Upapurāṇs*, Vol. II, Calcutta, 1958, P. 63
- ৩ Amita Roy and S. K. Mukherjee, ‘Excavation at Mangalkot’, *Pratnasamuskha*, Vol. I, Calcutta, 1992, pp. 107 to 136.
- ৪ গৌতম সেনগুপ্ত, ‘বাংলার ভাস্কর্য’, কৌশিকী, হাওড়া/কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ২৫৫।
- ৫ Ananda. K. Coomarswamy, *Yaksas*, (Part I and II), New Delhi, 1971, P. 8
- ৬ Ananda. K. Coomarswamy, *Yaksas*, part I and II, New Delhi, 1971, Plate 10 No. 1.
- ৭ Devala Mitra, *Sanchi*, New Delhi 1965, Page 19 (footnote No. 2).
- ৮ আগ্রহী পাঠক পড়ে দেখতে পারেন, গৌতম সেনগুপ্ত, ‘বাংলার ভাস্কর্য’, কৌশিকী, হাওড়া/কলকাতা, ১৯৯৫।

পরিষৎ-সংবাদ

৫ চৈত্র ১৮১২ রবিবার ১৯ মার্চ ২০০৬ বিকাল পাঁচটায় পরিষৎ ভবনে অধ্যাপক গোপীনাথ কবিরাজ স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন অধ্যাপক দেবব্রত সেন শর্মা। সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিষদ সভাপতি অধ্যাপক পবিত্র সরকার।

১১ ও ১২ চৈত্র ১৪১২ শনিবার ২৫ ও ২৬ মার্চ ২০০৬ পরিষৎ ভবনে সংবাদ সাময়িক পত্র সম্পর্কে আলোচনা সভা ও প্রদর্শনী আয়োজিত হয়। প্রথম দিন বেলা দু-টায় উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রথমে স্বাগত ভাষণ দেন পরিষদের সম্পাদক অধ্যাপক রমাকান্ত চক্রবর্তী। মূল ভাষণ দেন পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির সভাপতি এবং বিশিষ্ট কবি শ্রীনিরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। এরপর প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রধান সচিব শ্রীদিলীপ চক্রবর্তী।

একই দিনে বিরতির পর প্রথম অধিবেশন শুরু হয় বেলা সাড়ে তিনটায়। সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির সচিব শ্রীসনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়। এই দিনের আলোচনায় বাংলাদেশের বিশিষ্ট গবেষক মালেকা বেগম এবং অধ্যাপক রমেন সেন, যথাক্রমে 'বাঙালি মুসলমান মেদের পত্রিকার জগৎ' এবং 'নাটকের কাগজ' বিষয়ে বক্তৃতা দেন। অধিবেশন শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পরিষদের সহ সভাপতি শ্রীনির্মল নাগ।

দ্বিতীয় দিনের প্রথমে অধিবেশন শুরু হয়

বেলা বারোটায়। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক আলোক রায়। আলোচনার শুরুতে 'কবিতা পত্রিকা' বিষয় বক্তৃতা দেন পরিষদের পত্রিকাধ্যক্ষ শ্রীপ্রভাতকুমার দাস। পরে অধ্যাপক সুমন ভট্টাচার্য 'বাংলা পত্রিকায় জাতি ও বর্ণ' এবং শ্রীমতী গীতা চট্টোপাধ্যায় 'প্রাক-স্বাধীনতাপূর্বে মহিলা সম্পাদিত সাময়িক পত্র' বিষয় বক্তৃতা পাঠ করেন।

বিরতির পর দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয় বিকেল সাড়ে তিনটায়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট কবি ও সংবাদিক শ্রীকৃষ্ণ ধর। আলোচনার শুরু করেন পুঁথিালাধ্যক্ষ অধ্যাপক সুবিমল মিশ্র, তাঁর বিষয় 'শিশু কিশোর পত্রিকা'। অধ্যাপক স্বপন বসুর বক্তৃতার বিষয় 'উনিশ শতকের বাংলা সংবাদপত্র ও জনমত'। চিত্রশালাধ্যক্ষ শ্রীইন্দ্রজিৎ চৌধুরী 'স্বাধীনতা উত্তর বাংলা সংবাদপত্র' বিষয়ে বক্তৃতা দেন। সভার শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পরিষদের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক শ্রীঅশোক রায়চৌধুরী। দু-দিনের অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন সহ-সম্পাদক শ্রীঅলোক দাস।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ এবং গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য বিজ্ঞান প্রসার সমিতির যৌথ উদ্যোগে ২৫ চৈত্র ১৪১২ শনিবার ৮ এপ্রিল ২০০৬ বিকাশ পাঁচটায় পরিষৎ সভাঘরে গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের ২৫-তম বার্ষিক স্মরণ-সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক

সত্যব্রত দাশগুপ্ত ও অধ্যাপক রতনলাল ব্রহ্মচারী। অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান প্রসার সমিতির পক্ষ থেকে সায়ন মুখোপাধ্যায় অঙ্কিত গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের প্রতিকৃতি সাহিত্য পরিষৎকে প্রদান করা হয়।

প্রদর্শনী

বাংলা সংবাদ ও সাময়িক পত্র বিষয়ে প্রদর্শনী ২৫ মার্চ ২০০৬ উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রধান সচিব শ্রীদীপ চক্রবর্তী। প্রদর্শনীটি ৩১ মার্চ ২০০৬ পর্যন্ত সাধারণ দর্শকদের জন্য খুলে রাখা হয়। পত্রপত্রিকা ও সম্পাদকদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় সংবলিত তথ্যসমৃদ্ধ সচিত্র একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। সমগ্র প্রদর্শনীর পরিকল্পনা করেন অধ্যাপক স্বপ্নন বসু। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পাঠক সমাজ ও পরিষদের কর্মীদের সহযোগিতায় এই প্রদর্শনীটি রূপায়িত হয়। নেপথ্যে চিত্রশালাধ্যক্ষ শ্রীহরজিৎ চৌধুরীর শ্রমসাধ্য সহযোগিতা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। পূর্বোক্ত পুস্তিকাটি পাঁচ টাকা মূল্যে সর্ব সাধারণের কাজ বিক্রয় করা হয়।

প্রকাশন

গত ১৪১২ বঙ্গাব্দের ফাঙ্কুন মাসে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ১১২ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা কার্তিক-পৌষ ১৪১২ প্রকাশিত হয়। আলোচ্য সংখ্যায় প্রবন্ধ লেখেন রমাকান্ত চক্রবর্তী, শেখর ভৌমিক, শিবেন্দু মান্না, জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ ভট্টাচার্য, অজিতকুমার চক্রবর্তী, স্বপ্নন সোম, অতনু বসু, প্রবালকুমার হাজরা। অশোককুমার রায় বাগী পত্রিকার ইতিহাস ও রচনাপঞ্জি প্রস্তুত করেছেন। আলোচ্য সংখ্যায় বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, সুকান্ত ভট্টাচার্য ও ননী ভৌমিকের লেখা অপ্রকাশিত মোট আঠারোটি পত্র মুদ্রিত হয়েছে।

সাহিত্য-সাধক-চরিত্রমালার অন্তর্ভুক্ত আবদুল করিম সাহিত্যবিহারদ, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, নিশিকান্ত রায়চৌধুরী, প্রকাশিত হয়েছে জীবনীগুলি লিখেছেন যথাক্রমে মঞ্জুলা বেরা, মঞ্জুলা মুখোপাধ্যায়, সুভাষ ঘোষাল। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিনয় সরকার ও বিহারীলাল সরকার গ্রন্থ তিনটি শ্রীযুগ প্রকাশিত হবে। বৌদ্ধগান ও দোহা এবং পদকল্পতরু দ্বিতীয় খণ্ড পুনর্মুদ্রিত হয়ে নব কলেবরে প্রকাশের অপেক্ষায়। স্বপ্নন বসু সম্পাদিত ও ভূমিকা সংবলিত বসন্তক পত্রিকার অবিকল সংস্করণ মুদ্রণের কাজ চলছে।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার
মালিকানা ও অন্যান্য বিষয়ের বিবৃতি
(চনং ধারা অনুযায়ী, ফর্ম নং-৪)

প্রকাশনার স্থান : কলকাতা

প্রকাশনার ক্রম : ত্রৈমাসিক : বৈশাখ-আষাঢ়, শ্রাবণ-আশ্বিন,
কার্তিক-পৌষ, মাঘ-চৈত্র

প্রকাশকের নাম : শ্রীরমাকান্ত চক্রবর্তী
সম্পাদক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

ভারতীয় নাগরিক কিনা : ভারতীয় নাগরিক

পত্রিকাধ্যক্ষের নাম : শ্রীপ্রভাতকুমার দাস

ভারতীয় নাগরিক কিনা : ভারতীয় নাগরিক

ঠিকানা : ২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৬

মুদ্রকের নাম : শ্যামল সাউ
দি সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলকাতা-৬

স্বত্বাধিকারী : বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

ঠিকানা : ২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৬

আমি শ্রীরমাকান্ত চক্রবর্তী জানাচ্ছি যে উপরি-উক্ত বিবরণ আমার
জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

স্বা. রমাকান্ত চক্রবর্তী
প্রকাশক

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রকাশকের একটি অনন্য সম্ভার
সাহিত্য-সাধক চরিত্রমালা
১ম-২২শ বর্ষ একত্রে পাওয়া যাবে

চরিত্রমালায় অবতরন করেছেন
জগদীশচন্দ্রবসু / বসন্তরাম চক্রবর্তী
মুকুন্দরায় রায় / পার্থ বসু
গোপাল ভট্টাচার্য / ইলা সেনগুপ্ত
হরিভদ্রন বসুখোপাধ্যায় / নির্মল দাস
সিরিশচন্দ্র ঘোষ / ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়
গোপাল রায়চৌধুরী / অমিত্র ধর
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী / মানসী দাসগুপ্ত
সিরিনালা দেবী ভোক্তাভিষেকী দেবী / মঞ্জুশ্রী সিংহ
অম্বিকান্ত মজুমদার / অতিথ্য কিশোর
চিত্তাহরণ চক্রবর্তী / ভবতোষ দত্ত
বুদ্ধদেব বসু / অমিত্র সেন
সাবিত্রী রায় / সুশিক্ষা ঘোষ
মৃণোজকৃষ্ণ ভট্টাচার্য / মঞ্জুলা মুখোপাধ্যায়
আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ / মঞ্জুলা বেরা
সিদ্ধিকান্ত / সূতায় গোপাল

মহান প্রকাশন প্রকল্প : দুইখণ্ড গ্রন্থমালা ১
উনিশ শতকে প্রকাশিত গ্রন্থগুলির সমর্থনে রচিত

চলটি দুইখণ্ড গ্রন্থের পূর্ববর্তন

উনিশ শতকের গ্রন্থমালা

সম্পাদনা : অক্ষয় বসু

গ্রন্থিকা বিখ্যাত / সৌরভোদা শিল্পকলা

ভারতবর্ষীয় গ্রন্থের বিশেষণ / অসম্ভবতর ভবন

গ্রন্থিকা-বিধান / হরিভদ্রন রায়

দ্বিখণ্ড অক্ষয়বসুর বিশেষণ ও ভাষায় সজ্ঞাতি / কৈলাসচন্দ্র দেবী

মূল্য : ৬০.০০



বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪০/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড কলকাতা-৭০০ ০০৬

ফোন : ২৩৫০-৫৭৪০